তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

— পঁয়ত্রিশ টাকা —

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রী জয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

১

একালে অতীতের মহাকবি ও মহাকাব্য-পাঠকসমাজের বিলুপ্তি ঘটিলেও মহাকাব্যের নতুন প্রতিভূর আবির্ভাব উপন্যাসের মধ্যে সূচিত হয়েছে। সেকালে মহাকাব্য লেখা হত ছন্দে এবং প্রায়ই তা জনতার সম্মুখে গীত হত। একালে উপন্যাস লেখা হয় গদ্যে এবং তা আম-দরবারের বস্তু নয়, অর্থাৎ এযুগে বহুজনের সম্মুখে উপন্যাস পড়া হয় না। মহাকাব্যের লক্ষ্য—বিশাল শ্রোতৃসঙ্ঘ, উপন্যাসের আবেদন—একটি পাঠক। তা হলেও মহাকাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে গোত্রগত কিছু মিল আছে। উভয়ই মানুষ ও মানবসমাজের গল্প এবং উভয়ই বিশেষ দেশ-কালে বিধৃত। তবে মহাকাব্যের বিষয় হল বিশাল পটভূমিকায়-আঁকা বিরাট চরিত্র, উপন্যাসের বিষয় হল প্রাতিদিনের এক-রঙা পটফলকে চিত্রিত সাধারণ মানুষ। অসাধারণ মানুষও উপন্যাসের 'কুশীলব' হতে পারে, কিন্তু তাকে সাধারণ মানুষের আধারেই ঢালতে হবে। এযুগে প্রাচীন মহাকাব্য আর রচিত হবে না—এখন উপন্যাসের যুগ। পরিচিত মানুষের মধ্যে, অনুজ্জ্বল ব্যক্তি ও পাচাপাঁচি সমাজকে কেন্দ্র করেই একালের এই উপন্যাস, বলা যেতে পারে গদ্য মহাকাব্য। কেউ বলবেন, উপন্যাস হচ্ছে একালের জীবনভাষ্য।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলি উপন্যাস সেকালে রচিত হলে মহাকাব্যের রীতি-নীতিই গ্রহণ করত—তা বোধ হয় পাঠকসমাজ ইতঃপূর্বে-প্রকাশিত 'তারাশঙ্কর রচনাবলী'র নানা খণ্ড থেকেই বুঝতে পেরেছেন। উক্ত খণ্ডগুলির ভূমিকায় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক নিপুণ আলোচনা আছে, অনেক তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। এই খণ্ডে তার চেয়ে নূতনতর কথা শোনাবার অবকাশ অল্প। তবু কর্তব্যানুরোধে দু-চার কথা বলার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, আঞ্চলিকতা—সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে একটা বিশাল, ব্যাপক, গভীর অনুভূতি—যার একদিকে রয়েছে আশাহীন বিষণ্ণতা অপরদিকে আছে অস্তিবাচী প্রত্যাশা, এ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র প্রাণৈশ্বর্য, যা বিশ্বচেতনাকেও স্পর্শ করে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রধান প্রধান বাঙালী ঔপন্যাসিকের ক্রম নির্বাচন করতে হলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কর—এইভাবেই পর্যায় সাজাতে হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা এবং কিছুটা গোত্রছাড়াও বটে। কারণ তিনি মূলতঃ কবি, তারপরে ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্র আবেগমথিত সহজিয়া রসে বাঙালীর মন লুঠ করে নিয়েছেন। শুধু বাঙালী কেন, অনুবাদের মারফতে বাংলার বাইরেও তিনি জনপ্রিয় কথাকার। তিনি বাঙালী জীবনের কাহিনী লিখলেও তাঁর রচনায় ভূগোলের সীমা-উত্তরণের ইঙ্গিত রয়েছে। সেই জন্য বাঙালীর গতপ্রাণ একান্নবর্তী পরিবারের চোখের জলে-ভেজা নিতান্ত নিষ্প্রভ কাহিনীও ভিন্নভাষী অন্য প্রদেশের হৃদয়ে কান্নার ঢেউ তোলে। সমাজ ও নীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েও সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উদাসীন। সমাজতাত্ত্বিক আলোড়ন, নীতি-দুর্নীতি-ঘটিত কলহ-কলরব—এসব সম্পর্কে এখানে-সেখানে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকলেও শরৎচন্দ্র দৈবদশাধীন ও নিয়তিযূপবদ্ধ অসহায় মানুষের সুখদুঃখের কথা বুকের ভাষায় লিখতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর রচনার আঙ্গিক কোন

কোন ক্ষেত্রে শিথিল হলেও, আমাদের আবেগকে প্লাবিত করে। তাঁর সৃষ্টি বিশালতার চেয়ে গভীরতার মর্মতলস্পর্শী। বরং যে সমস্ত উপন্যাসে তিনি বুদ্ধির মারপ্যাচ দেখাতে গেছেন ('শেষ প্রশ্ন') বা আধুনিকতার ঘূর্ণি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ('বিপ্রদাস') অথবা নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনাকে মূল করেছেন ('পথের দাবি') তার জন্য প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এখন তাঁর সে গৌরব কিছু ম্লান তা স্বীকার করতে হবে।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের আবির্ভাব বিশাল পটভূমিকায় এবং সে পটভূমিকা প্রায়ই অঞ্চল-বিশেষকে কেন্দ্র করেছে। আবেদনের দিক থেকে তাঁর কথাবস্তু সর্বজন-হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু তার চৌহদ্দি আঞ্চলিকতার দ্বারা নির্দিষ্ট। হার্ডি যেমন ডরসেট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ওয়েসেক্স্ পর্যায়ের উপন্যাস লিখেছিলেন এবং আঞ্চলিকতা সত্ত্বেও অঞ্চলের সঙ্কীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি তারাশঙ্কর প্রধানতঃ রাঢ়ভূমির গেরুয়া মাটিকে পটভূমিকা স্বরূপ বেছে নিলেও, রচনার সার্বজনীন আবেদন ও জীবন সম্বন্ধে উদারতর ভাব-ভাবনার জন্য ভূগোলের সীমা সহজেই পার হয়ে গেছেন।

এই খণ্ডে তাঁর তিনখানি উপন্যাস গৃহীত হয়েছে—'অভিযান' (১৩৫৩), 'পদচিহ্ন' (১৩৫৭) এবং 'যতিভঙ্গ' (১৩৬৯)। 'গণদেবতা' (১৩৪৯), 'মন্বন্তর' (১৩৫০), 'পঞ্চগ্রাম' (১৩৫০), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৩৫৮) প্রভৃতি উপন্যাস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শরৎচন্দ্রের সীমানা ছেড়ে তারাশঙ্কর কঠিন মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সমসাময়িক দেশ ও কালের উত্তাপ ও আঘাত তাঁকে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন থাকতে দেয়নি। কঠিন ধরিত্রীর উপর পদ্মাসনে আসীন রুক্ষকঠোর সন্ন্যাসীর মতো তিনি যেন ধ্যানে বসেছেন, কিন্তু নয়নকোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমে উঠেছে। প্রেম ও বৈরাগ্য, বিষণ্ণ উৎক্রান্তি ও প্রসন্ন নির্ভরতা—দুই-ই তাঁর আত্মার আত্মীয়। কিন্তু সর্বোপরি সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ মৃত্তিকাতলচারী অভদ্রেতর জীবনের প্রতি তাঁর কৌতূহল যেমন সজাগ, তেমনি সেই সমস্ত ঘরছাড়া মানহারা যাযাবর মানুষের প্রতি আছে তাঁর অসীম মমতা। অনেকটা তান্ত্রিকের দুঃসহ সাধনার মতো তিনি মানুষের কবোষ্ণ হৃৎপিণ্ডটিকে যেন দুই হাতে স্পর্শ করেছেন।

তাঁর উপন্যাস সংখ্যায় বিপুল এবং বিষয়বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। চরিত্রসৃষ্টিতেও তিনি বিচিত্রের দূত হয়েই সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেছেন। এত অসংখ্য ব্যক্তির ভিড়ে এবং সমসাময়িক ঘটনার চাপে তাঁর উপন্যাস কোথাও অযথা ভারাক্রান্ত হয়নি। সকলের উপরে, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির এক-একটা বিশেষ পরিচয় আছে। তারা কোন কোন সময়ে প্রতীকতায় পর্যবসিতও হলেও তাদের ব্যক্তিত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এবং প্রতীকধর্ম তাদের মানবধর্ম কেড়ে নেয়নি। উপন্যাসে কোন্‌টির অধিকতর প্রাধান্য—কাহিনী-চরিত্র, শ্রেণীচিত্র তথা শ্রেণীদ্বন্দ্ব, অথবা তদতিরিক্ত—লেখকের নিস্পৃহ চেতনার গভীর স্বীকৃতি? কিংবা এর কোনোটাই নয়—শুধু টুকরো টুকরো ধাবমান মুহূর্তের সমাহার, অথবা মগ্ন চৈতন্যপ্রবাহের অযুত তরঙ্গভঙ্গ? এই সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে একালের লেখক, পাঠক ও সমালোচকের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই। বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক আঙ্গিক নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা চলেছে, মগ্ন চৈতন্যপ্রবাহ সম্পর্কে দুটি-চারটি উপন্যাস লেখাও হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত চরিত্রকে ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রবাহ বা মিশ্র চৈতন্যের রহস্য, কিংবা শ্রেণীসংঘর্ষের রণহুঙ্কার বাংলা উপন্যাসকে অভিনব

কোন সার্থকতার ঘাটে উত্তীর্ণ করতে পারেনি। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তারা এক-একটি বিশিষ্ট মানুষ। তাদের জীবনে বহু সমস্যা থাকলেও তারা শুধু সমকালীন বাতায়ন থেকে জীবনকে দেখেনি। ভূগোল-ইতিহাসের পিঞ্জরে যে-মানুষকে আঁটে না, যদিও স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিত তাদের বিচরণভূমি—সেই নিত্যকালের মানুষের সুখদুঃখকে তারাশঙ্কর অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু আধারটি হয়েছে একালের।

এই খণ্ডে মুদ্রিত তাঁর তিনখানি উপন্যাসে ('অভিযান', 'পদচিহ্ন', 'যতিভঙ্গ') সমাজের তিনটি বিশেষস্তরের স্বরূপ ধরা পড়েছে—যার সবগুলির সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার যোগ হয়তো ততটা অন্তরঙ্গ ছিল না। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ঔপন্যাসিকের একমাত্র মূলধন নয়। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' কখনোই শ্রেষ্ঠ শিল্প নয়। নিছক ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা যখন কল্পনার রসে আর্দ্র হয়ে একটি নিটোল শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে, তখনই তাকে সারস্বত প্রাঙ্গণে ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। ফটোগ্রাফ শিল্প নয়—যদি না তাতে শিল্পীর হাত পড়ে। রিপোর্টাজও সাহিত্য নয়, যদি না তা চাক্ষুষ প্রতীতির সাংবাদিক সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়েও কথা-সাহিত্যের রূপ কল্পনা করা যায় না। আসলে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সহানুভূতির যোগ থাকা চাই, এবং লেখকের সহানুভূতির পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠলেই চক্ষুকর্ণগত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কল্পনার মায়ায় রসবস্তুতে পরিণত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তারাশঙ্কর গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল ছিলেন, তাদের সঙ্গ করেছেন অত্যন্ত প্রীতি ও কৌতূহল নিয়ে। তাই তাঁর গল্প-উপন্যাস জীবনের আতপ্ত রসে এত সজীব। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাসকে আমাদের কাছে এতটা গ্রহণীয় করেছে। কিন্তু আরও একদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। কথাসাহিত্যের মূল উপাদান প্রত্যক্ষ জগৎ হলেও সেই বস্তুগত প্রত্যক্ষকে শিল্পগত পরোক্ষানুভূতিতে পরিণত করতে না পারলে ঘটনা ঘটনাই রয়ে যায়, এবং তা সাংবাদিকতার নগদা বিদায়ের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠকের সত্তার মূল ধরে নাড়া দেয়, তার প্রধান কারণ—সেগুলি খাঁটি বাস্তবধর্মী বলে নয়। তার কারণ—ঐ কাহিনী ও চরিত্রগুলিতে আমরা সমকালের মধ্য দিয়ে নিত্যকালকে প্রত্যক্ষ করি, ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনরহস্য উপলব্ধি করি, যা দেশকালাতীত হয়েও দেশকালানুগত। আসল কথা, বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হলেও তাঁর অপরিসীম মানবপ্রীতি, জীবনরহস্য সম্বন্ধে একটি বিষণ্ণ বেদনাতুর উপলব্ধি এবং জীবন-যবনিকা ভেদ করে নেপথ্যসঞ্চারী দৃষ্টির সুদূরাভিসার আমাদের বিস্ময়ানুভূতিকে আলোড়িত করে তোলে এবং পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে একটা গৈরিক উদাসীনতা এনে দেয়। প্রাণপ্রবাহের বন্ধ্যা তটমূলে নিক্ষিপ্ত মানবসজ্ঞ অন্ধের মতো পথ খুঁজে চলেছে—ওই অকারণ অবারণ পথসন্ধানই মানুষের একমাত্র নিয়তি। বোধ করি তারাশঙ্করের মতো আর কেউ এতো গভীরভাবে সেই নির্মম ভবিতব্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে অকস্মাৎ কোনও এক দুর্লভ মুহূর্তে যখন নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়, যখন দেখি—জনকল্লোলের মধ্যেও গভীর অরণ্যের নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে এসেছে, তখন মনে হয়, তিনি আমাদের আত্মার সঙ্গী। তাই তাঁর উপন্যাস শুধু চিত্তবিনোদনের সুলভ সামগ্রী নয়, বা অবসরযাপনের অলস অবলম্বন নয়। তাঁর রচনার মধ্যে পাঠক-পাঠিকা যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে।

'অভিযান' (১৩৫৩) উপন্যাসের পটভূমিকা বালিবহুল লাল আলোয়। কাঁকর-মাটির উদাসী প্রান্তর। তার মধ্য দিয়ে চলেছে গিরবরজা গ্রামের ছত্রীর ছেলে নরসিং—পুরাতন মডেলের গাড়ীর সারথি হয়ে। সে-ই তার চালক ও মালিক। মুর্শিদাবাদের গ্রামে রাজপুতানার ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ছত্রীদের ছোট উপনিবেশ ছিল। তাদের সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর একটি স্বল্পালোকিত অংশে আলোকপাত করেছেন। নরসিং, তার স্ত্রী জানকী আর শ্যালক রাম—এই নিয়ে তার সংসার। জানকীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তার জীবনে উদিত হল ফটকি—লাস্যময়, কামনার কালীদহের কাল-ভুজঙ্গিনী। নরসিং-এর সমস্ত দেহ-মন ফটকিকে কাছে পেয়েও উন্মত্ত হয় না। তখন ফটকির পাশে এসে দাঁড়ায় জানকীর অদেখা সত্তা। খ্রীস্টান মেয়ে শ্যামাঙ্গিনী মেরী নীলিমা দাস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী; রুচিতে সে মার্জিত, ভাষণে সংযত। তাকে দেখে নরসিং-এর নিরুদ্ধ কামনা শুদ্ধ হয়ে যায়। সে হয়ে ওঠে স্বপ্নকামনায় আকাশকুসুম। একদিকে জানকীর স্মৃতি, আর একদিকে স্বপ্ন-সঞ্চারিণী মেরী নীলিমা দাস। এর ফলে ফটকির উত্তপ্ত কামনাময় আকর্ষণ তার দেহে-মনে কিছুমাত্র সাড়া জাগাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নরসিং-এর স্বপ্নসৌধ ভেঙে পড়ল, যখন সে জানতে পারল, নীলিমা দাস নীলিমা ব্যানার্জী হয়েছে। এবার সে মুক্ত। এখন ফটকিকে গ্রহণ করার পক্ষে আর কোনও বাধা রইল না। মুর্শিদাবাদের গ্রামপথে পাল্লা দিয়ে গাড়ী চালানোর প্রয়োজনও ক্রমেই হ্রস্ব হয়ে পড়ল। এবার মোটরগাড়ী চালাবার ব্যবসা সে অন্যত্র জমিয়ে তুলবে, আর এক রুক্ষ মাটির দেশে, যার জঠরে রয়েছে কালো কয়লার অজস্রতা। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে তার পুরাতন গাড়ী ছুটে চলল অণ্ডালের কয়লাখাদের দিকে। সঙ্গে ফটকি, সিঁথিমূলে তার সিঁদুর, ঘরগৃহস্থালী নিয়ে সে অতিশয় ব্যস্ত। গিরবরজার ছত্রীর সন্তান নরসিং-এর নতুন জীবন ফটকিকে নিয়ে নতুন খাতে বইতে শুরু করল।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর একটি পুরুষের মনে তিনটি নারীর ছায়াছবি এঁকেছেন। এর মধ্যে একজন স্মৃতিসঙ্গিনী, তার মৃত স্ত্রী জানকী,—আর একজন স্বপ্নচারিণী মেরী নীলিমা দাস। কিন্তু মাঝে যে আছে সে সজীব, বাস্তব, উত্তপ্ত—সে ফটকি। তার নাসারন্ধ্রে কামনার উষ্ণ নিশ্বাস, নয়নে মদির কটাক্ষ, বাহুতে কালভুজঙ্গিনীর আমন্ত্রণ। পরিশেষে সে-ই হল নরসিং-এর ঘরনী-গৃহিণী। নরসিং পূর্বপুরুষের গ্রাম ছাড়ল, দেশান্তরে গিয়ে জীবিকার নতুন পথ খুঁজে নিল, সঙ্গে গেল ফটকি নতুন করে ঘর বাঁধবার জন্য। এর পর তার ছন্নছাড়া জীবনে হয়তো প্রশান্তি নামবে।

'পদচিহ্ন' (১৩৫৭) উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—এটি তাঁর বৃহৎ উপন্যাসের প্রথম অংশ। এর দ্বিতীয় পর্ব হল 'কালান্তর' (১৩৬৩)। 'পদচিহ্ন'-এর কালব্যাপ্তি ১৯০০ থেকে ১৯০৮-৯ সাল। বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ এর পটভূমিকা। তারাশঙ্কর তাঁর গ্রামকে কেন্দ্র করে, কোনও কোনও সময়ে সমগ্র বীরভূমকে কোনও একটি গ্রামে নামিয়ে এনে একটা বিশেষ অঞ্চলের দেশকালপাত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'গণদেবতা', 'মন্বন্তর', 'পঞ্চগ্রাম', 'পদচিহ্ন', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'কালান্তর'—সবই আঞ্চলিকতার পটতলে অঙ্কিত। অবশ্য তার পূর্বেও দেশ, দেশভাবনা, গ্রামীণ সমাজের দ্রুত রূপান্তর এবং ভগ্নপ্রায় ভূস্বামিসম্প্রদায়কে

নিয়ে তিনি 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) ও 'কালিন্দী' (১৯৪০) রচনা করেছিলেন। বিদেশী-শাসিত ভারতবর্ষে উপন্যাস নতুন পথে চলবে—এই নির্দেশ তিনি অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তিনিও এক সময়ে দেশব্রতী হয়ে কিছুকাল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছিলেন। সমসাময়িক দেশ ও সমাজকে তাঁর পূর্বে এত রূপকভাবে আর কোন লেখক উপন্যাসে ব্যবহার করেননি। অবশ্য সমসাময়িক পটভূমিকায় লেখা তাঁর সব উপন্যাসই যে সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তা অবশ্য বলা যাবে না। 'মন্বন্তর'-এর কাহিনী ও চরিত্র সমকালীন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে ছাড়িয়ে শিল্পলোকে সব সময়ে উন্নীত হতে পারেনি—একথা কেউ কেউ বলতে পারেন। জমিদারদের বিরোধ ও ভাঙনদশা নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসে এমন অনেক বিষয় আছে, উপন্যাসের দিক থেকে যার মূল্য যৎসামান্য। কিন্তু তাঁর নিজের গ্রাম ও নিজের জীবন তাঁর যে-সমস্ত উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে, যার থেকে তিনি উপন্যাসের বীজ সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে 'পদচিহ্ন' উল্লেখযোগ্য।

'পদচিহ্ন'-এর কাহিনী পৌনে এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী পটভূমিকা বেছে নিয়েছে—বলা বাহুল্য এটি বীরভূমের জমিদারশাসিত কোনও একটি গ্রাম। জমিদারদের সরিকী বিবাদ কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অলক্ষ্যে চলে। সেই ধারাই চলে আসছে পুরাতন কাল থেকে। গ্রামে তাঁদের অবস্থা পড়ে আসছে, নতুন বিত্তবানের উদয় হচ্ছে—যার ঐশ্বর্যের মূল কেন্দ্র ভূমি নয়—বাণিজ্য। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীর দল রাজপাদোপজীবীদের ক্রমেই কোণঠাসা করে আনছে। 'পদচিহ্নে'র গ্রামের নাম নবগ্রাম—বহু পুরাতন তার ইতিহাস। পুরাতন জমিদার বংশ তার কুলপতি—তাঁরা একাধিক সরিকে বিভক্ত এবং বিবদমান। ১৯০৫ সালের দিকেও গ্রামে একটি মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল ছাড়া আর কোন বিদ্যাকেন্দ্র নেই। তারও ভগ্নদশা। জ্ঞানের সেইটি একমাত্র উৎস। এই গ্রামের জমিদার বংশের একতরফ রাধাকান্ত, আর এক তরফ গোপীচন্দ্র—যিনি ব্যবসার দ্বারা প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছেন। রাধাকান্তদের পড়তি দশা। গোপীচন্দ্র এ গ্রামে নব-উদীয়মান। গোপীচন্দ্র বিরোধ না চাইলেও বিরোধ বাধল নিঃশব্দে এবং সে বিরোধে রাধাকান্ত হতমান হয়ে পড়লেন। পরাভূত রাধাকান্ত উপলব্ধি করলেন, তাঁর পতনের মূলে রয়েছে দুর্জ্ঞেয় নিয়তি—অদৃষ্ট। তিনি যে অপমান ভোগ করলেন তার জন্য তাঁর কোন অপরাধ দায়ী নয়। নবযুগের উদয়ে তাঁকে অস্তাচলে আসন করতে হল। তিনি এই অপমান লাঞ্ছনা বীরের মতো সহ্য করতে পারলেন না। দুর্ভাগ্যকে হাস্যমুখে তাচ্ছিল্যও করতে পারলেন না—সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করলেন—আশ্রয় নিলেন এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। ভাগ্যের বিরূপতায় তিনি নতুন যুগের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। অপর দিকে গোপীচন্দ্র নতুন যুগকে স্বাগত জানিত করলেন, আধুনিক জীবনের সাজসরঞ্জাম তাঁর আনুকূল্যে সুদূর গ্রামেও পৌঁছে গেল। একদিকে সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধিদের বিদায় গ্রহণ, আর এক দিকে ইংরেজ-সভ্যতাবাহী নতুন যুগের আবির্ভাব। এবার গ্রামজীবনের কেন্দ্রীয় পুরুষ হলেন ভগ্নপক্ষ জমিদার নয়, বিত্তবান ধনিক-বণিক। এই পটভূমিকায় তারাশঙ্কর স্বদেশী আমলের ছবি এঁকেছেন। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, বন্দেমাতরম্ গান, জনসেবার যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এবং কিশোরের বিবেকানন্দ সঙ্ঘে যোগদান এই পটভূমিকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যতদূর মনে হচ্ছে, লেখক এ উপন্যাসকে রাজনৈতিক ঘটনার দলিল হিসেবে

লিখতে চাননি। এতে তিনি একটি বিলীয়মান সমাজ, আর একটি নতুন সমাজ—এই দুই স্তরের সংঘাত দেখাতে চেয়েছেন। পরিশেষে দেখালেন, পুরাতনকে বিষণ্ণতার মধ্যে বিদায় নিতে হল। পরাভূত-রাধাকান্ত পলাতক হলেন। সংগ্রামবিজয়ী গোপীচন্দ্রও নিদারুণ ব্যাধিতে শয্যাগত হয়ে চিকিৎসার জন্য গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চললেন। গ্রামে রইল ভাবীকালের প্রতিনিধি রাধাকান্তের বালকপুত্র গৌরীকান্ত।

এই ধরণের উপন্যাসে পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। যে জমিদারতন্ত্র পঙ্গু হয়ে এসেছে, তারাশঙ্কর তার পরাভূত দীন মূর্তিটি সহানুভূতির সঙ্গেই এঁকেছেন। জয়ী হয়েছেন গোপীচন্দ্রের দল, যাঁরা একালের বড়োমানুষ, বহুবিত্তের মালিক, এবং যে-বিত্ত গ্রামসেবায় নিয়োগেও তাঁদের—বিশেষতঃ গোপীচন্দ্রের—অনীহা নেই—যদিও তার পিছনে রয়েছে অহঙ্কারের প্রচ্ছন্ন মূর্তি। কিন্তু স্পষ্টই মনে হয়, তারাশঙ্কর অধিকতর বেদনা বোধ করেছেন ভাগ্যহত রাধাকান্তের জন্য। এ উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অর্ধশতাব্দীরও পূর্ববর্তী রাঢ়ভূমির একটি গ্রামচিত্র অঙ্কন করেছেন, যাতে বাস্তবতা ও কল্পনা একসঙ্গে মিশে গেছে। এর পটভূমিকায় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনেরও যৎসামান্য উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে, যৎসামান্য এইজন্য যে, সুদূর গ্রামে তখনও এই যৌবনজলতরঙ্গ প্রবল উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়েনি। তখন সবেমাত্র এ গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে যাচ্ছে, থিয়েটারের ক্লাব হয়েছে—আধুনিকতার আরও দু-একটি উপকরণ নবগ্রামে সবে আসতে শুরু করেছে। তাই জমিদারতন্ত্রের দেউড়ি পেরিয়ে নবজীবনের ভাবতরঙ্গ তখনও এ গ্রামে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।

এ উপন্যাসের যে-চরিত্রটি সব চেয়ে নাড়া দেয় তা হল রাধাকান্তের স্ত্রীর চরিত্র। তার পিত্রালয় কাশীধামে, তাই তার নাম কিরণবালা হলেও সে নবগ্রামের জমিদারবাড়ীর অন্তঃপুরে 'কাশীর বউ' নামেই পরিচিত। এই অদ্ভুত দৃপ্ত ঋজু অনমনীয় নারীচরিত্রাঙ্কনে তারাশঙ্কর বিস্ময়কর নিপুণতা দেখিয়েছেন। লেখক তাকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। সে দুঃখ পায়, কিন্তু প্রকাশ করে না, অন্যায়কে উপেক্ষা করে, সরবে হৈ-চৈ করে প্রতিবাদ করে না এবং স্নেহপ্রেম ও কর্তব্যবোধের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করে, তার বেদনাহত চরিত্রটি লেখক দেবীপ্রতিমা নির্মাণের নিষ্ঠা নিয়ে অঙ্কন করেছেন।

'পদচিহ্নে' নতুন যুগের যে পদচিহ্ন পড়েছে, তা হয়তো খুব গভীর নয়; কিন্তু নবযুগের জলস্রোতে একদা একটি দূরবর্তী গ্রামের কিয়দংশ কীভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কীভাবে পুরাতন জীবন পরাভবের গ্লানি নিয়ে নিজেই রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল, কেউ-বা নতুনকে ত্বরান্বিত করতে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় বসে কিছু কিছু সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন—তারাশঙ্কর সেই সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা এমন জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে এঁকেছেন যে, মনে হয়, যেন সে গ্রাম এখনও এদেশের কোথাও না কোথাও আছে।

'যতিভঙ্গ' (১৯৬২) ভিন্ন স্বাদের ও নতুন পটভূমিকার উপন্যাস—আকারেও ঈষৎ সঙ্কীর্ণ। একে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না। কাহিনীটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করলেও এটি কোথাও 'ট্রাভালোগ' কোথাও বা ডায়েরির আকার গ্রহণ করেছে। লেখক নানা টুকরো টুকরো চিত্র ও চরিত্রকে কখনও পিছনে হটিয়ে দিয়ে, কখনও সামনে দৌড়

করিয়ে ভাবগত ঐক্য আনবার চেষ্টা করেছেন। যে সময়ে তারাশঙ্কর লোকসভার সদস্য। এজন্য তাঁকে প্রায়ই দিল্লী থাকতে হত। তখন তাঁর ঔপন্যাসিক হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি ছড়াতে শুরু করেছে, দিল্লীর সাহিত্যিক ও শিল্পীমহলে তিনি ক্রমে ক্রমে সুপরিচিত হলেন। লাভপুরের তারাশঙ্কর দেহলীপ্রান্তে পৌঁছে বর্তমান ভারত-আত্মার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় তিনি দিল্লীবাসিনী একটি অবাঙ্গালী যুবতীর ছবি আঁকলেন—বলাই বাহুল্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নাম তার রৌশন। আকস্মিক-ভাবে তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তার সম্বন্ধে তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন—"ভেবেছিলাম মডার্ন মেয়ে নিয়েই লিখব··আমার সে মডার্ন মেয়ে রৌশন।" কুতুবের চূড়া থেকে সেই আধুনিকা নাগরী লাফিয়ে পড়ল—জীবনের সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। তার আগে সে লেখককে চিঠি দিয়েছিল। লেখক তার থেকে এই বিচিত্ররূপিণীর পরিচয় খুঁজে পান।

রৌশন নিজেকে ধনীর দুলালী বলে পরিচয় দিলেও আসলে সে জম্মুর এক গ্রাম্য বালিকা—গরীব জাঠের ঘরে তার জন্ম। বালিকা বয়স থেকেই সে কিছু অধিক পরিপক্ব, হয়তটানও ছিল। ঐ বয়সেই এক দুর্দান্ত জাঠ যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হল। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সমস্ত দেশকেই গ্রাস করে ফেলল। এই দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাদের দুঃস্থ পরিবার উদ্বাস্তুর দীন বেশে দিল্লীর রাজপথে কোনও প্রকারে ঠাঁই করে নিল। তখন রৌশন কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে উঠেছে। সে ভিখ্-মাঙা জীবন বরদাস্ত করতে পারল না। গ্রাম্য নাম ছেড়ে নতুন নাম বেছে নিল—রৌশন। দিল্লীর রাজপথ থেকে সে উপরতলায় উঠে গেল, পথে পড়ে রইল তার পরিবার। যেখানে নাচগান, খুশি, খানাপিনা, জীবনের বল্গাহীন উদ্দামতা—রৌশন সেই জলোচ্ছ্বাসের মুখে নিজেকে সঁপে দিল। কিন্তু আর এক দিকে রয়েছে তার অতীত, তাকে মুছে ফেলতে চাইলেও একেবারে নিঃশেষে শূন্য করে দিতে পারেনি। এই দুয়ের মধ্যে সে মিল ঘটাতে পারল না, কুতুবের শীর্ষচূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করল।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে তারাশঙ্কর অপেক্ষাকৃত নতুন রাজ্যে পদার্পণ করতে চেয়েছেন। আধুনিকার মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, রৌশনের রঙমাখা মুখের অন্তরালে তার ব্যথাদীর্ণ অশ্রুমুখী সত্তা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। সে সাধারণ নারীর মতোই স্ত্রী হতে চেয়েছিল, মা হতে চেয়েছিল। কিন্তু অদৃষ্ট তার জীবনে অনাহূতভাবে প্রবেশ করে তাকে দিগন্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বলা বাহুল্য এ উপন্যাস ঠিক উপন্যাসের পূর্ণত্ব লাভ করেনি, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর মালা গেঁথে তিনি আধুনিক নারীর সকরুণ পরিণাম আঁকতে চেয়েছেন। রৌশনের বেদনাদায়ক পরিণতি পাঠককে সহানুভূতির রসে ভরিয়ে তুললেও এ উপন্যাস কতকটা স্কেচ্‌ধর্মী হয়ে গেছে। সে যাই হোক, তারাশঙ্কর একটি অনভ্যস্ত পথে পদচারণা করেছেন। সুতরাং সে পদক্ষেপ কিছু সাবধানী, কিছু মন্থর হবেই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ক্যাবারে-সভার চিত্র আঁকতে বসতেন তা হলে তার যা ফলাফল হত, এক্ষেত্রে তারাশঙ্করের বেলাতেও প্রায় তাই হয়েছে। তাঁর প্রতিভা-বহ্নি যে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে, তা এই উপন্যাস থেকেই অনুমান করা যাবে।

এই সঙ্কলনে একটি গল্প ('বন্দিনী কমলা') সঙ্কলিত হয়েছে। ছোট গল্পকার হিসেবে

তারাশঙ্কর একদা পাঠকসমাজে অসাধারণ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। ছোট গল্পের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকরণের প্রায় সব কটাতেই তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন। নাটকীয় মুহূর্তে বিদ্যুৎ-চমকসৃষ্টিই হল তারাশঙ্করের একপ্রকার বৈশিষ্ট্য। 'বন্দিনী কমলা' গল্পের পটভূমি শূন্যকুম্ভ জমিদারবাড়ী। কলসীর জল শেষ হয়ে এলেও কলসীটা যে পূর্ণই আছে তা সে বাড়ীর সকলেরই বিশ্বাস। কারণ কমলা এ বংশে অচলা। কয়েক পুরুষ আগে এক ঝড়জলের রাতে একটি পরমাসুন্দরী নারী সে বাড়ীর বৃদ্ধা গৃহিণীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কী ভেবে গৃহিণী তাকে একটি ছোট ঘরে বসিয়ে দরজায় শিকল টেনে দেন এবং ঝুলিয়ে দেন বড়ো তালা। কয়েক পুরুষ ধরে সে তালা তেমনিভাবে ঝুলতে লাগল। লক্ষ্মী তার মধ্যে বন্দিনী হয়ে রইলেন। তারপর বহুদিন কেটে গেল। নতুন বউ মণিমালা এ বাড়ীতে বধূরূপে প্রবেশ করে এ গল্প শোনে, বিস্মিত হয়। পরে তার প্রবল কৌতূহল জেগে ওঠে। সে সাধারণ ঘরের মেয়ে, ভগ্নদশা জমিদারবাড়ীর এ-সব ব্যাপার শুনে শঙ্কিত হয়। একদিন সন্ধ্যা দিতে গিয়ে দেখল সে কুঠরীর তালা মরচে পড়ে প্রায় খুলে এসেছে। কী এক নেশার ঘোরে সে একটু চেষ্টা করে দরজা খুলে ফেলল। শব্দ শুনে আরও অনেকে এসে জুটলো। সকলেই দেখতে পেল, ঘরের মধ্যে "একটা নরকঙ্কাল···একরাশ চুল···মেঝের উপর আরও পড়িয়াছিল—একখানি বিবর্ণ জীর্ণ কাপড় কি চাদর, পাড়ের চিহ্ন দেখা যায় না—আর একখানা নামাবলী।" কোনও এক দুর্যোগের রাত্রিতে এক অসহায় আশ্রয়প্রার্থিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে বৃদ্ধা গৃহিণী তাকে লক্ষ্মীঠাকরুণ বলে মনে করে তাঁকে পরিবারে অচলা করে রাখবার জন্য চোরা কুঠরীতে তালাচাবি দিয়ে রাখেন। গল্পের শেষাংশ যথার্থই নাটকীয় চমকে পরিপূর্ণ। তবে মনে হয় গল্পের উপসংহারের তুলনায় জমিদারবাড়ীর বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। লেখক যে নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সে তুলে গল্প শেষ করেছেন, যথার্থ ছোট গল্পের সেইখান থেকেই শুরু; চোরাকুঠরীতে বন্দিনী নারীর কঙ্কাল প্রভৃতি এর মূল কথা নয়, আসল কথা—মণিমালার মানসিক প্রতিক্রিয়া। সে সম্বন্ধে লেখক মাত্র একটি ছত্র ব্যয় করেছেন—"অকস্মাৎ কাঞ্চনবউয়ের (মণিমালা) চোখ দিয়া দর দর ধারে জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।" এ গল্পের যথার্থ বন্দিনী লক্ষ্মীঠাকরুণ নন, বন্দিনী হচ্ছে নতুন বউ মণিমালা। চোরাকুঠরীর ব্যাপার সঙ্কেত হিসেবে ব্যবহৃত হলেই ভালো হত।

তারাশঙ্করের জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় (তারাশঙ্কর রচনাবলী, ১ম খণ্ড)। সেখানে তিনি বলেছেন, তারাশঙ্করের জীবনে কেন যে বিষণ্ণতার ছায়া ঘনিয়েছিল বলা কঠিন। অবশ্য আনন্দও ছিল। "তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব আনন্দ ও বিষণ্ণতায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল।" তারাশঙ্কর জীবনের যবনিকা ভেদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে দুশ্ছেদ্য জালাবরণের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি জীবনের অনিবার্য নিয়তি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়েছিলেন ? অথবা প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ক্রমেই বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন ? সে রকম ইঙ্গিত এই খণ্ডের রচনা থেকেও পাওয়া যাবে।

বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিযান

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

লাভপুর, বীরভূম

পৌষ—১৩৫৩

এক

উত্তর-দক্ষিণে বরাবর চলে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা। দেশের লোক বলে পাকা সড়ক। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের খাতায় আছে—মেটাল্ড রোড। বারো ফুট চওড়া; লম্বায় মেন মেটাল্ড রোড থেকে "রামনগর রিভার ঘাট" পর্যন্ত টুয়েলভ মাইলস—অর্থাৎ রামনগর নদীর ঘাট পর্যন্ত বারো মাইল লম্বা।

পাথরের নুড়ি বিছিয়ে তার উপর বালিবহুল লাল আঠালো কাঁকর-মাটি ফেলে বর্ষার সময় রোলার চালিয়ে জমানো হয়েছে। বারো ফুট চওড়া লাল ফিতের মত মাঠ ও গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। অ্যাশফল্ট কি কংক্রিটের রাস্তার মত মসৃণ নয়, লাল কাঁকর-মাটির বিছানির সর্বাঙ্গে পাথরের নুড়িগুলোর মাথা বেরিয়ে আছে, সেই জন্যই খুব শক্ত। দেশের লোকে বলে বজ্র-কঠিন। বজ্র-কঠিনই বটে—আছাড় খেয়ে পড়লে সর্বাঙ্গে পাথরের নুড়ির মাপের কালশিটেতে ভরে যায়, মাথা কপাল ফাটে, দু-চার জায়গায় কেটেও যায়। পাথরের নুড়িগুলো গোলালো, দু-একটা তীক্ষ্ণ ধারালো হয়েও উঠে থাকে। উপর থেকে দেখে বেশ মসৃণ কোমল মনে হয়। লাল মাটির ধুলো কোমল কাগের মত জমে থাকে। লালচে ধোঁয়ার মত ওড়ে। আজ উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর-মুখে।

নরসিংয়ের মোটরখানা চলছে। পুরনো মডেলের গাড়ি। হুডের কাঠামো নতুন, বডির রংও চকচকে। কিন্তু মাডগার্ডগুলো টোল খাওয়া—মধ্যে মধ্যে জং ধরে ছিদ্রও হয়ে গেছে। দরজার হ্যাণ্ডেলগুলোর রুপোলী কলাই উঠে গিয়ে পেতল বেরিয়ে পড়েছে। দরজাগুলো গাড়ির চলার বেগে বিচিত্র ভঙ্গিতে নড়ছে, এ কোণটা যখন নামছে, ও মাথাটা তখন উঠছে, তবে বেশী নয়, অল্প-স্বল্প। সামনের কাচের চারিপাশের রবার-লাইনিং খসখসে; শীতকালের রুক্ষ মানুষের গায়ের মত ফাট-খরা, জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু খসেও গিয়েছে। পুরনো গাড়ি। বয়স হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দে একটু খুঁত নাই। একটানা গুঁ-গুঁ শব্দ করে চলেছে। আয়রন-চেস্টের মত শক্ত কলিজার মানুষের মত কলিজা ওর—এই কথা নরসিং বলে রসিকতা করে। বছর দুয়েক আগে নরসিং একবার বুক দেখাতে গিয়ে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল—চেস্ট কেমন দেখলেন স্যার? ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—আয়রন চেস্টের মত শক্ত। প্রাণ-সম্পদ তোমার নিরাপদেই আছে। কোন ভয় নেই। নরসিংহ সেই অবধি উপমাটি ব্যবহার করে তার গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে।

নরসিংয়ের গাড়িখানা শখের নয়, 'ট্যাক্সি-কার', নিয়মিত সময় ধরে ছাড়ে ইমামবাজার থেকে—জেলার সদর শহর। ছাড়ে ভোর ছটার সময়। সাত মাইল পাল্লা দেয় ছোট-লাইনের গাড়ির সঙ্গে। রেল-লাইন আর ডি বি রোড চলেছে পাশাপাশি। দস্তুর নরসিংহ। বড় বড় দাঁত বার করে রেল ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ভেঙচায়, কখনও ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর রেল-লাইনের পাশের রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যায়। ড্রাইভারও ভেঙচায়, হাসে। রাস্তায় তিনটে লেবেল-ক্রসিং আছে, প্রথমটা পড়ে ইমামবাজার পেরিয়েই, সেখানে রেল-কোম্পানির ফটক

নাই; নরসিং সেটা পার হয় প্রায় লাফ দিয়ে, সার্কাসের মোটরগাড়ির নালা পার হওয়ার কৌশলে রেল-ইঞ্জিনের দশ-পনেরো গজ সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। গ্রাম থেকে বেরিয়েই পড়ে একটা বাঁক, পার হয়েই নরসিং বাঁ পায়ে ক্লাচ চেপে গীয়ার বদলে আনে টপ-গীয়ারে। তারপর ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে পা দিয়ে চাপে এ্যাক্সিলারেটারকে; সেটাকে একেবারে নিঃশেষে বসিয়ে দিয়ে দু-হাতের মুঠোয় স্টীয়ারিং শক্ত করে ধরে। পেট্রোলগন্ধী ধোঁয়ার রাশি বের হয়; গাড়িখানা গর্জন করে ওঠে। স্থানীয় প্যাসেঞ্জারেরা সাবধান হয়ে বসে, কিন্তু তারা ভয় পায় না; নরসিংয়ের এ কৌশল তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে; গাঁইয়া কেউ থাকলে সে ভয় পায়, চীৎকার করে ওঠে। গাড়িখানাকে উল্কাবেগে ছুটতে দিয়ে—সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নরসিং হিংস্র বিরক্তিতে গর্জন করে ওঠে—এ্যাও! বলতে বলতে গাড়িখানা তখন ওপারে পেরিয়ে যায়। নরসিং ভীরু প্যাসেঞ্জারের কথা ভুলে যায়, সে গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে পিছনের দিকে ইঞ্জিন-ড্রাইভারের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসে আর ডান হাত বাইরে প্রসারিত করে বুড়ো আঙুল নাড়ে।

ফটক যেখানে আছে, সেখানে আটকে পড়তে হয় নরসিংকে। সেখানে ইঞ্জিন-ড্রাইভার হাসতে হাসতে দাড়িতে হাত বুলোয়, মুখ বাড়িয়ে জোরে শিস দেয়—যেভাবে কুকুরের মালিক শিস দিয়ে ডাকে কুকুরকে। এমনি ভাবে পাল্লা দিয়ে সাত মাইল দূর পর্যন্ত চলে। সাত মাইল দূরে রেলওয়ে জংশন। সেইখানেই শেষ হয়েছে ছোট লাইন। তারপর বাইশ মাইল পাল্লা বিশখানা মোটর-বাস আর ট্যাক্সি-কারের সঙ্গে। মূল রেল-লাইন চলে গিয়েছে সোজা উত্তরমুখে। সদর শহরের মামলা-মকদ্দমা সরকারী কাজকে সে গ্রাহ্য করে নি; সে গিয়েছে বিপুল শস্য-সম্পদ উৎপাদনকারিণী গাঙ্গেয় তটভূমি ধরে গঙ্গার পাশে-পাশে। সদর শহর রেল-জংশন থেকে বাইশ মাইল পশ্চিমে। অনুর্বর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। এই পথে নরসিংয়ের এবার পাল্লার কৌতুক—সর্বাগ্রে যাওয়ার কৌতুক। রাশি-রাশি ধুলা উড়িয়ে চলে সে। সেই ধুলায় পিছনের গাড়ির যাত্রীদলের চুলের ডগা থেকে কাপড় জামা সমস্ত ধূসর হয়ে উঠে; তারা নাকে কাপড় দেয়, কাশে।

সদর থেকে ফেরে আড়াইটার সময়। ইমামবাজারে পৌঁছায় বেলা পাঁচটায়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আর একটা ট্রিপ; ট্রিপ সদর পর্যন্ত নয়—রেলওয়ে-জংশন পর্যন্ত। সেখানে সাড়ে আটটার ও ন'টার ট্রেন ধরিয়ে দেয় এবং ওই দুটো ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরে আসে। এ সময় প্রতিযোগিতা নাই। ছোটলাইনের ট্রেন যায়, কিন্তু সাড়ে আটটার ট্রেনখানা ধরায় না এবং সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ফেরেও না। রাত্রে ফেরবার সময় নরসিংয়ের গাড়ির মাডগার্ডে লোক চাপে; ফুটবোর্ডে লোক দাঁড়ায়, ভিতরে লোক চাপে খোঁয়াড়ের ভিতর গরু-ছাগলের মত অথবা পাখিওয়ালার খাঁচার 'বগেড়ি' পাখির মত। গাড়িখানা তখন চলে ধীর মন্থর গতিতে। রাস্তার দু-পাশে ঘন গাছের সারির মধ্যে হেড-লাইটের আলো ফেলে নরসিং ভাবতে থাকে সেই সব কথা, যা ভাববার অবকাশ আর সমস্ত দিনের মধ্যে হয় না।

কত মুখ মনে পড়ে, যে সব সুন্দর মুখ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে মোটর চালাবার সময়

চকিতের মত চোখে পড়েছিল। সারিবন্দী চলমান লোকের মুখ যাওয়া-আসার পথে তার দ্রুত ধাবমান গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যায় বায়স্কোপের ছবির মত। তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে মনে থাকে একখানি কি দুখানি সুন্দর মুখ। রোজই নূতন একখানি দুখানি মুখ। আবার কতদিন আগে দেখা একখানি মুখ নিত্যই মনে পড়ে। সে রোজ ভাবে কাল আবার দেখবে তাকে। নরসিং জানে না—তার বিধাতা জানেন—কখনও কখনও তাদের একজনের সঙ্গে তার দেখাও হয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, নরসিং তাকে তখন সেই সুন্দর মুখ বলে চিনতে পারে না। হয়তো পাশ-থেকে-দেখা মুখ সামনে থেকে দেখে অন্য রকম মনে হয়। তা ছাড়া যে মুখখানা সে দেখতে চায়, সে মুখ তো একজনের মুখ নয়। কত মুখ মিশে সে মুখ রচিত হয়েছে তার মনে। রোজই সে তিল তিল করে বদলায়। শুধু অবশ্য এই মুখই ভাবে না সে; এই অলস রথ-চালনার সময় মাকে মনে পড়ে, বাপকে মনে পড়ে, গ্রাম মনে পড়ে। আবার কোনদিন মনে মনে হিসেব করে টাকাকড়ির। পাশবইয়ে কত আছে, নিজের কাছে কত আছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে কত হল, যোগ দিয়ে খতিয়ে দেখে ভাবে গাড়িখানা পাল্টে একখানা নতুন গাড়ি কেনার কথা, ট্যাক্সির বদলে বাস কেনার কথা, পেট্রোল-বিক্রির ব্যবসার কথা। কিন্তু সাত মাইল রাস্তায় যতই আস্তে চলুক মোটর, বিলাস করে ভাববার সময় কতটুকু! দেখতে দেখতে ইমামবাজারের হাটের চৌ-মাথায় এসে পৌঁছে যায়। তার পর গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে স্নান করে। আট মাস দীঘির জলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন চারটে মাস বাড়িতে, চার মাসের দু-মাস গরম জলে স্নান করে। তার পর আরাম করে আধ পাঁট পঁচিশ-ডিগ্রী পাকী মদ একটু একটু করে পান করে, তার সঙ্গে গরম তেলে-ভাজা আর সিগারেটের বদলে গুড়গুড়িতে তামাক। সঙ্গে থাকে নিতাই ক্লীনার। রাম কণ্ডাকটার সে ছেলেমানুষ, তার উপর সে নরসিংয়েরই শালা। নরসিং রামকে মদের ভাগ দেয় না। ছেলেমানুষ—ভিতরটা এখনও কাঁচা নরমই আছে, পঁচিশ-ডিগ্রীর বড় ঝাঁঝ।

রবিবার দিন সদর শহরে যায় না গাড়ি। কোর্ট বন্ধ। সেদিন সকালে যায় ওই জংশন পর্যন্ত। ফেরে নটার মধ্যে। ফিরেই গাড়িখানা নিয়ে যায় বামুনপুকুরে। মজে এসেছে বামুনপুকুর, পাড় ক্ষয়ে গেছে, নরসিং সটান গাড়িখানাকে নিয়ে যায় পুকুরের জলের কিনারায়। তার পর তিন জনে ধুতে আরম্ভ করে গাড়িকে। ধুয়ে মুছে বাড়ি এসে—যন্ত্রের অস্থি-সন্ধিতে ভাল করে মুছে দেয় গ্রীজ মোবিল, যেখানে যা প্রয়োজন।

নিজেরা চুল কাটে, দাড়ি কামায়, নখ কাটে, কাপড় পাঠায় ধোবার বাড়ি, জুতোতে কালি লাগায়। জুতো অবশ্য একা নরসিংয়েরই আছে। নিতাইয়ের জুতো নাই; রামের আছে একজোড়া স্যাণ্ডেল। রবিবারে আছে সাবান মাখার পালা। সে সাবান মাখা এক ঘণ্টার পর্ব। দুপুরে সেদিন পড়ে তাসের বাজি, পাশার দান; রাত্রে সেদিন মাংস রান্না হয়, বাজারে মাংস বড় পাওয়া যায় না, হাঁস কিনে আনে নিতাই; হাঁসের মাংস রান্না হয়। পুরো বোতল আসে সেদিন। রাম সেদিন ভাঙ খায়। নরসিংয়ের আসরে সেদিন চলে তে-তাসের জুয়াখেলা। যারই হার হোক—ভাঙের নেশায় রাম অনর্গল হাসে।

নরসিং নেশায় এবং খেলায় মশগুল হয়ে থাকে। নিতাইটা বসে থাকে ভাম হয়ে, প্রকাণ্ড বড় মুখখানার মধ্যে অত্যন্ত ছোট ছুটো চোখ—সেও আধখানা বন্ধ হয়ে আসে। খেলা চলে। খেলতে আসে নরসিংয়ের বন্ধুরা—এখানকার স্টেশনের স্টলওয়ালা লোকটা ছুর্দান্ত মাতাল, কয়লার ডিপোওয়ালা কালী সিং পশ্চিমীছত্রী, সোনার গয়নার শান-পালিশওয়ালা লুত্ফর রহমন, থানার কনেস্টবল জোবেদ আলি, ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার রমেশ, বুড়ো-দোকানী শশী চৌধুরী, আরও মধ্যে মধ্যে আসে রেল-লাইনের ভারপ্রাপ্ত ফিটার—হরকিষণ। যে রবিবারে হরকিষণ এ স্টেশনে আসে—থাকে—সেদিন তার আসা চাই-ই। সকলে মিলে সেদিন মদের জন্তে চাঁদা দেয়, রাত্রিতেই ছুটে যায় আরও কয়েকটা হাঁসের বা একটা খাসীর খোঁজে। ঠুন ঠান শব্দ করে টাকার দান পড়ে, লোকগুলি নিঃশব্দ; তাস উল্টানো হয়—যে দান পায় সে টাকা নেয়, বাকী টাকা নেয় যে তাস খেলেছে—সে। রাম হা হা শব্দে অনর্গল হাসে। সাধারণত নরসিং কিছু বলে না। এক-আধ দিন ক্ষেপে যায়। বেমক্কা মাটির উপর একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে, এ বেত্তমিজ, বেসায়েস্ত, বেয়াদপ কাঁহাকা!

রাম চমকে ওঠে। নিতাইও ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠে সজাগ হয়ে বসে—বেকুবের মত জিজ্ঞাসা করে—এঁ্যা?

কালী সিং নরসিংকে শান্ত করে—যান যা ভাইয়া—যানে দো। আবার অনেক সময় বলতেও হয় না—রাম চমকে উঠে চুপ করতেই নরসিং চুপ করে খেলায় মজে যায়।

সোমবার ভোরেই আবার সপ্তাহের বাঁধা-কাজ শুরু হয়। রবিবারের কাচা ফরসা গেঞ্জি, হাত-কাটা খাকী হাফ-শার্ট পরে চোখে গগল-চশমা এঁটে গাড়ির চাবি খুলে সীটে বসে বলে—মার হাণ্ডেল!

নিতাই হাণ্ডেল ঘুরোয়। রাম ভালমানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়ির দরজা ধরে। গাড়ি যখন ছুটতে থাকে—তখন নিতাই বসে মাডগার্ডে; রাম থাকে ফুটবোর্ডে খাড়া। ছু-রকম হর্ন আছে গাড়িতে—রবারের বল দেওয়া হর্নটা বাজে ভোঁ ভোঁ শব্দে—আর একটা হর্ন বাজে অতর্কিত মানুষকে চমকে দিয়ে ক্যাঁ—এঁ্যা। ইলেকট্রিক হর্ন আর বাজে না।

আজ কিন্তু মোটরখানা তার বাঁধা-রুটে চলছে না। সদর শহর থেকে ইমামবাজার পর্যন্ত যে রাস্তা—সেই রাস্তাই হল ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের মেন মেটাল্ড রোড। ওটা চলে গেছে সিধে পূর্বদিকে—এ জেলা থেকে অন্ত জেলায়। পূর্ব-পশ্চিমে ও রাস্তাটা আটচল্লিশ মাইল লম্বা। বাইশ মাইলে ইমামবাজার, এই ইমামবাজার থেকেই এই শাখা রাস্তাটি বেরিয়েছে—চলে গিয়েছে রামনগর নদীর ঘাট পর্যন্ত—দূরত্ব বারো মাইল। এ রাস্তাতেও একখানা মোটর-বাস চলে। ওই ছোটলাইনের রেল-কোম্পানি এ জেলার মোটর ব্যবসায়ের হর্তাকর্তা 'বুধাবাবু'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এ মোটর-বাস-সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছে। এর জন্ত ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সঙ্গেও বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে রেল-কোম্পানি। তারা রাস্তা মেরামতের জন্ত মোরাম আর পেব্‌ল্‌স্ অর্থাৎ কাঁকর-মাটি আর ছুঁড়িপাথর দেয়। নগদ টাকাও কিছু দেয়। বিনিময়ে

এ রাস্তায় ওই একখানি বাস ছাড়া অন্য বাস বা মোটর নিয়মিত সার্ভিস খুলবার ছাড়পত্র পায় না। তবে কেউ পুরো মোটর ভাড়া করে গেলে মোটর যেতে পারে—পুরো বাস ভাড়া করলে সেও যায়। মধ্যে মধ্যে নরসিংও যায় বর্ধিষ্ণু লোকেদের নিয়ে; তাদের মধ্যে প্রধান হল সা-আলমপুরের মিঞা সাহেবেরা। কলকাতায় ছোট-লাটের দপ্তরে চাকরি করেন। একেবারে খাঁটি সাহেবী পোশাক। দরাজ দিল। তা ছাড়া আরও আছে। কিন্তু সে সব লোককে খাতির করে না নরসিং। বিয়ের ভাড়া নিয়েও যায় মধ্যে মধ্যে। বাসে যায় বরযাত্রী, 'কায়স্থে'র গৌরবে—নরসিংয়ের ট্যাক্সিতে যায় বর। কালে-কস্মিনে আনতে যায় ডাক্তার। জটাধারী ডাক্তার বিচক্ষণ চিকিৎসক। কিন্তু সে থাকে তার গ্রামে—নদীর ধারে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। দিনের বেলা হলে জটাধারী নিজের ঘোড়ায় আসে। রাত্রি হলে নরসিংয়ের ট্যাক্সি যায়। এ সব হল দাঁও।

আজ কিন্তু নরসিংয়ের ট্যাক্সি চলেছে খালি। খালি, অর্থে নরসিংহ, রাম এবং নিতাই ছাড়া আর লোক নাই গাড়িতে। খালি রাস্তা, হু হু করে চলেছে গাড়ি, এ্যাক্সিলারেটার চেপেই আছে পায়ে। পিছনে লাল ধুলোর আবর্তের মধ্যে পেট্রোলের ধোঁয়া নদীর গেরুয়া রঙের বন্যার জলের মধ্যে পাশের গ্রাম্য ঝরনার কালো জলের ধারার মত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দু-ধারে ধান-কাটা মাঠ। পথের পাশে বট-পাকুড়ের গাছ। মাঠের মধ্যে রাস্তা চলেছে সোজা। দু-তিন মাইল অন্তর এক-একখানা গ্রাম। গ্রামে ঢুকবার এবং বের হবার মুখে রাস্তা বিসর্পিল পাকে বাঁক নিতে বাধ্য হয়েছে। আকুলিয়া গ্রাম ফেলে এসেছে পিছনে। গ্রাম থেকে উত্তর-মুখে নির্গমন পথে ঘন তেঁতুল জঙ্গলে ঘেরা, পুকুরটাকে বেড় দিয়ে রাস্তার যে বাঁকটা—সেটা পার হয়েই সোজা চলেছে গাড়ি। চুপচাপ বসে আছে নিতাই। পিছনে খুব আরাম করে লক্ষপতির মত ঢঙে হেলে বসে রাম বিড়ি খাচ্ছে। নরসিং একটা আক্রোশের উপর যেন গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

আক্রোশই বটে!

বুধাবাবুর চোখ-রাঙানি, পুলিস-সায়েবের ড্যাম-সোয়াইন গালি-গালাজ, দারোগা-ইনস্পেক্টারের হুমকি সবই এতদিন সহ্য হয়েছে। রাত্রে বাড়ি ফিরে হিসেব করে থলি ঝেড়ে সিকি আধুলি টাকা নোট গুনবার সময় দিনের ওই সব গ্লানি সে ভুলে যেত। কিন্তু কিছুদিন থেকে রেল-কোম্পানি প্রথম সাত মাইলে উঠে পড়ে লেগেছে—নরসিংকে ঘায়েল করতে। সাত মাইলের মধ্যে ছখানা শাট্‌ল্ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। ওদিকে জংশন থেকে সদর পর্যন্ত বুধাবাবুর একচেটিয়া এলাকা। একেবারে ইমামবাজার থেকে সদর শহরের যাত্রী না পেলে জংশনে যাত্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। ইমামবাজারের লোকেরাও বেইমান। তারা এখন ওই শাট্‌ল্ ট্রেনের সুবিধা পেয়ে ওতেই ছুটেছে। বলে পয়সা দিয়ে কথাই বা শুনব কেন আর গরু-ছাগলের মত ঠাসাঠাসি করেই বা যাব কেন? এতেও সে চালিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। দমে নাই। কিন্তু হঠাৎ আজ চার দিন আগে এস-ডি-ও তাকে বললে—শূয়ার-কি বাচ্চা! শুধু তাই নয়। আচমকা পিঠের উপর বসিয়ে দিলে হাতের লিকলিকে বেতখানা।

একবার, দুবার, তিনবারের বার নরসিং খপ করে ধরে ফেলেছিল বেতখানা। বড় বড় চোখ দুটো ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল—ছত্রী রাজপুতের ছেলে সে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সন্-সন্ করে রক্ত চলতে আরম্ভ করেছিল, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল আগুনের মত। বেতখানা চেপে ধরে সে বলেছিলো—মারবেন না স্যার।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই।

সেদিন ইমামবাজারেই নরসিংয়ের ট্যাক্সি সদর পর্যন্ত পুরো ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। একটা মামলার সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে যাচ্ছিল বাদী। গাড়ির পুরো ভাড়ায় নরসিং নিয়েছিল আট জনের ভাড়া। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নেওয়ার বিধি পাঁচ জন। নরসিং সাধারণত সকালের ট্রিপে নেয় সাতজন। তার পাশে দুজন, পিছনের সীটে চারজন, তাদের পায়ের তলায় একজন। রাত্রের ট্রিপে তারও বেশী হয় অবশ্য। সদর শহরে ঢুকবার আগেই ভাড়া আদায় করে নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দেয়। বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সিও তাই করে। যাক সেকথা। আটজনের ভাড়া পেয়ে নরসিংয়ের গাড়ি ছাড়ার তাড়া ছিল না। বাদীরও সাক্ষীদের ডেকে একত্র করতে অল্প দেরি হয়েছিল। গাড়ি যখন জংশনে পৌঁছুল, তখন বুধাবাবুর বাস, ট্যাক্সি সবই প্রায় ছেড়ে গিয়েছে। মাত্র একখানা বাস তখনও দাঁড়িয়ে ছিল—প্যাসেঞ্জার জোটে, সেখানা ছাড়বে, না হলে এখানেই থেকে যাবে। নরসিং জংশনে না দাঁড়িয়েই সটান বেরিয়ে গেল। জংশনের বাজার থেকে বের হয়েই দু-ধারে অনুর্বর প্রান্তর—তার মধ্য দিয়ে সেই রোড, মেটাল্ড রোডের উপর সামনেই ধুলোর মেঘ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে; নরসিংয়ের কাছে এটা অসহ্য। প্রথমত—সকলের পিছনে যাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই তার মেজাজ বিগড়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ—ধুলো। দুটোই সে বরদাস্ত করতে পারে না। চৌদ্দপনেরোখানা, আকণ্ঠ-বোঝাই ঢাউস বাস সামনে—খান তিন-চার ট্যাক্সি আছে তার আগে। তার উপর ঠিক তার সামনে কয়েকখানা গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ি অবশ্য একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলে, রাস্তাটার মাঝখানটা পাকা, দু-ধার কাঁচা। একখানা গাড়ি কিন্তু মাঝখান দিয়ে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছোকরা, গরু দুটোরও বয়স কাঁচা, চেহারাও বেশ তাজা। ছোকরা গরু দুটোকে ছুটিয়ে চীৎকার করছিল—এই ছুটেছে আরবী ঘোড়া। পিছনের হর্ন শুনেও সে ত্রস্ত হল না—নিজেদের অর্থাৎ গরুর গাড়ির সারির সকলকে অতিক্রম করে আগে এসে তবে পাশ কাটিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

নরসিং পায়ের কাছ থেকে গোল কুণ্ডলী-পাকিয়ে-বাঁধা খানিকটা দড়ি তুলে নিয়ে গম্ভীর-ভাবেই বলল—নিতাই! বলেই সে দড়ির কুণ্ডলীটা রামের হাতে দিলে। রাম অভ্যাস মত ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল, নিতাই বসেছিল বাঁ-দিকের মাডগার্ডে। রাম দড়িটা এগিয়ে দিলে নিতাইয়ের হাতে। নিতাইকে কিন্তু কিছু বলতে হল না, চট করে দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে নিয়েই ঘোরাতে আরম্ভ করলে দড়িটা। গরুর গাড়িখানার কাছ ঘেঁষে নরসিংয়ের ট্যাক্সি পার হবার সময় গতি ঈষৎ মন্থর হয়ে গেল; নিতাইয়ের হাতের দড়িটা পাক খেতে খেতে ঠিক সময়টিতে সোজা আছাড় খেয়ে পড়ল ছোকরা-গাড়োয়ানটার পিঠে। ডগায় গিঁট-দেওয়া

মজবুত-পাকের সওয়া ইঞ্চি মোটা দড়ি; নিতাই প্রায় ছ-ফুট লম্বা জোয়ান; ছাতির মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি, তার হাতের জোরে ওই দড়িটা সপ্ শব্দ করে পড়ল পিঠে। গাড়োয়ান ছোকরা চীৎকার করে উঠল—বাপ। তার চেয়েও কিন্তু জোরে কঠিন আক্রোশভরা-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নরসিং—এ্যাও শূয়ার কি বাচ্চা!

বলতে বলতে ট্যাক্সি হু-হু করে বেরিয়ে গেল! এর পর সামনে বাস। পঞ্চাশ-ষাট গজ অন্তর চলেছে; ওরা রাস্তা ছেড়ে দেবে না। পাশের ধুলোভরা কাঁচা অংশটার উপর দিয়ে পাশ-কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে একবার ডান দিক একবার বাঁ দিক দেখে নিল সে। মাডগার্ডের উপর থেকে নিতাই বললে—রাইট সাইড।

হাড়ির ছেলে নিতাই অনেক ইংরিজি কথা শিখেছে। তা ছাড়া গাড়ি চালানোর ব্যাপারে নিতাইয়ের বিচার-বুদ্ধি খুব পাকা। স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে নরসিং ডান পাশের কাঁচা দিকটায় নিয়ে এল গাড়ি। টপ-গীয়ারে এনে চেপে ধরলে এ্যাক্সিলারেটার। ধুলোর রাশি ঠেলে উড়িয়ে গাড়ি বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে চলল। চারখানা বাস অতিক্রম করে কিন্তু আবার ফাঁকে মাঝখানে আসতে হল, রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে এবং উঁচু বাঁধের মত চলেছে। দু'পাশের ঊষর প্রান্তর, শেয়াকুলের গুল্ম-সঙ্কুল বিস্তীর্ণ পতিত জমি। বালিতে মাটিতে জমে পাথরের মত শক্ত, বর্ষার সময় ছাড়া ঘাস পর্যন্ত গজায় না। প্রায় মাইল দেড়েক চলে গিয়েছে এ প্রান্তর। উপায় নাই। নরসিং দু-বার সামনের বাসের পিছনে খুব কাছে গিয়ে হর্ন দিলে। কিন্তু বুধাবাবুর বাস-ড্রাইভার সে গ্রাহ্যও করলে না। ফুট কয়েক যদি বাঁয়ে সরে যায়, তবে অনায়াসে নরসিং পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে তারা দেবে না। উল্টে গাড়ির স্পীড কমিয়ে খানিকটা বেশী ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে যাত্রীদের বললে—চুপ করে বসবে সবাই, কোন ভয় নাই। নিতাই, রাম—হুঁশিয়ার! বলেই সে গাড়িখানার মুখ আরও ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে পাশের প্রান্তরমুখী ঢালের মুখে ছেড়ে দিলে। ফুটব্রেক হ্যাণ্ডব্রেক কষবার জন্ত উদ্যত থেকে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে। ঢেউয়ে-দোল-খাওয়া নৌকার মত দুলতে দুলতে গাড়িখানা নেমে পড়ল প্রান্তরে। তার পর আবার একবার সে গাড়িখানাকে ছাড়ল। যথাসম্ভব শেয়াকুলের গুল্মগুলোকে এড়িয়ে শক্ত সমতল প্রান্তরের উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে গাড়ি ছুটল।

নিতাই উৎসাহ আনন্দে বলে উঠল, বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা—কেয়াবাত। রাম বাঁ-দিকে রাস্তার উপর চলমান বাসগুলোকে অতিক্রম করতে করতে বলতে লাগল, চলো তুফান মেল!

নরসিংয়ের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিয়েছে। সমস্ত বাসগুলোকে পেরিয়ে সে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে বললে—শা (সা)—লা!

এর পর সামনে দুখানা 'কার'। একখানা—বুধাবাবুর, অন্তখানা হরেন সাহার। ট্যাক্সির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল নরসিং। সামনে এখন প্রায় সিকি মাইল পতিত ডাঙা রয়েছে।

সিকি মাইল অতিক্রম করতে হল না, খানিকটা যেতেই সে গাড়ি খানাও পিছনে পড়ল। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা সড়কের চেয়ে সমতল প্রান্তরে গাড়ি অনেক বেশী অনায়াস গতিতে চলতে পারছে।

নিতাই বললে, এমনি রাস্তা হয় শালা!

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে, ভগবানের তৈরী আর মানুষের তৈরী বুঝলি! তফাত অনেক। বলতে বলতে সে ফের টপ-গীয়ার দিয়ে গাড়িখানার মুখ রাস্তার বাঁধের দিকে ঘুরিয়ে দিলে। সুকৌশলে সে তুলে নিলে গাড়িখানাকে রাস্তার উপর। তার পর চলতে লাগল আমিরী চালে। অর্থাৎ পিছনের গাড়ির উদ্দেশে ধুলো উড়াতে আরম্ভ করলে। পিছনের গাড়িখানা বার বার হর্ন দিলে। উত্তরে নরসিং ধোঁয়ার রাশি ছাড়লে।

হঠাৎ নিতাই ত্রস্ত হয়ে উঠল।—এই, এই সিংজী! সিংজী!

সামনের দিকে নিস্পৃহ অলস দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নরসিং—কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করেই সে বললে—কি?

রামও এই সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল, দাদাবাবু! দাদাবাবু!

—কি রে? নরসিং একটু রুষ্ট না হয়ে পারলে না।

—এস-ডি-ও সায়েব!

—কে? চমকে উঠল নরসিং।

—এস-ডি-ও সায়েব! পেছুকার গাড়িতে!

গাড়ির পাশে মুখ বাড়িয়ে চকিতের মত পিছনের গাড়িটা দেখে নিলে নরসিং। এস-ডি-ও'র তকমা-পাগড়ি-আঁটা চাপরাসী গাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে গম্ভীর আওয়াজে হাঁকছে, এই! এই! এই! খাড়া করো গাড়ি! এই—

গাড়িতে ভিতরে সাহেবী-পোশাক-পরা কেউ বসে আছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়েছে। এবার চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং। এবং যা করলে সেও ভেবেচিন্তে করলে না, করব বলেও করলে না। গাড়ি তার রোখাই উচিত ছিল, কিন্তু সে করলে তার বিপরীত। পূর্ণবেগে গাড়ি চালিয়ে দিলে। গাড়ির স্পীডোমিটার খারাপ হয়ে গিয়ে কাঁটাটা সরে না, গাড়ির গতির বেগে কাঁটাটা শুধু ঠক ঠক করে নড়তে লাগল। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল বেগে চলছিল গাড়িখানা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পিছনের গাড়িখানাও মোটরকার। তার উপর গাড়িখানা নরসিংয়ের গাড়ির তুলনায় নতুন। নরসিংয়ের অবশ্য দুর্দান্ত সাহস, যন্ত্রপাতির উপর তেমনি আয়ত্তশক্তি, তার উপর তাগিদটা ভয়ে পালাবার। সে আগেই এসে ঢুকল শহরে। শহরের মুখে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ছোট পথে। তবুও নরসিং ধরা পড়ল শহর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে। দুপুর বেলায় বে-টাইমে সে খালি গাড়ি নিয়েই যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিস। ধরা পড়ল।

তার পরই ওই কাণ্ড।

নরসিং বেত ধরতেই এস-ডি-ও বেত আর চালালেন না। ওভার-লোডের জন্য বিপজ্জনক

গতিতে গাড়ি হাঁকাবার অপরাধে অ্যারেস্ট করলেন। অবশ্য জামিন সঙ্গে সঙ্গেই হল। মামলাতেও হল অল্প জরিমানা। কিন্তু হাতের সাধ মিটিয়ে না মারতে পেয়ে ক্ষোভে নরসিংকে মারলেন ভাতে। নানা অজুহাতে তার ট্যাক্সির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হল। ইচ্ছে ছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সখানাও বাতিল করার, কিন্তু সে হয় নি। মোটর-অভিজ্ঞ বড় সাহেব-ইঞ্জিনীয়ারের মুক্ত-কলমে-লেখা প্রশংসাপত্র ছিল নরসিংয়ের।

তাই নরসিং চলেছে—ইমামবাজার সদর সার্ভিস লাইনের রাস্তা ছেড়ে এই ইমামবাজার-রামনগর ঘাটের পথে। এ পথেও সার্ভিসের লাইসেন্স মিলবে না।

বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল কোম্পানির মনোপলি সার্ভিস—এটা একচেটিয়া অধিকার।

নরসিং সে উদ্দেশ্যেও চলছে না। তার উদ্দেশ্য সে বলেও নাই। নিতাই এবং আর কেও বলে নাই। বলেছে—বাড়ি যাচ্ছি।

রামনগরের ঘাট পেরিয়ে ওপারে মাঠান—অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্র-প্রধান অঞ্চলে তার বাড়ি। ধুলো-ভরা মাঠের পথ। গরু চলে, মানুষ চলে—গরুর গাড়ি চলে।

হঠাৎ নিতাই বললে—আস্তে সিংজী, আস্তে।

—আস্তে?

সোনাডাঙার বাঁকে ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি বোধ হয়।

—হুঁ। নরসিং গাড়িখানাকে ছুটাতে চাইছিল নিজের মনের গতির সঙ্গে সমান বেগে। নরসিং গাড়ির বেগ সংযত করলে। গাড়িই বটে।

সোনাডাঙার বাঁক ঘুরে গাড়ি আবার পড়ল উন্মুক্ত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে। সামনে তিন মাইল দূরে অভয়াপুর—ডান দিকে চার-পাঁচ মাইল পূবে ভাসতোর, পুনাশী, কামারপাড়া; বাঁয়ে পাঁচ মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামবনরেখা। গাড়ি ছুটছে। পাশের গ্রামের গাছপালা প্রায় স্থিরই আছে, মধ্যবর্তী ফসল-কাটা ধূসর মাঠখানা যেন বৃত্তাকারে ঘুরছে। সামনের গ্রাম অভয়াপুর এগিয়ে আসছে। নদীর এপারে অভয়াপুর, ওপারে রামনগর।

গাড়ি চড়াইয়ে উঠেছিল। এবার ঢাল আরম্ভ হল। বোঝা যায় না ঠিক, মনে হয় সমতল মাঠ। কিন্তু নরসিং জানে এবং গাড়ির চাকার টানে বুঝতে পারছে। ক্ষেতও ক্রমশ শ্যামল হয়ে আসছে। সামনে দেখা যাচ্ছে রবিশস্য-ভরা মাঠ। কলাই, গম, সরষে। তিলের জমিগুলি গাঢ় সবুজ। তরকারির গাছ সব লতাতে শুরু করেছে। দু-চারটে জমিতে বাড়ন্ত লতার ফুল ফুটেছে। এই হল নদীর মাঠ। ভারী জোরালো মাটি। বীজ পড়লে এড়ায় না অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না এ মাটিতে। তবুও বন্যা কখনও এতটা ওঠে না।

অভয়াপুরের ভিতর রাস্তা অতি সংকীর্ণ। বাঁকগুলোও তেমনি বিচিত্র এবং আকস্মিক। এই গ্রামেই বুধাবাবু এ্যাণ্ড রেল-কোম্পানির বাসের এ-প্রান্তের আড্ডা। ইউ পি স্কুলঘরের সামনের খোলা জায়গায় বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর পরেই একটা 'ত'-কারের মত বাঁক। বাঁক ঘুরে ত্রিশ গজ গিয়ে আবার একটা এমনি বাঁক। তার পরই নদীর ঢাল। কাঁচা পথ। এখানে পাকা করলেও টেকে না। নদী ধুয়ে নিয়ে যায়। মাটি চাপিয়ে দিয়ে যায়। নরম

ধুলো-ভরা পথ। প্রায় দু-ফুট ধুলো জমে আছে; তুলোর চেয়েও নরম। নরসিং ছেড়ে দিল গাড়িকে। ইঞ্জিন বন্ধ। ঢালের মুখে নেমে চলেছে গাড়ি। দু-পাশে ঘন শরবন এবং নানা আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হল। গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে নদী। হাঁটুর চেয়েও কম জল। বিস্তীর্ণ বালুকাময় গর্ভ চিক্ চিক্ করছে। ওপারে দেখা যাচ্ছে—প্রকাণ্ড বড় পরিত্যক্ত সিল্ক-ফ্যাক্টরী। নদীর ওপার পাকা, বাঁধানো। বাঁধিয়েছিল সেকালে কুঠিয়ালেরা। রামনগরের ওপারে সংঘোড়া-চন্দ্রহাট, তারপরই পড়ল দোসরা জেলা। জেলা মুর্শিদাবাদ। এই জেলাতেই নরসিংয়ের ঘর।

—হাঁ—হাঁ সিংজী! নিতাই সতর্ক করে দিলে।

গাড়ি ঢালের মুখে জোরে নামছে। সামনেই নদীগর্ভ। নদীর ঘাট না দেখে নামা উচিত নয়।

ফুটব্রেকে চাপ দিতে দিতে হ্যাণ্ডব্রেকে শুধু হাত দিয়ে নরসিং ঈষৎ হাসলে। গ্রামের কথায় তার ভাবীকালের কল্পনা মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

গাড়ি থেমে এল।

নরসিং বললে, গাড়ি থেকে ইট দুখানা বার করে সামনের চাকায় লাগিয়ে দে। সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

জিলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম 'গিরবরজা'। ছয়ার গ্রাম। নরসিং চলেছে—ওই গ্রামের মুখে।

দুই

জেলা মুর্শিদাবাদের এই অংশটা নরম কালো মাটির দেশ। কাঁকর নাই, পাথর নাই; বালি যা আছে, তাও অত্যন্ত মিহি আর ঝিক-মিক্ করে গুঁড়ো রূপোর মত; চোখ জুড়ানো কালো মেয়ের অঙ্গ-লাবণ্যের মত মিশে আছে মাটির সর্বাঙ্গে। জল পড়বামাত্র ওই বালির গুণে মাটি এলিয়ে পড়ে ঘষা-চন্দনের মত। আবার ওই বালির গুণেই বাতাসের স্পর্শ এবং রোদের উত্তাপ সিক্ত-মাটির কাদাভাব অত্যন্ত সত্বর কাটিয়ে মাটিকে সরস ঝুর-ঝুরে করে তোলে। ওই মাটির সমতল মাঠ। বর্ষার সময় জলে একবার ভরলে আর জল মরতে চায় না। গঙ্গার ধারে খাল-বিল তখন ভরে ওঠে, সেই সব জলভরা বিলের চাপে মাঠের জল মরে না। বন্যাও হয় না অথচ জলও মরে না। মাটিতে অফুরন্ত উর্বরতা, কাজেই ধান এখানে অমর। সরকারী সায়েবসুবোরা মাঝে মাঝে আসে। তারা বলে, এতেও যখন তোমাদের লক্ষ্মী নাই, তখন আর তোমাদের হবে না। এমন ধান-ফলানো মাটি বাংলাদেশে আর নাই, বাখরগঞ্জ আর বর্ধমানের খানিকটা জায়গা ছাড়া। বাখরগঞ্জ কোথায় সে কথা এখানকার চাষী-ভুঁইতে জানে না, খোঁজ করার মত কৌতূহলও তাদের হয় না। তবে বর্ধমান তাদের পাশেই। এই গঙ্গার ধারের এলাকার নীচের দিকটাই খানিকটা বর্ধমানের মধ্যে পড়েছে। সাহেব-সুবোর কথা মিথ্যে নয়, সায়েবরা কি মিথ্যে কথা বলে! খাঁটি সত্য কথা। প্রচুর ধান হয়।

হাতি-ঠেলা ধান অর্থাৎ গরু-মহিষে গাড়ি ঠেলে এত ধান তুলতে পারে না, হাতি হলে তবে ঠিক হয়ঃ শুধু কি ধান? কলাই, গম, সরষে, মসনে, তিসি, আলু, পেঁয়াজ, আখ—কোন্ ফসলটাই বা না হয়! কিন্তু তবু যে কেন তাদের লক্ষ্মী নাই, সে কথাটা তারা জানে না। সায়েবরা বলে, তোরা হচ্ছিস কুঁড়ের সর্দার। সায়েবদের এই কথাটি লোকে মানে না। তারা দেহের এক পিঠ মাটিকে, অন্য পিঠ মেঘ আর রোদকে দিয়ে খাটে। লক্ষ্মী ওদের ঘরের মেয়ের মত; জন্মান, দিনে-দিনে বাড়েন, কচি মুখের হাসিতে আলো করে রাখেন দেশটা, তারপর যেই তাঁর ঘরকন্নার কাজে লাগাবার বয়স হয় অমনি চলে যান বিবাহিতা মেয়ের মত। কন্যার মতই ঘরে তাঁর অচলা হয়ে বাস করবার অধিকার নাই। লক্ষ্মী-কলানো দেশের মধ্যে লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়া গ্রাম সব। ছত্রীর গ্রাম 'গিরবরজা'ও লক্ষ্মীহীন ছন্নছাড়ার গ্রাম।

'গিরবরজা' বলে মুখে, লিখবার সময় লেখে কিন্তু 'গিরিব্রজ'। গ্রামের জমিদারের সেরেস্তার কাগজে সেই কোন্ আমল থেকে লেখা হয়ে আসছে। নবাবী আমলের ফরাসী 'খাকবন্দী'তে চিঠাতেও লেখা আছে গিরিব্রজ। ছত্রীরা বলে, পরশুরাম যখন নিঃক্ষত্রিয় করতে লাগল, সেই সময় গিরিব্রজ রাজ্যের এক অল্পবয়সী ক্ষত্রিয় মনসবদার রাজার অনাথা কন্যাকে নিয়ে রাজা ছেড়ে 'পক্ষী'র দেশ এই বাঙাল মুলুকে এসে এইখানে বাস করেন। 'ক্ষত্রিয়' এই পরিচয় ছড়িয়ে পড়লে কোনদিন সে কথা অমর পরশুরামের কানে পৌঁছুতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পরিচয় দেন—জাতিতে তিনি 'ছত্রী'। এই সব বিবরণ লেখা দুটো তামার পাত আছে। ফারসীতে লেখা। একটা হল, যখন মনসবদার রাজকন্যাকে নিয়ে এখানে পালিয়ে আসেন, সেই পুরনো আমলের। অন্যখানা হল মহারাজ মানসিংহের দেওয়া; মহারাজ মানসিংহ নাকি খাতির করে গোটা গ্রামখানাকেই তাদের মৌরসী বন্দোবস্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই বন্দোবস্তের বলে আজ গোটা গিরবরজা মৌজাটাই মোকররী মৌরসী হয়ে রয়েছে। নবাবেরা সে মৌরসী বন্দোবস্ত কাটতে পারে নাই—ইংরেজ সরকারও না। এই তামার পাতটায় মহারাজ মানসিংহ সীলমোহর দস্তখত দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তাদের ঘরে পুরনো তলোয়ার, সড়কি, খাঁটি গণ্ডারের চামড়ার ঢাল আছে। কত বার পুলিস এসে তাদের ঘর-তল্লাশির সময় কতক-কতক নিয়েও গিয়েছে, তবুও কতক এখনও আছে কাঠের মাচানের মধ্যে, অন্ধকূপের মত গুপ্ত চোর-কুঠুরিতে; মজা পুকুরের মাটি কাটাতে গিয়েও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। গাদা-বন্দুকও ছিল। সেগুলো লুকানো আছে, কিন্তু তার একটাও গোটা নেই। ভাঙা-ভাঙা টুকরো এখানে-ওখানে পড়ে আছে। ছেলেবেলায় একটা নল নিয়ে নরসিং খেলা করেছে।

সেটেলমেণ্টের সময় এসেছিল এক কানুনগো। অনেক দিন আগে। নরসিং তখন ছেলেমানুষ। সে কানুনগো ওই তামার পাতখানার ফটোগ্রাফ তুলে নিয়েছিল। মুরুব্বী ছত্রীদের কাছে পুরনো আমলের গল্প শুনত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। তারপর কানুনগো লিখেছিল একখানা কেতাব। সেই বইয়ের একখানা কানুনগো পাঠিয়ে দিয়েছিল গিরবরজার ছত্রীদের নামে। সে এক তাজ্জব কাহিনী বানিয়েছে। সে কাহিনী পড়ে গিরবরজার মুরুব্বীদের

কি রাগ। কেতাবখানা আগুনে দিতে হুকুম হয়েছিল। নরসিং ছিল কাছে দাঁড়িয়ে—তাকেই হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ছেলেমানুষ নরসিং তখন পাঠশালায় পড়ত, কেতাব কাগজের উপর তখন তার ভারী ঝোঁক। বইখানাকে আগুনে না দিয়ে সে সেখানা নিজের দপ্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে বয়সে নরসিং বইখানা পড়ে সব বুঝতে পারে নাই; পরে বড় হয়ে সে কাহিনী নরসিং কয়েক বার পড়েছে। মধ্যে মধ্যে কয়েক জায়গা এখনও তার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। হিজরী-শকাব্দর কচকচি, তামার পাতের মাপ ইঞ্চি ফুট, ফারসী লেখার ছবি—এমনি সব ব্যাপার আছে। এগুলো বাদ দিয়ে বাকিটা তার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চন্ চন্ করে ওঠে। কানুনগোর উপরে রাগও হয়। সে লিখেছে—

"মুসলমানেরা যখন প্রথম আসে বাংলাদেশে—পাঠান রাজত্বে—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ অনেক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মুসলমান-পুরুষেরা হিন্দুর কন্যা বিবাহ করতেন, অনেক স্থলে জোর করে কন্যা হরণ করে আনতেন, অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-রাজারা কন্যা দান করতেন—এ সব প্রমাণ ইতিহাসে আছে। হিন্দু-পুরুষেরা অনেক স্থলে মুসলমান-কন্যা বিবাহ করতেন—এ প্রমাণও আছে। রাজা যদু, কালাপাহাড়ের কাহিনী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এ সব ক্ষেত্রে হিন্দু-পুরুষ সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এক সময় হিন্দু-পুরুষেরা মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেও হিন্দু সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হতেন না, তাঁরা হিন্দুই থাকতেন—এর প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সমাজ মুসলমান-সংস্রবকে এমন কঠোরভাবে বর্জন করার নীতি প্রথম প্রথম গ্রহণ করেন নাই। সে সময় অনেক অভিজাত মুসলমান পুত্র-কন্যার সঙ্গে তদানীন্তন অভিজাত হিন্দু পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মুসলমান-কন্যা হিন্দুর ঘরে বধূ হিসাবে এসে হিন্দু-বধূরূপেই পরিগণিত হয়েছেন, যেমন হিন্দু কন্যা মুসলমান স্বামীর ঘরে গিয়ে মুসলমান-বধূ হিসাবে গৃহীত হয়েছেন বা হয়ে থাকেন। গিরবরজার রায়-বংশকে প্রদত্ত পাঠান আমলের তামার পাতের সনন্দ এর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। গিরিধারী সিংহকে সনন্দ দিয়েছেন এক পাঠান করদ নবাব বা জায়গীরদার মহম্মদ খলিল উল্লা খাঁ। 'দস্যুবৃত্তিধারী বর্বর শত্রু আব্দুল্লা খাঁর আক্রমণে মনসবদার গিরিধারী সিংহ তুমি যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমার উপর সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে যখন প্রধান-সেনাপতি হত, তখন গিরিধারী সৈন্য পরিচালনা করিয়া অধিকৃত-প্রায় দুর্গ হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করিয়াছ; এবং পলায়িত শত্রুদলকে অনুসরণ করিয়া আব্দুল্লা খাঁকে নিহত করিয়াছ; তাহার দুর্গ দখল করিয়াছ; এই জন্য তোমাকে আমি বর্ক-আন্দাজ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় দ্রুতগামী বীর, এই খেতাব দান করিলাম। এবং রায় অর্থাৎ রাজা এই খেতাবও দান করিলাম। তুমি আব্দুল্লা খাঁর যে কন্যাকে বন্দিনী করিয়াছ, তাহাকে আমার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছ, সে কসুর আমি মাফ করিতেছি। তোমাকে অভয় দিয়া এই সনন্দ পাঠাইলাম, তোমার লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। দরবারে হাজির হইয়া তুমি তোমার খেলাত গ্রহণ করিবে।' ফলকের অপর পৃষ্ঠে খোদিত আছে—'মনসবদার বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী

সিংহ রায় এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার বিবাহে গিরিধারী রায়ের নব-নির্মিত বাসভবনের চতুর্দিকে এক মৌজা জমি জায়গীর প্রদত্ত হইল। দরবারে এই মৌজার কর বার্ষিক পঞ্চ তঙ্কা হিসাবে ধার্য রহিল।' কানুনগো লিখেন—"পরশুরামের ভয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবাদের সঙ্গে এই আবদুল্লা খাঁর কন্যা দৌলতোন্নেসাকে নিয়ে গিরিধারী সিংহের আত্মগোপন করে থাকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। গিরিধারীর 'গিরি' এবং দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালার 'ব্রজ' থেকেই গ্রামের গিরিব্রজ নামের উৎপত্তি। গ্রামের পত্তনও এই লুক্কায়িত থাকার কাল থেকে"।

নরসিংয়ের খুব ভাল লাগে এই কাহিনী। খানিকটা খুঁত খুঁত করে—অবশ্য, ওই দৌলতোন্নেসা ওরফে ব্রজবালা-সংবাদে; কিন্তু সে যখন কল্পনা করে দৌলতোন্নেসার কথা, তখন ওই স্বল্প তিক্ততাটুকুও আর থাকে না। সদর শহরের জজসাহেবের কথা তার মনে পড়ে। জজবাহাদুর মেমসাহেব বিয়ে করেছেন। শাড়ি পরে মেমসাহেব জজসাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। পরিষ্কার বাংলা কথা বলে। ভাল ভাল উকিলদের সে গল্প করতে শুনেছে। মেমসাহেব পাউরুটি-মাংস খায় না, ভাত-ডাল-মাছ খায়। জজসাহেবের দুটি ছেলেমেয়েকে দেখেছে—ঠিক বাঙালীর ছেলেমেয়ের মত ধারা-ধরন। ছেলের পৈতেও হবে, নরসিং শুনেছে। নরসিং একথাও জানে যে জজসাহেব মেম বিয়ে করেছে বলে লোকে তাকে ঘৃণা করে না, হিংসা করে। পূর্বপুরুষ বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের কথা কল্পনা করতে তার মনে হয় —সেকালের লোকও তাকে এই জজসাহেবের মত হিংসা করত দৌলতোন্নেসার স্বামী হিসাবে। বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায় সম্বন্ধে সে যখন কল্পনা করে, তখন তার মনে হয়, তার চেহারা আর গিরিধারী রায়ের চেহারা ঠিক এক রকমই ছিল। সে নিজে মাথায় প্রায় সাড়ে ছ-ফুটের উপর। এর উপর সে যদি দামী পাথর, মুক্তো, পালক বসিয়ে রেশমী মুরেঠা বাঁধে, গায়ে পরে ইহা-লম্বা শেরওয়ানী—কাপড়ের বদলে সে যদি পরে চুস্ত পায়জামা, কোমরে ঝুলিয়ে দেয় বাঁকা তলোয়ার, আর যদি পিছিয়ে যায় সেই আমলে, তবে তার গিরিধারী সিংহ-রায় হতে বাধা কি?

গভীর রাত্রে মশালের আলো জ্বালিয়ে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হাতে রক্ত-মাখা নাঙ্গা তরোয়াল নিয়ে চলেছে সে। ঘোড়া ছুটেছে ঘাড় বাঁকিয়ে ছার্তকের চালে ঝড়ের মত। পিছনে তার হাজার সওয়ার। মাঠের মাটি ধুলো হয়ে আকাশে উঠছে, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। সামনে কয়েক রশি দূরে প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তার মালিক নবাব খলিলুল্লা খাঁ বাহাদুরের দুশমন আবদুল্লা খাঁ এবং তার লোকজন। ওরা নিজেদের এলাকায় পৌঁছে কেল্লার মধ্যে ঢুকে ফটক বন্ধ করবার আগেই তাদের ধরতে হবে। তার কালো ঘোড়া ছুটে চলে—পাশের গাছপালা পিছনের দিকে চলে—মাঠ ঘোরে চক্রাকারে, চলন্ত মোটরের পাশের গাছ ও মাঠের মত। নরসিংয়ের শরীরের ভিতরে একবার রক্ত যেন টগ্-বগ্ করে ফুটতে থাকে। কল্পনায় নরসিং ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাতক শত্রুর উপর। চীৎকার, হাজার সওয়ারের উল্লাস! মুণ্ড খসে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে, রক্তে মাটি ভেসে যায়, তরোয়াল সোজা তুলে

ধরে বলে—খবরদার। মেয়েদের ইজ্জৎ সবার আগে! খবরদার!

"ভাঙো অন্দর-মহলের দরজা। ভাঙো তোষাখানার কপাট।" সব ভেঙে পড়ে। হাজার সওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গিরিধারীরূপী নরসিং নাঙ্গা তলোয়ার তোলে।

সে নিজে গিয়ে প্রবেশ করে অন্দর-মহলে। ত্রস্ত পলায়নপর দাসী-বাঁদীর দল শুধু। সে বলে—ভয় নাই।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে—অপূর্ব-সুন্দরী কিশোরী মেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে ধুলোর উপর। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারে শাপলা ফুলের বনের মধ্যে 'শতদল' অর্থাৎ পদ্মকলি এটি।

—সে বসে যায় শিয়রে, মুরেঠা খুলে হাওয়া করে, হাঁকে, জল—জল—পানি। জলদি। কিশোরী চোখ খুলে চায়। সকরুণ সে দৃষ্টি। গিরিধারীরূপী নরসিং বলে, কোন ভয় নাই আপনার। তারপর সে হুকুম করে, ডুলি ডুলি! জলদি ডুলি নিয়ে আয়! জলদি!

ধন-রত্ন সঙ্গে দিয়ে হাজার সওয়ারদের অধিকাংশকে পাঠিয়ে দিল আগে নবাব খলিলুল্লার দরবারে। কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে দোলায় দৌলতোন্নেসাকে চাপিয়ে সে শেষে রওনা হয়ে পালিয়ে এল এইখানে। গঙ্গার ধারের ঘন-জঙ্গলে-ভরা স্থান। বাঘ-সাপে-ভরা জঙ্গল।

কল্পনা নরসিংয়ের যতই রঙীন হোক, তাতে রঙের প্রাচুর্য যতই থাক, বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক গবেষণার গঙ্গাজলে তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রঙের আধিক্য মুছে দিয়েও মোটামুটি রেখা-বিন্যাস একই থাকে।

গিরিধারী সিং দৌলতোন্নেসা এবং লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে—গঙ্গা পার হয়ে এপারে এসে—এই উর্বর ভূমিখণ্ডে গিরিব্রজ গ্রামের পত্তন করেছিল। ঘর-দুয়ার তৈয়ারি হল, পাঁচিলের ঘেরের পর পাঁচিলের ঘের, তার মধ্যে এক-এক চত্বরে বড়-বড় মজবুত ফটক। মোটা কাঠের দরজার উপর ঘন-ঘন লোহার শুল বসানো হল, যেন কুড়ুলের ঘা বসাতে না পারে। ফটকের মাথায় লোক দাঁড়াবার মত জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে বর্শা চালিয়ে যেন আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধব বিশ্বস্ত লোকেদের বাড়ি তৈরি হল আশেপাশে। রাস্তা তৈরি হল—আজকালকার তুলনায় অপ্রশস্ত রাস্তা। মানুষ চলবে, মানুষের কাঁধে পাল্কি-ডুলি চলবে, ঘোড়া চলবে, গরু চলবে, আর চলবে বয়েল গাড়ি। এর জন্য আর বেশী চওড়া রাস্তার দরকার কি? গ্রামের প্রান্তে এসে বাস করলে শ্রমজীবী নানা জাতি। বাগ্দী, বাউড়ী, মাল, ডোম, হাড়ী, মুচি। তারা ছত্রীদের বাড়িতে কাজ করত, ঘোড়ার পরিচর্যা করত, পাল্কি বহন করত। প্রয়োজন হলে ছত্রীদের পিছনে লাঠি-সড়কি নিয়ে বের হত।

গিরিধারী শুধু সিংহ-রায়—বাকি যারা ছত্রী, তারা শুধু সিংহ। সিংহরায়দের ঘিরে সিংহ ছত্রীরা বসে ঘিউ-রোটি খেত, শরীরের তদ্বির করত, বাব্‌রি চুলের যত্ন করত, গোঁফ পাকাতো, দাড়িতে গালপাট্টা বানাত। গঙ্গার ধারের বন থেকে তখন প্রায়ই বাঘ ছিটকে আসত, তারা দল বেঁধে হৈ-হৈ করে বাঘ মারতে বার হত। বাঘ আসতে দেরি হলে, তারা নিজেরাই যেত

গঙ্গার ধারের ঘন জঙ্গলে বাঘের সন্ধানে। সে এক সমারোহের বাঘ-শিকার। বাঘ না পেলে বুনো শূয়ার মারত; খরগোস শিকার ছিল প্রায় নিত্য-কর্ম; পাখি শিকারও করত; কিন্তু তার জন্ত সিংহ-রায় এবং সিংহরা নিজেদের হাতিয়ার ধরত না। তার জন্ত ছিল তাদের পোষা শিক্ষিত, ছোট জাতের বাজপাখি; এ দেশে এ জাতের বাজপাখির নামই হল 'শিকরে'। নরসিং 'শিকরে' পাখি দেখেছে, 'শিকরে'র শিকারও দেখেছে। ছত্রীদের মধ্যে বা সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে আজকাল 'শিকরে' পোষার রেওয়াজ উঠে গিয়েছে বটে; কিন্তু মুসলমান ফকিরদের এক শ্রেণী এখনও 'শিকরে' পোষে। পায়ে শিকল বাঁধা 'শিকরে' চামড়ার দস্তানা পরা হাতের উপর বসিয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা। সে আমলে ছত্রীদের প্রতিজনে 'শিকরে' পুষত। শিকার, পাশা, দাবা, কুস্তি, সড়কি, তলোয়ার খেলে, তলোয়ারে-সড়কিতে শান দিয়ে যে সময় থাকত, সে সময়টা কম নয়, তখন তারা গোঁফে তা দিত আর গল্প-গুজব করত। মধ্যে মধ্যে বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাত—গল্পের নেকড়ে যেমনভাবে ঝগড়া বাধিয়েছিল মেষশাবকের সঙ্গে—ঠিক তেমনভাবে। তার পর বাধত দাঙ্গা। চাষীদের ঘর চড়াও করে, পুরুষদের মেরে-কেটে সোনা, রুপা, টাকা, বাসন লুঠে নিয়ে আসত। তার সঙ্গে আনত তাদের যুবতী কিশোরী মেয়েদের। ধান, চাল, যব, গমের গোলা ভেঙে লুঠ করে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসত। ফসল উঠবার সময় আশেপাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফসল কেটে নেওয়ার রেওয়াজও ছিল। শুধু কৃষিজীবী নয়, আশপাশের জমিদারেরাও সন্ত্রস্ত থাকত ছত্রীদের ভয়ে নিয়ত। তাদের বাড়িতে লুঠ-তরাজ করতে ছত্রীদের দ্বিধা ছিল না, ভয়ও ছিল না।

তাদের এই বৃত্তির আভাস আছে ওই দ্বিতীয় তামার পাতে। কানুনগো লিখেছে—এখানা মহারাজ মানসিংহের দেওয়া সনন্দ নয়, এখানা দিয়েছিলেন মহারাজ তোডরমল। ছত্রী মুরুব্বীদের এও একটা আপত্তির কারণ। তারা চিরকাল জেনে এসেছে এখানা দিয়ে গেছেন মহাবীর মানসিংহ—অম্বর-স্থানের রাজা। মানসিংহের সনন্দে আর মহারাজ তোডরমলের সনন্দে!

কানুনগো সনদখানির একখানা ছবি ছেপে লিখেছে—এই সনন্দে মহারাজ তোডরমল লিখেছেন—"পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে গিরিব্রজে সিংহ-রায়রা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, সেই হেতু তাহাদের সম্পত্তি বাহাল রাখা হইল। অন্তথায় এই অঞ্চলে তাহারা দস্যুতার অত্যাচারে যে সমস্ত অপরাধ দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উপর শাস্তি-বিধান করাই উচিত। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্ত তাহাদের পূর্ব-দস্যুতার অপরাধ মার্জনা করা হইল। এবং ভবিষ্যতে সদ্ভাবে জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গিরিব্রজ মৌজার সমগ্র পতিত ভূমি হাসিলের জন্ত বাদশাহ-সরকার হইতে হাজার তঙ্কা সাহায্য দেওয়া হইল। স্থানীয় তহসিলদার এই পতিত হাসিলের নিয়মিত তদ্বির করিবেন। এবং সিংহ-রায়েরা স্থানীয় ফৌজদার ও বাঙলার সুবাদারের নিকট ভবিষ্যতে সদ্ভাবে থাকিবার জন্ত দায়ী রহিল। সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া গিরিব্রজ মৌজার উপর নূতন কায়েম মৌরসী স্বত্ব সিংহ-রায় ও সিংহদের মঞ্জুর করিয়া বার্ষিক কর পাঁচ তঙ্কার পরিবর্তে পঞ্চাশ তঙ্কা ধার্য করা হইল।"

নরসিংয়ের মনে হয়, এটা নেহাতই অসম্ভব কথা। মনে মনে কল্পনাও করা যায় না। এও কি কখনও হয়?

এই চোখ-জুড়ানো মোলায়েম উর্বর মাটির এই সুসমতল সুন্দর শোভন বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ, এও কোনদিন জঙ্গলে-ভরা, ঘাসে আগাছায় কদর্য পতিত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কানুনগো-বাবুটির উপর তার অনেক শ্রদ্ধা। ওই দুর্বোধ্য ফারসী লেখা সে দেখবামাত্র পড়েছে—সে নিজে যেমন বাঙলা চিঠি পড়ে, তেমনি সহজে পড়েছে। কাগজে ছাপার অক্ষরে ছেপেছে। তা ছাড়া ইদানীং নরসিং নানা ধরনের বইয়ের সঙ্গে দু-চারখানা ইতিহাসও পড়েছে। ইতিহাসের মত অদ্ভুত আর কিছু নাই। সে পড়েছে যে ইংরেজ সায়েবরা আজকাল মোটর তৈরি করে, এরোপ্লেন তৈরী করে, কলে যারা সূচ তৈরি করে, ঘড়ি তৈরি করে, তারা নাকি পাঁচশ-সাতশ বৎসর আগে জানোয়ারের ছাল পরে বেড়াত, কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। এত দূরে যেতে হবে কেন, সে চোখে দেখেছে—বামরু মাঝি—সাঁওতালের ছেলে, পাদ্রীদের ইস্কুলে পড়ে কোট-পেন্টালুন পরে হাকিম হয়েছে। এও হয়তো তেমনি একটা তাজ্জব ব্যাপার।

নরসিং কল্পনা করতে চেষ্টা করে। গিবুবরজার চারিপাশের মাঠ গঙ্গার ধারের জমির মত জঙ্গলে ভরা, ছোট বড় গাছের তলায় কাঁটা ঝোপ—অন্তহীন জট-পাকানো দড়ির জালের মত লতার জাল মাটিতে, মাটি দেখা যায় না—শুধু ঝরাপাতার রাশি—গ্রীষ্মকালে পা দিলে খর্ খর্ করে, বর্ষায় পা দিলে জ্যাব্ জ্যাব্ করে—তলা থেকে কষের মত জল ওঠে; ভন্-ভন্ করে মাছি-মশা। সেই সমস্ত কেটে ফেলতে দলে দলে লোক লেগেছে। ঠুক্-ঠাক্, ঠক্-ঠক্ শব্দ উঠছে, মড়্মড়্ শব্দ করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে বড় বড় গাছ। তার পর মাটি কেটে সমান করে চারিপাশে আলের বাঁধন দিয়ে তৈরি হচ্ছে জমি। ওই বাগ্দী, বাউড়ী, ডোম, হাড়ী, মুচি এদের পুরুষেরা মাটি কাটছে ঝপা-ঝপ—সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে ওদের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ফেলে আসছে আলের দড়ির দাগে দাগে।

দেখতে দেখতে সুসমতল বিস্তীর্ণ গিবুবরজার সোনা-ফলানো মাঠ গড়ে উঠল। বড় বড় বয়েল জুড়ে হাল নিয়ে এল সিংহদের কৃষাণেরা—ওই সব বাগ্দী-বাউড়দের দল। দেখতে দেখতে সবুজ ফসলে মাঠ ভরে উঠল। অগ্রহায়ণ আসতেই সে সবুজ ফসল হল সোনার ফসল। রাশি রাশি ধান, ভারে ভারে কলাই, ছালায়-ছালায় গম, বোঝা-বোঝা যব, শলি-শলি সরষে, হাড়ি-হাড়ি গুড় উঠল ছত্রীদের খামারে-খামারে।

গিবুবরজার ছত্রীরা লক্ষ্মী পেতে প্রণাম করলে, বললে—মা গো, আলা হয়ে ঘরে বাস কর, অধর্মের হাত থেকে রক্ষা কর; অধর্ম করলে জানি তুমি থাকবে না। ধর্মে মতি দাও।

শিকারের ঝোঁক কমে এল ছত্রীদের। তাদের সে সময়ই বা কোথায়? ভোরে উঠে বলদগুলি খেতে পেয়েছে কিনা, খেয়ে পেট ভরল কিনা দেখতে হয়। মাঠে গিয়ে আলের

মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বর্ষার সময় দেখতে হয় রোয়ার কাজ, ভাদ্র-আশ্বিনে নিড়েন, আশ্বিন-কার্তিকে দেখতে হয় জমির জল, অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হয় একদিকে ধান কাটার কাজ, অন্যদিকে রবিফসলের চাষের কাজ। শিকার করবার সময় কোথায়?

'শিকরে' পাখিগুলোর কতক মরে গেল, কারও কারও পাখি উড়ে গেল অবহেলায়। দু-পাঁচজনের অবশিষ্ট রইল—সেগুলো টিকটিকি-গিরগিটি ধরে খেত; সুযোগ পেলে লোকের ঘরের পায়রার বাচ্চা অথবা গৃহপালিত হাঁস মারত। গুলতি-মারা ধনুকগুলো হনুমান-বাঁদর তাড়াবার কাজে লাগল। সড়কি-তলোয়ারগুলি যত্ন করে দেওয়ালে রাখা হত। পর্বে-পার্বণে বের করে কোমরে বাঁধত ছত্রীরা।

জোয়ান ছেলেদের পাঠানো হত মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে, ফৌজীকাজের জন্য। অনেকের ছিল বারোমেসে কাজ, অনেকে বাড়িতেই থাকত, ডাক পড়লে যেতে হত। অনেকে বাড়িতেই বসবাস নিয়ে থাকত।

এই সময়ে গিরবরজা গ্রামের উন্নতি হয়েছিল চরম। যে পুরনো শিবমন্দিরগুলো এখনও ভাঙা-ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়—সেগুলি তৈরি হয়েছিল সেই সময়।

সিংহ-রায়েরা প্রথম শিব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের দেখাদেখি একে একে প্রায় সকল অবস্থাপন্ন ঘরের প্রত্যেকেই এক এক শিব প্রতিষ্ঠা করলে। ছোট-বড় মন্দির যার যেমন অবস্থা। শিব-চতুর্দশীতে উৎসবের প্রতিযোগিতা চলতে আরম্ভ হল। সে সব গল্প আজও প্রবীণ ছত্রীদের মুখের ডগায় লেগে আছে।

সিংহ-রায় বাড়িতে এসেছিল মুর্শিদাবাদ থেকে নাম-করা বাইজী—মা ও মেয়ে। তরুণী মেয়ে চটুল হাল্কা পায়ে নাচছিল দ্রুততম গতিতে—তার যেন নেশা লেগেছিল নাচের। তবলচীর হাত তরুণীর পায়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারছিল না। হেসে প্রৌঢ়া মা টেনে নিলে তবলা-বাঁয়া। নাচের সঙ্গে সঙ্গত চলছিল। হঠাৎ একসময় মৃদু হেসে সিংহ-রায়দের কর্তা তারিফ দিয়ে উঠল, বা-বাইজী বাঃ! অমনি প্রৌঢ়া বাইজী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারে নি; পরে প্রকাশ পেল। বাইজীর হাতেও তাল কেটেছিল। সমঝদার সিংহ-রায় ছাড়া সেটুকু কারোও বোধগম্য হয় নাই। বাইজী দম্ভভরে হেসে টেনে নিয়েছিল তবলা, তাই অতি সূক্ষ্ম চুকের জন্য মৃদু হেসে ব্যঙ্গভরে বাহবা দিলে সিংহ-রায়। সেই অপমানের ক্ষোভে বাইজী মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার প্রতিযোগিতায় সেও হত সমারোহের ব্যাপার। এক বাড়িতে চারটে করে মিঠাই দিয়ে একবার অন্য সকল বাড়ির অমর্যাদা করেছিল। নিয়ম ছিল জোড়া মিঠাইয়ের। এক বাড়ি যখন সে নিয়ম ভাঙলে, তখন অন্য বাড়ি রাগে ফুলে উঠল। পরের বার দেখা গেল আটটা, বারোটা, ষোলটা মিঠাই পাতে পড়তে আরম্ভ হল। তার পরের বার সিংহ-রায়েরা সংখ্যা করলে, যে যত খেতে পারে। তার পরের বারে সংখ্যা নির্দিষ্ট হল আটটা, আর ছেলেদের চারটে, কিন্তু সে মিঠাই এল মুর্শিদাবাদ থেকে। তার পর এল কাঁদির মনোহরা।

তারপর শোভা এবং সজ্জার প্রতিযোগিতা। একজন পঞ্চাশ মশাল জ্বাললে অন্যজনে জ্বালত একশ মশাল। সেকালে নিয়ম ছিল, এক বাড়ির কর্তা যেত অন্য বাড়িতে তত্ত্ব করতে। যাবার সময় সঙ্গে থাকত মশালচী পাইক। এ কর্তা যদি দুজন পাইক, একজন মশালচী নিয়ে যেতেন, তবে অন্য কর্তা যেতেন দুই মশালচী চার পাইক সঙ্গে।

নরসিং চলেছিল সেই সব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে। মুর্শিদাবাদ এলাকার নরম উর্বর মাটির মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা; গরুর গাড়ি চলে, গরু চলে, মধ্যে মধ্যে দু-একখানা ডুলি জেনানা-সওয়ারী নিয়ে, কখনও কখনও একটা-দুটো ঘোড়া। বড় ভাল জাতের ঘোড়া নয়; ছ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়ার জাতের দেশী ঘোড়া, পিঠে তামাক-মসলা-বোঝাই নিয়ে চলে—পিছনে চলে হিন্দুস্থানী ব্যবসাদার, গরুর মত পাঁচন্-লাঠি পিটে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কচিৎ কোন লাজ-লজ্জাহীন ছত্রী বা মুসলমান চাষী এমনি জাতের ঘোড়ার পিঠেই চেপে পা দুটো গুটিয়ে মাটি থেকে বাঁচিয়ে চলে। ঘোড়ার পায়ের ছিটানো ধুলোয় দাড়ি-গোঁফ-চুল ধূসর হয়ে যায়। মাঠের রাখালেরা দেখে হি-হি করে হাসে। সেই এক-হাঁটু নরম ধুলো-ভরা মাঠের রাস্তার উপর দিয়ে মন্থর গমনে চলেছে নরসিংয়ের মোটরখানা। গাড়িখানার আপাদ-মস্তক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। নরসিং, নিতাই, রামের সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। নরসিংয়ের গোঁফের গায় ধুলো লেগেছে—ঠিক কদম্ ফুলের কেশরের ডগায় রেণুর মত।

রামের অত্যন্ত হাসি আসছে—দাদাবাবুর গোঁফের এই কদম ফুল ঢং দেখে। কিন্তু ভয়ে সে হাসতে পারছে না। নিতাই মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

নরসিং সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে শক্ত হাতে স্টীয়ারিং ধরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধুলোর ভেতর কোথায় আছে গর্ত, তার ঠিক কি? তার ওপর চলন্ত সাপের মত আঁকাবাঁকা পথ। রাম অথবা নিতাইয়ের দিকে তার দৃষ্টিও নাই, মানসিক সচেতনতাও নাই। সিংহ-রায় বংশের ছেলে সে, আজ মোটর-ট্যাক্সি চালায়। ক্ষণিকের জন্য আক্ষেপ জেগে ওঠে। পর-ক্ষণেই হাসে। দিল্লীর বাদশাহের বংশধররা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিল, তারা সেখানে নাকি জুতোর দোকান করত। আজ রাজা, কাল ফকির। কালের গতিকই এই।

—সিংজী! নিতাই ডাকলে।

—হুঁ।

—রেডিয়েটারের জল পাল্‌টালে হত। বেজায় তেতে উঠেছে।

খেয়াল হল নরসিংয়ের, রেডিয়াটারের জলে সোঁ-সোঁ ডাক ধরেছে, মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প-অল্প। গাড়ি রুখলে নরসিং। নিতাই গিয়ে ঢাকনিটাতে হাত দিয়েই তুলে নিয়ে বললে—বাপ্ রে! নরসিং পায়ের কাছ থেকে খানিকটা ময়লা ন্যাকড়া তুলে ছুঁড়ে দিল। নিতাই সেইটা দিয়ে ধরে ঢাকনিটা খুলে ফেললে, ভেতরের গরম জল টগ্-বগ্ করে ফুটে যেন উথলে উঠল—ধোঁয়া বার হল অনেকটা।

রাম একটা পেট্রোলের খালি টিনটা বার করে বললে, এ-হে টিনটাতে জল নিস্ নাই নিতাই?
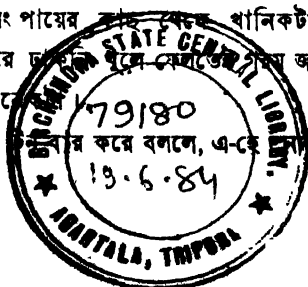
নিতাই জিভ কেটে বললে, এই যা!

নরসিং বললে, যা চলে—ওই দেখ্—মাঠে পুকুর।

পুকুরের ভাবনা এ এলাকায় নাই। ছত্রীরা পুকুরও কাটিয়ে গিয়েছে পরম্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গিব্বরজার চারদিকে এক ক্রোশের মধ্যে পুকুরের ভাবনা নাই। এক ঝুড়ি মাটি, পাঁচ গণ্ডা কড়ি।

তিন

বিস্তীর্ণ মাঠ চারিপাশে। গিব্বরজার সীমানা সাধারণ মৌজার অপেক্ষা অনেক বিস্তীর্ণ। পুকুরও অনেক। জলের ভাবনা এখানে? নিতাই কখনও আসে নাই, জানে না, তাই জলের জন্ত চিন্তিত হয়েছে সে। নরসিং হাসলে। গিব্বরজার সীমানা ছত্রীরা লাঠির জোরে বাড়িয়েছে। সে বিস্তীর্ণ এলাকা জলে-ফলে-ফসলে ভরে তুলেছে। সে আমলে যখন সিংহ-রায়েদের নেতৃত্বে গিব্বরজার ছত্রীরা লুঠ-তরাজ চালাত অবাধে, পাশের গ্রামগুলির শস্যক্ষেত্র থেকে পাকা ফসল কেটে নিয়ে আসত, তখন গিব্বরজার চারিপাশ থেকে মানুষের সঙ্গে গ্রাম-গুলিও সরে পালিয়েছিল। ছত্রীদের অত্যাচারে গড়া গ্রাম ভেঙে কৃষিজীবী অধিবাসীরা যথা-সম্ভব দূরে বসবাস করেছিল। পতিত গ্রামগুলির কৃষিক্ষেত্রও পতিত হয়ে আগাছার জঙ্গলে ভরে উঠে গিব্বরজার পতিত সীমা-পরিধি বাড়িয়ে তুলেছিল। সে সীমানার দখল কোনদিন আর ছত্রীরা ছাড়ে নাই। মহারাজ তোডরমলের সনদ এবং শাসনের পর যখন গিব্বরজার সীমানাভোর জমি তৈরি হল, তখন এই সব পতিত জমি আবার হাসিল হল। গিব্বরজার সীমানা চারিদিকে এক ক্রোশেরও বেশী। মাঠের মধ্যে যে সব গাছপালায় ঢাকা ছোট ছোট গ্রামের মত দেখা যায়, ওগুলি গ্রাম নয়, ও সব পুকুর, দীঘি।

শিব-দেবতার অর্চনা নিয়ে খাওয়ানো-দাওয়ানো, সাজ-সজ্জা সমারোহের পাল্লা যখন চলছিল, তখনই সিংহ-রায়দের এক তরফ কাটালে এক দীঘি। নাম হল শিবসায়র। দীঘি কাটিয়ে এক হাজার আট ভার গঙ্গাজল আনিয়ে ঢাললে দীঘির মধ্যে। তখন বর্ষা নেমেছে দেশে। সেই গঙ্গাজলের উপর জমল বৃষ্টির জল, দীঘি ভরে উঠল। দীঘির পাড়ে লাগানো হল আম-কাঁঠালের চারা। মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ঘাট থেকে কয়েক ভার মাছের পোনা আনিয়ে ছেড়ে সেদিন কর্তা যখন বাড়ি এলেন, তখন গিন্নী নাতিকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন—

আয় আয় আয়, আয় চাঁদ আ-রে—
সোনার কপালে আমার টিপ দিয়ে যারে;
গাই বিয়োলে দুধ দেব,
সোনার থালায় ভাত দেব।
রুই মাছের মুড়ো দেব,

মনের সুখে খাবি ;
আম-কাঁঠালের বাগান দেব,
ছাওয়ায়-ছাওয়ায় যাবি।"

কর্তা শুনে হেসে বললে, চাঁদ এত দিন আসে নাই, এইবার আসবে!

গিন্নী কথাটা বুঝতে পারলে না—নাত্তির কপালে হাতের তালু দিয়ে আঘাত করতেই ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে কর্তার মুখের দিকে।

কর্তা বললে, গোয়ালে গাই ছিল, বাড়িতে সোনার থালা না থাক্ রুপোর থালা আছে। কিন্তু পুকুর ছিল না, মাছও ছিল না, আম-কাঁঠালের বাগানও ছিল না। তাই চাঁদ-বেটা আসত না। এবার শিবসায়রের পাড়ে আম-কাঁঠালের চারা লাগিয়েছি, পুকুরে মাছও ছেড়েছি। এবার বেটা ঠিক আসবে লোভে-লোভে।

সমস্ত গ্রামে রটে গেল কথাটা। অন্য ছত্রী-কর্তারা মুখ বেঁকিয়ে হাসলে। গিন্নীরা বললে—ও মা! তাই তো বলি সিংহ-রায় বাড়ির নয়া-বহুয়ার নাকের সর্দি শুকোয় না কেন? আসলী চাঁদ এসে কপালে বসেছে কিনা! চাঁদের ঠাণ্ডি—বহুৎ ঠাণ্ডি!

ওটা উপেক্ষা করলে—এই শিবসায়রের জলে শিবের স্নানের ব্যবস্থার কল্পনাটার জন্য ছত্রীরা তারিফ করলে। এ কাজটা ভাল করেছে সিংহ-রায় কর্তা। দেবতার সরোবর না হলে চলবে কেন? এর পর বর্ষার শেষে—যখন পুকুরের পাড়ের চারাগুলি বেশ সতেজ নরম পল্লব মেললে এবং পুকুরের জলে যখন ঝাঁক বেঁধে পোনাগুলি বেড়াতে লাগল, তখন তারা বললে—হাঁা, সিংহ-রায় কর্তার বুদ্ধি বটে! সিংহ-রায় কর্তা চার পাড়ে চার ঘাট তৈরি করালে। এক ঘাট হল ছত্রী-বাড়ির মেয়েদের জন্য। এক ঘাট ছত্রী পুরুষদের জন্য। এক ঘাট অন্য পুরুষের জন্য—অন্য ঘাটে নামবে গ্রামের অন্য মেয়েরা। ছত্রী-মেয়েদের ঘাট বাঁশের 'খলপা'র ঘের দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সিংহ-রায় কর্তা। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

কয়েকদিন পর—শোনা যায় পনেরো দিন না যেতেই—কিন্তু ওই ঘিরে-দেওয়া ঘাটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা জলের ছিটকানির স্পর্শে একটা অঘটন ঘটে গেল। 'ছিটে জল আর মিছে কথা' নাকি অসহ্য ব্যাপার! আবার সেই ছিটে জল যদি অশুচি অবস্থায় কেউ ছিটিয়ে দেয়—তবে রক্ষা থাকে না। তাই হয়েছিল। মালিক সিংহ-রায়-বাড়ির ঝিউড়ী মেয়ে হৈ-হৈ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলের ছিটে লাগল অন্য সিংহ-রায় বাড়ির গিন্নীর গায়ে, গিন্নী তখন স্নান করে উঠেছেন। গিন্নী পূর্ণ-কলসীর জল ফেলে দিয়ে গা না মুছেই গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে গিয়ে ছত্রী-বাড়ির চিরাচরিত প্রথায় কুয়ার জল তুলে পুনরায় স্নান করলেন। কয়েকদিন পরেই সে বাড়ির পুকুরের পত্তন শুরু হল। মাসখানেকের মধ্যে আর এক বাড়িও দীঘি কাটাতে আরম্ভ করলে।

এই দীঘিই বিখ্যাত দীঘি! দীঘির মালিক নাম দিতে চেয়েছিল শম্ভুসায়র, কিন্তু আপনা থেকেই দীঘির নাম হয়ে গেল 'দাঙ্গা দীঘি'। দীঘি কাটাতে গিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল ছত্রীদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ; দীঘির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপ করে চারিদিকে খুঁটো পুঁততেই সিংহ-বংশীয়দের এক

তরফ এসে এক দিকের খুঁটো তুলে দিলে। দাবি করলে—এর মধ্যে দশ কাঠা জমি সিংহদের। এবং সিংহদের অংশীদার হিসেবে ওটুকু তার ভাগে পড়েছে।

সিংহ রায়ের এ তরফ জমির মূল্য দিতে চাইলে। দাবিদার সিংহ বললে, বড়লোক সে নয়, কিন্তু মূল্য নিয়ে জমি বিক্রি করবার মত লক্ষ্মীছাড়াও সে নয়।

সিংহ-রায় তাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করলে—তুমি বিবেচনা করে দেখ। ও দশ কাঠা নইলে পুকুরটার এ কোণটা সমান হয় না; চার কোণের বদলে পাঁচ কোণ হয়।

—সে দেখবার কথা আমার নয়। চার কোণ করতে চাও তো দীঘির আয়তন খাটাও।

—ভাল, জমি বিক্রি না কর, বদল কর। অন্য জায়গায় ভাল জমি দেব তোমাকে।

—ওর চেয়ে ভাল জমি আমার কাছে এ চাকলায় আর নাই। ওই আমার সোনা।

সেদিন স্থগিত রইল পুকুর-কাটার কাজ। মীমাংসার জন্য সন্ধ্যায় মজলিস ডাকবার কথা হল। মজলিসে দেখা গেল, পুকুর যারা কাটিয়েছে সেই দু-তরফ সিংহ-রায়েরা জমির দাবিদার সিংহের পক্ষে অবলম্বন করছে। তৃতীয় সিংহ-রায় তাদের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তার পর দাঙ্গা। দুজন বাগ্দী লাঠিয়াল খুন হল, সিংহ-রায়ের ছেলের ডান হাতখানা ভেঙে ঝুলতে লাগল। সেই হাত নিয়ে ছ-মাস ভুগে সে ছেলে মারা গেল।

দেশের অবস্থা তখন অরাজক অবস্থা। ক্রোশ-কতক দূরে বছর-কয়েক আগে পলাশীর আমবাগানে তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা হেরে গিয়েছেন ইংরেজী-কোম্পানির কাছে। তার পর জাফর খাঁ নবাব হলেন। তার পর নবাব হলেন কাসিম আলি খাঁ। তাঁর সঙ্গে ফের ইংরেজ কোম্পানীর লড়াই লাগল। কাসিম আলি খাঁ গেলেন। দেশে ফৌজদার আছে, খায়-দায়, ঘুমোয়, যে ভাল নজর দিয়ে নালিশ করে তার নালিশের আরজি দাখিল হয়, আবার বিবাদী যদি তার চেয়ে ভাল নজর দেয় তবে সে নালিশ তৎক্ষণাৎ খারিজ হয়ে যায়। যারা অবস্থায় দুর্বল, তারা নালিশ জানাতে লাগল ভগবানের কাছে; যারা সবল, তাদের দাবির মীমাংসা হতে লাগল কাজীর কলমের বদলে লাঠিয়ালের লাঠি-সড়কির আগায়। ঠিক এমনি সময়ে গিরবরজায় গৃহ-বিবাদ বাধল। যেন ঠিক ঋতুতে ঠিক ফসলের বীজ বোনা হল; রাজপুত-রক্ত ক্ষেপে উঠল। সিংহ-রায়ের বিপক্ষে দাবিদার সিংহ অবস্থায় দুর্বল হলেও সাহসে এবং দেহের শক্তিতে দুর্বল ছিল না। দাঙ্গায় হেরে সে একদিন রাত্রে অশান্ত মনে অন্ধকার উঠানে ঘুরছিল। হঠাৎ ইচ্ছা হল গাঁজা খাবার। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতে গিয়ে আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ল উঠানে বিছানো খড়ের উপর। খড় দপ করে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি সে খড়ের আগুন নিভিয়ে দিল বটে, কিন্তু তার লকলকে শিখায় জ্বলে ওঠার যে ছবি তার গাঁজার-নেশায়-আচ্ছন্ন মাথার মধ্যে জ্বলতে লাগল, সে আর নিভল না। কয়েক দিন পরেই আগুন গিয়ে লাগল সিংহ-রায়ের বাড়ির এক কোণে। ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার মত ছুটল সে আগুন, বড় বড় নালা লাফ দিয়ে পার হয়ে যায় যেমন লড়াইয়ের ঘোড়া—তেমনি ভাবে এ-ঘরের চাল থেকে ও-ঘরের চালে লাফিয়ে পড়তে লাগল। সিংহ-রায়ের বাড়ি-ঘর অর্ধেকের উপর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সিংহ-রায় বুঝলে এবং সজাগ হল। সিংহর মাথার

আগুনও সমান তেজে জ্বলতে লাগল। অনেক ভেবে সিংহ তৈরি করলে তীর। লম্বা লোহার ফলার নীচে একটা গোল লোহার চাকতি লাগিয়ে তাতে আঠা দিয়ে সযত্নে লাগালে তামাক খাবার গোল টিকে। গভীর রাত্রে সেই টিকেতে আগুন লাগিয়ে মজবুত সাঁওতালী ধনুকে জুড়ে দূর থেকে সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সেই তীর। কিছুক্ষণ পর সিংহ-রায়ের বড় ঘরের মাথা জ্বলে উঠল।

সিংহ-রায়ের বাড়ি পুড়েই কিন্তু আগুন নিভল না। গোটা গ্রাম পুড়ে গেল।

সিংহের মাথার আগুন ধীরে ধীরে অনেক ছত্রীর মাথায় জ্বলে উঠল। গিরিবরজার আগুনের খ্যাতি রটে গেল চারপাশে। মধ্যরাত্রে আপন-আপন গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোক আকাশ-আলো-করা রোশনাই দেখত।

যে সব দীঘি এই ছত্রীরা কাটিয়েছিল, তারই জল তুলে ঢেলে ঢেলে ছত্রীরা ক্লান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের আগুন কিছুতে নিভল না। গিরিবরজ পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আগুনের আঁচে লক্ষ্মী-ঠাকরুন ঝলসে গেলেন; তিনি নাকি কাঁদতে কাঁদতে গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিলেন একদিন। তিনি নাকি গিরিবরজা থেকে গিয়ে উঠেছিলেন পঞ্চমতির কায়স্থ-বাড়িতে। সে নাকি অদ্ভুত কাহিনী—সকলেই জানে, পাঁচজন প্রবীণে সেই কথা আজও হয়। কিন্তু নরসিংয়ের 'দিদিয়া' ঠাকুমার মত সুন্দর করে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

যেদিন নরসিং প্রথম এই গল্প শোনে, সেদিনের কথা আজও মনে আছে। চৈত্র মাসের সন্ধ্যাকাল। হঠাৎ পশ্চিম পাড়ায় এক সিংহ-বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠল। চৈত্র মাসেই সেবার ধু-ধু খরা উঠেছিল। নরসিং এবং তার ভাইবোনেরা বসে ছিল বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে শিরীষ গাছের তলায়। দুটো চারটে শিরীষ ফুল ফুটতে তখন আরম্ভ হয়েছে। চামরের মত কেশরওয়ালা একটি শিরীষ ফুল কখন খসে পড়বে, তারই প্রত্যাশায় তারা বসে ছিল। হঠাৎ শব্দ উঠল—আগুন, আগুন। সমস্ত গ্রাম কেঁপে উঠল। জোয়ান মরদেরা উঠল আপন আপন ঘরের চালে। হাতে ভিজানো খড়ের আঁটি, কলসী-ভরা জল। নীচে উঠানে কলসী-ভর্তি জল রেখে ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে উঠতে লাগল জ্বলন্ত খড়ের কুটি। গ্রামটা ভরে গেল পোড়া খড়ের কালো ছাইয়ে। শিরীষ ফুলের গন্ধ যেন কোথায় উড়ে গেল। দেখতে দেখতে আগুন এসে লাগল নরসিংদের গোয়ালে। জ্বলন্ত খড়ের কুটি সাবধানতা সত্ত্বেও সতর্ক চোখ এড়িয়ে কখন এসে পড়েছিল গোয়ালের চালে। চাল জ্বলে উঠল। ভাগ্য ভাল যে, বসতবাড়ি আর গোয়ালঘরের মাঝখানে ছিল ঐ শিরীষ গাছটা।

আগুন নিভল। আগুন নিভিয়ে স্নান করে এসে পুরুষেরা বসল তামাক খেতে। মেয়েরা উঠান পরিষ্কার করে জটলা পাকিয়ে বসল। গিরিবরজায় আগুন লাগলে আগুনের আঁচ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই থাকে মানুষের উত্তেজনা। আগুন নিভলে আর কিছু নাই। ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত; জ্বর ছাড়লেই রোগীও উঠে বসল। সেই দিন কথায়-কথায় মেয়ে-মহলে উঠে পড়েছিল সেকালের কথা।

দিদিয়া বলেছিল—'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা'—কখনও অবস্থা ভাল

থাকে, কখনও মন্দ হয়। যখন মন্দ হয়, তখন হীরা বেচতে হয় জিরার দামে, সোনা যায় সীসার কদরে; মতির হার পুঁতির মালার মত বিকিয়ে যায়। তাতে মা-লক্ষ্মীর আসন টলে অবশ্য, কিন্তু তবুও যেতে মায়ের মন চায় না। তিনি তাকিয়ে থাকেন—মানুষের মনে আচার-বিচারের ঝিনুকের খোলার ভিতর আছে যে অমূল্য 'মতি', যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যার আলোতে চোখ ঝলসে যায়, যা হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ যা মানুষের বুক ভরাট করে রাখে, সাপের মাথার মণির মত মানুষের বুকের সেই মতিকে ছুঁয়ে বসে থাকেন। সেই 'মতি' যখন মানুষের পাপের আগুনে গলে যায়, পুড়ে যায়—মতিচ্ছন্ন যখন হয় মানুষের—তখনই মা-লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে চলে যান।

গিবুবরজার ছত্রীদের সেই মতিচ্ছন্ন হল। মা-লক্ষ্মী থাকতে পারেন আর? তিনি চলে গেলেন। চৈত্র মাস, শুক্ল পক্ষ, ত্রয়োদশী তিথি; চাঁদনির রাত ফুট্‌ফুট্ করছে; খামারে গম যব সরষের আঁটি থরে-থরে সাজানো, গোলায় ধান মড়্‌মড়্ করছে, চালে নতুন খড় ঝল্‌মল করছে। ফুটেছে তিল ফুল মাঠে; উঠানে ফুটেছে টগর বেলা, পথের ধারে ফুটেছে শিরীষ; বাগানে আমের গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে; গিবুবরজায় মা-লক্ষ্মী মনের আনন্দে স্বপ্ন দেখছেন। হঠাৎ তিনি কেঁপে উঠলেন। এ কি হল! কিসের এ আঁচ? কিসের কালিতে সব কালো হয়ে গেল? কই, সে মতির আলো কই? নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন লাগিয়েছে ছত্রীরা; আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে হাজার জিভ মেলে, ক্ষ্যাপা লাল ঘোড়ার দঙ্গল ছুটছে, ঘাড়ে নাচছে কালো শিখার লম্বা কেশর। শয়তান তার সওয়ার। লাল হয়ে গেল আকাশ, কালো হয়ে গেল মাটি, লাল ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে ধুলোর মত উঠল ধোঁয়া আর ছাই। মা-লক্ষ্মী কাঁদলেন—দিশেহারা হয়ে গেলেন; চারিদিক আলোয় আলোময়, কিন্তু তাঁর চোখে সব অন্ধকার ঠেকল। ছত্রীদের বুকের মতি নিজেদের বুকের আগুনের আঁচে ফেটে চৌচির হয়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই উড়ে উড়ে তাঁর দমও যেন বন্ধ হয়ে এল, ছত্রীদের বুকের আগুনের আঁচে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ ঝল্‌সে গেল। তিনি তখন চোখের জলে ভেসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। পথে পথে ছুটে এসে দাঁড়ালেন বারেকের জন্য নদীর ঘাটে। পাঁচমতির কায়স্থ-বাড়ির গিন্নী ছিলেন সেখানে। চৈত্র-পূর্ণিমার লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আটনে আল্‌পনা দেবেন, তারই জল নিতে এসেছিলেন নদীর ঘাটে। তিনি বললেন, আহা—মা গো! এই রাত্রে একা তুমি কোথায় যাবে? মা বললেন, আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। গিন্নী বললেন, বস মা, আমি তোমায় আঁচল দিয়ে বাতাস করি। আঁচল দিয়ে বাতাস দিলেন, যত্ন করে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন। মা বললেন, আমার কাছে কিছু চাই তো বল। গিন্নী বললেন, কি চাইব মা? দেবতাকে পেন্নাম করি, অতিথিকে সেবা করি, তেষ্টা পেলে জল দিই, খোকা-তাপাকে মিষ্টি কথা বলি, এ কি কেউ কিছু দেবে বলে? মা দেখলেন, গিন্নীর বুকের ভেতর আচার-বিচারের খোলা দুটি খুলে গিয়েছে—তার মধ্যে টল্‌মল্ করছে সেই 'মতি'; যে মতি রাজা হলেই পায় না, দেবতারা যার সন্ধানে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান—সেই 'মতি'। তিনি গিন্নীর পিছনে পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে ঢুকলেন। এদিকে সে

রাত্রে গিরুবরজার সে কি আগুন! সে যেন খাণ্ডব-দাহন হয়ে গেল। ঘরের খড় পুড়ল, দরজা-জানালা পুড়ে গেল। সোনা গলে ছাইয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল, থালা-কাঁসা গলে গেল, বহুজনের ছেলে পুড়ল, মেয়ে পুড়ল, কাঁচা তালগাছ জ্বলে গেল দাউ দাউ করে। সকালবেলায় দেখা গেল, মাঠের তিল ফুলের বেগুনে রঙ কালো হয়ে গিয়েছে।

আকাশের দিকে চেয়ে নরসিং কাঁদছিল। তার কান্না কেউ লক্ষ্য করে নাই। দিদিয়া চুপ করলে। কিছুক্ষণ পর আবার বললে—যা থাকল অবশিষ্ট সোনা রুপো—এর পর থেকেই একে একে গিয়ে ঢুকল ওই কায়স্থদের বাড়ি। তার পর যজ্ঞি শেষ হল, কোম্পানির মাল-গুজারি দিলে না ছত্রীরা আপনাদের মধ্যে ঝগড়া করে। পঞ্চাশ টাকা! মাত্র পঞ্চাশটা টাকা! বাস্। সুরযনারায়ণ ডুবলেন আর কোম্পানির লোক ঘড়ি পিটলে—এক দুই তিন। ছুটে গেল গিরুবরজার জমিদারী স্বত্ব। সেও কিনলে ওই পাঁচমতির কায়স্থরা।

দিদিয়া আবার চুপ করলে। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে, ও মতি গেলে আর ফেরে না। সোনা রুপো যায়, আবার আসে, হীরা বেচে আবার কেনা যায়। কিন্তু মনের যে মতি, সে গেলে আর ফেরে না। বোধ হয় পুরুষ-বরাবরই আর ফেরে না। আজও তো ফিরল না। আজও সেই আগুন দেয় ছত্রীরা আপনাদের ঘরে। হায় রে হায়!

হায় রে হায়ই বটে। দিদিয়া ঠিকই বলেছিল।

বর্ক-আন্দাজ গিরিধারী সিংহ-রায়ের বংশ—তার জ্ঞাতি বন্ধুর বংশধরেরা মতিচ্ছন্ন হয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বরকন্দাজী বৃত্তি নিলে শেষে। পাইকের কাজ, চাপরাসীর কাজ, দারোয়ানের কাজ। কাজটা প্রথম অবশ্য দেশোয়ালীর ঘরে তারা নেয় নাই, নিয়েছিল ওই রামনগরের সায়েব-কোম্পানির রেশমকুঠিতে। তার পর ক্রমে দেশোয়ালী জমিদার ধনীর বাড়িতে। লক্ষ্মী গেল, বৃত্তিহীন হল, তবু চৈতন্য হল না; মাথায় পাগড়ি বেঁধে, গোঁফে তা দিয়ে, পায়ে নাগরা পরে, লাঠি নিয়ে ডাক-হাঁক করে বেড়াত, আর বুক চাপড়ে বলত, "শির লেনে সেকতা—দেনে ভি সেকতা—হাম লোক ছত্রী হ্যায়।" অহঙ্কার করতে এতটুকু বাধত না। আবার নানা জাতের অন্য পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলা-মেশা করতেও এতটুকু ঠেকত না। গ্রামের যে বাগদী হাড়ী লাঠিয়ালেরা আগেকার কালে ছত্রীদের বাড়িতেই পাইক-চাকরের কাজ করত, তাদের বংশধরদের সঙ্গে ছত্রীদের বংশধরেরাও কর্মজীবনে মিশে প্রায় একাকার হয়ে গেল। অবশ্য বাগদী হাড়ীরা তাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটা করত, আর জলটা ছুঁত না। কিন্তু গাঁজার কল্কে, তামাকের কল্কে চলত হাতে হাতে।

শুধু সিংহ-রায়দের দু-বাড়ি কোনরকমে মান বাঁচিয়ে চলত। তারা কারও বাঁধা-মাইনের চাকরি করত না। তারাও অবশ্য ওই বৃত্তিই নিয়েছিল, কিন্তু তাদের ছিল ঠিকের কাজ। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টাকা ঠিকে করে কাজ করে আসত। আরও একটা কাজ তারা করত। গিরুবরজার লাল ঘোড়ার কারবার। এককালে চাকলায় লাল ঘোড়ার খ্যাতি খুব প্রসার লাভ করেছিল। সামান্য বিরোধেই লাল ঘোড়া ছাড়াটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সিংহ-রায়দের দু-বাড়ির অসমসাহসী কারবারীরা এক ঘোড়া ছাড়তে নিতেন পাঁচ টাকা, দু

ঘোড়ার জন্তে দশ টাকা, তিন ঘোড়ায় পনেরো, চার ঘোড়ায় কুড়ি। অর্থাৎ, কারও ঘরে আগুন দিতে হলে ঘরের কোণ-পিছু পাঁচ টাকা ছিল পারিশ্রমিক। এক কোণে আগুন দিতে পাঁচ, দুকোণে দশ, তিন কোণে পনেরো, চার কোণে অর্থাৎ বেড়া আগুনের জন্ত কুড়ি টাকা রেট। সিংহ-রায়েরা আগুন দিয়েও কিন্তু ধর্ম বাঁচাত। আগুন দেওয়ার পর আগুন জলে উঠবামাত্র চীৎকার করে উঠত, "উঠডে। দোড়ডে। লাল ঘোড়া।" অর্থাৎ উঠ্ রে, দৌড়ে আয় রে, আগুন!

এই চীৎকার করাটা হল ছত্রীদের একটা বিশেষত্ব। ছত্রীদের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে—হাড়ী ডোম বাগ্দীদের দু-দশজন, সৎজাতিরও দু-একজন, মুসলমানদেরও দশ-বিশজন লাঠির কাজ এবং লাল ঘোড়ার কারবারও করত, কিন্তু তারা সকলেই এ চীৎকারটুকু করত না। ছত্রীদের এটা ছিল ধর্ম। এ চীৎকার না করলেই তারা ধর্মে পতিত হত। অসতর্ক ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

দিদিয়ার সেই আক্ষেপ সেদিন নরসিংয়ের বুকের মধ্যে শেলের মত বিঁধেছিল। সেই কবে কোন্ ছেলেবেলায় চৈত্র মাসের চাঁদনির রাতে শোনা কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দিদিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল—চাঁদের আলোয় গালের উপর সে জলের দাগ চক্-চক্ করে উঠছিল মধ্যে মধ্যে; নরসিংয়ের মনে হয়, সে যেন এই একটু আগে কাঁদতে দেখেছে তাঁকে। দিদিয়া তাকে বলেছিল—ভাইয়া নরসিং, তুই যেন এ কাজ করিস না। লিখাপড়ি শিখবি, মানুষের মত মানুষ হবি। কেমন?

নরসিং কথা বলে উত্তর দিতে পারে নাই, উপুড় হয়ে শুয়ে সকলকে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল—হাঁ। সে তাই করবে।

পরের দিন সে কুস্তির এবং লাঠির আখড়ায় যায় নাই। তার জেঠামশাই—এ অঞ্চলের বিখ্যাত শূরবীর মাধব সিং এসে ডাকলে—নরসিং! আখড়ামে কেঁও নেহি গিয়া রে? তবিয়ত কুছ খারাপ হুয়া?

মাধব সিং কোন মতেই বাঙলা বলত না। ছত্রীত্ব-গৌরবে সে বলত মেঠো ভুল হিন্দী। ভুলই হোক আর মেঠোই হোক, তাতে তার লজ্জা ছিল না। হিন্দী হলেই হল। তবে দু-দশটা আদব-কায়দার ভাষা তার জানা ছিল। সে কখনও বলত না—আপকা ঘর কাঁহা? বলত—জনাবকে দৌলতখানা কাঁহা? নিজের ঘরকে বলত গরিবখানা। জেঠা মাধব সিংকে মনে হলে আজও নরসিংয়ের বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। দুর্দান্ত মানুষ, বিশাল চেহারা, তার উপর মধ্যে মধ্যে জেঠার মাথাগরম হত। তালু কামিয়ে তার উপর ঘৃতকুমারীর শাঁস চাপাত। চোখ হয়ে উঠত রাঙা জবাফুলের মত। প্রথম কয়েক দিন থম ধরে থাকত। কথা কম বলত। কোন কোন বার অল্পেই যেত, সুস্থ হয়ে উঠত। কোন কোন বার একেবারে ক্ষেপে উঠত। মনে আছে নরসিংয়ের—কোমরে কেবলমাত্র কৌপীন এঁটে প্রকাণ্ড লাঠিগাছটা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পাঁয়তাড়া ভেঁজে বেড়াত, আর হাঁকত—আও রে কোন্ হ্যায় মর্দানা। আও রে! তার পরই হা-রা-রা হাঁকে লাঠি ঘুরিয়ে সামনের বাড়ির চালের উপর লাঠির আঘাত করত।

সামনে কোন বাড়ি-ঘর না পেলে পথের ধারে গাছগুলির উপর চালাত তার লাঠি। আর অট্টহাসি হাসত—হা-হা-হা-হা।

জেঠার প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা নরসিংয়ের মুখ দিয়ে ফুটল না, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কপালে, বুকে হাত দিয়ে জেঠা বলেছিল—বরফ কা মাফিক হিম হ্যায়? আঁ? আরে, তব কেঁও নেহি গিয়া? এও। বাতাও।

নরসিং এবার মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—পড়ছিলাম।

—কেয়া? ইস্ ওয়াক্ত পড়্ রহা? আ! লিখা-পঢ়ি? কেঁও? তুম কা গমস্তা হও গে? উল্লু কাঁহাকা!

মাধব সিং আচমকা তাকে দুই হাতে আলগোছে তুলে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছিল। বাড়ি-ঘর খুঁজে কখানা বই-কাগজ যা সে সামনে পেয়েছিল, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য ভাল যে, সেগুলো তার বই নয়।

সেই দিন রাত্রেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল এই ইমামবাজারে। ইমামবাজারের পাশে আকুলি গ্রামে একঘর ছত্রী আছে—এই আকুলি গ্রাম হল তার মামার বাড়ি। মামার বাড়িতে এসে সে উঠেছিল। সেই তার জীবনে প্রথম মামার বাড়িতে পদার্পণ। গিবুবরজার ছত্রীরা বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে—সে বউ আর কখনও গিবুবরজার সীমানা থেকে বাইরে যেতে পায় না। এই তাদের সেই পুরনো কাল থেকে নিয়ম। কালে কালে অবস্থার পরিবর্তনে ছত্রীদের অনেক ব্যবস্থার ওলট-পালট হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। পুকুর কাটানোর কল্যাণে মেয়েদের বাড়ির পাতকুয়োর তোলা-জলে স্নানের পরিবর্তে পুকুরঘাটে স্নানের রেওয়াজ হয়েছে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এখন মেয়েরা বাসনও মাজে, ঘুঁটেও দেয়, গ্রামের পথে বেরিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ওপাড়া পর্যন্তও যায়, এমন কি বাগ্দীপাড়ায় শাক-মাছ কিনতেও যায়; কিন্তু তার বেশী নয়, গ্রামের সীমানার বাইরে তাদের বেরুবার হুকুম নাই। নরসিংয়ের মায়েরও সেই নিয়মে কখনও বাপের বাড়ি আসা ঘটে নাই, তবে সে শুনেছিল, রামনগরে রেশমের কুঠি আছে, কুঠির চিমনি দেখা যায় দুক্রোশ দূর থেকে; সেই রামনগরের নদী পার হয়ে ওপারে সড়ক চলে গিয়েছে ইমামবাজার পর্যন্ত; ইমামবাজার ঢুকবার মুখেই আকুলিয়া গ্রাম। আকুলিয়ার মোড়েই সরকারী ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর পরেই আছে পুরনো একটা নীলকুঠির ভাঙা বাড়ি, সেই ভাঙা বাড়ির পাশেই আকুলিয়ার ছত্রীদের বাড়ি। ধরণী রায়—তার মামা।

আজও স্পষ্ট মনে আছে নরসিংয়ের। দুপুরবেলা সে এসে দাঁড়িয়েছিল মামার বাড়ির দরজায়। বগলে পুঁটুলির মধ্যে ছিল দুখানা কাপড় আর তার বই কখানা। ইমামবাজারে বড় ইংরেজী ইস্কুল আছে। সেই ইস্কুলে সে পড়বে, এই সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছিল। তার মামার ছেলে-পুলে নাই, মামা তাকে খুব ভালবাসে। কত বার এসেছে তাদের বাড়ি।

মামা বাড়িতে ছিল না। মামী উনোনশালে বসে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিল। নরসিং

তাতে বিস্মিত হয় নাই—গিরবরজাতেও মেয়েরা তামাক খেত। মামী তাকে দেখে লজ্জিত হয়ে পাশে হুঁকোটা নামিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে গো তুমি?

মামী কখনও গিরবরজায় যায় নাই, নরসিংকে চেনবার কথা নয়।

নরসিং বলেছিল, আমার বাড়ি গিরবরজায়। আমি নরসিং। বাবু ধরণী রায় আমার মামা।

বসন্তকালের দু-পহর বেলা। সকালবেলাটা ঠাণ্ডা থাকলেও দুপুর-রোদ বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। তার উপর ইঞ্জিনটা হয়েছে গরম। রেডিয়েটারের খোলা মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বার হচ্ছে। নদীর বালি ঠেলে যখন উপরে উঠেছিল, তখনই আর একবার ঠাণ্ডা জল দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নদীর ওপর থেকেই নরসিংয়ের মন কেমন হয়ে গিয়েছে। পুরনো আমলের গল্পের ঘোর ধরে গিয়েছে যেন। ইমামবাজারে প্রথম বাবুদের শখের থিয়েটার দেখে তার মনে যেমন ঘোর ধরেছিল—তেমনি ঘোর। জল নেওয়ার কথা আর তার মনেই হয় নাই। রামটা ছেলেমানুষ, তার উপর একেবারে বুদ্ধিহীন। নেহাত সে তার সম্বন্ধী, আর অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছে ওদের, তার উপর স্ত্রী মরবার সময় হাতে ধরে তাকে বলে গিয়েছে 'রামকে দেখো', তাই সে রামকে রেখেছে। বেহুঁশ ছোক্‌রা। দোষ নিতাইয়ের। নিতাইয়ের ভুল হওয়া উচিত হয় নাই। পুকুরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে তারা করছে কি? পুকুর খুঁড়ে জল তুলছে নাকি?

পিছনে একখানা গরুর গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা একটানা ক্যাঁ শব্দ—উঠে থেমে যাচ্ছে শব্দটা, একটি নির্দিষ্ট সময় পরেই আবার সেই একটানা শব্দ আরম্ভ হচ্ছে—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। দুপুরবেলা মাঠের মধ্যে দূর থেকে শব্দটা শুনলে মন কেমন ঝিমিয়ে আসে। নরসিং পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা টাপর-দেওয়া গাড়ি আসছে। যাত্রী চলেছে। নরসিং ব্যস্ত হয়ে উঠল। গাড়িখানা এসে আটকে যাবে। মাঠ দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলে নরসিং পড়বে ঝঞ্ঝাটে। ধুলো খেতে হবে খানিকটা। হর্ন দিয়ে—তেমন গোঁয়ার গাড়োয়ান হলে ধমক দিয়ে, গালিগালাজ করে মাঠে নামিয়ে পথ খোলসা করে নিতে হবে। নরসিং হর্ন দিতে আরম্ভ করলে, নিতাই এবং রামকে সে সংকেত জানালে। হর্ন দেওয়ার ভঙ্গির মধ্যে তার অসহিষ্ণুতা সুপরিস্ফুট। ক্রমশ হর্নের শব্দ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে আরম্ভ হল।

—এই নিতাই! হারামজাদা শুয়ার-কি বাচ্চা! ওরে—উল্লু—ক—রা—মা!

রামা—আকারের লম্বা টানটা তার শেষ হল না, পিছনে একটা হুড়মুড় শব্দে সে চমকে উঠল। চকিত হয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে সে দেখল, পিছনের গরুর গাড়িটা মাঠের পথের পাশের মাটির বাঁধের উপর থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছে। একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে, অন্যটা উল্টে-যাওয়া গাড়িটার চাপে মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। গাড়োয়ানটা বোধ হয় আগেই লাফ দিয়ে পড়েছিল এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ত্রস্ত-চকিত স্বরে একবার বলছে—এই, যা, মলো মলো! আর একবার

পলায়নপর গরুটাকে হেঁকে বলছে—হু-হু-হু! এই—হু-হু!

লাফ দিয়ে নেমে এল নরসিং। প্রথমেই গাড়োয়ানটার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—হু-হু করবি পরে। গাড়ি তোল্ আগে। পকেট থেকে ছুরি বার করে চাপা-পড়া গরুটার দড়ির বাঁধন কেটে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ির জোয়ালটাকে তুলে ধরলে। গরুটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। নরসিং ধমক দিয়ে গাড়োয়ানটাকে বললে—সোওয়ারীর কি হল দেখ্। সোওয়ারী ছিল গাড়িতে?

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে নরসিং—মানুষ দেখা যায় না, শুধু তামাকের বোঝা। পিছন দিকে এসে সে উঁকি মারলে। তামাকের বোঝার নীচে থেকে কাপড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে।

তামাকের বোঝা ঠেলে টেনে বার করলে নরসিং। একজন নয়, দুজন। একজন প্রৌঢ় আর একটি বিধবা যুবতী মেয়ে। তামাকের বোঝা চাপা পড়ে দুজনেই হাঁপাচ্ছে, আঘাতও অল্প-অল্প লেগেছে, টাপরের বাখারির খোঁচায় মেয়েটির কপাল কেটে গিয়েছে। প্রৌঢ়ের কাঁধে খোঁচা লেগেছে।

জল চাই। নিতাই ও রামের জন্য নরসিং মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালে। ওই দুজনে নবাবী চালে আসছে। নরসিং হাঁকলে—জলদি। এ—ই! জলদি।

চার

মেয়েটির রূপ আছে, সুন্দরী মেয়ে। সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। গায়ের রঙ তার যত ফরসা, চুলের রঙ তত ঘন কালো। দুপুরের রৌদ্রে তার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, শুভ্র স্বচ্ছ ত্বকের নীচে রক্তোচ্ছ্বাস যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। রাঙা টকটকে মুখের মধ্যে চোখের পাতাগুলি এবং ভ্রূ দুটিও ঘন কালো; ছোট কপালটিকে ঘিরে ঘন কালো রুক্ষ চুলের রাশি ফেঁপে-ফুলে রয়েছে, তাতেই মেয়েটিকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তেমনি তাকে মানিয়েছে সাদা থান-কাপড়ে; নিরাভরণ বৈধব্যেই যেন তাকে সব চেয়ে ভাল দেখায়। মেয়েটি অল্পেই উঠে বসল। উঠে গায়ের কাপড় সংবৃত করে মাথার অল্প ঘোমটা টেনে দিয়ে নিতান্ত নিরাসক্তের মত বসে রইল। সঙ্গী প্রৌঢ়ের জন্য কোন আকুলতাই তার দেখা গেল না। সে উঠে বসতেই নরসিং প্রৌঢ়ের কাছে এল। নিতাই তার মুখে জল দিচ্ছিল। লোকটি মাটির উপর তখনও পড়ে ছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে আর ক্রমাগত কাশছে লোকটি। নাকে, মুখে, চোখে তামাকের গুঁড়ো ঢুকেছে বেচারার। কালো বেঁটে মোটা লোক, কাপড়-চোপড় পরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায়, এদেশী মানুষ নয়। নরসিং এক-নজরেই চিনলে—লোকটি হয় ভকত-টকত অর্থাৎ মাড়োয়ারী, নয় তো সাহু-টাহু অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বেনিয়া কেউ হবে; তামাকের ব্যবসা করে। লোক সে হরেক

রকমের দেখেছে তার গাড়ির কল্যাণে। নিতাইয়ের হাত থেকে জলের টিনটা নিয়ে বেশ খানিকটা জল দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললে—উঠুন—উঠে বসুন।

লোকটি কোন সাড়াও দিলে না, তেমনিভাবে পড়ে রইল। নরসিং আবার বললে—উঠুন। শুনছেন?

নিতাই বললে—ভুঁটে প্যাটে মার এক খোঁচা, এখুনি কোঁক করে কোলা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠে বসবে। না হয় তো কাতুকুতু দাও। ন্যাকামি করে পড়ে আছে বেটা।

রাম হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে। মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়ে ঘুরে বসল। নরসিং লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বেশ যত্ন করে বসিয়ে দিলে, বললে, লাগে নাই তো বেশী, এমন করছেন কেন? উঠে বসুন।

উঠে বসেই লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।—অ রে বাপ রে বাপ, হামরা জান চলা গেয়া রে বাবা, মর গেইলো রে বাবা! হায় ভগোয়ান!

নরসিংয়ের ইচ্ছা হল একটি চড় কষিয়ে দেয় লোকটির গালের উপর। এই দুপুর রৌদ্রে নিজের গাড়ি ফেলে লোকটার ন্যাকামি শোনা তার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছিল ক্রমশ। তবুও ভদ্রতা রক্ষার জন্যই সে চুপ করে রইল, হাজার হলেও গাড়ি উল্টে তামাকের বোঝা চাপা পড়ে খানিকটা চোট খেয়েছে লোকটা।

পরক্ষণেই কিন্তু লোকটা উঠে দাঁড়াল, গাড়োয়ানটার দিকে হাত বাড়িয়ে এক মুহূর্তে কান্না থামিয়ে গর্জন করে উঠল—হারামজাদে উল্লুকে বাঁচে—তুম হারামজাদে হামারা জান মার দেতা! তার পর আর সাধারণ গালিগালাজে তার কুলিয়ে উঠল না, আরম্ভ করলে অশ্রাব্য, অশ্লীল গালাগাল। তার পর আরম্ভ করলে শাসন—তেরা খাল উতার লেবে হামি, হাড্ডি তোড় দিবে; ফাটকমে ভেজবে হামি শালাকো।

তার পরই অকস্মাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আরও উগ্র এবং উচ্চ কণ্ঠে—আরে হারামজাদী কুত্তী বে-শরমী কাঁহাকা, তু হাসছিস? কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে? বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, ত্রস্তভাবে সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। নরসিং আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না, খপ করে সে পিছন থেকে লোকটির হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে আটকে দিয়ে বলে উঠল—এই-য়ো!

সে ঝাঁকানি এবং ধমক খেয়ে লোকটি চমকে উঠল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না; নরসিংয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নরসিং বললে, কি রকম লোক মশাই আপনি? এই একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে সারা, আর এই একেবারে গাড়োয়ানের ওপর বীর-বিক্রম, এই মেয়েলোককে মারতে ছুটছেন! আপনার মাথা-টাথা খারাপ নাকি!

নিতাই বলে উঠল—পিঠের চামড়া তুলবার, হাড় ভাঙবার আর আইন নাই, বুঝলেন! সে তুমি যে হবে সেই হও—রাজাই হও আর মহারাজাই হও। আর মেয়েলোকের গায়ে হাত তুললে তোমাকেই যেতে হবে ফাটকে; হ্যাঁ।

নরসিংয়ের রাগ খানিকটা বেড়ে গেল, অকারণে যেন বেড়ে গেল, সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে—গাড়োয়ান তোমাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নাই। আর মেয়েটিই বা কি দোষ করলে তোমার কাছে?

রাম হি-হি করে হেসে উঠল, মেয়েটির সে মুখ-ঘুরিয়ে-হাসি সে দেখছিল, বললে—পচা কুমড়োর মত ওই ভুঁড়ি-নাচ দেখলে কেউ না হেসে থাকতে পারে? হাসির বেগ সামলাতে না পেরে সে এবার বসে পড়ল।

নরসিংহ এবার তাকেও ধমক দিয়ে উঠল—রাম!

লোকটি এতক্ষণে কথা বললে। শান্ত ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বললে, হামারা হাত ছোড় দিজিয়ে। তার সে কথা বলার ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে নরসিং আশ্চর্য হয়ে গেল। কে বলবে যে, এই লোকটাই কয়েক মুহূর্ত আগে সণ্ডের মত হাত-পা ছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করছিল!

লোকটি আবার বললে, আপনি হামার জান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ হামি তকরার করবে না। লেকেন হাত ছোড়িয়ে দিন।

নরসিংয়ের হাত আলগা হয়ে গেল আপনা থেকে। লোকটি টেনে নিলে নিজের হাত।

লোকটি বললে—গাড়োয়ানের বাত শুনেন তো হামার পাশ। বিচার করেন তো। আঙুল বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে দেখিয়ে সে বললে, উকে হামি বারণ করলাম দফে দফে, বারণ করলাম—মাঠের ভেতর মত্ যাও, গাড়ি খাড়া রাখো মোটরকে পিছে। মোটর চলা যায়গা তো গাড়ি চালাও। নেহি শুনা হামারা বাত। বোলা কি—ধুলা হোগা। আওর উসকা এক বাত—'দেখেন তো, দেখেন তো, মাঠের ভিতর কেমন মজা করে যাব। দেখেন তো।' ফিন হাম মানা কিয়া। মেরে বাত নেহি শুনা। হট্‌সে গাড়ি ঘুমা দিয়া মাঠের উধার—গরু চড় গিয়া নালাকে বাঁধ পর। আপ হর্ন দিয়া; ডরকে মারে গরু মার দিয়া লাফ! বাস্, উলট্ গিয়া গাড়ি। কথা শেষ করে সে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার পর বললে—আর আপ বোলিয়ে তো উসকা কসুর হ্যায় কি নেহি?

নরসিং, রাম, নিতাই তিন জনকেই স্তব্ধ হয়ে থাকতে হল এবার। গাড়োয়ানের অপরাধ এর পর স্বীকার না করে উপায় কি?

লোকটি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলে—তুচ্ছতায়, ঘৃণায় সে হাসি মর্মান্তিক। এবং সে হাসিও সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। হেসে সে বললে—আউর ওই মেইয়া লোকটির বাত শুনবেন? উসকে হামি কিনে আনছি মোশা। আড়াই শও রুপেয়া দিয়া ওকরা বাপকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তিন জনে।

লোকটি বললে—মাইয়া লোকটার পুকুর-ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েছিল চার আদমী—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বগ্‌দী, এক আদমী হাড়ী। কেস হুয়া। উ চার আদমীকে জেল হো গেয়া। লেকেন কেসমে বাপকে দেনা হো গেয়া। গাঁওমে পতিত হুয়া। হাম

দিয়া আঢ়াই শও রুপেয়া উসকো বাপকো। উ বেটিকো দিয়া হামার সাথ—হামারা বাড়িমে ঝিকে কাম করবে। আবার সে একটু থামলে, তার পর প্রশ্ন করলে, বোলিয়ে তো—ওকরা হাসনে কা একতিয়ার হ্যায় ?

নরসিং অবাক হয়ে গেল। সে শুধু ফিরে তাকালে ওই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ঘোমটা কখন দুপুরের বাতাসে উড়ে খসে পড়েছে, কিন্তু সে বোধও তার নাই।

লোকটি আবার হাসলে। তার পর বললে—ই গাড়ি কিসকা হ্যায় ? আপ তো ডেরাইবর হ্যায়।

নরসিং ওই প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে উঠল এবং ওই প্রশ্নে একটু বিরক্তও হল। গাড়ি কিসকা হ্যায় ? সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—হাঁ, ড্রাইভ আমি নিজেই করি। লেকেন গাড়ি হামারা হ্যায়।

নিতাই পরিষ্কার করে দিলে কথাটা—ট্যাক্সি হ্যায়। সিংজীই মালিক হ্যায়, নিজেই ড্রাইভ করতা হ্যায়।

—ট্যাক্সি ?

—হাঁ—হাঁ—ভাড়াকে মোটরগাড়ি।

হাসলে লোকটি—জানতা হ্যায় হাম। লেকেন ইধার কাঁহা যায়গা ট্যাক্সি ?

নরসিং গম্ভীরভাবেই বললে—বাড়ি যাতা হ্যায়, গির্‌বরজা গাঁও জানতা আপ ?

—হাঁ হাঁ।

—ওহি হামারা গাঁও।

—হাঁ, আমি শুনিয়েছি কি ছত্রী লোগের এক লেড়কা ইমামবাজারমে ট্যাক্সি কিয়া হ্যায়। হামারা নাম আপ নেছি শু—? শুখনরাম সাহু, শহর শ্যামপুরমে হামারা গদি। তামাকু চাউলকে কারবার। গির্‌বরজামে হামারা তিন চার খরিদ্দার খাতক হ্যায়।

নামটা নরসিংয়ের পরিচিত, লোকটা মস্ত বড় ব্যবসাদার। কিন্তু ওই উদ্ধত ভঙ্গি নরসিংয়ের ভাল লাগল না। সে বললে—না। কই, আপনার নাম আমি শুনি নাই কখনও। সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরের দিকে অগ্রসর হল। বললে—নিতাই, জল দে রেডিয়েটারে। বেলা অনেক হয়ে গেল।

—আর শুনো—শুনো—কি নাম তুমার ?

নরসিং কথার উত্তর দিলে না। নিতাই কিন্তু লোকটির দিকে ফিরে না তাকিয়ে পারলে না।

—শ্যামপুর পৌঁছা দেগা হাম্রা লোগনকে ?

হেসে নিতাই বললে—কত ভাড়া দেবেন ?

তুমলোক বোলো—কেতনা লেগা ?

এবার নরসিং বললে—লোকটাকে জব্দ করবার জন্তেই—পঞ্চাশ টাকা।

—পচাশ ? ভ্রূকুঞ্চিত করে লোকটি বললে—পন্‌রো মাইল রাস্তা যানেকা লিয়ে পচাশ রুপেয়া ?

নরসিং বললে—গাড়োয়ানটাকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়ে একখানা গরুর গাড়ি দেখ। নে রে নিতাই, মার্‌ হ্যাণ্ডেল।

—রোখো। পচাশ রুপেয়াই দেবে হামি। লোকটা অগ্রসর হয়ে এসে গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়াল।

পঞ্চাশ টাকা। নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নরসিং বললে—দে দরজা খুলে।

লোকটা বিচিত্র লোক। গাড়িতে উঠেই সিগারেট বার করলে। নরসিংকে দিয়ে বললে—লেও ভাইয়া।

নরসিং মাথা নেড়ে বললে—না থাক্‌।

লোকটা পিছনের সিট থেকে উঠে নরসিংয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—কেয়া ভাই—হামার পরে গোসা করিয়েছে তুম্‌হি ? না—কেয়া ? কি কসুর করলাম ভাইয়া ?

নিতাই বুঝেছিল ব্যাপারটা—সে বলে উঠল—কি আপনি তুমি তুমি করছেন বলুন তো ? ট্যাক্সি চালাই বলে আমরা কি ছোটলোক নাকি ?

—আরে রাম-রাম-রাম। রাম কহো ভাইয়া। ইসকো লিয়ে গোসা কিয়া। আরে ভেইয়া বোলিয়ে তো—আপনা লোগসে হামারা কেতনা উমর বেশী হুয়া ? আরে দেখিয়ে তো মাথা হামারা—একদম সব সাদা হোইয়ে গেলো। হামি দাদা—আপলোক ভাই। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

নিতাই এবার হেসে ফেললে, বললে—তা যদি বলেন, তবে কথা নাই।

রাম হি-হি করে হেসেই চলেছিল—সে নিতাইয়ের কানে কানে বললে—লোকটার কানের চুল দেখ মাইরি—যেন রামছাগলের দাড়ি। সে শুধু লক্ষ্য করছিল—লোকটার কোথায় কি হাস্যকর কুশ্রীতা আছে।

নরসিংয়ের পিঠে হাত দিয়ে গুখনরাম আবার বললে—লেও ভেইয়া—পিয়ো সিগরেট। এবার সে নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিলে সিগারেট।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই ক্ষেত্রটাকে লঘু করে তুললে বেশ একটি সরস রসিকতা করে। বললে—দাদা লও—সাওজী আমাদের ঠাকুরদাদা। "ঠাকুরদাদা, পেয়ারা খায়।" না কি সাওজী ?

সাওজী খুশি হয়ে উঠল—বহুত আচ্ছা—পিয়ো, তুম্‌ভি সিগরেট পিয়ো।

রাম হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে হি-হি করে হেসে উঠল—বললে—ওই মেয়েলোকটি আমাদের ঠাকরুন দিদি—না কি সাওজী ?

নরসিং আপনার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি পিছনের দিকে ফিরে দেখলে এবার. দেখলে ওই

মেয়েটিকে। মেয়েটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

শ্যামনগর যেতে পথে পড়ে পাঁচমতি। এই পাঁচমতির কায়স্থবাড়িতে এসে ঢুকেছিলেন—গির্‌বরাজের মা-লক্ষ্মী। এখানকার কায়স্থরা এখনও সমস্ত দেশের মধ্যে নামজাদা ধনী। বনিয়াদী জমিদার। বড় বড় পাকা তিন-মহল চার-মহল বাড়ি—উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা বাগান পুকুর, সে রাজা-রাজড়ার মত কাণ্ডকারখানা। মূল বাড়ি থেকে চার বাড়ি হয়েছিল, চার বাড়ি থেকে এখন আরও অনেক বাড়ি হয়েছে। এখানকার কায়স্থরা শুধু জমিদারই নয়—বড় বড় লেখাপড়া জানা লোক সব। কয়েকজন জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, ডেপুটি তো অনেক, কায়স্থবাড়ির ছেলে যে ছোট কাজ করে, সে সব-রেজিস্ট্রার। উকিল-ব্যারিস্টারও অনেক। মা-সরস্বতীর প্রসাদে কায়স্থরা মা-লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছে।

সেই কথাই তো বলত—নরসিংয়ের দিদিমা। বলত—ওই যে মানুষের মনের মধ্যে সাপের মাথায় মানিকের মত মতি, মানুষ মূর্খ হলে ওই মূর্খামি গোবরের মত মতিকে ঢাকা দেয়, চাপা দেয়। গোবরের তলায় চাপা-পড়া মানিক হারিয়ে যেমন সব অন্ধকার দেখে, মূর্খ হলে মূর্খামির ময়লায় আচ্ছন্ন মতিতে মানুষও তেমনি তখন পৃথিবীতে পথ দেখতে পায় না।

লেখাপড়া শিখবে বলেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়ে মামার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য। সে কি করবে?

চেষ্টার সে ত্রুটি করে নাই। মামার বাড়ির ভাত খেতে তার নুনের দরকার হত না, এক এক গ্রাস ভাত মুখে তুলত আর মামীর এক-একটি কথার হুল এসে বিঁধত—তার ফলে চোখের জল গড়িয়ে মিশত গিয়ে ভাতের সঙ্গে। সেও সে সহ্য করেছিল। তবে তার মামা ধরণী রায় বড় ভাল লোক ছিল। সে ছিল ওখানকার ডাকবাংলোর রক্ষক। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে মাইনে পেত মাসে বারো টাকা। মামা তাকে ইমামবাজারের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিল—ভাগ্নেকে তো ভর্তি করে দিয়ে আসা হল—মাস মাস মাইনে কে যোগাবেন শুনি?

তখন সন্ধ্যাবেলা, মামার গাঁজার মৌতাত ধরে এসেছে, চোখ বন্ধ করে মামা ভুড়ুত ভুড়ুত করে হুঁকোয় টান দিচ্ছিল। মামার কানে কথাটা গেলই না বোধ হয়।

মামী এসে মামার মুখের কাছে চীৎকার করে উঠল—কথা কানে যাচ্ছে না নাকি?

মামা চোখ খুলে বললে এবার—কি? চিল্লাচ্ছিস কেনে তু?

—চিল্লাচ্ছিস কেনে? সাধে চিল্লাই—বলি ভাগ্নের মাইনে কে দেবে?

মামা খুব গম্ভীরভাবে কয়েক মুহূর্ত মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মামী বললে—তাকিয়ে আছে দেখ, যেন আমাকে ভস্ম করে দেবে!

মামা উঠে দাঁড়াল। মামী সরে এল খানিকটা।

গোঁফে তা দিয়ে মামা বললে—হাম দেগা। আমি বাবু ধরণীধর রায়, আমার ভাগ্নে, আমি মাইনে দেব।

—বাবু ফরনীকর রায়। বাবু! মাইনে মাসে বারো টাকা। বারো রুপেয়াকে বাবু!

মামা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে গিয়ে মামীর ঘাড়ে ধরে বেশ ঘা-কতক বসিয়ে দিলে। আমি বারো রুপেয়াকে বাবু? বারো রুপেয়াকে বাবু হ্যায় হাম? তারপর তাকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে বার করে দিলে—নিকালো। নিকালো। আভি নিকালো।

দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নরসিং; তার মনে হয়েছিল—সমস্ত অপরাধ তার। ছি-ছি-ছি! কেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সমস্ত রাত্রি সে সেদিন কেঁদেছিল। মামী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছিল অন্য দরজা দিয়ে।

মাসে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ দিন অন্তর এই ধরনের কিছু-না-কিছু ঘটত। এ ধরনের 'যা-কিছু, সে অবশ্য ঘটত সন্ধ্যার পরে। সকালবেলাতেই মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি নিয়ে গোঁফে তা দিয়ে মামা বেরিয়ে যেত—ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে শনের দড়ি পাকাত—সামনে খোলা জায়গায় তার গরুগুলি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াত। এগারোটায় মামা বাড়ি ফিরত। নরসিং তার আগেই ইস্কুলে বেরিয়ে যেত। মামার অনুপস্থিতিতে মামী শোধ তুলত তার উপর। নরসিং আসবার পর থেকেই তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকালে যথানিয়মে উঠে কাজ-কর্ম সারত আর নিজের অদৃষ্টকে গাল পাড়ত। এইতেই নরসিংয়ের সব চেয়ে বেশী ভয় হত। আজও মামীর কথা মনে করতে গেলে তার ওই সকালের সেই ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত রূপই সর্বাগ্রে মনে পড়ে, সে আজও শিউরে ওঠে। মামী সকালে দরজা খুলে বেরিয়েই আরম্ভ করত—ঝাঁটা মারি, ঝাঁটা মারি নিজের অদেষ্টকে। মরণ হয় তো শরীর জুড়োয়, হাড়ে বাতাস লাগে। বিধাতা মুখপোড়ার দেখা পাই তো একবার জিজ্ঞাসা করি—তোর করণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে ডাকত বাউড়ী ঝিটাকে—বলি ওলো ও হারামজাদী,—ও গতরখাকী! বলি আর আসবি কখন? তার পর পড়ত নরসিংয়ের উপর—আরে তুমি তো বাবা নবাবজাদা, বাদশাহের ভাগ্নে, তোমাকে তো কিছু বলবার জো নাই আমার। পড় বাবা পড়, পড়ে হাকিম হবে—আমীর হবে—আঁটকুড়ো মামাকে পিণ্ডি দেবে—মামা বত্রিশটা দাঁত বার করে সোনার রথে চড়ে সগ্‌গে যাবে।

বলে হনহন করে গিয়ে গরুগুলোকে বাইরে বার করত। ফেরবার পথে আবার বলত—দিব্যি দিয়ে রাখছি তোমাকে, আমাকে যেন পিণ্ডি দিও না তুমি।

মামার গলার শব্দ শোনা যেত এই সময়, মামা ফিরত প্রাতঃকৃত্য সেরে। মামী আবার ঘুরে পড়ত মামার উপর। গাঁজার সরঞ্জাম, আয়না-চিরুনি, কাপড় বার করে দিত আর বলেই চলত—এ পোড়া দেহ পাত হলেই বাঁচি, আমার খেয়ে সুখ নাই, ঘুমিয়ে শান্তি নাই, খেটে-খেটে আমার পরমায়ু কমে গেল। দেহের সুখ-অসুখ নাই, মনের ভাল-মন্দ নাই, বারো মাস সেই বাঁদীগিরি।

মামা বলত—থাক্ থাক্, আমি নিজেই সব নিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

—না না না। এত 'ছেন্দায়' কাজ নাই।

—না। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমার হাত-পা আছে। আমি

অক্ষম নই।

—ভাল হবে না বলছি। আমি মাথা খুঁড়ব। বলতে বলতে মামী সব জিনিসপত্র এনে নাবিয়ে দিত। মামা জিনিসপত্রগুলিকে সরিয়ে দিয়ে বলত—নেই লেগা হাম। নেই লেগা। বলে জিনিসগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত—যেখানে ছিল সেইখানে। মামী চীৎকার করত—যদি না নাও তো আমার মরা মুখ দেখ। তা হলে মাথা খাও।

মামা আবার জিনিসগুলি নিয়ে বসত যথাস্থানে।

মামা চলে গেলেই ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে আবার এক দফা শুয়ে পড়ত। কোনদিন মরা বাপের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজেই নিজের মাথা টিপত আর কাতরাত।—ও বাবা, ও মা! তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু হত। ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে মামী উঠে বসে কিছুক্ষণ হাই তুলত, আড়ামোড়া ভাঙত, তার পর আরম্ভ করত ভাঁড়ার ও রান্নার কাজ। এর মধ্যেই বেজে যেত সাড়ে ন'টা, দশটা।

সভয়ে নরসিং বলত—ইস্কুলের বেলা হল মামী।

মামী বলত—তার মামী কি করবে বাবা?

নরসিং একটু ভেবে বলত—চারটি মুড়ি দাও আমাকে।

মামী বলত—মুড়ি এখন দু-দিন ভাজতে নাই, পান্তাভাত আছে, খাও তো খাও।

পরদিন নরসিং পান্তাভাতই চাইত, কিন্তু মামী বলত—পান্তা কটা যদি তোমাকেই দোব, তবে ঝিয়ের পাতে দোব কি আমি? মুড়ি দিচ্ছি গেলো, গিলে যাও।

রাত্রে ভাত খেত মামার সঙ্গে। তখন ইচ্ছে হত রাক্ষসের মত খায় সে, কিন্তু মামীর ভয়ে ভাত সে দ্বিতীয়বার চাইতে পারত না।

দেড় মাস। দেড় মাস সে মামার বাড়িতে ছিল। দেড় মাসের মধ্যেই নিজেই বুঝতে পারলে, সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইস্কুল দু-মাইল পথ, এই পথটা হাঁটতে সে দু-তিনবার বসত—পথের ধারের গাছতলায়। দেড় মাস পরে হঠাৎ সেদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল। মামা কেমন করে জেনে ফেলেছিল—নরসিংয়ের দিনে ভাত না পাওয়ার কথা।

মামী স্পষ্ট বলে দিলে মুখের উপর—আমি পারব না, পরের ছেলের জন্যে দশটায় ভাত রাঁধতে আমি পারব না।

মামী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যেন। সে নরসিংকে বলে উঠল—মর্—মরে আমার পেটে আয়—আমি তখন—

মামী কথা শেষ করতে পায় নাই। মামা চীৎকার করে উঠেছিল জানোয়ারের মত। নরসিংও সে চীৎকারে আঁতকে উঠেছিল। মামী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পরেই সে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়েছিল।

মামা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে নরসিংয়ের হাত ধরে বলেছিল—চল—আও হামারা সাথ।

টেনে—প্রায় টানতে টানতে নরসিংকে নিয়ে গিয়ে মামা উঠেছিল—ইমামবাজারে রাধাশ্যামবাবুর বাড়ি। বাবুদের কয়লার ব্যবসা আছে, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের কন্ট্রাক্টরি করে, জমিদারিও কিছু আছে, বাবুরা বড়লোক ; শুধু বড়লোকই নয়, অন্নদান করে বাবুরা। দু-তিনটি ছাত্র বাবুদের বাড়িতে খেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ধরণী রায় ডাকবাংলোর অনেক দিনের কীপার ; ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তাকে ভালোওবাসে এবং তাদের হুকুম নিয়ে অনেক দিন থেকেই কন্ট্রাক্টার হিসাবে বাবুদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা করে, এই দাবিতে ধরণী রায় নরসিংকে নিয়ে এসে বাবুর সামনে নমস্কার করে দাঁড়াল—এই আমার ভাগ্নে। ইস্কুলে পড়ছে। ওকে চারটি করে ভাত আপনাকে দিতে হবে।

নরসিং সবিস্ময়ে চারিদিক্ দেখছিল। গির্‌বরজার বাইরে তার জীবনের পরিচয় খুব বেশী নয়, তবে পাঁচমতি বার-কয়েক গিয়েছিল—পাঁচমতির ধন-ঐশ্বর্য, জাঁক-জমক সে দেখেছে ; সে ধন-ঐশ্বর্যের কাছে এ বাড়ির ঐশ্বর্য কিছু নয়, তবুও ছোটখাটোর মধ্যে হালকা অথচ ঝরঝরে তকতকে ব্যবস্থা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাঁচমতির বাবুদের আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পিলখানায় হাতি আছে, একটা লম্বা বারান্দায় পাল্কি ঝুলানো আছে, সহিস মাহুত বেহারা সর্দার, সে অনেক ব্যাপার। এখানে কাঠের তাকের উপর রাখা আছে চারখানা চকচকে দু-চাকার গাড়ি। দুজন হাফপ্যান্ট-পরা ছোকরা ন্যাকড়া দিয়ে আরও দুখানা গাড়ি বারান্দায় পরিষ্কার করছে। হঠাৎ ভট্ ভট্ শব্দ করে একখানা জবরদস্ত দু-চাকার গাড়ি এসে দাঁড়াল। মোটা চাকা—অনেক কলকজা—পিছনের দিকে নল থেকে ভক-ভক করে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে এল। গাড়ি থেকে নামল—একেবারে ফিটফাট সায়েবী-পোশাক-পরা—একজন অল্পবয়সী বাবু। নেমেই টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে খট-খট করে এসে ঘরে ঢুকল।

মামা ধরণী রায় খুব সম্ভ্রমভাবে নমস্কার করে বললে—এই আমাদের মেজ হুজুর চলে এসেছেন। আর ভাবনা নাই।

—বল কি রায়। আমার জন্যে কোন্ দুর্ভাবনায় তোমার ঘুম হচ্ছিল না। নাও একটা সিগারেট খাও। তার পর ধীরেসুস্থে শোনা যাবে তোমার দুর্ভাবনার কথা।—বলে মেজবাবু একটা টিন খুলে একটা সিগারেট বার করে দিলে। মেজবাবুর কথার ধরনের মত কথার ধরন নরসিং এর আগে কখনো শোনে নাই। অদ্ভুত লাগছিল তার মেজবাবুকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তার মনকে আকর্ষণ করছিল ওই কলকজা-ওয়ালা দু-চাকার গাড়িটা। ইচ্ছা হচ্ছিল ওটাকে সে একবার নেড়ে দেখে। একবার ছোঁয়। শুধু ছুঁয়ে দেখা।

মেজবাবুর সেই মোটর-সাইকেলটা তার জীবনে এমন রঙ ধরিয়েছিল যে, সে রঙ এখনও ফিকে হল না। তার বড় ইচ্ছা ছিল—ঠিক মেজবাবুর মত চোখে একটা নীল চশমা এঁটে ঐ গাড়িটাতে চেপে পায়ের চাপে সেই পাদানির মত হ্যাণ্ডেলটাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটাকে ছেড়ে দেয়। উড়ে চলে গাড়িটাতে চেপে। তার মনে হত গাড়িটা রাস্তার উপর দিয়ে চলে না—শূন্যলোক দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার বাঁকের মুখে প্রায় কাত হয়ে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে চলে যায় দকলের দৃষ্টির বাইরে। সে আর তার হল না। কোথায় যে চলে গেল গাড়িখানা, তার

পাত্তা আর নরসিং পায় নাই। মেজবাবুর মৃত্যুর পর গাড়িখানা কিনেছিল তার এক বন্ধু সার্কেল-ডেপুটি। সে বদলি হয়ে চলে গেল। তারপরও খোঁজ করেছিল নরসিং—ফিরবার জন্যে অবশ্য নয়, এমনি খোঁজ করেছিল ওই শখে—ওই মায়ায় খোঁজ করেছিল। জেনেছিল সার্কেল-ডেপুটি গাড়িখানাকে বিক্রি করেছে একজন আবগারীর সায়েবকে।

মেজবাবুর জিনিস—জিনিসটাকে রাখবার জন্যে সবাই অনুরোধ করেছিল বড়বাবুকে। কিন্তু বড়বাবু সে লোকই নয়। হিসেব-নিকেশ-লোকসান না দেখে বড়বাবু কিছু করে না। কিন্তু সব হিসেব বাঁকা। সহজ নিয়মে হিসেব বড়বাবু করে না।

মেজবাবুর ছিল দরাজ মেজাজ; মামা ধরণী রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলে—বেশ তো, এ আর এমন কি কথা। থাকবে তোমার ভাগ্নে। পড়ুক।

বড়বাবু চুরুট টানছিল—এতক্ষণে বললে—তোমাদের ওভারসিয়ারবাবু কবে আসবেন হে? খরচপত্র করে পাথরকুচিগুলো জমা করলাম, আর সেগুলো এক কথায়—'নেব না' বলে দিলেন তিনি। ওভারসিয়ারবাবু এলে তুমি বলবে তাঁকে, বুঝলে?

তেরশ ছাব্বিশ সালের বাইশে ফাল্গুন—ওই দিনটা মনে আছে নরসিংয়ের; ইমামবাজারে রাধাশ্যামবাবুর বাড়িতে সে ঢুকেছিল।

নিতাই তাকে সজাগ করে দিলে। সিংজী!

—হুঁ।

—ধুলোর নীচে বেজায় 'গচকা'—আরও স্পীড কমিয়ে দ্যান। তা ছাড়া—

আশেপাশে সে তাকিয়ে দেখল। দেখে বললে—মাঠ দিয়ে ভাঙুন বরং। গচকাও বাঁচবে আর গাড়িগুলাকেও 'পাস' করে যাওয়া হবে। শালা গাড়ির 'রইট' লেগে গিয়েছে রে বাবা!

গাড়ির স্পীড কমানো সত্যই দরকার, পুরু ধুলোর নীচে কোথায় খানা-খন্দর আছে বুঝবার উপায় নাই। এ রাস্তায় উঠেই সে কথা নরসিংয়ের মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন কথাটা সে ভুলে গিয়েছে। তা ছাড়া গাড়িতে প্যাসেঞ্জার চড়লেই কেমন একটা জোরে যাবার তাগিদ আপনা থেকেই মনের মধ্যে এসে পড়ে। প্যাসেঞ্জার গাড়িতে বসলেই তার তাঁবেদারি করতে হয়, 'রোখো' বললেই রুখতে হবে, 'জলদি কর' বললেই স্পীড বাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই খালাস—টাকাটাও পকেটে এসে যায়। ওই পাঁচথুপির কায়স্থবাবুদের দালানগুলোর চিলেকোঠার মাথাগুলি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে এই তাগিদটা তার হুঁশিয়ারি-বোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সে তার খেয়াল ছিল না। গাড়িটা বড় ঝাঁকানি খাচ্ছে, 'বডিটা' দুলছে, স্প্রিংয়ে মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে। তা ছাড়া সামনে চলেছে সারিবন্দী গরুর গাড়ি। সামনে আসছে আবার একটা নদীর ঘাট। এই ছোট গ্রাম্য রাস্তাটা ওই নদীর

ঘাটে নবাবী আমলের পুরনো বড় সড়কের সঙ্গে মিশেছে। নদীর ঘাটটায় মস্ত একটা বাজার। বড় বড় গাছের ছায়ার তলায় গরুর গাড়িগুলি রেখে যাত্রীরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে।

নদী পার হয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুর্শিদাবাদ। এপার থেকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পার হয়ে বর্ধমান। নরসিং যে রাস্তাটায় আসছে সেটা আসছে রামনগরের ঘাট থেকে। মধ্যে মধ্যে আশপাশ থেকে দু-চারটে গ্রামের পথ এসে মিলেছে। সারিবন্দী মানুষ চলেছে, অধিকাংশই হাটুরের দল—কাঁধে ভার নিয়ে—মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে—পাঁচমতির হাটে সারিবন্দী গাড়ি চলেছে—কতক গাড়িতে চলেছে মাল—কলাই, পেঁয়াজ, সরষে, আলু; দেশান্তরে নিয়ে চলেছে—বিক্রি করে ধান কিনে আনবে। কতক গাড়িতে চলেছে যাত্রী। মামলা-মকদ্দমার যাত্রীই বেশী, শ্যামপুর আদালত মুর্শিদাবাদ আদালত চলেছে সব। এ ছাড়াও যাত্রী আছে বইকি। মানুষের কাজের কি অন্ত আছে।

রাস্তাটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত। বিস্তীর্ণ মাঠের চারিদিক পরিষ্কার—শুধু মাঝখানে একটা ধুলার বিরাট কুণ্ডলী চলে গিয়েছে—রেলের ইঞ্জিনের পিছনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠল এবার।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এবার যেন মানুষের রাজ্য এল। মানুষ চলছে, পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, হোক গরুর গাড়ি—গাড়ি চলছে—গরুর খুরে, গাড়ির চাকায় ধুলো উড়ছে—শুধু উড়ছে নয়—চলছে; উড়ে চলেছে—গাড়ির টাপরে—চাকায়—গরুর খুরে—মানুষের গায়ে লেগে চলেছে, এখান থেকে ওখান।

নিতাই বললে—ডাইনে ওই দেখুন—ওই জায়গাটায় ধানের গাড়ি যাবার পথ ছিল—কাটা রয়েছে—পগার। ওইখানে—

—হুঁ।

পিছনে তাকিয়ে দেখল নরসিং, সাহজী খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মেয়েটি কখন জেগেছে, সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের ওই ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে হল—গাড়ির চাকায় লেগে দু-এক টুকরো মাটি যেমন চলেছে এদেশ থেকে ওদেশে—মেয়েটিও চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

নরসিং গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলে; ক্লাচে পা দিয়ে স্টীয়ারিংয়ের গোল মাথাটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের চাকা দুটো মোড় ফিরে—ধীরে ধীরে মাঠের ভিতরে এগিয়ে গেল। নিতাই ভাল বলেছিল—মাঠের পথ অনেক ভাল।

পাঁচ

নদীর ঘাট পার হয়ে পাঁচমতি গ্রামখানাকে পাশে রেখে রাস্তা চলেছে শ্যামনগর। এবার রাস্তা অনেক ভাল। পুরনো বাদশাহী সড়ক, দুখানা গাড়ি পাশাপাশি চললেও দু-পাশে খানিকটা করে পথ পড়ে থাকে সংকীর্ণ ফুটপাথের মত। স্থানে স্থানে তিনখানা গাড়ি চলবার মত প্রশস্ত। আগে আরও প্রশস্ত ছিল। এখন দু-পাশের ধানজমির মালিকেরা পথ কেটে কেটে জমির অন্তর্গত করে নিয়েছে। চাষীদের ওই একটা রোগ। সেকালে, মনে পড়ে নরসিংয়ের, এক চাষী তাদের গ্রামের ছোট পথটার পাশ কেটে রাস্তাটা এমন ছোট করে দিয়েছিল যে, গরুর গাড়ি যাওয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; চাষীকে ডেকে শাসন করেছিল তার জেঠা মাধব সিং ; বলেছিল—তু শালা ছিঁচকে চোর। আধা হাত, আধা হাত হর-বরিষ কাটিয়ে লেও। নজর মে আসে না। আরে শালা মরদ হো, তুমারা হিম্মৎ হ্যায় তো লাঠিকে জোরসে লে লেও যেতনা ইচ্ছা হোয় তুমারা—দেখে একদফে। চাষীকে দিয়ে সেই বছরই মাধব সিং সে রাস্তা ঠিক করে নিয়েছিল। এখানে কে রাজা, কে গোঁসাই। ডিস্ট্রিক-বোর্ডের ওভারসিয়ার বাইসিক্‌ল্ হাঁকিয়ে আসে যায়—চোখে তার এসব পড়ে না তা নয় ; চোখে পড়ে, হাঁকডাকও করে ; শেষ পর্যন্ত পকেটে কিছু পুরে নিয়ে যায়।

রাস্তা শ্যামনগরের দিকে যত অগ্রসর হয়েছে অবস্থাও তত ভাল হয়েছে। মেটে সড়ক হলেও রাস্তা বেশ সমতল। কিন্তু গাড়ি এবং যাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি আসছে শ্যামনগর থেকে। এখানে বলে 'কেরাচি গাড়ি'। শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত প্রতি শেয়ারে আট আনা ভাড়া। অধিকাংশই মামলা-মকদ্দমার যাত্রী। বিকেলের দিকে 'কেরাচি গাড়ি'র সংখ্যা বাড়বে। পাঁচমতি পর্যন্ত যাবে, রাত্রে সেখানে থাকবে, পরদিন আটটায় যাত্রী নিয়ে আবার ছুটবে শ্যামনগর।

—আর তো রাস্তা ভাল আসিয়ে গেলো, জোরসে চালাইয়ে দাও ভাইয়া।—পিছন থেকে তাগিদ দিলে শুখনরাম।

পিছন ফিরে তাকালে নরসিং।

—জোরসে—জোরসে। স্পীড বাড়াইয়ে দিন। শুখনরাম আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিলে নরসিং। শুখনরামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সীটের অপর যাত্রীটিকেও দেখবার ইচ্ছা হল। এ ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাত্রী যাত্রিণী হলে মুখ ফিরিয়ে দেখার বিপদ আছে। সঙ্গের পুরুষেরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। লোকের রাগকে সে ভয় করে না, কিন্তু বদনামকে ভয় আছে। প্যাসেঞ্জার কমে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে এমন ড্রাইভারের গাড়িতে উঠতে চায় না লোকে। এ ক্ষেত্রে সামনে-পিছনে গাড়ি এবং পথিক দেখবার জন্য যে আয়নাটা আছে, নরসিং সেটাকে একটু ঘুরিয়ে দেয়। পিছনের রাস্তার বদলে তখন গাড়ির ভিতরটা দেখা যায়। আয়নাটা ঘুরিয়ে দিলে সে।

নিতাই একটু হাসলে। এর গূঢ় অর্থ নিতাইয়ের কাছে অজ্ঞাত নয়।

আয়নায় মেয়েটির মুখ ভেসে উঠেছে। মেয়েটি হাসছে বলে মনে হল। অতি মৃদু হাসি। আয়নার মধ্যেই মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল, আয়নার দিকে তাকিয়েছে মেয়েটি। চোখ নামিয়ে নিলে সে। আবার তাকালে। এবার একটু ঘোমটা বাড়িয়ে দিলে। মেয়েটির মুখের হাসিটুকু আশ্চর্য! ঠোঁটের কোল ছাড়া আর কোথাও এতটুকু চিহ্ন নাই, চোখের কোণে না, নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বাঁকা দাগে পর্যন্ত না।

—বাঁয়ে—বাঁয়ে। বাঁয়া রাস্তাসে। শুখনরাম হাঁকলে।

শ্যামনগরের প্রবেশমুখে রাস্তাটা তিনটে রাস্তায় বিভক্ত হয়েছে। একটা সোজা চলে গিয়েছে, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে।

এ রাস্তাটার উপর মাল-বোঝাই গরুর গাড়ির ভিড় বেশী। ধানের কারবার, কলাই, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলুর আড়ত, জ্বালানী কাঠের আড়ত, দু-একটা কয়লার ডিপো। তারই মধ্যে শুখনরামের গদি ; ধান, চাল, তামাকের ব্যবসা। পাকা বাড়ি আপাদমস্তক শিক দিয়ে ঘেরা। বারান্দায় তক্তপোশের উপর তোশক এবং চাদর পেতে মালিকের বসবার জায়গা। মালিকের বসবার জায়গায় বসে আছে শুখনরামের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে।

শুখনরাম বললে—বাস রোখো, রোখো।

শুখনরাম নামল। সর্বাগ্রে সে হুকুম দিলে—ছোট পেটিয়াটা আগে নামাও। তামাকের ছোট একটি পেটি। ওটাকে সে সঙ্গে নিয়েছিল। শুখন ছেলেকে বললে—একদম উপরে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা হয় যেন—নিজে দেখবি।

ছেলে বললে—উ জেনানী ?

শুখন ধমকে উঠল মেয়েটাকে—এই, উতারো। এই হরামজাদী কুত্তী!

আয়নার ভিতর দিয়ে নরসিং তখনও তাকিয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও মধ্যে মধ্যে তাকে দেখছিল ; ধমক খেয়ে চমকে উঠল সে। তার পর আত্মসংবরণ করে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

শুখন বললে—ভিতরে নিয়ে যা। ঝি। নতুন ঝি একঠো নিয়ে এলাম। নরসিং নেমে এসে দাঁড়াল।—ভাড়া ?

শুখন বললে—ভাড়া লেও। লেকিন বহুত বেলা হইয়েছে, খানাপিনা করো—আস্নান করো।

নরসিং কি ভাবলে। তার পর বললে—আমরা আজ কাল দুটো দিন এখানে থাকতে চাই। একটু জায়গা দেবেন থাকতে ?

শুখন নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকালে, তার পর একজন কর্মচারীকে সে বললে—একঠো কামরা দে দেও সিংবাবুকো।

নিতাই বললে—পুকুর কোথা খোঁজ লেন, গাড়িখানাকে ধুতে হবে তো।

রাম হাঁ করে সব দেখছে। অবাক হয়ে গিয়েছে সে। ভয়ও পেয়েছে সে। শুখনরামের ভুঁড়ি দেখে, কানের চুল দেখে, সে হি-হি করে হেসেছে।

সন্ধ্যার সময় নরসিং এসে বসেছিল—সেই তে-মাথার মোড়ে। নিতাই এবং রামও সঙ্গে আছে। তে-মাথার মোড়ের পাশে একটা গাছের তলায় এক পাঁইট মদ এবং খানিকটা মাংস নিয়ে বসেছে। নরসিং গম্ভীরভাবে সমস্ত দেখছে, নিতাই মধ্যে মধ্যে মদের গেলাস পূর্ণ করে এগিয়ে দিচ্ছে। নরসিং গেলাস খালি করে নিতাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বলছে—রাম!

রামের কাছে আছে মাংসের পাত্রটা। সে-ই মাংস পরিবেশন করছে; হাড়ীর ছেলে নিতাই মাংসটা ছুঁয়ে নেড়ে সিংজীর হাতে তুলে দিতে চায় না। বলে, আপনারা ছত্রী, বামুনের নীচেই আপনারা।

খানিকটা মাংস রাম দাদাবাবুর হাতে তুলে দিলে।

নরসিং বললে—নিতাইকে দে মাংস।

নিতাই বললে—পাকিয়েছে ভাল মাংসটা। ঝাল একটুকুন বেশী। তা—। হেসে বললে, এ মুখে ঝাল ভাল লাগে।

নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

নিতাই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—সিংজী!

নরসিং তার দিকে ফিরে চাইলে।

—কি ভাবছেন বলেন তো আপনি?

নরসিং আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বাদশাহী সড়কের উপর প্রসারিত করে দিলে। ছ্যাকরা গাড়ি চলেছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ি চলেছে, মানুষের সারি চলেছে। ছ্যাকরা গাড়ি আসছে, টাপর-ছাওয়া গাড়ি আসছে, মানুষ আসছে পায়ে হেঁটে।

মদের নেশায় নরসিংয়ের মনে খানিকটা ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। তার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় সে রোজ সকালে ভাঁড়ার ঘরের দোরে বসে পিঁপড়ের সারি দেখত। বাড়ির যেখানে যত পিঁপড়ে সব সারি বেঁধে এসে ঢুকত ভাঁড়ার ঘরে, আবার বেরিয়ে যেত ছোট ছোট এক একটি দানা মুখে নিয়ে। ও ব্যাটাদের বুদ্ধি নাই, থাকলে উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘর পর্যন্ত যদি কেউ একটা পিঁপড়ের মোটর সার্ভিস খুলত—তবে খুব ভাল সার্ভিস চলত।

নিতাই আবার ডাকলে—সিংজী!

নরসিং বললে—গাড়ি গোন্, গাড়ি গোন্, যা বলেছি তাই কর্।

রাম ছ্যাকরা গাড়ি গুনছে। নিতাইয়ের গণনাশক্তি মন্থর, সে গুনছে টাপর-দেওয়া গরুর গাড়ি। পথের লোক গুনবার দরকার নাই।

নিতাই একটা সিগারেট সিংজীকে দিয়ে নিজে একটা নিলে, দেশলাই জ্বালিয়ে সিংজীকে এগিয়ে দিলে আগুন, নিজে ধরালে, বাক্সটা ছুঁড়ে দিলে রামকে। তার পর হঠাৎ বললে—একটি কথা আপনাকে বলব আমি।

নরসিং তার দিকে ফিরে তাকালে।

—অভয় দিচ্ছেন তো?

নরসিং প্রসন্নভাবে একটু হাসলে।

নিতাই বললে—রাম, গরুর গাড়িসুদ্ধ শুনবি। সিংজীর সঙ্গে ঝগড়া আছে আমার।

নরসিং আরও একটু হাসলে।

নিতাই বললে—হাসবেন না। নালিশ আছে আমার। সাংঘাতিক নালিশ। হ্যাঁ। সে বলে দিচ্ছি আমি—হ্যাঁ। 'না' বললে শুনছি না আমি।

গম্ভীর ভাবেই এবার নরসিং বললে সর্বশক্তিমান প্রভুর মত—বল্। কি নালিশ তোর শুনি।

নিতাই বললে—বলব?

—ব—ল্। বলছি তো।

—রাম বড় হয়েছে কিনা।

নরসিং বললে—বড় ইল্‌চে ওটা।

নিতাই সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করার মত ঘাড় নেড়ে বললে—একশ বার। হাকিমের মত কথা। ফ্যাক—ফ্যাক—ফ্যাক। হেসেই আছে।

নরসিং বললে—তুই ওকে মদ দেবার কথা বলছিস, কিন্তু বেলেল্লাগিরি করবে ও।

—খুন করে ফেলব। কি রে করবি, বেলেল্লাগিরি?

রাম মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালে—না, বেলেল্লাগিরি সে করবে না।

নিতাই চট করে এক গেলাস মদ ঢেলে নরসিংকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেন, পেসাদ করে দেন।

নরসিং মদের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু ভাবলে—তারপর বললে—নে, তাই নে। মদ তো খাবিই, আজ হোক আর কাল হোক। যার তার কাছে খাবি, তার চেয়ে আমার কাছে খা। নে। মদের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে গেলাসটা বাড়িয়ে ধরলে। নে নে। লজ্জা নাই এতে। নে।

সলজ্জ ভাবেই রাম এগিয়ে এসে গেলাসটা হাতে নিলে এবং একটু মুখ ঘুরিয়ে গেলাসটা মুখে তুললে। কিন্তু বাধা দিয়ে নিতাই প্রায় গর্জন করে উঠল, এইয়ো। এই রামা। তর সইছে না উল্লুক কাঁহাকা। লেও, আগাড়ি গুরুজীকে পাঁওকে ধুলা লেও, প্রণাম কর্ বাঁদর।

লজ্জায় জিভ কাটলে রাম। এ বড়ই কসুর হয়ে গিয়েছে। সে প্রণাম করলে নরসিংকে, পায়ের ধুলো নিলে। নরসিং বললে—খবরদার, মদ খাবি কিন্তু মাতলামি করবি না।

পাঁইট বোতল; দু-জনের জায়গায় তিন-জন খানেওয়ালা জুটেছে, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, অথচ নেশা এখনও জমে নাই। সংসারটা নিতাইয়ের কাছে এখনও উদাস মনে হচ্ছে না। সে-ই বললে, গুরুজী। আর এক পাঁট আনি।

নরসিংয়েরও এখনও জমে নাই। মেঠো পথে গাড়ি চালিয়ে এসে শরীরের অবসাদ এখনও যায় নাই। সে রামের দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে নিলে। নাঃ, রামা ঠিক আছে। ঘোড়াটা সিদ্ধি খেয়ে হাসে, মদ খেয়ে গম্ভীর হয়েছে। হাজার হোক ছত্রীর বাচ্চা।

—গুরুজী।

—হাঁ—আর এক পাঁট চাই।

—নিয়ে আসি। নিতাই উঠল।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে নরসিং বললে, চল্ সবাই যাব। দোকানে বসে খাব। বোস্, হিসেবটা করে নিই। রামা, তোর ঘোড়ার গাড়ি কখানা?

—ঘোড়ার গাড়ি? কখানা? রাম শঙ্কিত হল, মদ খাওয়ার পর আর তার গুনতে মনে নেই।

নরসিং আবার প্রশ্ন করলে—গুনতে ভুলে গিয়েছিস বুঝি?

—আটখানা পর্যন্ত গুনেছি।

—গরুর গাড়ি?

নিতাই জবাব দিল, সে অ্যানেক। চলছেই—চলছেই—কুড়ি-পঁচিশখানা তো খুব।

এতেই নরসিংয়ের হবে। এর চেয়ে সঠিক হিসেব সে কল্পনা করতে পারে না। চার আটে বত্রিশ, কুড়ি দুগুনে চল্লিশ। বত্রিশ আর চল্লিশে—বাহাত্তোর। হুঁ। নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নরসিং বললে—চলবে। বুঝলি রে নিতাই, চলবে।

নিতাই হাসলে পাকা সমঝদারের মত। হেসে বললে,—সে আমি বুঝেছি।

—তে-মাথায় এসে যখন গাড়ি গুনতে বলেছেন—তখুনি বুঝেছি। না বললেও বুঝে নিয়েছি। পাঁচমতি পর্যন্ত সার্ বিস?

নরসিং বললে—চল্, এবার দোকানে যাই। শহরের সার্ভিসের বাস ট্যাক্সি সব এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ড্রাইভারেরা সব ওখানেই আসবে। চল্।

নিতাই হেসে বললে—পেরথমে আমি কি মনে করেছিলাম জানেন?

নরসিং ভাবতে ভাবতেই চলেছে, এ সব কথায় কোন আসক্তি নাই তার, কোন আকর্ষণ সে অনুভব করছে না। ভাবছে সে অনেক কথা। আট মাইল পথ, যাওয়া-আসা এক ট্রিপ ষোল মাইল। এক গ্যালন তেল। ঘোড়ার গাড়ির শেয়ার আট আনা। প্রথমে আট আনার চেয়ে বেশী ভাড়া করলে চলবে না। ন আনাও চলতে পারে। মোটরে চড়ার ইজ্জৎ, তাড়াতাড়ি যাওয়া, আরামের জন্যে এক আনা দেবে না লোকে? এতক্ষণেই মনে হল, না, দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের অধিকাংশই কোর্ট-প্যাসেঞ্জার। জমিদারের গোমস্তা, মহাজনের কর্মচারী, চাষী রায়ত, দেনদার গৃহস্থ। জনকতক কোর্টের কেরানীও আছে। বাড়িতে খেয়ে তারা ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। আধ পয়সার বিড়ি কেনে, দু পয়সার বেগুনি ফুলুরি কিনে ঠোঙায় নিয়ে চায়ের সঙ্গে খায়। তারা কখনো এক আনা বেশী দেবে না। দেবে যখন নিরুপায় হবে, যখন ঘোড়ার গাড়ি আর থাকবে না, তখন দেবে। ঘোড়ার গাড়িগুলোর

সঙ্গে প্রথমে একবার লাগবে রেষারেষি। ওরা শেয়ারের দাম নামাবে। আট আনা থেকে সাত আনা—ছ আনা। চার আনাতেও নামতে পারে। তখন ?

মনে পড়ে গেল মেজবাবুকে।

মেজবাবুই প্রথম মোটর-বাস কিনে ইমামবাজার থেকে জংশন স্টেশন পর্যন্ত সার্ভিস খুলেছিলেন। ছোট রেলের সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে বাস চালিয়েছিলেন। এই যাত্রী গণনা করার পদ্ধতি তাঁরই কাছে শিখেছিল নরসিং। পনেরো দিন নরসিং স্টেশনে গিয়ে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রীসংখ্যা গুনে আসত। রেল-কোম্পানিও বাস সার্ভিসকে জব্দ করবার জন্ত ভাড়া কমিয়েছিল, মেজবাবুও কমিয়েছিলেন। দরকার হয়, সেও ভাড়া কমাবে।

নিতাই অনেকক্ষণ থেকে কথা বলবার জন্ত উসখুস করছে। সে বললে—গুরুজী।

—হুঁ।

খুব সরস করে নিতাই মৃদুস্বরে বললে—পেরথমে আমি কি ভেবেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম, মেয়েটার ওপর আপনার টান পড়ে গিয়েছে। সেই টানে বোধ হয় থেকে গেলেন।

নরসিং এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তে তার মন ঘুরে গেল, মনে পড়ে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটির মুখের আশ্চর্য হাসিটুকু চোখের উপর ভেসে উঠল। তার বিপত্নীক জীবনের উত্তাপ মুহূর্তে যেন আগ্নেয়গিরির গর্ভের অবরুদ্ধ উত্তাপের মত অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে চঞ্চল অস্থির করে তুললে। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললে—বোতলটা দেখি।

নিতাই বললে—না, কিনলেন তো নাই। চলুন দোকানে চলুন।

রাম এবার এগিয়ে এল; নরসিংকে শুনিয়ে নিতাইকে সে বললে—কাল আমি ঠিক সাওজীর বাড়িতে ঢুকে পড়ব। মেয়েটাকে বলব—রাত্তিরে দরজা খুলে চলে এস। মোটর রেডী করে রাখব। বাস্। মার পাড়ি। রামের সাহস বেড়ে গিয়েছে আজ, মাথা চনচন করছে। দাদাবাবুর জন্ত সে জান দিতে পারে আজ। আস্ফালন করে সেই কথাটা সে জানিয়েও দিলে—জান যায়—সে ভি আচ্ছা।

শহরের ভেতরে এসে পড়েছে তারা। নরসিং বললে, মেলা বকিস না রাম। চুপসে চল্।

ব্যবসা আছে শহরটাতে। রবি ফসলের আড়ত। এ অঞ্চলের রবি ফসল এইখানে এসে জমা হয়, এখান থেকে চালান যায় দেশ-দেশান্তরে। বড় বড় গদির সামনে অনেকটা পরিমাণে খোলা জমি, সেই খোলা জমিতে গরুর গাড়ির ভিড় জমে গিয়েছে। গাড়ির মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত বস্তা বোঝাই। দোকানে পেট্রোম্যাক্স আলো জলছে।

তারা এসে পড়ল মোটর-বাসের ডিপোয়। এখানেও একটা পেট্রোম্যাক্স জলছে। সামনে একটা শেড্। সেই শেডের মধ্যে মোটর-বাস রেখেছে পাঁচখানা। দুখানা ট্যাক্সি। এগুলো যায় সদর শহর পর্যন্ত। খুব লাভের সার্ভিস এটা। মোটরের দোকানটা নেহাত ছোট। আসল দোকান ওদের শহরে। এখানে কিছু পেট্রোল মোবিল রাখে মাত্র। বাকি যা দরকার হয় আনিয়ে নেয় শহরের দোকান থেকে। বৈকালে তে-মাথায় যাবার আগে সে এখানে এসে

দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গিয়েছে। ফ্যানবেল্টিংয়ের দরকারও ছিল, তারটা পুরনো হয়েছে, সেই উপলক্ষ্য করে দোকানটা দেখে গিয়েছে বেশ ভাল করে। এখনও সে আবার একবার দাঁড়াল।

নিতাইয়ের মন ছুটছে মদের দোকানের দিকে। সে তাগিদ দিয়ে বললে—বাজে দোকান, কিছু মেলে না। চলুন চলুন। ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

নরসিং অগ্রসর হল।

মদের দোকানে শেষ আসরের ভিড় জমে গিয়েছে। দোকান বন্ধ হবে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভদ্রবেশী খরিদ্দার আসছে। অনেকে অবশ্য বেপরোয়া, ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। গোমস্তা, আমমোক্তারদের দেখলেই চেনা যায়। পকেটে ক্লিপ-আঁটা পেন্সিল, কারও বা সস্তা ফাউন্টেন পেন, কাগজে নোটবুকে মোটা পকেট, কথাবার্তার মধ্যে আইনের ধারা চলেছে। নরসিং খুঁজছিল জামায় কাপড়ে কালি, গ্রিজ, মোবিলের দাগ—দোকানের মদের গন্ধেও নিঃশ্বাস নিয়ে খুঁজছিল—মোবিল পেট্রোল মেশানো অতিপরিচিত বিচিত্র গন্ধ। ব্যাকব্রাশ করা লম্বা রুক্ষ চুল, রুক্ষ কঠিন মুখ, পাকানো গোঁফ খুঁজছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠিক খুঁজে বার করল সে পাঁচজনকে। আলাপ করবার পথ সহজ। প্রশ্ন করলে—সকালে মোটর কখন ছাড়ে বলুন তো?

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক সাড়ে সাতটা?

—টাইম সাতটা পঁচিশ, তবে হয় সাড়ে সাতটা—পৌনে আটটা—শহরে ঘুরে প্যাসেঞ্জার নিতে সময় লাগে তো?

—এখানে ফ্যানবেল্ট পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারেন?

—ফ্যানবেল্ট? সবিস্ময়ে লোকটি তাকালে তার দিকে। ফ্যানবেল্ট নিয়ে—আপনি কি?

—আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি এখানে। নরসিং বললে—ইমামবাজার থেকে ভাড়া নিয়ে এসেছি।

—বসুন বসুন।

—আপনারাও তো মোটর সার্ভিসে কাজ করেন? হাসলে নরসিং।

বসল সকলে জমিয়ে। রসিদ মিয়া, জাফর সেখ, রামেশ্বরপ্রসাদ, জীবন, তারক এরা ড্রাইভার। পাগলা, ন্যাড়া, ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এরা ক্লীনার। ক্রীশ্চান জোসেফ, সে এস-ডি-ও'র ড্রাইভার। জোসেফ রজনী দাস। সব চেয়ে তার জোসেফকেই ভাল লাগল। রসিদ জাফরদের সঙ্গে জোসেফের পার্থক্য থাকারই কথা। বাস-ট্যাক্সির ড্রাইভারে আর প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারে তফাত থাকবেই। তার উপর জোসেফ এস-ডি-ও'র ড্রাইভার, চারজন এস-ডি-ও পার করলে জোসেফ। মধ্যে একজন এস-ডি-ও ড্রাইভার সঙ্গে এনেছিলেন—তখন সে ডি-এল-পির কাছে কাজ করছিল। জোসেফ খুব ভদ্র, মিষ্টি হাসিমুখ—অথচ গম্ভীর। গেলাসের মদ সে অল্প অল্প করে খাচ্ছিল; রসিদ জাফর এদের কিন্তু,

একটা গেলাস বড় জোর দু-চুমুক। রসিদ তার্কিক এরা দুজনে মদ খেলেই মারপিট করতে চায়, ওদের কয়েকটা কথা শুনেই এবং হাতকাটা খাকী শার্টের হাতা না থাকা সত্ত্বেও—আস্তিন গুটানোর ভঙ্গিতে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত হাতের উপর হাত বুলোনো দেখেই নরসিং সেটা বুঝতে পারলে। জাব্বর গুম হয়ে বসে আছে। পথের জনতার দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লোক চলছে—জাব্বর দেখছে—কিন্তু দৃষ্টির নিরাসক্তির মধ্যেও স্পষ্ট একটা সন্ধানের লোলুপতা রয়েছে। সে খুঁজছে স্ত্রীলোক। সে কথা বুঝতে নরসিংয়ের এতটুকু বিলম্ব হল না রামেশ্বর সব চেয়ে ভয়ানক। ঠোঁটের একটা দিক অনবরত টানা ওর অভ্যাস। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নখ কাটছে। ওটা ও চালাতে অভ্যস্ত—এতে নরসিংয়ের সন্দেহ রইল না। জীবনটা ক্রমাগত অশ্লীল-অশ্রাব্য কথা বলে চলেছে।

রামেশ্বর নরসিংকে বলল—তাসের বাজি খেলবেন? চলিয়ে না?

লোকটা শুধু ছুরিবাজ নয়—জুয়াড়ীও। নরসিং উঠে পড়ল, না। আচ্ছা, রাম-রাম। সেলাম।

বেরিয়ে এল সে দোকান থেকে। জোসেফ সঙ্গে এসে বললে—ভাল করেছেন। লোক ভাল নয় রামেশ্বর। আপনি বিদেশী—

হেসে নরসিং বললে—বিদেশী নই। গির্‌বরজার সিং আমি। এখানে হাঁক দিলে আমারও বিশ আদমী বেরিয়ে আসবে।

—গির্‌বরজা? গির্‌বরজার সিং আপনারা?

—হাঁ। নরসিং একবার দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত মুছে—উপরের দিকে ঠেলে দিলে।

জোসেফ বললে—আমাদের বাড়ি ছিল এক সময় গির্‌বরজা।

—গির্‌বরজা বাড়ি ছিল? আশ্চর্য হয়ে গেল নরসিং।

—আমার ঠাকুরদার বাবা এখানে এসে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ দাস। একটু চুপ করে থেকে সে হেসে বললে—তিনি জাতে ছিলেন হাড়ী।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নরসিং। তাদের গাঁয়ের হাড়ীদের মনে পড়ে গেল। তাদের গাঁয়ের হাড়ীর ছেলে এই জোসেফ।

জোসেফ সিগারেট বার করে নরসিংকে দিল। নরসিং বাঁ হাতে জোসেফের ডান হাতখানা চেপে ধরলে। তার মনে হল জোসেফ তার পরমাত্মীয়। হঠাৎ সে বললে—আচ্ছা বল দেখি—বলুন দেখি—এখান থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত যদি সার্ভিস খুলি—তো চলবে কিনা?

—পাঁচমতি? শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি?

—হাঁ।

—হঠাৎ আপনার এ ঝোঁক হল কেন? আপনাদের ইমামবাজার থেকে জংশন হয়ে সদর পর্যন্ত সার্ভিস তো খুব ভাল।

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফ বললে—রাস্তা তো মোটে আট মাইল—এইটুকু পথ—। ভাবতে লাগল জোসেফ।

নরসিং দাঁড়াল থমকে। বললে, এইখান থেকে ভাগব আমি। ভেবে দেখবেন। কাল আবার দেখা করব।

জোসেফ প্রশ্ন করলে—রয়েছেন কোথায় ?

—শুখনরাম সাহুর গদিতে।

—শুখনরাম শাহু ?

—হাঁ।

জোসেফ একটু চুপ করে রইল—তারপর বললে, আচ্ছা, কাল কথা হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

রাম বললে—দেখুন কোথা থেকে আপন লোক বেরিয়ে গেল।

নরসিং আবার ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

নিতাইও যেন কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে—হাড়ীর ছেলে ?

উত্তর দিলে না নরসিং।

আট মাইল পথ মাত্র। সার্ভিসে অসুবিধা আছে। আট মাইল পথ লোকে হাঁটতে পারে, ঘোড়া গরু একটানে চলতে পারে। পথ যত দূর হয়—তত ওরা অপারগ হয়—কলের কদর তত বাড়ে। আট মাইল পথে ঘোড়ার গাড়ির লাগে দেড় ঘণ্টা। নটার সময় পাঁচমতি ছাড়লে সাড়ে দশটায় শ্যামনগর। মোটরে আধ ঘণ্টা। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি যদি ভাড়া চার আনায় নামায় তবে চার আনা পয়সার জন্যই লোকে ওই দেড় ঘণ্টা আগেই যাবে। তার চোখের উপর ভেসে উঠল বাদশাহী সড়ক। কত দূর চলে গিয়েছে। এই সড়কে বর্ধমান জেলার দিকে গেলে রেল-লাইন পাওয়া যায় তিরিশ মাইল দূরে। কত যাত্রী, কত গাড়ি, কত মাল আসছে—যাচ্ছে। বিরাম নাই। তার যদি কলমের জোর থাকত তবে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডকে কলমের খোঁচায় ঘায়েল করে—এ রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করত। আর থাকত যদি টাকা, চারখানা বাস কিনবার পয়সা—তবে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত সার্ভিস খুলত। সার্ভিস খুলবার কত লাইন পড়ে আছে। পথ নাই। রেল-কোম্পানি মাঠের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে লাইন নিয়ে গিয়েছে হরিদ্বার পর্যন্ত, দিল্লী লাহোর পেশোয়ার পর্যন্ত, বোম্বাই পর্যন্ত, মাদ্রাজ পর্যন্ত, সবশেষে হঠাৎ ভূগোলে পড়া কুমারিকা অন্তরীপ রামেশ্বর তীর্থের কথা মনে পড়ল—রামেশ্বর পর্যন্ত রেল-লাইন নিয়ে গিয়েছে। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক চলেছে। পথ থাকলে সে খুলত অমনি সার্ভিস শ্যামনগর থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে বোম্বাই।

নিতাই বললে—সিংজী। এ লোকটা কিন্তু খুব চালবাজ বটে। হাড়ী থেকে খ্রীষ্টান হয়েছে কিনা, চালটা খুব মেরে গেল।

নরসিং বললে—না। ছোকরা লোকটা ভাল। ওর কাছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে।

নিতাই বললে—বলুক মশায় ও। খুলে দেন সারবিস্ আপনি। হ্যাঁ।

নরসিং বললে—হ্যাঁ, সার্ভিস আমি খুলব। যা থাকে কপালে।

—কপাল আপনার ভালই। ভেবে দেখেন আপনি। রোজকার-পাতি বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে ভাড়া মিলে গেল। বিশ মাইল পথ বড় জোর—ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এসে গেল। এ আপনার মা-লক্ষ্মী ডেকে এনে আপনাকে লাইন দেখিয়ে দিলেন।

কথাটা নরসিংয়ের মনে ধরল। নিতাই খুব ভাল বলেছে। কথাটা সে এমন ভাবে ভেবে দেখে নাই। ওখানকার এস-ডি-ও'র উপর নিষ্ফল ক্ষোভে সে স্থির করেছিল, আর সে এই ছোট কাজ করবে না। ছোট কাজ, যে কাজে এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় সে ছোট কাজ ছাড়া আর কি? সে ভেবেছিল, গাড়িখানা বেচে দিয়ে পূর্বের মজুত আর এই গাড়ির টাকা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে জমি কিনবে কিছু, আর করবে মহাজনি। সুদের ব্যবসা। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছিল তার দিদিয়াকে। মা মরে গিয়েছে, জেঠারা মরেছে, দিদিয়া বুড়ী আজও বেঁচেও আছে, তাকে মোটর গাড়িটা দেখাবে, তাকে একবার চড়াবে গাড়িতে—এই বলেই সে গাড়িখানা নিয়ে চলেছিল গির্‌বরজা; আরও দেখাতে ইচ্ছে ছিল তার ক্ষ্যাপা মাধবজেঠাকে, গ্রামের লোককেও দেখাতে ইচ্ছে ছিল। মোটরখানাই তো তার কীর্তি। তাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ কল্পনা করে সে মনে মনে খুশী হয়েছিল।

পথে হঠাৎ ওই শুখনরামের গাড়ি উল্টে গেল। শুখনরামকে অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জিত করবার জন্যই সে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকেছিল। শুখনরাম তাই দিয়ে তাকে নিয়ে এল। পথে আসতে আসতে তার চোখ খুলে গেল।

লক্ষ্মীমন্ত শুখনরাম। সেই মেয়ে। ঠোঁটের কোলে তার সেই আশ্চর্য সূক্ষ্ম হাসি। এই হয়তো তার ভাগ্যলক্ষ্মী। ছেলেবেলায় দিদিয়ার কাছে গল্পে সে ভাগ্যলক্ষ্মীর কথা শুনেছে। রাজার ভাগ্যলক্ষ্মী সর্বাঙ্গে তাঁর মণিমুক্তার আভরণ ঝলমল করছে, পরনে তাঁর সোনার সুতায় বোনা কাপড়, বিপদে সম্পদে রাজাকে এসে দেখা দিতেন। সে মোটর চালায়, সকাল ইস্তক রাত্রি পর্যন্ত দুনিয়া তার চারপাশে পাক খায়, গরমে হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ঝলসে যায়, পেট্রোলের গন্ধে কলিজা ভরে যায়, শীতের দিনের দরজা জানালা বন্ধ কেরোসিনের ধোঁয়ায় ভরা চোর-কুঠরির মত, তার ভাগ্যলক্ষ্মী যদি ওই মেয়েটি হয়—তবে সেও তার জোর নসিব বলতে হবে। খুলবে সে সার্ভিস শ্যামনগর পাঁচমতি ট্যাক্সি-সার্ভিস। তারপর দেখা যাবে। ছোট নদীটা পার হয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে—

বাজারের এ পথটা শেষ হল একটা চৌমাথায়। বাঁ দিকে তাদের পথ।

এ পথটা অন্ধকার। কাঠের আড়তে, কয়লার ডিপোতে কেরোসিনের ডিবিয়া জলছে, দোকানে হ্যারিকেন।

নরসিং বললে—বাত্তি কিনে নে নিতাই। দুটো।

মদের নেশার উপর কল্পনার উত্তেজনায় নরসিংয়ের ঘুম এল না। চিন্তার আগুন মাথার মধ্যে যেন আজ রাবণের চিতার মত অ-স্তিমিত এবং অনির্বাণ হয়ে উঠেছে।

রাম এবং নিতাই দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মদ খেয়ে নিতাইয়ের অবস্থাটা হয়—পুকুর থেকে বেরিয়ে নদীতে পড়া মাছের মত; সব আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে সে অতিমাত্রায় সহজ এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্ষুধা খোলে, তৃপ্তির সঙ্গে খায়, তার পরই বিছানাটি পেড়ে একটি বিড়ি ধরিয়ে "কালী দুর্গা শিবো হরি, জয়ো জয়ো মুকুন্দ মুরারী, জয় বাবা বুড়ো শিব, জয়ো মাতা মঙ্গলচণ্ডী" বলে শুয়ে পড়ে। মিনিটখানেক পরেই মৃদু নাসিকাধ্বনির আভাস পাওয়া যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। আরও মিনিটখানেক পরে সশব্দ হয়ে ওঠে রীতিমত। ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়ায় গিয়ে অনেক সময় অনেক রাত্রিই পথে কাটাতে হয়, সেখানে গাছতলায় শিকড়ে মাথা দিয়ে মাটির উপরে শুয়েও ঠিক এমনি ঘুম ঘুমায় সে। মদ না পেলেই সে আরামের বিছানায় শুয়েও চার প্রহর রাত্রির অন্তত আড়াই প্রহর জেগে থাকে, পাশ ফেরে আর মৃদুস্বরে ডাকে—ঘুমুলেন নাকি সিংজী? রামা রে!

রামাটা সাধারণতই ঘুমকাতুরে। আজ কিন্তু প্রথমটা সে অন্য রকম শুরু করেছিল। নেশায় বকতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত অকস্মাৎ লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শ পেলে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে এলিয়ে যায়, ভেঙে পড়ে—তেমনি ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। বকছিল, সহসা এক সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করলে; তার পর দু-চারটি কথা বললে মৃদুস্বরে, তার পরই চুপ করে গিয়েছে। হাঁ করে ঘুমুচ্ছে।

দুটো বাতির একটা জ্বলছে। প্রায় আধখানা পুড়ে এসেছে।

মদের নেশায় বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, স্থিরদৃষ্টিতে চোখ চেয়ে নরসিং বসে আছে। তাদেরই গ্রামের এক হাড়ীর ছেলে জোসেফ। আজকে বলতে পারে সে কথা। লোকটার কথাবার্তা চালচলন রীতিমত ভদ্রলোকের মত। আর সে হল গির্‌বরজার সিংবাড়ির ছেলে। তার পূর্বপুরুষ ওই ওদের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করত। তাদের উচ্ছিষ্ট ওরা প্রসাদ বলে খেত। ওরা সিংবাড়ির নোংরা ময়লা পরিষ্কার করত। ভাবতে ভাবতে নরসিং রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। এই ঘরের মধ্যে সে হিংস্রতা বিচিত্র রূপে তার মনে আত্মপ্রকাশ করলে। হঠাৎ তার মনে হল—হাঁ করে রামা ঘুমুচ্ছে, ওর গলাটা টিপে ধরলে কি হয়? তার জীবনের একটা পোষ্য, তার স্ত্রীর ভাই। স্ত্রী মরে গিয়েছে, ওর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

তার স্ত্রী ছিল তার মামীর ভাইঝি।

মামীকে প্রথম জীবনে সে ভয় করত, তার পর তার উপর নরসিংয়ের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মেছিল। খানিকটা সে আক্রোশের বশেই সে মামীর ভাইঝিকে বিয়ে করেছিল।

বাবুদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবস্ত করে তাকে তার মামা ইমামবাজারে রেখে এল। ওদিকে তার মামী গোপনে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এল তার ভাইঝিকে। তার এই রোগা

শরীরে সে আর একা পারছে না, একজন সাহায্য করার লোক চাই, সেবা করবার লোক চাই।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামীর উপর খানিকটা আক্রোশ, খানিকটা বাবুদের বাড়ির মেজবাবুর দৃষ্টান্তে তার মনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল অত্যন্ত ক্রুর একটি বাসনা।

মেজবাবু ছিল ঝড়। তাকে সে যত ভালবাসে, তত ঘৃণা করে, তত ভয় করে। মেজবাবুর কথা মনে হলেই সে মনে মনে বলে—সেলাম হুজুর। সঙ্গে সঙ্গেই অকারণে রাম অথবা নিতাইকে কঠিন আক্রোশে গাল দিয়ে ওঠে, শূয়ার কি বাচ্ছা কোথাকার!

নিতাই বলে, কি? রাম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। নরসিং গভীর মনোযোগ দেয় হাতের কাগজের উপর। কখনও বা নিতাইকে উত্তর দেয়, কিছু না।

মেজবাবু ছিল ঝড়।

বছর দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এল সেই মোটর-বাইকে চেপে। ইমামবাজারে নতুন করে কয়লার ডিপো খোলা হবে; কয়লার ব্যবসার ভার মেজবাবুর উপর; কয়লার ব্যবসা বাড়ানো হবে। কলকাতা আপিস থেকে ব্যবস্থা করে দু-তিন গাড়ি কয়লাও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 'বিলটি', অর্থাৎ রেল রসিদ সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেজবাবু। মেজবাবু মোটর-বাইক থেকে নেমে মাথার টুপিটা এমন কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে যে, চাকার মত পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে টেবিলটার উপরেই চুপ করে গিয়ে বসে গেল। তার পর হাঁকলে, গাড়িটা ওঠা রে।

সন্ধ্যাবেলা নরসিংয়ের ডাক পড়ল। ইজিচেয়ারে মেজবাবু বসে আছে। এক হাতে বিলিতী মদের গ্লাস অন্য হাতে সিগারেট, মদের গ্লাসটা বাঁ হাতে ছিল। আজও নরসিং যখন মদ খায় তখন বাঁ হাতে ধরে মদের গ্লাস, ডান হাতে থাকে সিগারেট। বড়বাবু তাকিয়ার উপর বুক দিয়ে শুয়েছিল; তার গ্লাসটা সামনে নামানো ছিল। আশ্চর্য, দু-ভাই একসঙ্গে বসে মদ খেত।

মেজবাবু বললে, তোকে আর পড়তে হবে না; কয়লার ডিপোতে থাকবি তুই। বুঝলি?

সেদিনও নরসিং মনে মনে পড়ার স্বপ্ন দেখত। লেখাপড়া যেমন করে হোক শিখবে, মানুষ হবে। দিদিরা যে বলত, মানুষের মনের মধ্যে অজগরের মাথার মণির মত যে 'মতি'—গজমতির চেয়েও যা দুর্লভ, যা হারিয়ে গির্‌বরজার সিংদের এই দুর্দশা, তাকেই সে ফিরিয়ে আনবে। যে 'মতি' অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের মত আলো দিয়ে পথ দেখায়, যে 'মতি' হাতে থাকলে জল দু-ভাগ হয়ে পথ দেয়, দিদিয়া বলেছে সে 'মতি' ফিরে পাওয়া যায়—লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে। লেখাপড়াটা অবশ্য তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেকছে, এখনও পর্যন্ত কিছুতেই বইগুলোর ভিতরের জিনিসগুলি আয়ত্তে আনাত পারছে না। পড়ে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলে প্রাণপণে চীৎকার করে সে মুখস্থ করতে চায়। তার পড়ার চীৎকারে পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়; অনেকে তিরস্কার করে, সে তা অম্লানবদনে সহ্য করে। কিন্তু আজকের মুখস্থ কাল ভুলে যায়, এই তার দুঃখ। তবু সে আশা ছাড়ে নাই। দেড়

বৎসর বাবুদের বাড়িতে রয়েছে, এর মধ্যে ছ মাস অন্তর তিনটে পরীক্ষা হয়েছে, কোনটাতেই সে পাস করতে পারে নি। চতুর্থ বারের পরীক্ষায় পাস করবার জন্য এবার সে উঠেপড়ে লেগেছে। ভেবেছিল মেজবাবু এলে তাকে সে ধরবে, তিনি বলে দেবেন তাঁদের ইংরাজী-নবিস্ কেরানীবাবুকে—সে লেখাপড়ার একটু-আধটু বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু, মেজবাবুর মুখে উল্টো কথা—পড়া ছেড়ে চাকরি করার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

মেজবাবু গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে—বুঝলি? এক চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেল। সেদিনের ছবি স্পষ্ট ভাসছে নরসিংয়ের চোখের উপর। চুমুক দিয়ে মেজবাবু মুখ দিয়ে খানিকটা নিঃশ্বাস ছাড়লে; বিস্বাদের কটুতা এবং গন্ধের উগ্রতা খানিকটা বেরিয়ে যায় এতে।

বড়বাবু বললে—একটু একটু সিপ করে। এভাবে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ো না।

মেজবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললে—সাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু একটু করে গেলা, ও আমার পোষায় না।

বড়বাবু হেসে বললে—সাপে ইঁদুর খায়, ছুঁচো খায় না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেজবাবু বললে—এক্সকিউজ্ মি। ওটা আমার ইচ্ছাকৃত ভুল। ইঁদুরের গায়ের গন্ধ নাই। এ বস্তুটার গন্ধের সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে ছুঁচো বলেছি। এবং সাপে যখন একবার কোন জিনিস ধরে তখন নাকি ওগরাতে পারে না। ছুঁচো হলেও খেতে হয়। এও তাই। ওয়াইন—উয়োম্যান্—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বললে—স্টপ। চোখের ইঙ্গিতে বড়বাবু নরসিংকে দেখিয়ে দিলে।

—আই সি। নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে মেজবাবু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাকীটা শেষ করে বললে—এখানে নতুন করে কয়লার ডিপো হচ্ছে, সেই ডিপোতে তোর চাকরি হল। বুঝলি?

নরসিংয়ের হৃৎস্পন্দন আবার সভয়ে দ্রুতগতি চলতে আরম্ভ করলে।

আবার মেজবাবু বললে—বুঝেছিস?

সহজ কথা, তবু নরসিং নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে? ঐ ভঙ্গির মধ্যেই নিহিত ছিল তার অতি দুর্বল এবং ভীত চিত্তের অস্বীকারের ভাব।

মেজবাবু কিন্তু এটা ভাবতে পারে না, তার কথা কেউ, অন্তত তার অনুগৃহীতের মধ্যে কেউ, অস্বীকার করতে পারে, এটা তার কল্পনারও অতীত। সে এটাকে সম্মতি ধরে নিয়েই বললে—হ্যাঁ। কাল সকালেই যাবি আমার সঙ্গে। কাজকর্ম আমি বুঝিয়ে দেব। প্রথম কিছুদিন আরও একজন ওয়াকিবহাল লোক থাকবে, সে ডিপো চালু করে দেবে। ভয় নাই তোর।

নরসিং এবার সাহস সঞ্চয় করে বললে—পড়ার কি হবে?

—পড়া? মেজবাবুর কপাল ভ্রূ খানিকটা কুঁচকে উঠল, ঠোঁটের এক পাশ ঈষৎ বেঁকে খানিকটা ধারাল হাসি বেরিয়ে এল।

বড়বাবু প্রশ্ন করলে—তুই পড়বি? তিনটে পরীক্ষার একটাতেও তুই পাস করতে পারিস নি। তোকে পড়ার জন্যে ভাত—

হাতের ইশারা করে বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেজবাবু বললে—দেখ্, বাঁদরকে শেখালে সে কসরত করে বাজি দেখাতে পারে, কিন্তু গাধাকে ঠেঙিয়ে মারলেও মোট বওয়া ছাড়া গাধাকে দিয়ে আর কিছু হয় না।

নরসিংহের মনে হল, জেঠা মাধব সিংয়ের লাঠির চেয়েও মেজবাবুর কথা ভয়ানক।

মেজবাবু বললে—লেখাপড়ায় তুই গাধা। ও তোর হবে না। শেষ পর্যন্ত চাপরাসীগিরি করবি। মোট বইতে হবে তোকে। তার চেয়ে ডিপোর কাজ শেখ্। এর পর গলার স্বর পালটে গেল মেজবাবুর, বললে—যা, যা বললাম তাই করতে হবে।

অসহায়ের মত নরসিং চলে এল।

উপায় ছিল না। গির্বরজার বাড়িতে শুধু জেঠা মাধব সিং নয়, বাবা পর্যন্ত তার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। ধরণী রায় হতে পারে তার মামা, কিন্তু মানে অনেক ছোট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে তার বাড়ি ভাত খায় পোষ্য হয়, তারপর সে বাবুদের বাড়ি বিনা মেহনতে নিমক খায়, দেনো ভাত খায়; তার মুখ কি দেখতে হয়—না, আছে?

নরসিং শুনেছে মাধব সিং বলে—মর্ গেয়া, উ বাচ্চাঠো মর্ গেয়া।

বাবা চুপ করে থাকে।

গির্বরজার সিং-বাড়ির অমূল্য ধন 'মতি' ফিরিয়ে আনতে এসে মাঝপথে জাদুকরের মন্ত্রের চোটে সে জানোয়ার বনে গেল।

তবু মেজবাবুকে সেলাম। হাজার সেলাম। দুনিয়ায় রোজগারের পথ মেজবাবুই খুলে দিয়েছে। ডিপোর চাকরি—বেশ চাকরি। মণ—আধ মণ—দেশ সের—পাঁচ সের—আড়াই সের বাটখারা নিয়ে কারবার। কয়লা বিক্রি করা—খসড়া খাতা লেখা—মজুরটাকে দিয়ে চালনায় কয়লা চেলে নিয়ে ধুলো গুঁড়ো বার করে রাখা—আর বসে থাকা। পাঁচ আনা মণ দাম। মণ-করা এক সের মারতে পারলে একটা আধলা বেরিয়ে আসে। সমস্ত রোজগারটাই গোড়ায় উদ্যোগ করে করত নিতাইয়ের বাবা। ভাগ দিতে চাইলেও নিত না নরসিং।

তার পর—কেমন করে কবে থেকে যে সে নিতে আরম্ভ করলে—সে নরসিংয়ের মনে নাই। পেতলের বাটিতে তেল তো তেল—ঘি রাখলেও কিছুদিন পর সবুজ রঙের কলঙ্ক জন্মায়, পেতলের বাটি থেকেই জন্মায়—কিন্তু ঘিয়েও লাগে। কয়লার ডিপোটা পেতলের বাটির চেয়েও খারাপ, লোহার বাটি। কয়লার ডিপোর পাশে কয়লা ছিটকে পড়ত, কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে আসত ছোট জাতের গরীবগুনার মেয়েরা। গির্বরজার এ জাতের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার এদের কোন তফাত নাই। ওখানে আগে সিংরা রাত্রে মদ খেয়ে ঝোঁক চাপলে চলে যেত ওদের পাড়ায়। দরজায় লাথি মেরে ডাক দিত। ঘুমন্ত দম্পতির ঘুম ভেঙে যেত; দরজা ভাঙার ভয়ে বেরিয়ে আসত পুরুষটি—এবং দূরে অন্ধকারে কোন স্থানে সিংমশায়ের নির্গমন-সময়ের অপেক্ষা করত; ঘুমিয়ে যেত সেইখানেই। কখনও আলো ফুটলে ঘুম ভাঙত, কখনও রাত্রেই ঘুম ভাঙত স্ত্রীর আহ্বানে। এখন আর অবশ্য সেদিন নাই। তবুও রেওয়াজটা আছে—দু-পক্ষই অভ্যাস ভুলতে পারে নাই; সিং-বাড়ির জোয়ান ছেলেরা

শিস দিয়ে বেড়াবার অজুহাতে ওদের নাড়া দিয়ে আসে, মেয়েদেরও দেখা যায় গাছের আড়ালে, গলির মুখে। মাঠে মেয়েরা কাঠ ভাঙতে যায়, সিং-বাড়ির ছেলেরা ভাবুকের মত মাঠের ধারে বসে থাকে। এখানেও ঠিক তাই। আগে এখানকার বাবুরাও সিংদের মত দরজায় লাথি মারত। চাপরাসীরা এসে খবর দিয়ে নিয়ে যেত বাবুদের বার-বাড়িতে। এখনও চাপরাসীদে এসব কাজ করতে হয়। এখানকার মেয়েরাও এখন গোপনে গাছতলায়, গলির মুখে দেখ করে। স্টেশনে, ডিপোয়, বাজারে নানা কাজের ছুতোয় যায়—তার প্রধান উদ্দেশ্য এইটা।

নিতাইয়ের বাপ নোটন, সে ওদের সঙ্গে রসিকতা করত। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না নরসিংয়ের। তারপর ক্রমে ক্রমে বেশ লাগতে লাগল।

একদিন ভট্ ভট্ শব্দ করে ফটফটিয়ায় চেপে এল মেজবাবু। কাল রাত্রে বাড়ি এসেছে। হিসাবপত্র ঠিক করে, ডিপো যতখানি পরিষ্কার করা চলে পরিষ্কার করে নরসিং বসে ছিল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেজবাবু নামল। নেমেই বললে, বাঃ।

খুশী হল নরসিং। পরিষ্কার করার ফল পেলে সে হাতে হাতে।

মেজবাবু বললে, ওটা কে রে নোটনা ? বেশ দেখতে তো। বাঃ!

নোটনা বললে, কুঞ্জ ডোমের বেটার বউ।

—ডাক্ ওটাকে।

হেসে নোটন বললে, আজ্ঞে ওটা ভারী ভীতু। নতুন বউ।

মেজবাবু এবার পিছন ফিরে কয়লার দিকে ফিরল, বেশ ভাল করে চারিপাশে ঘুরে দেখল তারপর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত খপ করে ধরে বললে, পুলিসে দে এটাকে। কয়ল চুরি করেছে। টেনে মেয়েটাকে নিয়ে সে ডিপোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে ছি আর দুটো মেয়ে, তারা হাসতে লাগল। নোটনও হাসতে আরম্ভ করলে। মেয়ে দুটো বললে, বাবুর কাছে আজ ফি জনায় এক টাকা করে লোব। হ্যাঁ।

নরসিং প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর অকস্মাৎ মনে হল—পায়ের ডগা থেকে মা পর্যন্ত কি যেন সন্ সন্ করে চলছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, চোখ দপ্ দপ্ করছে বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করছে না, কিন্তু যেন দুলছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, বৈশা সন্ধ্যার বাতাসের মত।

বেরিয়ে এল মেজবাবু।

নোট-কেস থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে নরসিংয়ের হাতে দিয়ে বললে নে। নোটনকে দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটন মৃদুস্বরে বললে, সঙ্গের মেয়ে দুটো বলেছে, দু টাকা লেবে।

দুটো টাকা ফেলে দিয়ে মেজবাবু ফটফটিয়ার প্যাডেলে ধাক্কা দিয়ে চড়ে বসল। দেখতে দেখতে উড়ে চলে গেল যেন। নরসিংয়ের মাথার মধ্যে সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল মুহূর্তে। মেয়েটা চলে গেল। নরসিংয়ের স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। সে আপসোস করে ঘরে

ঢুকতেই পায়ে কিছু একটা ঠেকল ; সেটা মেজবাবুর কাঁধে ঝুলানো থাকে, গরম চা ঠাণ্ডা হয় না, ঠাণ্ডা জল গরম হয় না বাইরের উত্তাপে ; কিন্তু ওটা থেকে গন্ধ উঠছে অন্য জিনিসের। বিলাতী মদের।

নরসিং খপ করে সেটাকে খুলে ঢকঢক্ করে মুখে ঢেলে দিলে।

সেদিনটা নরসিংয়ের চিরদিন মনে থাকবে। চিরদিন।

নরসিং দাঁতে দাঁত ঘষে প্রায় চীৎকার করে গর্জন করে উঠল—শূয়ারকি বাচ্চা। হারামজাদা।

রাম নিতাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে, রামটা গোঙাচ্ছে, নিতাইটার কশ বেয়ে বীভৎসভাবে লালা গড়াচ্ছে। নরসিং চঞ্চল হয়ে খানিকটা নড়েচড়ে বসল। তারপর উঠে ঘরের কোণে যে বোতল দুটো ছিল, বোতল দুটো নেড়েচেড়ে দেখলে। একেবারে খালি ; এক ফোঁটাও পড়ে নাই। গ্লাসের জল খানিকটা সে বোতলে ঢেলে তাই খানিকটা খেলে।

মামীর ভাইঝিটাকে এর আগে সে অনেকবার দেখেছে। ওই রামার মতই দেখতে ছিল সে। কিন্তু সে ছিল যেন কাদায় গড়া মানুষ। যত ছিল ভীরু তত ছিল সহগুণ। হঠাৎ তার চোখে সে যেন নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

মামীর উপর আক্রোশে, মেজবাবুর দৃষ্টান্তে সে মনে মনে···

আবার সে চেঁচিয়ে গর্জে উঠল—রামা, শূয়ারকি বাচ্চা।

উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের পিঠে লাথি মারলে। নিতাই একটা শব্দ করলে শুধু একবার ; অর্থহীনভাবে চোখ মেলে একবার তাকালে ; তারপর পাশ ফিরে শুলে।

নরসিং বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শুখনরামের গদির সামনে পাকা ইঁদারা ; একেবারে লোহার হুক দিয়ে আঁটা শেকলে ঝুলানো বালতি রয়েছে ইঁদারার পাড়ের উপর। বালতিটা ফেলে দিলে ইঁদারার জলে। সশব্দে গিয়ে পড়ল বালতিটা। সবল বাহুর টানে বালতিটা টেনে তুলে, বালতির জল সে হড়-হড় করে মাথায় ঢাললে।

—জান্‌কী, জান্‌কী, আমার পাপ তুই ক্ষমা করিস। জান্‌কী, তার সোনার জানকি।

খানিকক্ষণ সে পায়চারি করে ফিরল রাস্তার উপর। তার পর সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতিটা নিভে গিয়েছে, ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠাওর করে সে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠল। দেশলাই জেলে নতুন বাতিটা দেখে নিয়ে সেটাকে জেলে নিলে।

—যো হো গেয়া—সো হো গেয়া, যানে দো। ফিন্ শুরু করো।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। আট মাইল পথ। সে কাগজ পেন্সিল বের করে বসল এবার। আট মাইল পথ ; সকালে এগারটা পর্যন্ত দুবার যাবে, দুবার আসবে। রাত্রে দুবার

যাওয়া, দুবার আসা। আটবার। আট আটে চৌষট্টি মাইল। গাড়িটা পুরনো, রাস্তা খারাপ। গ্যালনে ষোল মাইল ধরাই ভাল। চৌষট্টি মাইলে চার গ্যালন তেল। আঠারো আনা গ্যালন হিসাবে—সাড়ে চার টাকা। মোবিল হাফ গ্যালন—দু টাকা। টায়ার বছরে একটা হিসেবে চারটে; চার পঁচিশ—একশ। টিউব চারটে; চার আটে—বত্রিশ। এ-ছাড়া বৎসরে একশ টাকা মেরামতি খরচ।

কাক-কোকিল ডাকছে। থাক্ হিসেব। হিসেব কষে দেখে কাজ করতে গেলে আর খোলা হয় না সার্ভিস। চোখে সে যে হিসেব রাস্তায় বসে দেখে এসেছে সেইটাই বড় হিসেব।

শ্যামনগর-পাঁচমতিয়া সার্ভিস। ভাড়া—সীট্-পিছু আট আনা।

সাত

—পাঁচমতি বাবু পাঁচমতি, খালি মোটর; আট আনা সীট। শুধু আট আনা। ট্যাক্সি মোটর বাবু। যাবেন বাবু, যাবেন?

চৌরাস্তার মোড়ে রাম দাঁড়িয়ে হাঁকছিল। নরসিং গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল—মোটর একসেসেরিজ সাপ্লাইয়ের দোকানে; তেল ভরে নিয়ে এল সে। নিতাই সঙ্গে গিয়েছিল। নরসিং এসেই ধমক দিলে।

—হাঁকিস না উল্লুক।

—হাঁকব না? বিস্মিত হল রাম।

—না। এখনও সার্ভিসের লাইসেন্স মেলে নাই। কেস হয়ে যাবে।

—তবে?

নরসিং বললে—ঘোড়ার গাড়ির আড্ডায় নজর রাখ। প্যাসেঞ্জার এলেই ডেকে আস্তে বল্। দেখতে দেখতে চারজন প্যাসেঞ্জার ছুটে গেল। ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারও আট আনা, মোটরের শেয়ারও আট আনা। মোটর ছেড়ে লোকে ঘোড়ার গাড়িতে যাবে কেন? নরসিং স্টীয়ারিংয়ে বাঁ হাতটা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানছিল। দৃষ্টি ছিল তার ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার উপর। দিদিমার ভাঁড়ার-ঘরের সামনে সকালবেলায় উঠে গিয়ে সে বসত, জলখাবার খেত—মুড়ি, ছোলা ভিজে আর গুড়। তার সঙ্গে থাকত জেঠা মাধব সিংয়ের পাতের প্রসাদ একখানা রুটি। পিঁপড়ে বেড়াত ঘুরে ভাঁড়ার-ঘরের সামনে। রুটির টুকরোটা ছিঁড়ে সে ফেলে দিত। দেখতে দেখতে জুটে যেত রুটির টুকরোটার চারি প্রান্তে পিঁপড়ের ঝাঁক। রুটির টুকরোটা টেনে নিয়ে যেত গর্তের দিকে। হঠাৎ এসে যেত একদল ডেয়ো পিঁপড়ে। প্রায় লাফিয়ে পড়ত টুকরোটার উপর। ছোট পিঁপড়েগুলো চঞ্চল হয়ে প্রথমটা ছটকে পড়ত, তার পর তারা আসত আরও দলে ভারী হয়ে, এসে টানত অন্য প্রান্ত ধরে। অবশেষে আক্রমণ করত ডেয়ো পিঁপড়েদের।

ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরা এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে

কি বলাবলি করছে।

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের কথা। সে চোখে দেখে নাই, জেঠা মাধব সিংয়ের কাছে শুনেছে। মাধব সিংয়ের ছেলেবেলাকার কথা। তখন ওই জোসেফদের পূর্বপুরুষেরা পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত যাত্রী বয়ে নিয়ে যেত। ডুলি ছিল ওদের, এক ডুলি চার বেহারা; পাঁচমতি থেকে চলত শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুর্শিদাবাদ। মাধব সিং বলে—একদিন এল কেরাঞ্চি গাড়ি। দুই ঘোড়া, ভিতরে বসবার গদি, থপ্ থপ্ করে জোড়া ঘোড়া চলে জোর কদম, ডুলিতে লাগল দু ঘণ্টা, কেরাঞ্চি এক ঘণ্টাকে অন্দর পঁহুছে দিলে। বাস্—বাতিল হয়ে গেল ডুলি।

কেরাঞ্চির নসিবে আগুন ধরাতে সে নিয়ে এসেছে তার 'ট্যাক্সি কার'কে—তার জবরদস্ত খাঁকে। বহুত আরামদার গদি, মজবুত স্প্রীং; হাওয়া গাড়ি—হাওয়ার মত জোরসে ছুটতে পারে,—সে যখন এসেছে কেরাঞ্চিকে তখন যেতে হবে বইকি। হাড্ডিসার—চোখে পিঁচুটি জানোয়ারগুলোকে দেখে তার মায়া হয়, ঘেন্নাও হয়। ছেড়ে দে, ওগুলোকে ছেড়ে দে।

একজন কেউ আসছে। হাতে চামড়ার কাগজ রাখা ব্যাগ—কি বলে যেন? অ্যাটাচি কেস। হ্যাঁ, আটাচি হাতে আসছে, পরনে শৌখিন জামাকাপড়।

নরসিং বললে—নিতাই মার্ হাণ্ডেল।

—আর একটু দেখবেন না?

—হয়ে গিয়েছে, নে। নরসিং জানে ওই লোকটা মোটরে জরুর যাবে। কেবল একটা খোঁচ আছে। লোকটা পুরা গাড়ি ভাড়া করে চাল মেরেও যেতে পারে।

—কি বাবু? পাঁচমতি যাবেন? আয়েন বাবু—আয়েন। আমার ঘোড়া ভাল।

—আমি হুজুর, এখুনি ছাড়ব। এদিকে হুজুর। ভাল গাড়ি।

নরসিং গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল।—মোটরে যাবেন স্যার? আট আনা ভাড়া।

—মোটর? ট্যাক্সি?

—হ্যাঁ স্যার। আসুন স্যার। দুটো সীটের দাম দিলে সামনেটা গোটা পাবেন।

—লোক বসেছে যে একজন?

—আপনি একটু ভেতরে যান তো দাদা। পিছনটা চারজনেরই সীট। হ্যাঁ, চারজনের। দেখুন না সামনের সীটের চেয়ে কতখানি চওড়া। সামনেটা যদি তিনজনের হয় তবে ওটা চারজনের কিনা আপনারাই বিচার করুন। বসুন স্যার, বসুন। গীয়ারের হাতলের মাথাটা বাঁ হাতে চেপে ধরে সে পায়ে চাপ দিলে অ্যাকসিলারেটারের উপর। গর্জন করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নরসিংয়ের গাড়ি ছুটল। শহরের ভিতরের রাস্তা অতিক্রম করে গাড়ি এসে পৌঁছে গেল তে-মাথায়; এইখান থেকে পাঁচমতির সড়ক শুরু। বাঁদিকে একটা মন্দির। নরসিং প্রণাম করলে—যে দেবতাই থাক, প্রণাম তোমাকে। কিছুটা দূরে একটা মসজিদের মিনারের আধখানা দেখা যাচ্ছে—সেলাম আল্লাহতয়লা-খোদাতয়লা। তোমাকেও প্রণাম।

নরসিং আরম্ভ করলে নতুন কারবার, নতুন পথে পা বাড়ালে, গাড়ি ছুটালে। তোমরা মঙ্গল করো। হঠাৎ মনে পড়ল জোসেফকে। জোসেফের গির্জার গড়—তোমাকেও প্রণাম।

আরে, উল্লুক বেকুবের দল, গরুর গাড়ির সারি নিয়ে আমিরী চালে হুঁকা টানতে টানতে চলেছে দেখ, চলেছে আবার রাস্তার মাঝখান জুড়ে। হঠাও, হঠাও—হঠাও গাড়ি। গাড়ির গতি মন্থর করে সে হর্ন দিতে আরম্ভ করলে—ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। তার পর দিলে ইলেকট্রিক হর্নে হাত। তীব্র চীৎকারে হর্নটা বেজে উঠল। হঠাও। হঠাও। জলদি করো। হঠ যাও।

নিতাই প্রশ্ন করলে—দড়িটা বার করব নাকি?

—না। নয়া জায়গা।

গাড়িগুলো সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সরছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদেরও মোটরে চড়ার নেশা লেগেছে। নরসিংয়ের পাশের বাবুটি বললে, উল্লুকদের চাবুক মারা উচিত।

মনে পড়েছে মেজবাবুকে। মেজবাবু চাবুক চালাতেন। দুরন্ত মেজবাবু কাউকে ভয় করতেন না, কিছুকে ভয় ছিল না তাঁর।

মোটর-বাস কিনে নিয়ে এলেন। সোনালী রঙের বাসখানা বাহারের বাস ছিল। কলকাতা থেকে রহমত ড্রাইভার এল, বাস চালিয়ে এসেছিলেন মেজবাবু, রহমত ছিল পাশে বসে। প্রথম গেলেন সদর, সেখান থেকে বাস লাইসেন্স করিয়ে এনে পরের দিন বাস সার্ভিস খোলা হল। সেদিন তিনটে ট্রিপের দুটো ট্রিপে বাস ট্রেন মিস্ করলে।

মেজবাবু রেগে আগুন হয়ে গেলেন। রহমত—এ কেয়া বাত?

রহমত ছিল বাঙালী মুসলমান, সে বললে—কি করব হুজুর? যাবার পথ চাই তো। গরুর গাড়ির এলাকা আপনাদের, এক এক দফায় দশ-বিশখানা গাড়ি সারবন্দি চলবে, মাঝখান চেপে চলবে। রাস্তা না ছাড়লে আমি যাই কি করে? রাস্তায় তখন মাল-বওয়া গরুর গাড়ি চলত। গাড়োয়ানেরা ছিল ইমামবাজারেরই পাশের গ্রামের পেশাদার গাড়োয়ান। তাদের স্বভাবই ছিল ওই। রাস্তা তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেজবাবু বললেন—আচ্ছা, কাল থেকে আমি যাব।

পরের দিন থেকে মেজবাবু বসলেন বাঁ ধার ঘেঁষে, হাতে নিলেন চাবুক।

ফিরে এসে রহমত বললে—বাপ রে বাপ! কাম ছেড়ে দোব আমি!

নরসিং তখনও কাজ করছে কয়লার ডিপোয়। সে বললে—কি হল?

—কি হল? মেজবাবু এক ধারসে চাবুক চালিয়ে গেলেন।

নরসিং হেসেছিল। রহমত মেজবাবুকে জানে না।

রহমত বললে—মেজবাবু বরাবর থাকবেন না। তখন যদি সকলে মিলে বাস আটকায়, আমার জান মেরে দেবে।

মেজবাবু না থাকে, মেজবাবুর নাম থাকবে। নরসিং আবার হেসেছিল। রহমত কিন্তু শুনলে না, বললে মেজবাবুকে। মেজবাবু হা-হা করে হাসলেন।—এ কলকাতা নয় রহমত,

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা এখানে দাঙ্গা করে না। যে চাবুক চালালাম তার সাঁই সাঁই শব্দ আর পিঠের জ্বালা ভুলতে লাগবে ছ'বছর। তা ছাড়া ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটবে তোমার গাড়ি—ধাক্কায় ভয় নাই ?

—হুজুর, সামনে একখানা গরুর গাড়ি খাড়া করে দিলেই তো হল। গাড়ি তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না বাবু!

—মুসলমানের বাচ্চা তুমি, লড়তে পারবে না?

—লড়তে পারি হুজুর। কিন্তু একা আমি কি করব ?

—আচ্ছা। তোমার সঙ্গে জবরদস্ত লোক দোব আমি। ডাকলেন নরসিংকে। নরসিং তখন কাঁচা বাঁশের মত সোজা লম্বা হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে দিলেন নিতাইকে। নরসিং কণ্ডাক্টার, নিতাই ক্লীনার। বললেন—এদের নিয়ে পারবে তুমি ?

—হ্যাঁ—হুজুর। এরা থাকলে তবু সাহস থাকবে।

মেজবাবু তাদের নিয়ে আরও ক-দিন চললেন বাসের সঙ্গে। নিতাইকে এবং নরসিংকে দুধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাঁক—হঠাও। হঠাও। হঠাও।

রহমত হাজার হলেও পাকা লোক। সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। রহমত বলত—মানুষে আর মেঘে কোন তফাত নাই রে ভাই। যে মেঘ পানি ঢালে, গলে গলে ঝরে পড়ে, সেই মেঘ হঠাৎ একসময় চড়াক্ করে বিজলী হেনে দেয়। কখন যে চিড় খাবে, বিজলী হানবে—সে তাক করা সোজা নয়।

আটকালে তারা গাড়ি। সামনে গরুর গাড়ি রেখে দিয়েছিল। নরসিং আর নিতাই হাঁকলে—হঠাও।

তারা দমলে না। বললে—আয় নেমে আয়।

নরসিং এবং নিতাই নামছিল। মেজবাবু তার আগেই নামলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ডাণ্ডা বের কর্। বলে গট্ গট্ করে এগিয়ে গেলেন। গাড়িতে লাথি মেরে বললেন—হঠাও।

তারা গর্জে উঠল। চাবুক মারার শোধ নোব আজ। চাবুক চালানো বার করব।

মেজবাবু বাঁ হাত পকেটে পুরে, ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে বলল—চাবুকের সঙ্গে আজ পিস্তল চালাব।

নরসিং এবং নিতাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে ডাণ্ডা হাতে। মেজবাবু বললেন—বে-এখ্-তিয়ারী কাজ করলেই চাবুক খেতে হবে।

একজন বললে—কিসের বে-এখ্তিয়ারী ? রাস্তা—সরকারী রাস্তা। এতে সবারই চলবার এখ্তিয়ার আছে।

—আছে। মেজবাবু হাসলেন। তার পর বললেন—কে আগে চলবে, কে পরে চলবে তারও একটা এখ্তিয়ার আছে।

—যে বড়লোক সে-ই আগে চলবে নাকি ?

হা-হা-করে হেসে উঠলেন মেজবাবু—সে হাসিতে হাওয়াও চমকে ওঠে। হেসে বললেন—

উল্লুক একটা তুই।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। অন্য একজন বললে—গাল দেবেন না মশায়।

মেজবাবু বললেন—গাল কি তোকে দিই, না, মানুষকে দিই? গাল দিই মানুষের বে-আক্কেলকে—বেকুফিকে।

—কেনে? কি বে-আক্কেলী কথা বলেছি?

—বড়লোকের আগে যাওয়ার এখ্‌তিয়ার নাই—যে সে কথা বলে সে বেকুফ, বে-আক্কেল আগে যাবে সে-ই, যার সব চেয়ে জোরে যাবার তাকত আছে। গরুর চেয়ে ঘোড়ার জরুর আগে যাওয়ার এখ্‌তিয়ার আছে। আবার ঘোড়ার চেয়েও মোটরের এক্‌তিয়ার আগে যাওয়ার। যে যত জোরে চলবে তার তত আগে যাবার এখ্‌তিয়ার, যে আস্তে চলবে তাদের সরে পথ দিতে হবে জলদি যানেওয়ালাকে। হঠাও—গাড়ি হঠাও।

আশ্চর্য। তারা সরিয়ে নিলে গাড়ি।

মেজবাবু গাড়িতে চেপে বললেন—গাড়িতে প্যাসঞ্জার রয়েছে। কারও আছে মামলা, কারও হয়তো আপনার জনের অসুখ, ওষুধ আনতে চলেছে। আর তোমরা মাঝখানে গাড়ির সারি চালিয়ে—'সখী আমার মনের ব্যথা তুমি বুঝলে না' বলে গান ধরে চলবে আপন মনে—ত হবে না। তোমার সখী মনের কথা বুঝল না বলে মন উদাস হয়ে থাকে তো পথের এক পাশে গাড়ি রেখে, গাছতলায় বসে মনের দুঃখে গাঁজা খাও, মদ খাও, কাঁদো হাসো নাচো—কিছু বলব না আমরা।

তারাও হেসে উঠল কথা শুনে।

মেজবাবু বললেন—না হয় তো আমার গাড়ির আগে ছুটে চল।

একজন বললে—তা আজ্ঞে, আমাদের গাড়ি তো বেমক্কা পড়তে পারে, গরু অনেক সময় বেকায়দা হয়ে যায়।

—নিশ্চয়। সে সময় আমার গাড়ি দাঁড়াবে। আমার লোকজন নেমে তোমার গাড়ি নিরাপদে পাশে সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তোরাই বল্ না, আজ আট দিন এই কাও চলেছে, চাবুক আমি চালিয়েছি, কিন্তু এমন কোন গাড়ির গাড়োয়ানের উপর আমি চাবুক চালিয়েছি? চালিয়ে থাকি, আমি কসুর মানব—মাফ চাইব।

তারা চুপ করে রইল।

হঠাৎ একজন বললে—আমাদের কিন্তু একদিন গাড়িতে চাপতে দিতে হবে।

মেজবাবু বললেন—খুব খুশি হব আমি। চাপ একদিন গাড়িতে। তা ছাড়া বলে দিচ্ছি আমি ড্রাইভারকে—হঠাৎ কারও কোন অসুখ হয় পথে, গাড়ি ভেঙে যায়—মানুষকে গাড়িতে তুলে নেবে। পৌঁছে দেবে ইমামবাজার বিনা ভাড়ায়।

তারা বললে—সেলাম বাবু। প্রণাম বাবু।

মেজবাবু বললেন—চল রহমত।

রহমত গাড়ি ছাড়বার আগে একটা সেলাম দিয়ে বললে—সেলাম হুজুর আপনাকে।

গাড়ি পাঁচমতি ঢুকছে।

পাঁচমতি গির্‌বরজার মা-লক্ষ্মীর কৃপায় ধনে-দৌলতে ঝলমল করছে। বড় বড় বাড়ি, ধনী জমিদারের বাস। উকিল, মোক্তার, আদালতের আমলার বাস। শ্যামনগরের মত না হলেও বেশ বড জায়গা। দু-তিনজন জমিদারের মোটর আছে, কয়েকজনের ঘোড়ার গাড়ি আছে, কয়েক বাড়িতে হাতি আছে। দোকান পশার, হাট বাজার। নিতাই বললে, বেশ জায়গা গুরুজী।

একটা চায়ের স্টলের সামনে গাড়ি থামালে নরসিং।—নে, আর একদফা চা খেয়ে নে। রামা, জোরে জোরে হাঁক্—শ্যামনগর খালি মোটর যাচ্ছে, আট আনা সীট!

চায়ের স্টলের দোকানদারের কাছে বসল সে।—আপনার দোকান? আপনার নামটি কি দাদা? চিমড়ে পাক-দেওয়া চেহারা লোকটির, দেখেই বুঝতে পারা যায়, চিমড়ে শরীর হলেও ভয়ানক শক্ত শরীর; একটা চোখ টেরা। মাথায় ঢেউ-খেলানো চুলে চেরা সিঁথি। লোকটার মেজাজও অদ্ভুত খারাপ। মনে হল, সে তাকালে নিতাইয়ের দিকে, কিন্তু তাকালে নরসিংয়ের দিকেই। টেরা চোখের চাউনির দিকনির্ণয়ের হদিস জানা আছে নরসিংয়ের। রামার বোন তার স্ত্রী ছিল টেরা। মনটা কেমন হয়ে গেল নরসিংয়ের। তাকে মনে পড়ে গেল।

লোকটা বললে, আমার নাম নিয়ে তোমার কাম কি হে বাবু? চা খাবে চা খাও। পয়সা দাও—চলে যাও, বাস্। পয়সা ফেলে মোয়া খাও আমি কি তোমার পর?

নিতাই বললে, ও বাবা! এ যে একেবারে মিলিটারি!

রামা খি-খি করে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে—লোকটার চাউনি দেখ মাইরি। হি-হি-হি-হি! চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলে—খক-খক করে কেশে সারা হল—তবু তার হাসির নিবৃত্তি নাই।

লোকটা উত্তর দিলে নিতাইয়ের কথায়—তুম বি মিলিটারি—হাম বি মিলিটারি। তুম বি ভাল—হাম বি ভাল। তুমি ধর লাঠি—হামি ধরি ডাণ্ডা। তুমি বল ভাই—তো আমি বলি দাদা। বাবা, সুরেশ দাসকে পেটে মুখে এক বাত। কোই কো বান্দা নেহি হাম। এ বাবা পাঁচমতি। এতনা বড় পাজী জায়গা আর নাই। যত কটি বড় লোক—উকিল—মোক্তার—সব এক এক চীজ। একচুল এদিক ওদিক হয়েছে কি বাস্, মামলা এক নম্বর—কি মারপিট। হিঁয়া চালাকি মৎ কর। ত্রিশ বছর বয়স হল—চল্লিশ নম্বর ফৌজদারী মামলার আসামী করেছে আমাকে, আমিও করেছি, বিশ-ত্রিশ নম্বর। সে করেও ঠিক আছি বাবা।

নরসিংয়ের ভারি ভাল লাগে সুরেশকে।—বসুন বন্ধু বসুন। চটছেন কেন? আমরা হলাম বিদেশী লোক। এসেছি আপনার এখানে। বন্ধু বলেছি—

—বাস্—বাস্। আপনি আমাকে বন্ধু বলেছেন; আমিও বলছি বন্ধু—মিতা—দোস্ত। বসুন, আরাম করুন। চা খান। সিগারেট খান। দিনে যদি থাকেন তবে আমার বাড়িতে

খান। আমি জাতিতে বৈষ্ণব।

—এই তো। এই তো ভাই বন্ধু। হয়ে গেল মিতালি।

সুরেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আপনারা কোথায় যাবেন?

—যাব না—এলাম।

—এলেন? মোটর নিয়ে—কার মোটর?

—মোটর আমার নিজের। ট্যাক্সি। পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর সার্ভিস খুলবার মতলব আছে।

—বলেন কি? জয় নিতাই রাধেশ্যাম। বহুত আচ্ছা। তা খুব চলবে আপনার। কেরাঞ্চিওয়ালারা বেশ কামায়। তবে খুব হুঁশিয়ার। এখানকার মোক্তার উকিল আমলারা বড় পাজী। একটু থেমে বলে, ভাল লোকও আছে দু-চারজন। এই যে এই যে—হরিনারাণ-বাবু মাস্টার, ভাল লোক। মাস্টার-মশায়—

খদ্দর পরা অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়ালেন।—কি সংবাদ সুরেশ?

—এই ইনি এসেছেন ট্যাক্সি গাড়ি নিয়ে। পাঁচমতি-শ্যামনগর সার্ভিস খুলছেন। তা আপনি তো রোজকার খদ্দের একজন।

—হ্যাঁ। তা,—তা, বেশ তো।

—চড়ুন গাড়িতে। চড়ুন।

সুরেশের টেরা চোখ জলজ্বল করছে।

—শ্যামনগর। শ্যামনগর। ট্যাক্সি কার।

সুরেশ হাঁকলে, এই চলে যায়। হর্ন—হর্ন দাও হে।

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ্ ভোঁপ্।

মাস্টার মশায় ডাকলেন, ও অরবিন্দবাবু।

—কি? মোটর কোথাকার মশায়?

—আসুন। আসুন। ট্যাক্সি। সার্ভিস খুলেচে শ্যামনগর-পাঁচমতি।

—ভাড়া?

—ভাড়া ওই আট আনা সীট।

—বহুত আচ্ছা। ফইজুর মড়া ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ি নিয়ে আর চলছিল না বাবা। আরে নবগোপাল—প্রতুল। এদিকে—এদিকে। ট্যাক্সি—চলে এস।

হরিনারাণ বললে নরসিংকে—আপনি এক কাজ করবেন, আমাদের সব যাবার সময় বাঁধা আছে, এক এক ট্রিপের প্যাসেঞ্জারদের নাম লিখে রাখবেন, টাইম বাঁধা করে নেবেন। ব্যাস্—ঠিক সময়ে এসে আমরা চেপে বসব।

নরসিংয়ের গাড়ি আবার ছুটল শ্যামনগর।

পাঁচমতি—শ্যামনগর।

বাদশাহী সড়কের উপর পহেলা ট্রিপের দাগ এখনও মিলায় নাই। তার উপরে পড়ল

দ্বিতীয় ট্রিপের রবার টায়ারের বরফি। কাটা ছকের ছাপ।

রামা এখনও হাসছে।—দাদাবাবু, লোকটার চোখ দুটো কি রকম। হি-হি-হি-হি।

নরসিংয়ের মনে পড়েছে রামার বোনকে। তার স্ত্রীকে। ভাসা পালকের মত স্বভাব রামার। নিজের বোনকে—মা'র পেটের বোনকে মনে পড়ে না।

নিতাই হাঁকলে—গুরুজী।

হুঁশিয়ার করছে নিতাই। অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে যেত। হাসলে নরসিং। চোখের জল এসে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সামনেটা।

ঝাপসা হবে না? জান্‌কীকে মনে পড়ছে যে। জান্‌কী বলে বাড়ির লোকে ডাকত। জান্‌কী। জান্‌কী ছিল তার নাম। চোখ দুটি ছিল টেরা। বারো-তেরো বছরের হিলহিলে লম্বা জান্‌কী হঠাৎ তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

মামী নিয়ে এসেছিল্ ভাইঝি আর ভাইপোকে; মামা তার বোনের ছেলেকে এনেছে যখন, তখন সে-ই বা আনবে না কেন? মতলব ছিল, মামার ভালবাসাটা পড়ে গিয়ে তাদের উপর। নরসিং যখন বিদায় হয়েছে, তখন এইটাই বড় সুযোগ। নরসিং কিন্তু থুথু ফেলেছিল। আরে সীতারাম। মামার আছে কি, তাই নেবে? একখানা খড়ে-ছাওয়া ঘর আর ক'বিঘে জমি। তার জন্যে নরসিং ঘর ছাড়ে নাই। তবু প্রথম প্রথম তার আক্রোশ হয়েছিল এদের দুজনের উপর। মধ্যে মধ্যে মামা তাকে নিমন্ত্রণ করত। সে আসত মামার বাড়ি। আসত শুধু মামার জন্য। তা ছাড়া তার জেঠা মাধব সিং বলেছিল—উসকে বদন্ হাম নেই দেখেগা। পরের ঘরে ভাত ভিক্ষে করে খায়?

বাবা কোন কথাই বলত না। কিন্তু একবারও খোঁজ নেয় নাই। নরসিং বাবুদের ঘরে শুধু বইগুলোর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মাথা কুটে মরত। তাকে উদ্ধার করতে হবে—দিদিমার গল্পের সেই গির্‌বজার ছত্রীদের হারানো মতিকে।

সে রবিবার দিন যেত মামার বাড়ি। তখন জান্‌কী ছোট। টেরা চোখে কার দিকে সে চাইত নরসিং বুঝতে পারত না। ভারী যত্ন করত তাকে। সোমবার যখন সে চলে আসত বলত—আবার কবে আসবে? কাদার মত স্বভাব ছিল তার। লেপটে লেগে থাকতে চাইত।

বলত—তোমার মত রামকে লিখাপড়া শিখবার বন্দোবস্ত করে দিয়ো তুমি। তোমার পুরোনো কেতাবগুলি দিয়ো। রেখে দিব। বড় হয়ে রাম সিং পড়বে।

প্রথম প্রথম নরসিং জান্‌কীকে কিছু বলত না। সে জান্‌কীকে রূঢ় ভাষায় বলত, ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো। কুকুরের বাচ্চার মত পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে হবে না—ভাগো।

তার পর তাকে প্রহার দিতে শুরু করলে।

সেদিন রবিবার। পরের দিন সোমবারে রথযাত্রা। ইমামবাজারে রথের মেলা।

জান্‌কী এসে হেসে বলেছিল—রথের মেলাতে আমাকে রাম সিংকে কি দিবে তুমি নরসিং ভাই?

অসহ্য মনে হয়েছিল নরসিংয়ের। সে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল।—আবদার! যাও আবদার কর গিয়ে তোমার পিসীর কাছে।

রামটা আজন্ম ওই 'গাধার মত উল্লুক'। খুব যে বোকা, তাকে নরসিং ওই কথা বলে—'গাধাকে মাফিক উল্লু'। জান্‌কীকে মারলে সে খি-খি করে হাসত।

জান্‌কী কেঁদে উঠেছিল, চড়টা জোরেই পড়েছিল। 'নেকড়ানী' ঠিক এই সময়টিতেই ঘরে ঢুকেছিল—কোথাও গিয়েছিল। 'নেকড়ানী'—নেকড়ে বাঘিনী। 'নেকড়ানী' থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রূ-কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে রইল; মনে হল, চোখের তারা দুটো যেন সদ্য আগুনে পোড়ানো রাঙা গুলতি-বাঁটুল—ধনুকে লাগিয়ে টান দিয়ে ধরেছে—লক্ষ্য করছে নরসিংকে। নরসিং মনে মনে ভয়ে পেয়ে গিয়েছিল। জান্‌কী, রাম—তারাও পিসীকে দেখছিল। পিসীর ওই গুলতি-বাঁটুল জোড়া ধনুকের মত চাউনি এবং ভ্রূভঙ্গি দেখে তারাও ভয় পেয়েছিল—রামার খি-খি হাসি তখন বন্ধ। হনুমান-শিকারীর হাতের বাঁটুল জোড়া ধনুক দেখে গাছের মাথার হনুমানগুলোর যেমন সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়—তখন তার অবস্থাটাও তেমনি। বাঁচালে জান্‌কী। পিসীর ঠোঁট নড়বার আগেই সে কাঁদতে কাঁদতে বললে—পায়ে হুঁচোট লাগল।

এবার বাঁটুল ছাড়লে মামী। নেকড়ানীর মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, চোখ ছিল কোথা? চোখ? হারামজাদী—টেরা-চোখী?

—ছুটে আসতে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামী বললে, হারামজাদী নাচনেওয়ালী, এত নাচনা কিসের লাগল তোর? ছুটলি কেনে তুই? বলতে বলতে সে আক্রোশভরে এসে ধাঁ করে বসিয়ে দিলে এক চড় জান্‌কীর গালে। নেকড়ানী মারলে তার থাবা।

নরসিংয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার করে উঠতে। কিন্তু পারে নাই। আশ্চর্য—গোটা জীবনেই সে পারে নাই নেকড়ানীর প্রতি ভয়টাকে মুছে ফেলতে। কত বার সে ভেবেছে—কিসের ভয়? মামার খায় না সে আর। সে গিরিবরজার সিংহরায় বংশের ছেলে—মামা ধরণী সিং সিংহরায়দের চেয়ে ইজ্জতে অনেক ছোট, মামী আরও ছোট ঘরের মেয়ে। তার পায়ের ধুলো পড়লে তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার কথা—কেন ভয় করবে সে?

চাকরি করে যেদিন সে মাইনে পেলে, সেদিন পাঁচটা টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেদিন সে ভেবেছিল—পাঁচ টাকা দিয়ে সে প্রণাম করবে মামাকে। মামীকে সে প্রণামই করবে না। মাইনে বলবে—পঁচিশ টাকা। মামীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠবে। মামী বলবে—কি বাবা? মামী এত ছোট হল? মামাকে দিলে পাঁচ টাকা, আর মামীকে মনেই পড়ল না।

সে বলবে—গিরিবরজার সিংহরায় আমরা। আমরা ছোট জাতকে প্রণাম করি না। সে মামীর বাপ তুলে, জাত তুলে গাল দেবে। বহুত বহুত কড়া কথা শুনিয়ে দেবে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা—মামীকেই সে প্রণাম করলে আগে টাকা দিয়ে। চারটে টাকা দিয়ে ফেললে।

মামী খুশী হল। সে বললে, বলো বেটা। বেঁচে থাক। বহুত রোজগার কর। মামী বলে মনে রাখিয়ো। একঠো বেটা নাই আমার যে আখেরে আমাকে দেখবে। একঠো বেটী নাই যে জামাই আসবে একটা—সে পেটের বাচ্ছার মত যতন করবে। তুমি ছাড়া কে আছে আমার।

তার পর মামী ডাকলে—জান্‌কী! জান্‌কী! আরে হারামজাদী বদমাশ! দেখ্‌, বেটা দেখ্‌। ভাইয়ের বেটীকে আনলাম কি আমার সুখ দুখ দেখবে। হারামজাদীকে করন দেখ্‌। কোথায় গেল পাত্তা নেই।

মামী বকতে বকতে উঠে গেল। উঠে গিয়েছিল—নরসিংয়ের জন্তে মিঠাই কিনবার ব্যবস্থা করতে। সেই সময় বাড়ি ঢুকল জান্‌কী। বিকেল বেলা পুকুরে গা ধুয়ে এল সে—গায়ে ভিজে কাপড় সেঁটে লেগে গিয়েছে।

নরসিংয়ের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল। কিশোরী জান্‌কীর দেহে তখন যৌবনের রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। এতদিন চোখে পড়ে নাই। আজ হঠাৎ সেটা পড়ে গেল। নরসিংয়ের হয়তো এতদিন চোখ ছিল না; চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে তার মেজবাবু। সেদিন ডিপোর ঘরের স্মৃতি মনে পড়ল। বুকের মধ্যে আগুন ধরে গেল।

মেজবাবু বলতেন—এই ঘটনার ঠিক দু দিন আগে মেজবাবু বলেছিলেন, স্বকর্ণে শুনেছিল নরসিং; মেজবাবু বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—ঘাটে সাবান মাজছিল দুপুরবেলায়, নামলুম ঘাটে পা ধুতে। এক হাত ঘোমটা দিলে—সরে দাঁড়াল এক পাশে। কুড়িটা টাকা আলগা করে রুমালে বেঁধে বুক-পকেটে রেখেছিলাম, ঝম করে ফেলে দিলাম ঘাটে, যেন পড়ে গেল পকেট থেকে। উঠে চলে এলাম। থাকল পড়ে ঘাটের জলে। পাঁচ মিনিট পর ফের গেলাম। দেখলাম রুমাল নাই। উঠে আসবার সময় বলে এলাম, হাত ভরে দোব টাকায়। সন্ধ্যেবেলা থেকো ঘাটে।

হা-হা করে হেসেছিলেন মেজবাবু। বলেছিলেন, বিশে হয় না পঞ্চাশ, পঞ্চাশে না হয় একশ, শয়ে না হয় হাজার। তাতেও না হয়, একটু তাকে থাকতে হবে। যখন একলা নির্জনে পাবে, জোরসে টেনে নাও। বাস্, চুপ হয়ে যাবে। আবার হাসি—হা-হা-হা-হা!

শয়তান! মেজবাবু শয়তান! শয়তানের সে হাসি মধ্যে মধ্যে আজও কানের পাশে বাজে।

জান্‌কী, তুই—তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস নরসিংকে। নইলে নরসিংয়ের দুনিয়া হয়ে যেত মেজবাবুর দুনিয়া, শয়তানের দুনিয়া।

মনের আগুনের আঁচে অধীর হয়ে মেজবাবুর ওই মন্তরের মায়ায় নরসিং তাঁকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। আশ্চর্য—ছোটবেলার কাদার মত নিরীহ বোকা মেয়ে, তার সেই টেরা চোখে বিজলী খেলে গেল সেদিন। নরসিং কটা-টাকা হাতে নিয়ে লুফছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন। জান্‌কী আগুন-ছড়ানো টেরা-দৃষ্টিতে চেয়ে বারকয়েক শুধু থুথু ফেললে—থু! থু! থু! থু!

নরসিং এবার আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না, মেজবাবুর মন্তর মনে পড়ল তার, সে জানকীকে টেনে বুকে চেপে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কী তার হাতের ভারী রুপোর কাঁকনি দিয়ে মারলে নরসিংয়ের ভ্রূর উপর। কেটে গেল ভ্রূটা। দরদর করে রক্ত ঝরে নরসিংয়ের মুখ ভাসিয়ে জান্‌কীর মুখের উপর ঝরে পড়ল।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে।

ডান হাতে স্টীয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়িটার মুখ পাশের রাস্তায় বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বাঁ হাতখানা আপনি গিয়ে পড়েছিল ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগের উপর। জান্‌কী তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল নরসিং। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করেছিল সমস্ত রাত্রি। পরের দিন রাম এসেছিল। গাধার মত উল্লুক রামা। কোনদিন তার বুদ্ধি ছিল না—কোনদিন হবেও না। এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেছিল—দিদি বললে—এক টাকার আফিং কিনে দিতে। টাকাটা সে নিয়েছিল। বলেছিল—বলিস আমি নিয়ে যাব সন্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যের গিয়ে মামীকে বলেছিল—মামী, জান্‌কীকে আমি বিয়ে করব। দেবে?

রাজপুতের মেয়ে জান্‌কী—বড় হয়ে হয়ে উঠল সোজা তলোয়ারের মত লম্বা—সেকালের রাজপুতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো হয়ে উঠেছিল মনে, মেজাজে। আশ্চর্য! ছোট-বেলার সেই কাদার মত মেয়ে!

মদ খেলে সে কিছু বলত না। মদ তো খায় রাজপুত মরদ। মদ যদি না খাবে তো রক্ত চন-চন করবে কিসে? কিন্তু ব্যভিচারের কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে যেত তবে সে তলোয়ারের ধারের দিকটার মত ধারালো হয়ে দাঁড়িয়ে বলত—খবরদার! কখনও ছোঁবে না তুমি আমাকে। কখনও না।

ভয় পেত নরসিং।

জান্‌কী বলত—আমাতে তোমার মন না ওঠে, দিল্ না ভরে, আর একটা দুটো তিনটে শাদি কর তুমি। কিন্তু এ কাজ—এ পাপ করে আমাকে ছুঁতে পাবে না তুমি।

জান্‌কী, তোকে হাজারো লাখো আশীর্বাদ! অক্ষয় স্বর্গে বাস হবে তোর।

জান্‌কীর দৌলতেই তার এ সমস্ত কিছু। সে-ই বলেছিল ট্যাক্সি করতে। সেলাম মেজবাবু, তোমাকেও সেলাম। তুমি শয়তানই হও আর যাই হও, তোমাকেও সেলাম। তুমিই বলেছিলে—নরসিং, রহমতের কাছে ড্রাইভিংটা শিখে নে দেখি। রহমতটাকে জবাব দোব আমি। মুখের উপর উত্তর করে ও আমার।

রহমতের কাছে সে ড্রাইভিং শিখেছিল। এ ইচ্ছাটা তার বুকের ভেতর আগে থেকেই জেগেছিল। গাড়িখানা ছুটে চলে, হু-হু করে যেন উড়ে যায়, ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে, গরম হাওয়ায় সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে, ছোই দূর-দূরান্তরের ছোট্ট জিনিসটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে

কাছে চলে আসে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল দূর চলে আসে পায়ের তলায়। নেশা—অদ্ভুত নেশা। মদের নেশায় দুনিয়াটা টলে। এতে তার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পিছনে চলে যায়। চল—চল—চল। কোই রোখনেওয়ালা হ্যায়? নেহি হ্যায়। চল—চল—চল। পাশ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চলে যায়—গাছপালা, রাস্তার ধারের যা কিছু—সব কিছু, আর দূরে পাশে ঘুরপাক খেয়ে ঘোরে সমস্ত কিছু। এত বড় দুনিয়া—একটুকু—এইটুকু ছোট হয়ে গেল। চল—চল—চল।

নিতাই বললে—স্পীড্ কমান সিংজী। এই মোড়েই তো সব নামবেন।

নরসিংয়ের সংবিৎ ফিরে এল। অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলে নিলে।

জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে—মোড়ের মাথায়।

আট

জোসেফ দাঁড়িয়েছিল বাজারের চৌমাথার ধারে। নরসিংয়ের মোটর থামতেই সে একটু হেসে নমস্কার করে বললে—আরম্ভ করে দিয়েছেন?

জোসেফের নমস্কারটা নরসিংয়ের ভাল লাগল না। গিরবরজার হাড়ীর ছেলে। সিংহরায়দের অদৃষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়ার পরিণাম। জোসেফের দোষ কি? তবুও সে প্রতিনমস্কার না করে পারল না। হোক সে গিরবরজার হাড়ীর ছেলে, তার হাড়ীত্বের একবিন্দু ছাপ আর কোথাও নাই যে, তাকে সেই বলে অবহেলা করা যায়। আচারে-আচরণে, কথায়-বার্তায়, ধারায়-ধরনে সে সর্বাংশে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, তাকে নমস্কার না করলে জোসেফের অপমান হবে না, জোসেফ ছোট হবে না, নরসিং নিজেই ছোট হয়ে যাবে, নিজেরই বার বার মনে হবে—এটা অভদ্রতা হল, নমস্কার না করাটা ঠিক হল না। সে একটা ম্লান হাসি হেসে প্রতিনমস্কার করলে।

নিতাই অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রামার সঙ্গে কথা বলছিল। ওই জোসেফকে নিয়ে কথা। কাল রাত্রি থেকেই সে জোসেফের উপর বিরূপ হয়ে রয়েছে। সে রামাকে মৃদুস্বরে বললে—বেটা হাড়ী খেরেস্তান হয়ে যেন রাজা হয়েছে। সাপের পাঁচপা দেখেছে। একবারে যেন লাট-সাহেব বনে গিয়েছে।

জোসেফ এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। নরসিংয়ের পাশের দরজাটার উপর কনুই রেখে হেঁট হয়ে গাড়িতে উপবিষ্ট নরসিংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরলে—খান।

ভাল সিগারেট, গোল্ডফ্লেক। নরসিংয়ের গোল্ডফ্লেক না-খাওয়া নয়। মেজবাবুর দৌলতে অনেক ভাল সিগারেট খেয়েছে। গোল্ডফ্লেক, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ, থ্রি কাস্‌ল্। মেজবাবুর চাকরটা দিত। দিলদরিয়া মেজবাবু গাড়িতে হামেশাই সিগারেটের টিন ফেলে যেতেন।

অধিকাংশ সময়েই আর খোঁজ করতেন না। খোঁজ করলে কিন্তু একটি সিগারেট কম হলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন। এই খোঁজের একটা সময় ছিল। সেই সময়টা পার হলেই নরসিং সিগারেটের টিনটা পকেটে করে একবার মেজবাবুর কাছে অকারণে ঘুরে আসত, দেখত মেজবাবু নতুন টিন খুলে সিগারেট টানছেন। সেও ফিরে, খানিকটা এসে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে হাপরের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গ্যারেজের দিকে চলে যেত। ভারী মিঠা সিগারেট এটা। নরসিং নিজেও কখনও কখনও দু-চার প্যাকেট কিনে খেয়েছে শখ করে। চার আনা প্যাকেট। একটা সিগারেট দেড় পয়সার উপর দাম। এ সিগারেট কি তার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের খাওয়া পোষায়?

গোল্ডফ্লেকের লোভ সে সামলাতে পারলে না। সিগারেট টেনে নিয়ে মুখে পুরে দেশলাই জ্বাললে; আগে সে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলে জোসেফের সামনে, তার পর নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা হল—ওর এই সিগারেট দেখার আগ্রহের মধ্যে দিয়েই সে যেন বলতে চাচ্ছিল—মনটা ঠিক তোমার দিকে দিতে আমি অনিচ্ছুক।

জোসেফ বললে—সিগারেটটা ভাল।

নরসিং হেসে বললে—না-খাওয়া নই। ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ—

বাধা দিয়ে জোসেফ বললে—স্টেট এক্সপ্রেসটা বড় নরম।

—হ্যাঁ। কিন্তু গন্ধ ভাল। তার পর থি কাস্‌ল্‌। হাসলে নরসিং।

জোসেফ বললে—আমার সাহেব এইটাই খেতে ভালবাসেন। খানসামাটার সঙ্গে আমার হাফ প্রাইসে বন্দোবস্ত। স্টক বেশী থাকলে প্রায়ই দেয়। কম পড়লে তখন খোলা প্যাকেট থেকে একটা-আধটা করে সরিয়ে চার-পাঁচ দিনে এক প্যাকেট পাই।

নরসিং একটু হাসলে। তার পর বললে—আমাদের বিড়িই ভাল, বুঝলেন না। যেমন কলি তেমনি চলি, সময় বুঝে চলতে হয়, যেমন মানুষ তেমনি চাল হওয়াই ভাল। এক পয়সায় আটটা।

জোসেফ হাসলে। বললে—এটা আমাদের উপরি। মাসে মাইনে তিরিশ টাকা; কামাই করলে এক টাকা তো কাটবেই—মধ্যে মধ্যে হাকিমের মেজাজ চড়লে দেড় টাকাও কাটে। তার ওপর ফাইন আছে।

নিতাই এগিয়ে এসে দরজার হ্যাণ্ডেল খুলে বললে—এই আসুন বাবু, এই আসুন।

জোসেফ গম্ভীরমুখে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর ট্রিপ দেবেন না।

—ট্রিপ দোব না? কেন?

—কোচোয়ানেরা জোট পাকিয়ে আমার সাহেবের কাছে গিয়েছে। লাইসেন্স না নিয়ে আর ট্রিপ দেবেন না।

নরসিং বললে—হুঁ! সে এটা অনুমান করেছিল। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার এই কাজে। এ কাজের হাল-হদিস, আইন-কানুন, সে সবই জানে; মোটর সার্ভিসের জন্যে

সরকারের হুকুম চাই, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের হুকুম চাই, পুলিস-সাহেব গাড়ি দেখে পাশ করবে—তবে হবে। তার উপর কথায় কথায় মামলা। বেশী যাত্রী চাপিয়েছ অমনি মামলা হয়ে গেল—দাও ফাইন। কোন কিছুর সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগা দূরের কথা, ছোঁয়াছুঁয়ি হল তো—মামলা; দাও ফাইন। বেলাইনে যদি গাড়ি চালালে তো দাও কৈফিয়ত। যদি মনের মত না হল—হয়ে গেল মামলা। গাড়ির আলো যদি কোনরকমে হঠাৎ বিগড়ে গেল তো হয়ে গেল মামলা। পুলিস রুখতে বললে রুখতে-রুখতে যদি এগিয়ে এসে পড়ল পাঁচ হাত তো নিয়ে নিলে নম্বর, দু দিন পরেই সমন—তার পর মামলা, নির্ঘাত ফাইন হবে মামলায়। সরকারী বাদশাহী সড়ক, গাড়ি তার নিজের; লোকে চাপবে তাদের গাঁটের পয়সা দিয়ে, কিন্তু তাতেও চাই লাইসেন্স—হুকুমনামা। নরসিংয়ের মগজটা গরম হয়ে উঠল। মাথার শিরাগুলোয় যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান ধরে গেল। প্রতি পায়ে আইন—প্রতি পায়ে আইন! জিঞ্জির দিয়ে তামাম মুলুকের মানুষগুলোর পা বেঁধে রেখেছে। নরসিংয়ের দু পাশের রগের দুটো শিরা মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। গিবুবরজার ছত্রীদের এটা বংশগত বৈশিষ্ট্য। রাগ হলেই মাথার দিকে রক্ত ছোটে। সে অবশ্য সকল মানুষেরই ছোটে, কিন্তু গিবুবরজার ছত্রীদের রক্ত ছোটে যেন বেশী পরিমাণে। সেই জন্য রাগ হলে তারা সামলাতে পারে না, দাঙ্গা বাধিয়ে বসে, খুনখারাপি হয়ে যায়, পরকে মারে, নিজেরা মরে, পরের হাতেও মরে, আবার অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শিরা ফেটে গিয়েও মরে, অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক দিয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি বিছানা ভিজে যায়।

নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তা হলে সিংজী ?

নরসিং বললে—এক লোটা জল নিয়ে আয় তো।

নিতাই ডাকলে—রাম! এ রে রামা!

রামা একদল গেঁয়ো-যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হালচাল লক্ষ্য করছে। মোটরে যেতে প্রলুব্ধ করবার কথা ভাবছে। রাজী ওরা চট করে হয় না। পায়ে হেঁটে বিশ মাইল চল্লিশ মাইল চলে যায়; মাথায় বোঝা, কাঁধে বাঁক নিয়ে পুরুষানুক্রমে হেঁটেই চলে ওরা।

নরসিং বিরক্ত হয়ে বললে—তুই নিয়ে আয়।

জোসেফ বললে—একটা কথা বলব ?

নরসিং মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

—চলুন না আমার বাড়ি। একটু চা খাবেন। ওখানে বসেই বরং দরখাস্ত লিখে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাব। আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব। হাজার হলেও আমার মনিব তো! এখানে সাহেব একটা রেকমেণ্ড করে দিলে চলে যাবেন সদর শহরে। পুলিসের কাছে পাস করিয়ে—ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পারমিশন নিয়ে কালই আবার ফিরে আসবেন।

নিতাই জল নিয়ে এল নরসিং কোন উত্তর দেবার পূর্বেই। জলের ঘটিটা নিয়ে খানিকটা জল ঢক ঢক করে খেয়ে বাকীটায় মুখ কান ঘাড়টা ধুয়ে ফেললে, খানিকটা জল মাথার উপর

দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। তার পর বললে—চলুন, তাই চলুন।

যেমনি অদৃশ্য রাসায়নিক কালির লেখা ফুটে ওঠে আগুনের উত্তাপ পেলে, তেমনি ভাবে পুরানো ছত্রীরা নতুন কালের ছেলেদের মধ্যে জেগে ওঠে ওই রক্তগরমের মধ্যে দিয়ে; ঠাণ্ডা জলে নরসিংয়ের মাথার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হতেই সে একালের মানুষ হয়ে উঠল। মামীর কঠোর তিরস্কারে ত্রস্ত হয়ে যে নরসিং বড় হয়েছে, ইমামবাজারের বাবুদের বাড়ির দয়ার অন্নে সংস্কারের বাঁধনের মধ্যে থেকে যে নরসিং পথ খুঁজে নিয়েছে, মেজবাবুকে সেলাম বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে যে নরসিং খুশী হয়েছে, ড্রাইভার রহমতকে তোয়াজ করে যে নরসিং ড্রাইভিং শিখেছে—সেই নরসিং। যে নরসিং এই গতকাল তামাকওয়ালাকে প্রথমটা ধমক দিয়ে শাসন করার পর তারই কাছে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পেয়ে তাকেই সসম্মানে ভেতরে বসিয়ে শ্যামনগর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে ড্রাইভ করে—সেই নরসিং।

গিরবরজার হাড়ীর ছেলের বাড়ি। কিন্তু 'শূয়ার খুপরি' নয়। গিরবরজার ছত্রীরা হাড়ী ডোম বাউরীদের ঘরগুলোকে 'শূয়ার খুপরি'ই বলে থাকে। কথাটার মধ্যে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা আছে তাই কথাটা কটু এবং অন্যায় শোনায়, অন্যথায় কথাটা সত্য। ছোট একখানা খড়ো ঘর। জানালা নাই, অন্ধকূপের মত অন্ধকার, ভিতরে ভ্যাপসা গন্ধ। এক কোণে থাকে হেঁসেল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে হাঁস-মুরগী, এক কোণে থাকে দু-চারটে মাটির হাঁড়িতে কিছু চাল ডাল কিছু পেঁয়াজ; চালের কাঠ থেকে "ঝুলানো" শিকেতে ঝোলে ক্ষেতের বা বাড়ির উৎপন্ন দুটো-একটা কুমড়ো; মাচায় তোলা থাকে কাটকুটো ঘুঁটে। রাত্রিতে তারই মধ্যে তারা শোয়। ঘরের বাইরে বাঁশের খুঁটি দেওয়া একটা চালা। চালার এক পাশে হয় রান্না, এক পাশে বসে তাদের দিনের আসর।

জোসেফ গিরবরজার হাড়ীর ছেলে, দু-পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ এসে এখানে খেরেস্তান হয়েছে। তাকে মদের দোকানে দেখে যেমন চিনতে পারে নি নরসিং গিরবরজার হাড়ীর ছেলে বলে, তেমনিই ঠিক চিনতে পারলে না তাদের বাড়িতে এসে তাদের বাড়িটাকে হাড়ীর ছেলের বাড়ি বলে। পাকা দালানকোঠা নয়, মেটে বাড়িই, কিন্তু মেঝে পাকা, দাওয়া পাকা, লম্বা বাংলো ধরনের সারি সারি তিনখানি ঘর, তক-তক ঝক-ঝক করছে। ধবধবে চুনের কলি দেওয়া দেওয়াল, প্রতি ঘরেই বেশ মাঝারি আকারের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। দরজায় দরজায় খেরেস্তানী কায়দায় সাহেব লোকের—বাবুলোকের মত পর্দা ঝুলছে। বাইরের বাঁধানো বারান্দায় খান দুই চেয়ার, গোটা চারেক মোড়া সাজানো রয়েছে। উঠানটা মাটির, কিন্তু চারিপাশে বাঁধানো নর্দমা। উঠোনের এক পাশে তারের জালের একটা বড় বাক্সে কতকগুলি মুরগীর বাচ্চা কিলবিল করছে, পাখা ঝাড়ছে, বড় বড় মুরগীগুলো উঠ'নে নর্দমায় খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা হাঁসও রয়েছে। নর্দমায় রাত্রের বাসী খাবার খাচ্ছে। এদিকে খানিকটা জায়গায় মাত্র গোটা চারেক বেলফুলের গাছ। শীতের সময় তারই মধ্যে গাঁদা এবং মোরগ ফুল লাগানো হয়েছিল, সেগুলি

এই বৈশাখ মাসে শুকিয়ে গিয়েছে, এখনও সেগুলো তুলে ফেলে নি। বেলফুলের ঝাড় কয়েকটা ফুলে ভরে আছে। ঘরের চালের উপর একটা লাউয়ের লতা উঠেছে, কচি লতা, লাউডগা সাপের মাথার মত লতার ডগাগুলা বেঁকে যেন মুখ তুলে রয়েছে। অন্য পাশ থেকে উঠেছে একটা কুমড়ো লতা। দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বাঃ! দিল খুশী হয়ে উঠল।

জোসেফ বারান্দায় উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আসুন, বসুন সিংজী।

নরসিং উঠে এল, আবার একবার সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বললে—বাঃ! ভারী চমৎকার আপনার বাড়ি

জোসেফ হেসে বললে—কি করব, গরীব মানুষ, নিজেরাই খেটেখুটে সব করে নিয়েছি। বসুন। তারপর ডাকলে—কই, মা কই?

বেরিয়ে এল জোসেফের মা। মোটাসোটা প্রৌঢ়া, পরিচ্ছন্ন কাপড় প'রে সাদাসিধে বাঙালী গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতই; কোনখানে খেরেস্তানীর ছাপ নাই। নরসিংকে নমস্কার করে বললে—আপনি আমাদের গিরবরজার সিংহরায় বাড়ির ছেলে? আমার কত ভাগ্যি যে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

নরসিং একটু হাসলে।

জোসেফ ডাকলে রাম এবং নিতাইকে—আপনারা আসুন, বসুন।

রামটা অকারণ লজ্জায় ছোট ছেলের মত মুচকে মুচকে হাসছিল। নিতাই অবাক হয়ে দেখছিল সব। সে হঠাৎ রামকে মৃদুস্বরে বললে—এ শালাদের ভেতরে গুড় আছে, বুঝলি রামা।

নরসিং ডাকলে—আয় রে, বোস্।

রামা উঠে গিয়ে ভাবছিল, কোথায় বসবে, চেয়ারে অথবা মোড়ায়। নিতাই নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল, একটা মোড়া রামার দিকে ঠেলে বললে—বোস্ না রে।

জোসেফ মাকে বললে—একটু চা তৈরী করতে হবে যে।

জোসেফের মা একটু অপ্রস্তুতের মত বললে—চা খাবেন? প্রশ্ন করল সে।

—খাবেন বইকি। আমি নিয়ে এলাম।

জোসেফের মায়ের প্রশ্নটা নরসিংয়ের মনের ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছিল; মনটা মুহূর্তের জন্য বিদ্রোহ করে উঠল। খেরেস্তানের, মুসলমানের দোকানে চা সে খেয়েছে, কিন্তু এরা যে এককালে গিরবরজার হাড়ী ছিল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দরখাস্তও লেখাতে হবে। এস. ডি. ও-র কাছে নিয়ে যেতে হবে এই জোসেফের সঙ্গেই। শ্যামনগর-পাঁচমতি সার্ভিস খুলতে হলে জোসেফের অনেক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বললে—খাব বইকি। তার পর জোসেফের দিকে চেয়ে বললে—আপনি কিন্তু দরখাস্তটা লিখে দিন। আর আজই ওটা যাতে সাহেব রেকমেণ্ড করে দেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

—হ্যাঁ। আমার বোন আসুক, তার হাতের লেখাটা ভাল। তাকে দিয়েই লেখাব।

—আপনার বোন ?

—হ্যাঁ। এখানকার মেয়েদের মাইনর ইস্কুলে চাকরি করে। এখন মর্নিং ইস্কুল, এই এল বলে। জোসেফের কণ্ঠস্বর একটু উদাস হয়ে উঠল—বড় ভাল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস করলে, আর পড়াতে পারলাম না। কি করবে ? মিশনারী ইস্কুল—আমরা ক্রিশ্চান, চাকরির সুবিধে হল, ঢুকে পড়ল চাকরিতে।

নরসিং এ কথার কি জবাব দেবে ? সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এখানে বসতে যে সে অস্বস্তি অনুভব করছিল মুহূর্তপূর্ব পর্যন্ত, সেটুকু এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। নিতাই রামের হাতে একটা চিমটি কাটলে। রামা একবার 'উঃ' করে উঠল, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই খুক্ খুক্ করে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরলে—খান ততক্ষণ। সিগারেট ধরিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—কাল বললেন শুখনরামের গদিতে রয়েছেন। ওখানে উঠলেন কেমন করে ?

নরসিং তার মুখের দিকে তাকালে, মনে পড়ে গেল গত রাত্রের মদের দোকানের কথা। শুখনরামের গদিতে উঠেছে শুনে জোসেফ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল, তার পর বলেছিল, কাল হবে কথা। নরসিংয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, সে বললে—কেন বলুন তো ? ওকেই কাল ভাড়া এনেছি।

নিতাই বললে—বেটা ভুঁড়ের মেলাই টাকা, না মশাই ? তার পর সে আকর্ণবিস্তার দাঁত মেলে বললে—আমরাও ছাড়ি নাই, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া আদায় করেছি।

রামের মনে পড়ে গেল শুখনরামের থলথলে ভুঁড়িটা কেমন ভাবে মোটরের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে দোল খাচ্ছিল। সে হি-হি করে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ গম্ভীর ভাবে বললে—লোকটা ভাল নয়। পাঁচ-সাত বার লোকটার বাড়ি সার্চ হয়েছে।

—বাড়ি সার্চ হয়েছে ? কেন ?

—লোকটা গাঁজা চরস আমদানি করে লুকিয়ে লুকিয়ে।

নরসিং কোন জবাব দিলে না ; তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠল ; বোধ করি অপরিসীম বিস্ময়ই তার হেতু।

জোসেফ বললে—বাইরে থেকে চরস আফিং গাঁজা আনে পেশোয়ারী পাঠান পাঞ্জাবীরা, শুখনরাম এখানে তামাকের ব্যবসার সঙ্গে এ ব্যবসা চালায়। হঠাৎ হেসে বললে—তা না হলে অত বড় ব্যবসাদার নিজে দেহাত যায় ! বুঝলেন ব্যাপারটা ? এখানে ওখানে গাঁয়ে দেহাতে যে সব এজেন্ট আছে তাদের কাছে এ ব্যবসায় মধ্যে মধ্যে নিজে না গেলে চলবে কেন ? এসব কি কর্মচারী দিয়ে চলে ?

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল ছোট্ট একটা তামাকের পেটি। গাড়ি দরুনে তামাক পড়ে থাকল ভাঙা গাড়ির সঙ্গে মাঠে। ওই ছোট্ট পেটিটা সে নিয়ে এল কেন ? মনে পড়ল গদির

সামনে গাড়ি থেকে নেমেই শুখনরাম হুকুম দিলে, ছোটা পেটিয়াটো উতারো আগাড়ি। তার পর ছেলেকে বলেছিল—একদম উপরমে লে যাও, মেরা কামরামে ঠিকসে রাখনা।

কি ছিল সেটাতে?

জোসেফ বললে—তা ছাড়া লোকটা মধ্যে মধ্যে মেয়ে কিনে আনে দেহাত থেকে। গরীব ঘরের মেয়ে—বিয়ে হয় না বদনামী হয়েছে বলে, কি বিধবা, মা বাপে পুষতে পারছে না এমন মেয়ে—লোকটা বুঝে-সুঝে কায়দামাফিক কথাটা পেড়ে মা-বাপকে টাকা ধরে দেয়; নিয়ে আসে। কিছুদিন রাখে বাড়িতে। ওই সব পাঞ্জাবী পেশোয়ারী যারা আসে, তাদের খুশী করে ওদের দিয়ে। মধ্যে মধ্যে টাকা নিয়ে বেচেও দেয়।

নরসিং এবার চমকে উঠল। কথাটা মিথ্যে মনে হল না। জোসেফের খবর পাকা খবর। সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে গেল। সুন্দরী মেয়েটি, সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। মনে পড়ে গেল শুখনরামের সেই বীভৎস ভঙ্গিতে কুৎসিত কদর্য গালাগাল: "আরে হারামজাদী কুত্তি বেশরমী কাঁহাকা! কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে?···আরে মশা, ওই মেইয়া লোকটার বাত শুনবেন?···আড়াই শও রুপাইয়া দেকে উসকে হামি কিনিয়ে আনলাম মশা। উসকে পোখোরকে ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়েসিল চারো জোয়ান—দোঠো মুসলমান, এক আদমী বাগদী, এক হাড়ী।"

চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং।

নিতাই বলে উঠল—ওরে শালা!

রাম ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল প্রায়। তার গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল যখন মোটর-খানা গদির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন গদির ঐশ্বর্যের পটভূমিতে ওই শুখনরামকে দেখে, তার গম্ভীর আদেশদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে একবার ভয় পেয়েছিল। সে দেখাটা যেন অন্ধকারে কোন দুশমনের চেহারা—আবছা চেহারা! আর এই মুহূর্তে সে দুশমনের চেহারাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোসেফের মা এসে দাঁড়াল।—রজনী!

জোসেফ বললে—হয়েছে?

—হ্যাঁ। কোথায় দোব?

—এই যে আমি ঠিক করে দিই। হেসে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে জোসেফ রজনী দাস বললে—একটা টেবিল পাতি? চা দেবার জন্যে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

হঠাৎ নরসিং ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে। দুনিয়ার সব কিছুকে ভেঙেচুরে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে তার। হারামজাদে শুখনরাম, সুদখোর মুনাফাখোর বানিয়া—

লম্বা একখানি ভাঁজা টেবিল এনে সাট করে পেতে ফেলল জোসেফ। তার উপর পেতে দিল একখানা রঙীন চাদর। জোসেফের মা চায়ের কাপ এনে নামিয়ে দিলে। বললে—বলতে ভরসা হয় না, কিছু খাবার দেব? মিষ্টিতে তো দোষ নাই।

জোসেফ হেসে বললে—মায়ের সেকালের ধাঁচ এখনও গেল না। আরও বেশী একটু হেসে বললে—আমরা সব ভাইবোনেরা মা, এক কাজ করি; একসঙ্গে উঠি বসি। তা ছাড়া—। সকৌতুকে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে বললে—কোন মদের দোকানে আমাদের দেখ নি তুমি!

নরসিং চুপ করে রইল।

জোসেফই প্লেটে করে মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। তারপর একটা খাতা পেন্সিল এনে বসল, বললে—আপনার নাম, বাবার নাম, গ্রাম তো জানি—বলুন দেখি, দরখাস্তটা লিখে ফেলি। মেরীর আসবার সময় হয়েছে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ও-জেলার সদর শহরে এস. ডি. ও-র সঙ্গে যে কাণ্ডটা তার হয়ে গিয়েছে—সেই কাণ্ডটার কথা! আগে সে ইমামবাজারে ট্যাক্সি-সার্ভিস চালাত এ কথা জানালেই একটা এনকোয়ারি হবেই। তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও-জেলার। কিন্তু তার উপায়ই বা কি?

জোসেফ আবার তাগিদ দিলে—বলুন?

নরসিং বললে—থাক এ বেলাটা! বলব, খানিকটা কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। আজ বেলা হল।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। আবলুসের মত কালো রঙ, নিতাইয়ের চেয়েও কালো। ধবধবে কাপড়জামায় হয়তো তাকে বেশী কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারী ভাল লাগল নরসিংয়ের। ভারী ভাল লাগল।

জোসেফ বলল—এই যে মেরী। ইনি আমাদের গিরবরজার সিংহরায় বাড়ির ছেলে।

মেরী মৃদু হেসে বলল—নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলে নরসিং।

নিতাই অবাক হয়ে গেল। একেবারে অবিকল স্কুলের দিদিমণি!

জোসেফের সঙ্গে সে দিব্যি কথা বলতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, মদ খেয়ে গালিগালাজ, এমন কি মারামারি করতে পারে। সহজে পাঞ্জা ধরেও বলতে পারে—চলে আও লড়ো পাঞ্জা। কিন্তু জোসেফের বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কিছুতেই 'আপনি' না বলে পারবে না।

রামা কিছুতেই হাসতে পারছে না, মেয়েটার এত কালো রঙ তবু সে হাসতে পারছে না।

মেরী নীলিমা দাস। জোসেফ রজনী পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটি কথা বলে কম। অল্প কয়েকটি কথা বললে সে। বেশ হাসিমুখে কথা বললে—কথাগুলিও বেশ মিষ্টি লাগল নরসিংয়ের। শুধু মিষ্টি নয়—কথাগুলি যেন একটু ভারী-ভারী মনে হল। এ ধরনের ভারী কথা বেশ একটু মানী লোকেরাই বলে থাকে। ওই কালো মেয়েটি বয়সে জোসেফের চেয়ে ছোট, জাতে একসময় হাড়ী ছিল ওর পূর্বপুরুষ, তবুও আশ্চর্যের কথা—এ ধরনের কথা মেয়েটির মুখে বেমানান বলে মনে হল না। সে হাসিমুখে বেশ সহজভাবে বললে—ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাদা বলতেন গিরবরজার গল্প। সিংহরায়দের সিংহদের কথা। ভারী ভাল

লাগত আমাদের। রাজা-রাজড়ার গল্পের চেয়েও ভাল লাগত। সে আরও একটু মিষ্টি হাসি হেসে চুপ করলে।

নরসিং গম্ভীরভাবে বসে ছিল, মেয়েটি আসার পর থেকেই সে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

নীলিমাও এক কাপ চা নিয়ে বসেছিল, সে চায়ের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়াতে নাড়াতে বললে—আবার আপনারা সব করবেন—এই তো আপনি নতুন পথ ধরেছেন।

নরসিং বললে—এতে কি আর সেদিন ফিরে আসে? এবার সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

সে আর এখন মোটর-ড্রাইভার নরসিং নয়, গিরিবরজার ছত্রী সিংহরায় বাড়ির ছাওয়াল সে, কথা বলতে গিয়ে মনে পড়েছে গিরিবরজার একটি গল্প—খুব বেশীকালের কথা নয়, কোম্পানির আমলের কথা। তখন সবে গিরিবরজার ছত্রীদের জ্বালানো আগুনের আঁচে অস্থির হয়ে মা-লক্ষ্মী গিরিবরজা ছেড়েছেন, লাগাম-ছেঁড়া পাগলা লালঘোড়া নিয়ে ঘোড়দৌড়ের খেলা খেলছে ছত্রীরা, মনের ভিতরে ঘর-আলো-করা মতি তখন তারা হারিয়েছে, কিন্তু মাথার পাগড়ির শিরপুছ বাতাসে পিছনের দিকে হেলে না পড়লে তাদের চমক ভাঙে, মনে হয়—এ কি! মাথাটা নুয়ে পড়ল নাকি? সেই সময়ের কথা। পাশের গ্রামে এক সদ্‌গোপ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ছত্রীরা সদ্‌গোপদের বলত—চাষা। বড় বড় সিংহরায়রা বলত,—চাষো। হালে বলদে, ধানে মরাইয়ে ক্ষেতে খামারে, জলকর ফলকরে, বাগ-বাগিচায় লোকটা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল।

লোকে বলত—লক্ষ্মীর সংসার। হঠাৎ লোকটার মাথায় ভর করলে বেওকুফির শয়তানি। সে নীলামে কিনলে সিংহরায়দের কতকটা আবাদী জমি। দখল নিয়ে দাঙ্গা হল। জখম হয়ে পড়ে গেল দু-তিন লাঠিয়াল, ক্ষেতের চসা-মাটির উপর দুশমনের রক্ত শুষে নিলে ছত্রীদের ক্ষেত। হটে যেতে হল সদ্‌গোপকে। তার পর হল মামলা। মামলা গিরিবরজার ছত্রীরা করলে না, করলে সদ্‌গোপ। ছত্রীরা হল আসামী। শিরপেঁচ বেঁধে গোঁফে চাড়া দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে হেলে রইল পাগড়ির শিরপুছ। সদ্‌গোপের বরাত, আর ছত্রীদের মাথায় দেবতা বাবা ভিখারী মহাদেওজীর কৃপা—হঠাৎ সদ্‌গোপটা মরে গেল মামলার মধ্যেই। এর পর একদিন এক সওয়ারী অর্থাৎ পাল্‌কি এসে নামল সিংহরায়দের অন্দরের দরজায়। নামল এক বিধবা ছোট এক ছেলের হাত ধরে। ওই সদ্‌গোপের বিধবা সে। মামলাটা মিটিয়ে নিতে এসেছে। তবে হ্যাঁ, মেয়েটি মেয়ের মত বটে। রূপ তো ছিলই, তার উপর লছমীর প্রসাদ পেয়েছে সে তখন। কপালের উপর চুলের সীমানা বরাবর মাথার ঘোমটা তুলে দিয়ে সিংহরায়ের সঙ্গে কথা বললে। কথার তার ধার কি! প্যাঁচ কি! জেদ না, জোর না, আইন না, তুললে সে স্থায়-অন্যায়ের সওয়াল। বললে—ফৌজদারী মামলা আমি তুলে নিচ্ছি কালই। আপনারা ছত্রী, ব্রাহ্মণের নীচেই আপনারা, চিরকাল আপনাদের আমরা প্রণাম করে এসেছি, রাজা বলে এসেছি। আমার স্বামী ফৌজদারী করেছিল তার জন্ম আমি কসুর মানছি। কিন্তু বিচার আপনাকে করতে হবে! এই আমার নাবালক বাচ্ছা।

এর বাপ টাকা দিয়ে নীলামে জমি কিনেছে। সে, নীলামে তার যোগসাজস থাকে, কোন কারচুপি থাকে বাজেয়াপ্ত করুন তার দাবি। কিন্তু যদি সে কসুর না করে থাকে, তার টাকা যদি হকের হয় তবে তার দাবি কায়েম করবার ভার আপনাকে নিতে হবে। আবার প্রণাম করে সে চলে গেল ছেলের হাত ধরে পালকিতে সওয়ার হয়ে। ষোল কাহার হুম-হুম করে যে শোর তুলতে পারলে না, গিরবরজা গাঁয়ে ওই মেয়েটির মিষ্টি অথচ জোরালো কথা কটি সেই শোর তুলে দিয়ে গেল। গিরবরজার সিংহরায় বাড়ির ঘরের কোণে কোণে যেন সেই কথার ধ্বনি বাজতে লাগল। জমে রইল সে কথা।

সিংহরায় গেল তার পর সদ্‌গোপের বাড়ি। ছেড়ে দিয়ে এল জমি। ছেলের হাতে দিল একটি মিঠাইয়ের ঠোঙা আর বললে, যাও বেটা, তুমার জমি দখল তুমি লে লেও। হামার দাবি ছুট গিয়া।

মেয়েটি বেরিয়ে আবার তাকে প্রণাম করলে, আসন দিয়ে বসালে, তরিবত করে ফল কেটে সাজিয়ে নামিয়ে দিলে সামনে। পান দিলে, আর দিলে এক মোহর প্রণামী। বললে—শুধু তো এতেই আপনাকে আমি রেহাই দিতে পারব না; আমার আরও আরজি আছে। আমার বাচ্ছা বড় না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে দেখতে হবে। নজর রাখতে হবে।

গিরবরজার ছত্রী সিংহরায় পান চিবিয়ে মুখ লাল করে ফিরে এল। লোকে বাহবা দিলে মেয়েটাকে। হাঁ, একটা রানীর মত মেয়ে। আচ্ছা বুদ্ধি, সিংহরায়কে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে দিলে।

হা-হা করে হাসল সিংহরায়। ঠিক কথা। মেয়েলোকের সম্বল হল বুদ্ধি—পাতলা ছুরির মত তার ধার, মিহি কাটে কাটাই ওর ধরম। পুরুষ হল মর্দানা, তার ধরম হল পৌরুষ। সে হল তলোয়ারের মত। পাতলা ছুরি তলোয়ারের গায়ের ময়লা সাফ করে চিরদিন। মাটি লাগলে চেঁচে ফেলে, রক্ত-মাংস লেগে থাকলে সাফা করে দেয়। আমার গায়ে বে-ধরমীর ময়লা লেগেছিল, পাতলা ছুরি সাফা করে দিলে। এতে আর শরমটা কোথায়? নরসিং নিজে তলোয়ার ব্যবহার করে নাই, তার আমলে তার বাপ-দাদাদের মধ্যেও তলোয়ার ব্যবহারের রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলিদান দেখেছে। ছেত্তাদারের কোমরে থাকে ধারালো ছুরি, প্রতিবার বলিদানের পরই সে ওই ছুরি দিয়ে খাঁড়ার রক্ত-মাংস-মেশানো মাটি সত্যিই চেঁচে ফেলে দেয়। যাক সে কথা।

সিংহরায়ের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। লছমীর প্রসাদ পাওয়া, পাতলা ছুরির মত ধারালো-বুদ্ধি যে মেয়ে, যে সওয়ালে হারিয়ে দিয়েছিল সিংহরায়কে, যে ষোল বেহারার পালকি হাঁকিয়ে এসেছিল একদিন গিরবরজা—সে মেয়ে একদিন চার বেহারার ডুলি চেপে এসে উঠল সিংহরায়ের বাপের কাটানো পুকুরের পাড়ে আম-বাগিচার মধ্যে যে এক বাড়ি তৈরি করেছিল আরামখানা নামে, সেই আরামখানায়। তলোয়ারের চেয়ে পাতলা ধার ছুরি তলোয়ারের তাঁবেদারিন হয়ে রইল এর পর চিরদিন।

কথাটা স্মরণ করে নরসিং আজ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে—আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি।

যোসেফ বললে—ও বেলায় কখন আসছেন ?

—ওবেলা ?

—হ্যাঁ, দরখাস্তটা লিখতে হবে, কি সব কথা বলবেন বললেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত উপরের দিকে তুলে দিয়ে নরসিং বললে, আসব। ভেবে হিসাব করে দেখি দাঁড়ান।

—আবার খটকা লাগল ?—হাসল জোসেফ।

—খটকা ?—নরসিং হাসল।

সমস্ত দুপুরটা ভাবলে নরসিং। অনেক ভাবনা। রামা রান্না করলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মন ঠিক করলে। বিকেলবেলা শুখনরাম গদিতে এসে বসতেই সে গেল সেখানে ; একটা চাকর একটা গেলাসে সিদ্ধির ঠাণ্ডাই এনে ধরলে শুখনরামের সামনে। শুখন মদ খায় না, সিদ্ধি, তার পর এক কল্কে চরস, তার পর গাঁজা। শুখন নরসিংকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললে—কেয়া সিংজী আঁা ? আজ পাঁচমতি তো চার-পাঁচ খেপ দিলেন। সার্ভিস খুলবেন ?

নরসিং বললে—খুলি যদি আপনি সুদ্ধ নামেন ব্যবসাতে।

—হামি ? হা-হা করে হাসলে শুখন। আরে সীয়ারাম। সিংজী, উ কেরেয়া খাটাকে কাম হামি পারবে না। হামারা বহুত কাম—ওহি কাম হামি দেখতে পারছি না ভাই।

নরসিং মুখটা এগিয়ে এনে বললে—আপনার সুবিধে হবে মোটর সার্ভিস থাকলে, পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর আপনার মাল আসবে মোটরের মধ্যে।

শুখনরাম চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে, কিন্তু কোন কথা বললে না।

নরসিং বললে—ছোট পেটির মাল আপনার!

শুখনরাম এবার ঘাড় বেঁকিয়ে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নরসিংয়ের দিকে এগিয়ে এল। সে দৃষ্টি দেখে নরসিং একটু শঙ্কিত হল ; চেয়ার টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে মেজবাবু হঠাৎ টেবিলের উপর কনুই রেখে ঝুঁকে পড়তেন ; চোখের দৃষ্টি ছোট হয়ে আসত ; তখন বুঝতে হত মেজবাবুর মেজাজে রাগের পাকে জট পাকাচ্ছে ; কিন্তু রাগটা প্রকাশ করবার উপায় নাই। শুখনরাম আবার উঠে খাড়া হয়ে বসল। তার পর হঠাৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাঁকে-ডাকে কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাতার পর খাতা আসতে লাগত তার সামনে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই শুখন বললে—হামার এখুন অনেক কাম মশায়, আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ।

সন্ধ্যার পর শুখনরাম নিজেই তাকে ডাকলে। ডাকলে একেবারে বাড়ির ভিতরে। একটা চাকর গাঁজা মলছে। একটা তার গা টিপছে। শুখন বললে—বলেন মশা, আপনার বাত!

নরসিং বললে—আমি তো বলেছি। এখন বলেন আপনি।

—কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুচছি।

হাসলে নরসিং—বলবে কে শেঠজী! আমি গিধুবরজার সিংহরায়-বাড়ির ছেলে। শ্যামনগরে কে কি করে, কি দিয়ে ভাত খায় আমি জানি না।!

অনেকক্ষণ পর শুখনরাম বললে—বাস্, হামাকে কি করতে হে'বে বলেন্।

—কি করতে হবে? প্রথম সার্ভিস লাইন খুলতে সাহায্য করতে হবে। দু'শ-চার'শ টাকা ধার দিতে হতে পারে। আমি গাড়ি বন্ধক রাখব অবিশ্যি। আর বিপদে-আপদে দেখবেন—এই আর কি!

—বাস্। ঠিক হ্যায়। হামার বাত হামি দেই দিলাম। বাস্। এই পর্যন্ত—আউর কিছু না। উ সব গাড়িকে বেবসামে হামি নামবে না। উ রাস্তামে সার্বিস—টাকাকে বরবাদ। গাড়ি তো তিন রোজমে লক্কড় ঝক্কড় হইয়ে যাবে। লেকেন—গাঁড়ির বন্ধক লিয়ে টাকা আপনাকে হামি দেবো।

—দেখুন, ঠিক তো?

—ঠিক—ঠিক—ঠিক।

—আচ্ছা, রাম রাম। এখন তা হলে আমি সব ঠিকঠাক করি। গাড়িটাকে পাস করাবার আগে খানিকটা মেরামত করা দরকার। মেরামত সে নিজেই করবে। ডাক্তারি পড়তে গেলে ছাত্ররা যেমন মড়া কেটে চিরে চিরে মানুষের শরীরের সব দেখে শেখে, রহমতের কাছে সে তেমনিভাবেই গাড়ির সব চিনেছে। কতকগুলো পার্টস দরকার শুধু। শুখনরামের কাছে টাকা ধার নিয়ে কলকাতা থেকে সে সব কিনে আনবে। কলকাতা তাজ্জবকে শহর! দিদিয়া বলত বাগদাদের গল্প। বাগদাদের মত আজব শহর। মনে পড়ে রাত্রে রঙ-ধরা চোখে কসবীদের পাড়ার ঝলমলে আলোয় আলো করা রাস্তার কথা। একদিন স্ফূর্তি করে আসবে সেখানে। হঠাৎ নরসিং চমকে উঠল। সিঁড়ির বাঁকের মুখে কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ঘোমটা দিয়ে, সাদা থান পরনে, বেরিয়ে আছে শুধু দুটি নিরাভরণ হাত। নরসিংয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে খপ করে তার মাথার ঘোমটাটি খুলে দিলে।

সেই মেয়ে! গাড়ির চাকায় লেগে দেশান্তরে এসে পড়া মাটির টুকরোর মত শেঠের বাড়ির সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চাইলে। নরসিং মৃদুস্বরে বলল—তোমাকে বেচে দেবে, পাঞ্জাবীর কাছে কি পেশোয়ারীর কাছে।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

নরসিং বললে—পার তো আজ রাত্রে বাইরে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এস।

নিতাইয়ের নেশাটা আজ ভাল জমে নাই। নেশা না জমলে নিতাইয়ের ঘুম আসে না। নরসিং বলে—নেশাটি পুরো হলেই হারামজাদে নদীর দহের মাছ। অথৈ জলে আরামসে থির হয়ে যেন অঙ্গ এলিয়ে দিলে। আর নেশা না হলেই শূয়রকি বাচ্চে ডাঙার মাছ। ঝটপট-ছটফট—উল্লুক কাঁহাকা!

নিতাই দাঁত বার করে হাসে, খুশীমনে হাসিমুখে স্বীকার করে নেয় সিংজীর কথা। বলে—গা-গতরের 'বেথা' না মরলে ঘুম আসে কখনও? আপুনিই বলুন ক্যানে? তা ছাড়া, নিতাই আরও খানিকটা দন্তবিকাশ করে বলে—অল্প খেলে মাথা চনচন করে, তাগদ যেন বেড়ে যায়, মারামারি করতে ইচ্ছে হয়; হা-রে-রে করে ছুটে বেড়াতে আমোদ লাগে। ঘুম পালায় যেন নদী পেরিয়ে ভূতের মত। এর পর গলা নামিয়ে বেশ মিষ্টি মোলায়েম সুরে বলে—আর পুরো নেশা হল, তামাম দুনিয়া দুলতে লাগল, মাটিতে পড়লাম যেন মায়ের কোলে শুয়ে দোল খেতে লাগলাম, কানের কাছে চেঁচান না ক্যানে, চোখ আরও মিটিমিটি করে বুজে আসবে, মনে হবে—শালা বর্গী এল বুঝি। বাস্, তার পর একবার নাক যদি ডাকল তো রাত ফরসা।

নেশা না জমায় নিতাইয়ের ঘুম আসে নাই; বিছানায় খানিকটা এপাশ-ওপাশ করে সে উঠে বাইরে এসে ঘুরছিল।

নরসিংও জেগে আছে। সে ভাবছে। অনেক কথা। নিতাই গল্প করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নরসিং উত্তর দেয় নাই। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বলেছে, মাথায় জল দিয়ে বাইরে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আয়।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শুখনরামের বাড়িটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হল, কেয়াবাৎ! বাড়িটার বাহার যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে বেড়ে গিয়েছে!

বেটা ভুড়িরাম আচ্ছা বাড়িটা হাঁকিয়েছে, পেল্লায় কাণ্ড! আষ্টেপৃষ্ঠে শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে যেন একটা সিন্দুক বানিয়েছে। মাছি গলবার ফাঁক নাই। দরজাগুলোয় ডবল পাল্লা, সামনে লোহার শিক-ঘেরা পাল্লা—পিছনে ইয়া পুরু শালকাঠের দরজা। দাওয়ার খিলেন-গুলো শিকের ফ্রেম এঁটে বন্ধ। উপরের বারান্দার রেলিং আর মাথায় ঝিলমিলির মাঝখানটা পর্য্যন্ত ফাঁক রাখে নাই; সমস্ত কাঠ দিয়ে বন্ধ। হঠাৎ তার মনে হল—দিনের বেলা যেন এগুলো খোলা ছিল। হ্যাঁ, খোলাই তো ছিল। স্থূল বুদ্ধিতে অনেক গবেষণা করেও সে ব্যাপারটার কিনারা করতে পারলে না। যাঃ বাবা, নেশা লাগল নাকি?

সে চমকে উঠল—এ কি? আরে বাপ রে বাপ! তার সর্বাঙ্গে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চমকের সিরসিরে প্রবাহ ছুটে গেল। সে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—সিংজী!

নরসিং অত্যন্ত বিরক্ত হল। মেজাজ তার ভাল নাই। মাথা যেন গরম হয়েছে। 'শ্যামনগর পাঁচমতি' সার্ভিসের ভাবনা, লাইসেন্স চাই। শুখনরাম সাহায্য করবে বলেছে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নাই; শুখনরাম সব পারে। তবে নরসিং বড় কায়দা করে ধরেছে শুখনকে। এখন ভয় হচ্ছে জোসেফকে। জোসেফকে পাশ কাটিয়ে শুখনরামের সঙ্গে দোস্তি করার জন্যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। সে আবার এস. ডি. ও-র ড্রাইভার। সাহেবের কানি না ভারী করে দেয়! 'গরজু' মিটমিটে ডাইন কাঁহাকা! গরজ কত! বলে, আরম্ভ করুন আপনি, আমারও ইচ্ছে আছে একখানা গাড়ি কিনে ওই লাইনে সার্ভিস চালাব। হাড়ীর ছেলে কেরেস্তান হয়ে হুঁশিয়ার হয়েছে। তবে লোকটা মোটের উপর ভাল। তা ছাড়া আজ মদের দোকানেও একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, আর একটু হলেই একহাত বেধে যেত। এইটা একটা খারাবি হয়ে গেল। কজন ড্রাইভার কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে গিয়ে তাসে বসেছিল নরসিং। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ আর সে। মদের বোতল নিয়ে মদের দোকানের পাশেই ডিম, আলুর দম, মাংসের দোকানে। মস্ত একখানা খড়ের চালা, সামনেটায় নড়বড়ে টেবিলের উপর চায়ের ব্যবস্থা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বড় একটা অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল ফুটছে। টেবিলের উপর ময়লা কাপ আর মাটির ভাঁড় সাজানো থাকে। চালার ভিতরে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার, কয়েকখানা বেঞ্চি; চেয়ার এবং বেঞ্চিগুলোর মাঝখানে উঁচু লম্বা টেবিল। সকাল থেকে চায়ের খরিদ্দারেরা জমিয়ে রাখে দোকানটি। সন্ধ্যে থেকে চায়ের আসরে মন্দা পড়ে; উনুনে কড়াই চড়ে। মাংসের কালিয়া, ডিমের কোর্মা, আলুর দমের লোভনীয় গন্ধ উঠতে থাকে। পরোটা ভাজা হয়। দোকানে আসর দুটো—একটা সামনে, একটা পিছনে। চালাটার পিছনে পাঁচিলের ওপাশে একটা আড্ডা, বারোমেসে বাঁধা খরিদ্দারের আসর। দু-চার জন কোর্টের টাউট আছে, রামেশ্বরদের একদল আছে, আরও আছে পাঁচমিশেলী একটা দল—কাপড়ের দোকানের কর্মচারী, ধানচালের দালাল, রঙমিস্ত্রী, হারমোনিয়াম-মেরামতওয়ালা, এমনি ধরনের পাঁচ কারবারের পাঁচটি লোক তারা এক পাশে আলাদা আলাদা মদ মাংস ডিম খায়, গোলমাল বড় করে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে চলে যায়। বড় জোর স্ফূর্তি বেশি জমলে হঠাৎ দু-চার কলি গান গেয়ে ওঠে।

রামেশ্বরদের আড্ডা আলাদা। ওদের প্রথম আড্ডা বসে মদের দোকানে, তার পর বোতল নিয়ে রেস্টুরেন্টের এই ভিতরের দিকে এসে বসে। পাকা বন্দোবস্ত, আপন আপন বসবার আসন পর্যন্ত ওরা কিনে রেখেছে। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ এদের তিনখানা ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ার কেনা আছে। ক্লীনার জাপলা, ফটকে, হাফিজ এদের আছে তিনটে টুল, সাজার অর্থাৎ চাঁদা করে কেনা আছে আরও একটা ইজিচেয়ার, একটা ছোট টেবিল—আসলে সেটা চওড়া টুল, আর একখানা বেঞ্চি। চওড়া টুল অর্থাৎ টেবিলখানাকে মাঝখানে রেখে রামেশ্বররা ইজিচেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের উপর পড়ে তাস। তে-

তাসের খেলা চলে। নিঃশব্দে নির্দিষ্ট তাসখানা সকলকে দু'তিন বার দেখিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দেয় তাস তিনখানা। নির্দিষ্ট তাসখানাকে চিনে তার উপর দান ধরতে হবে।

জোসেফ আজ মদের দোকানে আসে নাই। দোকানে গিয়েই নরসিং খবর পেলে সন্ধ্যাবেলাতেই জোসেফ দুটো বোতল কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়েছে। নরসিং বুঝলে জোসেফ তাদের প্রতীক্ষা করছে বাড়িতে বসে। হুঁশিয়ার শয়তান লোকটা, নরসিংয়ের বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে চায়। হেসে নরসিং বসে গেল দোকানে। ওদিকে আর মাড়াচ্ছে না সে। রামকে পাঠালে ডিম আর মাংস কিনে আনতে। রামেশ্বর এগিয়ে এসে বললে, রাম রাম সিং ভাই!

নরসিং হেসে বলে—রাম রাম!

রামেশ্বরের পিছনে এসে দাঁড়াল রসিদ। সেলাম ভাই।

—সেলাম।

রামেশ্বর হঠাৎ তার হাত ধরে বললে—সব শুনেছি। পাঁচমতি সার্ভিস খুলে দিলেন?

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে—দেখি; চেষ্টা তো করছি।

হাত ধরে টেনে রামেশ্বর বললে—আসুন।

—কোথায়?

রসিদ বললে—আমাদের একটি আড্ডা আছে।

—চলুন নিরিবিলি কথা হবে সেখানে। দোস্তি হবে।

রামেশ্বর বললে—শালা জোসেফটা আজ আসে নাই। ভাল হয়েছে। চলুন।

নরসিং একটু ভাবলে। যদি হাঙ্গামা বাধে! সে একবার নিতাইয়ের দিকে তাকালে। বেটা তোমের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গায়ের জামা খুলে কাঁধে ফেলেছে, মনে হচ্ছে একটা দুর্দান্ত মহিষ দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে রাম এসে দোকানে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ছোঁড়ার লাঠির হাতও ভাল। নরসিং উঠে দাঁড়াল, চলুন।

জাফর দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ধারে। রসিদ গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে—চল্ বে!

জাফর নিঃশব্দে তার দিকে ফিরে তাকালে একবার, তার পর বললে—আসছি।

রামেশ্বর হেসে উঠল, বললে—নজরমে কুছ আগেয়া? যানে দে উসকো।

নরসিং নিতাইকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললে—মাল খাবি না বেশী।

—খাব না?

—না। খাব বাড়িতে গিয়ে। খবরদার। অচেনা লোক, বিদেশ-বিভুঁই।

মন্দ লাগল না আসরটা। হ্যাঁ, আরাম আছে, তোয়াজ করবার মত ব্যবস্থা আছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল নরসিংয়ের। সে একখানা ইজিচিয়ারে বসে বললে—বেশ জায়গা!

নিতাই দাঁত বার করে বলে উঠল—কেয়াবাৎ হায়! গুরুজী আমাদেরও চেয়ার কিনে ফেলুন।

হারমোনিয়ম-ওয়ালাটার চুলের বাহার দেখে রাম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাহবা, বাহবা! থাকে থাকে ঢেউ-খেলানো চুল .টোপরের মত মনে হচ্ছে। সে নিজে চুলের উপর আঙুল দিয়ে ঢেউ-খেলানো থাক তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

রামেশ্বর বললে—জোসেফ শালার সঙ্গে দহরম-মহরম করবেন না। শালা এস. ডি. ও-র ড্রাইভার, শালা গোয়েন্দা হ্যায়।

—হ্যাঁ, উ হামারা মালুম হো গেয়া।

রসিদ মদের গেলাস ভরে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—আজ তো কটা ট্রিপ দিলেন, কি রকম মালুম হল?

—খুব ভাল।—নিতাই বলে উঠল।

—হারামজাদা তোম, বে-আক্কেল—বেকুফ কাঁহাকা! শূয়ারকি বাচ্চার ঘটে যদি এক তিল বুদ্ধি থাকে! মনে মনে চটে উঠল নরসিং, কিন্তু এখানে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। সে হেসে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হয়, কিন্তু রাস্তার যা হাল তাতে তিন মাসেই গাড়ি খতম। আর—। একটু থেমে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হলেও ঘোড়ারগাড়িওয়ালারা ছাড়বে না। ভাড়া নামাবে। তিন-চার আনায় নামাবে। তাহলে তেল আধেলা মুনাফাও থাকবে না। আবার একটু থেমে বললে—সুবিধে বুঝছি না। ভাবছি।

তারপর নিঃশব্দে মদ্যপান চলে।

নরসিং হঠাৎ তুললে শুখনরামের কথা।

রামেশ্বর বললে—বাপ রে বাপ! উ তো একঠো ঘড়িয়াল হ্যায়।

রসিদ বললে—শালা জেনানীর কারবার করে। দেহাতসে জেনানী কিনে আনে—চালান ভেজে কলকাত্তা। উঃ, পরসাদ-ভাই দু-মাহিনা হল একঠো যা ভেজলো! উঃ! শালা জাফর তো গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলে, হামভি যায়গা কলকাত্তা, শিয়ালদহসে উসকো ছিনা লেকে ভাগেগা। শালা!

রামেশ্বর তাস বার করলে।

রসিদ বললে—জোসেফের বহিনটাকে দেখিয়েছিস ভাই পরসাদ! জাফর তো বলে, কেরেস্তান হয়ে ওকে আমি বিয়ে করব। তা মেয়েটা কালোতে খুবসুরাত আছে।

নরসিং বললে—থাক্ ও সব কথা।

—আপনি দেখেন নি?

—দেখেছি।

—আঁ—। হেসে উঠল রসিদ।—নজর গির গেয়া?

—কি সব যা-তা বলছেন? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাদের ভাইবেরাদারের বহিন, লেখা-পড়া শিখেছে—

—ইয়া—। হা-হা-হা। দরদ আগেয়া! রসিদ বীভৎস উল্লাসে হাসতে লাগল। নিতাইও হাসতে লাগল, রামাও হাসছে। নরসিং হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, নিতাইয়ের মাথার চুলের মুঠো ধরে

ঝাঁকি দিয়ে বললে—হাসছিল ক্যানে উল্লুক ? তোর বহিনকে নিয়ে যদি এমনি তামাশা করে ?

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে ভাইয়া, ই কেয়া হোতা হায়। ছোড়দো উ বাত। বৈঠ্ যাইয়ে। এ রসিদ—ঢালো ঢালো।

রসিদ আবার গেলাস ভরতে লাগল। রামেশ্বর তাস বাঁটতে লাগল আপন মনে। গ্লাস শেষ হতেই সে বললে—আসুন দু হাত খেলা যাক। নসিব আপনার দেখি। পাঁচমতি সার্ভিস ভাল চললে আপনার জিত।

তাস খেলতে লাগল সে। ঠোঁটের একটা দিক ঘন ঘন নাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ পাশের নাকের পেটিটা সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। নেশা জমে আসছে রামেশ্বরের।

নরসিং স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রামেশ্বরের হাতের দিকে। লোকটা পাকা জুয়াড়ী। তাস তিনখানা পাশাপাশি ফেলে দিয়ে বললে—ধরুন দান।

নিতাই ঝপ করে একটা সিকি ধরলে একখানা তাসের উপর। উল্লুক বুড়বক মরেছে! সে বিষয়ে নরসিং নিঃসন্দেহ।

রসিদ ঝপ করে ফেললে অন্য একখানি তাসের উপর পুরা আধুলির একটা দান। রামেশ্বর বললে—আপনি ?

নরসিং ভাবলে একটু। সে রসিদের দানের পাশেই ধরলে তার দান পুরা টাকা।

রামেশ্বর তাস উল্টালে। সব ফাঁক। যেখানায় কেউ বাজি ধরে নাই সেইখানাই বাজির তাস। সে দান টেনে নিলে। ফের ফেললে তাস। রসিদ এবার ঝপ করে ফেললে এক টাকা। নরসিং তার দিকে তাকালে একবার। রসিদ এবার ঠিক তাসখানার উপর বাজি ধরেছে। প্রত্যাশা করেছে গতবার ঠকার পর এবার নরসিং তার তাসে বাজি ধরবে না।

নিতাই এক সিকিতেই দমে গিয়েছে।

নরসিং পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে ধরলে রসিদ যে তাসে বাজি ধরেছিল সেই তাসেই।

রামেশ্বর তাকালে রসিদের মুখের দিকে। কি ইশারা হয়ে গেল।

নরসিং বললে—উঠান তাস।

রসিদ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর—ফিন হামারা তাসমে বাজি লাগায়া ?

নরসিং হেসে বললে—হ্যাঁ, আপনার সনেই নসিব জড়ালাম। কই, উঠান তাস।

—সবুর। রসিদ আর একটু ঝুঁকে এসে বলল—এক বাত।

নরসিং বললে—তাস ঢাকা পড়েছে। খাড়া হয়ে বলুন কি বলছেন ?

উত্তরে আরও একটু ঝুঁকে বুকের আড়ালে গোটা টেবিলটাকে ঢেকে দিয়ে রসিদ বললে—আমার নসিবের ভাগা দেনে হোগা। জোসেফের বহিন—। দাঁত মেলে সে হাসতে লাগল। নরসিংয়ের দরদের পরিচয় সে পূর্বেই পেয়েছিল তাই ওই জায়গায় খোঁচা দিতে চাইল।

নরসিং দু হাতে এবার রসিদের দুই কাঁধে ঠেলা দিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলে, কিন্তু ততক্ষণে টেবিলের উপরের তাস টাকা ছিটকে পড়েছে, বাজিটা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রামেশ্বর চীৎকার

করে উঠল—উল্লুক কাহাকা! বাজি বরবাদ করে দিলে।

নরসিং পাঁচ টাকার নোটখানি তুলে নিয়ে বললে—বাজির টাকা দিতে হবে, বাজি আমি মেরেছিলাম।

রামেশ্বর চাকু ছুরিটা বার করে বললে—বসুন। বরবাদ গিয়েছে, ফের ফেলছি তাস। এমন যায়।

—উঁহু! বাজির টাকা না দেন, গত বাজির টাকাটা, নিতাইয়ের সিকিটা ফেরত দেন। আমি উঠব।

রসিদ উঠে দাঁড়াল।—ইয়ে আপকা আবদার হ্যায়, না, কেয়া?

—আবদার নয়—দাবি। নিকলান টাকা।

চাকু ছুরিটা হাতে নিয়ে রামেশ্বরও উঠে দাঁড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে নরসিং তার হাত চেপে ধরলে। ছ ফিটের কাছাকাছি লম্বা নরসিং, তার হাতখানাও সেই অনুপাতে লম্বা। বললে—দেখছেন কতখানি লম্বা আমি? আপনার চাকুর ফলা ছোট, আমার কলিজার সন্ধানও পাবে না।

নিতাইও উঠে দাঁড়িয়েছে নরসিংয়ের পাশে। কালো মহিষের মত চেহারা, তার উপর ছাতিখানা তার উঁচু হয়ে উঠেছে—হাতাহাতি মারামারির সম্ভাবনা। হারমোনিয়ম-ওয়ালার চুলের মোহ কেটে গিয়েছে রামার, সেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসিদ আস্তিন গুটিয়েছে, হ্যাপলা ফটকেও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাফিজ বসে ছিল। সে-ই সর্বাগ্রে গম্ভীরভাবে বলে উঠল—পর্‌সাদ সাহেব অন্যায় আপনাদের। বাজি সিংজী মেরেছিল, রসিদ ভাই অন্যায় করে ভেস্তে দিলে।

হাফিজের কথায়, মুহূর্তে ফেটে পড়বার মত ব্যাপারটা শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল—বার্স্ট হওয়ার বদলে, পাংচার হওয়া মোটরের চাকার মত চুপসে গেল। সকলেই তাকালে হাফিজের মুখের দিকে। রামেশ্বর বললে—ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, বসুন। নরসিং হাত ছেড়ে দিলে, কিন্তু বসল না, আসর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে—নিতাই, রামা, আয়। বেরিয়ে আসবার সময় দরজার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে হাফিজকে বললে—সেলাম ভাই দোস্ত। চললাম।

চলে এল ওখান থেকে। কিন্তু মদের বোতলটা উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেল। ওদিকে তখন মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন অচেনা জায়গা, মদের দোকানের খিড়কির দরজাটা জানা নাই; নিতাই কপাল চাপড়াতে লাগল। নরসিং খারাপ মেজাজ নিয়ে বসে আছে। মদের জন্যই যে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে তা ঠিক নয়, জোসেফের বোন মেরী বেচারীকে খামকা অপমান করলে; সে অপমানের নিমিত্ত হল সে-ই। জোসেফ কালই ওদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল। খামকা লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল; হয়তো ওরা এর পর শত্রুতা করতে আরম্ভ করবে। তার ভরসা শুখনরাম। শয়তান বদমাশ শুখনরাম। সবাই এক কথা বলছে। ও আবার শেষ পর্যন্ত কি করবে কে জানে? নরসিংয়ের একমাত্র অস্ত্র—শুখনরামের গোপন আবগারীর মাল আমদানির সন্ধান পেয়েছে। তার গাড়িতে সে মাল

এনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু শয়তান যদি শেষ পর্যন্ত ওকেই ধরিয়ে দেয়? কিছু বিচিত্র নয়, শুখনরাম সব পারে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠেছে নরসিংয়ের; সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়টিতেই নিতাই সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—গুরুজী!

নরসিং চমকে উঠল চিন্তায় বাধা পেয়ে, রূঢ়দৃষ্টিতে ফিরে তাকালে সে নিতাইয়ের দিকে।

—উঠে আসুন। তাজ্জব ব্যাপার!

—কি?

—আসুন না উঠে। চুপি চুপি। মজা দেখবেন আসুন।

নিতাই তাকে নিয়ে রাস্তায় একটা গাছতলায় দাঁড়াল। • ওই দেখুন।

নরসিংয়ের বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আগুনে পোড়ানো ভাঁটার মত হয়ে উঠল।

সাদা কাপড় পরা, মাথা পর্যন্ত ঢাকা। স্ত্রীলোক, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরেছে। মেথর-ঢোকা গলির মধ্যে শেঠজীর বাড়ির পাঁচিলের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে পড়বে। বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল। আজই সন্ধ্যার আগে শুখনরামের সিঁড়ির কোণে দেখা হয়েছিল, সে আসতে বলেছিল। বুকের ভিতর যেন মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল তার। ছুটে সে এগিয়ে গেল। অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য মেয়ে! নরসিং তাকে মাটিতে পড়তে দিলে না, তার দীর্ঘ মজবুত হাত দুখানা মেলে দিয়ে মেয়েটাকে সে লুফে নিলে।

মেয়েটা চমকে উঠল, তার পরই কিন্তু চাঁদের আলোয় নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

নিতাই ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ সেই পথের ধুলোর উপরেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলে। —শালা! ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রে বাবা!

ফট্‌কির গ্রামের লোকেও ঠিক এই কথা বলে। ফট্‌কি মেয়েটার ডাকনাম। ভাল নাম একটা আছে, কিন্তু সে গ্রামের লোক কেউ জানে না। ফুটফুটে মেয়ে, স্ফটিকের মত উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহবর্ণ দেখে ছেলেবেলায় ফটিক থেকে স্ত্রীবাচ্যে ফট্‌কি বলে ডাকত। সে নাম পরিবর্তন করার কোন হেতু ঘটে নাই। বাল্যের লাবণ্য গ্রামের ধুলায় মাটিতে দারিদ্র্যের স্পর্শে মলিন হয় নাই, সূর্যের উত্তাপেও তার রঙ তামাটে হয় নাই। বরং বিপরীতই হয়েছে। রঙ তার দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠেছে।

ছেলেবেলায় তার মা তাকে নাচিয়ে আদর করত—'রাঙা মাটির ছবি দেখলে তোরা পাগল হবি'। তিন-চার বৎসর বয়স হতেই রঙীন ফেরানী পরে পাড়ায় বেড়াতে বার হলেই লোকে তাকে কোলে তুলে আদর করত। বাঃ, ভারি ফুটফুটে মেয়ে! কি নাম তোমার?

—ফট্‌কি।

—বা-বা-বা! ফুট্‌ফুট্‌ ফুট্‌ ফটিকমণি!

পাড়া-ঘরের ছেলের মায়েরা বলত—বউ করতে হয় তো এমনি। হ্যাঁ গো ফটিক, আমার বেটার বউ হবে?

ফটিক হেসে ঘাড় নেড়ে বলত—হব।

আর একটু বয়স বাড়ল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে খেলার বয়স হল—তখন ছেলের দলের ঝগড়া বাধতে আরম্ভ করল ফট্‌কির স্বামিত্ব নিয়ে। ফট্‌কির পক্ষপাত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে নির্বিকারচিত্তে দেখত তাদের ঝগড়া; তার পর পুরাকালের বীর্যশুল্কার মত যেদিন যে বিজয়ী হত, তার খেলাঘরেই বউ সেজে বসত।

আর একটু বয়স হল, ফট্‌কি তখন ফেরানী ছেড়ে কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা তার নাম দিলে 'ফটিকজল'। ফট্‌কি মুখ টিপে টিপে হাসত, স্বাদ বুঝবার বয়স তখনও নয়, কিন্তু গন্ধটা মিষ্ট লাগত।

এই সময়েই হল তার বিয়ে। দশ বছরের মেয়ে, আঠারো বছরের বর।

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর"—প্রবাদবাক্যটা ফলে গেল ফট্‌কির কপালে, বছর পার না হতেই ফট্‌কি বিধবা হল; সব মনে পড়ে ফট্‌কির। বর মরে যাওয়ার সংবাদে ফট্‌কির দুঃখ হয় নাই, সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আঠারো বছরের জোয়ান চাষীর ছেলে, তাকে দেখে তার ভয় হত। এক বৎসরের মধ্যে বার তিনেক সে এসেছিল ফট্‌কির বাপের বাড়ি, প্রতিবার ফট্‌কি কেঁদেছিল; এখন তার মধ্যে মধ্যে তাকে মনে পড়ে দুঃখ হয়। আর সেই লম্বাচওড়া দেহ, চওড়া ছাতি মনে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য ফট্‌কি নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

আরও বছর দুয়েক গেল। দুনিয়ায় হঠাৎ রঙ লেগেছে মনে হল ফট্‌কির। মা-বাপ সাবধান করত তাকে, বাইরে যেতে বারণ হল; যেতে হলে মায়ের সঙ্গে যেতে হবে। একা বাইরে বার হলেই দু'পাশের বেটাছেলের চোখ তার উপরে এসে পড়ে; ফট্‌কি সংকুচিত হয়, অস্বস্তি অনুভব করে—বুকের ভিতরটা গুরুগুরু করতে থাকে। একলা দেখলে অল্পবয়সীরা হেসে তাকে হাসাতে চেষ্টা করে; মুখ নামিয়ে চলে যায় ফট্‌কি। তারা গান গায়, ছড়া কাটে। একটা ছেলে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারত। সে ছড়া বাঁধলে একটা নয় দু-চারটে!—

ফটিক জল, ফটিক জল, ও হায়, তেষ্টাতে ছাতি ফাটছে।
নাইকো খাওয়া নাইকো ঘুম, বড় দুঃখেতে দিন কাটছে।

আরও একটা মনে আছে—

ফটিক জল একবার মুখটি তোলো
মুচকি হেসে একটি কথা বলো।
ওগো একটু ফিরে চাও—আমার মাথা খাও।

মরণ। ফট্‌কির হাসি পেত। হাস্‌তে তার ইচ্ছা হত। কিন্তু ভয়, একটা আতঙ্ক তার বুকের ভিতরের সেই অদ্ভুত শিহরণকে স্তব্ধ করে দিত। দুটোর ধাক্কায় সে কেমন হয়ে যেত। দুনিয়া হয়ে উঠত তেতো, কিছু ভাল লাগত না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হত, ছুতোনাতায় ঝগড়া —সে উপোস করে কাঠের মত হয়ে থাকত। তখন সে সব বুঝেছে। বুকের ভিতরের অস্বস্তিটা আগে ছিল ধোঁয়ার মত, এখন সে যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সত্যিই, ফট্‌কির মনে হত শরীর তার জ্বলছে। পুকুরের জলে নেমে সে আর উঠতে চাইত না, শুধু মাটির উপর শুয়ে থাকতে ভাল লাগত। রাত্রে মা-বাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই সে শুয়ে থাকত, ঘরে এসে খিল দিয়েই সে বিছানা তুলে ফেলে দিত। ঘুম হত না। জানালায় মধ্যে মধ্যে ঠুকঠাক শব্দ উঠত, ঢেলা লাগত জানালায়। কখনও শিসের শব্দ উঠত। কখনও চাপা মিহিগলায় গান শোনা যেত।

হঠাৎ একদিন মনে হল, কোঠা-ঘরের জানালায় কে যেন উঠে বসেছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কোঠাঘর। পাশাপাশি দুখানা কুঠরি, দক্ষিণের কুঠরিতে শোয় মা আর বাবা, উত্তর দিকের কুঠরিতে ফট্‌কি। উত্তর দিকের জানালাটা খোলা বারণ। ও জানালাটায় বাবার নজর চলে না। শব্দ শুনে ফট্‌কি উঠে বসল, বুকের ভিতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে। চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছিল তার প্রথমে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, না। সে স্থির চোখে চেয়ে রইল জানালাটার দিকে। শব্দ হল—একটা কিছু যেন ভেঙে গেল। কি ভাঙল? কাঠের গরাদে? সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ঘরের অসমান জানালার জোড়ের ফাঁকের ভেতর একটা শিক চালিয়ে ঠেলে জানালার খিলটা খুলে ফেললে বাইরে থেকে। একটা মুখ ঢুকল গরাদে ভাঙা জানালা দিয়ে। গাঁয়ের বড় মোড়লের ছেলে। এতক্ষণে তার যেন চেতনা হল, সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে, খিল খুলে সে দরজা টানল, কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শেকল বন্ধ। মা-বাবা তার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ রাখে। পিছন থেকে এসে জোরে জড়িয়ে ধরে ফেললে বড় মোড়লের ছেলে। সে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলে, ডাকলে—বাবা, বাবা গো!

মোড়লের ছেলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠল—খুন করে ফেলাব।

ও-ঘরে বাবার শব্দ পাওয়া গেল, সে ভূত দেখে ভয় পাওয়া লোকের মত বু বু করছে, মা চেঁচিয়ে উঠল স্পষ্ট ভাষায়—মেলে গো, খুন করলে গো!

ফট্‌কি তখন স্তব্ধ। মোড়লের ছেলে আবার চীৎকার করে উঠল—দুয়োর ভেঙে গিয়ে কেটে ফেলাব। হ্যাঁ।

মা-বাবা চুপ হয়ে গেল।

মোড়লের ছেলে আবার ওই ভাঙা জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল, জানালা দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটির উপর। ফট্‌কি তখন অজ্ঞানের মত পড়ে।

সেদিন ফট্‌কির চিরকাল মনে থাকবে।

পরদিন বাবা-মা তাকে গালাগালি করলে। বললে—তুই জলে ডুবে মর্, বিষ খেয়ে

মর্, গলায় দড়ি দে।

সে কি করবে? সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মা-বাপের মুখের দিকে।

—কে? লোকটা কে বল্?

সে বললে—বড় মোড়লের ছেলে।

বাপ বললে—নালিশ করব আমি।

মা বললে—চেঁচিয়ে পাড়া গোল করো না। কেলেঙ্কারির সীমা থাকবে না। জাতে পতিত করবে। চাষার খেঁটে কোথাকার!

বাপ গেল বড় মোড়লের কাছে। কি হল কে জানে! তবে বাবা ফিরে এল বড় মোড়লের কাছে জমি-বন্ধক-দেওয়া বন্ধকী দলিলখানা হাতে করে। বললে—যা হয়েছে তা হয়েছে, মোড়ল বলেছে আর হবে না।

ফটিকি সমস্ত দিন যেন মাটির পুতুলের মত বসে রইল। রাত্রে মা বাবা সেসকলে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা হল। মা বাবা ঘুমিয়ে গেল, তার কিন্তু ঘুম এল না, একটা আতঙ্ক যেন তাকে অস্থির করে তুলছে। রাত্রি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও বাড়ছে। পেঁচা ডেকে গেল, সে চমকে উঠল। মনে হল, কে শিস দিয়ে গেল। ডাঁকপাখি ডাকছে, ফটিকির মনে হচ্ছে কেউ কুক দিচ্ছে। চাষীর ঘর, ইঁদুর বেড়াচ্ছে, শব্দ উঠছে, ফটিকির মনে হচ্ছে ওপাশের ঘরের জানালায় কেউ উঠে জানালা খুলছে। ঘুম এল তার শেষরাত্রে। তাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে সে গোঙাতে লাগল; মনে হল, কে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মা তাকে জাগিয়ে তুললে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলে না, কি দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল।

দিন কয়েক পরই আবার একদিন সন্ধ্যার সময়। গোয়ালে সে গরু বাঁধছিল। হঠাৎ বড় মোড়লের ছেলে গোয়ালে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।—চেঁচিয়ো না। চেঁচালে আমার কচু, তোমারই কলঙ্ক।

ফটিকি চেঁচালে না।

পরের দিন আবারও সে গোয়ালঘরে ঠিক সময়ে এসে ঢুকল।

একদিন বাইরে থেকে আর কয়েকজন ছোকরা এসে শেকল দিলে ঘরে। মোড়লের ছেলে ফট্‌কিকে নিয়ে মাচায় উঠল, কাস্তে দিয়ে চালের বাখারি কেটে ফট্‌কিকে নিয়ে চাল ফুঁড়ে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

মোড়লের ছেলেকে চিরদিন মনে থাকবে তার। তার বুকে সে বাঘিনীর সাহস জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, দিনে ফট্‌কি সে সাহস খুঁজে পায় না। রাত্রির অন্ধকার যত ঘনাতে থাকে ফট্‌কির বুকে সাহসও তত জাগতে থাকে, কয়লার আঁচের মত। সন্ধ্যা থেকে যে ধোঁয়ায়, প্রথম প্রহরে সে থমথম করে, চৌকিদার হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সে যেন ধক ধক করে জ্বলে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন পুড়িয়ে ছাই করে সে তখন বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ মরে গেল মোড়লের ছেলে। যেমন মানুষ তেমনি মরণ। প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠেছিল কচি পাতা কাটবার জন্য। শখের লড়াইয়ে-মেড়া ছিল তার, সেই মেড়াকে

খাওয়াবার জন্য লকলকে কচি ডাল এবং পাতা কাটতে উঠল। সেই গাছের ডগা থেকে পড়ল নীচে ঘাড় গুঁজে। বীভৎস সে মূর্তি।

তার পর সেই ছড়া-বাঁধা ছেলেটা।

ফটকির মা বাপ তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। মোড়লের ছেলে মরেছে। ফটকি ম্রিয়মাণ হয়েছে খানিকটা। ফটকিকে তার আলাদা ঘরেই শুতে দিয়ে তারা তাদের ঘরে শুচ্ছে। মেয়েটা যদি শুয়ে একটু-আধটু কাঁদে কাঁদুক, তা ছাড়া মা মেয়ে বাপ এক ঘরে শোয়াও ভাল দেখায় না।

ছেলেটা একদিন একলা পেয়ে বললে—ফটিকজল!

ফটকির বুকে পাক খেয়ে উঠল আগুন, সে চারিদিক চেয়ে দেখে নিয়ে বললে, রাত্রে জানালার ধারে এস। শিস দিয়ো। চৌকিদার চলে যাওয়ার পর।

রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে গেল। উঠে বসল ফটকি। আস্তে আস্তে সেই মোড়লের ছেলের ভাঙা জানালাটার ধারে বসল। সেটা আবার মেরামত হয়েছিল, কিন্তু আজই আবার ফটকি সেটাকে ভেঙে আলগা করে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ বসে থেকে সে জানালার খিলটা খুললে। আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করে জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলে। তার পর সম্পূর্ণ জানালাটা খুলে ফেললে। অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তার নারী-জীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষুধা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রের নির্দেশে। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মত বিষনিশ্বাস দিয়ে নির্গমন-পথ সৃষ্টি করে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে সে ক্ষুধার্ত ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এখন তুচ্ছ।

অধীরতার মধ্যে সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ভাঙা জানালাটা দিয়ে নীচের দূরত্বটা একবার দেখে নিলে। মনে পড়ল মোড়লের ছেলের সঙ্গে গোয়ালের চাল থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ার কথা। পড়বে লাফিয়ে? কিন্তু জানালাটা অপরিসর বলে লাফিয়ে পড়ার তেমন সুবিধা নাই। উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তার মস্তিষ্ক মন—সমস্ত কিছু তখন প্রচণ্ড কামনায় একাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে উঠল, উঠে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে জানালার মাঝের মোটা বাজুতে বেঁধে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলে। তার পর তাই ধরে সে ভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, দেওয়ালের গায়ে পা রেখে ধীরে ধীরে সে নেমে এল নীচে। তার পর সেই ছেলেটা এল।

ফটকির সর্বাঙ্গ তখন যেন জ্বরগ্রস্তের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটা জ্বলন্ত হাপরের মত মনে হল, হাঁপাচ্ছে—নিশ্বাস পড়ছে আগুনের মত গরম। সে বললে—চল গাঁয়ের বাইরে। বড় মোড়লের আমবাগানে। সমস্ত রাত্রি সেখানে প্রেতিনীর মত নৃত্য করলে সে। সত্যই সে নাচলে, গান গাইলে। শেষরাত্রে ফিরে সে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে আবার ওই কাপড় বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ছড়া-গাইয়ে ছেলেটা আর আসে নাই। তার কথা মনে হলে দিনের বেলা ফট্‌কি মুখ মচকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। রাত্রের বেলায় মনে হলে মাটির উপর থুথু ফেলে।

মানুষের অভাব কোথায়?

পরের দিন রাত্রেই নতুন লোক এল আশ্চর্যভাবে। ফট্‌কি কাপড় বেয়ে নীচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। সে এল না। ফট্‌কি ভাবছিল। হঠাৎ এল একজন। গ্রামে হাঁক মেরে চৌকিদার ফিরছিল। সে এসে খপ করে হাত ধরলে।

ফট্‌কি বললে—হাত ছাড়।

—না।

খালি হাতটা দিয়ে সটান এক চড় বসিয়ে দিল ফট্‌কি তার গালে। বাগ্দী ছোঁড়াটা সঙ্গে সঙ্গে আর এক গাল পেতে বললে—ই গালেও মার।

ফট্‌কি আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—মরণ!

তার পর এল গ্রামের জমিদার। ঘাটের পথে যেতে পথের মাঝখানে পড়ে কাছারি। হঠাৎ একদিন সে দেখলে কাছারিতে জমিদার এসেছে। ভাল লাগল জমিদারকে। দিনে ফট্‌কি আর এক ফট্‌কি। মুখ নামিয়ে ঘোমটা টেনে সে পার হয়ে গেল কাছারির সামনেটা কিন্তু রাত্রে নিজেই গিয়ে হাজির হল কাছারির পাশে। জমিদার কোন্ ঘরে থাকে সে তার অজানা নয়। নগদী গমস্তা গাঁয়ের লোক বলে—পুকুরের ধারের ছোট কুঠরিটা হল বাবু-কামরা। বাবুকামরার জানালায় গিয়ে সে টোকা দিলে। দু বার, তিন বার, চার বার। জানালা খুলে বাবু ডাকলে—কে? সামনেই ছিল সে, একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। চাপা গলায় বললে—খুলুন।

জমিদারকেও তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু কথাটা প্রকাশ করে দিলে চৌকিদারটা। সেই ছিল আবার জমিদারের নগদী। সে কথা মনে হলে হাসে ফট্‌কি। হারামজাদার চাকরি গেল। জমিদারের কাছে একটি নূতন আস্বাদ পেলে সে।

কথাটা প্রচার হলেও গ্রামে কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। বাপ-মা পর্যন্ত। বাপ নূতন জমি বন্দোবস্ত পেলে বিনা সেলামীতে। দু-একজন তাকে ধরলে সুদখাজনা মাফের সুপারিশের জন্য।

জমিদার চলে গেল। ওই চৌকিদার বাগ্দী ছোঁড়া এবার আক্রোশ মেটাতে একদিন তাকে ঘাট থেকে দিন-দুপুরে তুলে নিয়ে গেল আরও তিনজন সঙ্গী জুটিয়ে। দুজন মুসলমান, একজন হাড়ী। কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো তার সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে উঠত, কিন্তু ফট্‌কির জন্যে ব্যাকুল তরুণের গ্রামে অভাব ছিল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। উদ্ধার করে চৌকিদারটাকে আর তার সঙ্গীদের বেঁধে নিয়ে এল। ফলে ব্যাপারটা চাপা পড়ল না। মামলা হল।

মামলায় অনেক কথা নিয়েই জেরা হল, ঘাঁটাঘাঁটি হল, কিন্তু দিনের বেলায় ফট্‌কির মুখ দেখে বিচারক সব কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জেল হয়ে গেল তাদের। কিন্তু এবার

সমাজকে ঠেকানো গেল না। সমাজে তার বাপ পতিত হল।

এই সময়.এল শুখনরাম। সে আড়াইশ টাকা দিলে তার বাপকে। জরিমানা দিয়ে বাপ সমাজে উঠল। কথা দিলে—ফটকিকে সে ঘরে রাখবে না, নবদ্বীপ কি কোথাও পাঠিয়ে দেবে। নবদ্বীপের বদলে বাবা একদিন রাত্রে শুখনরামের তামাকের গাড়িতে তাকে তুলে দিলে। শুখনরাম তাকে নিয়ে এল। ফটকি আপত্তি করে নাই। শুখনরামকে দেখে তার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক সম্মান। তাই আস্বাদ করবার জন্ম সে এসেছে। একই রাত্রে শুখনরাম এবং শুখনরামের ছেলে, দুজনের কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। প্রথম ছেলে। বাপ তখনও অন্দরে আসে নাই। তার পর বাপ। শুখনরামকে দেখে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রথমে ইচ্ছে হল না, সে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। মনে হল, এ কি অত্যাচার! মনে হল, কি মনে হল সে তা বুঝতে পারলে না। শরীর-মন দুই-ই ঘিনঘিন করে উঠল। কিন্তু কি করবে সে?

আজ সিঁড়ির কোণে নরসিংয়ের সঙ্গে দেখা। নরসিংয়ের ডাক তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে তাকে শুখনরাম বিক্রি করবে শুনে সে প্রথমটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল। ভয়! কিসের ভয়! চলবে দেশ থেকে দেশান্তরে! স্ফটিকের মালার মত আজ এর গলায় কাল তার গলায়। তবে ওই মোটরওয়ালা কি বলে সেটা তাকে শুনতে হবে। ওকে দেখে ফট্‌কির নেশা লাগছে।

সন্ধ্যাবেলা থেকেই সে জর হয়েছে বলে শুয়ে ছিল। জর শুনে তার আজ ডাক পড়ে নাই। গভীর রাত্রে সে উঠে এসেছে।

ফট্‌কিকে লুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললে সে। রামা ঘুমোচ্ছিল। ফট্‌কি হেসে বললে—ও কে?

—আমার শালা।

—তোমার পরিবারের ভাই? আপন ভাই?

—হ্যাঁ।

হেসে ফট্‌কি লুটিয়ে পড়ে বললে—বলে দেবে না নিজের বোনকে আমার কথা?

চমকে উঠল নরসিং। মনে পড়ে গেল জান্‌কীর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—বউ আমার বেঁচে নাই। তুমি বসো।

ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফট্‌কি দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুলের মালার মত বুকের উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। ফুলের মালা, কিন্তু আগুনের ফুল—নরসিংয়ের সর্বাঙ্গে উন্মত্ত জ্বালা ধরিয়ে দিলে; কিন্তু সে ছত্রীর ছেলে—প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ম পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। শুধু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বড় মায়া হচ্ছে মেয়েটির উপর। শুধু মায়া—সুন্দর পাখি, ছোট্ট একটি হরিণ দেখে যেমন মায়া হয় তেমনি ধরনের মায়া। তার বেশী কিছু নয়। সমস্ত রাত্রি মেয়েটা আদরিণীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নরসিং শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে মাত্র। আর আফসোসও করলে, কেন তাকে

সে হট করে একটা ঝোঁকের মাথায় আসতে বলেছিল সিঁড়ির কোণে। জান্‌কীর কাছে দেওয়া কসম মনে পড়েছে তার। মোটর-ড্রাইভার হলেও সে ছত্রীর ছেলে। কসম তাকে রাখতেই হবে। কঠোর সংযমে সে নিজেকে বাঁধলে। এ বিষয়ে তার অভ্যাসও আছে। মেয়েদের নিয়ে সে আমোদ করে, মাখামাখি করে কিন্তু ব্যভিচার করে না। ফট্‌কি বকে গেল অনর্গল। সে বলে গেল, তার জীবনের কথা। নরসিং ভাবলে আর ফট্‌কির কথা শুনলে।

গভীর রাত্রের অন্ধকারে ফট্‌কির লজ্জা নাই, ভয় নাই; পিশাচী বল সে পিশাচী, প্রেতিনী বল সে প্রেতিনী—অকুণ্ঠ মুখরতার সঙ্গে সে সব বলে গেল। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। নিতাই বাইরে থেকে ডাকলে—গুরুজী, ভুল্‌কো তারা উঠেছে আকাশে।

নরসিং সস্নেহে বললে—চল, তোমাকে তুলে দিই বারান্দায়। রাত্রি শেষ হয়ে এল।

তাকে বুকের উপর রেখে উপভোগ না করে কেউ বিদায় দেয় এ ফট্‌কির কাছে নতুন। সে এক মুহূর্তে কেমন হয়ে গেল। নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

নরসিং সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে; মুখে তার বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

ফট্‌কি বললে—আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চল এখান থেকে।

নরসিং আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আজ তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি। কাল—কাল তোমাকে জানাব।

ফট্‌কি বললে—না না। তোমাকে ছেড়ে—না না।

নরসিং বললে—না নয়। কাল, কাল। আজ যাও তুমি। আর বেরিয়ে আসতে হলে চোরের মত নয়; কাল ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব আমি।

দশ

ওই মুখরা মেয়েটার সংস্পর্শে এসে নরসিং যেন কেমন হয়ে গেল। অতি মাত্রায় বিষণ্ণ এব স্তব্ধ অথচ গম্ভীর।

জান্‌কীর কাছে তার গায়ে হাত দিয়ে কসম খেয়েছিল। জান্‌কী তাকে শপথ করিয়েছিল— যদি ইচ্ছে হয় তুমি আরও একটা দুটো বিয়ে কর। কিন্তু ওই সব খারাপ মেয়েকে নিয়ে পাপ করতে পাবে না তুমি। নরসিং কসম খেয়েছিল। সে শপথ সে বিচিত্র উপায়ে রক্ষ করে। মধ্যে মধ্যে তার জীবনে স্বৈরিণী নারী আকস্মিকভাবে আসে। মদ খেয়ে দিল্ যখন দরিয়ার মত উথলে ওঠে তখন নিকটে যে এসে দাঁড়ায় তাকে সে টেনে নেয়; খুশীমেজাজে ঢেউয়ের সাপটাকে বারকয়েক লোকালুফি করে আবার তাকে কৌতুকভরে কিনারায় ডাঙার উপর ফেলে দিয়ে সরে যায়। কিন্তু এমনভাবে গম্ভীর কখনও হয় না। নেশার ঝড়ের হাওয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমানে উতলাও থাকে। হা-হা করে হাসে। অশ্লীল কৌতুক রসি

কতায় মাতোয়ারা হয়ে থাকে। নেশা কাটলে স্বাভাবিক অবস্থা। অনুশোচনা নাই আবার আফসোসও করে না। সহজ মানুষ সকালে উঠে চা খেয়ে আপনার কাজে লেগে যায়। মোটরে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনে রেস দিয়ে কাঁপিয়ে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গাড়ি ছোটে—নরসিং মধ্যে মধ্যে বিগত রাত্রির ঘটনা নিয়ে ইঙ্গিতে রসিকতা করে নিতাইয়ের সঙ্গে। কখনও কখনও নিতাই অনুযোগ করে—আর গুরুজী! আপনার কথা আপনাকেই ভাল। সিদ্ধপুরুষমশাই আপনি, দিষ্টিভোজনেই খুশী!

নরসিং হা-হা করে হাসে। বলে—ভাগ্ বেটা, হাড়ী কোথাকার। অনেক সময় গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—ওরে, যে ছত্রীর বাতের ঠিক নাই তার জাতের ঠিক নাই। সে কখনও ছত্রী নয়।

পথে দ্রুত ধাবমান গাড়িতে বসে দু-পাশের রাহীদের মধ্যে হঠাৎ কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখে ঠিক তারই কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হেসে ইশারা করে নিতাইকে ডাকে—নিতাই!

সেই মানুষের পক্ষে এটা একটা প্রত্যক্ষ পরিবর্তন। নিতাই কিন্তু একটু খুশী হয়ে উঠল, গুরুজীর মনে মেয়েটা রঙ ধরিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

নিতাই তাকে প্রায়ই অনুরোধ করে—এইবার সাদী করে ফেলান গুরুজী। রাম তার দাদাবাবুর জন্য আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে। মাঝে মাঝে সেও অনুরোধ জানায়।

গিবুবরজা থেকে তার বাপও কয়েকবার পত্র দিয়েছে।

নরসিংয়ের কিন্তু ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না তার কারণটা খুব স্পষ্ট নয় তার কাছে। জানকীকে সে খুবই ভালবাসত তাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে তার জন্যে যে সে আজীবন অবিবাহিত থাকতে চায় তাও ঠিক নয়। সে বলে—দূর, দুর! যেমন তেমন একটা পরিবার হলেই হল নাকি?

ইমামবাজারে, রেলজংশনে, সদর শহরে শিক্ষিত ভদ্রবাড়ির মেয়েদের দেখে তার মনে হয়, তাদের গিবুবরজায় কি ও-অঞ্চলে তাদের জাতের মধ্যে এমন মেয়ে একটিও পাওয়া যায় না। তার আফসোস হয়।

আসলে তার রুচি তার অজ্ঞাতসারে পালটে গিয়েছে। এই রুচির পরিবর্তনই তাকে নারী-সম্ভোগে তার এই বিচিত্র অর্ধনির্লিপ্ত পদ্ধতির অভ্যাস গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাল রাত্রে ফট্কির আবির্ভাবে তার অভ্যাস সত্যিই নাড়া খেয়েছে। ফট্কির রূপ, তার দেহের কোমলতা, জরোত্তপ্তার মত উষ্ণ স্পর্শ নরসিংয়ের নূতন রুচিতে—মুগ্ধ দৃষ্টিতেও মোহের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে, তার দেহের প্রতি জীবকোষে-কোষে উচ্ছ্বাস তুলতে চেয়েছে। নরসিং বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করেছে—মনের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব উঠেছিল।

মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল জানকী। বাইরে ছিল ফট্কি। দুজনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলেছে। এখনও সে লড়াইটা চলেছে।

নরসিং হঠাৎ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। আশ্চর্য—জানকী তো নয়—জানকীর জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে যে নীলিমা—জোসেফের বোন মেরী নীলিমা।

সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

অল্প দূরে বসে নিতাই অলসভাবে বিড়ি টানছিল, সে চকিত হয়ে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—গুরুজী ?

নরসিং এবার তার দিকে ফিরে তাকালে।

—কিছু বলছেন ?

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নরসিং উঠে দাঁড়াল। বললে—ওঠ। গাড়িখানাকে খুলে ফেলতে হবে। কি কি পার্টস বদলাতে হবে ভাল করে দেখে নোব।

—সব পাবেন এখানে ?

—না পেলে কলকাতা যাব।

নিতাই উদার লোক, সে বললে—এবার রামকে নিয়ে যান। ওকে কলকাতাটা দেখিয়ে নিয়ে আসুন। হঠাৎ হি-হি করে হেসে বলে উঠল—ছেড়ে দেবেন একদিন হাড়কাটা গলির ভেতর সন্‌জেবেলা।

এখানকার মোটর পার্টস সাপ্লাইয়ের দোকানটা নেহাত বাজে। প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। গিবুরজায় ছোট টেকোনার দোকান করে সিংহবংশের ভৈরব সিং তার নাম দিয়েছিল—মহাজনী কারবার। ছত্রীর ছেলে সে, নিজে হাতে তুলদাঁড়ি ধরত না—একজন সদ্‌গোপের ছেলে রেখেছিল, সে-ই জিনিস ওজন করত, ভৈরব সিং একটা ছোট তোষক পেতে বালিশে ঠেস দিয়ে গোঁফে তা দিত—পয়সা গুনে নিত। নিজের বসবার জায়গাটাকে বলত 'গদি'। ভৈরব সিংয়ের মহাজনী কারবারের মাল ছিল—মণখানেক নুন, এক টিন সরষের তেল, এক টিন কেরোসিন, পাঁচ সের নারকেল তেল, ধনে মরিচ লঙ্কা প্রভৃতি মশলার কোনটা পাঁচ পো কোনটা আড়াই সের। এখানকার মোটর পার্টস সাপ্লাইয়ের দোকানটাকে দেখে শুনে ভৈরব সিংয়ের মহাজনী কারবারের কথা মনে হল তার।

খানকয়েক টায়ার টিউব আর তেল—পেট্রোল-মোবিল-লুব্রিকেটিং অয়েল মাত্র সম্বল। কাঠের শেল্‌ফে অনেক বাক্স সাজানো আছে, কিন্তু তার ভেতরে জিনিস নাই। সিগারেটের দোকানদারদের খালি সিগারেটের বাক্স সাজিয়ে রাখার মত প্যাঁচ কষেছে। এদিকে দোকান-টার সামনে সাইনবোর্ডটা ইয়া লম্বাই-চওড়াই একটা ব্যাপার। কাঠের ফ্রেমে আঁটা টিনের প্লেটে কালো রঙ লাগিয়ে তার ওপর সাদা হরফে ইংরেজী বাংলা দু-রকম হরফে নাম লেখা হয়েছে। দরজার দুই পাশে দেওয়ালে হরেক কোম্পানীর রঙচঙে বিজ্ঞাপন এঁটে রেখেছে। একটা কাঠের খুঁটো পুঁতে তার মাথায় সাদা রঙ লাগানো টিনের প্লেটে গোল লেখা—Ask here for Gargoil—Mobil Oil। সবুজ রঙের প্লেটে সাদা রঙের হরফে B.O.C. Motor Spirit-এর বিজ্ঞাপন, তিনকোণা হলদে প্লেটে লাল হরফে—Shell পেট্রোলের বিজ্ঞাপন দু-একখানা নয়, কয়েকখানাই বেশ সাজিয়ে মেরেছে দেওয়ালে। গুডইয়ার—ফায়ারস্টোন—ব্রিজস্টোন টায়ারের বিজ্ঞাপনগুলো অপেক্ষাকৃত বড়। সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ডানলপ টায়ারের, দোকানের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বা একখানা টিনের প্লেটে

মোটা মোটা হরফে বেশ সাজিয়ে লিখেছে—'ডানলপ টায়ার', তার নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট —'দি ন্যাশনাল টায়ার উইথ ইণ্টারন্যাশনাল পপুলারিটি'।

ঘরের ভিতরেও হরেক রকম বিজ্ঞাপন: নাইট্রোভাল্‌সপারের বিজ্ঞাপন—হ্যাভ্‌ ইওর কার স্প্রেড্‌ উইথ নাইট্রোভাল্‌সপার এণ্ড ড্রাইভ এ নিউ কার। মিনটেক্স—টোয়াইস অ্যাজ সেফ—ব্রেক লাইনিংস। এক্‌সাইড—এস্‌কো—শক্তি ব্যাটারীর বিজ্ঞাপন। ফিল্‌ড ক্যাস্ট্রোল—ভি বেল্টের বিজ্ঞাপন। লুকাস ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনে বাহার আছে; এক একটা অক্ষর এক এক টুকরো পিচবোর্ডে এঁকে পাশাপাশি সাজিয়ে লিখেছে—লুকাস ব্যাটারীজ। টেবিলের ধারেই কাঠের শেল্‌ফের গায়ে আঁটা একখানা পিচবোর্ডে আঁটা একটি সুন্দরী মেমসাহেবের রাঙা টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মত সাদা এবং সুন্দর দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে—মিষ্টি হেসে মেমসাহেব বাঁ হাত তুলে ডেকে বলছে—স্টপ্‌—লুক—গ্লিসিন। মেটাল পলিশের বিজ্ঞাপন। এই ছবিটিই তার সবচেয়ে ভাল লাগল।

হঠাৎ মনে পড়ল তার ফটকিকে। মেয়েটার যেমন রঙ তেমনি মুখখানি মিষ্টি। ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে ছবি আঁকলে সে ছবি মেমসাহেবের ছবির পাশে খাটো মনে হবে না।

শ্যামনগর থেকে জেলার সদর শহর পর্যন্ত বাস সার্ভিসের গাড়িগুলো একটা ট্রিপ সেরে ফিরে আসতে শুরু করেছে। প্রথম গাড়িখানা এসে পৌছল। গাড়িখানার ড্রাইভার—রামেশ্বরপ্রসাদ, তারক কণ্ডাক্টার, পাগলা ক্লিনার; তারা নামল গাড়ি থেকে। পাগলার ধরনটা সত্যিই খানিকটা পাগলাটে। আধ হাত করে লম্বা চুল মাথায়; মেমসাহেবদের মত বব ছেঁটেছে। তেলের ওপর পথের ধুলো লেগে প্রায় স্থায়ীভাবেই লালচে হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে চুলগুলো সামনে কি আশেপাশে ঝুলে পড়লে পিছনের দিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয় পাগলা, চুলগুলো চাবুকের দড়ির মত লাফিয়ে ঠিক পাটে পাটে বসে যায়।

দোকানের বাবুটির সঙ্গে নরসিংয়ের পরিচয় প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই হয়েছিল—গতকাল সকালেও সে তেল নিয়েছে। বাবুটি নরসিংকে একখানা লোহার চেয়ার দেখিয়ে বললে—বসুন আপনি। সার্ভিসের গাড়ি এল, একবার দেখি।

পাগলা জামার পকেট থেকে একখানা চিরুনি বার করে চুলগুলো বার কয়েক আঁচড়ে নিলে। নরসিংয়ের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে রামেশ্বরপ্রসাদের দিকে চাইলে—সম্ভবত কিছু ইশারা হয়ে গেল।

রামেশ্বর গাড়ি থেকে নেমে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বললে—রাম রাম। বসে আছেন?

নরসিংও হেসে বললে—রাম রাম।

—কি খবর? আজ ট্রিপ দিয়া নেহি?

—না।

—কাহে?

—লাইসেন্স হুয়া নেই।

—ও-হোঃ! ঠিক বাত। একটু চুপ করে থেকে রামেশ্বর হেসে বললে—আজ সামকো আইয়েগা তো?

—না। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে নরসিং টেবিলের ওপর নিজের জিনিসের ফর্দটা রেখে সেইটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

রামেশ্বরও ঝুঁকে পড়ল টেবিলের এক কোণে হাত রেখে।—কি ওটা? পার্টস কিনবেন বুঝি?

ফর্দটা গুটিয়ে নিয়ে নরসিং বললে—হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে রামেশ্বর বললে—আমাকে দেখাবেন। থোড়াথুড়ি কিছু আমি দিতে পারব।

নরসিং তার দিকে চেয়ে হাসলে। সে জানে। হাজার কড়া হিসাবের মধ্যেও ড্রাইভারেরা কিছু কিছু পার্টস চুরি করে। ইমামবাজারে বাবুদের বাড়িতে সে যখন ড্রাইভারি করত—তখন এ কাজ সেও করেছে। কিন্তু এই লোকটির কাছে জিনিস কিনতে তার ইচ্ছা হল না। প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে তার ভাল লাগেনি। তার ওপর কাল যা ওর পরিচয় নরসিং পেয়েছে তাতে ওর ওপর দিল্ পর্যন্ত চটে গিয়েছে। নরসিং কোন উত্তর দিলে না।

রামেশ্বর নরসিংয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—সস্তা হবে।

নরসিং এবার বললে—দেখি। এখানকার যা গতিক তাতে কলকাতাই হয়তো যেতে হবে।

রামেশ্বর একটু চুপ করে হেসে বললে—আচ্ছা রাম রাম। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। খালি মোটর-বাসটায় বসে স্টার্ট দিয়ে সেখানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের সীটের পাশে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পাগলা হেঁকে উঠল—চল্ রে আমার ময়ূরপঙ্খী না—খিষ্টান পাড়ার দীঘির ঘাটে চল্! খিষ্টানপাড়া দীঘির পাড়ে যাবি—নীল জল খাবি রে মানিক, সাধ মিটিয়ে নীল জল খাবি। নীল জল—নীল জল খেতে চলল ময়ূরপঙ্খী।

পিছন থেকে দোকানের বাবুটি চীৎকার করে উঠল—এই, এই, এই। কিন্তু মোটর-বাসখানা বেরিয়ে চলে গেল, বোধ হয় শুনতে পেলে না। বাবুটি দোকানের চাকরটাকে বললে—এরা একটা হাঙ্গামা না করে ছাড়বে না। বার বার বারণ করে দিয়েছি ক্রীশ্চান পাড়ার দীঘিতে যাবি না। জোসেফ এস-ডি-ওর ড্রাইভার—তার ওপর পাদরীসাহেবেরা সুদ্ধ যদি জানতে পারে তবে থ্রি ওয়ার্ল্ড—তিন ভুবন দেখিয়ে দেবে।

চাকরটা বললে—কিছু দিন তো যায় নাই ওদিকে। আজ আবার দেখছি হঠাৎ ভূত চেপে গিয়েছে ঘাড়ে।

নরসিংয়ের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। নীলিমাকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে আগে থেকেই, ব্যাপারটা নিয়ে খানিকটা জানাজানিও হয়েছিল, হয়তো জোসেফ সার্ভিসের আপিসে জানিয়েছিল। এস-ডি-ওর কানে তুলবে, পাদরীসাহেবদের জানাবে—এ কথা বলেছিল। যার ফলে রামেশ্বর-পাগলার দল ওদিকে আর যাচ্ছিল না। আজ যে গেল সেটা নরসিংকে খোঁচা দিয়ে তার ওপর আক্রোশবশেই—নীল জল হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল

ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘির ঘাটে।

শয়তান! ভাইবেরাদারের মা-বহিনের ইজ্জৎ যে রাখতে জানে না—সে পুরা শয়তান।

বাবুটি এসে ঘরে ঢুকল। বললে—ফর্দটা রেখে যান। আজই আমি হেড অফিসে বাসের মারফতে পাঠিয়ে দোব; দু-তিন দিনের মধ্যে মাল পেয়ে যাবেন।

নরসিং বললে—আগে দাম করে আমাকে দিতে হবে। টাকা বুঝে যদি বাদসাদ দিতে হয়—দিয়ে অর্ডার দোব। নরসিংয়ের মনের কথা হল—সে এখানকার দাম দেখে কলকাতা যাওয়ার কথা বিবেচনা করবে। কলকাতায় তার জানাশুনা দোকান আছে, লোক আছে, যাদের মারফৎ—নামে সেকেণ্ড হাঁণ্ড কাজে প্রায় নূতন জিনিস—সস্তা দরে মেলে। দামের তফাতটা সে হিসেব করে দেখবে। তেমন বেশী তফাত না হলে সে কলকাতা যেতে চায় না। এখানে জিনিস কিনে একটা কারবারের সম্বন্ধ পাতাতে চায়। এদের সঙ্গে মুখ রাখতেই হবে—না রাখলে চলবে না। মনে পড়ে ইমাঁমবাজারের জেলার সদর শহরের সব চেয়ে বড় মোটর সার্ভিসের মালিক—মোটর পার্টসের দোকানের মালিক বুধাবাবুর কথা। বুধাবাবু এক মুঠোয় রাখেন জেলার হাকিমদের—অন্ত মুঠোয় রাখেন শহরের গুণ্ডা বদমায়েশদের; বড় বড় বাবুলোক—যাদের মোটর আছে তারাও থাকে তাঁর হাকিম-ধরে-রাখা মুঠোর মধ্যে। ফলে যত ড্রাইভার ট্যাক্সিওয়ালা ক্লীনার কণ্ডাক্টর বুধাবাবুর কাছে সার্কাসের পোষমানা বাঘের মত থাকে। দাঁত নখ বার করতে চেষ্টা করলেই বুধাবাবু হুঁশিয়ারির সঙ্গে আন্দাজ করে কখনো চালান হাকিমী মুঠোর ঘুষি, কখনো মারেন গুণ্ডাধরা মুঠোর রদ্দা। কখনও দুই মুঠোই চালিয়ে দেন একসঙ্গে। এখানের দোকানের মালিক থাকে জেলার সদর শহরে। তাকে নরসিং জানে না—কিন্তু এটুকু সে জানে যে এসব কারবারের কারবারীরা সবাই প্রায় বুধাবাবু। খানিকটা কম—আর খানিকটা বেশী। বড় ভাই আর ছোট ভাই। সহোদর নয়, মাসতুতো ভাই। এদের স্বপক্ষে আনতে না পারলে সার্ভিস চালানো কঠিন হবে। হাকিম মুঠোর মধ্যে থাকলে লাইসেন্স মঞ্জুরিতে প্যাঁচ কষবে। হয়তো নিজেরাই দিয়ে দেবে একখানা গাড়ি। কিংবা গুণ্ডা দিয়ে ছুতোনাতা করে একটা হুজ্জত বাধিয়ে দেবে। কাজ কি? বিশ-ত্রিশ কি আরও পাঁচ-দশ টাকা যদি বেশীই লাগে তো লাগুক। হাল-চাল যখন খারাপ তখন ও টাকাটাকে গুনাগারি মনে করলে চলবে না। মালিকের সঙ্গে আলাপটা বেশ জমিয়ে নিতে হবে প্রথম থেকেই। মালিক অবশ্যই বড়লোক—তার সঙ্গে নরসিংয়ের ঠিক দোস্তি হওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু তা বলে ওদের বাস সার্ভিসের ড্রাইভারদেরও সমান নয় সে। সে একখানা ট্যাক্সির মালিক—দোকানের খরিদ্দার—সুতরাং তাদের চেয়ে বেশী খাতির তার প্রাপ্য এবং তা পাবেও। তা ছাড়া এ জেলায় তার আরও একটা খাতির আছে। গিরবরজার ছত্রীবাড়ির ছেলে সে। মালিকের সঙ্গে আলাপ জমে গেলে ওই রামেশ্বরোয়া পর্যন্ত খানিকটা কায়দায় আসবে। মন সে স্থির করে ফেললে এই মুহূর্তে। তাই যাবে সে। আজই। সে উঠে পড়ল। নিতাইকে গাড়িটা সাফ করবার জন্ত—মেরামতের জন্ত খুলে ফেলতে বলেছে। সে আবার কতটা কি করে ফেলেছে এর মধ্যে কে জানে?

—আচ্ছা নমস্কার বাবুসাহেব! বেরিয়ে পড়ল সে। এতক্ষণ পরে সে সহজ হয়ে উঠল। শীতকালের ভোরে মোটরের ইঞ্জিন যেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়, কিছুতেই স্টার্ট নেয় না—তেমনি অবস্থা গিয়েছে তার এতক্ষণ। এইবার স্টার্ট নিয়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হনহন করে চলল সে।

আটটা বাজে। শহরের বাজার-হাট এরই মধ্যে জমে উঠেছে। চায়ের দোকানগুলোর আসর জমে উঠে এবার ভাঙতে শুরু করেছে। একটা দোকানে সে ঢুকল। দোকানটার সামনেই চৌমাথা। একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার। বাজারের আধ রশি পূর্বদিকে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। বাজারের সামনে গাড়িগুলো এসে দাঁড়িয়েছে। দু-তিনখানা চৌমাথা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ভাড়া খুঁজছে। নরসিংয়ের চায়ের তৃষ্ণাটা প্রবল নয়, গাড়োয়ানদের হালচাল দেখবার জন্য সে দোকানটায় ঢুকল। চারখানা গরম সিঙাড়া আর এক কাপ চা নিয়ে সে বসল। আজ ওদের হাঁকডাক খুব জোর।

—পাঁচমতি বাবু, পাঁচমতি। ভাড়া এক আনা কমল বাবু আজ থেকে। সাত আনা সীট। সাত আনা।

একজন পানওয়ালা মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে—কি রে সোভান! একদিনে ঘোল খেয়ে গেলি? কমিয়ে দিলি এক আনা? সোভান বেশ আস্ফালন করেই উত্তর দিলে—হাঁ। দরকার হোবে তো আউর ভি কমাবে। দু-আনা সীট চালাবে। হাঁ।

—তার পর?

—তার পর শালা ভাগা।

সোভানের পিছনের গাড়ির কোচোয়ান বলে উঠল—সাবাড় করে দিব শালাকে শেষ পর্যন্ত। বারোখানা গাড়িতে কম-সে-কম তিরিশ আদমি আমরা আছি—যাবে ফাঁসি এক আদমি! বাস্। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে নরসিংয়ের মনে হল—লোকটা সত্যিই খুন করতে পারে।

সোভান বললে—হ্যাঁ। তা না তো কি? মোটর সারবিস করে আমাদের অত বড় রুটির পথটা মেরে দিলে। শহরের মাঠ থেকে শ্যামনগর—পঁচিশ-বিশখানা গাড়ি খাটত, ঘোড়ার গাড়ির সার লেগে যেত। একা একখানা গাড়ির চারটে করে ঘোড়া লাগত। একটা খেপ মারলে কম-সে-কম—চারটে টাকা রোজগার। সোকালে একবার যাও—ফিন এসো—বিকেলে একবার যাও—এসো—বাস্। চারটে টিরিপে চার-চারে ষোল টাকা—শালা সিবিল সারজেনের ফি। সে পথ মেরে দিলে। তা বলি—লে রে বাবা লে। তোদেরই রাজত্বি কোম্পানির থাকল—আংরেজের কল আনলে শহরের শেঠজী, আচ্ছুক। মেরে দিলে গরীবের রুটি। দিক। আঠারো-উনিশখানা গাড়ি পেটের দায়ে ভাগল। আমরা শালা দশ-বারোখানা কোনও রকমে দিন গুজরান করছিলাম—আবার এল মোটর! দিব শালাকে এবার জানে মেরে।

নরসিং দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে সোভান থমকে গেল। পাশের সেই

কোচোয়ানকে ইশারা করে দেখিয়ে দিল। নরসিং দেখলে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চলে এল।

দুনিয়ার যত গোলমাল ওই পেটের রুটি নিয়ে। ওরা যে চটে উঠেছে—খুন করব বলছে, তার জন্যে নরসিং ওদের ওপর খুব রাগ করতে পারলে না। কিন্তু সে-ই বা কি করবে? তারও রুটি চাই। তা ছাড়া দুনিয়ার হালই এই। ওই ইমামবাজার থেকে রেলজংশন পর্যন্ত সে-আমলে কারবার ছিল গরুর গাড়ির। টাপরবাঁধা পঞ্চাশখানা গরুর গাড়ি হাজির থাকত জংশন ইস্টিশানে। তার পর হল ঘোড়ার গাড়ি। তার পর পড়ল রেল-লাইন, ঘোড়ার গাড়িকে পালাতে হল। তার পর হয়েছে মোটর-বাস। মোটরের ক্ষমতা আছে—সে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে, টিকে আছে। রাস্তা ভাল হলে ট্রেনের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে সে, ভাল মোটর হলে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েও আরাম দিতে পারে সে। ইমামবাজারের বাবুদের একবার শখ হয়েছিল কলকাতায় প্রাইভেট ট্যাক্সির কারবার করবার। ট্যাক্সির মিটার থাকত না। বড় বড় লোকেরা দিন ঠিকে করে ভাড়া নিত। আমেরিকা থেকে টুরিস্ট আসার ধুম পড়েছিল তখন। তাদের এন্তার পয়সা—দিলদরিয়া মেজাজ—মোটা মোটা ভাড়া দিত তারা। তাদের জন্য বাবুরা একখানা মাস্টার বুইক গাড়ি কিনেছিল। সে গাড়ি নরসিং চালিয়েছে। তার আরাম কি—ভেতরের কায়দা কি! তারই জোরে মোটর টিকে আছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মোটরের সঙ্গে পাল্লায় হার মেনে যদি ঘোড়ার গাড়িকে পালাতে হয় তবে পালাতে হবে, তার আর সে কি করবে! আর তাকে না হয় ডাণ্ডা মেরে খুনই করে ফেললি—কিন্তু তাতে নরসিংই মরবে, মোটর মরবে না। নরসিংকে খুন করার খবর রটবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে মোটরের কারবারীদের চোখ পড়বে এই পথের উপর। একখানার জায়গায় দু-চারখানা ট্যাক্সি এসে জুটবে। তবে হ্যাঁ, ওদেরও এটা রুটির ঘর—তাতে ভাগীদার জুটলে এদের দুঃখ হবারই কথা; কেউ কেউ যদি ক্ষেপেই ওঠে তাতেও দোষ দিতে পারে না নরসিং। উঠুক ক্ষেপে—সে ক্ষ্যাপামির ধাক্কা সইতে হবে তাকে। তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। ভয় পেলেই হার নির্ঘাত। সে জানে নরসিং। তবে মগজ গরম করলে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ডাণ্ডা চালালে ডাণ্ডা রুখতে হবে, উল্টে ডাণ্ডা চালালে চলবে না। ছত্রীর ছেলে সে, তার বংশে অবশ্য ডাণ্ডা খেয়ে কেউ চুপ করে থাকে না; এক ডাণ্ডা খেলে দু ডাণ্ডা চালানোই তাদের স্বভাব। কিন্তু গিরবরজায় যা চলে বাইরের দুনিয়ায় তা আর চলে না; গিরবরজা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অনেক নতুন আক্কেল তার হয়েছে। পারলে সে কোচোয়ানদের সঙ্গে একটা আপস করবে। আপস না হয়, চলুক লড়াই। কি করবে সে? ওদেরও রুটি চাই—তারও রুটি চাই। রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো দুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে।

গাড়িখানার সামনের সীটে শুয়ে নিতাইটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গাছের ছায়ায় গাড়িখানাকে রেখে মিঠা ঝিরঝিরে সকালের হাওয়ায়, সারারাত্রি জেগে, আরাম করছে উল্লুক। পরিষ্কার

করা, কি কলকব্জা খুলে রাখা দূরে থাক্, বনেটটা উল্টে সেটা আর বন্ধ করবার খেয়াল পর্যন্ত হয় নাই। অন্য দিন হলে নরসিংয়ের রাগ হত। কিন্তু আজ মেজাজটাও অন্য রকম হয়ে রয়েছে, তার উপর সদর শহরে যাওয়ার মতলব করে ফিরেছে। গাড়িখানা খুলে ফেললে অনেক অসুবিধা হত, আবার এক বেলার ফেরে পড়তে হত; এতে তার সুবিধাই হয়েছে। কিন্তু রামা কই? সেটা গেল কোথায়?

রাম দাদাবাবুর জন্য বেরিয়েছে। সকালে উঠেই সে নিতাইয়ের কাছে গতরাত্রির তাজ্জবের গল্প আগাগোড়া শুনেছে। নিতাই তার উপর চড়া চড়া রঙ চড়িয়েছিল। বলেছিল, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুলি উল্লুক বুড়বক্ কাঁহাকা—দেখতে পেলি না—সে কি তাজ্জবের কাণ্ড! শালা আকাশ থেকে নেমে এল এক পরী। আমি দেখালাম গুরুজীকে পরী নামছে। বাস্, গুরুজী গিয়ে দুই হাত পেতে লুফে ধরে নিলে। পরী একেবারে দু হাতে জড়িয়ে ধরলে গুরুজীর গলা। ভোরবেলা বলে—যাব না আমি, থাকব তোমার কাছে। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। গুরুজী অনেক বুঝিয়ে বললে—আজকের মত যাও। কাল সব ঠিক করব। তবে যায়।

রামের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল, হাঁ করে শুনছিল কথা, নিতাইয়ের কথা শেষ হলে তার বাস্তবজ্ঞানের সাধ্যমত বিচার করে পরী নেমে আসাটা নিতান্তই অসম্ভব—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অনুমান করলে, নিতাই তাকে ঠাট্টা করছে। সে বিজ্ঞ রসিকের মত বললে—ভাগ্।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে—মাইরি বলছি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি। এরও উপর গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য সে বললে—মা-কালীর দিব্যি, ওপর থেকে নেমে এল আর গুরুজী হাত পেতে লুফে নিলে।

মা-কালীর শপথে রামের সকল অবিশ্বাস সংকুচিত হয়ে গেল। বাস্তব বিচারবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে গেল, সে স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

নিতাই বললে—হ্যাঁ, পরী বটে!

রামা প্রশ্ন করলে—আজ আবার আসবে?

—কথা তো বটে। তারপর নিতাই হাসতে হাসতে বললে—পরীকে অবিশ্যি তুইও দেখেছিস। চল, ওই গাছতলাতে গাড়িতে বসে সব বলব।

সমস্ত কথা শুনে রাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। নিতাই বললে, কি, তুই যে ভিজে দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে গেলি রে! এ কথারও কোন জবাব দিলে না রাম। নিতাইয়ের মনে কিন্তু এখনও রঙ ধরে রয়েছে, সে বললে—মেয়েটা কিন্তুক গুরুজীর মনে রঙ ধরালছে। সে হাসতে লাগল।

রাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। নিতাইয়ের গল্পের প্রথম দিকটায় ওই শান্ত সুন্দর নরম মেয়েটার অকল্পিত দুঃসাহসিক অভিসারের কথা শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষের দিকটার বিবরণ শুনে সে স্তিমিত হয়ে পড়ল। তার দিদির মৃত্যুর পর নরসিংয়ের নারী

সম্পর্কে এই রহস্যময় নিরাসক্তি তাকে অত্যন্ত দুঃখ দেয়। নরসিং তার কাছে প্রায় দেবতা। ছেলেবেলায় তাদের মা মরেছিল, বাপ ছিল দরিদ্র। তার পিসীমা—ধরণী রায়ের স্ত্রী, তাদের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছিল নরসিংকে উচ্ছেদ করবার জন্য। পিসি বার বার তাকে বলত—পিসের কাছে যাবি, পিসের কথা শুনবি, মেজাজ দেখে আদর করবি, কোলে চাপবি। বুঝেছিস ?

হাঁ করে তাকিয়ে থাকত রাম। সে কথাটা বুঝতে পারত না।

পিসি বুঝিয়ে বলত—তোকে যখন আদর করবে তখন বলবি, তুমি নরসিংকে বেশী ভালবাস। বুঝলি ?

পিসি হিংসার বীজ বপন করতে চেয়েছিল ; সে বীজ থেকে অঙ্কুর ফেটে বার হলে সে হয়তো বিষবৃক্ষেই পরিণত হত। কিন্তু সে বীজ অঙ্কুরিত হতে পায় নি, ধরণী রায় নরসিংকে ইমামবাজারের বাবুদের বাড়িতে রেখে এল। শিশু রাম এমন কোন হেতুই পেলে না যার জন্য সে নরসিংকে হিংসা করতে পারে। নরসিং এ বাড়ির সকল আদর ফেলেই চলে গেল যখন, তখন নরসিং দাদাকে বেশী ভালবাস, বেশী আদর কর—এ বলে পিসের কাছে অভিযোগ করবার কোন কারণই দেখতে পেল না। বরং উল্টো হল। বয়স্ক ছেলেদের অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে সে নরসিংয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে পিসিই হয়ে উঠল ভয়ের মানুষ, সকল বিরূপতা জমে উঠল তার বিরুদ্ধে। পিসিরও দোষ নাই। বন্ধ্যাজীবনের অভ্যাসে জানকী এবং রামের অস্তিত্ব তার কাছে উপদ্রবের সামিল হয়ে উঠল। শিশুকে তার ভাল লাগত না এ নয়, কিন্তু তারা কলরব করলে সে তার মাথায় গিয়ে লাগত, কাঁদলে তো সে প্রায় ক্ষেপে যেত, ছুটোছুটি করলে অসহ্য মনে হত ; খেলার সামগ্রী—ভাঙা খোলা ঘুটিং নুড়িপাথর ঘাস-পাতা আগাছার ফল বাখারির টুকরো ঘরে এনে জমা করত, ঘরদোর ময়লা করত, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না নরসিংয়ের মামী—রামের পিসি। আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল প্রথম দিনই। মায়ের মতই স্নেহে রামকে নিজের ছেলের মত আপন করে নেবার আগ্রহে পিসি রামকে নিজের কাছে নিয়ে রাত্রে শুয়েছিল। জানকীর বিছানা করেছিল পাশেই একটু তফাতে। রাম ঘুমিয়ে গিয়েছিল, পিসি শুতে এল একটু রাত্রে। বিছানায় বসে কিন্তু তার গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল। হাতের কেরোসিনের ডিবের আলোটা পড়েছিল রামের মুখের উপর। পিসির চোখে পড়ল রামের মুখের এক পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। অসন্তুষ্ট মনে মুখ বিকৃত ক'রে খানিকটা ভেবে সে রামের দিকে পিছন ফিরে শুল। মধ্যরাত্রে রাম ঘুমের ঘোরে কুণ্ডলী পাকিয়ে মোড়া হাঁটু দুটো পিসির পিঠে প্রায় গুঁজে দিল। ধড়মড় করে উঠে পিসি ঠেলে সরিয়ে দিলে রামকে। কিন্তু আধঘণ্টা পরে আবার তাই। আবার সরিয়ে দিলে পিসি। আবার মিনিট দশেকের মধ্যে রাম হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ফিরে শুল। এবার পিসির আর সহ্য হল না। সে উঠে শিয়রের পাখা নিয়ে রামের অবাধ্য হাঁটু দুটোর উপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। রাম চীৎকার করে কেঁদে জেগে উঠে বসল। পিসি আরও ঘা-কয়েক পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললে—চিল্লাবি তো তোর খাল তুলে দিব।

থেমে গেল রাম ভয়ে, সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পিসির দিকে। পিসি বললে—ভাগ্ ভাগ্ আমার বিছানা থেকে। ভাগ্।

রাম বুঝতে পারলে না—এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে সে কোথায় ভাগবে! পাশের বিছানায় দিদি জান্‌কী উঠে বসেছিল এই চীৎকার-ঝঙ্কারে, ভয়-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে সে সব দেখছিল। পিসি হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পিঠে দু'ঘা পাখার ডাঁট চালিয়ে বললে—হারামজাদী ট্যারা চোখ নিয়ে বসে দেখছে দেখ। নিয়ে যা ভাইকে, নিয়ে যা বলছি। তার পর কপাল চাপড়ে বললে—আমার নসিব। বে-তরিবৎ বে-আক্কেল বে-সরমী দুটো বান্দরের বাচ্চা আমার কপালে জুটেছে! নিয়ে যা ভাইকে তোর বিছানায়, তোর ভায়ের হাঁটুর গুঁতো তুই খাবি না তো কি আমি খাব?

সেই রাত্রেই পিসিকে তার ভয় হয়ে গেল। বাঘ তখনও পর্যন্ত রাম দেখে নাই, দেখেছিল ক্যাপাকুকুর; দাঁত বের করে গোঁ-গোঁ শব্দ করে রাস্তার লোককে তেড়ে কামড়াতে সে নিজের চোখে দেখেছিল। পিসিকে দেখে তার তেমনি ভয় হত। পিসে ধরণী রায় গাঁজা খেয়ে ভাম হয়ে থাকত, ডাকবাংলায় বসে শনের দড়ি পাকাত, সে উপেক্ষাও করত না, আশ্রয়ও দিত না। পিসি মারলে পিসে সান্ত্বনা দিত, কিন্তু পিসিকে কিছু বলত না।

এরই মধ্যে শনিবার রবিবার আসত নরসিং। তার মামীকে বলত—নেকড়ানী। পিসির এই নামকরণের মধ্যেই রাম পেয়েছিল পিসির প্রতি নরসিংয়ের বিরূপতার পরিচয়। ওইটাই তাকে এবং জানকীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। নরসিং বয়সে বড়, তা ছাড়া তার বড় বড় চোখ দুটোতে ছিল উগ্র দৃষ্টি, দেখে তারা বুঝতে পারত ওর তেজ আছে। নরসিংয়ের মামী রামের পিসি মধ্যে মধ্যে বলত—নরসিংওয়ার আঁখ দেখো না, যেন গিলে খাবে। খুনখারাপি করা যে ওদের ঝাড়ের অভ্যেস। পিসির মুখে এই কথা শুনে নরসিংয়ের প্রতি ভক্তি তাদের বেড়ে গিয়েছিল। তারা ভাই-বোনে নরসিংকে দলপতি করে পিসির বিরুদ্ধে তাদের তিনজনকে একদলে মনে করত।

দিদি জান্‌কী বেশী ভক্তি করত নরসিংকে—রামকে বলত—নরসিং ভাই হছুত এলেমদার লোক হবে। লিখাপঢ়ি শিখছে। কলম চালাবে, তলব পাবে মোটা।

নরসিংকে মধ্যে মধ্যে বলত—তুমার পুরানো কিতাবগুলি দিয়ো নরসিং ভাই, রামসিং পড়বে। পিসি ব্যবস্থা করেছিল রাম ঘরের গরুগুলোকে মাঠে ঘাস খাইয়ে নিয়ে আসবে, পিসের কাছে শনের দড়ি পাকানো শিখবে, ক্ষেত-খামার জমি-জেরাত যেটুকু আছে সে-সব দেখবে, জোয়ান বয়স হলেই পিসের ওই ইজ্জৎদার কাজ—ডাকবাংলার জমাদারের কাম করবে। লোকে বলে—ডাকবাংলার মালী। ধরণী রায় ডাকবাংলার জমাদার। রায়ের স্ত্রী বলে—জমাদার সাহেব। রামের তাতে দুঃখ ছিল না। সে তাই গরু ঠেঙিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরত। সন্ধ্যাবেলা পিসে 'অ—আ—ক—খ' পড়াত। এমনি ভাবেই দিন কাটছিল, হঠাৎ কি হল। রাম আজ কিছু বুঝতে পারে না, তবে কিছু হয়েছিল। নরসিং এল সেদিন নতুন চাকরির তলব নিয়ে নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে প্রণাম করতে। তার পর কখন চলে

গেল। পরের দিন দিদি জানকী তাকে পাঠালে নরসিংয়ের কাছে, বললে—তুহার নরসিং দাদার কাছে যাবি। বলবি—দিদি বললে, গোটা রুপেয়ার আফিন্ কিনে দাও।

নরসিং তার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে—বলবি সন্ধ্যের সময় আমি নিয়ে যাব। সন্ধ্যের সময় গিয়ে নেকড়ানীকে বললে—মামী, জানকীকে আমি বিয়ে করতে চাই। দেবে বিয়ে আমার সঙ্গে ?

রাম কথাটা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকার মাঠে একলা আপন মনে নেচেছিল। কেয়াবাৎ হো! জয় ভগোয়ান, জয় শিরিরামজী!

নরসিংদাদা এবার তার সত্যিকার দাদা হল। ওইটুকুতেই সে খুশী হয়েছিল। তার পর যখন নরসিং জানকীকে নিয়ে ইমামবাজারে বাসা করলে এবং রামকেও সেখানে নিয়ে এল তখন সে খুশি হয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিং তখনও কয়লার ডিপোতে কাজ করে। সে রামকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে। রাম এই ব্যাপারটিতে তখন দাদাবাবুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। দিদি জানকী বলত—বান্দর, মুরুখ কাঁহাকা। লিখাপড়ি শিখবি না তো কি কাম করবি ? দেখ তো তোর দাদাবাবুকে। লিখাপড়ি শিখলে তবে না কয়লার হিসাব লিখে।

তার পর দাদাবাবু হল বাবুদের মোটর-ড্রাইভার। দাদাবাবু যখন ওই গাড়িটার সেই গোল চাকিটা ধরে বুনো শূয়োরের মত গোঙানি আওয়াজ ছেড়ে ছুটন্ত গাড়িখানাকে যেদিকে খুশি চালাত—দাদাবাবুর কেরামতি দেখে, এলেম দেখে অবাক হয়ে যেত। এখনও মনে হলে সে হাসে। সেও শিখেছে চালাতে, ওই গোল চাকিটা—স্টীয়ারিংটা ধরে সেও এখন ইচ্ছামত জোরে গাড়িটাকে ছাড়তে পারে।

তার পর বাবুদের মেজবাবু মারা গেল। নরসিং মাথায় হাত দিয়ে বসল। জানকী তাকে বললে—তুমি নিজে গাড়ি করো। সে বার করে দিলে পাঁচশ টাকা। নরসিংয়ের তলব আর উপরি-পাওনার টাকা থেকে সে জমিয়েছিল টাকাটা। নরসিং বুধাবাবুর কাছে কিনলে এই পুরনো গাড়িটা। জবরদস্ত পুরানো মডেলের গাড়ি।

রাম হল তখন কণ্ডাক্টর, টিকিট বেচে পয়সা নিত। নরসিংয়ের কাছে সে যেন কেনা-গোলাম হয়ে গেল। জোয়ান সে পুরো হয়নি, তবু ঘরে বসে দিদির আর দাদাবাবুর ভাত খেতে তার কেমন যেন লাগত ; মোটরগাড়ির কণ্ডাক্টার হয়ে তার মনে হল, সে অনেক ইজ্জতের মানুষ হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হত পিসির বাড়িতে থাকলে সে আজও মাঠে গরু চড়িয়ে বেড়াত। দাদাবাবুর কাছে তলব নিয়ে সেও গিয়েছিল পিসির বাড়ি। নেকড়ানীকে টাকা দিয়ে সেও প্রণাম করেছিল। নেকড়ানী তাকে অনেক আদর করেছিল সেদিন। সেদিনটা সে কখনও ভুলবে না। ওই দিনটা তার সবচেয়ে বড় ইজ্জতের দিন, খাতিরের দিন। নেকড়ানীর সব গালিগালাজ অনাদর অবহেলার শোধ উঠে গিয়েছে ওই দিনে। আর সব চেয়ে দুঃখের দিন তার দিদির মৃত্যুর দিন। দিদি জানকী সন্তান-প্রসব করতে গিয়ে মরে গেল। আরে বাপ রে! দাদাবাবুর সেদিন কি চোখ।

দিদি মরে গেল। দাদাবাবু পাথরের মত সহ্য করলে—রাম ভেবেছিল—দাদাবাবু আবার সাদী করবে, নতুন বউ আসবে, সে বউয়েরও তো ভাই আছে—সে হয়তো এসে গাড়ির কণ্ডাক্টার হবে। তবু দাদাবাবুকে পরণাম, হাজার হাজার পরণাম; দাদাবাবু তাকে কাম শিখিয়েছে—মানুষ করে দিয়েছে, কাম সে খুঁজে নেবে। দিদির মৃত্যু আজ ২ছর পার হয়ে গেল, তবু দাদাবাবু বিয়ে করলে না। দিদি জানকী নাই তবু দাদাবাবুর স্নেহ এতটুকু কমে নাই। তাই তো দাদাবাবু যখন মেয়েলোককে নিয়ে শুধু খেলা করে বিদায় দেয় তখন তার দুঃখ হয়, ভয় হয় দাদাবাবু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

আজ নিতাই যখন বললে—মেয়েটা গুরুজীর মনে রঙ ধরাল্‌ছে, তখন রামা কেমন অবাক হয়ে গেল। প্রথমেই খানিকটা দমে গেল। তবে এইবার দাদাবাবু বিয়ে করবে, নতুন বউ আসবে। যদি বউয়ের সঙ্গে বউয়ের ভাই আসে? এসে সে কি ফিরে যাবে? কিছুক্ষণ পরে মনে হল, তাই যদি আসে তো আসুক। দাদাবাবুর ঘর হোক, সংসার হোক, ছেলেপুলে হোক। সে কাজ শিখেছে, জোয়ান বয়স, দুনিয়াতে কাজের কি অভাব!

নিতাই বনেটটা খুলে ভিতরটা দেখছিল। বললে—বসে ভাব লেগে গেল নাকি তোর? আয়—আয়। গুরুজী মোটরের দোকানে গিয়েছে পার্টসের অর্ডার দিতে। বেবাক খুলে পুরনো রদ্দি যা আছে পাল্টানোর হুকুম হয়ে গিয়েছে। আয়।

রাম নিতাইয়ের সঙ্গে কাজে লাগতেই যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সাওজীর ছাদের আলসের মাথার ওপর সেই মেয়ের মুখ। তার নেশা লেগে গেল। মেয়েটাকে কোনরকমে ইশারা করে ডাকবে সে, সাওজীর বাড়ি থেকে কোনরকমে বেরিয়ে আসতে বলবে। তার পর সে তার সঙ্গে দিদি সম্বন্ধ পাতাবে। বলবে—আজ থেকে তুমি ভাই আমার দিদি। বলবে—দিদি, তোমাকে ভাই দাদাবাবুর মনটিকে ভিজাতে হবে, ভুলাতে হবে। দাদাবাবুর কেমন আমীরী মন, কত উঁচু দিল্, সে কথা তাকে বলবে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল; সেখান থেকে ফটকির মুখ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। এ ফট্‌কি দিনের ফটকি। এ আর এক রকম মানুষ। বেড়ালের চোখ, বাঘের চোখ রাত্রে জলজল করে জ্বলে; হাপরের আগুনের আঁচে লোহার টুকরো যেমন রাঙা টলটলে হয়ে বাহারের চেহারা ধরে, পদ্মপাতার উপরের জলের টোপার মত একটু দোলাতেই নাচে, রাত্রের স্পর্শ পেলেই ফটকি তাই জ্বলন্ত বাঘ-বেড়ালের চোখের মত জলজলে হয়ে ওঠে, হাপরের আঁচে চলন্ত লোহার দানার মত রাঙা টলটলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার দিনের আলোর ছটা পেলেই বাঘের, বেড়ালের চোখের তারা যেমন গুটিয়ে লম্বা কালো দাঁড়ির মত ঠাণ্ডা ভালমানুষটির চেহারা নেয়, ঠাণ্ডা হলেই যেমন গলন্ত টলটলে লোহা শক্ত খটখটে কালো চেহারা নেয়—দিনের বেলায় ফট্‌কির চেহারাও তেমনি পাল্টে গিয়েছে; কপালের ওপর চুলের সীমানা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নীচের দিকে চোখ রেখে সে কাজ করে চলেছে। রাম নিতাইকে ডেকে ইশারা করে তাকে দেখালে।

নিতাই হাসলে, বললে—আয়, এখন কাজ কর্, রাত্রে দেখবি। আসবে, ঠিক আসবে।

রামের কিন্তু কাজের চেয়েও ওই দিকে মন টানছিল বেশী। গোপনে কাজ করার মধ্যে একটা নেশা আছে। সেই নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে তখন। সে বললে—ব'স্, আমি আসছি। ওর সঙ্গে 'দিদি' পাতিয়ে আসি।

নিতাই তাকে বারণ করলে—যাস্ নে। দাদাবাবু বকবে। কাজ রয়েছে, জরুরী কাজ।

রাম এ কথাও শুনলে না। সে তো দাদাবাবুর জন্যই চলেছে। যদিই বকাবকি করে দাদাবাবু, সে তা সহ্য করবে। আর কাজ? কাজ তো হবেই। দু-দণ্ড আগে আর পরে। সে চলে গেল। নিতাই একটা বিড়ি ধরিয়ে এসে বসল সামনের সীটে। সারারাত্রি জাগরণের ফলে চোখ জ্বলছিল। চৈত্র মাসের সকালে গাছতলায় মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। সে শুয়ে পড়ল। তার পর ঘুম। সে ঘুম ভাঙল নরসিংয়ের ডাকে। রামা শূয়ার এখনও ফেরে নাই।

কাজকর্ম কিছু হয় নাই, এর জন্য নরসিং আজ বিরক্ত হল না। ভালই হয়েছে। গাড়ি খুলে রাখলে আজ আর সদর শহরে যাওয়া হত না। কাজের কথা না তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে—রামা কই?

নিতাই একটু মাথা চুলকে বললে—গেল যে কোথা! বললে এই আসছি। তার ভয় হচ্ছিল বেকুফ উল্লুক রামা আবার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে গিয়ে ধরা পড়ল নাকি? নইলে এতক্ষণ ফিরছে না কেন?

নরসিং বিরক্ত হল এবার, সে বেশ বুঝতে পারলে—নিতাই তার কাছে আসল কথাটা লুকোচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেল বলতে ঢোক গিলছিস কেন?

নিতাই এবার না বলে পারলে না। বললে—ছাদে সে কাপড় মেলে দিচ্ছিল, তাকে দেখে—

—কে?

—কাল রাত্রের সেই।—হাসলে নিতাই।

ভুরু কুঁচকে নরসিং দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের কথা শুনে তার মনে হয়েছিল রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়াতেই তো দুনিয়া সরগরম হয়ে রয়েছে সেই আদ্যিকাল থেকে। এখন মনে হল—রুটির ঝগড়ার সঙ্গে সমানে চলছে মেয়েলোকের মন নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়া। রামা ছুটেছে মেয়েটার মনের জন্য। জোয়ান হয়ে উঠেছে ছোঁড়াটা। নরসিং বললে—ওকে কড়কে দিতে হবে। এই বার রোগে ধরেছে শূয়ারকে!

নিতাই বললে, না না গুরুজী, সে বলে গেল—'দিদি' পাতিয়ে আসি ওর সঙ্গে, ব'স্ তুই। মুহূর্তে নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল জানকীকে। তার মনের চিন্তা সব যেন এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নিতাই তাকে ডাকল—সিংজী! তার শুষ্ক মূর্তি দেখে তাকে 'গুরুজী' বলে ডাকতে তার ভরসা হল না।

নরসিং বললে—হ্যাঁ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে সচেতন হয়ে উঠল।

নিতাই প্রশ্ন করলে—কি রকম দাম দেখছেন এখানে? সব জিনিস মিলবে?

নরসিং বললে—ওদের হেড অফিসে যাব। গাড়ি খুলে ফেলিস নাই ভাল হয়েছে। সে গাড়িতে উঠে বসল। স্টিয়ারিংটার ওপর মাথা রেখে বললে—রামাটা—

নিতাই বললে—দেখব নাকি?

নরসিং চুপ করে রইল। মনের মধ্যে এখনও সব এলোমেলো হয়ে চলছে। নিতাই আবার বললে—সিংজী!

নরসিং বললে—হারামজাদা রামেশ্বর-পাগলা এরা আজ জোসেফদের পাড়ায় একটা গোলমাল করতে গিয়েছে। জোসেফের বোনের নাম নিয়ে নীল জল, নীল জল বলতে বলতে ওদের পাড়ার দীঘির পাড়ে গিয়েছে বাঁস ধুতে। বাইসাইকেলে চড়ে কে আসছে! জোসেফ নয়?

নিতাই বললে—হ্যাঁ, সেই নবাবই বটে। নিতাই কিছুতেই ভুলতে পারে না—হাড়ীর ছেলে—তারই স্বজাতি স্বশ্রেণীর লোক হয়ে জোসেফ একটা মাতব্বর হয়েছে।

জোসেফ এসে তাদের গাড়ির কাছেই নামল। নেমে হেসে নমস্কার করে বললে—নমস্কার। ভাবি নাই আপনাকে ধরতে পারব। আজ গাড়ি বার করেন নাই?

নরসিং বললে—না, লাইসেন্স না হলে কি করে বার করব গাড়ি? আপনি বারণ করলেন কাল।

—ভাল হয়েছে। আমার গাড়ি বিগড়েছে। গোটা দিন লাগবে সারতে। এদিকে সাহেবকে আজ সদর শহরে যাবার জরুরী তাগিদ এসেছে। সাহেব বলছিলেন বাসে সীট দেখতে। আমি বললাম…একখানা ট্যাক্সি আছে। এসেছে এখানে ভাড়া নিয়ে। চলে যান সাহেবকে নিয়ে। যা ভাড়া দেয় নিয়ে নেবেন। লাইসেন্সে সুবিধে হবে।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠে বসল। নিতাইকে বললে—স্টার্ট দে।

নিতাই বললে—রামাকে একবার দেখি।

নরসিং বললে—সে থাক্। স্টার্ট দে তুই।

জোসেফ বললে—একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি বাড়ি থেকে। নীলির কি দু-একটা বরাত আছে, শহরে কিনতে হবে। আমি আসবার সময় ফেলে এসেছি কাগজের টুকরাটা। সে বাইসাইকেল হাঁকিয়ে চলে গেল।

নরসিংয়ের মনে হল—ভালই হল। জোসেফ বাড়ি গেল—যদি রামেশ্বররা বদমাইশি শুরু করে থাকে, তাহলে জোসেফ তার ব্যবস্থা করতে পারবে।

নিতাই বললে—যাই বলেন গুরুজী, হাড়ীর ছেলের এত বাড় ভাল নয়।

নরসিং বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

নিতাই বললে—হলেই বা খ্রীষ্টান। আপনাদের গাঁয়ের হাড়ীর ছেলে তো! আপনার সঙ্গে কথা কয় যেন ইয়ারকি মারে। বলে আবার—নমস্কার!

নরসিং কোন উত্তর দিলে না। সে ভাবছিল। অনেকক্ষণ ভেবেও সে জোসেফ এবং নীলিমার ব্যবহারকে উদ্ধত বা অপমানজনক মনে করতে পারলে না। জোসেফ তার অনেক উপকার করছে, নীলিমা-মেয়েটি বড় ভাল। হোক হাড়ীর মেয়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে আজ ওর কাছে হার মেনে যায়।

জোসেফ ফিরে এল। তার সঙ্গে নীলিমা। বাইসাইকেল ধরে হেঁটে নীলিমাকে সঙ্গে করে এল জোসেফ। চোখ-মুখ তার থমথমে হয়ে উঠেছে। বললে—ভাগ্যে গিয়েছিলাম আমি। রামেশ্বর আর পাগলা আমাদের পাড়ায় দীঘিতে বাস ধুতে এসে—। সে থেমে গেল।

নরসিং বললে—হ্যাঁ, আমার সামনে দিয়েই গেল চীৎকার করতে করতে, ক্রীশ্চান দীঘির জল খেতে চলল গাড়ি।

—হ্যাঁ। সেখানে উপদ্রব আরম্ভ করেছিল। নীলি ইস্কুলে পড়ায় তার জন্যে ওদের ভীষণ রাগ। যা-তা বলে, রাস্তায় ঘাটে শিস দেয়। ওর অপরাধ ও ক্রীশ্চান—আর আমি মোটর-ড্রাইভার—আমার বোন। দিনকতক বন্ধ হয়েছিল। আজ দেখি আবার শুরু করেছে, তাই ওকে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে, ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে নিয়ে যাব আপনাকে।

নরসিং বললে—কেন? উনি উঠুন না গাড়িতে; ওঁকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাব। নীলিমার দিকে চেয়ে সে খুব মিষ্টি করেই বললে—উঠুন গাড়িতে।

নীলিমা দাদার দিকে চাইলে। জোসেফ বললে—উঠে পড।

নরসিং হেসে বললে—আপনাদের বাড়ি গেলে ভাড়া দিয়ে দেবেন। ভাল করে চা খাইয়ে দেবেন। সত্যি, আপনাদের বাড়ির চা চমৎকার।

এগারো

নসিবের গতিক হল ভাজ্জবের কাণ্ড। নসিবের খেয়ালের মত খামখেয়াল দুনিয়ায় আর হয় না। অত্যন্ত সহজে, যাকে বলে—খাঁ করে, হয়ে গেল নরসিংয়ের সার্ভিস লাইনের হুকুম। এখানকার এস-ডি-ও করে দিলেন। ইমামবাজারের সার্ভিস উঠে গেল সেখানকার এস-ডি-ও'র জবরদস্তিতে; শ্যামনগর এসে সেই ভয়টাই ছিল সব চেয়ে বড় ভয়। এনকোয়ারি হলে সেখানকার রিপোর্ট আসবে—কি রিপোর্ট আসবে সে নরসিং জানত। সেই কারণে সে ঠিক করেছিল শুখনরামের নামে সার্ভিস লাইনের দরখাস্ত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এখানকার এস-ডি-ও বিনা এনকোয়ারিতেই লাইসেন্স করে দিলেন। বেঁচে থাক জোসেফভাই; সে-ই দিয়েছে সাহেবের ভাড়া জুটিয়ে। সাহেব গাড়ির ফুটবোর্ডে পা দিয়েই তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—তুমি আগে ইমামবাজারে থাকতে না? ইমামবাজারের সুধাংশু বাবুদের বাস সার্ভিসে ড্রাইভার ছিলে না?

সুধাংশুবাবু ইমামবাজারের মেজবাবু।

নরসিং এবার সায়েবকে চিনতে পারলে। ইনি যে সেই 'গুপ্তি' সায়েব। ইমামবাজার

অঞ্চলে সার্কেল-অফিসার ছিলেন। ছিপ্‌ছিপে শরীর, অল্পবয়সী ফুটফুটে চেহারার গুপ্ত সায়েব মাসে অন্তত দু-বার করে ইমামবাজারে আসতেন। মেজবাবুর সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল। সে দোস্তি গলায় গলায় হয়ে উঠল একদিন। নরসিংয়ের মোটর-বাসেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। মনে আছে নরসিংয়ের।

হোলির দিন। মেজবাবুর হঠাৎ ঝোঁক উঠল—খুব ধুমধাম করে হোলি খেলবেন এবার। সকালেও কোন কথা ছিল না। জংশন থেকে ন'টার ট্রিপ দিয়ে ফিরবামাত্র হুকুম এল মেজবাবুর, গাড়ি লে আও। বাস্ নিয়ে নরসিং বাবুদের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়াল। আরে বাপ রে বাপ! বিলকুল সব লালে লাল হো গেয়া। মাথায় মুখে আবীর মেখে খুন-খারাবি রঙে জামা কাপড় রাঙিয়ে মেজবাবু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; বালতি বালতি রঙ, পিচকারি, আবীর আর সঙ্গে বেতের বোনা সোডা-কেরিয়ারে বোতল। বাবুদের চোখ লালচে। গ্রামের যাত্রার দলের কয়েকজন গাইয়ে ছেলে নিয়ে ঢোল বাঁশী হারমোনিয়ম বাজিয়েরা এক পাশে বসে আছে।

বাস্ নিয়ে দাঁড়াবামাত্র মেজবাবু বললেন—নেমে আয়।

নামবামাত্র নরসিংকে আবীর রঙে রাঙিয়ে দিলে একজন। মেজবাবু হুকুম দিলেন—যা, ও ঘরে যা। সে ঘরে মেজবাবুর চাকর তাকে কাচের গেলাসে আধ গেলাস ঢেলে দিলে বিলিতী মদ। 'রম্'; রম্ মদটার নাম।

তার পর বার হল মেজবাবুর হোলির হল্লা।

লাগাও গান।

যাত্রার ছেলেরা গান ধরলে—"কেন রঙ দিলি ঢঙ করে? সাদা কাপড় রঙিয়ে দিলি পিচকারি মেরে।"

বাবুরা চেঁচাতে লাগল—ইয়া! ইয়া! হোলি হায়!

গাড়ি চলতে লাগল। দু-পাশে চলতে লাগল পিচকারির মুখে রাঙা ফোয়ারা। গোটা গাঁ মাতিয়ে—থানা, সবরেজিস্ট্রি অফিস, বাজার পার হয়ে গাড়ি চলেছিল বাবুদের বাগানের দিকে, পথে বাইসিক্লে যাচ্ছিলেন—গুপ্ত সায়েব।

হো-হো-হা-হো করে মেজবাবু স্ফূর্তিতে নেচে উঠলেন—মিল গিয়া বাবা নয়া আদমী মিল গিয়া! রোখো, রোখো গাড়ি।

বাস্। গাড়ি থেকে নেমে গুপ্ত সায়েবকে আবীরের রঙে লাল বানিয়ে দিয়ে তাকে টেনে তুললেন গাড়িতে। বাইসিক্লটা তুলে দিলেন গাড়ির ছাদে। হুকুম হল—চল ডাকবাংলো। গুপ্ত সায়েব ইমামবাজারে এসে ডাকবাংলোতেই ছিলেন। ডাকবাংলোয় একদফা মজলিস হল। পূর্ণিমার রাত্রে ময়ূরাক্ষী নদীর বালুচরে হোলি হবে। রাত্রি আটটায় গাড়ি ছাড়ল।

কোঁচানো কাপড়ে, গিলে-করা পাঞ্জাবিতে, সাবান দেওয়া খসখসে চুলে, এসেন্স আতরের খুশবয় ছড়িয়ে উঠলেন মেজবাবু আর এই গুপ্ত সায়েব। আর যারা, তারা কায়দায় এঁদের

মত তুংস্তু নয়। আর উঠল খাবার। লুচির ঝুড়ি, মাংসের ডেকচি, কাটলেটের ট্রে, বোতলে ভরা সোডা-কেরিয়ার—ছটা খোপে ছটা বোতল। হোলির জন্যে পুরো একটা কাঠের বাক্স ভরে বোতল এনেছিলেন মেজবাবু। অধিকাংশই ওই রম্। তুটো বড় বোতল ছিল সাদা ঘোড়া-মার্কা হুইস্কি। আর চড়ল হারমোনিয়ম ডুগি-তবলা।

মেজবাবু তারই একটা বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে ধরলেন গুপ্ত সায়েবের মুখের কাছে।

সায়েব হাতজোড় করলেন প্রথমটা।

মেজবাবু বললেন—এক চুমুক অন্তত।

এক চুমুক, তু চুমুক, তিন চুমুক—গেলাস খালি। হোলি হায়, হোলি হায়! মেজবাবু ঢাললেন দোসরা গেলাস।

সাদা ধোয়া ফিনফিনে মসলিনের মত 'চাঁদনী' গায়ে জড়িয়ে বালুচর যেন দাঁড়িয়ে ছিল নাগরের অপেক্ষায়, পিয়ারীর মত চুপ করে, অনড় হয়ে। গাড়ি থেকে বাবুরা লাফিয়ে পড়ল বালুচরের উপর। সে কি মাতামাতি! শেষ পর্যন্ত গড়াগড়ি। নদীর ওপার থেকে আনা হয়েছিল চার-পাঁচটি মেয়ে, মেজবাবু দিনের বেলায়ই বাইসিক্লে লোক পাঠিয়েছিলেন ; তারাও শুয়ে পড়েছিল। ঠিক ছিলেন শুধু তিনজন। মেজবাবু, রজনীবাবু আর এই গুপ্ত সায়েব। রজনীবাবু মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, মরল নাকি শালীরা?

আকাশের দিকে চেয়ে গুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, মরুক। ওরা পুণ্যবতী। এ মরণ স্বরগ সমান।

মেজবাবু হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে গান ধরেছিলেন—"এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো সে মরণ স্বরগ সমান।" গুপ্ত সায়েব উঠে নাচতে শুরু করলেন। হাঁ, সেদিন গুপ্ত সায়েবের নাচবার এক্তিয়ার ছিল। কি ছিপছিপে চেহারা! ভারি ভাল লেগেছিল নরসিংয়ের।

গুপ্ত সায়েব তার পর গান গেয়েছিলেন—সে গান আজও মনে আছে নরসিংয়ের।—"হেসে নাও তু-দিন বৈ তো নয়। কে জানে কার কখন সন্ধ্যে হয়।"

মেজবাবু নাম দিয়েছিলেন সেই দিন—তুমি বাবা 'গুপ্তি' সাহেব। গুপ্তি যেমন লাঠির খাপের মধ্যে লুকানো থাকে তেমনি চাঁদ তুমি লুকিয়ে থাক।

সেদিনও নরসিংয়ের রাজপুত রক্তে দোলা লাগত এই সবে। সেদিন তারও মনে হয়েছিল —এর চেয়ে ঠিক কথা আর হয় না। সাচ্ বাত হায়। এর চেয়ে সুখ আর তুনিয়ায় কি আছে? এই দোলে—হোলির পর নরসিং গোপনে তু-চারজন বন্ধু নিয়ে গভীর রাত্রে বাবুদের অগোচরে বাস্ নিয়ে ওই বালুচরে এসে ওই খেলা খেলেছে! কিন্তু সে-সব পাল্টে গিয়েছে আজ। জান্কী—না, একা জান্কী নয়, এই ট্যাক্সিটাও আছে জান্কীর সঙ্গে। বাবুদের বাস্ ছিল—বাবুদের বাস্, বাবুদের পেট্রোল ; আর এ ট্যাক্সিটা তার নিজের। পেট্রোল যাবে নিজের, ট্যাক্সিতে ধুলো লাগবে, টায়ার ক্ষয় হবে—তার নিজের যাবে। মাইনের টাকা, উপরি আয় খরচ করতে মায়া হত না। এখন নিজের ব্যবসার টাকা খরচ করতে মায়া

লাগে। তা ছাড়া তখন ছিল অল্প বয়স, গিবুবরজার ছত্রী বংশে জন্মে রক্তের মধ্যে যে তেজ, যে নেশা ছিল—তখনও পর্যন্ত তা বেঁচে ছিল। আজ আর সে বেঁচে নাই। যদিই থাকে সে সামান্য। গিবুবরজার বর্কআন্দাজ গিরধারী সিংয়ের বংশের ছেলেরা লক্ষ্মী হারিয়ে পুরুষে পুরুষে ছোট কাজ-কাম করে পাল্টে যেমন আজ দারোয়ান আর চাষীতে দাঁড়িয়েছে—সেও তেমনি মোটর-ড্রাইভারি করতে করতে পাল্টে পাল্টে আজকের এই খাঁটি মোটর ড্রাইভার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টীয়ারিং থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নরসিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যাক। তামাম দুনিয়া পাল্টাচ্ছে—সে পাল্টাচ্ছে তার জন্য নরসিংয়ের দুঃখ নাই। রাজা ফকির হয়, ফকির রাজা হয় দুনিয়ায়। নরসিং কোন রাজাকে ফকির হতে দেখে নাই, কিন্তু জমিদারকে জমিদারি হারাতে দেখেছে, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে যে লোক মাথায় করে তামাক বেচে বেড়াত তাকে শেঠ হতে দেখেছে।

শুখনরাম আজ শেঠ, তার তিনমহলা বাড়ি।

তবু তার ভাগ্য ভাল যে হঠাৎ এইভাবে 'গুপ্তি' সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গুপ্তি সায়েবের এখন আর সে চেহারা নাই। মোটা হয়েছেন গুপ্তি সায়েব। রঙ ময়লা হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে। আগের মত আর প্রাণ খুলে হাসেন না। অল্পস্বল্প হাসেন, আওয়াজ হয় না, চোখে দেখে বুঝতে হয় সায়েব হাসছেন। পাকা সায়েব হয়েছেন—সে এক নজরেই বুঝে নিয়েছে নরসিং।

খুব খাতিরের সঙ্গে সেলাম করে সে বলেছিল, হুজুর আপনি ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

সায়েব গাড়িতে উঠে শহরে যাওয়ার পথে অনেক খবর নিলেন। মেজবাবুর মৃত্যু-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সুধাংশুবাবু যে বেশীদিন বাঁচবেন না এ আমি জানতাম। এত অত্যাচার কি মানুষের দেহে সহ্য হয়!

তারপর আবার বললেন—আর তিনি যে অল্প বয়সেই গিয়েছেন এও তাঁর পক্ষে ভাল হয়েছে। বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচলে হয়তো সবই নাশ করে ফেলতেন। নিজেও দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকতেন। কেলেঙ্কারি হত। লোকে ঘেন্না করত।

আবার একটু পরে বললেন—এমন মানুষ আর হয় না।

নরসিং কোন কথার জবাব দিলে না। সে জানে জবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল। এ জাতকে সে চেনে, কিন্তু ওরা যে কিসে তুষ্ট হয় কিসে রুষ্ট হয় সে নরসিংয়ের বুদ্ধির অগম্য। অনেক সময় সায় দিলেও এরা চটে।

গুপ্তি সায়েব আবার বললেন—ট্যাক্সি তোমার নিজের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—কতদিন কিনেছ গাড়ি?

—অনেকদিন হল হুজুর। মেজবাবু মারা গেলেন—তার পর বাবুরা বছর দেড়েক রেখেছিলেন বাসের কারবার। তার পর তুলে দিলেন। তখনই আমি—। তা আজ হল পাঁচ-ছ বছর।

সায়েব প্রশ্ন করলেন—এতদিন কোথায় সার্ভিস ছিল তোমার? ওখানেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওখানকার সার্ভিস এখন আর ভাল চলছে না বুঝি?

নরসিং চুপ করে রইল। সত্য কথা বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারলে না।

—ওখানে এখন কখানা গাড়ি চলে? অনেকগুলো, না?

—আজ্ঞে?

—কখানা গাড়ি ওখানে চলে?

নরসিং সত্য কথা বলে ফেললে।—আজ্ঞে গাড়ি একখানাই ছিল। আমারই গাড়িখানা।

—তবে?

—তবে—। আজ্ঞে—। নরসিং ঘামতে লাগল।

—ট্রেনের সঙ্গে কম্পিটিশনে সুবিধে হচ্ছে না বুঝি? অনেকগুলো গাড়ি দিয়েছে বুঝি রেল-কোম্পানি? শুনেছিলাম বটে শাটল্ ট্রেন দিয়েছে ওখানে। ইমামবাজার থেকে জংশন—একখানা ইঞ্জিন দুখানা গাড়ি; যায় আর আসে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নরসিং। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই—

গুপ্তি সায়েব একটু ভাবলেন—তাই তো হে, পাঁচমতি পর্যন্ত সার্ভিস তোমার চলবে তো? কাঁচা রাস্তা; বর্ষার সময় গরুর গাড়ি পর্যন্ত চলে না—

—আজ্ঞে দেখি। না চলে তো তখন—। তখন যে কি করবে নরসিং জানে না। নরসিংয়ের ধারণা তখন যে কি হবে সে জানে একমাত্র ভাগ্য। এখানে সে আসবে তাই কি সে জানত? জল ফুরাল, দাঁড়াতে হল। না দাঁড়ালে মোটরের পিছনে যে গাড়ি আসছিল তার সঙ্গে দেখা হত না। গাড়িখানা উল্টাল। শুখনরাম বার হল সেই গাড়ি থেকে, তামাকের ছোট পেটী আর ফট্‌কিকে নিয়ে। ফট্‌কি সঙ্গে না থাকলে শুখনরামের উপর তার মেজাজ গরম হত না। আর তা না হলে শুখনরাম আর তার গরম মেজাজের উপর মেজাজ দেখাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হেঁকে বসত না। সুতরাং এখানে যদি না চলে সার্ভিস, তখন যে কি করবে সে তা জানে না।

গুপ্তি সায়েব বললেন—তা ভাল, দেখ। একখানা দরখাস্ত করে দিয়ো।

নরসিং আবার তোষামোদ করবার চেষ্টা করলে—হুজুরই তো মালিক। আপনি যা করবেন তাই হবে।

গুপ্তি সায়েব বললেন—ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের ক্ষতি হবে। তা—। একটু ভেবে বললেন—সে হবে'খন। জনকতক ভদ্রলোকদের দিয়ে মোটর-সার্ভিসের সুবিধা দেখিয়ে দরখাস্ত করিয়ে দেবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।

গঙ্গার তটভূমি নিকট হয়ে আসছে। বনঝাউ দেখা দিয়েছে রাস্তার পাশে। বড় বড় আমবাগান দেখা যাচ্ছে। দু-পাশের সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে রাস্তাটা ক্রমশ বাঁধের মত উঁচু হয়ে উঠেছে; সাঁকোর সংখ্যা বাড়ছে। যাত্রী-গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। নরসিংয়ের হাতে গাড়িখানা চলেছে পাকা জকির হাতের ঘোড়ার মত।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন গুপ্তি সায়েব। সিগারেটের ধোঁয়া ভারি চমৎকার ভাবে ছাড়েন তিনি, গোল কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ ফাঁদলে বড় হয়ে প্রায় ছুটে চলে সামনে। মেজবাবুও ধোঁয়া ছাড়তেন এমনিভাবে, বলতেন—ধোঁয়ার রিং। বড়লোকের বড় কায়দা।

বড় বেশী ভেবেছিল নরসিং। কিন্তু অতি সহজে-লাইসেন্স হয়ে গেল। সুতরাং এ নসিব ছাড়া আর কি হতে পারে? তার নসিব নয়—এ হয়েছে শুখনরামের নসিবে। সেদিন সদর শহর থেকে ফিরে যখন এই কথাটা সে বড় গলা করে জাহির করলে তখন শুখনরাম হেসে বলেছিল—আরে ভাই, হামার নসিবের সাঁথে আপনি নসিব যখন জড়াইয়ে দিলেন তখন এ তো হোবেই হোবে। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

শুখনরাম সেইদিন সকালে এক সওদায় পাঁচ হাজার মুনাফা করে দিল্‌দরিয়া মেজাজ নিয়ে বসে ছিল। শুখনরামের কথাটা নরসিংয়ের মনে লাগল। কথাটা অত্যন্ত সত্য বলে মনে হল তার। গিরধরজার যে ঘর থেকে মা-লক্ষ্মী চলে গিয়েছেন আগুনের আঁচে ঝলসে—সেই লক্ষ্মীছাড়া ঘরের ছেলে সে। দিদিয়ার কথা শুনে সে একদিন বেরিয়েছিল—লেখাপড়া শিখে সে মানুষ হয়ে মা-লক্ষ্মীকে ফেরাবে বলে। কিন্তু নসিব কপাল যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। দিদিয়া একটা ছড়া বলত—

"গোপাল যাচ্ছ কোথায়?
ভূপাল।
কপাল?
সঙ্গে।"

কপাল মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। তাই তো বিয়ে-সাদীর সময় মানুষ সব চেয়ে আগে দেখে কনের কপাল।

ভেবে-চিন্তে কথাটা ধ্রুব সত্য বলে মনে হল নরসিংয়ের।

শুখনরাম বললে—তব্ তো সব ঠিক হইয়ে গেল। এখুনি আপনি টাকা লিয়ে তুরন্ত গাড়িঠো ঠিক বানাইয়ে ফেলেন।

তার পর গলা নামিয়ে বললে—আজ রাতে একবার পাঁচমতি যাবেন? দুঠো পেটী হুঁয়া পৌঁছা দেনে হোগা।

দু পেটী বলতে নরসিং বুঝেছিল অনেক। কিন্তু আসলে দুটো পাঁচসেরী ঘিয়ের টিনের কৌটায় আড়াই সের করে পাঁচসের মাল। এবার গাঁজা নয়—আফিং। গন্ধ নিবারণের জন্য

ঘিয়ের আবরণ দিয়ে টিনে পুরে পাঠানো হচ্ছে। চালানের রকমারি ব্যবস্থা আছে। পাঁচমতির বাজারে জগুবাবু, জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জে বাবুলোক, বড় জমিদার ঘরের ভাগ্নে, বাবুদের ম্যানেজার, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘিয়ের ব্যবসাও করছে। খাঁটি গাওয়া ভয়সা ঘি এই গঙ্গার ধারের সরস অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে কলকাতা চালান দেয় এবং বাইরের আড়ত থেকে বাজারে ঘি এনে ওখানকার দোকানে সরবরাহ করে। সঙ্গে সঙ্গে আছে এই গোপন কারবার। পাঁচমতি থেকে ওদিকে তার বাঁধা খুচরা কারবারী খরিদ্দার আছে। তারা নিয়ে গিয়ে সরবরাহ করে গাঁওলা গাঁয়ে। ভরি পিছু অল্প কিছু সস্তা দেয়। নেশাখোরদের কাছে একটা পয়সা, একটা আধলাও মূল্যবান। তা ছাড়া এই লুকিয়ে কেনায় একটা আলাদা নেশা আছে। এই মালের যা তেজ, সে সরকারী মালে নাই। নেশাখোরেরা বলে—সরকারী মালের আরক বের করে আর কিছু থাকে না। এ মালের জোর চাহিদা।

মাল নিয়ে এসেছিল একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। আমীরের মত চেহারা। তেমনি তার বেশভূষা। নরসিং তাকে দেখেছে। সে এসে উঠেছিল ডাকবাংলোয়। চামড়ার খোঁজে সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে উঠল শুখনরামের গদিতে। শুখনরাম রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। 'অন্দরমহলেরও ওধারে একখানা ঘর। সেই ঘরে কারবার, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। গোলকধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে পথ। নরসিংকে ডেকে শুখনরাম ঘিয়ের টিন দুটো হাতে দিলে। বললে—হাজার রুপেয়ার মাল। জগুবাবুর পাশে পানশো রুপেয়া গুনে লিবেন। কুছ ডর নেহি। বড়া জমিদারের কাছাহরি, একদম ঘুসে যাবেন গাড়ি লিয়ে। দিল্ চাহে তো হুঁয়া থাকবেন রাতমে।

কারবারী মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, নেহি। রাত্তিরেই চোলে আসবেন। রাত্তিরেই আমি যাব—ট্রেন ধরব, গাড়ি চাই আমার।

নরসিং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল; চমৎকার বাংলা বলেন ভদ্রলোক। সামান্য টান, আর দু-একটা কথার বাঁকা উচ্চারণ ছাড়া ধরাই যায় না যে, ভদ্রলোক বাঙালী নন।

শুখনরাম বলেছিল, আরে না—না। সো হবে না সাব। তার পর অশ্লীল কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে সে; যার অর্থ হল শুখনরাম তাঁকে একটি অতিসুন্দরী নারী উপহার দিতে চায়।

নরসিং চমকে উঠল। কে সে? সে কি—?

পরমুহূর্তেই শুখনরাম বললে, আচ্ছা, পহেলে দেখেন। বলেই সে চলে গেল অন্দরের দিকে। নরসিং দাঁড়িয়ে রইল।

মুসলমান ভদ্রলোক বললেন—শীগ্‌গির শীগ্‌গির চলে যান। শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরবেন। রাত্তিরেই আমি যাব। যান দেরি করবেন না।

নরসিং তবু গেল না। বললে—হ্যাঁ, যাই। বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক এই সময় তার অনুমানকে সত্য করে ফট্‌কিকে সুমুখে নিয়ে উপস্থিত হল শুখনরাম। ঘরের মধ্যে ফট্‌কিকে ঠেলে কুৎসিত বীভৎস হাসি হেসে শুখনরাম বললেন, দেখেন।

নরসিং আর দাঁড়াল না। চলে এল। গাড়িতে চেপে নিতাইকে বললে—মার হাঁকেল!

নিতাই জানে ব্যাপারটা। রাম জানে না। রাম বিস্মিত হয়ে বললে—প্যাসেঞ্জার কই?

দুর্দান্ত ক্রোধে নরসিং যেন ফেটে পড়ল—চোপরও শালা হারামী কাঁহাকা! সে খবরে তোর দরকার কি?

গাড়িখানা গোঙাচ্ছিল। সুইচ টিপে হেড লাইট জেলে দিয়ে নরসিং গাড়ি ছাড়লে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ধূমকেতুর পুচ্ছের মত তীব্র আলো সামনে ফেলে গাড়িখানা ছুটছিল। জনহীন পথ। হঠাৎ নিতাই বললে—সাপ, সাপ যাচ্ছে।

রাস্তার পার থেকে একটা কালো সাপ চলে যাচ্ছে ওপারে; নরসিং বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ, একটা কঠিন আক্রোশে পূর্ণশক্তির পথ পায়ের চাপে মুক্ত করে—গাড়িখানাকে ছেড়ে দিলে। দেরে—ওটাকে সে চাপা দেবে। গেল, গাড়ির সামনে থেকে বেরিয়ে গেল! ক্ষিপ্রহাতে স্টীয়ারিং অল্প বেঁকিয়ে দিলে নরসিং। বেঁকে গাড়িখানা প্রায় রাস্তার প্রান্তে এসে পড়ল, আর হাত দুয়েক পরেই নেমে গিয়েছে রাস্তার ঢাল। আবার বেঁকল গাড়িখানা। রাস্তার মাঝখানে এসে আরও খানিকটা গিয়ে থামল। ব্রেক কষে নরসিং বললে—দেখ তো টর্চটা জেলে।

নিতাই টর্চ জ্বাললে। সাপটার মাথার দিকটাই ছেতরে গিয়েছে মোটা রবার টায়ারের চাপে। ধুলোর উপর টায়ারের ছাপ এঁকে বসে গিয়েছে। পিছনের দিকটা এখনও নড়ছে।

—শালা!

মোটরটা এবার অপেক্ষাকৃত সংযত গতিতে চলল।

জগবন্ধু বাঁড়ুজ্জের একটা পা নাই। বগলে ঠুঙি লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। এক নজরে নরসিং তাকে চিনে ফেললে—লোকটা শুখনরামের চেয়েও হারামী। ওর দুটো ঠ্যাঙ থাকলে দুনিয়ার সর্বনাশ করে ফেলতে পারত। ওর চেয়েও শয়তান ওই পাঞ্জাবী লোকটা। রাত্রে স্টেশনের পথে বললে—এসব কারবারে সঙ্গে পিস্তল রাখতে হয়। নিজে পিস্তল বার করে দেখালে।

নরসিং দেখলে পিস্তলটা। দেখবামাত্র তার বুকের ভিতরটা লালসার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠল। মারণাস্ত্রের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ওঃ, ওই জিনিসটা কাছে থাকলে দুনিয়ায় আর কিসের ভয়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

সকালবেলা উঠে মনে হল মনটা তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। নিতাই রাম গাড়ি নিয়ে পড়েছে। খুলে আগাগোড়া সাফা করতে হবে, বদ্দি পার্টস দেখে সেগুলো বিলকুল পাল্টাতে হবে। শুখনরাম আজই টাকা দেবে। দলিল তৈয়ার হচ্ছে তার উকিল-সায়েবের দপ্তরে। এখানকার সব চেয়ে ভাল উকিল তার উকিল। বুড়া উকিলটার গোঁফজোড়াটা দেখে মনে হয় লোকটা একটা উকিলের মত উকিল। কিন্তু ঠিক ভাল লাগছে না নরসিংয়ের। জোসেফ বলেছে, শুখনরামের সঙ্গে লেন-দেনের কারবার করে ভাল করলেন না আপনি।

নিতাই বলেছে—বেটা হাড়ীর মতলব ছিল আপনাকে ওর বহিনের টোপ দিয়ে মুফতে আপনার গাড়ির ভাগীদার হতে—

ধমক দিয়েছে নরসিং। নিতাই গুম্ হয়ে আছে। দুঃখিত হয়েছে একটু। তা হোক। কিন্তু এমন অন্যায় কথা কখনই বরদাস্ত করবে না সে। মেরী নীলিমা বড় ভাল মেয়ে। প্রথম দিন তাকে দেখে তাদের পূর্বপুরুষের যে গল্প তার মনে পড়েছিল, সে গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজ আর নরসিং নীলিমাকে নিয়ে কল্পনা করতে সঙ্কোচ মনে করে। অন্যায় মনে হয়।

নরসিংয়ের মনে কেমন একটা আফসোস হচ্ছে। শুখনরামের সঙ্গে জড়ানোটা ভাল হয় নাই। গত রাত্রির কথা মনে হচ্ছে। ফট্‌কির উপরে ঘেন্না হচ্ছে। আবার মনে হচ্ছে সে করবে কি? সে নিজে কি করলে? কাল রাত্রে সে যা করেছে—না করে তার যেমন উপায় ছিল না, তেমনি ফট্‌কিরও ছিল না কোন উপায়। ও মেয়ের ওই নসিব। নরসিং মোটর-ড্রাইভার—তার ওই নসিব। গেজেট খবরের কাগজ• পড় না—দেখতে পাবে—মোটর-ড্রাইভারের নসিব তাদের কোন্ পথে নিয়ে যায়। হরদম দেখতে পাবে মোটর-ডাকাতির কথা। ড্রাইভারের নসিব পাক লাগিয়ে তাকে ডাকাতদের সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাবে পথ থেকে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গেল জেনানী—কারও বহু, কি কারও বেটী। নসিবের ফের—ড্রাইভার কি করবে! হাঁ, টাকার লোভ একটা অপরাধ বটে—আর এ সব কাজের নেশাও বটে। কিন্তু নরসিংয়ের বিশ্বাস—এ সব হল মোটর-ড্রাইভারি নসিবের ফের। তার যে কিছুতেই ইচ্ছা হচ্ছে না শুখনরামের এই পাপ কাজ করতে। কিন্তু কি করবে, উপায় নাই যে।

মোটা মুনাফা আর এই কাজের নেশা। গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে বাবুলোক সায়েব-লোক ট্যাক্সি নিয়ে, পিয়ারী এসে ওঠে। মোটা ভাড়া মেলে, চোখ সামনে রেখে বসে থাকে ড্রাইভার—পিছনে চলে—অশ্লীল কাণ্ড। কি করবে ড্রাইভার? দু-দশ দিন পরে এ কাজে নেশাও একটা জমে যায়, তখন মজা লাগে। নরসিংয়েরও সয়ে যাবে। মজা লাগবে। পাঞ্জাবী কাল রাত্রে স্টেশনে পৌঁছে করকরে দুখানা দশটাকার নোট দিয়ে গিয়েছে। কুড়ি-কুড়িটা টাকা ছাড়া যায়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—সিংজী! শুখনরামের কর্মচারী ডাকছে।—চলুন উকিল-বাড়ি। শেঠজী বললেন।

—চলুন। না গিয়ে উপায় কি!

বিকেলে শেঠজী দু-বোতল মদ দিলে। কাল রাত্রের ভাড়াটা শুখনরাম দেয় নাই। এটা তারই বদলে দিচ্ছে বোধ হয়। উপায় নাই—ডুবতেই হবে, ফট্‌কিও ডুববে। কোন্ দিন দেবে বিক্রি করে কাউকে মোটা টাকায়।

—পাঁচমতি—পাঁচমতি! পাঁচমতি!

শ্যামনগর থেকে সার্ভিসের প্রথম ট্রিপ ছাড়বে।—পাঁচমতি খেয়াঘাট ছ আনা। মোটর ট্যাক্সি।

ট্যাক্সির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে হাঁকছে রামচন্দর। নিতাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেঁয়ো

প্যাসেঞ্জারদের ধরে আনতে হয় দরকার হলে পুঁটলি-পোঁটলা মোটঘাট বয়ে এনে চাপিয়ে নিতে হয় নামিয়ে দেবার সময়—ও দায়িত্ব নাই। গাড়ি থেকে পথের ধারে নামিয়ে দিলে খালাস। বিরক্তি ধরলে—মেজাজ খারাপ থাকলে—ছুঁড়ে ফেলে দিলেও দোষ নাই।

গাড়ি মেরামত হয়ে গিয়েছে। সার্ভিস খুলেছে নরসিং। মন্দ চলছে না। মন্দ কেন, ভালই চলছে। কিন্তু শেঠকে নিয়ে মনটা খুঁতখুঁত করছে। লোকটা ভয়ানক ঘড়িয়াল। কি ভাবে, কে জানে? বোধ হয় ওই টাকা ক'টা দিয়ে ভাবছে টাকাটা নরসিং দেবে না। রোজ সন্ধ্যার পর—গাড়ি ট্রিপ শেষ করে ফিরলেই আসবে!—কি মোশা, আজ কেত্না হল সেল্ আপনার? হিসেবটি নিয়ে ফিরবে। সপ্তাহ শেষে বলবে, দিয়ে দিন না খরচ বাদে যা আপনার বাঁচল। কি করবেন নিজের কাছে রেখে? বাচ্চা তো হবে না আপনার রুপেয়ার।

আশ্চর্য মানুষ! যে মানুষ গদিতে বসলে কথা বলতে ভয় হয়, মনে হয় একটা বাঘের মত ভয়ানক লোক বসে আছে, সেই মানুষ নরসিংয়ের কাছে এসে দিব্যি তার স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসে হেসে কথা বলে। হাসি-তামাশা করে। মধ্যে মধ্যে বলে, কত নিজের হাতে আর রান্না করবেন মোশা? একটা সাদী করেন—না তো একঠো মেয়েলোক রাখেন। কাম কাজ করবে, থাকবে। উসমে কেয়া দোষ? খুব গম্ভীর ভাবে বলে। নরসিংয়ের ইচ্ছা হয় ফট্‌কির কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য, সাহস হয় না। নিতাই প্রথম দিনে শুখনরামকে ঠাট্টা করে বলেছিল—দাদা নয়, উনি আমার ঠাকুরদাদা। ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়। সেই নিতাই এখন কথাই বলতে পারে না, শুখনরাম এলে চুপ করে বসে থাকে। লক্ষ্য করে দেখেছে নরসিং—নিতাই আপনাআপনি হাতজোড় করে বসে।

নরসিং একদিন বলেছিল নিতাইকে—হাতজোড় করিস কেন?

নিতাই আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল—না তো।

রাম বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে শুখনরাম এলে।

অবসর পেলেই এই সব কথা ভাবে নরসিং।

স্টীয়ারিংয়ের উপর বুক রেখে অলস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে নরসিং ভাবে, কোথা থেকে সে কোথায় এসে পড়ল! দু'শর জায়গায় চারশ টাকা দিয়েছে শুখনরাম। কতকগুলো পার্টস বদলে গাড়িখানা অবশ্য মজবুত হয়েছে, তাজা হয়েছে। দু'শ টাকা এস্টিমেট করে গাড়িখানাকে ভাল করবার ঝোঁকে নরসিং চারশ টাকা খরচ করে ফেলেছে। শুখনরাম তাতে আপত্তি করে নাই। সে বলে—আপনি হামার কাম দিবেন, আপনার কাম হামি জরুর চালাইয়ে দিব।

কোনরকমে টাকাটা উপায় করে শুখনরামকে ফেলে দিতে পারলে সে খালাস হতে পারবে এ বন্ধন থেকে।

কখন ছাড়বে গাড়ি? পিছনের সীটে তিনজন প্যাসেঞ্জার বসে আছে। তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে।—পাবলিক সার্ভিসের গাড়ি। তার ছাড়বার একটি ধরা-বাঁধা সময় থাকা উচিত। যখন খুশি তখন ছাড়ব বললে চলবে না। এগুলো অত্যন্ত বে-আইনী ব্যাপার।

ঘোড়ার গাড়ি কখন ছেড়ে চলে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি যাবে বলে এক আনা বেশী ভাড়া দিয়ে মোটরে এলাম।

নরসিং স্টীয়ারিং ছেড়ে খাড়া হয়ে বসল। বললে—ঘোড়ার গাড়ির আগে পৌঁছলেই হল তো আপনাদের?

—ঘোড়ার গাড়ির আগে কি পরে সেটা কোন কথাই নয়। পাঁচমতি কোন্ টাইমে পৌঁছবার কথা সেইটাই হল কথা। ঠিক টাইমে যদি না পৌঁছয় তাতে যদি আমার ক্ষতি হয়, তার দায়ী হতে হবে তোমাকে।

নরসিং এ কথার কোন জবাব দিলে না। জবাব দিতে গেলে চলে না। ঘোড়ার গাড়ি-ওয়ালারা তাকে তাড়াবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছে। ভাড়া নামিয়েছে পাঁচ আনায়। বাধ্য হয়ে নরসিং ভাড়া করেছে ছ আনা। রাস্তায় চলবে এমনভাবে যে, কোনরকমে যেন ঘোড়ার গাড়ির সারি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় না থাকে। ঝগড়া একটা বাধাবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পরশু রামাকে বাজারের পথে একা পেয়ে গালাগাল করেছে, মারতেও এসে-ছিল। কোনরকমে সেদিনটা রক্ষা হয়েছে।

—পাঁচমতি-শ্যামনগর, পাঁচমতি-শ্যামনগর। মোটর টেক্সি। ছ আনা—ছ আনা। হি-হি করে হাসতে হাসতে রামা এল দুজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

—ছাড়ুন মশায় ছাড়ুন। এই তো পাঁচজন হয়ে গিয়েছে।

—এই তো বিপদ এদের গাড়িতে চাপার। না আছে ছাড়বার ধরা-বাঁধা সময়, না আছে কজন প্যাসেঞ্জার নেবে তার কোন আইন। গরু-ছাগলের মত ঠেসে ভরে দিলে—সে তোমরা মর আর বাঁচ, ওদের পয়সা হলেই হল!

নিতাই এল। রামা হি-হি করে হেসে বললে—শুধু হাতে এলি? হি-হি-হি। আমি আজ—

—হ্যাঁ···হ্যাঁ! তোরই জিত—। হ্যাণ্ডেল মার্।

নিতাই বললে—আপনার পাশের সীট খালি রাখেন। নেস্‌পেক্টারবাবু যাবেন।

—ভেতরে জায়গা কোথায় হে বাপু? তিনজন তো বসেছি।

নরসিং আবার রূঢ় দৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চেয়ে বললে—চারজনের সীট ওটা—চারজন বসবে ভেতরে।

—কক্ষনও না। তিনজনের সীট।

—আজ্ঞে না। চারজনের।

—চারজনের সীট কিসে তোমার লেখা আছে দেখি? কোন্ আইনে আছে?

মাথা গরম হয়ে উঠল নরসিংয়ের। এক-একজন আইন-জানা লোক আছে, প্রতি কথাতেই তারা আইন দেখায়। নরসিংয়ের ইচ্ছা হল লোকটাকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে এই সার্ভিস চালু হওয়ার মুখে বদনাম হবে। একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে নরসিং বললে—আজ্ঞে বাবু, এই তো একটুখানি পথ—সাত মাইল। আধঘণ্টার মধ্যে চলে

যাবে। একটু কষ্ট না করলে উপায় কি? সবারই তো যাওয়া চাই। তা ছাড়া পুলিস ইন্সপেক্টার যাবেন—কি করব আমরা? ভাড়া যা পাব সে তো জানেনই। কিন্তু সীট না রেখে তো আমাদের উপায় নাই।

তবু লোকটা গজগজ করে।—হলেই বা পুলিস ইন্সপেক্টার। আইন মেনে চলতে হবে তো তাঁকে? না, পুলিস বলে সাতখুন মাপ তাঁর? না, মানুষের মাথায় পা দিয়ে যাবেন!

একটা লোক ক্রমাগত তার পুঁটলি নিয়ে ব্যস্ত। সামনে বনেটের পাশে একটা মোট রাখা হয়েছে—বার বার সে উঁকি মেরে দেখছে আর প্রশ্ন করছে—ওটা পড়ে যাবে না তো?

—না—না। ঠিক আছে।

একটু সোজা করে দাও দেখি ভাই। একটু টিপে খাঁজে বসিয়ে দাও। ও মশাই—পোঁটলাটায় পা দেবেন না। আঃ ছি-ছি-ছি। এই দেখ দেখি কি করে দিলে মোটটাকে—মুখের বাঁধনটা আলগা হয়ে গেল যে!

নিতাই বললে—ও মশাই, বকের মত গলা বাড়াবেন না। মোট আপনার ঠিক আছে।

—বসুন মশাই, বসুন ঠিক হয়ে। গাড়িতে যাওয়া-আসারও কতকগুলো নিয়ম আছে। সেগুলোও আইন। বসুন।

গাড়ি ছাড়ল নরসিং।

থানার সামনে থামল। ইন্সপেক্টারবাবু উঠবেন।

নিতাই বললে—চা খাবেন? পাশেই চায়ের দোকান

—থাক্, পাঁচমতিতে দাসজীর ওখানে খাব।

দাসজী, সেই সুরেশ দাস। চায়ের স্টলওয়ালা বৈষ্ণব। সে বলেছিল—তুম বি মিলিটারী হাম্ বি মিলিটারী।

—পাঁচমতি-শ্যামনগর। পাঁচমতি-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস। ছ আনা ভাড়া।

বারো

সুরেশ দাসের চা-খাবারের দোকান পাঁচমতিতে নরসিংয়ের আস্তানা। সুরেশ দাসের সঙ্গে নরসিংয়ের দোস্তিটা জমে উঠেছে। দাসকে বড় ভাল লেগেছে। দিলখোলা লোক, মিলিটারী মেজাজ। চড়া কথা, কড়া মেজাজ, রাঙা চোখ—এ তিনটের একটাও তার সহ্য হয় না। লাঠি দেখালে সে ডাণ্ডা দেখায়, লোহার বড় উনোনের ধারেই সেটা পড়ে থাকে; মধ্যে মধ্যে সেটা দিয়ে উনোনে খোঁচা দিয়ে আগুনের আঁচ তাজা এবং তেজালো করে তোলে সুরেশ। কিন্তু ভাল কথা মিষ্টি কথা বললে সে খুশী; প্রাণ খুলে হা-হা করে হাসে তখন। তুমি ভাল তো সুরেশ দাস মাটির মানুষ; তার উপরে দোস্তি হলে আর কথাই নাই, দোস্তের গোলাম সে।

মোটরের হর্ন পেলেই দাস দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে চেঁচায়, আ গিয়া—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল—বোম্বাই মেল—তুফান মেল! আ গিয়া।

লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে আগুনের আঁচ জোরালো করে দিয়ে জল গরমের পাত্রটার ঢাকনি খুলে জলের অবস্থাটা একবার দেখে নেয়, তারপর আরও খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়; অনেকক্ষণ ধরে যে জল ফুটছে সে জলে চা ভাল হয় না, তাই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে নতুন করে ফুটিয়ে নেয়। টেবিলের উপর সারবন্দী কাপ সাজিয়ে ফেলে চিনি পরিবেশন করতে থাকে। ছোট ভাই ভবেশকে বলে—কেটলিতে গরম জল ঢাল। সিগারেটের টিনে একটা বাখারি লাগানো হাতা ডুবিয়ে ফুটন্ত কেটলিতে ঢালে ভবেশ। সুরেশ হাঁকে—আ গিয়া পাঞ্জাব মেল! গরম চা। চা-গ্রম! সিঙাড়া নিমকি—টাটকা তাজা ভাজা—দেশী চপ্ কাটলেট!

নরসিংয়ের গাড়ি এসে ব্রেক কষে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। খুব একরাশ ধোঁয়া বার করে দিয়ে এক চোট গর্জন করে ইঞ্জিনটা থেমে যায়। প্যাসেঞ্জাররা নামে। অনেকে চা খাবার খায়, নরসিং নিতাই রাম এরা বসে দোকানের এক পাশে একটা স্বতন্ত্রভাবে ঘেরা জায়গায়, সুরেশ ওটা তৈরী করিয়েছে দোস্তদের জন্ম। ওইখানে আড্ডা পড়ে নরসিংদের। আড্ডা চলে ট্রিপের ফাঁকে ফাঁকে। শ্যামনগর থেকে ভোর ছটায় ছাড়ে—সাত মাইল পথ আসতে লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট, পঁচিশ মিনিট পাঁচমতিতে থেকে সাতটায় ছাড়ে পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর।' ফের আটটায় শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি সেকেণ্ড টিপ। এ দফায় তিন কোয়ার্টার আড্ডা দেবার সময়। পাঁচমতি থেকে সোয়া নটায় ছাড়তে হয়; দশটা থেকে সাড়ে দশটায় যাদের আপিস তারা যায় ওই টিপে। ওই ট্রিপে ভিড় বেশী। দশজন পর্যন্ত চাপায় নরসিং। আরও বেশী চাপাবার উপায় থাকলে আরও বেশী প্যাসেঞ্জার হতে পারে এই ট্রিপে। পান চিবুতে চিবুতে আদালত, ট্রেজারি, মিউনিসিপ্যালিটির কেরানীবাবুরা হন্তদন্ত হয়ে আসে। জন দুয়েক ইস্কুল-মাস্টার আছে। সবসুদ্ধ জন বিশেক ডেলী প্যাসেঞ্জার। বিশজনের মধ্যে আটজন পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে নরসিংয়ের সঙ্গে। বাকী বারোজনের মধ্যে অধিকাংশই যায় ঘোড়ার গাড়িতে। যাওয়া আসায় দৈনিক এক আনা করে দু আনা—তিরিশ দিনের চারটে রবিবার এবং ছুটি-ছাটা নিয়ে আর দু দিন, এই ছদিন বাদ দিয়ে চব্বিশ দিনের চব্বিশ দু আনা—আটচল্লিশ আনা—তিন টাকা, তাদের কাছে অনেক; আরো চব্বিশ বারো আনা আঠারো টাকা একসঙ্গে নরসিংকে দেওয়া তাদের সামর্থ্যে কুলায় না। এই বারোজনের মধ্যে যাদের যেদিন ভাত হয়ে ওঠে না, কি কোন জরুরী কাজে আটকে যায়—তারাই সেদিন অগত্যা নরসিংয়ের গাড়িতে যায়। পিছনের তিনজনের সীটে চারজন বসে—সামনে তার নিজের পাশে বসায় দুজনকে, দুটো ছোট মোড়া পেতে দেয় পিছনের সীটের সামনে, তাতে দুজন বসে; এতেই তার বাঁধা খদ্দের আটজন বসতে পায়। বাকী দুজন বা একজন যারা আসে তাদের বসিয়ে দেয় সামনে মাড-গার্ডের উপরে। বসতে আপত্তি করলে নেমে যেতে হবে। নরসিং কি করবে? বাঁধা বারো মাসের ডেলী-খদ্দেরদের বাদ দিয়ে ছুটো প্যাসেঞ্জারকে বসতে দিতে পারে না। এই ট্রিপে গাড়ি চলে ভর্তি মালঠাসা মহাজনী নৌকার মত। সাত মাইল যেতে পঞ্চাশ মিনিটে লেগে যায়। খানাখন্দ দূরে থাক ছোটখাটো গচকায় গাড়ি পড়লে খটাং শব্দ করে স্প্রিংয়ের উপরের

পাটীখানা নীচের পাটাতে ঠেকে যায়। স্পীড বেশী দিলে স্প্রিং খতম হয়ে যাবে। সাত মাইলের মধ্যে চার মাইল রাস্তার অবস্থা প্রায় মাঠের রাস্তার মত—এই চার মাইল সে চলে ঘণ্টায় আট মাইল স্পীডে, জায়গায় জায়গায় পাঁচ মাইলে কমাতে হয়; বাকী তিন মাইল শ্যামনগরের মুখটায় রাস্তাটা ভাল, এখানে সে দশ মাইল দমে গাড়ি ছাড়ে, মধ্যে মধ্যে পনের মাইলেও ওঠে। শ্যামনগরে ঢুকেই সেই তেমাথাটা, যেখানে বসে সে প্রথম দিন গাড়ি আর পায়ে-হাঁটা যাত্রী গুনেছিল—সেইখানে গাড়ি থামিয়ে প্রথমেই নামিয়ে দেয় ছুটো প্যাসেঞ্জার—যাদের বসতে হয় মাডগার্ডের উপর, তাদের। খানিকটা এগিয়েই নেমে যায় ইস্কুলের মাস্টারবাবু দুজন। ব্যস—তার পর আবার কি? আর ধরে কে? থানা কোর্টের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে নরসিং। এতেও অবশ্য সিপাইদের মাস মাস কিছু কিছু দিতে হবে। একটা কথা আছে—"ভাল করতে নাই পারি মন্দ করতে তো পারি, এখন কি দিবি তা বল্?" আইন মেনে চললেও কিছু না পেলে ছুতোনাতা করে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে ফেলবে। কিছু না পারলে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় পাঁচ আইন আছে। আর পাঁচ আইনের মামলায় সাক্ষী-সাবুদ প্রমাণ প্রয়োগ এসব কিছু নাই, আছে জরিমানা। দাঁড়ানো মাত্র জরিমানা দু-টাকা, প্রতিবাদ করে 'অপরাধই করি নাই' বললে জরিমানা তিন টাকা হয়ে যায়, আবারও কিছু বলতে গেলে তিন টাকা পাঁচ টাকায় লাফিয়ে ওঠে। তার চেয়ে মা-শেতলা, ওলাইচণ্ডী বাবা-ব্রহ্মদৈত্যের মত প্রণাম করে পূজো দেওয়াই ভাল। ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা গাড়ি পিছু চার পয়সা দেয়, সকালে সর্বাগ্রে চৌমাথায় সিপাহীজীকে দিয়ে তবে গাড়ি ছাড়ে। সে দেয় চার আনা হিসাবে। পাঁচমতিতে দিতে হয় দু-আনা। এই সাড়ে নটার ট্রিপটি ছাড়বার ঠিক আগেই একজন ওদের আসবেই। সুরেশ দাসের দোকানে বসবে।—"চা হৈল ভাই সুরেশ? দেখি একঠো বিড়ি।"

বিড়ি ধরিয়ে দোকানের সামনে বেঞ্চিটাতে চেপে বসবে। নরসিংকে আপ্যায়িত করবে—"কেয়া ভাই সিংজী, কেমন আছেন মোশা?' তার পরই বলবে, "মরসুম তো সিংজীর। আরে বাপ রে! বাদুড়কে মাফিক পেসিঞ্জার ঝুলকে ঝুলকে যাচ্ছে রে বাবা!" তার পর একদফা অট্টহাসি। হাসি থামিয়ে বলবে, "তা বেশ, বহুত ভালা, আপকে উন্নতিমে হামিলোক খুশী আছি।"

সুরেশ চায়ের কাপটি হাতে দিয়ে বলে, লেন।

—দুঠো নিমকি তো দেও রে ভাই।

সুরেশ নিমকি দিয়ে আর একটি বিড়ি বার করে পাশে নামিয়ে দেয়। তার পর দেয় দুটি সুপারিকুচি। এবং চোখ টিপে নরসিংকে ইশারায় বলে, ফেলে দেন দু-আনি একটা। নরসিংয়ের কাছে বিদায়ী নিয়ে সুপারি চিবিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নরসিং এবং সুরেশের কিছু হিতসাধন করে আস্তে আস্তে খসে পড়ে। তবে মধ্যে মধ্যে উপকার পায় নরসিং। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি কি ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পি'র এ রাস্তায় যাবার কথা থাকলে সেটা তারা জানিয়ে দেয়। শ্যামনগর চৌমাথাতেই বলে দেয়, আজ থোড়া হুঁশিয়ারিসে যাবেন ভাইয়া, পুলিস-সাব বায়েগা পাঁচমতি।

পাঁচমত্তিতে বলে, এ ভাই, নরসিং দাদা, ডি-এস-পি কো আনে কা বাত হ্যায়।

নরসিং সেদিন আর মাডগার্ডের উপর কাউকে বসায় না। ভিতরের আট জনের মধ্যেও জন দুইকে কোনরকমে ফাঁকি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়; ছ'জন এসে জুটবামাত্র নিতাইকে বলে, মার হ্যাণ্ডেল। রামুকে রেখে যায় সুরেশের দোকানে।

নিতাই অর্থপূর্ণ স্বরে ডাকলে, সিংজী!

নরসিং উত্তর দিলে, হুঁ। অর্থাৎ সে দেখেছে এবং ঠিক আছে।

ঘোড়ার গাড়িগুলো সামনে চলছে পাঁচমতি থেকে শ্যামনগর। চারখানা গাড়ির একখানা আছে আগে তার পর পাশাপাশি দুখানা, তাদের পিছনে একখানা। বেশ বন্দোবস্ত করে সাজিয়ে রাস্তা বন্ধ করে চলেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে অতিক্রম করে যাবার উপায় নাই। হর্ন দিলেও সরবে না। অর্থাৎ ঝগড়া করবার মতলব। অবশ্য নরসিং ইচ্ছা করলে পিছনের গাড়িখানাকে ডাইনে রেখে ওদের মেরে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভয় হয় মাডগার্ডে যারা বসে আছে তাদের জন্ম। নিতাই রাম হলে 'কুছপরোয়া নেহি' বলে সে হাঁকিয়ে দিত গাড়ি। কিন্তু এ সব হচ্ছে বচনবাগীশ 'ডরফোক্‌নার' দল। মুখে লম্বা লম্বা বাৎ, রাজা উজীর খতম করে দেয়, কিন্তু গাড়িটা একটু টলুক, কাত হোক—ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকবে, এ ওকে আঁকড়ে ধরবে আর চীৎকার করে উঠবে মেয়েছেলের মত।

মন্থর গতিতেই গাড়ি চলছে। পুরনো গাড়ি, স্পীডোমিটার অনেকদিন আগে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বারকয়েক মেরামত করিয়েছিল—তার পর সে একবারেই জবাব দিয়েছে, এখন কাঁটাটা নড়েও না চড়েও না, পাঁচ মাইলের দাগের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে; গাড়িখানা খুব জোর ঝাঁকি খেলেও নড়ে না—একটু-আধটু কাঁপে। নরসিং কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে বলে—উয়ো শারোয়া মর্‌গিহিস। খুব রাগ হলে একসময় ওটার উপর স্টার্টিং হ্যাণ্ডেলটা মেরে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা হয় নরসিংয়ের। কিন্তু গাড়িখানার শোভা বাড়িয়ে রেখেছে বলে ভাঙে না। যাক সে কথা। স্পীডোমিটার খারাপ হয়ে গেলেও নরসিং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে গাড়ি কত মাইল জোরে চলেছে। ছ-সাত মাইল। এর চেয়ে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ মাইলে নামালেও উপায় হবে না। ছ্যাকড়া গাড়ির পক্ষীরাজেরা তার চেয়েও কম জোরে চলেছে। ওদের আর দোষ কি? আকারে রামছাগলের চেয়ে একটু বড়, খেতে না পেয়ে এবং খাওয়ার অভাবে অষ্টপঞ্জর ঝরঝর করছে, নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখের কোণে পিচুটি জমেছে; লোহা এবং কাঠ দিয়ে গড়া ওই গাড়ি, তার উপর পাঁচ থেকে সাত জন সোওয়ারীর ওজন টানবার ওদের ক্ষমতা কোথায়? টানে চাবুকের চোটে—জান দিয়ে কলিজা ফাটিয়ে টানে, দাঁড়াতে পেলেই হাঁপায়। কতকগুলোর পিঠে গাড়ির সাজের ঘর্ষণ লেগে ছাল চামড়া উঠে দগদগে ঘা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে মায়া হয় নরসিংয়ের। মনে হয় ওই কোচম্যানগুলোকে ধরে ওই চাবুক কেড়ে নিয়ে চাবকায়। আবার কখনও কখনও দয়াও হয়। মনে হয় সে মোটর নিয়ে আসাতেই ওদের মন্দ দশা আরও মন্দ হয়ে গিয়েছে। কোচম্যানদের রুটি, ঘোড়াগুলোর দানাপানিতে সে-ই ভাগ বসানোর জন্তই ওদের ওই দশা। এর

আগে বোধ হয় আরও একটু গায়ে-গতরে ছিল ঘোড়াগুলো। কিন্তু সে কি করবে? এই তো তুনিয়ার ধারা-ধরন! একজন ওঠে একজন পড়ে। মানুষের মত এই সব ব্যাপারেও ঠিক ওই এক ধারা-ধরন। কেরোসিন এসে রেড়ির তেলকে ওঠালে। লণ্ঠন এসে ডিবিয়াকে ওঠালে। তুম্‌ড়ে ভাঁজার চাকু ছুরির আমদানি হল, কামারে ছুরির দিন গেল। ক্ষুরের মাথা খেতে বসেছে, বাজারে 'বেলেড' ক্ষুর এসেছে। গাঙের বুকে নৌকার রেওয়াজ উঠতে বসেছে ইস্টিমারের ধাক্কায়। তামাকের ব্যবসাতে মন্দা পড়েছে, সিগারেট চলছে মুখে মুখে। কলকাতাতে ট্রামগাড়ি ঘোড়ার গাড়ির মাথা খেয়েছিল, সেই ট্রামগাড়ি কায়দা হয়ে গেল—দোতলা বাসের রেওয়াজে। শ্যামনগর পাঁচমতিতে এসেছে মোটর নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ি নাজেহাল হবেই; সে না এলে আর কেউ আসত। সে হয়তো তু-দিন আগে এসেছে, অন্য লোক আসত তু-দিন পরে। তফাত এইটুকু।

ঘন ঘন বারকয়েক হর্ন দিয়ে নরসিং মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে পথ দেবে, না দেবে না? মতলব কি?

উত্তর দিল না ওরা। কষের দাঁতে জিব ঠেকিয়ে ক্যা-ক্যা শব্দ করে মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে শব্দ করতে লাগল।

এদের সঙ্গে লড়াই একদিন দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। নিতাই পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনেই গাল দিতে শুরু করেছে। নরসিং ছত্রীর ছেলে। লড়াই দিতে পিছপাও নয়। কিন্তু সে তাকালে গাড়ি-ভর্তি প্যাসেঞ্জারদের দিকে। কেরানীবাবু আর ইস্কুল-মাস্টার সব। বিপদ এদের নিয়ে। একটা কিছু হলে ওরা গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে শুরু করবে। তার পর ওরাই দেবে তার ব্যবসার গায়ে জল। ইতিমধ্যে ওরা অধীর হয়ে উঠেছে। হাতের বিড়ি সব নিবে গিয়েছে, ধরেই আছে; উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে—উঃ আঃ করছে। নরসিং আবার হাঁকলে—এই ঘোড়ার গাড়ি!

ঘোড়ার গাড়ির একজন কোচওয়ান বললে—রাস্তা তো কারুর বাবার নয়, এস না তুমি পিছু পিছু।

নিতাইয়ের আর সহ্য হল না, সে লাফিয়ে নেমে এগিয়ে গিয়ে বললে—মোটরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি যেতে পারে না। তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে।

একজন—এ সেই সোভান, সোভান আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে, তার পর বললে সকলের পিছনের গাড়িওয়ালাকে—এ কাদির, দে না বে চাবুকটা হাঁকড়ে শালার মুয়ে।

নিতাই ক্ষেপে উঠল। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের সকলেও গরম হয়ে উঠেছে। একজন বললে—আজই গিয়ে একটা দরখাস্ত করতে হবে। এ তো ওরা অত্যাচার আরম্ভ করেছে!

একজন মুখ বাড়িয়ে বললে—কি হে, তোমাদের গাড়ি তোমরা এক পাশ করবে কিনা?

সোভান হেসে দাঁত বার করে কাদিরকে বললে—আবে কাদির, শালা চুনো-পুঁটিরা কি বলছে রে?

কাদির জবাব দিলে—বেইমান হারামী সব আজ মোটর পেয়েছে। শা-লা—মোটর—শালা—!

নিতাই এগিয়ে চলল ঘোড়ার মুখের কাছে—গিয়ে লাগাম ধরে টেনে এক পাশে সরিয়ে দেবে জোর করে। নরসিং হঠাৎ ডাকলে—নিতাই!

নিতাই জবাব দিলে—থামুন, আমি দিচ্ছি ঠিক করে।

—ফিরে আয়।

—ফিরে যাব? নিতাই বিস্মিত হয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। নরসিং স্টীয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাচ্ছে বাঁ পাশে। বাঁ পাশের ঢালটা বেশ চওড়া। বেশ ক্রমে ক্রমে ঢালু হয়ে পাশের মাঠের সঙ্গে মিশেছে। নরসিং সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে ডাকলে—নিতাই!

নিতাইয়ের মন বিদ্রোহী হলেও উপায় নাই। গাড়ি নামবে ঢালের মুখে, সিংজীর বাঁ পাশে দু-জন লোক বসেছে। মাডগার্ডে লোক বসেছে, বাঁ পাশটায় সিংজীর নজর পুরে চলবে না। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে তাকে ওপাশটা দেখতে হবে, বলতে হবে সিংজীকে—'ঠিক আছে। চলুক, চলুক। হুঁশিয়ার গচকা আছে, হুঁশিয়ার। আচ্ছা—ঠিক হ্যায়।'

গাড়ি নামল ঢালের মুখে।

—ও বাবা, মাঠে নামছে কোথা হে? আরে ওহে—ওই, কি বিপদ; এই এই! ওহে! মাডগার্ডের একজন চীৎকার করে উঠল।

—চুপ করুন, ঠিক আছে। ভয় নেই।

সোভান চেঁচাচ্ছে—চল—চল জলদি। সপাসপ চাবকাচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। ওরা বুঝতে পেরেছে নরসিং মাঠে নেমে মাঠের উপর উঠবে। ঘোড়াকে প্রাণপণে মারছে ওরা।

গ্রীষ্মকালে শস্যশূন্য ক্ষেত, সমতল মাঠে মাটি কঠিন হয়ে আছে। নরসিংয়ের গাড়ির চাপে মাটির উপরের স্তরটা শুধু মুড় মুড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ছুটেছে—অন্তত পনের মাইল বেগে ছুটছে। সড়কের চেয়ে মাঠ অনেক ভাল।

গতির প্রতিযোগিতার একটা কৌতুক লেগেছে প্যাসেঞ্জারদের মনে। সকলেই চেষ্টা করছে দেখতে—ডান দিকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ পিছনে পিছিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে ওরা ঘোড়াগুলোকে ঠেঙাচ্ছে। নরসিংও দেখে একটু হেসে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোজা গাড়ির সামনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে—হবে একদিন ওদের সঙ্গে।

আজই না-হওয়ার জন্য নিতাই একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে বললে—আপনি ভয় পেয়ে গেলেন, নইলে আজই হয়ে যেত একটা হেস্তনেস্ত।

—ভয়? নরসিং রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ়স্বরে বললে—ভয়?

—নইলে—আজই তো—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের কথা আমাকে আগে ভাবতে হবে। ওঁদের আপিস আছে, আদালত আছে, ইস্কুল আছে। ওঁদের টাইম মাফিক পৌঁছে দিতে হবে আমাকে।

তা ছাড়া মারামারি হলে ওঁদের কারও কিছু হলে তখন কি হবে ?

—ঠিক কথা।

—হাজার হলেও তুই হলি হোঁতকা। বুঝলি ? ঝগড়া ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের সঙ্গে আমাদের। ওঁদের কিছু নয়। সে ঝগড়া মারামারি করব আমরা। একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে—হবে সে ঝগড়া, আলবৎ হবে, দেখবি সেদিন।

লজ্জিত নিতাই পিছনের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের দেখছিল, আর চেঁচিয়ে ডাকছিল—আও—আও—জলদি আও। নিজের খুশীকে সে ঠিক যেন ব্যক্ত করতে পারছিল না। তাই হিন্দী বন্ধ করে—তার মাতৃভাষায় প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলে—আয় রে—শালারা আয়। তারপর সে দেখাতে আরম্ভ করলে বুড়ো আঙুল। তারপর সে আবার চীৎকার করে উঠল—পাঁচমতি-শ্যামনগর, শ্যামনগর-পাঁচমতি মোটর সার্বিস।

অকস্মাৎ সে চীৎকার করে উঠল,—গেল রে—মল রে—গেল রে। আ—শালা!

নরসিং সন্ত্রস্ত সতর্ক হয়ে উঠল, গাড়ির ব্রেক কষতে আরম্ভ করলে। প্যাসেঞ্জারেরা কেঁপে উঠল। বুক তাদের ঢিপ-ঢিপ করছে।

—ছোট্ শালারা, ছোট্। রাস্তা বন্ধ করে ছুটবে। শা—লা!

কোন বিপদ তাদের সামনে আসে নাই। বিপদ ঘটেছে ঘোড়ার গাড়িগুলোর। পাশাপাশি গাড়িগুলো ছুটছিল প্রাণপণ গতিতে। হঠাৎ দুটো গাড়ির চাকায় চাকা বেধে গিয়ে বিপদ ঘটেছে। একখানার চাকা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আর একখানার গায়ে হেলে পড়ে কোনরকমে মারাত্মক বিপদ থেকে বেঁচেছে।

নরসিং একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তারপর সে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি নিজের গাড়ির সামনে নিবদ্ধ করে স্টীয়ারিং ঘোরাতে আরম্ভ করলে। এইবার মাঠ ছেড়ে আবার সে সড়কে উঠবে।

সড়কে উঠে সে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে বললে—পরের মন্দ, বুঝলেন কিনা, এ যে করতে যাবে, বিপদ তারই হবে। আপন ধর্মে যে থাকবে, ভগবান তাকে রক্ষা করবেনই।

রাস্তার উপর উঠল গাড়ি। খোলা রাস্তা। সামনে আর ঘোড়ার গাড়ি নাই। নিতাই বললে, লেন—লাইন কিলিয়ার।

মাইল দেড়েক অতিক্রম করেই শ্যামনগরের তিন মাইল ভাল রাস্তা। নরসিং গাড়িতে স্পীড দেবার আগে মাঠের দিকে তাকিয়ে আর একবার দেখে নিলে। গ্রীষ্মের ধূলিসমাচ্ছন্ন কাঁচা সড়ক, ধুলোর রাশি উড়িয়ে চলল গাড়ি। পাঁচমতি-শ্যামনগর মোটর সার্ভিস।

আজ কিন্তু পঞ্চাশ মিনিট লাগে নাই। লেগেছে সাতচল্লিশ মিনিট। তিন মিনিট আগে এসে পৌঁছে গিয়েছে। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলল—হাই ইস্কুল পোস্টাপিস হয়ে মোড় ফিরে কোর্টের সামনে দিয়ে এক্সাইজ আপিসের সামনে আবার মোড় ফিরে বাজারের মধ্যে মোটর-পার্টসের দোকানের কাছে।

পাঁচমতির প্যাসেঞ্জারেরা আজকাল ওই দোকানের সামনেই অপেক্ষা করে। সকালের দিকে প্যাসেঞ্জার খুব বেশী হয় না। রাত্রে যারা গঙ্গার ঘাট ইস্টিশানে ট্রেনে নেমে ওদিকের মোটর সার্ভিসে শ্যামনগর আসে তারা এক দফা যায় প্রথম ট্রিপে। তারপর দুটো ট্রিপ—একটা আটটায়, শেষটা সাড়ে দশটায়। এ দুটো ট্রিপে লোকজন বেশী হয় না। কোন ট্রিপে তিন, কোনটায় চার। বিকেলবেলা থেকে পাঁচমতি যাবার লোক বেশী। সকালে যারা এল তারাই ফেরে। সাড়ে তিনটে থেকে ট্রিপ শুরু; সাড়ে তিনটেয় ছেড়ে চারটে পাঁচ বা দশ মিনিটে পাঁচমতি; সাড়ে চারটেয় পাঁচমতির তিন-চারজন নিয়ে শ্যামনগর পাঁচটায়। এবার পাঁচটা পনের মিনিটে বোঝাই গাড়ি নিয়ে পাঁচমতি। সকালের সেকেণ্ড ট্রিপে কেরানীবাবুরা আসে, তারাই ফিরবে। একেবারে হাঁ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চেপেই বলে—চল—চল। কিন্তু তবু সকালের সেকেণ্ড ট্রিপের মত ভিড় হয় না। মাডগার্ডে কেউ বসে না। ভেতরেই বসে আটজন। সকালে যাদের কোনরকমে দেরি হয়ে যায় অথচ আপিসে ঠিক সময়ে পৌছুতেই হবে, তারাই দায়ে পড়ে মাডগার্ডে বসে। বিকেলে আপিসের তাড়া নাই; আপিসের সায়েব নাই বাড়িতে; কাজেই তারা ঘোড়ার গাড়িতে এক আনা পয়সা বাঁচিয়ে একটু আরাম না হোক আয়িরী করে বাড়ি ফেরে।

গাড়িখানা এসে দাঁড়াল মোটর পার্টসের দোকানের সামনে। নিতাই রেডিয়েটারের ঢাকনিটা খুলে দিলে। এক ঝলক টগবগে ফুটন্ত জল উছলে পড়ল, ধোঁয়া বার হচ্ছে। ভিতর থেকে মগ বার করে ঠাণ্ডা জল ভরে দিলে। গরমের দিন, ইঞ্জিন তেতে উঠেছে, একটু হাওয়া লাগার প্রয়োজন।

রামেশ্বর আর তারক বসে আছে তেল-কালি মেখে। সেলাম করে রামেশ্বর বললে—কি সিংজী কেমন?

হাসলে নরসিং, সেও সেলাম করে বললে—ভাল। আপনি ভাল? এলেন কখন?

রামেশ্বর এবং তারককে বদলি করেছে মোটর সার্ভিসের মালিক। তাদের সদর শহরে নিয়ে গিয়েছে, সেখানকার মেরামতি কারবারে কাজ দিয়েছে। এখানকার পাদরীসাহেব চিঠি লিখেছিল। সেই মেরী নীলিমার ব্যাপার। কোম্পানি ওদের বদলি তো করেইছে উপরন্তু শাসিয়েও দিয়েছে।

মেরী নীলিমা আশ্চর্য মেয়ে! চোখ রাস্তার উপর রেখে সেই যে বাড়ি থেকে বার হয়—ইস্কুলে পৌছুবার আগে চোখ তোলে না।

সাড়ে দশটা বাজে। এখন এখানে মর্নিং ইস্কুল চলেছে। এইবার সে ফিরবে। পাঁচমতি ট্রিপ নিয়ে যাবার পথে রোজ দেখা হয় তার সঙ্গে। এই ট্রিপে যাবার সময় নরসিং ইচ্ছা করেই একটা রাস্তা ঘুরে যায়। ব্যাপারটা নিতাই বুঝেছে। সে হেসে বলে—সিংজীর এই 'টিরিপে' 'দিগভম' হয়!

নরসিং কিছু জবাব দেয় না। গোপনে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। নীলিমা দাস বড় ভাল মেয়ে। তাকে তার ভাল লাগে। তার বেশী কিছু নয়। জোসেফ মোটর-ড্রাইভার,

কিন্তু নীলিমা পাস করে ইস্কুলে মাস্টারি করে। নসিবের খেয়াল। গির্‌বরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে সে, আর গির্‌বরজার হাড়ী, যাদের—। যাক, দুনিয়ার হাল-চাল! আপসোস করে লাভ নাই। নসিবের খেয়ালে আজ সে মোটর-ড্রাইভার। তার ওই ফটকিই ভাল।

ফটকিও আজ কদিন আসে নাই। সাহুজী গুখনরাম কিছু আঁচ পেয়েছে বোধ হয়। কাঠেঘেরা বারান্দায় যে জানালাগুলো ছিল তাতে আজকাল সন্ধ্যার সময়েই মজবুত তালা চাবি বন্ধ হচ্ছে। সাহু একদিন বলেছিল হাসতে হাসতে—আওরতকে কভি বিশোয়াস করবেন নাই সিংজী।

আরও খবর পেয়েছে, একদিন নাকি ফটকিকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে নরসিং একটু সরে এসে নির্জনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। এখান থেকে নীলিমা দাসের আসবার পথটা দেখা যায়।

হর্ন দিচ্ছে নিতাই। নিজের পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলে নরসিং। পকেটে একটা মোটা ওয়াচ রাখে সে। মেজবাবু দিয়েছিলেন। সাড়ে দশটা বাজে। নরসিং সেখান থেকে এসে দাঁড়াল গাড়ির পাশে। তিনজন প্যাসেঞ্জার এ ট্রিপে গাড়িতে চেপে বসল। নিতাই হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলে।

—পাঁচমতি! পাঁচমতি! পাঁচমতি! লাস্ট টিরিপ, লাস্ট টিরিপ!

গাড়ি চলল, ঘুরল নরসিংয়ের দিগ্‌ভ্রমের রাস্তায়। কই, কোথায় আজ মেরী নীলিমা দাস? দূর থেকে ছাতা দেখা যাচ্ছে না তো?

পথে একটা গরুর গাড়ির আড্ডা। এখান থেকে তিন মাইল দূরে এক জাগ্রত মা-কালীর স্থান। সেখানে যাত্রী যায় শনি-মঙ্গলবার। একটা হাটও সেখানে আছে—আলু-কলাইয়ের আড়ত আর গরুও বিক্রি হয়। গরুর গাড়ি এই পথে ভাড়া খাটে। শনি-মঙ্গলবার মা-কালীর যাত্রী নিয়ে যায়। সোম-শুক্রবারে হাট।

আজ এখানে ভুপা মাহাতো আর সখিরাম কাহার তাদের ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসে জুটেছে দেখা যাচ্ছে। গরুর গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে যাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। এখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য না দাঁড়িয়ে নরসিং পারলে না। ভুপা আর সখিরাম এসেছে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের রুটি মারতে। চলবে—তা চলবে। যাত্রীরা ঘোড়ার গাড়ি পেলে গরুর গাড়িতে যাবে কেন?

—পাঁচমতি! পাঁচমতি! পাঁচমতি! লাস্ট টিরিপ! গাড়ি শ্যামনগরের মিশন গার্লস স্কুলের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এসে পড়ল ইতে-মাথায়। গার্লস স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেরী নীলিমা। শহর পার হয়ে মাঠের মধ্যে এসে নরসিং বললে—রবিবার দিনে মনে করে রাখবি নিতাই, একখানা টামনা নিতে হবে সঙ্গে।

•

রবিবার এ লাইনেও ট্রিপ কম। ইমামবাজারের মত এখানেও রবিবারে আরাম করে নরসিং নিতাই রাম। ঘাটরোড-শ্যামনগর সার্ভিসের কোম্পানির কারবারেও রবিবার ছুটো

ট্রিপ কম। জোসেফের কিন্তু রবিবার ছুটি নাই। এস-ডি-ও সাহেব টুরে বার হন শুক্র-শনিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত। টুরে না বার হলে যান ঘাটরোড—একবার সদর শহর ঘুরে আসেন। যে সপ্তাহে টুরে যান না সেই সপ্তাহের রবিবারটা তার ছুটি।

এ রবিবার নরসিং সকালবেলার লাস্ট ট্রিপ মেরে নিতাইকে বললে—সাহুজীকে বলে রেখেছি দুখানা টামনা নিয়ে যাব। চাইলে দেবে।

টামনার প্রয়োজন সম্বন্ধে নিতাই কোন প্রশ্ন করলে না। সে কথা হয়ে গিয়েছে ওদের রাত্রির আলোচনার মধ্যে। শুকনো ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে নরসিং যে নতুন রাস্তাটা আবিষ্কার করেছে—ধান তোলার প্রয়োজনে গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে—সে রাস্তার জমির আলগুলো ছেঁটে সমান করে নেবে; কাজ খুব বেশী নয়, তিনজন ঘণ্টা কয়েক পরিশ্রম করলেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ মিনিট কমে এসে পঁয়তাল্লিশে নেমেছে এই কয়েক দিনের মধ্যে; কেটে ছেঁটে বেশ সমান করে নিলে চল্লিশ মিনিটে ট্রিপ এসে যাবে।

নিতাইয়ের সঙ্গে শুখনরামও বেরিয়ে এল। বললে—চলেন, আমাকে ওকিলবাবুর মোকামে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। দরকার আছে। নিজেই সে গাড়ির দরজা খুলে ভিতরের সীটে বসে পড়ল ধপ করে। গাড়িটা দুলে উঠল তার ভারী দেহের আকস্মিক পতনে। উপায় নাই। মহাজন। তার উপর তারই বাড়িতে রয়েছে। এ বেগারটুকু দিতেই হবে। সাহুজী সিগারেট বার করে বললে—খান।

হঠাৎ বললে—ওই কেরেস্তানটার বাড়িমে আপনি যান সিংজী?

নরসিং বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সাহুজীর দিকে চেয়ে আবার তখনই সামনে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

সাহু বললে—আরে রাম-রাম। কেরেস্তান উলোক! না—যাবেন না আউর। আরে ছি! এর পর সে অনর্গল অশ্লীল কথা প্রয়োগ করে যায় জোসেফ এবং মেরী নীলিমা সম্পর্কে। নরসিংকে উপদেশ দেয়—ওই কেরেস্তান মেয়েটির মোহে যেন কদাচ না পড়ে।

নরসিং চুপ করে গাড়ি চালিয়ে যায়, কোন উত্তর দেয় না। বিশেষ করে আজ এই রবিবার দিন—সাহুর কথাগুলো তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছে। রবিবার বিকেলবেলা জোসেফের বাড়িতে চমৎকার একটি চায়ের আসর বসে। রবিবার দিন জোসেফদের সাজ-পোশাকের ঘটাটা একটু বেশী। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনেও বেশ একটি পারিপাট্য থাকে। রীতিমত মাখন দিয়ে টোস্ট, বাড়ির তৈরী কেক, ডিম, তার সঙ্গে চা! বিকেলের আসরে জোসেফও প্রায় সাহেবের টুর সেরে ফিরে আসে; দু-এক রবিবার থাকে না। কিন্তু সে না থাকলেও ক্ষতি হয় না। নরসিং বেশ স্বচ্ছন্দেই যায়। মেরী নীলিমার সাহচর্য তার ভাল লাগে। সে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ভগবানকে যে, ভাগ্যিস জোসেফ মোটর ড্রাইভার হয়েছে নইলে নীলিমার মত মেয়ের সঙ্গে তো তার কথা বলবার সুযোগই জুটত না! আরও ভাবে—দুনিয়ার মালিকের মজার খেয়ালের কথা। জোসেফের ঠাকুরদার বাপ ছিল গিরবরজার হাড়ী। ছত্রীদের বাড়ির সবচেয়ে ছোট কাজ করত। কেন ক্রীশ্চান হয়েছিল সে কথাও খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে নরসিং।

তেরো

জোসেফ থেকে তিন পুরুষ আগে তার ঠাকুরদার বাপ অর্থাৎ প্রপিতামহ ক্রীশ্চান হয়েছিল। ক্রীশ্চান হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্ত। গিবুবরজার সিংদের উচ্ছিষ্ট একটি গোপকন্যা রোগজীর্ণ হয়ে অকাল-বার্ধক্যে কুৎসিত হয়ে পড়ায় রক্ষক সিংটি তাকে ত্যাগ করে পথে বার করে দিয়েছিল। একটা প্রবাদ আছে যে, পশুরাজ সিংহ কখনও রোগা জানোয়ার খায় না। গিবুবরজার সিংরা সে প্রবাদ মেনে চলত। শুধু গিবুবরজার সিংরাই নয়, যৌবন-বিলাসী পশুরাজ মাত্রেরই এই এক স্বভাব। এ পশুরাজেরা শুধু গুজরাট বা আফ্রিকায় বাস করে না, এ নরসিংরা পৃথিবীর সর্বত্রই বাস করেন। থাক্ সে কথা। ওই রোগজীর্ণ অকালবৃদ্ধা গোপকন্যাটিকে সিংমশাই পরিত্যাগ করার পর তাকে আশ্রয় দিয়েছিল জোসেফের প্রপিতামহ। সে ছিল ওই সিংমশায়টিরই অনুচর; পুরাকালের গল্পের সিংহ-ব্যাঘ্রের অনুচর শৃগাল বললে ঠিক হবে না, তবে সেনাপতি বনবরাহ বললে ভুল হবে না। সেও ছিল শক্তিশালী লাঠিয়াল, সুস্থ যৌবনধন্যা ওই মেয়েটির প্রতি তার একটা আকর্ষণ ছিল, প্রভুর ভয়ে দমিত আকর্ষণ; সেই আকর্ষণেই কঙ্কালসার মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে তার অতৃপ্ত, মালিকানা স্বত্বের কামনা পরিপূর্ণ করতে চেয়েছিল। নিছক মালিকানা স্বত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ উর্বর জমিতে বালি পড়ে মরুভূমি হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়—মেয়েটিরও তখন সেই অবস্থা। সিং তাতে তখন আপত্তিও করে নাই। ছেঁড়া জুতো পথে ফেলে দিলে যদি কেউ কুড়িয়ে নেয়—তাতে আপত্তি কেউ করে না, কিন্তু জোসেফের প্রপিতামহের অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। সে মেয়েটার সেবা আরম্ভ করলে। সেবা আর অন্য কিছু নয়—তাকে দিলে সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর আহার। আহার তাও আঙুর বেদানা ডালিম এসব নয়—সে তাকে খেতে দিলে তারা যা খায়, পাঁকাল মাছ, শামুক, গুগলি, ডাল, ভাত আর বাড়ির গরুর খাঁটি দুধ। মাস কয়েকের মধ্যেই মেয়েটার মাথায় চুল উঠে গেল, গাল দুটো হয়ে উঠল কাঁচা টমেটোর মত। ক্রমে মাথায় চুল গজাল, কাঁচা টমেটোর মত গাল দুটোয় যেন পাক ধরল। কপালের কালচে ভাবটা কেটে গেল, ফুটে উঠল তার সাবেকের রঙ। মেয়েটাকে নিয়ে জোসেফের প্রপিতামহ প্রায় পাগল হয়ে উঠল। মেয়েটাও, কৃতজ্ঞতাই হোক আর প্রেমই হোক, একটা কিছুর বশবর্তী হয়ে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে রক্ষাকর্তার কাছে। জাতি বিচার করলে না, রূপ বিচার করলে না, অবস্থা বিচার, কি অন্য কোন বিচারই করলে না। মেয়েটার নব কলেবরের কথা গিয়ে পুরাতন সিং মালিকের কানে পৌছল। সিং-জাতীয় পুরুষেরা চায় যৌবন, রূপ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করে না, দুষ্কুলোদ্ভবা স্ত্রীরত্ন স্পর্শ করতে কোন দ্বিধা তাদের নাই—পূর্ব মালিকও সিং—সেও এ বিচার করলে না। একেবারে সরাসরি গিয়ে সিং-মহাশয় জোসেফের প্রপিতামহের বাড়ির দরজায় কেশর ফুলিয়ে দাঁত বার করে থাবা গেড়ে বসল। জাতিগৌরবে বঞ্চিত জোসেফের প্রপিতামহ সাহসের অভাবে সিংপদবাচ্য ছিল না বটে, কিন্তু গোঁ এবং শক্তিতে সে কম ছিল না—এদিক দিয়ে বিচার করলে অনায়াসেই

তাকে ভীম বরাহ বা মহিষাসুর বলা যেতে পারত। দ্বন্দ্বযুদ্ধও বাধত, কিন্তু এই মেয়েটি তাকে সুবুদ্ধি দিলে। রাত্রির শেষ প্রহরে দুজনে উঠে গ্রাম ত্যাগ করলে। আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করেছিল অবশ্য জোসেফের প্রপিতামহ নিজেই। পাদরীরা তখন এঁ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তুলসী-মাহাত্ম্যের কদর্থ ব্যাখ্যা করে—উলঙ্গিনী কালীমূর্তির বর্বরতা ও অসভ্যতা লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কালাআদমীকে গোরা বানাচ্ছিল। সর্বদেশে সর্বকালে সমাজে ও রাষ্ট্রে অবহেলিত নিপীড়িতেরাই মজ্জমানের তৃণ থেকে তৃণান্তর আশ্রয় গ্রহণের মত ধর্ম থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করে থাকে; জোসেফের প্রপিতামহও সটান এসে উঠল শ্যামনগরে পাদরীদের আশ্রয়ে। মুসলমান হওয়ার কথাও ভেবেছিল, সে তখন মরীয়া, এই মেয়েটিই তখন তার সব; কিন্তু তার বিবেচনায় মুসলমান হওয়া ভাল মনে হয় নাই। মুসলমানেরা ঠিক ওই পাদরীসাহেবের মত ঐশ্বর্য বা জোরালো আশ্রয় দিতে পারে না—আরও একটা কথা মনে হয়েছিল—সেটা আশঙ্কার কথা—সিংদের মত তাদের মধ্যেও নারী-শিকার নিয়ে মারামারি বেশী; ওদের মধ্যেও শের মর্দানার প্রাদুর্ভাব অনেক। আরও ছিল। জোসেফের প্রপিতামহ জানত যে, মুসলমান হলেও মীরজা, মল্লিক, খাঁ ওরা তার সঙ্গে চলবে না, ভাল কুলের শেখেরাও তার সঙ্গে চলবে না, তাকে চলতে হবে এই সব ঘরানা ঘরের বাড়িতে যারা চাকর, খেটে খায়, যাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভোরবেলা গ্রাম-গ্রামান্তরের কাঠ ভেঙে আনে, পাঁকাল মাছ ধরে—তাদের সঙ্গে। কেরেস্তান ধর্মে এ সব নাই বলেই তার ধারণা ছিল। তাই সে মেয়েটিকে নিয়ে সটান এসে উঠল শ্যামনগরে; পাদরীদের গির্জার সিঁড়ির পাশে আস্তানা গাড়লে। শ্যামনগরে তখন একজন ব্রাহ্মণ, দুজন কায়স্থ এবং ঘর দুয়েক মুচি—এই নিয়ে সবে ক্রীশ্চান-পল্লীর পত্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণ যুবকটি তখন দাড়ি রেখেছে এবং সে দাড়ি বেশ বড়ও হয়েছে। পাদরীদের মত আলখাল্লা পরে বুকে লোহার 'করস' ঝুলিয়ে সে বেড়ায়। কায়স্থেরা চাকরি করে। একজন সকলকে লেখাপড়া শেখায়। অন্যজন সাহেবদের হিসাবনিকাশ করে।

ব্রাহ্মণ ছেলেটি বিয়ে করে নিয়ে এল মুর্শিদাবাদ থেকে, চমৎকার মেয়েটি—বৈদ্য কেরেস্তানের মেয়ে; কায়স্থেরাও বিয়ে করলে; একজন কায়স্থ বিয়ে করলে কলকাতায়, বিয়ে করে সেইখানেই সে থেকে গেল। অন্যজন বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে ওই মুচি কেরেস্তানদের একটি মেয়েকে। বাধ্য হয়ে বিয়ে করলে, তার কারণ মেয়েটি তখন সন্তানসম্ভবা।

তার পর তিন পুরুষ ধরে অর্থাৎ জোসেফ পর্যন্ত পরিবর্তন অনেক হয়েছে।

ব্রাহ্মণ ক্রীশ্চানের বংশের একটি শাখা এখনও এখানে আছে। বাকী তিনটি শাখা এখান থেকে চলে গিয়েছে। একটি শাখা কলকাতায়, এক শাখা মাদ্রাজ অঞ্চলে, অন্যটির খোঁজ কেউ জানে না; কায়স্থের যে ছেলেটি বিয়ে করে কলকাতাতেই থেকে গিয়েছিল, তাদের বংশের ছেলেদের কয়েকজন পুলিস সার্জেন্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ ছেলেটির যে শাখাটি এখানে আছে তাদের বাড়ির কর্তা এখানকার পাদরী রেভারেণ্ড ব্যানার্জী। ব্যানার্জীর দুই ছেলে,

এক ছেলে এম-এ পাস করে ডেপুটিগিরি পেয়েছে। অন্যটি বি-এ পাস করে বসে আছে। বসে আছে তার কারণ ছেলেটি কানা এবং খোঁড়া দুই-ই। ছেলেবেলায় পায়ে অপারেশন হয়ে একটা পায়ের গোড়ালি গিয়েছে অকেজো হয়ে, তার পর এই কয়েক বৎসর আগে স্মল-পক্‌স্ হয়ে একটা চোখ গিয়েছে। ছেলেটির সম্ভবত বিয়ে হবে না। কে দেবে ওকে মেয়ে? যে সমাজে ওদের করণ-কারণ সে সমাজে কেউ বিয়ে করবে না ওকে। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়ের বিয়ে আজও এখানে হয় নাই। ছেলে-মেয়েরা কলেজে পড়তে যায়—কলকাতাতে, সেখানে ওদের জানাশুনা বনেদী ঘর আছে, বেশ একটি গোষ্ঠীর গণ্ডিতে ঘেরা সমাজও আছে। তারই মধ্যে চলাফেরা করতে করতে ছেলেমেয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। সে পরিচয় ঘন হয়ে প্রেমে দাঁড়ায়—বিয়ে হয়। ক্রমে অবশ্য গণ্ডির পরিধি বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাদের বলে, তাদের সঙ্গেও দু-একটা করণ হচ্ছে। একজন বিলেতে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে খাঁটি ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে এনেছে।

বাকী ঘর কয়েকটির কয়েকটি শাখাও এখান থেকে চলে গিয়েছে; যারাই লেখাপড়া একটু ভাল শিখে ভাল উপার্জন করছে, তারাই চলে গিয়েছে কে কোথায় ঠিক সন্ধান জানা নাই। বেশ নাম-করা বড় কেউ হয় নাই, তাই কেউ সন্ধানও রাখে নাই। বাকী কয়েক ঘর এখানে পড়ে রয়েছে, মিশনের কাজকর্ম আঁকড়েই আছে। দু-চারজন ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য করে; কয়েকজন বেকার—সামান্য লেখাপড়ায় পাঠ্যজীবন শেষ করে মদ খেয়ে গুণ্ডামি করে কাল কাটাচ্ছে; প্রথম জীবনে জোসেফও ছিল তাদের মধ্যে একজন; পরে সে নিজেকে সংশোধন করে মোটর-ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারি করছে। মেয়েরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখে এখানকার ছেলেদের কাউকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে। সকলেই অবশ্য চায় এদের মধ্যে যে ছেলেটি ভাল তাকেই ভালবাসতে, কিন্তু ভাল ছেলেরা এখানকার মেয়েদের দিকে তাকায় না, তারা অবসর খোঁজে বাইরে যাবার, সেখানে গিয়ে তাদের মনোমত জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে চায়।

যে কায়স্থ ছেলেটি বাধ্য হয়ে মুচির মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল তাদের উপাধি ঘোষ; ঘোষ-বাড়ির একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে রেলে গার্ড হয়েছে, তার দিকেই এখন সব বাড়ির গৃহিণীদের নজর, অবিবাহিতা মেয়েগুলিও মনে মনে তাকেই কামনা করে; নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখে—লাল পেন্টিং করা রেলের বাংলো, সামনে এক টুকরো বাগান, দুয়ারে জানলায় রঙীন ছিটের পর্দা, বারান্দায় কিছু আসবাব, একজন খানসামা ইত্যাদি। আরও দুটি ছেলে এখানে কোর্টে কেরানীর কাজ করে। তাদেরও তারা অবহেলা করে না, কিন্তু ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তেও চায় না। জোসেফের বোন মেরী নীলিমা কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে। কালো মেয়েটির মনে যে কি স্বপ্ন তা সে-ই জানে। সে এদিক দিয়ে একেবারে হিম-শীতল নিস্পন্দ অর্থাৎ মৃত বললেই হয়। সে ওই গার্ড-সাহেবের বাড়িও কোনদিন যায় না। সে বাড়ি এলেও যায় না। এখানকার মেয়েদের মধ্যে সে-ই কেবল ম্যাট্রিক পাস। তাও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে। রেভারেণ্ড ব্যানার্জীর চেষ্টায় এখানকার এম-ই গার্লস স্কুলে সব চেয়ে ছোট

শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়েছে। ম্যাট্রিক পাসও করেছে সে ওই রেভারেণ্ড ব্যানার্জীর কৃপায়। তিনি তাঁর ওই কানা-খোঁড়া ছেলেটিকে বলে দিয়েছিলেন নীলিমার পড়াশুনা একটু দেখে দিতে। নীলিমার অসীম ধৈর্য্য তাই ওই বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত একচক্ষু লোকটার কাছে, মাসের পর মাস বসে থেকে পড়া বলে নিয়েছে। এখনও দিনে একবার যায় তার কাছে, ইচ্ছে—প্রাইভেটে আই-এ দেবে। কেরানী ছেলে দুটি অত্যন্ত ব্যগ্র তার মনোরঞ্জনের জন্ম। নীলিমার মত স্ত্রী তাদের কাছে আদর্শ স্ত্রী। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের পরিশ্রমের উপার্জনে বেশ একটি সচ্ছল সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে নীলিমার এদিক দিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এখানে শহর জুড়ে নীলিমাকে নিয়ে নানা অবাঞ্ছনীয় আলোচনা এবং আলোড়ন চলছে।

এখানকার হিন্দু এবং মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশ সতৃষ্ণ নয়নে নীলিমার দিকে চেয়ে থাকে। ক্রীশ্চান-সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত—এই বিধানকে তারা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগের বিধান মনে করে এবং ক্রীশ্চান মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার কুৎসিত ব্যাখ্যা করে, প্রলোভন দেখায়, বিরক্ত করে। কখনও কখনও দু-একটা নিন্দনীয় কাণ্ডও ঘটে যায়। দু-চারটি মেয়ে এদের নিয়ে খেলাও করে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দৃষ্টি এখন পড়েছে গিয়ে এই কালো মেয়েটির উপর। সকল কুরূপকে উপেক্ষা করে তার প্রতি আকর্ষণের কারণ—সে লেখাপড়া শিখেছে। বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত শিক্ষিতা মেয়েদের জীবন-দর্শনের যে বিকৃত ব্যাখ্যা সর্বত্র প্রচলিত, এখানে সে ব্যাখ্যা হয়তো একটু জোরালো। শুধু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশই নয়, ওদের নিজেদের সমাজে বেকার ছেলেগুলিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারাও শিস্ কাটে, ইঙ্গিতে রসিকতা করে। তাকে রাস্তায় একা দেখলে মুসলমান ছোকরারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে বলে 'জানি'। হিন্দুর ছেলেরা গান ধরে; তাদের মধ্যে কবি-কবি ভাবটা একটু বেশী। ক্রীশ্চান বেকার পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদুস্বরে বলে, ডার্লিং। দু-চারজন তরুণ উকিল-মোক্তারও নীলিমাকে ইঙ্গিতে নিজেদের প্রেম নিবেদন করে। এরাই সবচেয়ে কুৎসিত এবং অশ্লীল।

নীলিমা কিন্তু নিস্পন্দ হিমশীতল এদিকে।

নীলিমার মা এর জন্য বিরক্ত। মেয়ের বয়স হয়েছে; মা আর ইঙ্গিতে কথা বলে না, সোজা খুলেই বলে, তোর মতলবটা কি? রেভারেণ্ডদের বাড়ির কানা ছেলেটাকে বিয়ে করবি নাকি? তা হলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দোব।

নীলিমা বলে—কেন সে নিরীহ লোককে নিয়ে পড়লে বল তো?

মা বলে—তবে? তবে ব্যারিস্টার-ম্যাজিস্ট্রেট কে তোকে বিয়ে করতে আসবে?

নীলিমা লেখাপড়া শিখে কথাবার্তাগুলো একটু বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বলে, শুধু বাঁকাই নয় অত্যন্ত ধারালও বটে। মায়ের কথায় সে একটুও বিচলিত হয় না, যদিই বা হয় তা অন্তত বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সে নির্বিকারের মতই হাতের কাজ করে যায়, সেলাইয়ের কাজ করতে থাকলে সেলাই থেকে চোখ না তুলেই সে বলে—মস্ত বড় আয়নাখানা দেওয়ালে

ঝুলিয়ে রেখেছ, আমিও আমার ব্যাগে আয়না রেখেছি একখানা,—কানাও নই, চোখের কোনো ডিফেক্টও নাই। আর তোমাকে দিব্যি গেলে বলতে পারি, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে কোনদিন স্বপ্ন দেখার মত ঘুম পাতলা হয় না, সুতরাং—। বাকীটা আর সে বললে না, মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

এই ধরনের জবাব বুঝতে মায়ের কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই ধরনের জবাব দিতে পারে না বলে মায়ের রাগ বেড়ে যায়। সে বলে—কিন্তু বিয়ে তো করতে হবে, না কি? এর পর বয়স গেলে ওই পোড়া কাঠের দিকে কেউ ফিরে চাইবে আর? পাস করার গুমোর, বিশ টাকা মাইনের গুমোর তখন বুকে যে পাথর হয়ে বসবে!

নীলিমা তবুও হাসে।

—হাসছিস যে? তখন করবি কি?

—কি আর করব! জর্দন নদী অনেক দূর, কিন্তু গঙ্গা কাছে। গঙ্গাকেই জর্দন ভেবে নিয়ে রোজ গঙ্গাস্নান করব আর মথি-লিখিত সুসমাচার পড়ব; বাইবেলও পড়ব।

মা এবার দৃঢ়ভাবে বললে—কিন্তু ওই সিংয়ের গাড়িতে চেপে যে রোজ ইস্কুলে যাচ্ছিস, লোকে যে দশ কথা কানাকানি করতে আরম্ভ করেছে।

—রোজ?

—সে তুই জানিস, আর যারা বলছে তারা জানে।

—যাক। তুমি যখন জান না, তখন—

বাধা দিয়ে মা বললে—লোক যে বলছে—

—লোকের কথায় যদি বিশ্বাস কর তবে আমার উত্তর তো তুমি বিশ্বাস করবে না, সুতরাং কথা বলে তো কোন্ লাভ নেই আমার।

মা বললে—লাভ না হোক, লোকসান তো হবে না।

হেসে নীলিমা বললে, হবে বৈকি। কথা ক'টা বলার পরিশ্রমটাই লোকসান হবে।

মায়ের মুখ দেখে মনে হল, মা এবার রাগে ফেটে পড়বে। তবে কি ভাবে ফেটে পড়বে তাই বোধ হয় ভাবছে মা। কেলেঙ্কারি ঝামেলা ভালবাসে না নীলিমা। তাই সেটা নিবারণের জন্য কিছু বলবার আগেই বললে, পাঁচদিন গিয়েছি ওর মোটরে। তিনদিন দাদা সঙ্গে ছিল। দুদিন অবশ্য একা গিয়েছি। তাতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে, তবে দাদার সঙ্গে লোকটি বাড়িতে এলে তাকে খাতির কর কেন?

—আর খাতির করব না। স্পষ্ট বলে দোব। লোকে পাঁচ কথা বলছে।

নীলিমা হেসে বললে—লোকের কথা ছেড়ে দাও। লোকে চায় ওর মোটরে না গিয়ে তাদের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে ইস্কুলে যাই, তারা এস্কর্ট করে নিয়ে যায় আমাকে। দাদাও ড্রাইভার—ও-ও ড্রাইভার, দাদার বন্ধু, লোকটিকে বেশ লাগে আমার। আরও ভাল লাগে কি জান? গির্ বরজাক্ক ছত্রী—যারা এককালে আমার ঠাকুরদার বাপকে জুতো মেরেছে, এঁটো খাইয়েছে—তাদের বাড়ির ছেলে এসে—। নীলিমা হাসে। হাসি থামিয়ে আবার

বলে—দাদাও ওকে খুশী করতে চায়। কিছু যদি বলবার থাকে তো দাদাকে বল।

জোসেফ নরসিংকে যে একটু খুশী করবার চেষ্টা করছে এটা সত্য। নরসিং শুধু ড্রাইভারই নয়, সে গাড়ির ওনার অর্থাৎ মালিকও বটে; মাইনের চাকর নয় সে, সমস্তটা লাভেরই হকদার। সুতরাং সমস্ত ড্রাইভার-মহলেই সে হয় খাতিরের লোক, নয় তো ঈর্ষার পাত্র। রামেশ্বরপ্রসাদ, রসিদ—এরা তাকে ঈর্ষা করে, তারা বলে ড্রাইভার-ওনার চামচিকে পক্ষী। জোসেফ কিন্তু ওকে খাতির করে। সে নিজে এমনি একখানি গাড়ির মালিক হতে চায়। সব দিক দিয়ে নরসিং তার আদর্শ। নরসিংয়ের যেমন অতি অনুগত দুটি লোক—নিতাই আর রাম আছে, তেমনি একটি লোক রাখবার কল্পনা তার। দুজন লোকের খরচ বেশী, একজন লোক রাখবে সে। ধোয়ামোছা, টুকিটাকি মেরামত, চাকা পাংচার হলে স্টেপ্‌নী অর্থাৎ বাড়তি চাকাটা খুলে পরানো, জগ দিয়ে ঠেলে গাড়িটাকে উঁচু করে তোলা—এসব কাজে দুজন লোক হলে ভাল হয়, নিজেকে বেশী খাটতে হয় না, কিন্তু তেমনি তার খরচও আছে। সে নিজে বেশী খাটতে প্রস্তুত। এ ছাড়া নরসিং গিব্‌বরজার সিং-বাড়ির ছেলে—তারও পূর্বপুরুষ একদা গিব্‌বরজার অধিবাসী ছিল—এই হিসাবেও খানিকটা তার ভাল লাগে। তার পূর্বপুরুষ ছিল সিংদের গোলাম—অস্পৃশ্য, সিংদের কাছে হাতজোড় করে থাকত; আর সে নরসিংয়ের বন্ধু, নরসিংয়ের সমান পদস্থ হয়ে ঘোরাফেরা করে এটাও তার বেশ লাগে। মেলামেশার মধ্যে এটা অবশ্য অহরহ মনে পড়ে না—কখনও কালেকস্মিনে প্রসঙ্গ উঠলে, হঠাৎ মনে হলে বিচিত্র ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে সে। আরও একটা কারণ আছে। রামেশ্বর, রসিদ প্রভৃতি এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই। সে নিজে ক্রীশ্চান; লেখাপড়া ওদের চেয়ে বেশী জানে, সভ্যতা-ভব্যতার আইন-কানুনও বেশী জানে—নিজে সরকারী অফিসারের ড্রাইভার, সেই হেতু সে ওদের অসভ্য বর্বর ভাবে এবং নিজেকে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। রামেশ্বর, রসিদ এরাও ওকে ঘৃণার চোখে দেখে—কেরেস্তান শব্দটাকেই ওরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে। মেয়েদের স্বাধীনতা আছে, তারা লেখা-পড়া শেখে সেজেগুজে পথে বেড়ায়, এজন্য তাদের অশ্লীল কথা বলে; বিশেষ করে জোসেফের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু এবং ম্যাট্রিক পাস করে ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে বলে নীলিমার উপরেও আক্রোশটা বেশী। ওই সব নানা ধরনের সূত্র একসঙ্গে পাকিয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই জটিলতার মধ্যে জোসেফ নরসিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। প্রীতির আধিক্য হেতুই সে প্রীতিকে অকপটে প্রকাশ করে নরসিংকে বুঝিয়ে দেবার অভিপ্রায়েই জোসেফ প্রতি রবিবারে নিজের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে, তাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী মায়ের সঙ্গে, নীলিমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে নীলিমার প্রতি রসিদ-রামেশ্বরের অভদ্র বর্বর আচরণের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখাতেই সে বাইরেও নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে নরসিংয়ের সঙ্গে বেড়ায়, বাজারে দেখা হলে দাঁড়িয়ে আলাপ করে। নীলিমার ইস্কুলে যাওয়ার সময় নরসিংয়ের পাঁচমতি যাওয়ার পথে গাড়ি খালি থাকলে গাড়িতে চড়ে বসে। বয়সের ভাল লাগায় নরসিংয়েরও এটা ভাল লাগে। না, তার চেয়েও অনেক বেশী

ভাল লাগে। অনেক—অনেক বেশী। রূপ এবং যৌবনকে ভাল লাগা এক; এ ভাল লাগা আর এক ভাল লাগা। শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়ের মধ্যে শিক্ষিতা কালো মেয়েকে সেই ভাল লাগার চোখে অশিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের চেয়ে বেশী ভাল লাগে। ফটিকি তো তার উপর উচ্ছিষ্ট।

ড্রাইভার নরসিং জীবনে নীলিমার মত মেয়ের সাহচর্য কখনও কল্পনা করতেও পারে নাই। তার স্ত্রী জানকীর মৃত্যুর পর বিবাহের বাসনা তার মনে যখনই জেগে উঠত তখনই তার মনে পড়ত শহরে ইস্কুলে যাওয়া কিশোরী মেয়েদের ছবি। তাদের সমাজে এ ধরনের মেয়ে নাই; যদিই দূরে-দূরান্তরে কোথাও থাকে তবে তার মত ড্রাইভারকে সে মেয়ে সমর্পণ করবে কেন তার অভিভাবক? কখনও কখনও মদের নেশায় উত্তেজিত মস্তিষ্কে কল্পনা করত তার দ্রুত-গামী এই মোটরে এমনি একটি মেয়েকে হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে তিরিশ-চল্লিশ মাইল স্পীডে পালিয়ে গেলে কি হয়? মনে পড়ে যেত তার গিবুররজার সিং-বংশের আদি-পুরুষের কথা।···আবার নেশা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওটা স্বপ্নের মত মনে হত।

শিক্ষিতা কালো কুরূপা নীলিমার সঙ্গে আলাপ, তাকে গাড়িতে চড়িয়ে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়ার ভাগ্যটা তাই তার কাছে অকল্পিত সৌভাগ্য। সাধারণ ড্রাইভার-জীবনে এটা ব্যতিক্রম। সে অবশ্য গল্প শুনেছে, দু-দশজন বড় লোকের ঘরের মেয়ে-বউ ড্রাইভারের প্রেমে পড়েছে, জানাজানি কানাকানি হতেই ড্রাইভারের চাকরি গিয়েছে। দু-এক ক্ষেত্রে মেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছে, কিন্তু সেও ব্যতিক্রম। এবং সে ব্যতিক্রমের সঙ্গেও এ ব্যতিক্রমের পার্থক্য আছে। জোসেফ নীলিমাকে নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে; তার গাড়িতে চড়ে, পরিহাস করে, হাসে। সে সমস্তই প্রকাশ্য—সহজ, তার এতটুকু অংশও কোন শাসনে কোন বাধায় পীড়িত অথবা সংকুচিত নয়। এ যে অকল্পিত সৌভাগ্য!

জানকীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—চরিত্রহীনা কসবী জাতীয় নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করবে না। কিন্তু অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্না এই ফটিকি মেয়েটার কাছে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারত না, যদি না নীলিমা এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াত।

এ রবিবারটা কাটল পাঁচমতিতে সুরেশ দাসের ওখানে। খরচ অবশ্য নরসিংয়ের, কিন্তু বন্দোবস্ত সব সুরেশের। দাসজীর বন্দোবস্ত পাকা। হাঁসের মাংস—খিচুড়ি—মদ—মাছভাজা থেকে আরম্ভ করে—একজন বাউলের দেহতত্ত্বের গান এবং নূপুর পায়ে নাচ পর্যন্ত। হেসে সে বললে—সব ঠিক করে রেখেছি বন্ধু, নাচ-গান পর্যন্ত।

নরসিং হাসলে।

নিতাই বললে—আরে যান মশাই। ভারী নিয়ে আবার নাচগান হয়?

দাস বললে—হুঁ হুঁ। বিনা ভারী—লাল শাড়িও হতে পারে—তবে সুরেশ দাসের এলাকায় নয়, সুরেশ দাস দেখিয়ে বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসবে, কিন্তু নিজে সেখানে থাকবে না।

নিতাই কেমন যেন গজগজ করছে ভেতরে-ভেতরে। খেটেছেও আজ খুব। মজুরের

কাজ করেছে। ওকে খুশী করার প্রয়োজন আছে। নরসিং সুরেশকে বললে—ওর ব্যবস্থা একটা করে যদি দিতে পারেন তো ভাল হয়।

সুরেশ বললে—আপনার ?

—না।

—বহুত আচ্ছা। খুব খুশী আমি এতে। আচ্ছা, ও বেটার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ওই ছোঁড়াটা ? রামটা ?

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—ওর কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

নিতাই রাম দুজনেই গেল।

নরসিং সুরেশের সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের কথা কইলে। সুরেশের দুঃখ নাই। সে বলে—যো হোগেয়া সো যানে দো। সে সব ভেবে মনখারাবি করো না। আনন্দ কর। ব্যস। বেশ কয়েক পাত্র পান করে সুরেশ নরসিংয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে বসল। ওই এক বাতিক সুরেশের। বিশেষ করে মদ খেলে তখন দু-হাত পাঞ্জা-লড়াই চাই। লোক না পেলে দুটো ম্যাড়া আছে, তাদের নিয়ে ঢুঁ খেলে। নরসিংয়ের কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে নীলিমাকে বার বার মনে পড়ল। বেশ কাটল রবিবারটা।

তার উৎসাহ যেন বেড়ে গিয়েছে।

গিরিবরজা থেকে পাঁচমতির পথে সড়ক ছেড়ে মাঠের বুকের পথ কেটে সমান করে নেওয়ার পর হিসেবমত সময় বাঁচার কথা তিন থেকে পাঁচ মিনিট। কিন্তু নরসিং আজকাল এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে যে সময় বাঁচছে আট মিনিট। পঞ্চাশ প্রথমে নেমেছিল পঁয়তাল্লিশে, কেটে নেওয়ার পর নামবার কথা চল্লিশে, কিন্তু সাঁইত্রিশের বেশী লাগছে না এখন। রামা নিতাইয়ের ধারণা—তাড়াতাড়ি ফেরার মূলে নরসিংয়ের আছে নীলিমাকে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়ার সময় করে নেওয়ার চেষ্টা।

রামা বলে—দাদাবাবু আজকাল উড়ে চলেছে। শালা তুফান মেল।

নিতাই কিন্তু অসন্তুষ্ট, সে বলে—হ্যাঁ, যেদিন গোঁত্তা খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়বে সেই দিন হবে।

রামা একটু বিস্মিত হয় নিতাইয়ের মুখে এ ধরনের কথা শুনে। কি হল নিতাইয়ের ? নরসিংও সেটা অনুভব করলে ক্রমে। কিছু একটা হয়েছে নিতাইয়ের। সে একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোর বল্ দেখি ?

নিতাই বললে—হবে আর কি বলেন ? গাড়ি 'ডেরাইব' করা যে ভুলে গেলাম মশাই!

নরসিং স্বীকার করলে—তা বটে। নিতাইকে এখানে এসে অবধি স্টীয়ারিং ছেড়ে দেয় নাই। সে বললে—ঠিক হ্যায়, কাল থেকে একবেলা তোর, একবেলা আমার।

নিতাই খুশী হয়ে গেল।

নিতাই কিন্তু জবরদস্ত ড্রাইভার হবে। বেটার হাতটা একটু কড়া এই যা। বেটা যে রকম মোড় নেয় জোরে! নরসিং বার বার ওকে সাবধান করে—খবরদার, মানুষের জীবন তোর হাতে।

রামাটাও মধ্যে মধ্যে স্টীয়ারিং ধরেছে। নিতাইয়ের পাশে বসে স্টীয়ারিং ধরে।

রামা হঠাৎ একদিন নরসিংকে চুপিচুপি বললে—নেতাই শালার পোকা ঢুকেছে দাদাবাবু! রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করছে—ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবে। আমাদের কাজ ছেড়ে ড্রাইভারি চাকরি করবে।

নরসিং বিস্মিত হয় নাই। এ পথের এই ধারা। সে নিজেও জানে। সে যখন মেজবাবুর গাড়িতে কণ্ডাক্টারের কাজ করতে করতে মোটর চালাতে শিখেছিল, তখন সে ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স নেবার জন্যেই শিখেছিল। রহমৎ ড্রাইভারের কাছে কাজ শিখে সে রহমতের জায়গাতেই ড্রাইভার হয়ে বসেছিল। নিতাইকে ড্রাইভিং সে যখন শিখিয়েছে, তখন সে মনে মনে ভেবেছিল—নিতাইকেও সে লাইসেন্স নেওয়াবে। এখানে এসেও সে-কথা সে ভেবেছে। সে নিয়ে কথাও হয়েছে। এ ছাড়াও তার মনে আরও অনেক কল্পনা আছে। সামনে বর্ষা এগিয়ে আসছে। একটু জোর বৃষ্টি নামলেই প্রথমে মাঠের পথ বন্ধ হবে, তারপর ক্রমে কাঁচা মাটির সড়কও বন্ধ হবে। সে মধ্যে মধ্যে ভাবে—এই শ্যামনগরে সে ছোটখাটো একটা মেরামতি কারখানা খুলবে; তার লাইসেন্সটা পাঁচমতির রাস্তা ছাড়াও ওই শহরের ঘাট পর্যন্ত বাড়িয়ে নেবে। তাতে এখানকার মোটর-কোম্পানির সঙ্গে একদফা ঝগড়া বাধবে। নরসিংয়ের ক্ষমতা নাই মোটর কোম্পানির সঙ্গে ঝগড়া করবে। সে ভাবছে শুধনরামকে যদি নামানো যায়। সাহুজীর টাকা আছে। এ কাজে লাভ আছে। সাহুজী যদি গাড়ি কেনে—একখানা বাস, একখানা মোটর; সবচেয়ে ভাল হয় যদি তার সঙ্গে একখানা ট্রাক কেনে। তা হলে জোর চলবে কোম্পানি। সে আর জোসেফ দুজনে ভাগে কিনবে একখানা মোটর। একটাতে ড্রাইভার হবে নিতাই, একটাতে জোসেফ, অন্যটায় রামাকে বসালে চলে কিন্তু সে এখনও ছেলেমানুষ, রামাকে সে নিজের গাড়িতে রেখে তালিম দেবে, অন্যটায় বসিয়ে দেবে হাফিজকে। হোটেলে জুয়ার আসরে যে রামেশ্বরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলেছিল—পরসাদ সাহেব এ অন্যায় আপনার। হাফিজ লোকটি ভাল।

আজ সকাল থেকে নিতাই ট্রিপে নাই। ছুটি নিয়েছে। বলেছে—আমার শরীর আজ ভাল নাই সিংজী। আমি আজ আর যেতে পারব না।

গায়ে হাত দিয়ে নরসিং দেখেছিল—গায়ে তাত তো নাই!

—সর্বাঙ্গ বেথা করছে, মাথা টিপটিপ করছে। আমি কি মিছে কথা বলছি মশায়?

অবিশ্বাস করে নাই নরসিং, অবিশ্বাসবশত পরীক্ষা করবার জন্যও গায়ে হাত দিয়ে দেখে নাই, মমতাবশতই দেখেছিল, তাই নিতাইয়ের মেজাজ খারাপ দেখে তার বিশ্বাস হল বেশী। নিশ্চয়ই বেচারার শরীর খারাপ, নইলে মেজাজ খারাপ কেন হবে! সস্নেহে হেসে সে ছ আনা পয়সা দিয়ে বলেছিল—যাক, শুয়েই থাক্‌। দোকান খুললে চার আনার মদ আর দুটো কুইনিন খেয়ে নিস। আমি রামাকে নিয়ে চললাম।

পাঁচমতি থেকে ট্রিপ নিয়ে ফিরে দেখলে, নিতাই বাসায় নাই। মদের দোকানে, চায়ের

দোকানেও গেলে না। পথে হাফিজ বললে—নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে বোধ হয় শহরে গিয়েছে।

—শহরে? আশ্চর্য হয়ে গেল নরসিং। এতক্ষণে চুপিচুপি রামা বললে—হয়েছে দাদাবাবু। আপনাকে বলতে আমার মনে ছিল না।

রামার মুখে নিতাইয়ের এই কথা শুনে সে আশ্চর্য অবশ্য হল না, পাখির ছানার ডানা গজায় উড়বার জন্যই, নিতাই ড্রাইভিং শিখেছে লাইসেন্স নেবার জন্যই; কিন্তু তাকে লুকিয়ে তার শত্রু ওই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে দোস্তি করে ষড়যন্ত্র করে নিতে চলেছে—এ জন্য তার দুঃখ হল। ড্রাইভারের মেজাজে দুঃখ নীরব বিষণ্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে না, করে ক্রোধের মধ্য দিয়ে। নরসিং বললে—শালা হারামী কাঁহাকা! ও, এই জন্যে বুঝি? তাই শরীর খারাপ?

ক্ষুব্ধ মনের তাড়নায় সে গাড়িটাকে মোড় ফিরবার মুখে নিয়ে গিয়ে ফেললে রাস্তার ধারে, রাস্তা মেরামতের জন্য গাদা করে রাখা পাথর-কুচির গাদার ওপর। কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার নরসিং, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে স্টীয়ারিং, পায়ের চাপে গতি নিয়ন্ত্রিত করলে। ঠিক পার হয়ে গেল। শা-লা!

ফ-স্-স্-স্।

—কি হল? গিয়েছে একটা চাকা! পিছনের বাঁ দিকের কোণটা বসে যাচ্ছে। ব্রেক কষলে নরসিং। লাফ দিয়ে নামল রামা।

—এঃ, একটা বোতল-ভাঙা কাচ দাদাবাবু। টায়ারটার পাশে ঠিক সেই ক্ষয়া জায়গাটাতে ঢুকে গিয়েছে। পাথর-গাদায় বোতল-ভাঙা কাচ ফেলেছে কে?

নরসিং নামল।

ট্রিপের সময় চলে যাচ্ছে। আপিসের সময়। এই ট্রিপে বাঁধা খদ্দের অনেক। তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

—নিয়ে আয় জগ। নিজে লেগে গেল স্টেপ্‌নীটা খুলতে। মনটা খিঁচড়ে গিয়েছে, ফুটে-যাওয়া চাকাটার বোল্টগুলি খুলতে ক্রমাগত বাধা পাচ্ছে। শালা নিমকহারাম বেইমান! ছোটলোকের বাচ্চা তো হাজার হলেও।

—কি হল? পাংচার?

জোসেফ আর নীলিমা। নীলিমা ইস্কুলে যাচ্ছে। নরসিংয়ের মন খানিকটা স্নিগ্ধ হল। সে ওরই মধ্যে নমস্কার করতেও ভুললে না।—নমস্কার।

জোসেফ এসে দাঁড়াল নরসিংয়ের পাশে।

—আঃ! করলেন কি? আঙুলটা জখম করে ফেললেন? সরুন, আপনি সরুন। আমি দেখি। নীলি, তুই বরং চলে যা আজ। আমি দেখি। সিংজী আঙুলটা জখম করে ফেলেছেন।

নীলিমা আঙুলটা দেখে শিউরে উঠল। বেঁধে ফেলুন এক্ষুনি। রামা, তুমি চট করে গিয়ে খানিকটা বরফ নিয়ে এস।

হেসে নরসিং বললে—ড্রাইভারদের ও রকম অনেক লাগে। রামের এখন যাওয়া চলবে না।

নীলিমা বললে—না, চলুন, ওই আগে বরফ পাওয়া যায়। আসুন।

—উঁহু। আমার প্যাসেঞ্জার বসে আছে পাঁচমতিতে।

হন হন করে চলে গেল নীলিমা।

ঘটাং-ঘটাং-ঘট ঘট-ঘট। জগ খুলে নিয়ে গাড়ির ভিতরে ফেলে দিলে রামী সেটাকে।

জোসেফ বললে, ও. কে, ঠিক হয়ে গেছে।

পানের দোকানের একটা ছোকরা ছুটে এল। তার হাতে নীলিমার রুমালে জড়ানো খানিকটা বরফ।

জোসেফ বললে—লাগান, উপকার হবে। রামা. তমি ওঁর পাশে বসে আঙুলের ওপর ধরে রাখ। ডান হাতে দিব্যি স্টীয়ারিং চলবে ওঁর।

নরসিং সুস্থ হাতটায় সিগারেট বার করে ধরলে। বললে—আপনি নিন, একটা বার করে আমার মুখে দিয়ে ধরিয়ে দিন।

সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়িতে চেপে বসল। রামা হাতে বরফ ধরিয়েছিল। নরসিং সেল্‌ফ-স্টার্টার ব্যবহার করলে। গাড়িখানা গর্জন করে উঠল। রামাকে বললে—হাঁক।

—পাঁচমতি—পাঁচমতি—পাঁচমতি।

ফুঃ করে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বরফ থেকে হাত টেনে নিয়ে সে গীয়ারের উপর রাখলে।

পাঁচমতি—পাঁচমতি—পাঁচমতি।

চৌদ্দ

আরও মাস খানেক পর।

শ্যামনগর, শ্যামনগর, শ্যামনগর।

বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এবার বর্ষা নেমেছে দেরিতে। শ্রাবণ মাস—গোটা আষাঢ় নরসিং গাড়ি চালিয়েছে। আকাশে মেঘ ঘুরছে। মধ্যে মধ্যে রিমঝিম বৃষ্টি নামছে। কাঁচা-সড়ক হলেও নবাবী আমলে তৈরী রাস্তা, অন্তত তিন-চারশ বৎসর ধরে জমে তলদেশ 'বজ্রকঠিন' হয়ে গিয়েছে। নরসিং 'বজ্রকঠিন' শব্দটি ব্যবহার করে। 'বজ্র' নামক পদার্থটি আসলে কি এবং আসলে তার আকার-আয়তন আছে কিনা, সে সব বিশ্লেষণ করলে কথাটা দাঁড়ায় কিনা, এ সব প্রশ্নই তার কাছে নাই। সে শুনে আসছে কথাটা এবং কথাটা ভারি ভাল লাগে তার কাছে, তাই সে ব্যবহার করে। বজ্র বলতে নরসিং জানে, এ দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে—শাণিত এবং কঠিনতম একটা অস্ত্র। লম্বা তীরের ফলার মত আকার, সেটা আকাশে ক্রুদ্ধ দেবতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, ব্রহ্মশাপগ্রস্তের উপর এসে পড়ে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যে গাছের উপর বাজ পড়ে তার কারণ ওই অভিশাপ। ওগুলো ব্রহ্মশাপগ্রস্ত গাছ। বজ্রাস্ত্র এসে শাপ-গ্রস্তকে বিনাশ করে আকাশে চলে যায়। একমাত্র কলাগাছের কাছে এই বজ্রাস্ত্র পঙ্গু। কলাগাছ হল কলা-বউ, সে হল স্ত্রীলোক, তার উপর যদি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাজ এসে পড়ে

তবে সে আর ফিরতে পারে না। কলাগাছের কোমল বুক চিরে ফেলবামাত্র তার শক্তি লোপ পায়, আগুন নিভে যায়, বজ্রাস্ত্রের টুকরো ওই গাছের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকে। সিঁধেল চোরেরা এর সন্ধানে থাকে। এ অস্ত্র যে পায়, তার আর ভাবনা নাই। ইট কাঠ পাথর এমন কি দেওয়াল যদি লোহারও হয় তবে এই ফলা দিয়ে কাটলে পাকা ফলের শাঁসের মত কেটে যাবে। ছেনিতে কাটে না, আগুনে গলে না, হাম্বর দিয়ে পিটলে ভাঙে না, একটা কণা পর্যন্ত খসে না, এমনি কঠিন এই বজ্রাস্ত্রের টুকরো। তিন-চারশ বছরের সড়কটার তলাটা ঠিক তেমনি কঠিন। উপরে হাত দেড়েক মাটি, যেটা হালআমলে ফেলা হয়েছে। তাই চাকায় চাকায় গুঁড়ো হয়, গ্রীষ্মে ধুলো হয়ে ওড়ে, বর্ষায় কাদা হয়ে এলিয়ে পড়ে, বর্ষা ফুরিয়ে গেলে শুকিয়ে ঘায়ের মামড়ির মত কদর্য হয়ে ওঠে। কোনরকমে যদি এক পুরু মুড়িপাথর আর লাল মোরাম এনে বিছিয়ে দিতে পারা যায় তবে আর ভাবতে হয় না। একেবারে—নরসিং বলে—একেবারে ফাস্ট কেলাস মটর রোড হয়ে যায়। কিন্তু কে রাজা কে মন্ত্রী, কে গুরু কে গোসাঁই, এর পাত্তা করাই এক কঠিন ব্যাপার! গোটা রাস্তাটায় মুড়িপাথর মোরাম দেওয়া দূরে থাক্, এর মধ্যেই কয়েকটা বিশ্রী গর্ত দেখা দিয়েছে। সেগুলিকে অন্তত ওইভাবে মেরামত করিয়ে দেবার জন্য নরসিং কণ্ট্রাক্টরের কাছে গিয়েছিল। কণ্ট্রাক্টর বলেছে—ওভারসিয়ারবাবু বললেই আমি করে দেব। ওভারসিয়ারবাবু বলেছে—মুড়িপাথর? ক্ষেপেছ নাকি তুমি? কাঁচা সড়কে মুড়িপাথর?

নরসিং বলেছিল—এখন কয়েক ঝুড়ি মুড়িপাথর দিলে আর গর্ত হবে না। না হলে এক পশলা চেপে জল হলেই ও একেবারে 'জাওন গাড়া' হয়ে যাবে।

এখানে বর্ষণ হওয়াকে 'বৃষ্টি হওয়া' বলে না, বলে 'জল হওয়া'। 'জাওন গাড়া' বলে জলে কাদায় ভর্তি খানাকে। ওভারসিয়ার হেসে বলে দিয়েছেন—তখন গাছের ডাল কেটে ফেলে দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে দেব।

নরসিং ধরেছিল এস-ডি-ওকে। এস-ডি-ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার থ্রু দিয়ে দেবে, আমি রেকমেণ্ড করে দেব।

তাও করেছিল নরসিং। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন—কাঁচা রাস্তার মুড়িপাথর দিয়ে মেরামতের বরাদ্দ কোন কালে নাই। যা নাই, তার রেওয়াজ আমি কি করে করব?

রেওয়াজ নাই! দেশে কি মোটরের রেওয়াজ ছিল কোন কালে? নরসিং ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় নাই। ঘামিয়ে লাভ নাই। অল্পস্বল্প বৃষ্টি এখন, এ সময়ে প্যাসেঞ্জারের ভিড় বাড়ছে। গোটা রাস্তাটা চটচটে কাদায় ভরে গিয়েছে, পিছল হয়েছে, বর্ষায় ভিজতে হচ্ছে মানুষকে, হেঁটে যাওয়ায় অনেক কষ্ট, পথিকেরা এখন গাড়িতে যেতে চায়। ঘোড়ার গাড়িগুলো এর মধ্যেই ঘাল খেয়েছে, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। দশ-বারোখানা গাড়ির কয়েকখানা শ্যামনগর শহরেই ভাড়া খাটে; খান দুই-তিন গরুর গাড়ির মাথা খেতে উঠে পড়ে লেগেছে। শ্যামনগর থেকে তিন মাইল দূরবর্তী জাগ্রত মা-কালীর থান এবং গরু-ছাগলের হাট—হাট দেবীপুরে ভাড়া খাটছে। খান পাঁচেক এখনও পথে চলছে।

এ পাঁচখানা গাড়ির ঘোড়া ভাল। কিন্তু রাস্তায় কাদা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলায় নরসিং পড়েছিল, গরু-মহিষাদির ক্ষুর চেরা বলিয়া কাদার চলাচলের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এবং ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদার মধ্যে ঘোড়া ভাল চলিতে পারে না। আজকাল রাস্তায় ঘোড়াগুলো যখন অতিকষ্টে চলে তখন নরসিং আপন মনেই বলে—'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া—।'

আজ বৃষ্টি কিছু বেশী হয়েছে; মোটরের চাকা পিছলে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্তে জল জমেছে, সমস্ত সড়কটার উপরেই চার-পাঁচ আঙুল পুরু কাদার একটা আস্তরণ পড়েছে; এখানকার মাটি অত্যন্ত আঠালো, টায়ারে মধ্যে মধ্যে এমন কাদা জমে যাচ্ছে যে মাডগার্ড পর্যন্ত পুরু হয়ে উঠে খস খস শব্দ উঠছে। খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। মাঠের রাস্তা বন্ধ, সেখানে এখন কাদা এক হাঁটু সমান। ওদিকে নামলে আর রক্ষা নাই। রথচক্র গ্রাস হয়ে যাবে। ইঞ্জিন চলবে, চাকাও ঘুরবে, কিন্তু গাড়ি এক ইঞ্চি এগুবে না। কাদার মধ্যেই চাকা সর-সর শব্দ করে পাক খেতে থাকবে। এইবার সার্ভিস বন্ধ করতে হবে, আর উপায় নাই। 'ঘোড়ার ক্ষুর জোড়া বলিয়া' আজ রাস্তায় একখানাও ঘোড়ার গাড়ি নাই। কেবল গরুর গাড়িগুলো চলেছে সেই এক চালে। কিবা রাত্রি কিবা দিন, কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা—সমান চালে চলেছে ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে, পাড়াগাঁয়ের দা'ঠাকুরী চালে—এক হাতে ছাতা লাঠি, এক হাতে হুঁকো নিয়ে ভারিক্কি চালে চলার ভঙ্গিতে।

এই সময়টা কিন্তু ভাল রোজগারের সময় ছিল। ভাড়া বাড়িয়ে দিলেও কেউ আপত্তি করত না, ঝিপি-ঝিপি বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য সুড়সুড় করে হুডের তলায় এসে ঢুকত। পাঁচ-মতির যারা ডেলী-প্যাসেঞ্জারি করে তারা বর্ষার সময়টা শ্যামনগরে বাসা গাড়তে বাধ্য হয়। মোটর চললে তারাও বাঁচত। মরুক অকর্ম্মার দল সব, লেখাপড়া শিখেছে, না, কচু শিখেছে। দরখাস্ত করে তদ্বির করে এই সাত মাইল রাস্তা পাকা করে নিতে পারে না? বড় বড় জমিদার আছে, তাদের না ভাবনা না চিন্তা, জমিদারি করে ঘি দুধ মাছ মাংস খায় আর ঘুমোয়, মামলা মকদ্দমা লেগেই আছে। সে চালায় তাদের কর্ম্মচারীরা; রাস্তা পাকাই হোক আর কাঁচাই হোক বাবুদের কিছু আসে যায় না। নেহাত দরকার হলে পাল্কি আছে, ভিজতে ভিজবে বেটারা, কাদা ভাঙবে তারাই, কয়েক বাড়িতে বুড়ো হাতী আছে, বর্ষার সময় তাদের হাতী বার হয়। থপ-থপ করে জলকাদা ভেঙে চলে।

—হুঁশ করে একটু হুঁশিয়ার হবেন সব। নরসিং হেঁকে উঠল।

সামনে একটা বড় খন্দক ঠিক একেবারে মাঝখানে, দুপাশে দুফালি কাদাভরা জায়গা, খন্দক বাঁচিয়ে যেদিকেই যেতে যাবে সেইদিকেই একপাশের চাকা একেবারে রাস্তার কিনারার উপর পড়বে। কোনরকমে যদি কিনারা ধ্বসে তবে মোটর নিয়ে 'মালকবাজি' অর্থাৎ উল্টে ডিগবাজি খেয়ে মাথা নীচু করে পড়বে। চাকা চারটে আকাশের দিকে উঠে যাবে। নরসিং অবশ্য ভয় খায় না, এভাবে মোটর চালানো তার নতুন নয়। মেঠো পাড়াগেঁয়ে যারা সাইকেল চালায় তারা মাঠে আলপথে সাইকেল চালিয়ে যায়; এও তাই। পাশে বসে রামা

পাশে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলে চলেছে—'চল চল, হুঁশিয়ারি, হুঁশিয়ারি, বহুৎ আচ্ছা, বলিহারি, কেয়াবাৎ—জয় মা-কালী, ঠিক হ্যায়।' অতি সন্তর্পণে নরসিং চালিয়ে পার হয়ে আসে দুর্গম স্থানটা। আর কিন্তু সার্বিস চলবে না মনে হচ্ছে। বন্ধ করতে হবে। ওদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড মেরামতির নোটিস দিয়ে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করবে দু-চার দিনের মধ্যেই। একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই। রাস্তার যা অবস্থা তাতে স্টীয়ারিংয়ে এক হাতের জোর রেখে ভরসা হয় না। শালা শূয়ারকি বাচ্চা নিতাই। বেটা ভেগেছে। পাখির বাচ্চার ডানা গজালে সে আর মা-বাপের বাসায় থাকে না। উড়ে পালায়। নিতাই পালিয়েছে। সে থাকলে তাকে স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে নিতে পারত।

এবার রাস্তা ভাল। গাড়ির স্পীড বাড়ালে নরসিং। রাস্তায় রাহী চলেছে এক পাশ ঘেঁষে। জনকয়েক চলেছে ঠিক মাঝখান বরাবর। হর্ন দিলে নরসিং।

—জ্বালালে রে বাবা! মোটর এল, না, আপদ্ এল!

পাড়াগেঁয়ে হালফ্যাশানি চাষা-ভূষো শহরে চলেছে মামলা করতে। দুচক্ষে দেখতে পারে না নরসিং। 'আধ আখুরে' যে বলে এদের, সে মিথ্যে বলে না। অ-আ-ক-খ অক্ষরগুলোর আধখানা চেনে না। ছাপা অক্ষর চিনতে পারে, বানান করে পড়ে কোনরকমে; কিন্তু হাতের লেখা হলেই—ব্যাস, 'আজমীর গেয়া'কে 'আজ মর গেয়া' একপ্রহর কসরতের পর।

রাম বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—গর্ত গর্ত···গচকা।

—দেখেছি।—নরসিং গর্তের উপর দিয়েই গাড়িটা চালিয়ে দিলে, স্পীড একটু বাড়িয়ে দিয়েই চালিয়ে দিলে। জলভরা গর্তের উপর দিয়ে গাড়ি চলে এল কাদা জল ছিটিয়ে। নরসিং পিছনের দিকে চেয়ে বললে—শালা!

রাম এতক্ষণে বুঝেছে। সে হি-হি করে হেসে উঠল, সেই সর্বনেশে হাসি। সে হাসি আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না। প্যাসেঞ্জাররাও হাসছে। ওই চাষী দুজনের জামাকাপড় কাদায় ভরে গিয়েছে। মাথায় মুখে পর্যন্ত কাদা লেগেছে। একজনের বোধ হয় মুখের ভিতরে চলে গিয়েছে কাদা। লোকটা থু-থু করে থুথু ফেলছে।

জল-বৃষ্টি হলে এটা একটা আমোদ পায় নরসিং। শুধু নরসিং কেন? সব ড্রাইভারেরই আমোদ লাগে। বিশেষ করে সাদা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, বেশ ফিটফাট বাবুটি সেজে যারা যায়, তাদের দেখলেই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে জলকাদার উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করে। কাদায় যখন ধোপদুরস্ত জামাকাপড় ছিটেয় ভরে গিয়ে চিত্তেবাঘ হয়ে ওঠে, তখন ওদের মুখের চেহারা দেখে সবচেয়ে আমোদ লাগে।

রামা এখনও হি-হি করে হাসছে। নরসিং প্রাণপণে আত্মসংবরণ করেছিল, এবার সেও হাসতে আরম্ভ করলে।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে। এইবার পাথর দেওয়া রাস্তা। চালাও। স্পীড বাড়ালে নরসিং। সময় সংক্ষেপের জন্য নয়, ভাল রাস্তায় জোরে চালাবার আরাম অথবা আনন্দের

জন্য। সময় এখন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টিতে উঠেছে। কুড়ি মিনিট বেশী লেগেছে। সে জন্য প্যাসেঞ্জারদের অভিযোগ নাই, চোখ আছে তাদের, তারা দেখতেই পায়, অবুঝ নয়, বুঝতেও পারে এবং বিবেচনাও আছে তাদের—বিরক্তি হয়তো বোধ করে, কিন্তু তাদের চেয়ে বিরক্তি বোধ করে নরসিং নিজে। সাত মাইল রাস্তা আসতে যদি পঁয়ষট্টি মিনিটই লাগে তবে আর মোটর চালিয়ে লাভ কি ?

—রোখো, এই, রোখো।

পথের ধারে জামাকাপড়ের উপর হ্যাট মাথায় দিয়ে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ও কে ? ও! শ্যামনগরের মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ারবাবু।

হুঁ। বুঝেছে নরসিং ব্যাপারটা। তখনই বার বার বারণ করেছিল নরসিং—

—ওরে রামা, একটা গাদা থেকে নিস না। পাঁচ জায়গা থেকে নিলে ধরতে পারবে না।

—রোখো!

রুখলে নরসিং।—নমস্কার বাবু। কোথাও যাবেন নাকি ? সীট রাখতে হবে ?

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠে ওভারসিয়ার এর উত্তরে বললে—তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব। তোমার সহিসের লাইসেন্সের মাথা খেয়ে দোব আমি। বদমাস পাজী লোক কোথাকার!

নরসিংয়ের পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের প্রান্তদেশ পর্যন্ত একটা ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। গিরবরজার ছত্রী-রক্তের এটা স্বভাব-ধর্ম।

কিন্তু তার আর একটা অভ্যাস-ধর্ম জন্মেছে। ড্রাইভারি-কর্ম করতে করতে ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, এস-ডি-ও, এস-পি, ম্যাজিস্ট্রেট এদের ধমক খেয়ে সে ধমক হজম করার অভ্যাস। এই এখানে আবার যেটা হেতু, এস-ডি-ও বেত মেরেছিলেন। সেই বেত সে চেপে ধরে বলেছিল, মারবেন না স্যার। সেই হেতুটার মূলে তার যে অসহনশীলতা ছিল তার জন্যে নরসিং মনে মনে অনুশোচনা করে। মনে হয় বেতটা অমনভাবে চেপে না ধরলেই হত। আরও দু-চার ঘা বেত হয়তো মারত এস-ডি-ও, তারপর ক্ষান্ত হত, তাতে তার রাগটা পড়ে যেত। তা হলে এতকালের সহিস ছেড়ে এই কানামাটির দুর্গম পথে তাকে আসতে হত না। সাপ যে সাপ, তাকেও মানিয়ে চলতে হয় অবস্থার সঙ্গে। নরসিং এটা নিজের চোখে দেখেছে। একই দিনে একটা বেদে দুটো সাপ ধরেছিল, একটা ধরেছিল মাঠে—নরসিং সেখানে উপস্থিত ছিল, আর একটা ধরেছিল গ্রামে—নরসিংয়ের প্রতিবেশী বাড়িওয়ালা গড়াঞী মশায়ের বাড়িতে; দুটোই গোখরো, আকারে আয়তনে ঠিক এক। কিন্তু মাঠের সাপটার সে কি তেজ, বেদের হাতে চাদের মত করে ধরা ঝাঁপিটার উপর ছোবলের পর ছোবল মেরে নিজের মুখটাকে রক্তাক্ত করে ফেললে। আর গ্রামের সাপটা যেন মরা, মাথা দু-এক বার তুললে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নিজের দেহের পাকানো কুণ্ডলীর মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। নরসিং বলেছিল—ওটার জাত হল আসল গোখরোর জাত। আর এটা হল ঢোঁড়ার জাত বোধ হয়।

হেসে বেদে বলেছিল—"আজ্ঞে না, মাঠের সাপ আর গাঁয়ের সাপের এমনি তফাতই হয়

আজ্ঞে। মাঠের সাপকে মানুষের সঙ্গে তো ঘর করতে হয় না। মানুষের 'বেক্রম' জানে না। তাই একেবারে ফোঁসাচ্ছে। গাঁয়ের সাপ জানে, মানুষ কী। বুঝলেন আজ্ঞে, তাতেই ওরা মানুষের কাছে 'বেক্রম' দেখায় না। 'অ্যাবস্থার মত বেবস্থা' আর কি।"

গিরিবরজার ছত্রীর ছেলের রক্ত বংশধারা অনুযায়ী প্রথমেই চঞ্চলই হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তেই সে শান্ত হয়। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ওটা। নরসিং নিজেকে সংযত করবার জন্ম নির্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ওভারসিয়ারের দিকে। ওভারসিয়ার বললে—অ্যাঁ:, আবার চাউনি দেখ, যেন গিলে খাবে!

নরসিং এবার বললে—গিলে তো মানুষ মানুষকে খায় না; আপনি কিন্তু যে রকম করছেন তাতে মনে হচ্ছে ধরে মারবেন আমাকে। কেন বলুন দেখি? কি করলাম আমি?

—কি করলে? মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পাথরের গাদা থেকে তুমি পাথর নিয়েছ কেন হে বাপু?

—পাথর? ওই পাথর-কুচি?

—হ্যাঁ হে। ন্যাকা সেজো না। কেন নিয়েছ বল?

—খাবার জন্যে নিয়েছি। পাথর-কুচির ডালনা রেঁধে খেয়েছি। কি আর বলব বলুন? পাথর-কুচি চুরি! পাথর-কুচি চুরি করে আমি কি করব? আপনার কণ্ট্রাক্টরকে ধরুন গিয়ে। সে এখান থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় গাদা দিয়ে নতুন মাপ দেবে।

—দেখ হে, বেশী চালাকি করো না। যে দেখেছে, যে জানে, সে আমাকে বলেছে। এখানকার পাথর নিয়ে তুমি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাও, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের ফাটলে দাও। আমি সব খবর পেয়েছি।

—বেশ তো, যে দেখেছে সে আমার সামনে বলুক। আপনি তো দেখেন নাই, আপনার কথা তো প্রমাণ নয়।

ওভারসিয়ার এবার এগিয়ে এল। বললে—চল, মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে যেতে হবে তোমাকে। চেয়ারম্যানের কাছে যা বলতে হয় বলবে।

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—এখন আমার সার্বিসের সময়। এখন তো যেতে পারব না, যাব এর পরে। এর পর আপনার সঙ্গে দেখা করব।

'দেখা করব' কথাটা ইশারার কথা। ওরই মধ্যে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। গোটা পাঁচেক অন্তত খসবে। পাঁচ টাকার কমে রাজী হবে না ওভারসিয়ার। কথাটা সত্য। একটা খন্দকে দেবার জন্ম কয়েক ঝুড়ি পাথর-কুচি নিয়েছে নরসিং। মাথাব্যথা তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নয়, রাস্তা তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারদের কাছে ধোবির পরিষ্কার করতে নেওয়া কাপড়, ফাটে আর ছেঁড়ে তাদের কি আসে যায়? যারা হাঁটে রাস্তা তাদের, এখন সব চেয়ে রাস্তাটা আপনার হল নরসিংয়ের। দিনে তিন বার তিন বার ছ বার—এই সাত মাইল পথ তার মোটর ছোটে। একটা খন্দক ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, রাত্রের অন্ধকারে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার জন্ম জমা-করা পাথরের গাদা থেকে কয়েক ঝুড়ি পাথর নিয়ে সে খন্দকটায় দিয়েছে।

উল্লুক বেকুব রামা! একটা গাদা থেকে বেশী পাথর নিয়েছে। বার বার সে বারণ করেছিল। কিন্তু রামা সেই হি-হি করে হেসেছে, বলেছে—আপনি যেমন দাদাবাবু! দায় পড়েছে ওভারসিয়ারের।

নরসিং বলেছিল—মেম্বাররা দেখে যদি কেউ কৈফিয়ত চায়?

—তখন বলে দেবেন—গরুতে খেয়ে নিয়েছে। বলে সেই হি-হি করে হাসি।

নরসিংও হেসে ফেলেছিল। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। ও-জেলায় রাস্তায় কাঁকর দেওয়া হয়। ঠিকেদারের সঙ্গে ওভারসিয়ারের বন্দোবস্ত আছে। রাস্তায় কাঁকর আশী ফুট দিলে একশ ফুটের মাপ দেয় ওভারসিয়ার। চেয়ারম্যান কড়া হলে মধ্যে মধ্যে ইন্‌স্পেকশনে আসে, দু-দশটা গাদা চেক করে দেখে। কম হয়ই। কৈফিয়তে ওভারসিয়ার বলে, তিন মাস পড়ে আছে, ঝড়ে উড়েছে, জলে গলেছে. তারপর ধরুন মানুষ গরু ছাগল এদের পায়ে পায়ে চলে গিয়েছে।

ওখানকার লোকে কথাটার উপর রঙ চড়িয়ে বলে—গরুতে খেয়ে নিয়েছে।

ওভারসিয়ারও এখানে একটা কিছু রিপোর্ট দেবে আর কি! লোকসানের মধ্যে নরসিংয়ের পাঁচটা টাকা। আর আফসোস, জাত গেল পেট ভরল না। ঝুড়িকয়েক পাথর দিয়ে একটা খন্দক বন্ধ করেও সার্বিস চালানো গেল না। কাঁচা রাস্তা পাকা করতে গেলে যে পাথর লাগে সে চুরি করে সংগ্রহ করা যায় না।

কথাটা কিন্তু বলে দিলে কে? এইখানে কয়েক ঘর পশ্চিমা ডোম বাস করে। শহরে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই ওদের দুপুর রাত হয়ে যায়। মদের নেশায় খানিকটা হল্লা করে ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের তো এ চুরি দেখার কথা নয়। মেয়েগুলো অবশ্য জেগে থাকে। এদের মেয়েগুলো অত্যন্ত বিলাসিনী। পুরুষেরা মদে অচেতন হয়ে গেলে ওরা কান পেতে থাকে বাইরের ইশারার জন্য। শিসের শব্দ ভেসে আসে, টুপটাপ করে ঢেলা পড়ে। নরসিংয়ের মনটা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল—পাথর কোথায় গেল এর একটা ভাল কৈফিয়ত পাওয়া গেছে। ওই ডোমপাড়ার উঠানে এবং চারিপাশে ছড়িয়ে আছে। ডোম-মেয়েগুলোর সন্ধানে যারা আসে তারাই ইশারা জানাতে ঢেলা মেরে গাদা সাবাড় করে দিয়েছে। ওভারসিয়ার এ কথা শুনবে না, কিন্তু ওভারসিয়ারের এ কথা মিউনিসিপ্যালিটি শুনবে।

রামা হঠাৎ বললে—জানেন দাদাবাবু, এ কথা বলে দিয়েছে কে জানেন?

—কে?

—নেতাই। এ আপনার ওই শালার কাজ।

—নিতাই! নরসিং সোজা হয়ে বসল। ঠিক। এ আর কেউ নয়, ওই নিতাই। বেইমান নিমকহারাম হাড়ী ছোটজাতের বাচ্চা ওই শয়তানের কাজ। নিতাইয়ের ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়ে গেছে; রামেশ্বরোয়া এখন তার পরামর্শদাতা হয়েছে, সেই এখন তার মুরুব্বী, গার্জেন।

রামেশ্বরোয়ার তদ্বিরে ড্রাইভিং লাইসেন্স হয়েছে, একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছে রামেশ্বরোয়া। এখানকার এই শ্যামনগরের এক বাবু একখানা পুরনো 'লঝ্ঝড়' ফোর্ড গাড়ি কিনেছে। বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, প্রচুর মদ খায় আর আমোদ করে বেড়ায়, চেয়ারম্যানরা যা বলে তাতেই সায় দিয়ে যায়। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, ম্যাজিস্ট্রেটের তোষামোদ করে, রাত্রে ডোমনী নিয়ে আমোদ করে।

তারই সেই ফোর্ডগাড়িতে খোরাক-পোশাক আর পনেরো টাকা মাইনেতে ড্রাইভার হয়েছে নিতাই। রাম কহো! পনের টাকা মাইনে যার, সে আবার ড্রাইভার! নরসিং তাকে কম কি দিত—খোরাক দিত, বারো টাকা মাইনে দিত। পোশাক আর তিন টাকা বেশী মাইনে সে চাইলে নরসিং তাকে নিশ্চয় দিত। আর সে তো তাকে বলেছিল, লাইসেন্স করে দোব—দোব—দোব। নরসিংয়ের মনে হয়, নিতাইয়ের মত অকৃতজ্ঞ, এতবড় বেইমান দুনিয়ায় কখনও হয় নাই, হবে না। হাড়ীর বাচ্চা গরুর রাখালি করে, নয়তো মাটি কেটে কিংবা লাঙল ঠেলে জীবন যেত; বড় জোর ইমামবাজারে বাবুদের বাড়িতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করত, ঘাস কাটত, ঘোড়ার ময়লা ফেলত মাথায় করে। সে-ই তাকে মোটরের কাজ শিখিয়েছে, ড্রাইভিং শিখিয়েছে। সে তাকে ড্রাইভিং শিখিয়েছিল বলেই না এই লাইসেন্স সে পেয়েছে! সে-ই তো তার গুরু। কলিকাল, পাপের কাল। একালে বেইমানিই হল গুরু-দক্ষিণা। নিতাই তার যা করেছে—তার আনুগত্য, তার প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম, সে সমস্তই নরসিংয়ের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। ঠিক কথা। ঠিক ধরেছে রামা। এ চুকলামি করেছে নিতাই। বেইমান নিমকহারাম ছোট জাতের বাচ্চা ওই নিতাই। নিতাই আসে ওই ডোমপাড়ায়। ডোমনী সংগ্রহের জন্য আসে। নিজের জন্যও আসে—মনিবের জন্যও। ওই কোনরকমে দেখে থাকবে। নিতাই-ই বলেছে তার মনিবকে, তার মনিব বলেছে ওভার-সিয়ারকে। বলুক। বলে কি করে দেখবে নরসিং!

'পাঁচঠো রুপেয়াকে কিস্মৎ।' বাস। "ডোমপাড়ায়—ডোমনীদের ইশারা দিবার জন্য ঢেলা মারিয়া মারিয়া পাথর গাদার পাথর শেষ করিয়া দিয়াছে। অমুক বাবুর ড্রাইভার নিতাই-চরণ হাড়ী ইহাদের একজন। রামেশ্বরোয়া ড্রাইভারও যায়।"

নিতাইয়ের বাবু মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার। বাবুর নামটা করতে পারে না ওভারসিয়ার। সে এখন থাক। সময় হলে সে নামও চাউড় হবে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট আসছে। কংগ্রেস নাকি এবার দাঁড়াবে। 'বন্দেমাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'! সে কি মাতন! নরসিং চিরদিন ভোটের সময় তার গাড়ি দিয়েছে কংগ্রেসকে। এবারও দেবে। কংগ্রেস এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও ভোটে দাঁড়াবে। সেখানেও সে গাড়ি দেবে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক টেনে গাড়িটা রুখলে নরসিং। সামনেই মদের দোকানটা। রাম বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। এই তো সবে ছটা বাজে। এখনও দুটো ট্রিপ বাকি। একবার যাওয়া—একবার আসা। ফিরে এসে নটার সময় দাদাবাবুর বোতল নিয়ে বসবার কথা। রাস্তা খারাপ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, এই অবস্থায় নেশা ধরলে অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে

যাবে। নরসিং সে দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করলে না। গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। রামকে ডাকলে—আয়।

—আর ট্রিপ দেবেন না?

—না।

—এ ট্রিপে কিন্তু লোক হত।

—ভাগ। আয়। পয়সা পয়সা করে তুই ক্ষেপে যাবি দেখছি। আয়। পয়সার ভাবনা আজ আর নরসিংয়ের নাই। মদ খেয়ে মেজাজকে তার চড়া স্বরে বাঁধবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পয়সা যেতেও আছে আসতেও আছে, দু-মাসে রোজগারও সে যথেষ্ট করেছে। খরচ-খরচা বাদে চারশ'র ওপর জমিয়েছে নরসিং। শুখনরামের টাকা সে ফেলে দিয়েছে। নরসিংয়ের আর কোন ঋণ নাই। পঞ্চাশের উপর টাকা তার হাতে। তা ছাড়া দরকার হলে শুখনরাম এবার তাকে পাঁচশ টাকা দেবে এক কথায়। টাকার জন্য আজ তার মেজাজ খারাপ নয়। আজ তার মেজাজ চায় গরম হয়ে উঠতে; এই দোকানে নিশ্চয় আসবে নিতাই রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে। সে আজ নিতাইকে একবার দেখবে। এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, দারোগা ও ওভারসিয়ার নয় নিতাই। হাড়ীর ছেলেকে সে-ই ড্রাইভার বানিয়েছে; দরকার হয়েছে আবার সে তার হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়ে ড্রাইভারি ঘুচিয়ে দেবে। ছেলেবেলায় হিতোপদেশে একটা গল্প পড়েছিল সে। এক মুনি তপস্যা করছিলেন—একটা ইঁদুরের বাচ্চা কাকের মুখ থেকে খসে পড়ল। বড় মায়া হল মুনির। মুনি তাকে বাঁচালেন। কিছুদিন পর বিড়ালে তাকে তাড়া করলে। মুনি তাকে বিড়াল করে দিলেন। বিড়ালকে তাড়া করলে কুকুরে। মুনি তাকে কুকুর করলেন মন্ত্রবলে। কুকুরটা বাঘের ভয়ে সারা হয়ে একদিন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনি তখন তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হয়ে ইঁদুরটার আস্পর্ধা বাড়ল; সে একদিন এল মুনিকেই খাবার মতলবে। তার মতলব বুঝে মুনি হেসে মন্ত্র পড়ে বললেন—ফের ইঁদুর হয়ে যাও। বাস! হয়ে গেল সে বাঘ থেকে সেই কুৎসিত ভীতু ইঁদুর, যে ইঁদুর গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

নিতাইয়ের দেখা পেলে না নরসিং।

—শালা! দুটো ট্রিপ লোকসান। এমন নেশার আমেজটা বরবাদ! একটা চরম উত্তেজনাপূর্ণ কিছু না করলে তার মেজাজ শান্ত হচ্ছে না। নটায় দোকান বন্ধ হল। নরসিং অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে এসে মোটরে বসলে। বিলকুল বরবাদ আজ। রাত্রে শুখনরামের সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিল। ইচ্ছা ছিল শেঠকে একখানা ট্রাক কিনবার জন্য ভজাবে। এতগুলো টাকা দু-মাসের মধ্যে ফেলে দেওয়াতে শুখনরামও একটু বিস্মিত হয়েছে। সে যা বলেছিল সেটা তার কানে এখনও বাজছে।' শেঠ বলেছিল—বাস্, জী? দু মাহিনার অন্দরে টাকাটা শুধে ফেললেন সিংজী? কেয়াবাৎ! তবে শেঠ লোক ভাল, সুদ এক পয়সা নেয় নি। বলেছে, আপনি আমাকে অনেক কাম দিয়েছেন—আপনার পাশে সুদ নিলে ধরমকে কি

কৈফিয়ত দিবে মোশা ?

নরসিং বলেছিল—নামুন না আপনি সুদ্ধ। দেখিয়ে দিই একবার।

—আচ্ছা—হেসেই কথাটা বলেছিল শেঠজী।

শেঠ নামলে—এখানকার মোটর কোম্পানির সঙ্গেও নরসিং পাল্লা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিল কথাটা আজ পাড়বে। কিন্তু এখন সেও মদ খেয়েছে। শেঠও বসেছে নেশায়, সিদ্ধি খেয়েছে বিকেলে, তার পর চরস, তার পর গাঁজা। এখন আর কথাবার্তার জুৎ হবে না। বরবাদ হয়ে গেল সব।

মোটরের হেড লাইটে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডাটা। একটা গাড়িকে ধাক্কা মারলে কি হয় ? এক শিকারী শিকারে গিয়ে বাঘ ভালুক কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কাক মেরেছিল গুলি করে। তেমনিধারা নিতাইয়ের বদলে ঘোড়ার গাড়িটাকে—। কিন্তু হাত অত্যন্ত কৌশলে গাড়িগুলোকে পাশে রেখে নিরাপদে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা বাঁয়ে রেখে মোটর কোম্পানির আফিস পিছনে ফেলে গাড়ি মোড় ফিরল। ওই শুখনরামের গদির পাশে তার আস্তানা। আঃ! টর্চ ফেললে কে ?—কে ? গাছতলায় কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?—কে ? এগিয়ে গেল নরসিং।

—নরসিং! চিনতে পার আমাকে ?

—কে ?

—ইমামবাজার থানার পাশে থাকতাম আমি। পুলিসের কন্‌স্টেবলরা ভাড়া দেয় না বলে—

—বাবু! ডেটিনিউবাবু! অনন্তবাবু!

—চুপ কর। আস্তে কথা বল।—বাবু নিজেই এগিয়ে এলেন নরসিংয়ের খুব কাছে।

এবার মুখে হাত আড়াল করে খানিকটা সরে এসে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলে নরসিং। ভদ্রলোক হেসে বললেন—মদ খেয়েছ তার জন্ত লজ্জা করতে হবে না। কাছে এস।

—বলুন।

—আমাকে ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে। সাড়ে এগারটার ডাউন ট্রেন। ভাড়া কি নেবে বল ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—আপনার জিনিসপত্র ?

—এই যা আমার সঙ্গে।

—আসুন।

ভদ্রলোক কাঁধের ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে দিলেন, মাথায় চাপিয়ে নিলেন টুপিটা। চেপে বসলেন গাড়িতে। চল। তার পর বললেন—তোমাকে তো বলতে হবে না। আমার এখানে আসার কথাটা যেন—

নরসিং গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললে—ঠিক আছে বাবু।

গাড়ি ছুটল। নরসিংয়ের নেশা নরসিংকে আজ বাঘের মত সাহস এনে দিয়েছে। হেড লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর, পোকা উড়ছে আলোর মধ্যে। দু ধারে বন।

গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গল। হু-হু করে গাড়ি চলছে। ডেটিনিউবাবু। নরসিং জানে, ওঁদের জিজ্ঞাসা করতে নাই, কোথায় এসেছিলেন, কোথায় যাবেন—এসব কথা। দু-তিন বার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। এও সে জানে যে, পুলিস পিছনে আসতে পারে মোটর হাঁকিয়ে। সামনে যদি আসে তবে সে যদি পয়দলে থাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে নরসিং।

স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে নরসিং জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, শরীর ভাল আছে?

—হ্যাঁ। পাঁচ টাকার একখানি নোট বার করে বাবু নরসিংয়ের হাতে দিলেন। নরসিং নিজের ব্যাগ খুলে বার করলে একটি টাকা। বাবুর কাছে এক পয়সা ভাড়া বেশী নিতে পারবে না সে। বাবু হেসে বললেন—না, রাখ।

—আজ্ঞে না বাবু, আপনার কাছে—

—মিষ্টি খেয়ো, আমি দিচ্ছি। মদ খেয়ো না কিন্তু। বাবু হেসে স্টেশনে ঢুকে গেলেন।

পনেরো

এই এরা এক মানুষ। দুনিয়ার মানুষের জাতের মধ্যে এদের জাত আলাদা। দেশের মধ্যে এমন মানুষ তো সে দেখলে না, যারা এদের না ভালবাসে, না খাতির করে। পুলিস যে পুলিস—যারা এদের ধরে, যারা এদের আটক রাখে তারাই কি এদের কম খাতির করে, কম ভালবাসে? পুলিস হলেই সে খারাপ লোক হয় না, ভাল আর মন্দ নিয়ে দুনিয়া, পুলিসের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে; ভাল যারা তাদের কথা ছেড়েই দেয় নরসিং; চাকরি নিয়েছে পুলিসের—ডিউটি করতেই হয়, ডিউটি করেও তারা এই সব বাবুদের ভালবাসে। ছোটখাটো অনেক দোষ ঢেকে নেয়। তা ছাড়া ছোটখাটো ব্যবহারে যে ভালবাসা দেখায় সে সব নরসিং চোখে দেখেছে। নিজের বাসার ভাল জিনিসটির একটু ভাগ এঁদের না দিয়ে তারা খায় না। নজরবন্দী অবস্থায় বাবুরা পুলিসের কাছে যে সব আবদার করে সে সব আবদার রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। ভাল লোক পুলিসের কথা বাদ দেয় নরসিং। মন্দ লোক পুলিস—যারা বাঁকা পথ ছাড়া চলে না, নিজের চাকরি আর পকেট ছাড়া কিছু জানে না—তাদেরও দেখেছে এদের খাতির করতে। এই বাবুরই একবার জ্বর হয়েছিল—বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন জ্বরে। সে এক বদমাশ দারোগার আমল। সেই বদমাশ দারোগাকে বাবুর মাথার শিয়রে বসে থাকতে সে দেখেছে চিন্তিত মুখে। নরসিংয়ের গাড়িতে তিনি স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়েছিলেন সদরে—বাবুকে সদর হাসপাতালে পাঠাবার মঞ্জুরীর জন্য। নিজের কানে দারোগাবাবুকে বলতে শুনেছে নরসিং—মরে গেলেও এ সব লোক তো আক্ষেপ করবে না, কিন্তু আমি চোখে দেখব কি করে? পরকালে জবাবই বা কি দোব? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল নরসিং; এই দারোগাবাবুটিরও পরকালের ভাবনা আছে, এর মুখেও এমন কথা বার হয়! অনেক ভেবে দেখেছে নরসিং। শুকনো গাছে ফুল কখনও ফোটে না। কিন্তু—"হরিনামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে।" এ সব মানুষের গুণই এই।

বাবু এল প্রথম ইমামবাজারে। কদিন পরেই এক হুলুস্থুল কাণ্ড। ইমামবাজারের জনচারেক বাবুভাই মদ খেয়ে গরীব বোষ্টমপাড়ার মেয়েদের স্নানের পুকুরের ঘাটে নেমে হল্লা করছিল। এটা ওরা বরাবরই করত। বোষ্টমরা নিরীহ ভিখারীর জাত—হাতজোড় করে ফল পায় নাই, ভদ্র মাতব্বরদের কাছে গিয়েও কিছু হয় নাই ; পুলিসের কাছে তারা যায় না ওখানে তাদের যাওয়ার অভ্যাস নাই কোন কালে। শেষে ওরা সব সহ্য করে যেত। বাবুরা হল্লা করে পথ দিয়ে গেলে ঘরের মধ্যে ঢুকত, ঘাটে নামলে ঘাট থেকে উঠে আসত। উঠে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাটে আর নামত না। অনন্তবাবু বেরিয়েছিলেন···হঠাৎ সেদিন তাঁর নজরে পড়ল এমনিধারা কাণ্ড। চারজনে ঘাটে নেমে হাতমুখ খোয়ার অছিলায় হল্লা করছে, কয়েকটি মেয়ে ভিজে কাপড়ে রাস্তার এক পাশে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, একটি মেয়ে বেশী জলে ছিল। সে উঠতে পারে নি—মাথায় ঘোমটা টেনে নীরবে একগলা জলে সে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের লোক পুরুষ পুরুষ ধরে যে ব্যবহার সয়ে আসছে, অনন্তবাবুর তা সহ্য হল না। তিনি গিয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু এখানকার বাবুদের ছেলে—বনগাঁয়ের রাজা শেয়ালের বাচ্চা—তার উপর মদ খেয়ে মাতোয়ারা অবস্থা—তারা একেবারে মারতে এল অনন্তবাবুকে। ব্যস—লেগে গেল লড়াই। চার শেয়াল হলে কি হবে! এ বাবুরা হল—শের মানে বাঘের জাত। অনন্তবাবু বক্সিং জানেন। ঘুষির চোটে চারজনকে তিনি 'ভানুমতীর খেল' দেখিয়ে দিলেন। তার পর সে অনেক হাঙ্গামা। দরখাস্ত, মামলা করবার হুমকি—অনেক কিছু। দারোগা তখন যে ছিল, সে ছিল ভাল লোক। সে অনন্তবাবুর পক্ষ নিলে। আর বাবুর কপাল জোর—কালেক্টর ছিলেন ভারী তেজী, অল্প বয়স, তিনি এসে সমস্ত শুনে বাবুদের ছেলেদের লাঞ্ছনার বাকি রাখলেন না। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অনাচার চলে আসছিল, ওই বাবুটি একদিনে বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়। ওই জাতভিখারী বোষ্টমের লাঞ্ছনা সহ্য করে যে পিঠ বেঁকে গিয়েছিল, সে পিঠ সোজা করে তারা দাঁড়াল।

তার পর বাবু কদিনের ভেতর প্রায় গোটা গ্রামকে জয় করে ফেললেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর প্রাণখোলা হাসি আর মানুষের সঙ্গে আলাপ করার ক্ষমতা—এই তিনটি মূলধন। তবে আসল মূলধন—অন্যায় হলে তাকে রুখে দাঁড়ানোর অভ্যাস আর ক্ষমতা। নরসিংয়ের—নিজের—। সামনেই একটা বাঁক ঘুরে শহরে ঢুকবার তে-মাথার মোড়। মোড়টা দেখে বিদ্যুতের মত একটা কথা মাথায় খেলে গেল। ওই তে-মাথার মোড়ে একজন পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে। হেড লাইট নিবিয়ে দিলে সে। রাম বললে—দাঁড়ালেন যে ?

—হুঁ। নরসিং বললে—শহরে ঢুকব না।

—ঢুকবেন না ?

—না। পাঁচমতি চলে যাব সটান।

—পাঁচমতি ?

—হ্যাঁ। চুপ করে বসে থাক্। নরসিং গাড়ি ঘুরিয়ে—একটা কদর্য গেঁয়ো রাস্তা ধরে

শহরকে পাশে রেখে সতর্ক মন্থর গতিতে চলতে আরম্ভ করলে। রামাকে বললে—টর্চটা জেলে মাঝে মাঝে পথটা দেখে নে।

আর একটু নেশা হলে ভাল হত। কিন্তু উপায় নাই। পাঁচমতিতে পৌঁছে দোস্ত সুরেশের কাছে গাঁজার ভরসা একমাত্র ভরসা। তবে আজ নজরবন্দী বাবুকে পৌঁছে দিয়ে মেজাজটা তার ভারী খুশী হয়েছে। ভারী খুশী। সমস্ত শরীর চনচন করছে, মাথার ভিতরটা এই বাদলার মধ্যেও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এই ধরনের ট্রিপ না-হলে ট্রিপ!

শ্যামনগরের এলাকা পাশে-পাশে পার হয়ে সে এসে উঠল বাদশাহী সড়কে। এইবার জেলে দিলে হেড লাইট। চল পাঁচমতি। রাতটা কাটাতে হবে দোস্ত দাসের ওখানে। তাকে বলতে হবে—লাস্ট ট্রিপে পাঁচমতি থেকে বেরিয়ে মাইল দুয়েক গিয়েই গাড়ির মাথা বিগড়েছিল। সেই তখন থেকে টর্চের আলোয় খুট-খাট্ খুটুর-মুটুর করে শয়তানকে সোজা করে পাঁচমতিতেই ফিরে এল। শ্যামনগর পর্যন্ত ছ মাইলের ঝুঁকি নিতে সাহস হল না। দু-মাইল পথ পাঁচমতি আর দোস্ত যখন এখানে রয়েছে তখন আর ভাবনা কি? কথাটা পাখিকে শেখানোর মত শিখিয়ে দিতে হবে রামাকে।

নরসিং আন্দাজ করতে পারে, দোস্ত সুরেশ দাস কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। সে বললে—আলবৎ, জরুর। নইলে আবার দোস্তি কিসের? আমার ঘরও যা তোমার ঘরও তাই। যা ঘরে আছে একমুঠো—একমুঠোই সই, তাই তিনজনে ভাগ করে খাব, একটা বিছানায় তিনজনে শোব। ব্যস।

বলেও সে উনোনে নতুন করে আঁচ দেবে। ময়দা মাখবে। আলু কুটবে। বেশী উৎসাহ হলে এই রাত্রেও সে একটা বোতল অন্তত যোগাড় করে আনবে।

রামা বলে উঠল—দাদাবাবু!

নরসিং তার আগেই দেখেছে। সমস্ত শরীরে তার রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। গাড়ি সে মুহূর্তে থামিয়ে ফেললে; হেড লাইট নিভিয়ে দিলে। দুটো প্রকাণ্ড বড় সাপ। রাস্তার দু-মাথায় পরস্পরের দিকে মুখ করে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নরসিং বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা কি! এই আকাশভরা মেঘের অন্ধকারের মধ্যে রিমিঝিমি বাদলের আমেজে ভরা খানা ডোবার কলরবমুখর ব্যাঙেদের লোভ ভুলে আর-এক টানে এসে রাস্তার দু-মাথা থেকে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাম ভয় পেয়ে গেল, বললে—আলো নিভিয়ে দিলেন কেন?

—কড়া আলো চোখে লাগলে ভয় পাবে। সাপের চোখে পাতা নাই।

—কিন্তু—

—ধ্যাৎ, বুঝতে পারছিস না, জোট খেতে এসেছে! টর্চটা আল। দে আমাকে দে।

অত্যন্ত সাবধানে জ্বাললে সে টর্চটা। এমনভাবে শূন্যলোকে ফেললো আলো যেন মাটির উপর না পড়ে, অথচ তার আভায় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। হাঁ, ওই যে! ঠিক মাঝ-রাস্তায় দুটো লতার মত পরস্পরকে পাক দিয়ে জড়াজড়ি করে লেজের উপর ভর দিয়ে

দাঁড়িয়েছে। এই পড়ে গেল মাটিতে। ওই আবার জড়িয়ে নিচ্ছে। ওই উঠে দাঁড়িয়েছে ফের লেজের উপর ভর দিয়ে। এমন খেলা নরসিং আর দেখে নাই কখনও। এর আগেও সে সাপের জোটখাওয়া দেখেছে। সে দিনের বেলা আর সে সাপ ছিল ছোট। এই এমন অন্ধকার বাদলা রাত্রে ঘন জঙ্গলে দুপাশ ভরা বাদশাহী সড়কের মত জায়গায় অজগরের মত সাপ-সাপিনীর এমন পাগলের মত খেলা করা সে নয়। হিস-হিস গর্জনে একেবারে মাতিয়ে তুলেছে জায়গাটা। যেমন হোক আলোর আভা পড়েছে—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মোটরের ইঞ্জিনটা চলছে, তার শব্দ উঠছে, পেট্রোলের ধোঁয়া ভিজে ভারী বাতাসে নীচে-নীচেই ঘুরছে—কিছুতেই গ্রাহ্য করছে না তারা। আ-হা-হা, ওই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে জড়াজড়ি করে—ফণা মেলে মুখে মুখে যেন মুখে মুখ দিয়ে তুলছে! নরসিংয়ের সমস্ত শরীরে একটা কি বয়ে যাচ্ছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই বিষধর-বিষধরীর লীলাতরঙ্গায়িত দেহের দিকে। কি হিল্লোল!

রাম বললে—দাদাবাবু!

খেলতে খেলতে সাপ দুটো পাশের জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। আর দেখা যায় না। রাম নরসিংকে ডাকলে। নরসিংয়ের এখনও যেন হুঁশ হয় নাই। তার মনের মধ্যে উন্মত্ত কল্পনা চলেছে; নীলিমা আর ফট্‌কি, ফট্‌কি আর নীলিমা।

রাম বললে—দাদাবাবু, চলুন।

—তুই চালাতে পারবি গাড়ি?

রাম চমকে উঠল। এই অন্ধকারে এই রাস্তায় তাকে গাড়ি চালাতে বলছেন দাদাবাবু! কিন্তু সে দাদাবাবুর সাকরেদ, সে কি 'না' বলতে পারে? সে বললে—আপনি পাশে বসে থাকবেন—ভয় কি? খুব পারব।

নরসিং তাকে সীট ছেড়ে দিয়ে বললে—ঘুরিয়ে নে গাড়ি।

—ঘুরিয়ে নেব?

—হাঁ, শ্যামনগর।

কিছুদূর এসেই নরসিং আবার তাকে বললে—সর্, ছেড়ে দে আমাকে। এমন করে যেতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এবার গাড়ি ছুটল। নরসিং পাগল হয়ে গিয়েছে।

পরণাম গিরিধারী সিং, পরণাম তোমাকে, জান্‌কী জান্‌কী, মাপ করিস তুই নরসিংকে—কসম সে রাখতে পারছে না। পারবে না।

গাড়িটাকে নিয়ে সে ঝড়ের মত এল ক্রীশ্চান-পাড়া ঢুকবার রাস্তার মুখে। কিন্তু এখানে এসে খানিকটা দমে গেল। নীলিমাকে এই রাত্রে সঙ্গিনী কল্পনা করতে তার মন কেমন ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব মনে হচ্ছে। গাড়িটাকে নিয়ে সে আবার ফিরল। এসে দাঁড়াল শেঠের বাড়ির এলাকায় নিজের আস্তানায়। গাড়ি থেকে নেমে সে অকারণ হর্ন দিতে লাগল।

ঘুম ভাঙবে না ফট্‌কির?

শেঠের সিন্দুকের মত বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোন সাড়া নেই।

নরসিং বাড়িটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। মধ্যে মধ্যে ঢেলা তুলে বন্ধ জানালায় ছুঁড়ে মারতে লাগল।

রামা গাড়ি তুললে—বাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী গ্যারেজের মধ্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল দাদাবাবুর জন্য। কিন্তু দাদাবাবু ক্ষ্যাপার মত ঘুরছেই। এবার সে সাহস করে দাদাবাবুর হাত ধরে বললে—আসুন, শোবেন।

—ছাড়্!

—না। শেষে কেলেঙ্কারি হবে একটা। আসুন শোবেন।

নরসিং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরেটা তার যেমন মোটরের তেলে কালিতে পেট্রোলের ধোঁয়ায় তাতে জ্বলছে—ভিতরেও তেমনি দাহ। সে আজ নিজেকে সামলাবার এক্তিয়ার হারিয়েছে।

রাম বললে—কাল। কাল আমি তাকে এনে দোব।

নরসিং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। রাম তার হাত ধরে ঘরে এনে কলসী থেকে জল ঢেলে মাথা ঘাড় ধুইয়ে দিলে। তার পর খাবার দিলে। খাইয়ে তাকে শোয়ালে।

পরদিন সকালে উঠেই সে গেল জোসেফের বাড়ি।

নীলিমা তাকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললে—এমন চেহারা কেন আপনার?

নরসিং রাঙা চোখে তার দিকে চেয়ে হাসলে।

নীলিমা বললে—সমস্ত রাত্রি মদ খেয়েছেন বুঝি? আপনারা—। সে ঘাড় নেড়ে বললে—ড্রাইভারি করলে তাকে এই করতেই হবে? বসুন, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।

সে আর তার কাছেই এল না। নরসিং দশটা বাজতেই মদের দোকানে গিয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলে বাড়ি ফিরল। সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত পড়ে রইল। রামা তাকে স্নান করালে, খাওয়ালে, বিছানায় শুইয়ে দিলে। সন্ধ্যেবেলা উঠে সে স্নান করে পরিপাটী করে বেশভূষা করে আবার গেল জোসেফের বাড়ি। জোসেফ মাকে ডাকলে—মিস্টার সিংকে চা খাওয়াও মা।

—নীলিমা কোথায়?

—সে গেছে পড়তে—রেভারেণ্ড ব্যানার্জীর বাড়ি।

একটু চুপ করে থেকে নরসিং বললে—দোকানে যাবে না?

—না। আনিয়ে রেখেছি। খাবে নাকি?

—অল্প। আজ অনেক খেয়েছি।

—চা থাক মা। জোসেফ ভেতরে নিয়ে গেল নরসিংকে।

অল্প নয়। তবে সকালের তুলনায় অল্প খেয়ে বাসায় ফিরে নরসিং বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর দাঁড়াতে পারছে না সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরেই ঘুমোচ্ছিল সে। হঠাৎ তীব্রতর চাঞ্চল্য এবং শিহরণ খেলে গেল তার সর্বশরীরে—একটা স্পর্শের আস্বাদে। সে রক্তরাঙা চোখ মেলে চাইলে। তার বুকের উপর মাথা রেখে শুয়েছে কট্‌কি। বাইরে মেঘ ডাকছে। রিমিঝিমি বৃষ্টি হচ্ছে। রামা ডাকলে—দাদাবাবু, উঠুন, খান কিছু।

খাবারের থালা সামনে নামিয়ে দিয়ে সে বললে—আমি গ্যারেজে গাড়িতে শুচ্ছি গিয়ে।

নরসিং উঠে বসল। চোখের সামনে তার সাপ ছুটোর খেলা করার ছবি নাচছে।

ষোল

একটা বাদলা আসন্ন। 'দেবতা মুখ নামিয়েছে কাল থেকে'—অর্থাৎ আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ফিনফিনে বৃষ্টি আসছে; 'ধরতি'র (ধরিত্রীর) চেহারা হয়েছে যেন অভিমানিনী কালো বউয়ের মত; কালো বউটি যেন মুখ নামিয়ে বসে আছে। আকাশের গায়ে জমাটবাঁধা মেঘের কোলে কোলে হালকা পেঁজা তুলোর মত ঘন কালো রংয়ের মেঘ ছুটছে, আসছে, চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, সন-সন করে যাচ্ছে, কলকাতার পিচের পথে 'থার্টি-ফর্টি মাইল স্পীডে চলে যেমন 'লাইট ইঞ্জিন'-ওয়ালা দামী গাড়ি তেমনি ভাবে চলেছে। বাতাসটা বন্ধ হয়ে একবার গুমোট ধরলেই জোর বৃষ্টি নামবে।

সাহুজীর বারান্দায় ভিজে কাপড় হাওয়ায় উড়ছে। একখানা রঙ্গিলা ছিটের শাড়ি, দুখানা মিলের—একখানা ডুরে, একখানা খুব চওড়া কালাপেড়ে; ওরই মধ্যে দুখানা ধুতি সরুপাড় নিয়ে মিন্‌মিন্ করছে। এক পাশে একখানা আধময়লা থান কাপড়। ওখানা কট্‌কির কাপড়, নরসিং চিনতে পারছে। সাহুজীর টিনের ছাদের আলসের কোণে একটা কাক বসে আছে, এদিক ওদিক ঘুরছে, মাথা কাত করে নীচের জিনিস দেখছে, মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে গলার নরম ফ্যাকাসে পালকগুলো ফুলিয়ে বসে থাকছে। নরসিংয়ের মনেও বেড়ে আমেজ লেগেছে। সকালে এখনও আবগারীর দোকান খোলে নাই; খুললেই একবার যাবে সেখানে, একটা পাঁট অন্তত নিয়ে আসতে হবে। একটা বোতলে এক ঢোক পড়েছিল, সেইটুকুই খেয়ে আমেজ করে বসে নরসিং সিগারেট ফুঁকছে। একটা পাঁট আর আধ সের মাংস, তার সঙ্গে চালে ডালে খিচুড়ি। ভাবছে, ছাগল ভেড়ার মাংস না এনে একটা হাঁস আনবে কি না। হাঁস আনলে হাঙ্গামা আছে—পালক ছাড়ানো, কাটাকুটি করা, নাড়ীভুঁড়ি ঘাঁটা, এগুলি হাঙ্গামা তো বটেই, তার উপর নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে। গ্রিজ, মোবিল, পেট্রোল, গাড়ির তেল-কালি নাড়তে নরসিংয়ের গা ঘিনঘিন করে না, কিন্তু এই সব নাড়ী ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে না সে। রামা থাকলে ভাবনা ছিল না, সে-ই সব করত। রামা নাই, আজ সাত-আট দিন হল বাড়ি গিয়েছে। বাড়ি তো হতভাগার চুলোয়, গিয়েছে ইমামবাজার, সেই নেকড়ানী

পিসি—নরসিংয়ের মামীর কাছে। ফিরবার পথে গিবুবরজা হয়ে ফিরবে বলে গিয়েছে।

মাসখানেকের কাছাকাছি আজ শ্যামনগর-পাঁচমতি সার্ভিস বন্ধ। বাদশাহী সড়ক কাদায়-জলে খানা-খন্দকে ভরে উঠেছে—গাঁওল-গায়ের গরু-মহিষ-চলা গো-পথকেও হার মানিয়েছে। ভাড়াটে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানগুলো এখন লাফাচ্ছে—লম্বা লম্বা বাত্ বলছে। তাও সেদিন বড় বৃষ্টিটার পর তিন দিন এরাও ওপথে হাঁটতে সাহস করে নাই। গত বছর নাকি একটা বড় কাদায় একখানা গাড়ি পড়ে যাওয়ার ফলে একটা বলদ ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কসাইখানার পাইকারকে বেচে দিতে হয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির পক্ষীরাজগুলো কিন্তু বেঁচেছে কিছুদিনের জন্য। চারিদিকে এখন দল-দাম-ঘাসের সমারোহ, সামনের পা-দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কোচওয়ানেরা তাদের ছুটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে; বেটারা সব খুব খাচ্ছে। হাড়পাঁজরা-সার ঝুরঝুরে চেহারাগুলো এরই মধ্যে একটু-আধটু চেকনাই মেরেছে যেন। ইমামবাজার থেকে সদর শহরের সড়কের পাশে কাঁকুরে মরুভূমির মত ডাঙায় বর্ষার সময় কচি কচি পাতলা ঘাস বেরিয়ে ফিকে সবুজ হয়ে ওঠার কথাও মনে পড়ে নরসিংয়ের।

এক সারি গরুর গাড়ি আসছে, তুই উঁচু করে কাঠ বোঝাই করেছে। গঙ্গার তীর—অফুরন্ত জঙ্গল কাটছে, বোঝাই করে নিয়ে আসছে। তা আসুক; কিন্তু রাস্তার দফারফা করে দিলে উল্লুক গাঁইয়ার দল। ওদের দেখলে গা জ্বলে যায় নরসিংয়ের। নরসিংয়ের এক এক সময়ে ইচ্ছে হয়, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস তুলে দিয়ে মাল-বওয়ার সার্ভিস খোলে, কার বিক্রি করে দিয়ে ট্রাক। না না, মফঃস্বলে চলবে না ইণ্টারন্যাশনাল মহাপ্রভু! চোরাবালিতে হাতী বসে যাবে। হালকা মজবুত ট্রাক চাই। নানান ধরনের গাড়ির কথা মনে হয়। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল নরসিং। গাড়ির সারির পাশে পাশে—ছাতা মাথায় দিয়ে লোকটা কে? থানার সিপাহী মনে হয় যেন! মুখ দেখা যাচ্ছে না, পায়ের জুতোজোড়াটা ভোঁতা নাগরা; কাপড় সেঁটে লেগে রয়েছে পায়ের সঙ্গে, হাঁটুর নীচে অবধি নেমেছে কোনরকমে; গায়ের পাঞ্জাবিটায় বগলের কাছে তিনটে সেলাই রয়েছে যেন। তা ছাড়া এমন-হুজুর দুলে চলা তো যার গরব নাই, গরম নাই তার সম্ভবপর নয়। গরব আর গরম তো পুলিসের একচেটিয়া।

হ্যাঁ ঠিক। চামোরী সিং সিপাহী। নরসিংয়ের ভুল হয় নাই। সকাল বেলায় চামোরী সিং কোথায় চলেছে! বুকটা তার ধক করে উঠল। মাসেক খানেকের কদিন বেশীই হবে—রাত্রের অন্ধকারে সে ডেটিনিউবাবুকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, কথাটা তার মনে পড়ে গেল। নড়ে-চড়ে বসল নরসিং। খবর পেয়েছে নাকি?

বেইমান ছোটলোকের বাচ্চা নিতাই। ওই শূয়োর-কি-বাচ্চারই কাজ নিশ্চয়। সেদিন বেটা চুকলামি করতে এসেছিল। এসে রামাকে বলেছিল; তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় নাই। বেঁচে গিয়েছে হারামজাদা নিমকহারাম। নরসিংকে বলতে এলে, থাপ্পড় লাগাত তাকে নরসিং। হারামজাদ নিমকহারাম! দুনিয়াতে কুত্তা যে কুত্তা—সেও কখনও বেইমানি করে না, নিমকহারামি করে না। শুধু কুত্তা কেন, কোন জানোয়ারই নিমকহারাম নয়। গরু

ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, মহিষ মনিবকে কখনও ভুলে যায় না। মনিব বিক্রি করে, জানোয়ার যেতে চায় না সে বাড়ি থেকে, চিৎকার করে, মাথা নাড়ে, জোর করে বেঁধে নিয়ে গেলে কাঁদে —চোখ দিয়ে জল পড়ে। আর মানুষকে একটুকরো এঁটো রুটি বেশী দাও, ব্যস্! তোমার নিমক ভুলে তার গোলাম হয়ে যাবে।

নিতাই রামাকে বলেছিল—গুরুজীর ছামনে যেতে আমার ডর লাগছে ভাই। তু বলিস গুরুজীকে। খুব পেরাইভেটে বলে গেলাম তোকে। পুলিস বোধ হয় পিছু লেগেছে গুরুজীর।

পুলিস এসেছিল তার মনিবের কাছে। অনন্তবাবু ডেটিনিউ এখানে এসেছিল, সে খবর পুলিস পেয়েছে। নিতাইয়ের বাবুর এক ভাগ্নের কাছেই এসেছিল বলে তাদের বিশ্বাস। পুলিসের ধারণা রাত্রের মোটরবাসে এসেছিল অনন্তবাবু। কিন্তু কোথায় কোন দিকে সে চলে গেল সে খবর তারা পাচ্ছে না। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল নিতাইকে—বাবুর মোটরে করে সে বাবুকে পৌছে দিয়ে এসেছে কিনা। নিতাই সত্য কথাই বলেছে। গাড়ির চাবি থাকে বাবুর কাছে। বাবুর হুকুম ছাড়া সে যাবে কি করে? নিতাইয়ের বাবুকে তারা অবিশ্বাস করে না। বাবু আংরেজ-সরকারের খয়ের-খাঁ। রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ার লোভে কুকুরের মত জিভ দিয়ে জল পড়ে। সাহেবদের খানা খাওয়ায়, তাদের হুকুমে চাঁদা দেয়, তাদের হুকুমে নাচে। সত্যি সত্যি নাচে। একজন সাহেব এসে নাচিয়ে গেছে তাদের। চুলিতে ঢোল বাজাত—বাবুরা সব নাচত। বাবুর কথায় বিশ্বাস করে তারা নিতাইকে রেহাই দিয়ে ফিরে গিয়েছে। নিতাইয়ের কিন্তু আশঙ্কা হয়েছে নরসিংয়ের জন্ত। তাই সে বলতে এসেছিল রামাকে। আসল কথা, নিতাই-ই অনন্তবাবুকে নরসিংয়ের সন্ধান দিয়েছিল। বাবুর ভাগ্নের কাছেই এসেছিল অনন্তবাবু। হঠাৎ দেখা হয় নিতাইয়ের সঙ্গে। নিতাই-ই তাকে নরসিংয়ের আস্তানার কাছে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শালা এ জানলে—নরসিং কখনও—। না—না। অনন্তবাবুকে 'না' বলতে পারবে না। দেশের জন্ত যে বাবুরা ফাঁসি যায়, জেল খাটে, নজরবন্দী হয়ে থাকে—তাদের কি কখনও কেউ 'না' বলতে পারে? তাদের ভাইবেরাদার—যত মোটর-ড্রাইভারকে সে জানে তারা কেউ 'না' বলে না। ও-জেলার সদরে মোটরসার্ভিস কোম্পানির মালিক দুর্দান্ত বুধাবাবু—সরকারের খয়ের-খাঁ পুলিসের দোস্ত। তার সার্ভিসের ড্রাইভারেরাও চেনা স্বদেশীবাবুদের এমন কত সাহায্য করে। বুধাবাবু জানতেও পারে না। অনন্তবাবু শুধু স্বদেশীবাবুই নয়, বাবু তার যে উপকার করেছেন সে কথা নরসিং ভুলতে পারে না। ইমামবাজারে এসেছিল এক বদলোক দারোগা—তার আমলে পুলিস বিনাভাড়ায় যাওয়া-আসা করত, আবার জবরদস্তি করে চোখ রাঙাত। সমস্ত শুনে একদিন অনন্তবাবু দরখাস্ত দিলে উপরে, গেজেটে ছাপিয়ে দিলে। ব্যস্ সব ঠাণ্ডা। এর ফলে নরসিংকে একদিন একটা তুচ্ছ কারণে থানায় ডেকে তাকে অপমান-লাঞ্ছনা করবার উদ্যোগ করেছিল দারোগা-জমাদার-কনস্টেবলরা। থানার পাশেই ছিল ডেটিনিউবাবুদের বাসা। অনন্তবাবু হাসতে হাসতে এসে বসলেন থানায়, বললেন—হিতোপদেশের গল্পের অভিনয় হচ্ছে বুঝি? দেখতে এলাম তাই। তারপর বললেন—সেই গল্পটা নিশ্চয়ই! নেকড়ে

ও মেষশাবক! সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেয়েছিল নরসিং। সে কথা কি ভুলতে পারে নরসিং?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। চামোরী সিং এসে সাহুজীর গদির সামনেই দাঁড়াল। আসুক চামোরী সিং—নরসিং ঠিক আছে। সে-পথ সে বন্ধ করে রেখেছে। বাবুকে পৌছে দিয়ে শ্যামনগর ঢুকবার মুখে কথাটা তার হঠাৎ মনে হয়েছিল—সে শ্যামনগরের বাজারে ঢুকবার পথ ছেড়ে শ্যামনগরকে পাশে রেখে একেবারে সেই ঝাড়ুদার ডোমপাড়ার ওপার দিয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ ধরে বাদশাহী সড়কে উঠে সটান পাঁচমতি যাবার মতলব করেছিল; কিন্তু সেই সাপ দুটো—সাপ আর সাপিনী তাকে জাদুতে ভুলিয়ে ফিরে পাঠালে শ্যামনগর। তার জন্য তার আপসোস নাই, তবে সেদিন পাঁচমতি গেলেই ভাল হত। তবে পথ সে বন্ধ করে রেখেছে। সুরেশ দাশকে সকল কথা বলে অনুরোধ করেছে যে, এনকোয়ারী হলে তাকে বলতে হবে—সে রাত্রে নরসিং পাঁচমতিতে সুরেশের দোকানে ছিল। সুরেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক। দোস্ত বললে—সে নিজের প্রাণ দিয়ে তাকে বিপদ আগলে রক্ষা করবে। রামাও হুঁশিয়ার ছত্রীর ছেলে। সুতরাং ভয় তেমন নাই। কিন্তু হঠাৎ পুলিস দেখলেই চমকে ওঠাটা এখনও যায় নাই। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!' আবার কোথা দিয়ে কি ভাবে কোন্ সুতো যে টেনে বার করবে কে জানে! আজ সে আশঙ্কা ফলে গেল। খুব জোরে সিগারেট টানতে লাগল সে।

—এ সিং, এ ডেরাইবর সাব! চামোরী সিং তার নাম ধরেই ডাকছে। উত্তর দিতে গিয়ে গলায় আওয়াজ আটকে গেল নরসিংয়ের। আই-বি আপিসের গল্প শুনেছে সে অনেক। ভয়ঙ্কর গল্প।

—এ নরসিং সিং!

কোনমতে নরসিং এবার জবাব দিলে—কে?

—আরে বাহার আসো মোশা।

নরসিংয়ের পা কাঁপছে। বোতলগুলো বেবাক খালি।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সে বাইরে এল।

চামোরী সিং বললে—আজ তিন বাজে কালেক্টর সাব আইবন, ডিস্টিক্ট বোডকে চেয়ারম্যান আইবন। পাঁচমতি সড়ককে লিয়ে দরখাস হইয়াছে, ইনকুয়ারী হোবে। তুমার পর হাজির হোনেসে হুকুম হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে নরসিং কেমন হয়ে গেল। এমন আকস্মিকভাবে এক মুহূর্তে ভয়ের শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে অভাবনীয় আনন্দের মধ্যে সে জীবনে কখনও আসে নাই।

চামোরী সাহুজীকে হাঁকতে লাগল। সাহুজীকে কেন? চামোরী বললে—দরখাস্ করনেওয়ালাদের মধ্যে সাহুজীও একজন। উনকে বোল দেনা ভাইয়া।

—আলবৎ আলবৎ। জরুর—জরুর বোলেঙ্গে। সাথমে লে যায়েঙ্গে।

চামোরী সিং চলে গেল। নরসিং নিজের ঘরের মধ্যে এসে কি করবে ভেবে পেলে না। অথচ এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ না করে সে কোনমতেই স্থির থাকতে পারছে না। ফট্‌কিকে পাবার এখনও উপায় নাই। জোসেফের বাড়ি যাবে? জোসেফ আছে, মেরী

নীলিমা আছে। চা খাওয়াবে মেরী নীলিমা। জোসেফ মদ খাওয়াতে পারে।

'পাঁচমতি সড়ককে নিয়ে দরখাস্ হইয়েছে।'—দরখাস্তের কথা সে জানে, সে-ই তার উদ্যোক্তা। কিন্তু দরখাস্তে ফল হবে এমন প্রত্যাশা সে করে নাই। কিন্তু লেগেছে দরখাস্ত। ব্যস্—। ঢেলে দাও পাথর—দাও বিছিয়ে ছ ইঞ্চি পুরু করে। তার উপর দাও মোরাম লাল কাঁকর। চালিয়ে দাও রোলার বাস্—উ—উ—উ—উ—ভর—র—র—র—উ—উ—উ। ভোঁ—ভোঁ—ভোঁপ। সোজা স্টিয়ারিং ধরে একসিলারেটরে পা চেপে বসে থাক; ছুটুক গাড়ি বিশ-পঁচিশ মাইল স্পীডে, ঘুরুক পাক দিয়ে চারিপাশের বন-জঙ্গল মাঠ, নেহাত পাশের গাছগুলো সড়াক সড়াক করে পিছনে ছুটে চলে যাওয়ার মত—পিছনে পড়ে থাক্। আনন্দের সঙ্গে অকারণ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে নরসিং একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জোসেফের বাড়ির দিকে চলল।

দুখানা ট্যাক্সি—না, একখানাকে বদলে একখানা বাস্। তার পর একখানা কার—ট্যাক্সি—তার পর একখানা ট্রাক। জোসেফকে একের তিন অংশ। এ দিলেও কি মেরী নীলিমাকে পাওয়া যাবে না? ওরা ক্রীশ্চান। হলেই বা। নরসিং জাত মানে না। নরসিংয়ের জাত অনেক দিন মরে গিয়েছে। নিতাইয়ের সঙ্গে খেয়েছে, রহমানের সঙ্গে খেয়েছে, জোসেফের সঙ্গে খেয়েছে, তার আবার জাত! জাত তার নাই—তার থাকবার মধ্যে যা আছে সে তার পেট আর তার 'মটরোয়া' ট্যাক্সি-কার, আর যদি তোমাকে পায় তবে স্ত্রী—। ফিন্ ফিন্ করে বৃষ্টি পড়ছে মুখে-চোখে, বাতাসে লম্বা চুলগুলি উড়ছে, জামাকাপড় ভিজছে। ভিজুক।

আগে পাঁচমতির সড়ক নিয়ে দরখাস্ত ছিল মামুলী ব্যাপার। সেই যে-কাল থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পত্তন হয়েছে সেই কাল থেকে সড়কটার জন্য প্রতি বৎসর একখানা, কোনবার বা তিন-চারখানা। আগে আগে দরখাস্ত করতেন বাবুলোকেরা—জমিদার উকিল কেলাসের বাবুরা, জমিদারের মামলা-মকদ্দমার জন্য তাঁদের নিজেদের যাওয়া-আসার অসুবিধা হত, মধ্যে মধ্যে নিজেদের যেতে হত, উকিলবাবুরা শনিবার বাড়ি আসতেন, তাঁদের অসুবিধা হত। শ্যামনগরে আদালত যে-কাল থেকে বসেছে সেই কাল থেকেই পাঁচমতি থেকে আদালতের আমলা সরবরাহ হয়ে আসছে। তারা অবশ্য হেঁটে যাওয়া-আসা করত, তারা দরখাস্তে সই করত না। তখন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজপ্রতিনিধি দণ্ড-মুণ্ডের মালিক, সরকারী কেরানীদের অন্নদাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের সামিল। সুতরাং দরখাস্তে সই করে তাঁর রোষনয়নে পড়তেও চাইত না এবং নিমক খেয়ে নিমকহারামির পাপ থেকেও পরিত্রাণ পেত। দরখাস্তের ফলে খানা-খন্দক বুজিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলা হত, কাদা হত একহাঁটু। এক ইঞ্জিনিয়ার কাদার মধ্যে গাছের ডাল কেটে দেবার ব্যবস্থা করে মগজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার পর কাল পাল্টাল; গঙ্গার ধারে রেল লাইন পড়ল, ঘাটরোড স্টেশনে নেমে শ্যামনগর হয়ে এ অঞ্চলে যাওয়া-আসার যাত্রীর সংখ্যা বাড়ল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা এল ভিড় করে। তখন ঘোড়ার গাড়ির নাম ছিল 'কেরাচী'। সাইকেল

উঠল। দেখতে দেখতে বছর দশেকের মধ্যে সাইকেলে পাঁচমতি-শ্যামনগর ছেয়ে গেল, পাড়াগাঁয়েও দু-চারখানা ঢুকল। কয়লা, কেরোসিন তেল, কলের লণ্ঠন, কাচের চুড়ি, চা আর সাইকেল—এ কয়েক দফা দেশে এল যেন বর্ষার বন্যার মত। এসেই দেশ ছেয়ে ফেললে। দুশ আড়াইশ থেকে দেখতে দেখতে একশ—আশী—পঞ্চাশ, আজ তো জাপানী সাইকেল তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়; রঙ-চটা, কট কট শব্দ করে চলে এমন পুরনো সাইকেল পনের টাকা, দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। লটারি তো লেগেই আছে—এক টাকা টিকিট। কেরানীবাবুরা প্রায় সবাই একখানা করে সাইকেল কিনে ফেললে। তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হল নন-অফিসিয়াল চেয়ারম্যান। এবার কেরানীবাবুরাও দরখাস্ত দিতে শুরু করলেন। ক্রমে পল্লীগ্রাম থেকেও দরখাস্ত পড়তে আরম্ভ হল। দরখাস্ত বাড়ল, কিন্তু রাস্তায় মাটি কমল। লোকে বলে—চুরি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বলে, চুরি করবে কি? টাকা কোথায়? জেলায় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হিসেব করে দেখা যায়···বাংলার জেলাগুলির মধ্যে তৃতীয় কি চতুর্থ, কিন্তু আয়ের হিসাব করলে তালিকার প্রায় শেষে এসে পড়ে। আমরা কি করব? প্রশ্ন ওঠে, অফিসিয়াল চেয়ারম্যান থাকতে যে মাটিটা পড়ত তা আসত কোথা থেকে? উত্তর আসে, আমরা ধনীর মুখের দিকেই তাকাই না, ধনীর নিয়ে দরিদ্রের কল্যাণ করাই আমাদের ব্রত, কয়েকটা বড় রাস্তার উপর নজর না দিয়ে আমরা পল্লী-উন্নয়ন করছি। যা হোক, এতই যখন চিৎকার উঠছে তখন এক শত টাকা বেশী বরাদ্দ হল।

এমনি ভাবেই চলছিল। এমন সময় দেশে এল মোটর-বাস। কলকাতা থেকে বাইরে আসতে আরম্ভ করলে। এখানে শ্যামনগর থেকে ঘাটরোড স্টেশন পর্যন্ত পাকা রাস্তা, সেখানে মোটরবাস সার্ভিস হল। প্রথম প্রথম উকিলবাবুর বেকার ছেলে, মদ্যব্যবসায়ী সাহাদের আধুনিক ছেলে পুরনো কার নিয়ে ট্যাক্সি চালাতে আরম্ভ করলে। তার পর একজন কাপড়ের দোকানদার করলে প্রথম বাস। তার পর হল আরও খানদুয়েক। তার পরই এল এই কোম্পানি, যাদের বাস্-সার্ভিস এখন চলছে ঘাটরোড থেকে শ্যামনগর। ঘোড়ার গাড়িগুলো হার মেনে ঘাটরোড ছেড়ে পাঁচমতির দিকে মোড় ফেরালে। এবার বাবুরা যাঁরা কাজের জন্যে শ্যামনগর থাকতেন তাঁরা ডেলীপ্যাসেঞ্জারি আরম্ভ করলেন। যাতায়াতও বাড়ল। জমিদারেরা, বাবুরা ব্যবসাদারেরা যাঁরা পাল্কি অথবা গরুর গাড়ি চড়ার ভয়ে যথাসম্ভব কম যাতায়াত করতেন তাঁরা 'কেরাচী' গাড়ির সুযোগ পেয়ে বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শ্যামনগরে এসে কাজ-কর্ম নিজে দেখে-শুনে সেরে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরতেন। গ্রামের লোকেরাও কেরাচী গাড়িতে আট আনা পয়সা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলে। এবার দরখাস্ত ছাড়াও খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ছাপা হতে আরম্ভ হল—'শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তার দুরবস্থা'। অফিসার সাহেবদের তখন মোটর হয়েছে। তাঁদের মোটরে ধুলোকাদা লাগায়, কখনও-সখনও অ্যাকসেল ভাঙায়, তাঁরাও নোট দিতে আরম্ভ করলেন। এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড চঞ্চল হল খানিকটা। একশ'র জায়গায় সাময়িক বরাদ্দ দুশ-আড়াইশতে উঠে গেল। এই ভাবেই চলে আসছিল, এবার নরসিং এসে ট্যাক্সি সার্ভিস খুলে গোলযোগ বাড়িয়ে

দিয়েছে। এবার দরখাস্তের জোর খুব। এতখানি নরসিং প্রত্যাশা করতে পারে নি। নরসিং নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল ক্রমশ। সময় তার ভাল এসেছে। নইলে এই সময়টিতেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড মোটর কোম্পানি থেকে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্যে টাকা পাবে কেন? অদ্ভুত যোগাযোগ! আমেরিকায় যারা মোটর তৈরী করে, তারা অনেক টাকা দিয়েছে ভারতবর্ষে মোটরের রাস্তার উন্নতির জন্য। সে অনেক টাকা—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি! সেই লক্ষ নিযুত অর্থাৎ অনেক লক্ষ টাকা এখানকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পেয়েছে। দরখাস্ত এবং টাকা…দুয়ের যেখানে মিল হয়েছে সেখানে ভাবনা কোথায়?

জোসেফদের একদফা চায়ের আসর উঠে গিয়েছিল। সাধারণত বাসী রুটির সঙ্গে হাঁসের ডিম আর একটু চিনি সহযোগে প্রাতরাশ হয়ে থাকে, দুখানা করে রুটি জনপ্রতি বাঁধা বরাদ্দ। রাত্রে জোসেফ রুটি খায়। ক্রীশ্চান হয়ে অবধি ওদের সংসারে এই বিধিটা চলে আসছে। পুরুষেরা রাত্রে রুটি খায়—আটার রুটি। পাঁউরুটি রবিবার ছাড়া পাওয়া যায় না, তার উপর নিত্যব্যবহারে খরচও কিছু বেশী পড়ে, তাই দেশী রুটিতেই ভাতবর্জনের কাজটা সারতে হয়। ক্রীশ্চান হওয়ার দ্বিতীয় পুরুষে অর্থাৎ জোসেফের পিতামহ দু বেলাই রুটি চালিয়েছিল নবীন অনুরাগে। কথাটা উপহাসের নয়। ক্রীশ্চান হয়ে এই পরিবারটি দ্বিতীয় পুরুষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে, অতি উগ্রভাবে এ দেশীয় খাদ্য-পোশাক-ভাষা সব বর্জন করে—এ দেশের লোকদের থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পৃথক হতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর বাহিরে দু-দিক দিয়েই সে চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মে চলেছিল। বাইবেল সযত্নে তোলা থাকত; ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে এবং গির্জায় ফাদারের প্রার্থনা শুনে যথাশক্তি আধ্যাত্মিক দিকটা পরিপুষ্ট করত। সেই পুরাতন খাদ্যাখাদ্য বর্জন করে নূতন-ধর্ম-অনুমোদিত খাদ্য গ্রহণের প্রচেষ্টায় বাড়িতে পাঁউরুটির ব্যবস্থা হয় প্রথম; তারপর ক্রমে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং পাঁউরুটির দুষ্প্রাপ্যতার বদলে দেশী রুটির ব্যবস্থা হয়। মেয়েদের কিন্তু ভাত ভিন্ন তৃপ্তি হত না, রুটি তাদের বরদাস্ত হত না। বাংলাদেশে হাড়ী ডোম বাউরী প্রভৃতিদের মধ্যে আজও শূকরপালনের রেওয়াজ আছে, শূকর মুরগী হাঁস তাদের জীবিকার একটা প্রধান উপায়; শূকর-মাংসও তারা খায়। খাদ্যের দিক দিয়ে হ্যাম-ফাউল-ডাকে তাদের অসুবিধে হয় নি; ক্রীশ্চান হয়ে বীফ্ ধরেছিল। প্রথম-পুরুষে বীফে মেয়েদের ঘৃণা হত; দ্বিতীয়-পুরুষে সেটা অবশ্য সয়ে গিয়েছে। তৃতীয়-পুরুষ থেকে তারা খাঁটি ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চানে পরিণতি লাভ করেছে। একবেলা ভাত একবেলা রুটি—সুক্তো-চচ্চড়ির সঙ্গে রাই-সরষের গুঁড়ো—সপ্তাহে তিনবার মাছ—দু-তিন দিন মাংসের বিলিতী রান্নার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে। মেয়েরা কয়েকদিন দু-বেলাই ভাত খায়, দু-তিন দিন—ওই মাংস যে কয়েক দিন হয়—সেই কয়েক দিন খায় রুটি। সদর শহরে যাওয়া-আসার সুযোগ হলে পাঁউরুটি আসে, সেদিন একটা মুরগী অথবা হাঁস মেরে রান্না হয়। পার্বণ ইত্যাদিতে সমারোহে বিলাতী রান্না চলে—মুরগী হাঁস পাঁউরুটি—তার সঙ্গে

মেয়েরা বাড়িতে তৈরি করে স্যাণ্ডউইচ, কেক, পুডিং। মুরগী চালান যায় এ অঞ্চল থেকে, তাই মুরগীর ডিম বেশী খাওয়া হয় না, হাঁসের ডিমটা সকালবেলায় প্রাতরাশে ব্যবহার করে।

সকালে জোসেফ চা খায় বিছানায় শুয়ে। জোসেফের মা পাকা গৃহিণী। নীলিমার ঝোঁক রাত্রে রুটির দিকে হলেও মার ঝোঁকে ভাত খেতেই বাধ্য হয় নীলিমা। নীলিমার মা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত স্থূল—সে আকারেও বটে প্রকারেও বটে। নীলিমা ম্যাট্রিক পাস করে সব দিক দিয়ে সূক্ষ্ম হতে চেষ্টা করে, প্রায়ই সে কেক তৈরি করে; নীলিমার মা আপত্তি করে হার মানলেও সেগুলিকে যথাসম্ভব বাসী না করে দেয় না। কাচের জারে পুরে চাবি দিয়ে রেখে দেয়। পাউরুটি আনলে তাও লুকিয়ে রাখে, অন্তত পাঁচ দিনের আগে খেতে দেয় না। নীলিমা তাগিদ না দিলে মধ্যে মধ্যে দু-একখানা পাঁউরুটি দশ-পনেরো দিনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—ফেলে দিতে হয়।

জোসেফের মা প্রথম দিন নরসিংকে অভ্যর্থনা করেছে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে। গিরবরজার ছত্রী সিংরায়দের গল্প তার স্বামীর সংসারে তিন পুরুষের রঙ-ধরানো গল্প। সেদিন নরসিং ছিল তার কাছে সেই গল্পের দেশের মানুষ। তার পর ব্যবহারিক জগতের মেলামেশার মধ্যে নরসিং যখন নিতান্তই সাধারণ মানুষ বলে চোখে ঠেকল, তখন তার সম্ভ্রম উবে গিয়ে তার স্থানে জন্মাল সর্বস্বান্ত মূর্খ বড়লোকের ছেলের উপর সাধারণ মানুষের যে আনন্দদায়ক উপেক্ষা এবং ঘৃণার মনোভাব—সেই মনোভাব। সেই মনোভাব আরও প্রখর হয়ে উঠেছিল নরসিংয়ের সঙ্গে নীলিমার হৃদ্যতার অভিব্যক্তিতে। নরসিংয়ের গাড়িতে ইস্কুলে যায়, নরসিং এলে সে হেসে কথা কয়, চা তৈরি করে দেয়—এটা তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছিল। আজ শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তা পাকা হচ্ছে এবং সেই রাস্তায় একখানা মোটর-বাস্, একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক নিয়ে ব্যবসার পরিকল্পনা এবং সেই ব্যবসায়ে জোসেফের মাকে অন্তত একের-তিন অংশ দিতে চাওয়ার প্রস্তাবে জোসেফের মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। অন্যদিন সে ভদ্রতার খাতিরে তার বিরক্তি নরসিংয়ের সামনে প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু অবিরত চেষ্টা করে মেয়েকে আড়াল করে ফিরতে।

আজ সে মেয়ের সামনেটা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে পায়ের গাঁট টিপতে আরম্ভ করলে। বোধ হয় আজকার এই সামনে ছেড়ে দেওয়াটা তার নিজের কাছেই অশোভন ঠেকছিল বলে—গাঁটের সামান্য ব্যথাটা হঠাৎ রাত্রি থেকে বেড়ে উঠেছে, এই ছলনার আশ্রয় করলে। কথাটা প্রকাশ না করে বললে—পাছে পা টেপার অভিনয়টা বোধগম্য না হয় এই ভেবে জোসেফ ও নরসিংয়ের কথার মধ্যেই সে ব্যাঘাত দিয়ে বললে—তোমাদের তো পাঁচমতির রাস্তা পাকা হচ্ছে, মোটর চালাবে আরামসে, রোজগার করবে। আমি কিন্তু ওই কালীঠাকুরের থানে যাবার রাস্তাটার জন্যে একটা দরখাস্ত করব। দিবি তো নীলি আমার একটা দরখাস্ত লিখে! উঃ বাবা—বাতের ব্যথায় মরে গেলাম। যত বেতো রুগীদের নিয়ে দরখাস্ত সই করাব আমি। বলে সে হি-হি করে হেসে উঠল।

নীলি খুব চতুর মেয়ে। বয়স হলে অবশ্য সকল মেয়ের মনেই অন্তত এদিক দিয়ে কিছু

চতুরতা স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায় এবং বয়স্কদের কাছ থেকে শেখে—নারীজীবনেরই এটা ঐতিহ্য ; নীলি এ সব বিষয়ে বিশেষ চতুরতা শিক্ষা পেয়েছে তার সহকর্মিণী অর্থাৎ মিশনের গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছে। মনোবিদ্যার যুগ এটা—মনের খবর নিয়ে এ যুগের সভ্যতা-সম্মত বাঁকা এবং চোখা বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের যে মনোবিলাস চলে সে বিলাস সন্ত-তরুণী নীলির খুবই ভাল লাগে। এগুলি সে শোনে না—গেলে। গেলা জিনিস সে হজম করেছে। মায়ের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেললে নীলি।

বাঁকা দৃষ্টি এবং মুচকি হাসির ওজন কম কিন্তু ধার বেশী ; ব্লেডের মত দাগ টানলেই গভীর ক্ষত হয়ে যায়। মায়ের মনে লাগল। মা বলে উঠল—ওই হাসি দেখতে পারি না। দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

—চোখ বন্ধ করে পা টেপ না কেন ? আরামটা ভোগ করতে পারবে বেশী। এ হাসিও দেখতে হবে না।—নীলিমা আবার তেমনি ভাবে তাকিয়ে তেমনি হেসে উত্তর দিলে।

মা এবার চিৎকার করে উঠল—হে ভগবান, আমার মরণ হোক—আমার মরণ হোক, আমার মরণ হোক। আমাকে নাও তুমি—আমাকে নাও। দয়া নাই—মায়া নাই—আমি বাতে মারা যাচ্ছি—আমার—। এর পর আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে সে হাঁউ হাঁউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নাটা অবশ্যই অভিনয় নয়—মেয়ের ওই ধারালো আঘাতের যন্ত্রণা যত না হোক তার উপযুক্তমত উত্তর দিতে না পারার ক্ষোভের পীড়ন কান্নার পক্ষে যথেষ্ট।

জোসেফ হাসতে লাগল। সেও মাকে জানে। নীলি চা করছিল তৃতীয় দফায়। এর আগে একদফা চা-ডিম-কেক দিয়ে চা খাইয়েছে নরসিং এবং জোসেফকে। সেই খাওয়ার মধ্যেই ব্যবসাবাণিজ্যের কথা এবং শ্যামনগর-পাঁচমতি রাস্তা সম্পর্কে গুপ্ত তথ্য অর্থাৎ মোটর-কোম্পানির দেওয়া টাকা পাওয়ার কথা জোসেফ তাকে বলেছে। নরসিং তাকে বলেছে নিজের ব্যবসার পরিকল্পনার কথা। চায়ের কাপ জোসেফ ও নরসিংয়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে সেও এক কাপ চা নিয়ে বসল—মায়ের এই হাঁউ-মাউ কান্নার জন্তে বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হল না। ব্যস্ত হয়ে উঠল নরসিং। ভদ্রতার খাতিরেও বটে এবং নীলিমার মাকে সন্তুষ্ট করতে চায় বলেও বটে। সে বললে—কালীথানের বাতের ওষুধ বুঝি খুব ভাল ? তা চলুন না একদিন—একটু রোদ উঠুক, রাস্তা-ঘাটটা একটু শুকিয়ে যাক—চলুন, আমার গাড়ি তো বসেই রয়েছে।

এক কথাতেই মা খুশী হয়ে গেল। চোখের জল মুছে বললে—বেঁচে থাক তুমি বাবা, তোমার উন্নতি হোক অনেক করে। তোমার সঙ্গে থেকে যদি জোসেফের উন্নতি হয় সেই আমার ভরসা। তোমার বাবার কত বড় বংশ—তোমাদের কত মান—কত নাম—কত ডাক! শ্বশুরের কাছে শুনতাম—গায়ে কাঁটা দিত।

নরসিং একটু স্ফীত হল অহঙ্কারে, একটু তৃপ্তি হল তার। এর বেশী কিছু না। কোন আক্ষেপ বা ক্ষোভ—এসব আর জাগে না। অনুভব করতে পারে না।

জোসেফ উঠে বললে—যাই, স্নানটা সেরে নিই। মেঘলা করে থাকলেও বেলা অনেক হয়েছে। আজ আবার সায়েবের নায়েব আসবে। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে ঘাটরোড স্টেশন।

ওপার থেকে নৌকোয় আসবে। নিজের গাড়িটি আনবে না। ভারী চালাক।

নরসিং হেসে বললে—পাঁচমতির সুরেশ দাস—আমার বোইম মিতে বলে, বাবার বাবা!

জোসেফ বললে—এ বেটা কালেক্টর বড় খট্‌মেজাজী লোক। তারপর নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললে—তোদের ইস্কুলে যাবে নাকি?

—কি জানি!

—তা হলেও একটু পরিষ্কার হয়ে যাস। তোর ভাল সেলাই কিছু নিয়ে যাস।

হেসে নীলিমা বললে—আমাদের ইস্কুলে ভিজিটর এলে "টেল দি ম্যান টু কাম্ টু মি"-কে পার হয়ে আর কিছু দেখতে হয় না!

নীলিমাদের মিশন গার্লস্ ইস্কুলে প্রধানা হলেন খাটি ইংরেজ-মহিলা। নীলিমাও তাঁর ছাত্রী। সরু গলায় তাঁর ইংরেজী উচ্চারণের জন্য "টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি" এই লাইনটিই তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পথে ভদ্রলোকের ছোট ছেলেরা তাঁকে দেখলে কণ্ঠস্বর মিহি করে বলে—"টেল দি ম্যান্ টু কাম্ টু মি।" মেমসাহেব হাসেন।

জোসেফ চলে গেল।

নরসিং উঠল, বললে—তা হলে আমিও চলি।

মা বললে—বসো বাবা বসো একটু। নরসিংকে বসতে বলে সে নিজে উঠে খোঁড়াতে ভুলে গিয়ে সহজ পায়েই হেঁটে চলে গেল।

নীলিমা হেসে উঠল সশব্দে।

নরসিং বললে—কি?

—মা খোঁড়াতে ভুলে গিয়েছে। বাত-বাত বলছিল না?

—ও! নরসিং কিন্তু বুঝতে পারলে না ব্যাপারটার কিছুই। বুদ্ধির সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে নরসিংও স্থূল!

বাইরের দরজায় বাইসিক্লের ঘণ্টা বেজে উঠল।—ড্রাইবর সব!

এস-ডি-ওর আর্দালী। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল নীলিমা।

হিন্দুস্থানী মুসলমান চাপরাসী নীলিমাকে দেখে হেসেই বললে—কালেক্টর সাব আসবেন আজ, ড্রাইবর সাবকো জলদি যানে বলিয়েছেন সাব।

নীলিমা উত্তর দিলে—গোসল কর রহে হেঁ। তুরন্ত যাইয়ে গা। সে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে।

আর্দালী এবার নরসিংকে বললে—তুমনে ভি তলব দিয়া সাব। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে চেয়ারম্যান আওর মেম্বার ভি আইয়ে গা। উনকে লিয়ে গাড়ি লেকে যানে কো হুকুম দিয়া সাব।'

মুহূর্তের জন্য পা থেকে মাথা পর্যন্ত চিন্ চিন্ করে উঠল নরসিংয়ের। জিভের ডগায় এসে গেল—নেহি যায়ে গা—যাও—বোল দো তুমহারা সাবকো, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করলে সে। পাঁচমতি-শ্যামনগর রাস্তা ভাল হলে তার বাস্ চলবে—ট্যাক্সি চলবে—ট্রাক চলবে! আরও মনে পড়ে গেল ইমামবাজার—জংসন স্টেশন সদর শহর সার্ভিস—তার সোনার

সার্ভিস। মেজাজের জন্যই তার সে সার্ভিস গিয়েছে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—যাও সাবকো বোলো—ঠিক টায়েমমে যায়েঙ্গে হম।

নীলি একটু হাসলে। নরসিং এবং দাদার উপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে তার। ওই আর্দালীটা ওদের 'তুম' করে কথা বলে।

নরসিং বললে—তা হলে চলি এখন।

—আচ্ছা।

নরসিং গাড়িটা নিয়ে বাজারে এসে দাঁড়াল। ঘাটরোড—ঘাটরোড স্টেশন। গাড়িটা তো খালিই যাবে, যদি দুটো-চারটে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায়! তাই পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা। যা হয়! ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড চেয়ারম্যান ভাড়া দেবে হয়তো, কিন্তু কি দেবে কে জানে! নাই যদি দেয় তাই বা কি করতে পারে নরসিং? কলকাতাতেই ট্রামে-বাসে কনস্টেবলরা ভাড়া দেয় না। এই সব কথা মনে হলে তখন সে আপনার মনেই চিৎকার করে বলে, দূর দূর দূর! ছোটলোকের কাম—বেইজ্জতিকে কারবার! দূর কর শালা, দূর কর।

—গুরুজী! পাশেই এসে দাঁড়াল একখানা ফোর্ডগাড়ি। নিতাই ড্রাইভ্ করছে।

নরসিং কথা বললে না। মুখ ফিরিয়ে রইল।

নিতাই বললে—আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। জোসেফের গাড়িতে ম্যাজিস্টর, আপনার গাড়িতে চেয়ারম্যান, আমার গাড়িতে বাবুর সঙ্গে মেম্বর-টেম্বররা আসবেন।

নরসিং তবু কথা বললে না।—হারামজাদ বেইমান কাঁহাকা! পনের টাকা মাইনের ড্রাইভার—বগলস আঁটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা! তোর সঙ্গে কথা কইবে নরসিং?

নিতাই বললে—আমার ওপরে খুব রেগেছেন, নয়?

—না নাঃ। রাগ-টাগ কারুর ওপরে আমার নাই।

নিতাই একটু চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা সেলাম। গাড়িতে তেল নিতে এসেছি। চলে গেল সে গাড়ি নিয়ে।

যাবার সময় নিতাই এল সব শেষে। গাড়ির মধ্যে তার বাবু। নিতাই হর্ন দিয়ে হাত নেড়ে ইশারা করছে পথ দাও। পথ ছেড়ে দিলে নরসিং। নিতাইয়ের বাবু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর। নিতাই খুব জমকালো পোশাক পরেছে। আসবার সময়েও নিতাইয়ের গাড়িকে তার পথ ছেড়ে দিতে হল। নিতাইয়ের বাবুর গাড়িতেই এলেন চেয়ারম্যান। বন্ধুলোক। নিতাইয়ের বাবু যেমন মদ খায় চেয়ারম্যানেরও তেমনি মদে ঝোঁক। কেউ কারও মুখের গন্ধ পায় না। তিক্ত ভাবে হাসতে হাসতে দুজন মেম্বরকে নিয়ে নরসিং সব চেয়ে পিছনে এল।

মিটিং—তদন্ত শেষ হল রাত্রি দশটায়। নরসিংয়ের মাথা ঝন্ঝন্ করছে, আগুন জ্বলছে। শয়তানের রাজত্ব! বেইমানের কাল! মর গিয়া! ধরমরাজ মর গিয়া! ভগোয়ান মর গিয়া! হে ভগোয়ান! বিলাত আমেরিকার কোম্পানি দিয়েছে লাখে লাখে টাকা—সেই

টাকাতেও পেট ভরছে না ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আর এই এখানকার কুমীর ওই বাস কোম্পানির। বলে—মনোপলি সার্বিস হোক, যে টাকা দেবে বছর বছর সেই পাবে সার্বিস। বছরে পাঁচ শ টাকা—রাস্তা মেরামতের জন্য। আপত্তি করেছেন এখানকার এস-ডি-ও। কেঁচে গিয়েছে মতলবটা, কিন্তু এ কি শয়তানি মতলব!

মদ সে প্রচুরই খেয়েছিল কোভে। টলতে টলতে ফিরল বাসায়।

শুখনরামের লোক বললে—শেঠজী আছেন ডাকবাংলায় চেয়ারম্যানের ওখানে। আপনাকে যেতে বলেছেন গাড়ি নিয়ে। আরে বাপ রে—ওই এক লোক! আজ শেঠজীর চেহারা দেখে নরসিংয়ের তাক লেগে গিয়েছে। হাকিম-চেয়ারম্যানের মধ্যে চেয়ারে বসে—মাথা উঁচু করে—কি বলছিল! সে মনোপলি সার্বিস সম্বন্ধে কথা বলে নাই, তবে রাস্তা পাকা করা নিয়ে খুব দামী দামী কথা বলেছে। মাল আনতে তার ভারী অসুবিধে হয়।

শেঠজীকে নিয়ে নরসিং পাগলের মত হাসতে হাসতে ফিরল। শেঠ আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। ধরাধরি করে তুলতে হল শেঠজীকে। হাসতে হাসতেই সে বাসায় ফিরল।

—কে? ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ও কে?

ফটকি!

সতেরো

মোটর-ড্রাইভারের দিনরাত্রি। দিনটা চলে উড়ে; রাত্রির খানিকটা অংশও দিনের সামিল। দু-হাতে ধরা থাকে স্টীয়ারিং, পায়ের তলায় থাকে ক্লাচ, একসিলারেটর, ফুটব্রেক, হাতের পাশে থাকে গিয়ারিং হ্যাণ্ডেল, হ্যাণ্ডব্রেক। চোখ থাকে পথের সামনেটায় নিবদ্ধ; স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি। নীচে থেকে ওঠে গরম ভাপানি, প্রায় বুক পর্যন্ত গরম ভাপানিতে সিদ্ধ হতে থাকে। নাকে অবিরল ঢোকে পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ। কানের দুপাশে, কপালে, সামনের চুলগুলোকে পিছনের দিকে উড়িয়ে বাতাস লাগে। সকাল-সন্ধ্যায় বাতাস ঠাণ্ডা, দুপুরে গরম,—গ্রীষ্মের দুপুরের বাতাসে মুখ জ্বালা করে, বর্ষায় লাগে জলের ছাট, শীতে কনকনে ঠাণ্ডায় মুখের চামড়া যেন অসাড় হয়ে আসে। দুপাশে কাছের জিনিস, বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মানুষ-জনই যেন পিছনে চলে যায় ছুটে; খোলা মাঠ হলে দূরের গাছপালা, গ্রাম, গরুবাছুর, মানুষ পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ছেদ পড়ে, গাড়ি থামে, তখন নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আরামের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরটা জুড়িয়ে নেয়। অল্পক্ষণের জন্য গাড়ি থামলে গাড়ি থেকে আর নামে না, স্টীয়ারিংয়ের উপর মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নেয়। সারাদিনের পর যখন "বিলকুল ছুটি" মেলে তখন শরীর টলতে থাকে, মনে হয় মাটিই টলছে। মোবিল-পেট্রোল, তৈলাক্ত লোহার কষ-কালি, বাতাসে উড়ে লাগা ধুলোকাদা এবং সারাদিনের ঘামে সর্বশরীরে একটা জর্জরতা অনুভব করে। শরীরের গ্রন্থিগুলো

খুলে পড়তে চায়, পেশীতে পেশীতে টাটানি জাগে ; অবশ্য এ তাদের সহ্য হয়ে যাওয়া ব্যাপার —ক্ষয়রোগের রোগীর নিত্য অপরাহ্নের স্বল্প উত্তাপের মত। তখন চাই মদ। মদ পেটে পড়লেই শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কেয়া হ্যায়? কোন্ হ্যায়? কিস্‌কো পরোয়া?—এই তখন মুখের বুলি। বেপরোয়া টলতে টলতে চলে। নরসিংও চলে। চলতে চলতে রামাকে অথবা যে সঙ্গী থাকে তাকেই বলে—এখানে কি আছে ; কুছ না। বুড়ো আঙুল দুটো নেড়ে বলে—ঢু-ঢু ঢন্-ঢন্। উ সব হ্যায় কলকাত্তামে।

কলকাতায় দেখেছে নরসিং—রসা রোডে, হাজরা রোডে, শ্যামবাজারে, ভবনাথ সেন স্ট্রীটের মোড়ে রাত্রি দশটা-এগারোটায় হল্লা করতে করতে চলেছে শিখ ড্রাইভারের দল। কলকাতায় মোটর-ব্যবসা মানেই শিখদের কারবার। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কামিজ, পরনে হাফপ্যাণ্ট, পায়ে নাগরা, লম্বা-চওড়া জোয়ান সব টলতে টলতে চলেছে—হা-হা ইয়া! খবরদার! মারো ডাণ্ডা! তার সঙ্গে অট্টহাসি—হা-হা-হা-হা! অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান। সমস্ত দিন দশ-বারোটা লোহার ঘোড়া আর পেট্রোল গ্যাসের উত্তাপের সঙ্গে লড়াই করে এইবার কোমল শীতল দেহের স্পর্শের মধ্যে নিজেদের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে অবসন্নতায় এলিয়ে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠে। বস্তির নোংরা পল্লীর গলিপথে ঢুকে পড়ে।

কি আছে এখানে? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ—!

গঙ্গার ধার, রেড রোড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে পাশে বড় বড় গাছে-ঘেরা নির্জন পথ, পিচ-ঢালা শক্ত সমতল পথ, ট্যাক্সি চলে বড় দীঘির জলের উপর নৌকার মত। পিছনের সিটে বসে থাকে সাহেব আর মেম ; তাদের গুনগুনানি কানে এসে ঢোকে, তাদের খিলখিল হাসিতে শরীর শিউরে ওঠে। এই কলকাত্তা।

এখানে কিছু নাই—'কুছ্ না, কুছ্ না'—আক্ষেপ করতে করতে রামেশ্বরোয়া, তারক, ইসমাইল, রসিদ সকলেই মদ খেয়ে গিয়ে বসে নিজেদের আড্ডায়—সেই চা-মাংসের দোকানে, খানিকটা সময় জুয়ো খেলে, ঝগড়া করে, তারপর আড্ডা ভেঙে গিয়ে ঢোকে এখনাকার বেশ্যাপল্লীতে। হাড়ী-ডোমপল্লীর কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তি—খুপরীর মত ঘরে দরজায় কেরোসিনের ডিবরি জ্বেলে বসে থাকে ঐ পল্লীর কুলত্যাগিনী মেয়েরা। মধ্যে মধ্যে ধাক্কা খায় ভদ্রলোকের সঙ্গে। উকিল-মোক্তারদের মুহুরি, দু-চারজন উকিল-মোক্তারও মাথায় ঘোমটা টেনে ছুটে পালায়। ওরা প্রথমটা চুপ করে থাকে, কিন্তু তারা খানিকটা দূরে পড়লেই হো হো করে হাসে।

নরসিং অনেকদিন নিজেকে এই শেষের মহল্লার কারবার থেকে দূরে রেখেছিল। প্রথম জীবনে জানকী এসে তার জীবনের লাগামটা কষে চেপে ধরেছিল। অনবরত তাকে মনে পড়িয়ে দিত—সে গিরবরজার ছত্রী-বংশের ছেলে। বলত,—যার বাত্ ঠিক থাকে না, তার জাত চলে যায়। তুমি আমার কাছে কসম খেয়েছ। জানকী মরে গেল. তার মৃত্যুর পরে নরসিং জানকীর শোকে জানকীর কাছে-দেওয়া কসমটাকে পালন করবার জন্য নিজেকে আরও শক্ত করে তুলতে চেষ্টা করলে। ছত্রী-বংশের অহঙ্কারটাকে আরও বড় করে তুললে

মনে মনে। কিন্তু দুনিয়া হল শয়তানির রাজ্য। নরসিং বলে—'হারামির জায়গা'। এখানে কারও ভাল থাকবার উপায় নাই। ছোট ছোট করে লোককে এখানে ছোট করে দেয়। প্যাসেঞ্জার থেকে আরম্ভ করে রাস্তার ওভারসিয়ার, থানার জমাদার, দারোগা, ইন্সপেক্টর, সমস্ত লোকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে ওকে ছোট করে দিলে। সবারই এক বুলি—বেটা 'ট্যাক্সি-ড্রাইভার' ছোটলোক। গিরবরজার ছত্রী-বংশের ছেলে কি ছোটলোক হয়? কিন্তু পেটের দায়ে প্যাসেঞ্জারের কথা সইতে হল, সাজার ভয়ে ওভারসিয়ার-দারোগা-জমাদারের লাল চোখ দেখে সেলাম বাজাতে হল। শেষ পর্যন্ত এস-ডি-ও'র বেত খেয়ে নরসিংয়ের ছত্রীত্বের অহঙ্কারের শেষটুকু মুছে গেল। তা-ই বোধ হয় গেল। ওই বেত খেয়ে বাড়ি আসবার পথেই শুখনরাম সাহুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সাহুকে ধমক মেরেছিল নরসিং প্রথমটা। সেই সাহু পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে তারই গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। সে পঞ্চাশটা টাকা পঞ্চাশ চাঁদির জুতো। ছোট কারবার করে সত্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে নরসিং। তারপর ওখানে এসে যা করলে—সে ভাবলে নরসিং নিজের মনেই চীৎকার করে বলতে থাকে—ভাগ্—ভাগ্—ভাগ্।

ফট্‌কি চমকে ওঠে নরসিংয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে।—কি? ভয় হয় ফট্‌কির, হয়তো তাকেই তাড়িয়ে দিতে চাইছে নরসিং।

নরসিং মাথা নাড়তে থাকে, ফট্‌কির মুখে চোখ রেখে বলে— তোকে নয়।

—তবে কাকে?

—আরশুলা। পায়ে আরশুলা উঠেছে।

নরসিং ফট্‌কিকে গ্রহণ করেছে। জানকীর কাছে দেওয়া কসম তার মনে নাই এমন নয়, কিন্তু সে কসম আর মানে না নরসিং।

কি-ই বা মানে সে আর? গিরবরজার ছত্রী-বংশের ছেলে সে, সে আজ গিরবরজারই হাড়ীদের ক্রীশ্চান বংশধরের বাড়িতে তাদের হাতে তাদের হেঁসেলে খায়। তাদের মেয়ে মেরী নীলিমা আজ তার কাছে নতুন মডেলের 'মাস্টার বুইক' গাড়ির মত স্বপ্নের বস্তু। পুরনো তাপ্পি-মারা ভাড়াটে শেভ্রলে গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার নরসিংয়ের নতুন গাড়ি দেখলেই মনে নেশা লাগে, দিনের আলোতেই এই ভাঙা গাড়ি চালাতে চালাতে নতুন দামী—ওই বুইক গাড়ি কেনার কল্পনার স্বপ্ন রচনা করে, পদ্যপাঠের কবিতার সর্বস্বান্ত হয়ে মাটির বাসনের ব্যবসায়রত সে বেনের ছেলের মত। এমনি বুইক গাড়ি কিনে চালাবে সে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে মেরী নীলিমাকে নিয়েও তার কল্পনা নানা স্বপ্নকাহিনী রচনা করে। এক এক সময় নরসিং বেশ বুঝতেও পারে যে এসব নেহাত মিথ্যে, এ সব কখনই সত্য হবে না, কিন্তু মনকে মানাতে পারে না। কিছুতেই মানে না মন।

সমস্ত দিন গাড়ি চালানোর উত্তেজনার উপর রাত্রে লাগে মদের নেশার ঘোর—তখন সে ফট্‌কিকে বুকে টেনে নেয়; কিন্তু সকালে নেশা কেটে যায়, সুস্থ মস্তিষ্কে সহজ মনে ফট্‌কির উপর বিতৃষ্ণা জাগে। তখন তার মন অস্থির হয় মেরী নীলিমার জন্য। হাড়ীর বংশের

ক্রীশ্চান-ধর্মাবলম্বী কালো মেয়ে—নীলিমা। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা নরসিংয়ের কাছে মনে হয় সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাময় এবং দুর্লভ। দিনের আলোতে সহজ মনের সম্মুখে নীলিমা তার কালো রূপ নিয়েই স্বপ্ন হয়ে ওঠে। পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচিসঙ্গত পোশাকে-পরিচ্ছদে কালো মেয়েটিকেই অপরূপ মনে হয়; হাড়ীর বংশের মেয়ে হলেও ম্যাট্রিক পাস নীলিমার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি শুনে এবং দেখে নরসিংয়ের মনে হয়, এই মেয়েই তার মনের সকল ক্ষোভ-গ্লানি মুছে দিয়ে আনন্দে শান্তিতে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। মনে হয়—কিসের জাত? ওর জন্যে জাত দিতে তার কোন দুঃখ নাই। কিন্তু 'সব ঝুট হ্যায়'। নীলিমাকে নিয়ে কোন কল্পনাই তার সত্য নয়, সব মিথ্যে।

ইমামবাজারের বাবুদের বাসের রহমত ড্রাইভার নরসিংয়ের গুরু। রহমত ড্রাইভার তাকে বলেছিল তার এমনিধারা গল্পের কথা। কলকাতায় তখন সে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল; একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে দেখে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। কলেজে যাবার সময় মেয়েটি যে স্টপেজ থেকে ট্রামে উঠত—ঠিক সময়টিতে রহমত তার কিছু দূরে ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আপনার সীটে বসে মেয়েটিকে দেখত শুধু। মেয়েটি ট্রামে উঠত, রহমতও তার ট্যাক্সি নিয়ে ট্রামের পাশে পাশে চলত ওই ট্রামের গতির সঙ্গে সমান তাল রেখে। কলেজের সামনে মেয়েটি নামত, কলেজে ঢুকে যেত, রহমত গাড়ি নিয়ে চলে যেত ভাড়া খাটতে। তার পর? নরসিং প্রশ্ন করেছিল রহমতকে। তার পর আর কি? একদিন দেখলাম, এল না। দু দিন না। তিন দিন না। শেষে গাড়ি নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকলাম—গলির মধ্যে তাদের বাড়ি। ছুটির পর তার পিছনে এসে বাড়িও সে দেখেছিল।—দেখলাম মাল বোঝাই হচ্ছে মোটরে। বাড়ির ছাদে হোগলার ছাউনি; মেয়েটি বউ সেজে দাঁড়িয়ে আছে; গাড়িতে চড়বে। ব্যস্, ফিরে এলাম। শুধু ঝগড়া হয়ে গেল যে-ট্যাক্সি দুটো ভাড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের ড্রাইভারের সঙ্গে। মিছে ঝগড়া; পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমার দোষেই মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে গেল।

নীলিমাও হয়তো একদিন চার্চে যাবে কারো হাত ধরে। সেদিন নরসিংয়ের ঝগড়া হয়ে যাবে কারো সঙ্গে।

ফট্‌কি বলে—আমি আর ওই কুপোর বাড়িতে থাকব না। অর্থাৎ শুখনরামের বাড়িতে। আমাকে তুমি নিয়ে চল।

রাত্রের নেশার মধ্যে নরসিং উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—আলবৎ, জরুর।

ফট্‌কি পরামর্শ দেয়—চল, এখান থেকে পাঁচমতিতে একখানা ঘর ভাড়া করে আমাকে রাখবে। রাত্রে এখন এখানে থাক, তখন পাঁচমতিতে থাকবে।

ঠিক—ঠিক। ফট্‌কির বুদ্ধি দেখে নরসিং অত্যন্ত খুশী হয়ে ওঠে। ঠিক বলেছে। এমন জীবন আর ভাল লাগছে না। এই চুরি-চুরি খেলা, এ কি নরসিংয়ের পোষায়? এ হল ছোট-লোকের কাজ। 'ডরফোক্‌না'—ভীতুলোকের কাজ।

তা ছাড়া।—ফট্‌কি নরসিংয়ের খুশী মেজাজের স্পর্শ পেয়ে অভিমান করে ঈষৎ ঠোঁট

ঝুলিয়ে বলে—তা ছাড়া এমন করে আসতে আর পারব না বাপু। কোনদিন যদি ধরে ফেলে, তবে ওই যে কালো কুমীর—ও আমাকে খুন করে দেবে। মেথর ঢোকার দরজা দিয়ে সরু গলিটা দিয়ে আসি, এখনও ধরতে পারে নাই। এবার ধরতে পারলে তোমারও মুস্কিল হবে, আমাকে হয়তো খুন করে গুম্ করে দেবে।

—হুঁ।

ফট্‌কি বলেই যায়—বারান্দা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলে নামার কথা বলেছিল সেই বুড়ী ঝি হারামজাদী। কুমীর ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নাই। বলে—ওই নরম চেহারা, ওই মেয়ে কাপড় ঝুলিয়ে নামতে পারে কখনও? বলে সে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

নরসিং চুপ করে বসে ভাবে।

—কি ভাবছ?

—কিছু না। তাই চল্। পাঁচমতিতেই ঘর ভাড়া করে তোকে নিয়ে যাই। শুধনরামের টাকাগুলো ফেলে দি।

ফট্‌কি সাদরে নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে। নরসিং স্নেহভরে ফট্‌কির পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ ফট্‌কি উঠে বসে বলে—ছাড়, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দি।

—না।

নেশার উত্তেজনার মধ্যে ফট্‌কির সেবা নরসিংয়ের ভাল লাগে না। সে চায় দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি।

শেষরাত্রে ফট্‌কি উঠে চলে যায়। কোনদিন নরসিংকে ডাকে, কোনদিন ডাকে না। সকালে উঠে নরসিং কথাটা ভাবে। এই ফট্‌কিকে নিয়ে কি জীবন কাটানো যায়? আর ফট্‌কিই কি তাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে? আবার কাকে দেখে তার নেশা জাগবে কে বলতে পারে? একটা দাঁতনকাঠি চিবুতে চিবুতে চলে মাঠের দিকে; ফেরার পথে ক্রীশ্চানপাড়া হয়ে ফেরে; পথে জোসেফের বাড়ির দরজায় ডাকে—জোসেফ, উঠেছ?

কালো মেয়ে রুখু অবিন্যস্ত চুলে বাঁধা-বেণী ঝুলিয়ে সাড়া দেয়—আসুন নরসিংবাবু। ওর কালো চেহারায় রুখু চুল যেন বড় ভাল মানায়। আর ভাল লাগে ঝকঝকে মুক্তার মত দাঁতগুলি।

—জোসেফ ওঠে নি?

—না। এখনও নাক ডাকছে। নীলিমা মৃদু হাসে—খিলখিল হাসি নীলিমা বড় হাসে না!

—তবে চলি।

—বসুন, চা খেয়ে যাবেন।

নরসিং আর আপত্তি করে না, বাইরের বারান্দায় একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে। চেয়ারে মোড়ায় ভীষণ ছারপোকা।

জোসেফের বাড়ি থেকে ফিরে বাসায় এসে বাজার। নিতাই চলে গিয়েছে। বেইমান

এখন বাবুর বাড়িতে ড্রাইভারি করছে। ড্রাইভারি, না, গোলামি! বাবুর জুতাও মুছিয়ে দিতে হয়—এ কথা হলপ করে বলতে পারে নরসিং। মনে পড়ে মেজবাবুর কথা। নরসিং—তবু তো ছত্রীর ছেলে গলায় পৈতে আছে, তবুও মেজবাবুর বরাত করতে বাধত না—নরসিং, আমার ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আয় তো। হ্যাঁ, আর এই চায়ের কাপগুলো নিয়ে যা। এঁটো চায়ের কাপ। প্রথম-প্রথম নরসিংয়ের মনে ছত্রীবংশের মান-ইজ্জতের গরম জেগে উঠত। তার পর তাও করতে হয়েছিল; আর বাধত না। নিতাইটা তো হাড়ীর ছেলে; নরসিং জানে—তাকে বাবু যখন পনেরো টাকা মাইনে আর দুবেলা খাবার দিয়ে রেখেছে তখন নিশ্চয় বলে—এই নিতাই, আমার জুতোজে ড়াটা নিয়ে আয় তো। একটা খবর তো সে এর মধ্যেই পেয়েছে—বাবুর বাড়িতে সার্কেলডেপুটি আফজল খাঁ সাহেব মধ্যে মধ্যে আসেন, চা খান, খাবার খান, তাঁর বাসন নিতাইকে তুলতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়। মরুক নিতাই। যার যেমন নসিব, নরসিং করবে কি?

রামা শুয়ার কবে ফিরবে কে জানে! সে উল্লুকটা ফিরলে এই সব হাঙ্গামা থেকে নরসিং বাঁচবে। বাজার করা, রান্না করা—এসব এক হাঙ্গামা। কয়েকদিন হোটেলে খেয়েছিল, কিন্তু হোটেলে কি বারো মাস দুবেলা খাওয়া যায়! তার উপর রোজগার নাই, কাজ নাই—এ সময় করবেই বা কি?

বাজার করে ফিরে একবার গাড়ি বার করতে হবে। বর্ষার সময়; উকিলবাবুদের অনেকে এ সময়টা ছ্যাকরা গাড়ি ভাড়া করে কোর্টে যায় আসে; নরসিং ছ্যাকরা গাড়ির চাকার দাগ ধরে অল্পস্বল্প রোজগারের পথ আবিষ্কার করেছে। তিনজন উকিল মক্কেল পেয়েছে। এঁরা হলেন বড় উকিল এখানকার মধ্যে। একজন একা যান-আসেন, মাসকাবারি বন্দোবস্ত করেছেন তের টাকা। দৈনিক আট আনা হিসেবে মাসের চারটে রবিবার বাদ দিয়ে ছাব্বিশ দিনে তের টাকা। মাঝের ছুটিছাটাগুলো ধর্তব্য নয়, তেমনি মধ্যে মধ্যে মেয়েরা যদি কোন বাড়িতে বেড়াতে যায় তবে সেটাও হিসেবের মধ্যে আসবে না। আর দুজন একসঙ্গে যান-আসেন। তাঁরা দুজনে দেন বারো টাকা। রবিবার বা অন্য ছুটির হিসেব-নিকেশও নাই আর বাড়ির মেয়েরা মোটরে চড়ে কুটুম্বিতাও করতে যায় না। এ ছাড়াও শহরের মধ্যে একটা-আধটা ভাড়া মেলে, তার রেট নরসিং করেছে এক টাকা। এক টাকার কম মোটরে চড়া হয় না,—কমে যেতে চাও, চলে যাও ছ্যাকরা গাড়ির আড্ডায়। অবশ্য কমেও নিয়ে যেতে পারে নরসিং, কিন্তু তাতে ভিতরে গদিতে বসে যেতে পাবে না, মাডগার্ডের উপরে বা ফুটবোর্ডে চেপে যেতে হবে। চীনেম্যান জুতোওয়ালারা কম দাম বললে বলে—এক পাতি হোগা। এও তাই। ভাগো বাবা, পথ দেখ। ছ্যাকরা গাড়িতে যাও, আরও কম হবে। হেঁটে যাও, পয়সা লাগবে না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একবার যায় পাঁচমতির সড়কের ও-মাথায়। রাস্তা পাকা হচ্ছে, তার মালপত্র—অর্থাৎ ইঁটের খোয়া, স্টোন ব্যালাস্ট, মিলের বয়লার-ঝাড়া পোড়া কয়লার ছাই—ঢালাই হচ্ছে। এখন বাদশাহী সড়ক, এতদিনে আংরেজী সড়ক বনতা হায়।

ইস্ক্রিরিট হয়ে যাচ্ছে সড়ক। এর উপরে পড়বে লাল মোরাম। তার উপরে চলবে রোলার। রাস্তা তৈরি হয়ে গেলেই তার উপর চলবে নরসিংয়ের কোম্পানির গাড়ি। 'সিং দাস এ্যাণ্ড কোম্পানি'—মানে নরসিং জোসেফ এ্যাণ্ড কোম্পানির গাড়ি। নরসিং আর জোসেফের গাড়ি। কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। মোটর-কোম্পানির সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলছে, চিঠি লিখছে নীলিমা। নরসিং দেবে তার পুরনো গাড়িটা কোম্পানিকে, গাড়িখানার দাম যা হবে সে বাদ দিয়ে যা থাকবে মাসিক ইন্‌স্টলমেণ্টে তা শোধ দেবে। জোসেফও টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছে। শুখনরামকে দলে নেওয়ার কথা এখনও ঠিক হয় নাই। জোসেফও আপত্তি করেছে, নরসিংও মন ঠিক করতে পারছে না এ বিষয়ে। ফটকিই তার মতটাকে ঘুলিয়ে দিয়েছে, নইলে শুখনরামকে কোম্পানিতে নেবারই তার ষোল আনা মত ছিল। শুখনরাম ট্রাক কিনুন দুখানা, পাঁচমতি থেকে যত মাল বইবার একচেটে কারবার হয়ে যাবে। ওদিকে ঘাটরোড পর্যন্ত মাল বইবার সুবিধে রয়েছে। দুখানা কেন, চালালে চারখানা ট্রাক চলবে। কথাবার্তার মধ্যে কয়েকবার নরসিং শুখনরামকে কথাটা বলেও দেখেছে। শুখনরাম হাঁ-না কিছু বলে নাই। কথাটা পাকাপাকি করবার সংকল্পের মুখেই ফটকিকে গ্রহণ করলে এবং ফটকি আবদার ধরলে তাকে নিয়ে পাঁচমতিতে বাসা বাঁধতে হবে।

সে করতে গেলে শুখনরামের সঙ্গে সদ্ভাব চটে যাবে, এটা নিশ্চিত। সেই ভাবনায় পড়েছে নরসিং। বর্ষার জল রাস্তার দুপাশের মাঠে থৈ থৈ করছে; ধান পোঁতা শুরু হয়ে গিয়েছে, চাষীদের কাজকামের শেষ নেই, চোখে স্ফূর্তি কত! কাজকামের মধ্যেই মানুষের আসল স্ফূর্তি। প্রায় বেকার হয়ে বসে আছে নরসিং, মনের মধ্যে রাজ্যের বিরক্তি জমে উঠেছে।

শহর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। ঢং-ঢং ঢং-ঢং। চারটে বাজল। শহরের প্রান্তে ছোট জেলখানার ফটকে ঘড়ি পেটা হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। বর্ষার সময় আওয়াজ বেশীদূর যায় যেন, বিশেষ করে আকাশে মেঘ থাকলে। গ্রীষ্মের সময় এখান থেকে জেলখানার ঘণ্টার আওয়াজ এমন স্পষ্ট শোনা যায় না।

এখন ফিরতে হবে নরসিংকে। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে কোর্টে। বড় উকিল বাবুর কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় গাড়ি চাই। বাড়ি ফিরে ঠিক পাঁচটায় চা খাবেন। বুড়োর কি বাঁচবার চেষ্টা রে বাবা! নিক্তির ওজনে খায়, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। পঞ্চাশ বছর বয়স থেকে রাত্রে গুনে দুখানি লুচি খায়।

রামা চলে যাওয়ায় বড় অসুবিধা হয়েছে। একটা লোক গাড়ি ধুয়ে দেয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে না দেখলেই ফাঁকি দেয়। ঘোড়ায় চড়ে আসে যেন। অবশ্য দোষই বা তাকে কি দেবে নরসিং? শুখনরামের গদিতে মাথায় করে বস্তা বয়ে তার দিন চলে, প্রায় বাঁধা কাজ, কাজে লাগবার খানিকটা আগে এসে কয়েক বালতি জল তুলে চাকার উপর ঝাপটা দিয়ে ঢেলে দিতে দিতেই গদির সরকার হাঁক পাড়ে। তাকেও ছুটে যেতে হয়। গাড়ির ভিতরটা কদিন ঝাড়া

হয় নাই। উকিলবাবুদের চোগা-চাপকানেই ধুলো মুছে যায়। কিন্তু জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে ধুলো জমেছে অনেক। ঝাড়নটা দিয়ে ঝেড়েও যেতে চায় না ধুলো। গদিটা টেনে সরাতে হবে। বিরক্তিভরেই নরসিং টেনে তুললে গদিটা আর গালাগাল দিলে নিত্যাইকে এবং রামাকে—বেইমানের দুনিয়া, ছোটলোকের বাচ্চা কখনও সাচ্চা হয় না দুনিয়ায়। আর সেই উল্লুক গিধ্বড় বাড়ি গিয়েছে তো যেন রাজগী পেয়েছে সেখানে। সেই তো নেকড়ানী পিসি!

চমকে গেল নরসিং। ওটা কি? চিক্‌চিক্ করছে কি ওটা? সোনার জিনিস, কানের গহনা। মাকড়ির মত হাল-ফ্যাশানের কানের গহনা। কোন মেয়ে-প্যাসেঞ্জারের কান থেকে পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার দুদিন আগে বুড়ো উকিলবাবুর বাড়ির মেয়েরা দুপুরবেলায় গিয়েছিল এস-ডি-ওর বাড়ি। ঠিক এই দিকেই বসেছিল উকিলবাবুর বেটা-বউ—নতুন বউ। নিশ্চয় তার। শাশুড়ী-ননদের ভয়ে সম্ভবত হারানোর কথাটা চেপে গিয়েছে, বলতে পারে নি। না হলে নিশ্চয়ই খোঁজ হত। তার কাছেও আসত লোক। প্যাসেঞ্জারেরা কতজনে কত জিনিস ফেলে যায়, আবার খোঁজ করতে আসে। ফিরিয়ে দেয় নরসিং। প্যাসেঞ্জারের জিনিস গেলে বদনামী হয়। কলকাতার কথা অবশ্য আলাদা। সেখানে কে কাকে চেনে? কার কথা কে শোনে, মনে রাখে? কিন্তু মফঃস্বলে ও চলে না। কলকাতার এক সাহেব-কোম্পানির জুতোর দোকানে লেখা আছে—'খরিদ্দার প্রভুর সমান'। ও-জেলার মোটর-কোম্পানির মালিক বুধাবাবু বেতরিবৎ ঝগড়াটে কণ্ডাক্টার-ড্রাইভারকে বলত—ওরে হারামজাদা শূয়ার-কি বাচ্চা, প্যাসেঞ্জার হল লক্ষ্মী। প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া যদি ফের শুনি কোনদিন তো তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব, টেনে জিভ ছিঁড়ে দেব।

পকেটে ফেললে জিনিসটা। খোঁজ করলে দিতে হবে, না করে—। চোখ দুটো চকচক করে উঠল নরসিংয়ের—ওজনে আধ ভরি হবে, পনেরো টাকার কম নয়, প্রায় বেকার-অবস্থায় যা হয়। হঠাৎ মনে পড়ল নীলিমাকে। এমনি আর একটা গড়িয়ে নীলিমাকে দিলে নীলিমা নেবে না? নীলিমার হাতে না দিয়ে ওর মায়ের হাতে কিংবা জোসেফের হাতে দিলে আরও ভাল হয়। কালো নীলিমার কানে চিক্‌চিকে সোনার গহনাটা বাহার দেবে।

বুড়ো উকিলবাবু গম্ভীর লোক, কথাবার্তা বড় বলেন না। নরসিং দরজা খুলে দেয়, মুহুরি মামলার ফাইলগুলো দেয়, বুড়োবাবু গাড়িতে উঠে কোণে হেলান দিয়ে বসেন, পাকা গোঁফ-জোড়াটা বার দুয়েক হাত দিয়ে টেনে যেন সোজা করে নেন—ব্যস্। বাড়িতে গিয়ে নিজেই দরজা খুলে নেমে যান। চাকর এসে ফাইল নিয়ে যায়।

নরসিংয়ের মনের মধ্যে সোনার গয়নাটার কথাই ফিরছিল। অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কথাটা বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল নীলিমার মুখ। মন তখন বলছিল—মরুক গে, তার কি এত সাধু সাজবার গরজ! যার জিনিস সে যদি খোঁজ না করে দাবি না করে, তবে তার দোষটা কোথায়? কিন্তু উকিলবাবু গাড়ি থেকে নামতেই সে কতকটা যেন সব যুক্তিতর্ক ভুলে গিয়েই তাঁকে কথাটা বলবার জন্যে ডাকলে—বাবু!

ভুরু কুঁচকে উকিলবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

মুখের এই চেহারা দেখে নরসিং একটু ভড়কে গেল। তবু সে বললে—বলছিলাম স্যার—

উকিলবাবু বললেন—মাস শেষ না হলে টাকাকড়ি দেব না আমি। গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন উকিলবাবু।

—শালা! নরসিং ফুটকণ্ঠেই গাল দিয়ে উঠল। সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বাবুর পিছন পিছন এসে বারান্দায় উঠে বললে—টাকাকড়ি আমি চাই নি বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন উকিলবাবু, বললেন—সন্ধ্যের পর এস। সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুরে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলেন তিনি।

—একটা কথা, বাড়িতে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করবেন কারও কিছু হারিয়েছে কি না?

আবার ঘুরলেন উকিলবাবু। স্তব্ধ হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে যেন কথাটা বুঝে নিয়ে বললেন—হারিয়েছে কি না? মানে?

—আমি একটা জিনিস পেয়েছি গাড়িতে।

—কি জিনিস?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—পরশু তারিখে মায়েরা গিয়েছিলেন এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ি। তার পর আর মেয়েছেলে যায় নাই। আপনি একবার তদন্ত করে দেখবেন বাড়িতে। আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব।

উকিলবাবু এবারে নরসিংয়ের পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলেন।—কি জিনিস? জিনিসটা কি হে?

—জিজ্ঞাসা করবেন মায়েদের। তাঁদের হলে তাঁরাই বলবেন কি জিনিস।

নরসিং নিজেই যেত, কিন্তু উকিলবাবু তার অবসর দিলেন না। উকিলবাবুর লোক তাকে খুঁজে বার করলে।—বাবু ডাকছেন।

উকিলবাবু চোখমুখ রাঙা করে বসে আছেন। যেন বড় মামলায় সওয়াল করে হাঁপাচ্ছেন। নরসিং যেতেই বললেন—হ্যাঁ, বউমার কানের মাকড়ি-দুল হারিয়েছে। পেয়েছ তুমি?

নরসিং গয়নাটি বার করে টেবিলের উপর নামিয়ে দিলে।

—ইয়েস্! দ্যাটস ইট। এ-ই বটে। হাতে করে তুলে নিয়ে তিনি বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

নরসিংয়ের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। সে মৃদুস্বরে আবার গাল না দিয়ে পারলে না। শা-লা! ভাল কথা বলতে জানে না দুনিয়া। অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এসে সে গাড়ি নিয়ে চলে এল। মনটা কিন্তু তার ভারী খুশী হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এতে তার ভাল হবে—এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। উকিলবাবু—ওই বুড়োয়া—ও এর দাম না দিক, দুনিয়া এর দাম দিতে কসুর করবে না। পাকা নয়া-রাস্তা, আংরেজ আমলের ইস্টিরিট রাস্তায় মেয়েছেলে নিয়ে যারা যাবে তারা নরসিংকে খোঁজ করবেই। শা-লা!

ক্লাচ—ফুটব্রেক—সব শেষে হ্যাণ্ডব্রেকটা পর্যন্ত টেনে ধরলে। আর একটু হলেই চাপা পড়েছিল বাচ্চা একটা। ধাঁ করে ছুটে বেরিয়ে এসেছে পাশের গলি থেকে।

পরের দিন কিন্তু উকিলবাবু নিজে থেকেই কথা বললেন।

—কি হে, কাল আমি বাড়ির ভিতর থেকে আসতে আসতে তুমি চলে গেলে কেন?

নরসিং যথাসাধ্য মিষ্টভাবেই জবাব দিলে—আপনি তো দাঁড়াতে বলেন নি!

—ও, বলি নি, না? ভুলে গিয়েছিলাম তা হলে। একটু চুপ করে থেকে বললেন—ইউ আর এ গুড ম্যান, অ্যান অনেস্ট ম্যান। সততা আছে তোমার।

নরসিং কোন জবাব দিলে না।

গাড়ি থেকে নেমে উকিলবাবু পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে বললেন—ধর।

জোড়হাত করে পিছিয়ে গেল নরসিং।—এর জন্যে আমি কোন বকশিশ নিতে পারব না স্যার। বাড়িতে কাজকর্ম হলে নিজে চেয়ে নেব বকশিশ, জরুরী কাজে ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে দু-টাকা বেশী ভাড়া দাবি করব স্যার। কিন্তু এর জন্যে কিছু নিতে পারব না।

উকিলবাবু নোটখানা পকেটে পুরে কোর্টে গেলেন।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে বললেন—দেখ হে, তোমার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ আমি করতে পারব না। তুমি সন্ধ্যের পর একবার আমার এখানে আসবে। কিছু কথা বলব।

চমকে উঠল নরসিং। ক্ষতি হয়—? ক্ষতির চেষ্টা তা হলে কিছু হচ্ছে? সে প্রশ্ন করে উঠল—আজ্ঞে?

—সন্ধ্যের পর এস—সন্ধ্যের পর।

আঠারো

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। উকিলবাবু বললেন—তোমার ক্ষতি হয় এমন কাজ অর্থাৎ নরসিংয়ের ক্ষতি হয় এমন কাজ কিছু হচ্ছে। উকিলবাবু জানতে পেরেছেন। উকিলবাবু যখন শুনেছেন তখন আইন-আদালতের কাণ্ড। অর্থাৎ মামলা-মকদ্দমা। কে করেছে মামলা-মকদ্দমা? নরসিং কারও কাছে টাকা ধারে না, কারও খাজনা রাখে না। কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয় নি—কোন প্যাসেঞ্জার ক্ষতিপূরণের নালিশ করতে পারে না। কারও সঙ্গে মারপিট হয় নি, গালিগালাজ হয় নি। মধ্যে মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানদের সঙ্গে দু-চারটে কড়া কথা বলাবলি হয়েছে, তার জবাব তারাও দিয়েছে। তবে?

ডেটিনিউবাবুর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। পুলিস কিছু করেছে? খুব সম্ভব। বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? মিউনিসিপ্যালিটির ক-ঝুড়ি পাথর চুরি? না না না। ওটা বাজে। মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ারবাবু নগদ পাঁচটা টাকা তার হাত থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছেন। আর কি হতে পারে?, ওভারলোডিং-এর কেস?

বেশী যাত্রী বোঝাই করার জন্যে পুলিস কেস করেছে ? হতে পারে হয়তো। কিন্তু এমন তো কোনদিনের কথা মনে পড়ে না। তা ছাড়া সিপাহীদের দৈনিক পার্বণী তো সে নিয়মিত দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল শুখনরায়ের কথা। সাহুজীর ছোট ছোট তামাকের পেটি সে মধ্যে মধ্যে নিয়ে আসে। তাই নিয়ে কিছু কি ? কিন্তু ধরা তো সে পড়ে নি, সাহুজীরও কিছু হয় নি, তবে মামলা হয় কি করে ? সারাটা বিকেল তার চিন্তার মধ্যে কাটল। সন্ধ্যের সময় মদের দোকানে গিয়ে একটা শিশিতে সে মদ কিনে পুরে নিলে, খেলে না ; উকিলবাবুর কাছে যেতে হবে, মুখে গন্ধ নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

উকিলবাবু মৌজ করে বসেছেন বারান্দায় ; একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসেছেন, সামনে একটা ছোট টেবিল—টেবিলের উপর একটা শৌখীন টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। একটা কাচের গেলাসে মধ্যে মধ্যে চুমুক দিচ্ছেন আর গড়গড়ার নলে তামাক খাচ্ছেন। উঃ উঃ ! তামাকের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে আর একটা গন্ধ কিসের ? আরে সীতারাম, বোম শঙ্কর হরি হরি ! কাঁচা মাংসের গন্ধ বাঘের কাছে লুকানো যায় না ; মাছের গন্ধ বেড়ালের কাছে চাপা দেওয়া যায় মসলার গন্ধ মিশিয়ে ? বাবু মদ খাচ্ছেন। নরসিং খুব খুশী হয়ে উঠল উকিল-বাবুর উপর। এ না হলে মানাবেই বা কেন, আর শরীরই বা থাকবে কেন ? এই বয়সে খাটুনি তো কম নয় ! সারাটা দিন সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বকবক করা, জেরা করা—এ কি সোজা কথা ! বড় বড় উকিলের চালই এই। ও-জেলাতেও সে দেখেছে, শুনেছে। সন্ধ্যের পর মাপ করা শিশি থেকে দাগে দাগে ঢেলে জল মিশিয়ে একটু একটু করে—বাবুরা বলেন 'সিপ করে'—খান। চ্যাংড়া উকিলেরা বেশী খায় ; মধ্যে মধ্যে বেএক্তিয়ার হয়েও পড়ে ; দু-চারজন কসবীপাড়ায় হানা দেয়।

বারান্দায় উঠতেই উকিলবাবু বললেন—এসেছ ?

বিনীত নমস্কার করে নরসিং বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বসো। উকিলবাবু গেলাসে চুমুক দিয়ে ডাকলেন—রামধনিয়া ! গেলাসটা নিয়ে যা। জল মিশিয়ে আধ গেলাস দিয়ে যা। তামাক টানতে লাগলেন বাবু। বার-দুই টেনে নলটা ফেলে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—হ্যাঁ। তোমার ক্ষতিকর কিছু আমার করা উচিত নয়।

নরসিং বললে—আমি তো স্যার কোন অন্যায়ই করি নি।

—ইয়েস। অন্যায় কর নি। তা ছাড়া তুমি অনেস্টির পরিচয় দিয়েছ। বউমা তো কথাটা চেপে গিয়েছিলেন বকুনির ভয়ে। তুমি অনায়াসে ওটা আত্মসাৎ করতে পারতে। ইয়েস তোমার অনেস্টি তুমি প্রুভ করেছ। ইয়েস।

নরসিং উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করে রইল।

উকিলবাবু একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলেন—বাট্ ইউ সি, সংসারে বেঁচে থাকাটা একটা যুদ্ধ—স্ট্রাগল্। ইয়েস—জীবনযুদ্ধ। বিশেষ আজকালকার বাজারে।

একজনকে কিছু করতে গেলেই আর একজনের এলাকায় হানা দিতে হবেই। তুমি এখানে এসে হানা দিলে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের রোজগারের এলাকায়। ঠিক কি না বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নরসিং আশ্বস্ত হল, তা হলে ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের কোন ভড়পাইয়ের ব্যাপার।

উকিলবাবু গোঁফ চুমরে নিয়ে বললেন, ইয়েস। ব্যাপারটা ঠিক তাই, বড় ছেলেটা আমার বসে আছে। ভাবছিলাম, কি করে দেওয়া যায় ওকে! তা শ্যামনগর-পাঁচমতি রোড পাকা হওয়ার প্রপোজাল হতেই শুখন সাহু আমার কাছে এল। ওর বড়ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেটির ফ্রেণ্ডশিপ আছে। আমাকে প্রপোজাল দিলে রাস্তাটায় মনোপলি-সার্ভিস নিয়ে ওদের দুজনকে একটা মোটর-বাস্ বিজনেস করে দেওয়ার। কথাটা ভাল লাগল আমার। ইয়েস। দেখ, ছেলেটা বসে আছে, তা ছাড়া এমন একটা রাস্তায় যদি মনোপলি-সার্ভিস পাওয়া যায় তবে মন্দ হবে না ব্যবসাটা। ইয়েস, ভালই হবে। শুখনরাম আমাকে বললে, আড়াই মাসে বেশ লাভ করেছ তুমি।

নরসিংয়ের মাথার মধ্যে মুহূর্তে ক্ষোভের যেন একটা হাউই বাজি ছুটে গেল। গিরুবরজার ছত্রীর ছেলে নরসিং, দশ-বারোটা লোহার ঘোড়ার রাশ ধরে দিনভর হাঁকায় নরসিং। চড়াসুরে বাঁধা মেজাজের তার কড়া কথার অল্প ছোঁওয়ায় কেটে যায় তার, সে উঠে দাঁড়াল; হয়তো অঘটন কিছু ঘটিয়ে ফেলাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সংসারে ব্যক্তিগত স্বভাবটাই সব নয়, তার চারিপাশের পৃথিবীকে তার না-মেনে উপায় নেই। তার এই তীব্র ক্ষোভ এবং ক্রোধকে হাউইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে পারিপার্শ্বিককে তুলনা করতে হবে বর্ষাঋতুর সঙ্গে। বর্ষার মেঘলা আকাশ এবং বর্ষণ যেমন হাউইকে অল্প একটু উঠতেই দমিয়ে দেয়, তেমনভাবে দাঁড়িয়ে উঠেও সে চারিপাশের প্রভাব স্মরণ করে আবার দমে গেল। উকিলবাবুর বুদ্ধি এবং টাকা, শুখনরামের শয়তানি আর টাকা—এর সামনে সে কতটুকু? আর সে তো সেই গিরুবরজার ছত্রী নয়। গিরুধারী সিংরায়ের বাস নাই, ফৌত হয়ে গিয়েছে গিরুধারী সিং। দাঁড়িয়ে উঠে সে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে —তা বেশ তো। আমি তো গরীব। আপনাদের টাকা আছে, আপনারা ব্যবসা করবেন বৈকি। গরীবের রুটি নেবেই তো বড়লোক। তা বেশ, আমি চলে যাব এখান থেকে।

উকিলবাবু হেসে বললেন—বসো, বসো। তোমার দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। ইয়েস, তোমার দুঃখ হবার কথা। ইয়েস, ন্যাচ্যারল এটা—বেরী বেরী ন্যাচ্যারল। উকিলবাবু Natural-কে বলেন 'ন্যাচ্যারল', Very-কে বলেন 'বেরী'। এককালে তাঁর ইংরেজী বলার খুব খ্যাতি ছিল। বড় বড় কথা দিয়ে ইংরেজী বলতেন। একালের ছেলেরা তাঁকে বলে 'বোম্বাস্টিক'! উকিলবাবু হাসতে হাসতে গেলাসে আবার একটা চুমুক দিয়ে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চাকরকে ডাকলেন—রামধনিয়া, এলাচ আর লবঙ্গ দিয়ে যা আর কয়েকটা। তারপর নরসিংকে বললেন—বসো, বসো। আরও কথা আছে। ইউ আর এ গুড ম্যান, অনেস্ট ম্যান; কিন্তু আমিও অনেস্ট ম্যান, ডিসনেস্টি আমি পছন্দ করি না। কাল থেকেই আমি

ভাবছি, হোয়াট ইজ দি ওয়ে আউট। বুঝতে পারছ? কঃ পন্থা? মানে, সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না—এমন কি পথ থাকতে পারে? এ্যাণ্ড আই হ্যাভ ফাউণ্ড ইট আউট। ভেবে বের করেছি। ইয়েস—এর চেয়ে আর ভাল হতে পারে না।

নরসিং বললে, আসছি স্যার, এক্ষুনি আসছি। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সময়ে অভ্যাসের নেশা পেটে না-পড়ায় শরীর মেজাজ বেশ তাজা হচ্ছে না, তার উপর উকিলবাবুর গেলাস থেকে গন্ধ এসে নাকে ঢুকে তাকে চঞ্চল করে তুলছে। সে আর থাকতে পারলে না, উকিলবাবুর বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিশিটা বার করে নির্জলা মদ গলায় ঢেলে দিলে। গন্ধের ভয় নাই, 'নাইপাকা' হরিণকে কি বলে যেন? কস্তুরী হরিণ। ওই 'নাইপাকা' হরিণের মত বাবু এখন নিজের মুখের খোসবয়েই মশগুল। আর যদি পায়ই গন্ধ তাতেও নরসিং গ্রাহ্য করবে না। যে লোক তার রুটি মারতে হাত বাড়িয়েছে, তাকে আর খাতির কিসের? ঠাণ্ডা কথায় জবাব দিয়ে নরসিংয়ের সুখ হচ্ছে না। গ্যাস বানিয়ে নিতে হবে। ধাঁ করে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে চোঁ-চোঁ করে যাকে বলে—সেইভাবে টানতে লাগল। বর্ষাকালের সিগারেট—জলো হাওয়ায় আর জোরালো টানে সিগারেটটা পাটকিলে রঙ ধরে গরম হয়ে উঠল চলন্ত ইঞ্জিনের তৈলাক্ত নাট, অথবা স্ক্রুয়ের মত।

—কই হে?—উকিলবাবু ডাকছেন। বাবু আজ খুব খুশী হয়েছেন দেখছি। ভাল। কি পথ তিনি বার করেছেন শোনাই যাক। তার পর নরসিং যা হয় করবে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে এবার বেশ শক্তভাবে পা ফেলে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

উকিলবাবু বললেন—দেখ হে, আমি ঠিক করেছি—ব্যবসা করতে গেলে তোমাকে বাদ না দিয়ে তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কোন সমস্যা নেই আর। নয় কি? এখন আমার প্রপোসাল হচ্ছে—'প্রপোসাল' মানে বোঝ তো? প্রস্তাব—ইয়েস—প্রস্তাব। তুমিও আমাদের ব্যবসাতে লেগে যাও।

এবার নরসিং একটু খুশী হল। মন্দের ভাল এ-প্রস্তাব। সে জোসেফ এবং শেঠজীকে নিয়ে কোম্পানি খুলবার কল্পনা করেছিল—এতে জোসেফের বদলে উকিলবাবু আসছেন। জোসেফ বাদ যাচ্ছে—তার আর কি করতে পারে নরসিং! বন্ধু লোক আর মেরী নীলিমার ভাই। নইলে গিরবরজার হাড়ীর ক্রীশ্চান বংশধরের সঙ্গে শেয়ারে ব্যবসা করতে তারও মন খুঁতখুঁত করে।

নরসিংয়ের কাছে কোন জবাব না পেয়ে উকিলবাবু বললেন—কি? মত নেই নাকি তোমার?

—আজ্ঞে, মত থাকবে না কেন? এ তো খারাপ কথা বলেন নি আপনি?

—ইয়েস, খারাপ কথা আমি বলি না। সে লোক আমি নই। যাক্—তুমি তা হলে রাজী?

—হ্যাঁ। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে, প্যাসেঞ্জার যখন হয়, তখন আরও গাড়ি চলবে সে আমি জানি। তবে মনোপলি-সার্বিস করে যদি আমার রুটিটা মারেন, তা হলেই আমার উপর

অধর্ম করা হবে। নইলে—

—ইয়েস, নইলে অধর্ম হবে না। এবং সেটাই আমি চাই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো ওই গরুর গাড়ির রাস্তায় মোটর চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছি। খারাপ রাস্তায় কেউ তো মোটর চালিয়ে লোকসানের ঝুঁকি নিতে চান নি।

—বটে। ও কথাটা তুমি বাদ দাও। রাস্তা যখন পাকা হচ্ছে তখন তুমি এর আগে মোটর না চালালেও লোকে নতুন করে সার্ভিস খুলত। সেটা কোন দাবি নয় তোমার। তবে তুমি অনেস্ট লোক—তোমার ক্ষতি আমি চাই না, এইটেই হল আসল কথা। এখন শোন। আমরা একখানা মোটর বাস্ নিয়ে আসছি।

—এর সঙ্গে ট্রাকসুদ্ধ আনুন বাবু, এ পথে মালের আনাগোনা প্যাসেঞ্জারের চেয়ে অনেক বেশি।

—গুড্ আইডিয়া! হ্যাটস ইট। এ কথা মনে হয় নি আমাদের। এই জন্যেই তোমাকে চাই আমাদের মধ্যে। ইয়েস, বেরী গুড আইডিয়া!

নরসিং উৎসাহিত হয়ে উঠল। উকিলবাবুর মত গণ্যমান্য বিচক্ষণ পদস্থ ব্যক্তির প্রশংসা তার মত ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী, সে বললে—আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি বাবু, মালের গাড়ি—গড়ে কত মণ করে মাল আসে গাড়িতে, মণ করা ভাড়া হিসেব করে খতিয়ে দেখেছি, মালের ট্রাক এখানে চালু করতে পারলে খুব লাভ। তা ছাড়া ট্রাক করলে আরও একটা কারবার জুড়তে পারা যাবে এর সঙ্গে।

—কি বল তো?

—রাস্তার ঠিকেদারি।

—কণ্ট্রাক্টরি? আই সি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্ষার সময় মেরামতের জন্যে রাস্তা বন্ধই থাকে কিছু দিন। আমি দেখেছি—বুধাবাবু, মানে, পাশের জেলায় বুধাবাবুর মোটর সার্বিস একরকম একচেটে, তিনি রাস্তা কণ্ট্রাক্ট নেন; গরুর গাড়িতে পাথর-কাঁকর ঢালাই করতে দু-মাস লাগলে—ট্রাকে সে কাজ দশ দিনে হয়ে যায়। বসে থাকার লোকসানটা হয় না—ঠিকেদারির লাভ থাকে—আর সব চেয়ে বড় কথা—রাস্তা মেরামতটি ভাল হয়। মানে—ওভারসিয়ারের প্রণামী দিয়ে ঠিকেদারেরা কম কাঁকর-পাথর দিয়ে বেশি লিখিয়ে লাভ করতে গিয়ে রাস্তার মাথা খেয়ে দেয়, সেটি হয় না। আমাদের হাতে রাস্তা থাকলে আমরা গাড়ির জন্যে রাস্তা ভাল করে মেরামত করাব। ভেবে দেখুন ঠিক বলেছি কি না।

উকিলবাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—গ্র্যাণ্ড বলেছ। চমৎকার আইডিয়া। ইয়েস। অদ্ভুত কথা! মনোপলি সার্বিসের জন্যে বছরে একটা টাকা আমাদের ওই রাস্তার জন্যে দিতেই হবে। কণ্ট্রাক্ট আমাদের থাকলে—ইউ উইল বি লাইক ক্যাচিং এ হিল্সা ফিশ। মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ে যাবে। গ্র্যাণ্ড! গুড! তোমাকে আমাদের চাই। বুঝলে?

নরসিংয়ের মাথায় মৌজ ধরে এসেছে, সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

উকিলবাবু বলেন—নাউ অর্থাৎ এখন আসল কথাটা বলে নি। মানে 'টর্মস' বুঝলে! শর্ত। আমি খুব সোজা লোক। বাঁকা-চোরা গলি-ঘুঁজি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি খোলসা করে কাজ করতে চাই। দেখ ব্যবসা করতে গেলেই আগে ঠিক করতে হয় মূলধন। তা তোমার মূলধন—ক্যাপিট্যাল আমরা ঠিক করেছি বিশ হাজার টাকা। ইয়েস বিশ হাজার। বাস দুখানা—বারো থেকে চোদ্দ হাজার,—মানে, গাড়ি কিনব নতুন। তা ছাড়া মনোপলি সার্ভিসের জন্ম রাস্তায় দিতে হবে দু-হাজার। আর ধর—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লাগবে শ-পাঁচেক—মানে পুজো। এই গেল সাড়ে ষোল হাজার। তারপর গ্যারেজ এ-ও-তা এসব আছে। এখন ট্রাক একখানা কি দুখানা কিনতে গেলে টাকা আরও বেড়ে যাচ্ছে—ধর আরও দশ-বারো হাজার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকিলবাবু যোগ-বিয়োগ করে টাকার পরিমাণ ধার্য করেন তিরিশ হাজার। তারপর বললেন—এখন কারবারে অংশীদার হতে গেলে তোমাকেও এর একটা অংশ দিতে হবে। তা না হলে অংশীদার হওয়া যায় না। আমি জানি না—ইয়েস—আমি কি করে জানব কত টাকা তুমি দিতে পার!

নরসিংয়ের মনে হল—সে যেন কোন উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছে—সর্বাঙ্গ কেমন শিরশির করছে, হাত-পা নাড়বার শক্তি নাই। একটা সাপ যেন মুখে না কামড়ে লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তিরিশ হাজার টাকার অংশ—!

উকিলবাবু উৎসাহ-ভরে বলে গেলেন—এক, তোমার গাড়িটা আছে, ওটার দাম যা আমি এনকোয়েরি করে জেনেছি। তাতে ম্যাক্সিমাম হাজার টাকা। ওটা আমরা মোটর-কোম্পানিকে বেচে গাড়ি কেনবার সময় এক্সচেঞ্জ দিলে কিছু হয়তো বেশি পেতে পারা যাবে। মানে, পুরনো গাড়ি আমি রাখব না। বুঝলে? এখন এর ওপর কি দেবে তুমি—বল?

নরসিং নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—টাকাকড়ি আমার নাই বাবু। কোথায় পাব আমি?

—তা হলে মাত্র গাড়িখানার দাম! ধর—এক হাজার; তা তিরিশ ভাগের এক ভাগ। দু-পয়সার সামান্য কিছু বেশি। সামান্য মানে হাজার টাকা মাসে লাভ হলে ৩৩৵৪ পাই পাবে তুমি। আর কাজ করবে তার একটা মাইনে পাবে। বেশ, কালই তুমি গাড়িখানা লিখে দাও—

নরসিং ঘাড় নেড়ে বললে—গাড়ি আমি বেচব না বাবু।

চমকে উঠলেন উকিলবাবু। ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—মানে? একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে তুমি এতে রাজী নও? এর পর খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—ভাল। ছাট্স গুড। আমি খালাস।

নরসিং পকেট থেকে শিশিটা বার করে অল্প খানিকটা সরে গিয়ে একটা থামের আড়ালে

দাঁড়িয়ে খানিকটা মদ খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ওই আড়াল থেকেই বললে—আজ্ঞে ও শর্তে আমি রাজী নই। কোম্পানিকে গাড়ি আমি দেব, কিন্তু গাড়ি আমারই থাকবে, আপনাদের গাড়ি আপনাদের থাকবে, আয় আপনারা নেবেন, আমার গাড়ির আয় আমার থাকবে। মনোপলি নিতে যে টাকা লাগবে তার যা ন্যায্য অংশ হবে আমি দোব। গাড়িখানা কোম্পানিকে বেচলে দুপয়সা অংশ হবে বলছেন, তা বেশ ঐ টাকার দু-পয়সা অংশ আমি দোব।

—না। সে হয় না।—উকিলবাবু সোজা হয়ে বসলেন। দিলদরিয়া মেজাজ, গলার মৌজী কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছে। ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন—ও-সব কাঁচা কাজ আমি করি না। ও-সব বাঙালীর এলোমেলো কাজের মধ্যে আমি নেই। আমার কারবারের মধ্যে আমি থাকতেও দোব না।

একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে ঢুকল কম্পাউণ্ডের মধ্যে; উকিলবাবু উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।—কে? নিজেই আলোটা তুলে ধরলেন—কে সাহুজী?

হ্যা-হ্যা করে হেসে মুখ বার করে সাহুজী বললে—জী, হুজুর।

—গাড়ি? গাড়িতে এলে? এনেছ নাকি?—উকিলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সাহু উকিলবাবুর কথার জবাব না দিয়ে গাড়ির ভিতর কাউকে উদ্দেশ করে বললে—আরে নাম্ রে বাবা, নাম্। উকিলবাবু হেসে বললেন—যাক, তা হলে সত্যিই ব্যবসা করবে তুমি!

—আলবৎ। দেখেন, মানুষটাকে দেখেন আগে। একবার পায়ে তেল দিবে তো—বাত আঁধা ভাল হইয়ে যাবে।

গাড়ি থেকে ধবধবে সাদা থান কাপড় পরে নামছে একটি মেয়ে। নরসিং দাওয়ায় উবু হয়ে বসেছিল—সে উঠে দাঁড়াল। থামের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। উকিলবাবু সম্ভবত উত্তেজনার প্রাবল্যে এতক্ষণ নরসিংয়ের কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি এবার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—নরসিং, তুমি যেতে পার এখন।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে মুখের ঘোমটা সরিয়ে চারিদিকে চাইলে—নরসিংয়ের নাম শুনে ফট্‌কি তাকেই খুঁজছিল। নরসিংয়ের দিকে চেয়ে তার চোখ জলে ভরে উঠল। উকিলবাবুর হাতের চিমনির আলো তার চোখ-ভরা জলের উপর ছটা ফেলেছে।

শুখনরাম নরসিংকে দেখে বিরক্ত হয়েছে—বিব্রত হয়েছে, এটা বুঝতে পারলে নরসিং। শুধু বুঝতে পারলে না একটা কথা। ফট্‌কিকে এখানে এক রাত্রির জন্ম দিয়ে যাচ্ছে শুখনরাম অথবা চিরদিনের জন্ম? শুখন নরসিংকে বললে—উকিলবাবু আপনাকে যানে বলছেন সিংজী।

—যাব। আর দুটো কথা আছে।

—সে কাল হবে। রামধনি! ডাকলেন উকিলবাবু।—এই নূতন ঝিকে নিয়ে যা। বুঝলি?

শুখনরাম বললে—খাস বাবুর ঘরের কাজকাম করবে—বাবুকে সেবা-উবা করবে। খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল শুখনরাম। উকিলবাবু ধমক দিয়ে বললেন—থাম, থাম। সে ও জানে। যাও গো তুমি, এর সঙ্গে যাও।

শুখনরাম ফট্‌কিকে বললে—যা না রে!

নরসিং স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ফট্‌কির দিকে। রাত্রে ফট্‌কির চেহারা বদলাত আগে, বাঘিনীর মত চোখ জলত, কিন্তু ফট্‌কি আজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। আজই হয়েছে, কি কতদিন হয়েছে, কে জানে! আজ কিন্তু নরসিংয়ের চোখে পড়ল। তার আজকার এমন চেহারা আর কখনও নরসিং দেখে নি। প্রথম যেদিন নরসিং মাঠের মধ্যে তিরস্কৃতা ম্লানমুখী ফট্‌কিকে দেখেছিল—সে চেহারাও তার মনে আছে, সেদিন পথে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল—মেয়েটি যেন গরুর গাড়ির চাকায়-লাগা টুকরো মাটির মত, অসহায়ের মত, চাকার লেগে দেশ থেকে দেশান্তরে চলেছে। আজকার চেহারা তার অত্যন্ত করুণ। ফট্‌কি এ জীবনে কখনও কাঁদে নি। শুধু হেসেছে; সে কি হাসি! কাচের পেয়ালার আওয়াজের মত আওয়াজ বেজে ওঠে সে হাসিতে। মদভর্তি কাচের পেয়ালার মতই ফট্‌কি—তাকে যে আদর করে তুলে মুখে ধরেছে, তারই মুখে সে ওই হাসির আওয়াজ নেশার মৌজ যুগিয়েছে। হঠাৎ যেন মদ-ভরা কাচের পেয়ালা দুধ-ভর্তি জয়পুরী শ্বেত-পাথরের গেলাস হয়ে গিয়েছে জাদুর মত কিছুর ছোঁয়া লেগে। রাত্রের অন্ধকারে আসত, আলো জ্বালতে সাহস করত না; নরসিং ঠাওর করতে পারে নি ফট্‌কির এই পরিবর্তন। সুন্দর রঙ ফট্‌কির, সাদার সঙ্গে একটা লালচে আভা খেলত; আজ সে লালচে আভা কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

রামধনি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ফট্‌কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা নড়ে নি। এক নূতন দৃষ্টি চোখে নিয়ে নরসিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কিছু বলছে। কি বলছে সে কথা শুখনরাম বুঝতে পারলে না, উকিলবাবু বুঝতে পারলে না, কিন্তু নরসিংয়ের বুঝতে ভুল হল না। চোখের কোল-ভরা জল তারা না-দেখে-দেখে আজ আর দেখতেই পায় না।

শুখনরাম এবার ধমক দিয়ে উঠল—আরে হারামজাদী, তুর কানে আসছে না বাত্—না কি?

পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শুখনরাম তাকে সামনে ঠেলে দিলে।—যা-ও!

অতর্কিতে ধাক্কা খেয়ে ফট্‌কি হয়তো উপুড় হয়ে যেত; কিন্তু নরসিং তার আগেই এগিয়ে এসে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললে। শুধু ধরে ফেলে তাকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েই ক্ষান্ত হল না, সকল বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে সমস্ত সঙ্কোচ লজ্জাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পাশে টেনে নিয়ে বললে—না।

এই আকস্মিক ঘটনায় এবং নরসিংয়ের গলার আওয়াজে শুখনরাম-উকিলবাবু চমকে উঠলেন, রামধনির হাতে একটা কাচের গেলাস ছিল—সেটা তার হাত থেকে পড়ে ঝনঝন্ শব্দে ভেঙে গেল।

উকিলবাবু হাজার হলেও উকিলবাবু—তিনি সর্বাগ্রে সামলে নিয়ে নরসিংয়ের স্পর্ধায় রাগে জলে উঠে চিৎকার করে উঠলেন—ই-উ সোয়াইন!

নরসিং চিৎকার করে উঠল—খবরদার! তার পর ফট্‌কির হাত ধরে টেনে বললে—আয়, চলে আয়।

উকিলবাবু বললেন—তোমাকে আমি জেলে দেব। আমার ঝি—

নরসিং বললে—ও আমার পরিবার।

—বেটা শয়তান, তুই ছত্রী আর ও সদ্‌গোপ বিধবা ; তোর পরিবার ?

—হাঁ হাঁ। আমি মর্দনা ও আমার আওরৎ। ছত্রী ? সদ্‌গোপ ? হা-হা করে হেসে উঠল নরসিং।

এতক্ষণে শুখনরাম চিৎকার করে উঠল—বন্দুক—বন্দুক—আপনার বন্দুকঠো নিকলান ওকিলবাবু—বন্দুক !

নরসিংয়ের হাসি তখনও থামে নাই, এ কথায় সে হাসিতে তার আবার জোর ধরে গেল। সে পকেট থেকে বড়-ফলার চাকু-ছুরিটা বার করে খুলে ফেললে।

মফস্বলের শহর, তাও সদর-শহর নয়—মহকুমা-শহর। বড় রাস্তায় টিম্‌টিমে কেরোসিনের আলো জ্বলে এখানে ওখানে একটা। গলিপথগুলোর এ-মাথায় একটা আলো, ও-মাথায় একটা আলো, মাঝখানটা অন্ধকার। সেই অন্ধকার গলিপথে হনহন করে চলেছে নরসিং। ফট্‌কিকে ছুটতে হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গ রেখে। নরসিংয়ের এক হাতে টর্চ, এক হাতে সেই ছুরিটা। মধ্যে মধ্যে টর্চটা জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। মনে কোন ভাবনা-চিন্তার অবসর নাই। সকল ভাবনা-চিন্তার আজ একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। নরসিং জানে, সে বিশ্বাস করে, মানুষের ভাবনা-চিন্তায় দুনিয়ার কোন কিছুরই ফয়সালা হয় না। ফয়সালা-করনেওয়ালা একজন আছেন, তিনিই করে দেন সকল কিছুর শেষ রায় হুকুমনামা, তার উপর কোন আর্জি-আদালত চলে না। নইলে ঠিক যখন এখানকার হাটের সকল ভালমন্দ লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল, মোটর-সার্বিসের জন্য যখন আর কারুর খাতির রেখে মন যুগিয়ে চলবার আর প্রয়োজন রইল না, উকিলবাবু শুখনরাম এঁদের কারুর সঙ্গেই নির্ভয়ে সোজা তকরার করতে এতটুকু ভয়ও আর তার রইল না, তখন ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ফট্‌কির সম্বন্ধে একটা ফয়সালা করবার জন্য তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন কেন ? উকিলবাবু যদি নরসিংয়ের প্রস্তাবে আপত্তি না করতেন, তা হলে নরসিং কি করত কে জানে ? সে কি এমনিভাবে ফট্‌কিকে নিয়ে ছুরি ঘুরিয়ে চলে আসত ? না, চুপ করে মুখ নামিয়ে বসে থাকত, ফট্‌কি কিছুক্ষণ কেঁদে চোখ মুছতে মুছতে উকিলবাবুর অন্দরে গিয়ে ঢুকত, নরসিংও ফিরে এসে খুব মদ খেত, হা-হুতাশ করত ? কোন কসবীর বাড়ি যেত ? বড় জোর যেন্নী নীলিমার কথা নিয়ে মনে মনে কাহিনী তৈরী করত! সে মনে মনে বললে—দুনিয়াদারীর মালেক শিউশঙ্কর রাম ভগবান—তোমার পায়ে হাজার বার পরণাম। মানুষ কি নিজের মন বুঝতে পারে ? বার বার তার ভুল হয়। অবতার যে রামচন্দ্র, তিনি বুঝতে পারেন নাই—নরসিং তো ছার মতিভ্রষ্ট মোটর-ড্রাইভার ; সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল—রামজী কাঁদলেন, সে কান্নায় পশু কাঁদল, গাছের পাতা ঝরে গেল, বনের বানর কাঁদল, তাঁর সাথী হল, দরিয়ার তুফানের উপর পাথর ভেসে রইল, রামচন্দরজী লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার করলেন। ব্যস, তাঁর ভুল হয়ে গেল।

ইজ্জৎ বড়, না সীতা বড়—এই নিয়ে সওয়ালজবাব করতে গিয়ে চুক হয়ে গেল তাঁর। বললেন আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে সীতাকে। সীতা আগুনে ঝাঁপ দিলেন। ব্যস্, তখন রামজী বুঝলেন—কার দাম বড়। ধুলার উপর লুটিয়ে পড়লেন—কাঁদলেন। সে কান্নায় আগুন নিভে গেল—বেরিয়ে এলেন সীতামাই। অযোধ্যায় এলেন। রামচন্দর রাজা হলেন, আবার প্রজার কথায় ভুল করলেন। এই ভুল করেই তো চলছে দুনিয়ার মানুষ। মন একবার বুঝেও আবার ভুল করে বসে। মহারাজা রামচন্দর অযোধ্যাপতি! তাঁর যে ইজ্জৎ, কি তাঁর যে রাজ্য সে তাঁর উপযুক্ত, তার মোহে তিনি ভুল করেছেন। নরসিংয়ের পক্ষে এই সার্বিসই তার রাজ্য। আজ যদি শ্যামনগর-পাঁচমতির মনোপলি-সার্বিসের অংশীদারীর পাট তার থাকত—তবে সেও নিশ্চয় এমনই ভুল করত। ওই মোহ ছুটে যাওয়াতেই যে কট্‌কির দাম কত তার কাছে—এক লহমায় বুঝতে পারলে। চোখের সেই দৃষ্টি আর জল এই দুই দিয়ে কট্‌কিও তার দাম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওই দুটি না দেখলে নরসিং কিছুতে বুঝতে পারত না। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য! ঝুটো-কাচ কট্‌কি এমন করে সাচ্চা পাথর হয়ে উঠল কি করে? কিসের জাদুতে? যার জাদুতেই হোক—হয়েছে—সে নিয়ে সে ভাববে না। দিন-দুনিয়ার মালিক, যাঁর জাদুতে দুনিয়ার দিন-রাত্রির খেলা চলছে; যাঁর জাদুতে পাখিতে গান গায়, ফুলে সুবাস বিলায়, জাদুতে ছোট খুকী বড় হয়ে হয় বহুড়ী, বুকে তার জমে মউফুলের মধু, বহুড়ী হয় মা, বুকের মৌ-ফুলের মধু হয়ে যায় ক্ষীর—এ হল সেই দিন-দুনিয়ার মালিকের জাদু। সেই মালিকের কাছে নরসিং বার বার আর্জি জানালে—সকল জাদুর সেরা জাদুওয়ালা, সকল হাকিমের শেষ হাকিম, কট্‌কির উপর এই যেন তোমার শেষ জাদু হয়, এই যেন তোমার শেষ হুকমত—শেষ রায় হয়।

—একটু আস্তে চল। কট্‌কি হাঁপাচ্ছে, সে আর চলতে পারছে না।

—আস্তে?

—হ্যাঁ।

নরসিং বসে পড়ল মাটিতে। বললে—আমার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপে নে।

—না।

—না নয়। এখুনি জলদি গিয়ে আমাকে গাড়িখানা বার করে নিতে হবে সাহু বেটার ওখান থেকে। বেটা যদি এসে গাড়িটা আমার আটকে দেয় তো মুস্কিল হবে! চেপে নে।

কট্‌কি আর আপত্তি করলে না। অন্ধকার গলিপথে কট্‌কিকে পিঠে নিয়ে নরসিং চলতে লাগল। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল। মনে হল জাদুর মন্তরটা সে জানতে পেরেছে। ঠিক তাই। সে ডাকলে—কট্‌কি!

—কি?

—একটা কথা শুধাব, ঠিক জবাব দিবি?

—বল।

—ঠিক জবাব দিবি?

—তোমার গা ছুঁয়ে কি মিছে কথা বলতে পারি আমি ?

—তোর বাচ্ছা, মানে, ছেলে হবে—নয় ?

ফট্‌কি বলে উঠল—ধ্যেৎ।

—আমি বুঝেছি রে, আমি বুঝেছি।

ফট্‌কি বললে—না—না—না। তোমাকে ছুঁয়ে মিছে আমি বলব না।

—তবে ?

—কি তবে ?

—সেই ফট্‌কি তুই এমন হলি কেন ? উকিলবাবুর বাড়িতে তো খুব সুখে থাকতিস। বুড়োর পরিবার নাই, বড়লোক, তুই তো ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ওঠাতে বসাতে পারতিস।

ফট্‌কি জবাব দিল না।

—আমার সঙ্গে এলি কেন ?

—জানি না।

—জানিস না ?

—না। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

নরসিং হয়ত হাসতো এ কথায়, কিন্তু হাসতে পারলে না, তার ঘাড়ে ফোঁটা ফোঁটা গরম কিছু পড়ছে। সে চমকে উঠল। ফট্‌কি কাঁদছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—কাঁদিস না ফট্‌কি। নে, এখন নাম। এসে গিয়েছি। তুই এই গাছতলায় দাঁড়া। আমি গাড়িটা বার করে আনি।

—এখুনি পাঁচমতি যাবে ?

—না। আমার এক দোস্ত আছে এখানে—তার বাড়ি যাব।

জোসেফের বাড়িতে উঠল নরসিং। বাড়ির কাছে এসে নরসিংয়ের একটু দ্বিধা হল ; ভয়ও হল। নীলিমা ? সে কিভাবে গ্রহণ করবে তাদের ? হয়তো ঘেন্নায় মাটির উপর থুথু ফেলবে। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চোখা-চোখা কথা বলবে। হয়তো বলবে—এই ধারার জঘন্য কারবারের মধ্যে তারা নিজেদের জড়াতে পারবে না। জোসেফকে সে ভয় করে না, সেই তার ভরসা, সেও মোটর-ড্রাইভারি করে। একসঙ্গে তারা মদ খায়।

আশ্চর্যের কথা কিন্তু, নীলিমা ঠিক উল্টো ব্যবহার করলে—নরসিংয়ের সঙ্গে ফট্‌কিকে দেখে প্রশ্ন করলে—এটি কে নরসিংবাবু ?

নরসিং এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে—ওটি ? ওকে আমি ভালবাসি মিস দাস। মানে, ওকে আমি বিয়ে করব। নীলিমার কাছে বিয়ে করব কথাটা বলে ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র না করে পারলে না।—মানে, বিধবা বিয়ে।

—বলেন কি ? দেখি—দেখি কেমন বউ হবে ? নীলিমা বাঁ হাতে ফট্‌কির ঘোমটা সরিয়ে ডান হাতে হ্যারিকেনটা তুলে ধরলে। ফট্‌কিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—বাঃ

বাঃ, এ যে ভারী সুন্দর বউ হয়েছে নরসিংবাবু। আমাদের খাওয়াচ্ছেন কবে?

—খাওয়াব। তার আগে যে বিপদে পড়েছি তা থেকে উদ্ধার করুন। জোসেফ কই?

—সে আজ খুব নেশা করেছে, বিছানায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, বিড়বিড় করে বকছে। কিন্তু বিপদটা কি?

চিন্তিত হয়ে নরসিং বললে—তাই তো!

—তাই তো বলে চিন্তা কেন? আমাকে বলুন না? আমি কিছু করতে পারি কি না ভেবে দেখি।

—শুনবেন? কিন্তু—

—কিন্তুটা কিসের?

একটু ভেবে নিয়ে নরসিং বললে—শুনুন। কিন্তু আর কিসের! ঠিক কথা। সে পকেট থেকে শিশিটা বার করে অবশিষ্ট মদটুকু নিঃশেষে খেয়ে বললে—আপনার দাদা মোটরের কাজ করে। খানিকটা তো বুঝতে পারেন আমাদের ধাত। মেয়েটিকে এনেছিল—কিনে এনেছিল ওর বাপের কাছ থেকে শুখন সাহু। আমিইগাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম শুখনকে আর ওকে শ্যামনগর। তারপর—

হেসে নীলিমা বললে—ভালবাসা হল দুজনে!

—হ্যাঁ। আজ হঠাৎ বুড়া উকিলবাবুর কাছে শুখন সাহু ওকে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি।

—বেশ করেছেন।

—ওরা যদি পুলিসে খবর দিয়ে জবরদস্তি করে মামলা করে?

—মেয়েটি তো বলবে, ও আপনার সঙ্গে ইচ্ছে করে এসেছে? কি ভাই—কি বলছ? ফটকি সলজ্জভাবে হেসে মুখ নামালে।

নরসিং বললে—ওকে তো ওর বাপ বিক্রি করেছে।

হেসে নীলিমা বললে—এ যুগে মানুষ কেনা-বেচা হয় না তবে অন্য রকম মিছে মামলা করে হয়রান করতে পারে। বেইজ্জৎ করতে পারে কোর্টে।

—বেইজ্জতি?—হেসে উঠল নরসিং।

একটু চুপ করে থেকে নীলিমা বললে—আসুন আমার সঙ্গে। সাবধান হওয়া ভাল।

—কোথায়?

—রেভারেণ্ড ব্যানার্জিদের বাড়ি। ওঁদের বাড়ির ছোট ছেলের কাছে। তাঁর পরামর্শ নিয়ে যদি পুলিসে কি এস-ডি-ওর কাছে খবর দিয়ে রাখতে হয় তো দিয়ে রাখতে হবে।

•

বেশি দূর নয়, কিন্তু কাছেও নয়। ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘিটার উত্তরপাড় আর দক্ষিণপাড়। মধ্যে পূর্বপাড়ে গির্জা, মিশন, সমাধি-ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল—তারা আভিজাত্য বজায় রেখে দক্ষিণ দিকে বাড়ি করেছিল।

অন্ধকার নির্জন পথে নীলিমার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে নরসিংয়ের মন যেন কেমন অনুশোচনায় ভরে উঠল। এই কালো মেয়েটি, এই তার আকাশের ফুল! আকাশের ফুল—রাত্রের অন্ধকারে আকাশে-ফোটা ফুল ফেলে সে মাটিতে-ফোটা ফুল তুললে. অবশেষে? অথচ—অথচ তার মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছা করলেই আকাশের তারাফুল পেতে পারত। নীলিমা নীরবে পথ চলছে। কোন কথা আর বলে না। কি ভাবলে নীলিমা? ইচ্ছে হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে নীলিমার মুখে হাত বুলিয়ে দেখে, আঙুলের ডগায় গরম জলের স্পর্শ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে সে।

রেভারেণ্ড ব্যানার্জির ছোট ছেলে লেখাপড়া-জানা লোক। এককালে বসন্ত হয়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে ক্রীশ্চান হওয়া সত্ত্বেও ভাল চাকরি পাওয়া সম্ভবপর হয় নি; সারা মুখে বসন্তের দাগ, ভদ্রলোককে কুৎসিত দেখায়। কিন্তু লোকটি বড় ভাল। নীলিমা তাঁকে সব বলতেই তিনি বললেন—মেয়েটিকে মিশনে এনে রেখে দাও রাত্রে। তার পর যা হয় কাল করব। নরসিংকে বললেন—কিছু হবে না এতে। ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নীলিমা বললে—কাল নয়, আজই।

—অন্ধকার রাত্রি, তার উপর একটা চোখ নেই—

হেসে নীলিমা বললে—একটা তো আছে! ওতেই হবে। মিস্টার সিংয়ের গাড়িতে যান আপনি।

—হ্যাঁ। নরসিং সায় দিলে।

হেসে ব্যানার্জি বললে—আচ্ছা।

—চলুন। নীলিমা বেরিয়ে এল নরসিংয়ের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে বললে—দাঁড়ান। আবার সে ভিতরে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তারার দিকে চেয়ে নরসিং দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল নীলিমার কথা। এ কি মেয়ে! এর সঙ্গে কি ফট্‌কির তুলনা হয়? এ মেয়ে নরসিংয়ের জীবনে শুধু স্বপ্ন। কিন্তু না, অনুশোচনা সে করবে না।

—ঠিক তো? বলতে বলতে বেরিয়ে এল নীলিমা।

—ঠিক।—ব্যানার্জিও বেরিয়ে এসেছে।

—নরসিংবাবুকে বলি তা হলে? নীলিমা বললে।

—হ্যাঁ, বল।

—চলুন।—নীলিমা বললে নরসিংকে।

অন্ধকারে আবার দুজনে চলল। নরসিং বললে—আমাকে কি বলতে বললেন ব্যানার্জি?

—ব্যানার্জি না—আমি। আমি বলব আপনাকে।

—কি?

আপনাদের উপকার করছি—তার বদলে আমার, মানে—আমাদের একটা উপকার করতে হবে। কাল রাত্রে আমাকে আর ব্যানার্জিকে ঘাটরোড স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে।

কাউকে না জানিয়ে—দাদাকে পর্যন্ত না।

নরসিং থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নীলিমা বললে—আমার মায়ের আপত্তি উনি কানা বলে, দেখতে কুৎসিত বলে; ওঁদের বাড়ির আপত্তি আমাদের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ওঁদের কারও বিয়ে আজও হয় নি। অথচ আমরা অনেক দিন থেকেই পরস্পরকে ভালবাসি। উনি আমাকে ম্যাট্রিকের সময় পড়া বলে দিতেন, সেই সময়—। হাসতে লাগল নীলিমা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ পর সে আবার বললে—এবার আমাদের বিয়ে করতেই হবে নরসিংবাবু।

নরসিং প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবেন?

—কলকাতা। এখানে অনেক হাঙ্গামা হবে। দু-পক্ষের ঝগড়া-ঝাঁটি। কলকাতাই সব চেয়ে ভাল জায়গা। কিছুক্ষণ পর আবার সে প্রশ্ন করলে—ও রাস্তায় তো সাহুরা মনোপলি সার্বিস করছে। আপনি কোথায় যাবেন?

নরসিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেখি। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। পাঁচমতির রাস্তায় কাঁকরপাথর ফেলেছে, নোটিস দিয়ে রাস্তা বন্ধ; গাড়ি নিয়ে ওদিকে বেরুবার পথ নেই। এদিকে ঘাটরোডে গঙ্গা। পথঘাট শুকুক। আমিও ভেবে দেখি—কোথায় যাবো। যাব কোথাও! এত বড় দুনিয়া! একটা পথ ধরব।

নীলিমার কানে নরসিংয়ের উদাস ভাবটুকু এড়িয়ে গেল না; নরসিংয়ের দুঃখের স্পর্শ তাকেও ব্যথিত করে তুললে। সত্যই তো দুঃখের কথা। নরসিং ভাঙা-চোরা পথে প্রথম সার্বিস খুলে দিলে। আজ সেই পথ মেরামত করে আর একজনকে মনোপলি সার্বিস খুলে দেওয়া হলে তার দুঃখ হবারই কথা। সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, না? দুঃখ পাবারই কথা।

নরসিং কথার জবাব দিলে না। তার মাথার মধ্যে জটিল চিন্তা পাক খাচ্ছিল। দুঃখ—দারুণ দুঃখ তার মনে রয়েছে। সেটা কিসের জন্যে সে তা বুঝতে পারছে না। পকেট থেকে বার করলে মদের শিশিটা। কিন্তু শিশিটা খালি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে মদের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

নীলিমা হাসলে, বললে—ফুরিয়ে গিয়েছে?

উত্তর দিলে না নরসিং। গাড়ি বার করতে ব্যস্ত হল।

নীলিমা বললে—ভালই হয়েছে। বেশি না খাওয়াই ভাল। একটা কাজে আছেন।

নরসিংয়ের আফসোস হল। আর এক শিশি হলে সে পারত। এই মুহূর্তে গাড়ির মধ্যে নীলিমাকে টেনে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারত গাড়িটা। কিংবা ব্যানার্জিকে গাড়িতে চাপিয়ে একটা গাছে কি লাইটপোস্টে ধাক্কা মারতে পারত।

হঠাৎ সে সজাগ হয়ে উঠল। ফুটব্রেক কষে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে সে সামলে নিলে। দীঘির ধারে এসে পড়েছিল গাড়িটা। আরে বাপ! ছুটে গেল তার নেশা।

নীলিমা হেসে বললে—যাক, সামলে নিয়েছেন। সাবধান, খুব সাবধানে চালাবেন কিন্তু। গুডলাক্!

এবার নরসিংও মৃদু হেসে বললে—গুডলাক্। আপনাকে গুড লাক্ জানাচ্ছি।

উনিশ

সেই বাদশাহী সড়ক। উঁচু-নীচু, গর্ত-গচকা, ধুলো-কাদা-ভরা কত শ বছরের পথ, দু-পাশে গাছের সারির তলায় আগাছার জঙ্গল, কুলকাঁটার ঝোপ ভর্তি করে রেখেছিল। মধ্যে মধ্যে ঝোপের ভিতর থেকে সাপের হিস্-হিস শব্দ শোনা যেত, সাপে-ধরা ব্যাঙের কাতরানির আওয়াজ উঠত। রাত্রে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে শেয়াল নেকড়ের চোখ জ্বলতে দেখা যেত—জ্বলন্ত আঙরার টুকরোর মত। মধ্যে মধ্যে পাথরের মাথা উঠে থাকত, সে পাথরে যে কত কালের কত লোকের জখম নখের রক্ত লেগেছে তার হিসেব নাই। কাদাভর্তি খন্দকে কত লোকের জুতো বসে থেকে গিয়েছে—তারই বা কে হিসেব রাখে! আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছে এমন লোকের কত কিছু হারিয়েছে, মেয়েদের কানের টাপ, হাতের বাজুর ঘন্টি, গলার মাদুলী কত কি-না খসে পড়েছে সেই ধুলো-কাদায় জরাজীর্ণ সড়কের বুকে!

সে বাদশাহী সড়ককে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন চেহারা হয়ে গিয়েছে তার। ঢিলে-চামড়া গাল-তোবড়ানো কুৎসিত বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার হাকিমের তাজা দাওয়াইয়ে আঁটসাঁট-গড়ন চকচকে-চামড়া কাঁচা-জোয়ান হয়ে উঠেছে। তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তার দু-পাশে ফুটপাতের মত ছ-ফুট করে বারো ফুট বয়লারের ছাইঢাকা কাঁচা—মাঝখানে ষোল ফুট পাকা; লাল মোরামের আস্তরণ বিছানো সমতল ঝক্‌ঝকে-তকতকে চোখ জুড়ানো ষোল ফুট চওড়া লাল ফিতের মত পথ। দু-পাশের ছাই-বিছানো ধূসর রঙের মাঝখানে টকটকে লাল—ভারী বাহার দিয়েছে। ধূসর রঙের দু-পাশের কাঁচা অংশের কিনারায় দূর্বাঘাসের চাপড়াবন্দী চলে গিয়েছে সিধে লাইন্ ধরে। আগাছা কুলঝোপ বিলকুল সাফ হয়ে গিয়েছে। চোখে যেমন বাহার দিচ্ছে—চলেও মানুষ তেমনি আরাম পাবে। কুলকাঁটা শুকিয়ে ঝরে পারে ফুটবে না, মাথা-তুলে-থাকা পাথরে হোঁচট লেগে নখ যাবে না। কাদায় পিছলে পড়ে মানুষ আছাড় খাবে না। শুধু কষ্ট হবে গরুর, ধুলো-কাদার মধ্যেই ওদের চলতে আরাম, ছেলেবেলায় পড়েছে নরসিং—'গরুর ক্ষুর চেরা বলিয়া—।' আর কষ্ট হবে কিছু খালি-পায়ে যে সব মানুষ হাঁটে তাদের; খুব বেশি হবে না—আজন্ম খালি পায়ে হেঁটে ওদের পায়ের তলার চামড়া এমন শক্ত যে শুকিয়ে নিয়ে ঢাল তৈরি করা যায়। আর কষ্ট হবে সেই বেটা হাঁটুভাঙা খোঁড়ার—যে লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে শ্যামনগর থেকে পাঁচমতি পর্যন্ত ভিক্ষা করে বেড়ায়। তা সেও ঠিক ফিকির বার করে নেবে কয়েকদিনের মধ্যে, হাঁটুতে চটের প্যাড লাগিয়ে নেবে, হাতে ফিতে-বাঁধা খড়মের মত দুটো চাকতি লাগিয়ে খট্‌খট্ থপ্‌থপ্ করে চলবে। না চলতে পারে, বাস্ সার্বিস হল—বাসে ভাড়া দিয়ে যাবে আসবে। গাড়ির জন্তেই পথ সড়ক, পায়ে যারা হাঁটবে

তাদের জন্যে শহরে গাঁয়ে গলি—মাঠে-প্রান্তরে 'গোন' আছে, সেই পথে তারা চলুক। 'গোন' হল—মাঠ, পতিত জমি, বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা ফালি পথ; গহনের মধ্যে দিয়ে সেই হল 'গোন'। ইমামবাজারের বড়বাবু বি-এ পাস, তিনি বলতেন কথাটা। বিশ্বাস না কর জিজ্ঞাসা কর এখানকার তেমুণ্ডে বুড়োদের—বাদশাহী সড়কের কথা। কত কাল—কত শ বছর আগে কোন্ নবাব কি বাদশা তৈরি করিয়েছিলেন এই সড়ক তা তারা জানে না—কিন্তু কেন তৈরি করিয়েছিলেন সে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর ফৌজ যাবে বলে। পয়দল পল্টন যেত নাল-মারা জুতোর আওয়াজ তুলে—কুচকাওয়াজের কায়দায় একসঙ্গে পা ফেলে—হাত দুলিয়ে, তলোয়ার বাগিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে। ঘোড়সওয়ার যেত চার ক্ষুরে ধুলো তুলে, আওয়াজ তুলে। হাতি যেত হাওদা পিঠে—আরও হাতি যেত তোপ টেনে নিয়ে, উট যেত সওয়ার নিয়ে, গাড়ি টেনে—উটের গাড়িতে যেত সরঞ্জাম, বয়েল চলত পিঠে ছালা নিয়ে, বয়েল গাড়ি যেত, তাতে যেত বিবি-বাঁদি, আর যেত রসদ। বুড়োরা বলে—"গল্প নয় বাবা! জমিদার-বাড়ির পুরনো কাগজে প্রমাণ আছে, দেখে এস; ঘোড়ায় হাতিতে উটে ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে যাবে না—খেয়ে তছনছ করে দেবে না—এর জন্যে মাথট লাগত—নজর সওয়ারী মাথট!"

বাদশাহী ফৌজ চলে যেত—তার পর জমিদার আমীরের হাতি ঘোড়া পালকী বয়েল গাড়ি, পাইক বরকন্দাজ লোক-লস্কর। তার পর সড়কে চলত ব্যাপারীদের কারবার, ছালার বয়েল, ছালার ঘোড়া, মালের গাড়ি। তার পর চলত গৃহস্থ চাষীরা—ক্ষেত-খামারে ধান-চাল কলাই তিসির বস্তা বোঝাই নিয়ে ভারী মজুর চলত ভার কাঁধে—তার পর চলত রাহী।

এবার ইংরেজের আমলে সেই কাঁচা সড়ক হল পাকা। বিলাত না আমেরিকার পেট্রোল-কোম্পানি মোটর-কোম্পানি দিলে টাকা। সেই টাকায় মেটে রাস্তার উপর বিছানো হল ইটের খোয়া, তার উপর দেওয়া হল পোড়া কয়লার ছাই আর কুঁচি পাথর, চালানো হল রোলার—সমান হয়ে বসে গেল পাকা ইমারতের মেঝের মতন—তার উপর দেওয়া হল লাল মোরাম, ফের চালানো হল রোলার; দু-পাশের ঝোপ আগাছার জঙ্গল কাটা হল; সাপ মরল, বিছে মরল, গোসাপ মরল, উই-পোকা পিঁপড়ে মরল—সে চোখে দেখা গেল না—মাটির তলায় চাপা থাকল। তার উপর ঢালা হল বয়লারের ছাই। চালানো হল রোলার। দু-দিকে ধারি কাটা হল দড়ি ধরে, ঘাসের চাপড়া বন্দী করে ঘাসের শিকড়ের জালের বাঁধন দেওয়া হল মাটিতে। পাকা হয়ে গেল রাস্তা। মাঝখানে পুরা পাকা, দুটো ধার আধ-পাকা। মাঝখানে চলবে মোটরবাস্ ট্যাক্সি ট্রাক; সেই আমেরিকা থেকে আসবে মোটর পেট্রোল মোবিল টায়ার টিউব, এখানে পাকা রাস্তায় চলবে ফুল স্পীডে। দু-পাশের আধ-পাকা রাস্তার ফালিতে চলবে গরুর গাড়ি, ছালার গরু, রাহী মানুষ। নরসিং বলে—বাদশাহী সড়ক, আংরেজী ইস্টিরিট বনে গেল। কখনও বলে—রোড। রোড কি ইস্টিরিট কোন্‌টা ঠিক সে জানে না। 'ইস্টিরিট' শব্দটা তার ভাল লাগে বলে ওইটাই ব্যবহার করে বেশি।

এই রাস্তার মনোপলি সার্বিস নিয়েছে—'সাহু এ্যাণ্ড বোস ট্রান্সপোর্টস'। গুখনরাম সাহু আর সেই বুড়ো বোসবাবু উকিলের বেকার ছেলে। ঝকঝকে সবুজ রঙের দুখানা 'এক টনি' বাস্ এসেছে—একখানার নাম "জয় গণেশ," অন্যখানার নাম "উল্কা", পাশে ইংরাজীতে লেখা Express (এক্সপ্রেস)। 'একখানা আপ—একখানা ডাউন গাড়ি। আরও এসেছে একখানা ট্যাক্সি, একখানা ট্রাক। পাঁচমতির বাবুদের তিন বাড়ির তিনখানা মজবুত সস্তা ফোর্ড গাড়ির অর্ডার গিয়েছে।

রাস্তা আজই খুলেছে। কালেক্টর সাব এসে রুপোর কাঁচি দিয়ে কেটে দিলে লাল ফিতের মাঝখানটা। ব্যস্—বেরিয়ে গেল সার্বিসের দুখানা বাস। তার পর হল চা খাওয়া।

সেই দিন থেকে চার মাস পর। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ও কার্তিক পার হয়ে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম। আজ রাস্তা খুললে, সাহু কোম্পানির সার্বিস আরম্ভ হল। নরসিং আজই চলল শ্যামনগর থেকে। আর একটা দিন সে এখানে থাকতে পারবে না। ভাঙাচোরা ধুলোয়-কাদায় গর্ত-গচকায় কাঁটায়-পাথরে ভর্তি রাস্তায় নিজের সর্বস্ব ওই গাড়ি তার সঙ্গে নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে সে-ই প্রথম খুলেছিল সার্বিস, আজ এই নতুন রাস্তায় সেই লাইন থেকে উৎখাত হল—আর শ্যামনগরে সে থাকতে পারবে না। সেও চলেছে আর এক দিক লক্ষ্য করে। চার মাস বসে আছে—এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ছিল না। তা ছাড়া হাঙ্গামার পড়েও আটক হয়ে গিয়েছে।

সাহু মামলা করেছিল—ফটকির জন্যে। নিজে নয়, সে আর উকিলবাবু আড়ালে থেকে ফটকির দেওর আর বাবাকে দিয়ে মামলা করিয়েছিল। বহুত তোড়জোড়, নানান আঁকা-বাঁকা ফন্দি-ফিকিরের সে জাল। সাজা হলে নরসিংকে চালান দিত দায়রায়, সেখানে কালা-পানি বেত দুই-ই হতে পারত। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল—"মোটর-ড্রাইভারের কুকীর্তি! নারীহরণ!"

সাহুর টাকায় এখানকার এক বাঘা উকিল—বুড়ো উকিলবাবুর পরামর্শ নিয়ে সওয়াল করেছিল—"এই যে আসামী, এর প্রকৃতির দুটি কথা আমি সর্বাগ্রে বলতে চাই। এ হল গিরবর-জার ছত্রীর ছেলে। এই বংশটির মধ্যে নারীঘটিত কুকীর্তি একটা কুখ্যাতি লাভ করেছে। এর জন্যে এরা ধ্বংস হয়ে গেল। আর এ হল পেশায় মোটর ড্রাইভার। মোটর-ড্রাইভারদের পক্ষে একটা অতি সাধারণ কর্ম।"

নরসিং আদালতেই বলে উঠেছিল—হাঁ হাঁ, মোটর-ড্রাইভার লোক ডাকাত, মোটরে ডাকাতি হয়, মোটর-ড্রাইভার লোক মাতাল, মোটর-ড্রাইভার লোক আওরত নিয়ে ভাগে। মোটর-ড্রাইভারের চেয়ে খারাপ লোক দুনিয়ায় নাই।

হাকিমের ধমক খেয়ে চুপ করেছিল নরসিং। দায়রায় চালান যাবার জন্য মনকে তৈরি করছিল। কিন্তু হাকিম দিলে বেকসুর খালাস।

এ খালাসের জন্য নরসিং তার নসিবের প্রশংসা করে না। তার নিজের উকিলের ওকালতি বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করারও কিছু নাই। বাঁচিয়েছে তাকে ফটকি।

দিনের বেলায় ফট্‌কি ছিল বোবা মেয়ে—মাটির পুতুল। আদালতের কাঠগড়ায় হাকিম উকিল পেস্কার আর ঘর-ভরা লোকের সামনে কোন মন্ত্রে কোন দেবতার আশীর্বাদে দিনের বেলায় সেই মাটির ফট্‌কি মানুষ হয়ে কথা বলে উঠল। বাঁধ দিয়ে আটক করা থির জল বাঁধ ভেঙে ঝর ঝর আওয়াজ তুলে বেরুতে আরম্ভ করলে—তাকে যেমন আর আটকে দেওয়া যায় না তেমনি ভাবে তার যে মুখ আদালতে দিনের বেলায় খুলল—সে আর বন্ধ হল না।

ফট্‌কি এসে কাঠগড়ায় উঠল; মাথায় ঘোমটা কমিয়ে লোক-ভরা আদালত-কামরায় চারিদিকে চাইলে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল করে। তার পর তার চোখ পড়ল নরসিংয়ের উপর। তার মুখে একটু হাসি দেখা দিলে, চোখের হতবুদ্ধির ঘোর কেটে গিয়ে যেন দেওয়ালগিরির জোড়া সেজের মধ্যে দপ্‌ করে মোমবাতির আলো জ্বলে উঠল। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলে সে কাঠগড়ার কাঠের ফ্রেম। গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। সাহেব উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—নরসিং তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছে কিনা, উকিলবাবুর বাড়িতে ঝি থাকতে যাবার পথে?

সে ঘাড় নাড়লে। সে ঘাড় নাড়ার দোলায় তার মাথার ঘোমটা খসে পড়ে গেল। নরসিংয়ের মুখের দিকেই সে চেয়েছিল—ঘোমটা তুলতে বোধ হয় ভুলে গেল।

উকিল ধমক দিয়ে বললে—আমার দিকে চাও।

ফট্‌কি কিন্তু চোখ ফেরালে না।

উকিল বললে—কথার জবাব দাও। নরসিং তোমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কি না?

ফট্‌কি নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়েই হাসিমুখে বললে—ওকে আমি ভালবাসি। আমি ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে এসেছি। ওর সঙ্গেই যাব।

—তোমার বাপ—দেওর,

—না—না—। উকিলকে কথা শেষ করতেই দিলে না ফট্‌কি। অসহিষ্ণু হয়ে কথার মাঝখানেই বলে উঠল—না—না। কথা বলার সঙ্গে সে প্রবলভাবে ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করলে—না। না। না। না।

একদিন নয়, পুরো আড়াই দিন ফট্‌কির এজাহার নিয়ে লড়াই হয়েছিল। আড়াই দিনই নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে ফট্‌কি এজাহার দিয়েছে। সে তার কি কথা! একঘর লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। পচা নর্দমার গন্ধে জমা[illegible]ত নীলচে রঙের ভন্‌ভনে মাছির মত একঘর লোক। মধ্যে মধ্যে উকিলের বিশ্রী প্রশ্ন এবং ফট্‌কির বেপরোয়া জবাবগুলি শুনে মাছির ভন্‌ভনে আওয়াজের মত কুৎসিত কথা ও কদর্য হাসিতে তারা মেতে উঠেছে। চোখের চাউনি তাদের ওই মাছিগুলোর মতই ড্যাবডেবে, সে চাউনি স্থির হয়ে নিবদ্ধ ফট্‌কির মুখের উপর। ফট্‌কির গ্রাহ্য নাই। সে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে নরসিংয়ের দিকে।

উকিল ফট্‌কিকে জিজ্ঞাসা করলে তার আগেকার কথা। বললে—তোমাদের গাঁয়ের অমুক মোড়লের ছেলে অমুককে চিনতে?

নরসিং বারণ করে উঠল কাঠগড়া থেকে—না। আমার সাজা হোক—ওসব কথা ওকে শুধাবেন না।

ফট্‌কি কী বুঝলে সে-ই জানে। সে বললে—না। আমি বলছি। আমার আবার লজ্জা কি? মান কি? ওই আমার সব। আমি সত্য কথা বলব। আমি যত বড় মানুষ তার একশ গুণ বেশী পাপ আমার। সেই পাপের জ্বালা জুড়িয়েছে—ওই মানুষের সঙ্গ পেয়ে।

সে এবার চাইলে হাকিমের দিকে। বলতে আরম্ভ করলে—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গেল তার কদর্য কলঙ্ক ভরা জীবনের কথা। শেষে বললে—এবার সে চাইলে মাটির দিকে—মাটির দিকে চেয়ে খসে-পড়া ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে বললে—হুজুর, ও মানুষ আমাকে ডাকে নাই, নিজে দোতলার বারান্দা থেকে কাপড় বেঁধে তাই বেয়ে নেমে ওর কাছে গিয়েছি, ওর বুকে গড়িয়ে পড়েছি, ও মানুষ আমার মাথায় হাত বুলিয়েছে, কিন্তু—

কিছুক্ষণ থেমে বললে—এমনি মাসের পর মাস। দু-মাস। আমি হুজুর ওই মানুষের চরণতলায় পড়ে থাকতে চাই, বাপ চাই না; দেওর চাই না; শেঠজীর ঘরের—উকিলবাবুর ঘরের সুখ চাই না; আমি ওকেই চাই। ওর কোন দোষ নাই—ওকে খালাস দেন। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ও যদি না নেয় নদীতে জল আছে, দোকানে দড়ি মেলে, কল্কেফুলের গাছে ফলের অভাব নাই—আমি মরব।

নরসিং অবাক হয়ে ভাবছিল—এ কি হল? এ কেমন করে হল? কিসের গুণে এমন হয়? পেটের জ্বালায় যে দুনিয়ায় মা ছেলে বিক্রি করে, ভাল খাবার-পরবার লোভে যে দুনিয়ায় সধবা কুমারীতে ইজ্জৎ বিক্রি করে—সেই দুনিয়ায় এও ঘটে?

এর পর ডাক্তারসাহেব ফট্‌কির বয়স পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন—বয়স বিশ বছরেরও বেশী। সে সাবালিকা।

হাকিম খালাস দিলেন নরসিংকে। ফট্‌কির উপরেও রায় হল—সে আপন ইচ্ছামত যে কারুর সঙ্গে যেতে পারে।

নরসিং কোর্টের বারান্দায় বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কি এসে সেই জনতার মধ্যেই তার বুকে মাথা রেখে কাঁধে একটি হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নরসিংও তাতে লজ্জা পায় নাই। গির্‌বরজার ছত্রীর ছেলে সে, পেশায় সে মোটর-ড্রাইভার, তার আর এতে লজ্জা কি? কিসের লজ্জা? সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌কির সেই চোখের গরম লোনা জলে নরসিংয়ের মনে আগেকার দেখা যত মেয়ের মুখের ছাপ পড়েছিল, সে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

জানকীর মুখও মনে নাই তার। নীলিমাকেও আর মনে পড়ে না। ফট্‌কি, শুধুই ফট্‌কি।

নরসিং গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

ভিতরে ফট্‌কি বসেছে নরসিংয়ের সংসার নিয়ে। জিনিসপত্রগুলো সামনে নিয়ে সে গিন্নীর মত বসেছে। সে লালপেড়ে শাড়ি পরেছে, কপালে কুমকুমের টিপ পরেছে, সিঁথিতে

সিঁদুর দিয়েছে। এ যেন সে আগেকার কালের মেয়েই নয়। হাতে পরেছে চুড়ি—গিল্টির চুড়ি। বাঁ-হাতে ধরে রয়েছে এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি, ওটাতে আছে খাবার; কোনরকমে উল্টে যায়—সেই ভয়ে ধরে রয়েছে। ডান হাতে ধরে আছে সরা-চাপা জলের কুঁজো; কোলের উপর একটা ছোট সাজি, তার মধ্যে আছে টুকিটাকি জিনিস আর নরসিংয়ের বোতল গেলাস। তিনটে বোতল আছে। কখন যে দরকার হবে তার তো কোন ঠিকানা নাই। যে মানুষ! এ ছাড়া কাপড়ের গাঁঠরি, রান্নার জিনিসপত্র, মায় একটা মোড়া। গরম পুল-ওভার পর্যন্ত বার করে রেখেছে। অগ্রহায়ণ মাস, বেলা পড়লেই চলন্ত মোটরে শীত লাগবে। এ যেন সে মেয়েই নয়; মরে গিয়ে নতুন করে জন্মেছে ফট্‌কি। ফট্‌কির পাশে বসেছে রামা। রামা ফিরে এসেছে অনেকদিন।

ফট্‌কি রামাকে বলে, দাদাভাই।

রামচন্দ্রের ভারি আমোদ লাগে, এ কি হাসির কথা! দাদা আবার ভাই কি করে হয়? সে হি-হি করে হেসেই সারা হয়, তার সে অভ্যাসের হাসি, বলে—তোমার যখন খোকা হবে তখন তাকে কি বলবে, বাবা-ছেলে?

যে-ফট্‌কি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লজ্জা পায় নাই, সেই ফট্‌কি ছেলের কথায় লজ্জা পায়, তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, রামাকে লজ্জা দিয়ে জবাব দেবার মত ভাষা খুঁজে পায় না। আবোল-তাবোলের মত জবাব দেয়—তোমার বউ হলে তাকে বলব, বিবি-বউ।

তাতে রামের আপত্তি কি? বিবি-বউ তো সে চায়। সেও মোটর-ড্রাইভারি করবে, এখন করে কণ্ডাক্টরি—এখনই তো সে মোটরের প্রতি ট্রিপে সুন্দর মুখ দেখে মনে মনে আকাশে ফুল ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে।

"পাশের জঙ্গল থেকে হুম করে লাফিয়ে গাড়ির সামনে থাবা গেড়ে বসে একটা বাঘ। মেয়েটির সঙ্গীরা ঠক ঠক্ কাঁপে। মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে যায়। তাকে 'ভয় কি' বলে আশ্বাস দিয়ে পেট্রোলের টিন ঢেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে টায়ার রিমুভারের মাথায় জড়িয়ে জ্বেলে নির্ভয়ে নেমে যায় রাম। আগুন দেখে পালায় বাঘ। ছোরা থাকলে—সে লড়াই করে। বাঘের কলিজায় বসিয়ে দেয় ছোরা।" আরো কত উদ্ভট কল্পনা করে। "অ্যাকসিডেণ্ট হয়, উল্টে যায় গাড়ি। রাম গাড়ির নীচে থেকে সযত্নে উদ্ধার করে মেয়েটিকে।"

রামও চলেছে নরসিংয়ের সঙ্গে। নরসিং জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখ্, ভেবে দেখ্, এখানে নতুন সার্ভিস খুলছে। নিতাই চাকরি পেয়েছে, তুইও চেষ্টা করলে পাবি। এখানে থাকবি, না, আমার সঙ্গে যাবি ভেবে দেখ্।

রাম বলেছে—দাদাবাবু, তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে।

নরসিং সঙ্গে নিয়েছে রামাকে। রামের কথায় কিন্তু তার হাসি আসে। রাম এখনও নিতাইয়ের মত পাকা ড্রাইভার হয় নাই তো। হলে—। বাচ্চা পাখির ডানার পালক এখনও শক্ত হয় নাই, পালকের নীচে ডানার খাঁজে খাঁজে হাড়ে মাংসে তাগদের তাগিদ আসে নাই; তাগদ হলেই সাড়া জাগবে, তাগিদ জানাবে মন। তখন পাখসাট্ মেরে নরসিংকে পাশ

কাটিয়ে আকাশে উড়বার জন্ত ছটফট করবে, ফাঁক পেলেই ভেসে পড়বে। যতদিন সে সময় না আসে ততদিন থাক্। কাজও অনেক দেয় রাম। তা ছাড়া ড্রাইভারি শেখাবার একটা সাকরেদ না পেলেও ড্রাইভারি করে মন ভরে না। ফুল স্পীডে চলতে চলতে যখন সামনে কিছু পড়ে, অ্যাকসিডেন্ট প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে, মরীয়া হয়ে অসীম সাহসে ধাঁ করে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে ক্লাচ টিপে সে অ্যাকসিডেন্টকে চুলের ফাঁকে ফেলে বাঁচিয়ে চলে যায়, তখন তার কৌশল বুঝবারও একজন লোক চাই। প্যাসেঞ্জারে বুঝতে পারে না সব ব্যাপার। বুঝতে পারে সাকরেদ—সে তারিফ করে। রাম একটু বেশী বলে ; বলে—এ বাঁচাতে পারে এমন মরদ আমি দেখি নাই। আমার বুক কাঁপছিল। বাপ রে! বাপ রে! এছাড়াও রাম জানকীর ভাই। তাই রাম সম্পর্কে অন্ত ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কি হয়!

আর সঙ্গে আছে জোসেফ। জোসেফও এখানকার চাকরি ছেড়ে এখানকার সমস্ত পাট উঠিয়ে দিয়ে চলেছে। জোসেফ বসেছে নরসিংয়ের পাশে, সামনের সীটে। নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একটা সিগারেট নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিয়ে, নিজের সিগারেটের আগুনটা দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি চলেছে ফুল স্পীডে। রাস্তায় এখন গাড়ি গরুর খুব ভিড় নাই। এই অগ্রহায়ণের প্রথম। ফসল এখনও মাঠে, সবে ধানে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে; সমতল রাস্তা—পরিষ্কার ভরা খুব লম্বা দীঘির স্থির জলের মত আরামদায় নতুন শ্যামনগর পাঁচমুণ্ডি রোড ; তার উপর চলেছে নরসিংয়ের গাড়ি, জার্কিং নাই, পুরনো গাড়িতেও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠছে না। চলেছে যেন দীঘির জলে নৌকার মত। শুধু শব্দ উঠছে চারখানা নতুন টায়ারের ঘুরপাক খেয়ে চলার। বিছানো মোরামের উপরে অল্প-স্বল্প আলগা কাঁকরের উপর একটানা স-র-র-শব্দ তুলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে। পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত পেট্রোলের ধোঁয়ার একটা আঁকাবাঁকা রেশ জেগে রয়েছে। নরসিং জোসেফকে বললে—হর্ন দিন।

সামনে ঢিমে-তেতালায় এক সারি গরুর গাড়ি আসছে। আসছে ঠিক মাঝখানটা ধরে, অর্থাৎ মোটরের জন্তে পাকা সীমানা জুড়ে, পাশের ছাই-বিছানো কাঁচা পথটায় হাঁটছে না। হর্নটার রবার বাল্বটা কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, কেনা হয়েছে নতুন বাল্ব, কিন্তু এখনও লাগানো হয় নাই, কাল রাত্রে চারখানা নতুন টায়ার লাগাতেই আধখানা রাত কেটে গিয়েছে; তখন আর ওটা মনে হয় নাই। বাল্বহীন হর্নটা জোসেফের হাতে রয়েছে। জোসেফ সেটাকে তুলে মুখে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল।

রাম পিছনে ফট্‌কিকে বললে—দাদাবাবুর বেতগাছটা কই? সেই সরু লিকলিকেটা?

নরসিং সামনে দৃষ্টি রেখে গাড়ির স্পীড কমাতে কমাতে বললে—না।

রাম বললে—আসছে দেখ দেখি! মোটরের রাস্তা জুড়ে—

নরসিং বললে—রাস্তা সবারই।

জোসেফ বললে—কিন্তু বড় শয়তান বেটারা! বড় শয়তান!

নরসিং স্টীয়ারিং ঠিক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাম বেত ব্যবহার করলে না,

কিন্তু মুখে গাল না দিয়ে ছাড়লে না—দেখতে পাও না বেটারা ?

সে কথায় ওরা গ্রাহ্য করলে না। একজন বললে—হু-হু, খুব ছেড়েছে লাগছে।

খুব জোরেই চলেছে নরসিং। নতুন ভাল রাস্তার জোরে চলার আনন্দেও বটে, এখান ছেড়ে নতুন সার্ভিস লাইনের উদ্দেশে চলার ব্যগ্রতায়ও বটে। নতুন সার্ভিস লাইনের সন্ধান সে পেয়ে গিয়েছে। দিন দুনিয়ার মালেক—যে সকালে উঠে রাজা থেকে আরম্ভ করে মেথরের পর্যন্ত রুটি মাপে, বাঘের খোরাক থেকে শুরু করে পিঁপড়ের খুদের কণা, চিনির দানা মাপতে যার ভুল হয় না—সন্ধান অবশ্য তাঁরই ; তবে উপলক্ষ নীলিমা দাস—দাস নয়—নীলিমা আর কানা ব্যানার্জী। তারাই নতুন লাইনের সন্ধান দিয়ে চিঠি লিখেছে। নরসিংয়ের মনে পড়ে রেল-স্টেশনের কথা। ওরা যেদিন পালায় দু-জনে, সেদিন ব্যানার্জি পেট্রোলের দাম বলে দুটো টাকা দিতে এসেছিল, কিন্তু নরসিং বলেছিল—না।—নীলিমা ব্যানার্জির হাত থেকে টাকা দুটো কেড়ে নিজের ব্যাগে পুরে বলেছিল—ছি! ওঁর অপমান করো না। ভারী ভাল মেয়ে নীলিমা। নীলিমার কথা মনে হলেই নরসিং দুনিয়ার হালচালের মজার কথা ভাবে। গির্‌বরজার হাড়ীর মেয়ে নীলিমা, আর গির্‌বরজার ছত্রী বংশের সিংরায় বাড়ির ছেলে সে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নরসিং।

নীলিমা এবং ব্যানার্জি কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। সেখানে চাকরিও যোগাড় করে নিয়েছে। অগুল-অঞ্চলে মিশনের একটা ব্রাঞ্চে চাকরি পেয়েছে তারা। ব্যানার্জি কাজে লেগে গিয়েছে। নীলিমাও সেখানে, তবে সে মাস কয়েক পরে জয়েন করবে। খোকা হবে নীলিমার। নীলিমার হবু খোকাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে নরসিং। ওই হবু খোকাই তাকে আর এক ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচিয়েছে। জোসেফ এবং তার মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে খুবই ঝগড়া হবার কথা। কানা-খোঁড়া-কুৎসিত ওই ব্যানার্জির ছেলেকে তারা পছন্দ করত না। ও কানা-খোঁড়ার চাকরি হবারও কথা নয়। তা ছাড়া ব্যানার্জিরাও কখনও এমন বাড়ির মেয়ে ঘরে ঢোকায় নাই, চিরকাল এই সব ছোট-কাজ-করা ক্রীশ্চানদের ঘেন্নাই করে এসেছে। ঝগড়া নিশ্চয়ই হত। কিন্তু নীলিমা 'মা হতে চলেছে'—নিজের এই অবস্থা জানিয়ে যে চিঠিটা লিখে নরসিংয়ের হাতে দিয়েছিল, সেই চিঠিটা পড়ে জোষেফ একটি কথাও বলে নাই, তার মাও কিছু বলে নাই। ব্যানার্জির বাবা চটেছিল নরসিংয়ের উপর। কিন্তু তাদের কি তোয়াক্কা করে নরসিং ? রাম কহো! দুনিয়ার সে কারও তোয়াক্কাই করে না। তোয়াক্কার কথাই নয়, কথাটা হল 'দোস্তির কথা, বেরাদারির কথা'। ওই জিনিসটা হারানোর চেয়ে 'বদ্‌নসিবি' আর নাই। কটুকির মামলায় কত সাহায্য করলে জোসেফ। আর নিতাই ? নিতাইয়ের সঙ্গে ছুটে গেল, ভেঙে গেল সম্বন্ধ, নিতাই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে। তবে নিতাইয়ের সঙ্গে দোস্তি ভাঙার জন্যে নরসিংয়ের কোন দোষ নাই। নিতাই বেইমানি করলে। সে-ই নিমকহারাম, সে-ই বেইমান। রুটির টুকরোর জন্যে বেইমানি করলে সে। করুক। তার জন্যে প্রথম প্রথম তার অনেক রাগ হত—আর রাগ হয় না। এই দুনিয়া! তার দিদি একটা ছড়া বলত—"এ পিথিমী সাত রঙের পুরী, কেউ হাসছেন—কেউ কাঁদছেন—

কেউ করছেন চুরি।" দুঃখ পেয়ে সাধু-জ্ঞানীতে হাসে, সংসারীতে কাঁদে, আর নেহাত যারা ছোট তারা দুঃখ ঘুচাতে চুরি করে, ডাকাতি করে, খুন করে, জাল করে। নিতাই বেটা নেহাত ছোট, ছোট কাজ করেছে। বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে সাহু-বোস কোম্পানির সার্বিস লাইনে ড্রাইভারি চাকরি পেয়েছে। শুকো—চল্লিশ টাকা মাইনে। রামেশ্বরোয়া, তারক এরাও দু-জনে জুটেছে ওই কোম্পানিতে। ওরা সেদিন নতুন গাড়ি নিয়ে, বুক ফুলিয়ে, ক্রীশ্চানপাড়ার দীঘিতে ধুতে এসেছিল। আগে নীলিমাকে ইঙ্গিত করে চিৎকার করত—নীলজল বলে; সেদিন চিৎকার করেছিল—ফটিক জল, ফটিক জল। জোসেফ চটেছিল, রাম চটেছিল, কিন্তু নরসিং চটে নাই। বলেছিল—যানে দো ভেইয়া। রাম বলেছিল—দশ টাকা বেশী মাইনের চাকরি হওয়ায় বেটাদের গরম বেড়েছে। আরে সীতারাম! দশ টাকা বেশী মাইনে হলেও তো গোলামি! অরে গোলামি করতে রাজী হলেও তো নরসিং তোদের মাথার উপর বসত। থুঃ—থুঃ—থুঃ! আবার বলে সার্বিস লাইনসে তো ভাগিয়েছি!

—দূর! দূর! দূর! আরে—ঘরের কোণের চামচিকে, আকাশের গিরবাজকে বলিস, তোকে তাড়ালাম আমি!

এত বড় দুনিয়া; মাটি মাটি মাটি—গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ, পরদেশ, পাহাড়, বন—দুনিয়ার কি শেষ আছে রে? মাটি খুঁড়ে, বন তোলপাড় করে, পাহাড় ফুঁড়ে মানুষের কারবার চলেছে। পাহাড় ফুঁড়ে টানেল বানিয়ে, উঁচু জমি কেটে সমান করে, নিচু জমিতে মাটি ফেলে বাঁধ বেঁধে কোম্পানি পাতছে রেল-লাইন—নদী নালা গঙ্গা-যমুনার মত দরিয়ার উপর 'বিরিজ' বানিয়ে চালাচ্ছে রেল, খাল বিল নদী নালা সমুদ্দুরে চালাচ্ছে নৌকা ইস্টিমার জাহাজ, আজ কলকাতা থেকে পেশবর তক্ চলেছে মোটর—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, আকাশে উড়ছে উড়ো-জাহাজ, ওই সাত মাইল রাস্তায় সার্বিস বন্ধ করে নরসিংয়ের গাড়ি চালানো বন্ধ করবি? ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ!

মেরী নীলিমা আর কানা ব্যানার্জি সন্ধান পাঠিয়েছে। অণ্ডালের আশেপাশে লাল কাঁকুরে মাটি আর কালো পাথরে ঢেউ-খেলানো ধূ-ধূ-করা মাইলের পর মাইল ধরে জনমানবহীন একটা অঞ্চলে কয়লার খাদ গড়ে উঠেছে। একটা-আধটা নয়, বিশ-ত্রিশটা কলিয়ারির কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ে মেজাজের চড়াই-উৎরাই ভাঙতে পারলে আর কোন হাঙ্গামা নাই; চালাও গাড়ি। মিশনের গাড়ি আছে, জোসেফের চাকরি ঠিক করে দিয়েছে সেইখানে। সেই সঙ্গে লিখেছে—"নরসিংবাবু এখানে ট্যাক্সি নিয়ে এলে খুব সুবিধে হবে তাঁর। খুব চাহিদা গাড়ির। চারিদিকে কলিয়ারির সঙ্গে গ্রাম হাট বাজার গড়ে উঠছে। দু-একখানা ট্যাক্সি আসানসোল থেকে মধ্যে মধ্যে আসে—যায়। এখানে রেগুলার সার্বিস খুললে লাভ হবে।"

সেইখানে চলেছে নরসিং তার গাড়ি নিয়ে। এ অঞ্চলে নরসিংয়ের না-দেখা নয়। মেজবাবু, তার জীবনে শনি ছিল মেজবাবু, যত ভাল দিয়েছে তত মন্দ দিয়েছে। মেজবাবুদের কুঠিতে এদিকে ঘুরে এসেছে নরসিং।

মনে মনে এবার সে অনেক মতলব করেছে। নসিব অনেক ফেরে তাকে বাঁধতে চেয়েছে, সব ফের কেটে বেরিয়ে দিল্‌কে শক্ত করে বেঁধে চলেছে সে। বাড়িতে বাপকে টাকা দিয়ে যে ক-বিঘে জমি করেছিল—সে জমি ক-বিঘে বেচে দিয়েছে। বাপের সঙ্গে গিরবরজার সঙ্গে তার ফারখত। বাপ বলেছে—তোর মুখ আমি দেখব না, তোর হাতের আগুন আমি নেব না। তুই ছত্রীবংশ থেকে খারিজ।

ব্যস্‌, ব্যস্‌। খারিজ। নরসিং, শুধু মোটর-ড্রাইভার—সে আর কেউ নয়, কিছু নয়। জমি বিক্রির আট-শ টাকা তার মজুত। আরও একশ টাকা সে পেয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশনে। কংগ্রেস নেমেছিল এবার। সে কংগ্রেসকে দিয়েছিল তার গাড়ি। কংগ্রেস হারিয়ে দিয়েছে নিতাইয়ের সেই মাতাল বাবুটাকে। তাতেই নরসিং খুশী। তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা গাড়ির সামনে লাগিয়ে গোটা শহরটা সেদিন সে ঘুরেছিল। কংগ্রেস দেড়শ টাকা দিয়েছে আর মামলায় তাকে উকিল দিয়েছিল অল্প পয়সায়। ব্যস্‌। এই তার বহুত—খুব।

মোট এখন ন'শ টাকা তার মজুত। আর কিছু কামাতে পারলেই সে একটা নয়া গাড়ি কিনবে ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে। রামাকে বসিয়ে দেবে এ গাড়িতে। নিতাইয়ের বেলা ভুল হয়েছে তার। আবারও ভুল হয় হবে।

জোসেফ আবার হর্ন দিলে।

বাস্‌ আসছে পাঁচমতি থেকে।

কে ড্রাইভার? রামেশ্বরোয়া। তারক কণ্ডাক্টর। তারক চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে ভাগতা হ্যায়! নরসিং হাসলে। উল্লুকরা জানে না। গোলাম। ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। ওদের সঙ্গে বাত-চিত করবে না নরসিং। রামা কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল—ভাগতা নেহি, চল রহে হ্যায় নয়া লাইনমে।

অ্যাক্‌সিলারেটারের চাপ কমিয়ে ক্লাচে পা দিলে নরসিং। স্টীয়ারিং ঘুরছে।

জোসেফ জিজ্ঞাসা করলে—পাঁচমতির ভিতরে ঢুকবেন নাকি?

—হ্যাঁ, আমার দোস্তের সঙ্গে দেখা করব। সুরেশ দাস।

দাস অদ্ভুত মানুষ। এই ক'দিন আগে একজনকে চড় মেরে দশ টাকা জরিমানা দিয়েছে ইউনিয়ন কোর্টে। নরসিংকে সে সমাদর করে একবেলা ধরে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে। যাবার সময় খুব খুশী হয়ে বললে—চলে যাও দোস্ত, নির্ভাবনায় চলে যাও। কলিজার হিম্মৎ, গায়ে তাগদ আর মাথার উপর ধরম, এ থাকলে চোখ বন্ধ করে চলে যাও দুনিয়ায় যে দিকে ইচ্ছে।

শেষকালে বললে—ওখানে যদি সুবিধে হয় তো আমাকে লিখো, আমি গিয়ে মিষ্টির দোকান করব।

গাড়িতে স্টার্ট দিলে। গাড়ি চলল শ্যামনগরের শহরের ধুলোর উপর—পাঁচমতির ধুলো লাগল গাড়ির গায়ে। গাড়ি এসে থামল ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

সাহু-বোস কোম্পানির মোটরবাসের আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—'জয় মা কালী'।

গাড়ি থেকে নেমে এল নিতাই। ঘাটে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। জোনেক রাম মোটর ঠেলছে। টপগীয়ারে গাড়ি চলছে, তাও আস্তে। বালি এখন ভিজে রয়েছে। নরসিং হাঁকছে—আরও জোরে। আউর জেরা। আচ্ছা ভাই। বহুত আচ্ছা।

গাড়িখানা অপেক্ষাকৃত জোরে চলতে লাগল। রাম ক্ষুব্ধ আক্রোশে বললে—থাক্ থাক্, তোকে লাগতে হবে না।

নিতাই এসে গাড়ি ঠেলতে লাগছে। সে হাসলে, রামের কথার জবাবও দিলে না, ঠেলতেও ক্ষান্ত হল না। মহিষের মত যেমন চেহারা নিতাইয়ের, তেমনি শক্ত; তার ঠেলাতেই বালি ঠেলে বেশ সহজেই চলছে। নিতাই জানে নরসিং চলে যাচ্ছে। তাই সে এই নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাবার সময়টিতে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। লাইসেন্সের লোভে সে ওস্তাদকে ছেড়ে রামেশ্বরোয়ার সঙ্গে জুটেছিল। অনেকদিন ধরেই তার লাইসেন্স নেবার শখ। ওস্তাদ বলত মুখে—এইবার হবে, করে দোব। কিন্তু কি জানি নিতাইয়ের মনে হত নরসিং তেমন গ্রাহ্য করছে না কথাটা। তাই সে রামেশ্বরোয়ার আশ্বাস পেয়ে আগ্রহ দেখে তার সঙ্গে না জুটে পারে নাই। রামেশ্বরই খাওয়া-পরা আর পনেরো টাকা মাইনের চাকরি সেই মাতালবাবুর বাড়িতে জুটিয়ে দিয়েছে। সে তো নরসিংয়ের কোন ক্ষতি করে নাই। যতদিন তার কাছে ছিল দেবতার মত ভক্তি করেছে, খেটেছে সে গরুর মত। তার লাইসেন্স হওয়ায়—চাকরি হওয়ায়—ওস্তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু খুশী হওয়া দূরের কথা, ওস্তাদ তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে। মদের দোকানে বেইমান নিমকহারাম শূয়ারকি বাচ্চা বলে গাল দিয়েছে—সে কথাও নিতাইয়ের না-শোনা নয়। তবে নিতাইয়ের দোষটা কোথায়? হ্যাঁ, একটি দোষ সে করেছে। সাহু-কোম্পানির চাকরির লোভে সে কটুকির মামলায় ওস্তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। তাও সে একটি মিছে কথা বলে নাই। একটিও না। তার জন্তে সে হাজার শাস্তি নিতে রাজী আছে। সাহু-কোম্পানি ওস্তাদের অনেক ক্ষতিই করেছে। এ লাইন তো বলতে গেলে ওস্তাদেরই লাইন। যখন রাস্তার গরুর গাড়ির চলতে কষ্ট হত তখন ওস্তাদ এই রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। আজ রাস্তা ভাল হল—ওস্তাদকে দিলে উৎখাত করে। সে পাপ নিতাইয়ের নয়। সে চাকরি করছে—চাকর। কিন্তু—। ওস্তাদের এইভাবে চলে যাওয়ায় তার বড় দুঃখ হচ্ছে। সে তাই এগিয়ে এসেছে। গাড়ি ঠেলার সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে। দুটো কথা বলে সে চলে যাবে।

গাড়িটা এপারে এসে উঠল। আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নরসিং গাড়িতে ব্রেক কষলে। নিতাই কিন্তু কথা বলতে সাহস করলে না। সে ফিরল। নদীর জলে নেমে হাতের ধুলো কালি ধুয়ে একটু দাঁড়াল। তার পর সে আবার ঘুরে এল নরসিংয়ের কাছে। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললে—ওস্তাদ!

নরসিং ভুরু কুঁচকে চাইলে তার দিকে।

এবার তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিতাই বললে—গাল দেন, মারুন, যা করবেন—

কিছু বলব না, কিন্তু কথা না-বলে যাবেন না। মাফ করে যেতে হবে, আমার দোষ হয়েছে।

নরসিং একটু চুপ করে থেকে হেসে পিঠে হাত দিয়ে বললে—মাফ।

নিতাই বললে—আপনার নসিবটা ভাল নয় ওস্তাদ। ইমামবাজার থেকে কুঠিঘাট সার্বিস—মেজবাবু প্রথম খোলেন বটে—কিন্তু আপনি ছিলেন ড্রাইভার। মেজবাবু মারা যেতে আপনি লাইনটা জানালেন। রেল-কোম্পানি আর বুধাবাবু মিলে আপনাকে উৎখাত করে লাইনটা নিয়ে নিলে—আবার—

নরসিং বাধা দিয়ে হেসে বললে—দেখি আবার কে কোথা উৎখাত করে!

—কোথায় যাবেন?

সে কথার জবাব না দিয়ে নরসিং বললে—মন পাতিয়ে কাজ করিস। মোটরের কাজ ভাল করে শিখিস। ভাল হবে।

ওপারে সাহু-কোম্পানির মোটর-বাসের কণ্ডাক্টর হর্ন দিয়ে উঠল; সার্বিসের গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে। নরসিং বললে—যা, হর্ন দিচ্ছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিতাই বললে—যাই। কিন্তু, কোথা চললেন?

হেসে নরসিং নিতাইকে জবাবটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই বললে—আরে, দুনিয়ায় কি যাবার ভাবনা আছে নাকি? বন কেটে শহর বানাচ্ছে, পাহাড় কেটে পথ বানিয়ে—সেই পথে মানুষ ছুটছে, ধু-ধু করা ডাঙায় কারখানা বানাচ্ছে, আশেপাশে গড়ছে হাটবাজার, মানুষ দলে দলে ছুটছে—পিঁপড়ের মত দানার সন্ধানে। দুনিয়াতে এখানে জলকর, ওখানে ফলকর, সেখানে বনকর, লা-মহল, কয়লা মহল, অভ্রের খনি, ক্ষেত-খামার, ফসল-কুটো—দৌলতের কি অভাব আছে? যেখানে দৌলত সেইখানে মানুষ, যেখানে মানুষ যাবে সেইখানে গাড়ি যাবে। চললাম তেমনি কোথাও। হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

ওপারে হর্ন বাজছে ঘন ঘন। নিতাই আর থাকতে পারলে না। আজ প্রথম সার্বিস। দেরি হলে কৈফিয়ত দিতে হবে! তা ছাড়া সার্বিসের ড্রাইভার হিসেবে কাঁটা ধরে গাড়ি ছাড়বার একটা শখও তার মনে খুব তাগিদ দিচ্ছে, সে ফিরল। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মত বিঁধে রইল একটা দুঃখ। ওস্তাদ তাকে পুরো বিশ্বাস করলে না। কোথায় যাচ্ছে সে কথাটা বলে গেল না।

সে দুঃখ নরসিংয়ের বুকেও বেজে রইল; কিন্তু তার সঙ্গে একটু আনন্দও রইল। নিতাইকে অবিশ্বাস করে যে অপমানটুকু করা যায় সেটুকু না-করার মত ঔদার্য তার নাই। তবু স্তব্ধ হয়ে সে গাড়ি চালাতে লাগল। চলল গাড়ি।

মুর্শিদাবাদের পলিমাটির দেশ পার হয়ে—বীরভূমের পাথুরে শক্ত মাটির দেশের মধ্য দিয়ে দেশ হতে দেশান্তরের ধুলো মেখে, তার গাড়ি চলল যে রাস্তা থেকে তাকে উৎখাত করে বুধাবাবু আর রেল-কোম্পানি মনোপলি সার্বিস খুলেছে সেই রাস্তা ধরে—সাঁকোর উপর দিয়ে নদী নালা পেরিয়ে চলল। বড় নদীর বালিতে নেমে, টপগীয়ারে—মানুষের ঠেলায়, সে নদী পেরিয়ে চলল তার গাড়ি। আশপাশের মাঠ জঙ্গল গ্রাম পাক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরছে; পথের

পাশের গাছগুলো ছুটছে পিছনের দিকে সোজা লাইনে ; মাইলপোস্টের পর মাইলপোস্ট পার হয়ে চলল গাড়ি। সামনে এগিয়ে এল নতুন দেশ। মধ্যে মধ্যে কালো পাথরের চাঁই-জেগে-ওঠা লাল মাটির দেশ, চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। তিরিশ ফুট চড়াই উঠে পঁচিশ ফুট নেমে—আবার পঞ্চাশ ফুট চড়াই, তার পর বিশ ফুট ঢালে নেমে—ফের ফুট চল্লিশেক উঠে মাইলখানেক সমতল চলেছে। গরুর গাড়ি এবং মোটরের টায়ারের দাগ-আঁকা রাস্তার চিহ্ন।

এ দেশ নরসিংয়ের না-দেখা নয়।

মেজবাবু মরেছিল এই দেশে। সেই ফট্‌ফটিয়াটা—সেইটায় চেপে এখানকার এক ফিরিঙ্গী গরীব ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে হুল্লোড় করতে আসত রোজ রাত্রে। একদিন মাতোয়ারা হয়ে ফিরবার সময়—একটা পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা লাগিয়ে ছটকে পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে সমস্ত রাত্রি। সকালে কিন্তু সেই শরীরেই জ্বর নিয়ে জাঁদরেল ফিরেছিল কুঠিতে। তার পর নিউ-মোনিয়া। তার পর একদিন ঠাণ্ডা হয়ে গেল মেজবাবু। একটা ছুটন্ত ইঞ্জিন যেন 'বিরিজ' ভেঙে পড়ে গেল নদীর জলে। মেজবাবুর দেহটা সে-ই নিয়ে গিয়েছিল বাবুদের বাসে তুলে গঙ্গাতীরে। সেলাম—মেজবাবু—সেলাম।

আরে—আরে—!—ঘ্যাঁচ করে টানলে নরসিং হ্যাণ্ডব্রেক, পায়ে কষে বসিয়ে দিলে ফুট-ব্রেকটা। গাড়িটা থেমে গেল। চড়াইয়ের মাথা থেকে কেমন করে গড়িয়ে নেমে আসছে একটা আধমণী পাথরের চাঁই।

রাম ফট্‌কি শিউরে উঠেছে। নরসিং হেসে আবার স্টার্ট দিলে। চলল গাড়ি। ফের পঞ্চাশ ফুট চড়াই। কেয়াবাৎ রে দেশ! আহা-হা! চোখ জুড়িয়ে গেল। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে, কিনারায় কিনারায় নীল মেঘ নেমে এসে লাল মাটি ছুঁয়েছে। তার মধ্যে কলিয়ারি হচ্ছে। এদিকে—ওদিকে—সেদিকে। মধ্যে মধ্যে কাঠের পোস্টের মাথায় কাঠের ফলকে লেখা—টু কলিয়ারি। দেখা যাচ্ছে গীয়ার হেডের ছাঁদাছাঁদি-করা ফ্রেমের একেবারে মাথার উপরে ঘুরছে চাকা, আকাশ-ছোঁয়া চিমনির মুখ থেকে আকাশের গায়ে কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মধ্যে মধ্যে খুব কাছে এসে পড়ছে কলিয়ারি, দেখা যাচ্ছে সারি সারি কুলী-ধাওড়া ; নোংরা, ময়লামাটি-কালি-ঝুলিতে ভরা আধনেংটি সাঁওতাল-বিলাসপুরিয়া মালকাটাদের দুর্গন্ধ ভরা ডেরা। গিজগিজ করছে। কলকল করছে। ফট্‌কি দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দেয়, জোসেফ নাকে রুমাল ঢাকে, রামা হি-হি করে হাসে। নরসিংয়ের দুই হাত বন্ধ,—তা ছাড়া সে গন্ধও পায় না, পেট্রোলের গন্ধ ঢেকে দিয়েছে সব। হঠাৎ তার হাসি যায়। জোসেফ নাকে রুমাল দিচ্ছে। হায় দুনিয়া! নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তেলে কালিতে মোবিলের পেট্রোলে ধুলোয় ভরা, গায়ে মোবিলের লোহার গন্ধ! ওরা কাটে মালিকের জন্যে কয়লা—নরসিংরা গাড়ি চালায় পরকে চাপিয়ে, পরের হুকুমেতে, পরের দরকারে, পরের আমোদের কারবারে। কুছ ফরক নেহি। গাড়ি আবার ঘুরল। নতুন পিট কাটাই হচ্ছে এখানে। পিটের মুখে স্তূপ হয়ে জমে আছে মাটি-পাথরের রাশি, ইঁটের ভাটা পুড়ছে, ইঁট

পোড়াই হচ্ছে, টিনের এবং ছাপরার শেড দেখা যাচ্ছে, বড় বড় শেড তৈরি হচ্ছে, তার টি-আয়েল-জয়েন্ট গড়া বিচিত্র ফ্রেম দাঁড়িয়ে আছে ; মধ্যে মধ্যে সাদা চুনকাম করা বাংলো ঝকমক করছে ; মাঝে মাঝে এসে পড়েছে সাইডিং লাইন, লাইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারিবন্দী ওয়াগন। দু-একখানা মোটরও পেরিয়ে গেল ; তার মধ্যে সাহেবী পোশাক-পরা ম্যানেজার কিংবা মালিক যাচ্ছে বোধ হয়। কেয়াবাৎ দেশ ! আজব কারখানার নতুন দেশ তৈরি করছে মানুষ এখানে। বিলকুল নতুন দুনিয়া। তার পূর্বপুরুষ গিরধারী সিংয়ের আমলে এ দুনিয়া ছিল না। গিরধারী সিং এসে বনের মধ্যে আড্ডা গেড়ে বন কেটে চাষী ক্ষেত গড়েছিল। সে চলেছে একালের এই নতুন দুনিয়ায়। ঘোড়ায় চড়ে বয়েল গাড়িতে মাল নিয়ে এসেছিল গিরধারী সিং। সে চলেছে মোটরে চেপে। কলকারখানা—লোহা-লক্কড়ের কারবার। ভাল নসিব বল—ভাল নসিব। মন্দ বল—মন্দ। কিন্তু না এসে নরসিংয়ের উপায় ছিল না ! দুনিয়াই তাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। সেও এসেছে খুশী হয়ে। এইখানেই নরসিং ঘর বাঁধবে। সেই ঘরে থাকবে ফট্‌কি। পুরনো গাড়ি বেচে নতুন গাড়ি কিনবে, ট্রাক কিনবে। রোজগারে পকেট ভরে এনে ফট্‌কির আঁচলে দেবে—ব্যাঙ্কে রাখবে। খোকা হবে। হবে বৈকি। তাকেই দিয়ে যাবে সে নিজের সব বিদ্যে, মেকানিক করে তুলবে ; তাকেই তো দিয়ে যাবে সে তার জমি-বিক্রি-করা টাকায় কেনা গাড়ি আর উপার্জন-করা টাকা।

—বাঁয়ে। হাঁকলে জোসেফ।

সামনেই রাস্তাটা তিন ভাগ হয়েছে। বাঁয়ের রাস্তাটার গায়ে লেখা—'টু মিশন'। বেঁকে মোড় ফিরল মোটর। ফের গীয়ার দিয়ে নরসিং স্পীড বাড়ালে গাড়ির। চলল গাড়ি।

পদচিহ্ন

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রিয়বরেষু

'পদচিহ্ন' প্রকাশিত হল দীর্ঘকাল পর। এটি একখানি বৃহৎ উপন্যাসের প্রথম অংশ। এর কাল ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে সে আমলের পাত্র-পাত্রীদের ভাষা, সমাজের রূপ কালানুযায়ী চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছি। তাঁদের ধারণা ভাবনা তাঁদেরই। পরবর্তী অংশ আশা করি এই বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

লাভপুর, বীরভূম
১লা বৈশাখ ১৩৫৭

বিনীত
লেখক

রাঢ়ের একখানি গ্রাম। নাম নবগ্রাম। নবগ্রাম পুরাতন হয়েছে।

কতকালের গ্রাম?

ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের ইতিহাস নাই; 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী'—সে ততদিনের। তবু এ গ্রামের কাহিনী আছে। সভ্যতার নিদর্শনও আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ রয়েছে—জঙ্গলে ভরা দেবীস্থান; প্রবেশপথের পাশে আছেন সদাজাগ্রত মহাভৈরব। মহাপীঠ হ'লে সত্যযুগ থেকে এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। এখানকার সকলেই সে গল্প শুনেছে—

সে যুগে এখানে নাকি রাজা ছিল। রাজার প্রিয়তমা রাণীও ছিল। যৌবনচপলা সুন্দরী সেই রাণীর পরামর্শে রাজা তাঁর গুরুর যোগশক্তি পরীক্ষার জন্য যজ্ঞ করেছিলেন। মহাতেজস্বী নিষ্ঠাবান গুরু ভেবেছিলেন, এ যজ্ঞের মূলে আছে রাণীর সন্তানকামনা। প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যজ্ঞ করলেন। কিন্তু 'রাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হোক' ব'লে আহুতি প্রদান মাত্রে ভেঙে পড়ল যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখস্থ নারিকেল গাছের মাথা। প্রকাশ পেল, নারিকেল গাছের মেথি খাবা। কামনা অন্তরে পোষণ ক'রে রাণী ওই যজ্ঞে গুরুকে আহ্বান করেছিলেন। অপমানে ক্ষোভে অগ্নিতপ্ত গুরু জ্ব'লে উঠলেন। যজ্ঞে তিনি পুনরায় আহুতি দিলেন অবশিষ্ট হবি নিয়ে—ধ্বংস হোক এ পাপ রাজবংশ, ধ্বংস হোক এ পাপ রাজ্য।

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিদাহ, ঝড়, প্লাবন এল রুদ্রমূর্তি ধ'রে। ধ্বংস হয়ে গেল রাজ্যর নিবিড় জঙ্গলে আবৃত হয়ে গেল সমস্ত স্থান।

তারপর কত যুগের পর এল এক সন্ন্যাসী। সে এসে আবিষ্কার করলে মহিমময়ী মহাদেবীর স্থান। দেবী তাকে নির্দেশ দিলেন, ব্রহ্মশাপ-উষর অংশটুকু বাদ দিয়ে বসতি স্থাপন কর। দূরান্তর থেকে সন্ন্যাসী নিয়ে এল মানুষ। কালো কালো মানুষ, জাতে তারা বাউরী। বাউরী-রাজার নাম এ অঞ্চলে আজও অনেকে জানে। মহাশক্তিশালী বাউরীবংশ, তারা এল সব হাজারে হাজারে, বন কেটে বসালে বসতি, নগর, গ্রাম; বাঘভালুক ধ্বংস করলে, মানুষ নির্ভয় হ'ল; ক্ষেত খামার গ'ড়ে ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করলে এই স্থানকে। নদীর ঘাটে গ'ড়ে উঠল বন্দর। এখনও বন্দর-ঢিপি ব'লে একটা বাবলাগাছ আর সেয়াকুলের জঙ্গল ভরা উঁচু জায়গা নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন গ্রামগরবীরা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলে, ওই সেই জায়গা। প্রমাণস্বরূপ বলে, নদীর ঘাটের নাম আজও 'না' ঘাট; 'না' মানে নৌকো, দেশদেশান্তরের নৌকো এসে লাগত বর্ষার সময় ওই ঘাটে। ঘাটের উপরেই ওই ঢিপি, কোন বন্যায় ডোবে না। সাঁওতাল মাঝিরা কতজনে ওখানে লোহা-পাথর খুঁড়তে গিয়ে পুরানো আমলের টাকা-পয়সা পেয়েছে। বন্দর সেদিনও ছিল।

বাউরী-রাজার কীর্তি—পুরানো মজা দীঘি উদাসী এখনও লোকে দেখায়। চারিদিকের পাড় এখনও রয়েছে, মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে পাকা সড়ক এবং একটা ছোট নালা, তার দু পাশে

ধানের ক্ষেতে এখন সোনার ফসল ফলে ; মাঠখানার নামই হয়েছে উদাসীর মাঠ।

উদাসী ছিল নাকি বাউরী-রাজার রাণী।

বাউরী-রাজার দেশবিখ্যাত সম্পদ। পাশের গ্রাম মহিষতলী বা মণ্ডলীতে ছিল মহিষশালা ; এ পাশের গ্রাম গোগ্রাম—গোগাঁয়ে ছিল গোশালা। ধনডাঙায় ছিল ধনাগার। মহাগ্রাম ছিল কেল্লা। নাম থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, অথবা প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না, কেউ জানে না, জানতেও চায় না। কোন চিহ্নও নাই। শুধু ওই ব্রহ্মশাপ-উষর ভূখণ্ড আজও ধূ-ধূ করছে। ঘাস পর্যন্ত হয় না, শুধু কাঁকর, নুড়ি, নিষ্কাশিত-লৌহ—লোহা-পাথর, আর বড় বড় পাথরের চাঁই সমাকীর্ণ প্রান্তর। পাথরের চাঁইগুলোকে বলে—অসুরের কাঁড়ি। গাছের ডালের এবং গুঁড়ির মত গড়ন,—কোনমতে ভাঙলে দেখা যায়, ভেতরটাও ঠিক কাটা গাছের ডালের মত। তেমনই আঁশের চিহ্ন ও সারের চিহ্ন পাওয়া যায়। ব্রহ্মশাপে সব পাষাণ হয়ে গেছে।

ওই উষর ভূখণ্ডের নীচে সমতল প্রান্তর। তারই পাশে নদী।

ওই প্রান্তরটার নাম তুরুকডাঙা।

তুর্কীরা একদা এ দেশে এসে নাকি এইখানে তাঁবু ফেলেছিল। স্থানীয় মুসলমানেরা বলে —তারা এসেছিল আরব দেশ থেকে। তারাই নাকি বাউরী-রাজাকে পরাজিত করে। তুর্কীদের যারা এসে এখানকার বাউরী-রাজাকে উচ্ছেদ ক'রে এখানকার মালিক হয়ে বসেছিল তাদের বংশের নাম ঠাকুর-বংশ। প্রথম মালিক ছিল একজন ফকির সিদ্ধপুরুষ। তাদের বংশে ভোগীর চেয়ে যোগীর সংখ্যাই বেশি। গুলমহম্মদ ঠাকুর নাকি মস্ত একজন যোগী ছিলেন। তিনি নাকি তাঁর অন্ত্রাদি পেট থেকে যোগবলে বাইরে এনে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে আবার ভিতরে যথাস্থানে স্থাপন করতেন। তাঁদেরই অনুগৃহীত ছিল এখানকার গন্ধবণিকেরা। তাদেরই উপর এখানকার মণ্ডলের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। হিন্দুসমাজের যাবতীয় দেবদেবীর পূজার ভার, দেবত্র সম্পত্তির ব্যবস্থার অধিকার ছিল তাদেরই। এখনও আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাদের সমৃদ্ধিও ছিল প্রচুর। নদীর ধারে বর্ষার সময়, ওই বন্দর-ঢিপিতে তাদের কয়েক মাসের ব্যবসার আড়ত বসত। দেশান্তর থেকে ভরানদী বেয়ে নৌকো আসত। এখান থেকে নিয়ে যেত ধান চাল রেশমের কাপড় রেশম ; বিক্রি ক'রে যেত ছোলা মসুরি কলাই গুড় লঙ্কা পেঁয়াজ। আরও অনেক কিছুর বিনিময় হ'ত। আগন্তুক ব্যবসায়ীদের মধ্যে আসত এক গরিব ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী। গুড় নিয়ে আসত। মিষ্টভাষী বিনয়ী ব্রাহ্মণ। কয়েক বৎসর পর গন্ধবণিকেরা তাকে এখানে বাস করালে। তার আগে এখানে সৎ-ব্রাহ্মণ ছিল না। ছিল চক্রবর্তী উপাধিধারী শূদ্রযাজক বর্ণব্রাহ্মণ, তাও এক ঘর। নবাগতেরা শ্রোত্রীয়, উপাধি—সরকার। তারপর কিছুকালের মধ্যেই চাকা একটা পাক খেলে।

ঠাকুর-বংশের অবনতি হ'ল। তাঁদের সম্পত্তি নবাবের রাজস্বের দায়ে চ'লে গেল রায়-চৌধুরী-উপাধিধারী এক হিন্দু জমিদারের ঘরে। লোকে বলে—রাজস্ব না দেওয়ার দায়টা ছিল গন্ধবণিকদের। গন্ধবণিকদের তখন পাকা বাড়ি, অনেক নামডাক, সাত-আটখানা ডিঙি

নৌকা, এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সোনা-ফলানো জমির চক, আরও অনেক কিছু। অনেক কিছুর মধ্যে এক বাড়ির দত্তগিন্নীর চন্দ্রহারের কথা প্রবাদবাক্যের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। একশো আট ভরির চন্দ্রহার, অর্থাৎ ওজনে পাঁচ পোয়ার উপর।

এর পরই হ'ল সরকারদের উন্নতি। চাকা আরও এক পাক ঘুরল।

উন্নতির মূলে নাকি সরকারদের গুরুবল। একদা এক সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসী এসে অতিথি হলেন। সরকার-বাড়ির সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে, যাবার সময় দিয়ে গেলেন দীক্ষা এবং এক শালগ্রামশিলা। বললেন, 'রাজ-রাজেশ্বর'। সেবা করিস, রাজা করবেন তোর বংশকে।

রাজা না হোক, রাজ-সরকারে অর্থাৎ নবাব (মুর্শিদাবাদ নয়, স্থানীয় জেলার নবাব)-দপ্তরে চাকরি হ'ল। রাজরাজেশ্বরের জন্ত নাখরাজ মিলল। ক্রমে ঘরে এসে ঢুকল রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে স্থানীয় জমিদারির দু আনা অংশ। দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করলেন, কালীপূজা আনলেন, আর আনলেন আমিনী চাল। আর আনলেন দেশদেশান্তর থেকে কুলীনের ছেলে। মেয়েদের কুলীনে বিয়ে দিয়ে দৌহিত্রদের স্বতন্ত্র এক পাড়া প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দত্তদের সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। কিন্তু রাজরাজেশ্বর ছিলেন সরকার-পক্ষের প্রতি সদয়; দত্তদের মাথা মাটিতে নোয়াতে সরকারদের হাত তুলতে হ'ল না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে বিনাশ করলে। রায়চৌধুরীদের শেষ পতনের সময় বাধল জেলার নবাবের সঙ্গে হাঙ্গামা, সেই হাঙ্গামার মধ্যে দত্তদের গদিও লুঠ হয়ে গেল। তারপর থেকেই হ'ল দত্তদের অবনতি। তারপর কোম্পানির রাজত্বে রেল পড়ল। প্রথম রেল-লাইন সাত ক্রোশ দূর পর্যন্ত। সাত ক্রোশ দূরে গ'ড়ে উঠল প্রকাণ্ড গঞ্জ। এখানে দত্তদের গদি মুদীর দোকানে পরিণত হ'ল। নদীর ঘাটে নৌকা আসা বন্ধ হ'ল, বন্দর উঠে গেল। তখন অবশ্য সরকার-বংশেরও ভাগ্যের নদীতে থম ধরেছে। সরকার-বংশের ছেলেরা তখন নিজেদের মধ্যে ছোরা-ছুরি, লাঠি-সোঁটা নিয়ে মত্ত। ইংরেজ কোম্পানির আদর উপেক্ষা করে না, তবে চাকরিকে ঘৃণা করে। ওদিকে ভাগিনেয়দের বংশ—কুলীনের ছেলেগুলি সরকারদেরই প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা মক্তবে বাংলা-ফার্সী শিখে কেউ উকিল, কেউ মোক্তার, কেউ সাবরেজিস্ট্রার হয়ে চন্দ্রকলার মত বাড়তে শুরু করেছে। এই সময়ে দত্তদের ঘটে পরম পরাজয়। সদর-রাস্তার উপরে সরকার-বাবুরা এবং ভাগিনেয়-বংশের বাবুরা মজলিস ক'রে একদা ব'সে ছিলেন, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল দত্ত-বংশের একজন। যাবার সময় দত্ত ঈষৎ হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে চ'লে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ জমিদারের হুকুমে পাইকেরা তাকে ধ'রে এনে ঘাড়ে ধ'রে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। যার ফলে দত্তর কপালে বিঁধে গিয়েছিল এক টুকরো কাচ। সে ক্ষতচিহ্ন তার সমস্ত জীবনে মিলায় নাই।

দত্তদের পাকা বাড়ির ভগ্নাবশেষ—ছোট আকারের পাতলা ইটে গাঁথা একটা ভাঙা পাঁচিলের খানিকটা আজও আছে। দূর থেকে দেখিয়ে লোকে বলে—দত্তবাড়ি। কাছে কেউ যায় না। ওই ভাঙা পাঁচিলের গোড়ায় নাকি থাকে এক দুধে-গোখরো।

সে নাকি অথর্ব। এত বুড়ো হয়েছে যে নড়তে-চড়তে পারে না। লোকে তাকে বলে বুড়ো।

ওই বৃদ্ধ জানে, নবগ্রামের জীবন-নাট্যে কত অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে প্রশ্ন তাকে করবে কে? মানুষের অবসর নাই। আজ নবগ্রামের জীবন-নাট্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মুখর হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রাচীন প্রধান জমিদার স্বর্ণবাবু এবং নবোদিত ধনী ব্যবসায়ী গোপীচন্দ্র, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রচণ্ডতায় প্রবল হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে অকস্মাৎ অঙ্কটি এক অভিনব ঘটনার মধ্যে শেষ হয়ে এল।

* * * *

হঠাৎ সংবাদ র'টে গেল, এখানকার কৃষ্ণ চাটুজ্জে যাবেন কাশীধাম, বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের বাসনায়। চাটুজ্জে প্রবীণ, বাট বৎসর অতিক্রম করেছেন অনেকদিন; দীর্ঘকাল সদর শহরে স্থানীয় জমিদারের আমমোক্তারি ক'রে অন্নবস্ত্রের সচ্ছল সংস্থানও করেছেন, পুত্র-কন্যায় সংসারও পরিপূর্ণ; রোগশয্যায় শুয়েই কবিরাজের দিকে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কি বুঝছ?

কবিরাজ বললেন, কষ্ট পাবেন কয়েকদিন।

হেসে চাটুজ্জে আবার প্রশ্ন করলেন, কষ্টভোগের অন্তে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে কিনা তাই বল।

কবিরাজ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, সে রকম কোন লক্ষণই নাই—না না।

চাটুজ্জে ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। ভাল ক'রে দেখ তুমি। আমার নিজের এমন মনে হচ্ছে কেন!

কি মনে হচ্ছে?

কিছু না। তুমি তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও একবার। ডুলি বা গরুর গাড়ি—যাতে তিনি আসতে পারেন, তাতেই আসবেন তিনি।

বৃদ্ধ কবিরাজ এসে হাতখানি তুলে ধ'রে চোখ বুজে স্থির হয়ে দেখলেন প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানি বিছানায় নামিয়ে দিলেন। এক টিপ নস্য নিলেন।

চাটুজ্জে প্রশ্ন করলেন, দেখলেন?

কবিরাজ কোন উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতখানি তুলে নিলেন। বাঁ হাতের নাড়ীও অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে চিকিৎসকোচিত ধীরতার সঙ্গে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বললেন, বলুন তো কি কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট?

হ্যাঁ। কষ্টটা কি? বলুন?

একটু ভেবে নিয়ে চাটুজ্জে বললেন, বলতে পারব না।

হুঁ। একটু স্তব্ধ থেকে কবিরাজ বললেন, আর একটু ভাবুন। কষ্ট না বলতে পারেন, আরাম কিসে হয় ভেবে দেখুন। বলুন।

চাটুজ্জে আবার বললেন, হ্যাঁ। আরাম কিসে হয় সেটা বুঝতে পারি।

বলুন।

ঘুমে। গভীর দীর্ঘ নিদ্রা যদি হয়, তা হ'লে যেন সব গ্লানি কেটে যায়।

হুঁ। কিন্তু নিদ্রা হয় না।

চাটুজ্জে বললেন, না।

কবিরাজ আর এক টিপ নস্য নিলেন।

চাটুজ্জে হেসে বললেন, এইবার আপনি বলুন।

কবিরাজ মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন, কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে? রুচি কিসে?

রুচি?

হ্যাঁ, বলুন।

ঘাড় নেড়ে চাটুজ্জে উত্তর দিলেন, কিছুতে না, যা মুখে দি, বিস্বাদ মনে হয়। খাবার জিনিসের গন্ধে বমি আসে।

কবিরাজ আর একবার হাত দেখে বললেন, কি বাসনা আছে আর চাটুজ্জে মশায়?

হেসে চাটুজ্জে বললেন, সেই বাসনা পূর্ণ করবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিলাম।

বলুন।

বাসনা! দেহখানা তো শবে পরিণত হবে, গঙ্গাতীরেও নিয়ে গিয়ে দাহ করবে; কিন্তু শিবময় কাশী ভিন্ন বিশ্বনাথের চরণাশ্রয় তো পাব না!

বেশ, কাশীই যান। পনরো দিনের পূর্বে কোনও আশঙ্কা নাই।

যেতে পারব তো?

যত্ন ক'রে নিয়ে যেতে হবে। ধ'রে তুলবে, ধ'রে নামাবে; আমি কিছু ওষুধও দেব, ক্লান্তি অবসাদ অনুভব করলে খাবেন। একটু নীরব থেকে কবিরাজ বললেন, চ'লে যান আপনি। বেশ বুঝতে পারছি—বিশ্বনাথ আপনাকে ডেকেছেন। নইলে, আপনি এতটা বুঝতে পারতেন না। চ'লে যান, কোনও ভয় নাই।

দু'দিনের মধ্যেই গ্রামে প্রচার হয়ে গেল কথাটা। আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। চাটুজ্জে-বাড়িতে ভদ্রমণ্ডলী একে একে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির বাইরে সাধারণ লোকে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ নয়। এখানকার প্রধানদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানগঙ্গা গিয়েছেন, তবে কাশী বড় কেউ যান নাই। পূর্বে রেল যখন ছিল না, তখন এ কামনা কল্পনাতেও আসত না, রেল হওয়ার পর লোকে তীর্থভ্রমণের জন্য কাশী গিয়েছে, কিন্তু রুগ্ন অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত জেনে কাশীতে মৃত্যুকামনায় এর পূর্বে মাত্র একজন গিয়েছেন। চুরাশি বৎসর বয়সে এখানকার দীনবন্ধুবাবু উকিল গিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণ চাটুজ্জে। পরিণত বয়সে মৃত্যুকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করার যে আদর্শ এবং সাধনা, এখানকার সমাজে আজও তা বেঁচে আছে—মাটির সঙ্গে মিশে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাড়ির মধ্যে বারান্দায় বিছানা ক'রে, পিঠের দিকে কয়েকটা বালিশ দিয়ে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে চাটুজ্জে আত্মীয়-জ্ঞাতি-প্রতিবেশী-বন্ধুদের স্মিত হাস্যে নীরবে সম্ভাষণ করলেন। কয়েকজন প্রবীণ ধর্মচর্চা করছিলেন—শিবলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন

লোকের আলোচনা চলছিল। অল্পবয়সেরা বিস্মিত সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জেকে দেখছিল। মেয়েদের আসর পড়েছে আর একটি বারান্দায়, সেখানেও গুঞ্জন চলছে। এ গ্রামের কন্যা এবং প্রবীণতমাদের প্রধান রঞ্জন-ঠাকরুন অর্থাৎ রঞ্জনী ঠাকুরাণী, বিদায়ের প্রাক্কালে কি করতে হবে সেই সব বিধি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দরজার মুখে লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, ব্যস্ত হয়ে স'রে গিয়ে সকলে পথ দিলে, সেই পথে প্রবেশ করলেন রাধাকান্তবাবু—ওই উকিল দীনবন্ধুবাবুর পুত্র। বেশে ভূষায় রুচিতে পদক্ষেপের ভঙ্গীতে একটি সহজ আভিজাত্য পরিস্ফুট। বলশালী দেহ, গম্ভীর মুখ, চোখের গভীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব যেন সংজাত বলে মনে হয়।

চাটুজ্জে আর একটু উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, আসুন, রাধাকান্তকাকা আসুন।

যাঁরা আগের দিকে ব'সে ছিলেন, তাঁরা রাধাকান্তবাবুর জন্য বসবার স্থান ছেড়ে দিলেন।

রাধাকান্তবাবু বসলেন, ব'ললেন, দাদার আচরণে আমি লজ্জা পেয়েছি। নইলে অনেক আগেই আসতাম। দাদার কাছে আপনি পালকি চেয়েছিলেন, তিনি দেন নি।

চাটুজ্জে বললেন, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনার কথান্তরও হয়েছে, সে আমি শুনেছি, প্রতাপ আমাকে বলেছে। কিন্তু তার জন্যে আপনি কি করবেন বলুন? আপনি আমার যা করলেন, সে আমার মহা উপকার।

চাটুজ্জে একটু থামলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বললেন, আপনি কর্তাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, কোথায় কি করতে হবে—যে ভাবে লিখে দিয়েছেন, কাশীতে বাসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, আপনার সম্বন্ধীকে লিখেছেন কাশীতে দেখাশুনা করতে, সাহায্য করতে। এর চেয়ে বেশি আর কে করবে বলুন।

রাধাকান্তবাবু বললেন, যাওয়ার ব্যবস্থা তা হ'লে গরুর গাড়িতেই ঠিক করলেন? সাত মাইল পথ!

ওদিকে দরজার সম্মুখে লোকজন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। দরজার ওপাশ থেকেই এখানকার সরকারবংশীয় জমিদার বংশলোচনবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল—মূকং করোতি বাচালং, মূককে বাচাল করেন, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, ভগবানের কৃপা থাকলে ভয় কি? সমতল রাস্তা, হাতীর মত গরু আমার, সাত মাইল পথ কতক্ষণ? শ্যামাকান্তকে ব'লো, পালকিখানাকে আয়রনচেস্টে পুরে রাখতে। রাধে, রাধে, রাধে!

চাটুজ্জে আবার একবার অল্প ওঠবার চেষ্টা ক'রে বললেন, আসুন, আসুন।

বংশলোচন বললেন, আমার গরুর গাড়ি দেব, আপনার কোনও চিন্তা নাই।

বংশলোচনবাবুর সঙ্গে ছিলেন স্বর্ণকমলবাবু,—স্বর্ণকমলবাবু এখন এখানকার প্রতিপত্তিশালী জমিদার হিসাবে প্রধান। গোঁফে তা দেওয়া তাঁর একটা অভ্যাস, অভ্যাসমত গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি বললেন, তিনখানা ভাড়ার গাড়ি ঠিক হয়েছে, ঠিক সময়ে তারা আসবে। তাদের একটু আগেই রওনা ক'রে দেবেন। একটু হেসে বললেন, লচুকাকার হাতীর মত গরুর সঙ্গে তো সমানে চলবে না ওদের মর্কটের মত গরু।

বংশবাবু বললেন, তা শ্যামাকান্তের তেঠেঙে, ছাউনি-ছেঁড়া পালকিটা যদি পালকি হয়,

তবে আমার গরুও হাতী।

স্বর্ণবাবু বললেন, গুজরাটী।

বংশবাবু হঠাৎ রাধাকান্তের দিকে ফিরে বললেন, রাধাকান্ত কি পালকিখানা ভেঙে ফেলে রেখেছ, লোককে দেবার ভয়ে?

রাধাকান্ত হেসে বললেন, লোকের ভয়ে ঠিক নয়, নিজের ভয়ে।

নিজের ভয়ে? কেন, পাছে আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়? না কি?

রাধাকান্ত আবার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে লচুকাকার দিকে চেয়ে বললেন, জবাবটা বাকি রইল লচুকাকা। চাটুজ্জের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আজকে ওঁর সামনে জবাবটা ঠিক শোভন হবে না। অন্য দিন মনে ক'রে দিও, জবাব দেব।

রুগ্ন চাটুজ্জে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই জমিদারগুলিকে তিনি জানেন, ভয় করেন, রাধাকান্তকেও জানেন, হয়তো তাঁর এইখানেই এই উপলক্ষে কোন একটি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়ে যাবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, প্রতাপ! প্রতাপ!

কৃষ্ণচন্দ্রের ভাই প্রতাপচন্দ্র। প্রতাপ ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন, এঁদের তামাক দাও। আমার মহাভাগ্য যে এঁদের পায়ের ধুলো পড়েছে।

প্রতাপচন্দ্র বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার মুখেই সে ব্যস্ত হয়ে কাকে আহ্বান করলে, আসুন, আসুন, আসুন।

সুদীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, পাকাচুল লোকটি এসে দাঁড়ালেন। এবার সমগ্র বাড়িটাই যেন চঞ্চল হ'ল। শুধু স্বর্ণকমলবাবু বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন। এলেন যিনি, তিনি গোপীচন্দ্রবাবু, এ গ্রামের নূতন ধনী এবং ধনের পরিমাণে ইতিমধ্যেই স্থানীয় সকলকেই তিনি অতিক্রম করেছেন। সকলের চেয়ে বড় পাকাবাড়ি তৈরী করেছেন, ঠাকুর এবং ঠাকুর-বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ গ্রাম এবং গ্রামখানির অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি না হ'লেও দূরে-দুরান্তরে জমিদারিও কিছু কিনেছেন, জুড়িগাড়িও তিনি সম্প্রতি কিনেছেন—যা এ অঞ্চলে কারও কখনও ছিল না বা নাই। স্বর্ণকমলবাবুও সম্প্রতি একটি ঘোড়া এবং একখানা টমটম কিনেছেন, কিন্তু জোড়া ঘোড়া ও পালকি-গাড়ির সঙ্গে তার মর্যাদার পার্থক্য অনেক। গোপীচন্দ্রবাবু এখানে বড় একটা থাকেন না, থাকেন কলকাতায় এবং কয়লাকুঠী-অঞ্চলে,—অনেকগুলি কয়লাকুঠীর মালিক তিনি। নিজের জীবনেই উনি এ সব সম্পদ ও সম্পত্তি আয়ত্ত করেছেন; তাঁর বাপ ছিলেন নিঃস্ব, তিনি নিজে জীবন আরম্ভ করেছিলেন কয়লাকুঠীতে সাত টাকা বেতনে।

বংশলোচনবাবু বললেন, এস, এস। এলে কবে তুমি?

বিনয়সহকারে কথা বলাই গোপীচন্দ্রের অভ্যাস এবং কথা ও কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই সুমিষ্ট, তিনি বললেন, আজই সকালে এসে পৌঁছেছি। এসেই শুনলাম। তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, আপনি ভাল ছিলেন?

বংশলোচন বললেন, 'তোমার কুশলে কুশল মানি', তুমি কেমন বল?

রাধাকান্ত হঠাৎ উঠলেন, চাটুজ্জের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি উঠছি।—ব'লে

চাটুজ্জের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনাকে প্রণাম করছি আমি।

চাটুজ্জে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি, বয়সে অনেক ছোট হ'লেও আপনি আমার কাকা—

রাধাকান্ত বললেন, আজ আপনি শিবত্ব কামনায় কাশী চলেছেন, সংসারকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, সকল সম্বন্ধকে অতিক্রম করেছেন—আজ আপনার চেয়ে বড় কেউ নাই, আপনি সকলের বড়, প্রণম্য।

কৃষ্ণ চাটুজ্জে স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাধাকান্তের দিকে চেয়ে রইলেন, পার্থিব সকল কিছুকেই তিনি ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, বৈরাগ্য এবং মৃত্যুর দিকে প্রশান্ত মুখে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ়তার নিকট সমস্ত কিছুই তুচ্ছ করতে চেয়েছেন তিনি; কিন্তু তবু গ্রামের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাপন্ন পিতার সন্তান রাধাকান্ত সামাজিক সম্বন্ধে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সত্যই যেন মহত্তম স্বর্গের দিকে অগ্রসর ক'রে দিলেন ব'লে তাঁর মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে তিনিই যে আজ সকলের চেয়ে মহত্তম ব্যক্তি, মহিমান্বিত ব্যক্তি—এ বোধও ওই রাধাকান্তই তাঁর অন্তরে জাগ্রত ক'রে দিলেন। রাধাকান্ত তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। সমস্ত বাড়িটি তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। রাধাকান্তের কথাগুলির ধ্বনিই প্রতিটি লোকের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল; মুখর বংশলোচন পর্যন্ত স্তব্ধ। স্বর্ণকমল-বাবু নীরবই ছিলেন, কিন্তু গোপীচন্দ্র আসবামাত্র তাঁর মুখে যে দাম্ভিকতাদৃপ্ত গাম্ভীর্যের ছায়া নেমেছিল সে ছায়াচ্ছন্নতা কেটে গিয়েছে। গোপীচন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাধাকান্তের পর তিনিই সর্বপ্রথম উঠে এসে চাটুজ্জের পায়ের দিকে সুদীর্ঘ গৌরবর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। নীরবেই পায়ের ধুলো নেওয়া শেষ ক'রে বললেন, একটা কথা বলছিলাম—। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, শুনলাম ট্রেন ধরবার জন্যে এখান থেকে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। আমার ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। যদি বলেন, তবে পাঠিয়ে দিই।

চাটুজ্জে বললেন, দেবেন।

তিনি সত্যই এক মুহূর্তে সংসারকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন, আজ যে যা দিতে চাইবে, তার কোন কিছু নিতেই তাঁর দ্বিধা নাই, শোধ করবার দায়িত্বই যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

সেই মুহূর্তেই রাধাকান্ত আবার ফিরলেন দরজার মুখ থেকে। বললেন, বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আশ-পাশ গ্রাম থেকেও লোক আসছে। সম্ভব হ'লে, বাইরের বারান্দায় বিছানা ক'রে যদি আপনি সকলকে দেখা দেন—

চাটুজ্জে ডাকলেন, প্রতাপ!

বংশলোচন বললেন, বারবেলা, কি খারাপ সময় নয় তো? পঞ্জিকাটা দেখ। ব'লে এবার তিনি এগিয়ে এলেন। বংশলোচনের পরে এলেন স্বর্ণবাবু, তারপর অন্য সকলে। বংশলোচনবাবু ধমক দিলেন, ধীরে, ধীরে—একে একে—আস্তে।

ঠিক এই সময়টিতেই, দরজার মুখ থেকে একজন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে স্বর্ণবাবুর কাছে

দাঁড়াল। মৃদুস্বরে অথচ ব্যস্তভাবে বললে, আপনার নায়েব এসেছে। আপনাকে—

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই কথার মাঝখানেই স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, রমণ এসেছে?

হ্যাঁ। আপনাকে এখুনি যেতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি?

ইস্কুলে এসেছেন, ইস্কুল দেখছেন।

ইস্কুল দেখছেন?

হ্যাঁ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, না, এস. ডি. ও?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই তো বললে আপনার নায়েব।

হুঁ। ব্যস্ত হয়ে স্বর্ণবাবু চাটুজ্জের দিকে ফিরে বললেন, কি ফ্যাসাদ দেখুন, হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন ইস্কুলে! আমি তা হ'লে যাই। গাড়ি আপনার ঠিক সময়ে আসবে। লচুকাকা, তুমি বরং ব্যবস্থা ক'রো সব।

বংশবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খামকা আসবেন কি হে বাপু? তিনি এলে থানায় পরোয়ানা আসবে, জমিদারদের জানাবেন দারোগাবাবু, তাঁর খাদ্যসরবরাহ আছে—

এবার স্বর্ণবাবুর নায়েব এগিয়ে এল, আজ্ঞে, হঠাৎ এসেছেন তিনি। গিয়েছিলেন শঙ্করপুর থানা। সেখান থেকে মনিহারপুর হয়ে সদরে ফিরছিলেন। পথে আমাদের নদীর ঘাটে ঘোড়ার গাড়ির চাকা ভেঙে যাওয়ায়, এখানকার থানায় যাচ্ছিলেন হেঁটে। গ্রামে ঢুকতেই ইস্কুল দেখে, ইস্কুলে ঢুকেছেন।

আর কোন কথা হবার আগেই এবার আর একজন এগিয়ে এল বাইরে থেকে।

রাইটার-বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাইটার-বাবু অর্থাৎ রাইটার কন্‌স্টেবল।

স্বর্ণবাবু ব্যস্তভাবেই গোঁফে তা দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে গরুর গাড়ি এল। স্বর্ণবাবুর ভাইও এলেন এই সময়টিতে। স্বর্ণবাবু পাঠিয়েছেন তাঁকে, গাড়ি এসেছে কি না দেখতে। ভাড়ার গাড়ি, গাড়োয়ানেরা স্বর্ণবাবুর প্রজা। তিনি তাঁদের ব'লে দিয়েছিলেন, খবরদার, যেন দেরি না হয়।

স্বর্ণবাবুর ভাই দাঁড়িয়ে তদ্বির ক'রে মালপত্র বোঝাই করালেন। চাটুজ্জের সঙ্গে যাবেন ছেলে গোপাল এবং ভগ্নী কাদু। তারা ছাড়া আর যাঁরা সঙ্গে যাবেন—চাটুজ্জের কন্যা, ছোট ছেলে, শ্যালিকা, ভাগ্নে—এঁরাও গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ির চারিদিকে লোকের ভিড় সমানে জ'মে আছে,—এক যাচ্ছে, এক আসছে। বাড়ির বাইরের বারান্দাতেই চাটুজ্জে আধাশোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে নূতন লোকের দল এলে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। এ ছাড়া কখনও হঠাৎ মনে পড়ছে কোন একটা অতীত কথা, তখন সেই ঘটনাটি গ্রামের যেখানে ঘটেছিল, সেই স্থানটির

দিক-লক্ষ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টার মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ছে কোন প্রাচীন গাছের শাখাপল্লব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে সেই গাছের ফলের কথা অথবা ফুলের কথা অথবা ছায়ার কথা।

স্বর্ণবাবুর ভাই এসে বললেন, দাদা আসতে পারলেন না, সায়েব এসেছেন, ইস্কুল নিয়ে কথাবার্তা—। তা ছাড়া, গাঁয়ের কথা তো জানেন। ইস্কুল নিয়ে শত্রুতা আরম্ভ করেছে।

চাটুজ্জের কানে বোধ হয় কথাটা গেল না। তিনি উদাস দৃষ্টিতে যেমন তাকিয়ে ছিলেন, তেমন ভাবেই তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর গোপীচন্দ্রবাবুর জুড়ি এসে দাঁড়াল। জুড়ির সঙ্গে গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে এসেছে। ছেলেটির নাম পবিত্র। বাপের মতই মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী। নম্রকণ্ঠে বললে, বাবা বললেন, তিনি ক্ষমা চেয়েছেন আপনার কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন শুনেছেন বোধ হয়। সাহেবের সঙ্গে এখানে এণ্ট্রান্স স্কুল করবার কথা হচ্ছে। বড়দা মেজদাও সেখানে। আমি এসেছি। সে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে।

চাটুজ্জে এ সংবাদটায় যেন ঈষৎ চঞ্চল হলেন। ধীর ক্লান্ত স্বরে বললেন, এণ্ট্রান্স ইস্কুল হবে?

হ্যাঁ। বাবার তো অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে।

চাটুজ্জে বললেন, ভাল হবে, ভাল হবে।

আরও হয়তো কিছু বলতেন তিনি। কিন্তু কানে এসে ঢুকল খোল-করতালের ধ্বনির সঙ্গে সংকীর্তন-গান—"ও সে নায়ের তরী বাঁধা ঘাটে, ডাকলে দয়াল পার করে"।

সংকীর্তনের দলের পিছনে বংশলোচনবাবু।

চাটুজ্জে প্রস্তুত হয়ে ঈষৎ খাড়া হয়ে গমনোদ্যত হয়ে উঠলেন—শিব, শিব, শিব!

গাড়ি চ'লে গেল। লোকজনের অনেকে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত গাড়ির সঙ্গে ছুটে গেল। গ্রাম পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা বাগান—ফলের বাগান, বাগানের মধ্যে একটি দেবমন্দির। রাধাকান্তবাবুর বাপ প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন। সেইখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাধাকান্ত।

কোচোয়ান গাড়ি থামালে।

রাধাকান্ত বললেন, না, থামবার প্রয়োজন নাই। তিনি উঁকি মেরে দেখলেন, চাটুজ্জে চোখ বন্ধ ক'রে আধশোয়া অবস্থায় ব'সে রয়েছেন। জীর্ণরেখাঙ্কিত মুখের উপর দুটি শীর্ণ জলের ধারা নেমে এসেছে মুদ্রিত চোখের দুটি কোণ থেকে।

২

উনিশশো পাঁচ সাল। বঙ্গব্যবচ্ছেদকে উপলক্ষ্য ক'রে অকস্মাৎ দেশময় একটা সাড়া জেগে উঠেছে। ঘুমন্ত জীবের ধমনীতে অপূর্ব কৌশলে ছিদ্র ক'রে এক শ্রেণীর বাদুড়ে রক্ত পান করে, ঘুমন্ত জীব রক্তক্ষয়ে দুর্বলতার জন্য একটা অশান্তি অনুভব করে, দুঃস্বপ্নাতুরের মত

ঘুম ভেঙে উঠতেও চায়, কিন্তু উঠতে পারে না ; সে সময় যদি কৌশলী বাদুড় কৌশল ভুলে চঞ্চুর আঘাত করে দেহে, তবে সে আঘাতে জীব যে বেদনা, যে জ্বালা, যে ক্ষোভ নিয়ে চীৎকার ক'রে জেগে ওঠে, বঙ্গব্যবচ্ছেদের জাগরণ ঠিক সেই ধারার জাগরণ। সে জাগরণের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে ইংরেজের আমলে গণ্য হবার মর্যাদা লাভ করবে না, শুধু সরকারী রিপোর্টে থাকবে। কিন্তু এ দেশের মানুষ সে তথ্য সংগ্রহ ক'রে রাখছে। একদিন সে জাগরণের কাহিনী প্রকাশিত হবে। এ গ্রামের রাধাকান্তবাবু নিয়মিত জীবনের দিনলিপি রেখে থাকেন, তিনিও লিখে রাখছেন।

উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গে দেশ জেগেছে। সরকারও সজাগ এবং তৎপর হয়ে উঠেছেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের টুর-প্রোগ্রাম বেড়েছে। আগে সাধারণত এস. ডি. ও. সাহেবরাই আসতেন, যেতেন ; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহাশক্তির রহস্যের মত অদৃশ্য এবং দুর্লভ ছিলেন ; কদাচিৎ বর অভয় করবার নিমিত্ত, অথবা দেবলোকে দানবোত্থানের মত কিছু সমুপস্থিত হ'লে তাকে দমনার্থে আবির্ভূত হতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মোটর ছিল না, রেল-লাইন জেলাটার মধ্যে সবে একটা ছিল, কাজেই ছ্যাকরাগাড়িতে যাতায়াত করতে হ'ত। এই থানার পাশে শঙ্করপুর থানা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শঙ্করপুর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পথে এই গ্রামপ্রান্তে নদী। নদী পার হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক চ'লে গিয়েছে সদর শহরে। নদীর ঘাটে সাহেবের গাড়ি ভেঙেছে। সাহেব এসে ঢুকলেন এই গ্রামে।

পথে স্বর্ণবাবুর বাবার প্রতিষ্ঠিত এম. ই. স্কুলটা দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লেন। বেহার প্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশীয় ব্যক্তি—আই. সি. এস.। সম্ভ্রান্তদর্শন চেহারা, সর্বোপরি জমকালো একজোড়া গোঁফ। হেডমাস্টার তাঁকে দেখেই তটস্থ নয়, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কুর্নিশের মত আভূমি নত সেলাম জানিয়ে সত্য সত্যই হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

সাহেব বললেন, আমি এ জেলার কালেক্টার এবং ম্যাজিস্ট্রেট। তুমি হেডমাস্টার ?

হেডমাস্টার কেঁপে উঠলেন, তাঁর গলা শুকিয়ে গেল, কোন রকমে শুষ্ককণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, আই হ্যাভ দি অনার টু বি সার্, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট।

ধন্যবাদ তোমাকে। আমি তোমার স্কুল দেখতে চাই।

হেডমাস্টার করতলযুগল প্রসারিত ক'রে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

স্বর্ণবাবুর অবস্থা খারাপ না হ'লেও, স্বচ্ছলতার সমস্তটুকুই এখন ব্যয়িত হচ্ছে তাঁর জ্ঞাতি এবং সদ্য-উদীয়মান ধনী গোপীচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতায়। মামলা-মকদ্দমা দিয়ে মালা গাঁথা যায়। স্কুলটা স্বর্ণবাবুর বাড়ির সীমানার মধ্যেই, তাঁর কাছারি এবং বৈঠকখানার সামনেই ; তবুও তাঁর সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশও নাই, সামর্থ্যও নাই। স্কুলের আসবাবপত্র ভেঙেছে, চেয়ার-বেঞ্চগুলোর অধিকাংশই নড়ে, ব্ল্যাকবোর্ডগুলোর রঙ নষ্ট হয়েছে, দেওয়ালের চুন উঠে গিয়ে তৈলাক্ত টাক-পড়া মাথার মত মনে হচ্ছে, অনেক জায়গায় পলেস্তারা উঠে গেছে, খড়ের চাল থেকে ছাওয়ানো-অভাবে সারি সারি জলের ধারা প'ড়ে সারা দেওয়ালটাকে তার উপর কর্দমাক্ত ক'রে তুলেছে। কিন্তু ছেলের সংখ্যা কম নয়।

সাহেব বিস্মিত হয়ে নোট-বই খুলে এ গ্রামের তথ্যগুলির উপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, তাতেও তাঁর বিস্ময় কাটল না।

প্রাচীন জমিদারপ্রধান গ্রাম, ধনের খ্যাতি আছে, খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সভ্য সমাজ। তিনি প্রশ্ন করলেন, হেডমাস্টার, এমন গ্রামে স্কুলের অবস্থা এমন কেন?

হেডমাস্টার সবিনয়ে বললেন, হুজুরের কৃপাদৃষ্টি হ'লে অবস্থা এখুনি ভাল হবে।

সাহেব তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, গভর্মেণ্ট অবশ্যই তাঁর কর্তব্য করবেন। এবং আমি আশা করি, এখনও করেন। গ্র্যাণ্ট পাও নিশ্চয়।

পাই। কিন্তু অত্যন্ত অল্প।

বাকিটা স্থানীয় লোকেরা দেবে।

হেডমাস্টার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

স্কুলের ফাউণ্ডার কি দেন?

আগে সবই দিয়েছেন, যখন যা অভাব হয়েছে যুগিয়েছেন, কিন্তু এখন অবস্থা তাঁর পূর্বের মত নাই, নানা কারণে তিনি এখন বিব্রত—। কথা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চুপ করলেন। বাকিটা বুঝে নিতে সাহেবের কষ্ট হ'ল না।

এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আছে শুনেছি, তারা কেউ দেয় না কেন?

হেডমাস্টার মাথা চুলকাতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, তাঁরা এ বিষয়ে উদাসীন। হুজুর, এই এতগুলি ছেলে পড়ে স্কুলে, তার মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেদের বেতনই নিয়মিত পাই না।

সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে হেসে বললেন, সেটাতে এরা ধারে ছেলে পড়াবার একটা গৌরব অনুভব করে। এতে এদের ক্রেডিট বাড়ে ব'লে মনে করে। তোমরা কখনও সাহায্য চেয়েছে?

হেডমাস্টার বললেন, চাই নি এমন নয়। তবে—

তবে খুব আর্নেস্টলি চাও নি, কেমন?

হেডমাস্টার চুপ ক'রে রইলেন।

সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমি যদি চাঁদা আদায় ক'রে দিই? মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের ফাউণ্ডার-প্রোপ্রাইটারের নিতে আপত্তি হবে না তো?

হেডমাস্টার বললেন, তাঁকে খবর পাঠিয়েছি সার্, তিনি আসবেন এক্ষুনি।

সাহেব পা দুলিয়ে বললেন, আমি এই সব পিপ্‌লকে জানি হেডমাস্টার। এরা হচ্ছে ফাঁকা ড্রামের মত দাম্ভিক।

হেডমাস্টার কোন উত্তর দিতে সাহস করলেন না।

সাহেব একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, এখানকার ইয়ং জেনারেশন কি রকম? তারা রটন 'বন্দে মাটরম্' করে না? বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে বন্‌ফায়ার করে না? নিজেই ব'লে

উঠলেন—প্রশ্ন-শেষের এক মুহূর্ত পরে, ইয়েস—ইয়েস, বন্‌ফায়ার করেছিল এখানে, পুলিস রিপোর্ট পেয়েছি আমি।

হেডমাস্টার বললেন, সে সার্ অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। সে সব এখানে কিছু নাই।

আমি আশা করি তাই। বিশেষ ক'রে আমি রয়েছি এ জেলায়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, শোন হেডমাস্টার। গভর্মেণ্ট সব করতে প্রস্তুত তোমাদের জন্তে। আমি দেখব, যাতে তোমাদের গ্র্যাণ্ট বাড়ে। আমি গ্রামে স্থানীয় লোকদের কাছে সাহায্য আদায় ক'রে দেব। কিন্তু তুমি দেখো, but you see, এই ছেলেদের সৎশিক্ষা দিতে হবে তোমাদের। এই সব রটন্ থিংস—হুজুক, এতে যেন তারা না মাতে, ওদিকে তাদের টেণ্ডেন্সি না যায়।

বার কতক চুরুটে টান দিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ গ্রামের সবচেয়ে অর্থশালী ব্যক্তিটি কে?

হেডমাস্টার বললেন, বাবু গোপীচন্দ্র ব্যানার্জি।

জমিন্দার?

জমিন্দারি তিনি সম্প্রতি কিনেছেন বটে, কিন্তু জমিন্দার হিসেবে বড়লোক নন। তিনি মার্চেণ্ট।

মার্চেণ্ট? ধান-চালের ব্যবসা করে?

না সার্। তিনি কলিয়ারি-প্রোপ্রাইটার, কোল-মার্চেণ্ট। বাংলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোল-মার্চেণ্টদের একজন।

সাহেব সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বল কি? তবে তো তার মূল্য লক্ষাধিক টাকা?

অনেক লক্ষ টাকার মালিক তিনি সার্।

স্বর্ণবাবু এসে সাহেবকে আভূমি-নত সেলাম ক'রে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে জামা-কাপড় পালটে চোগা-চাপকান প'রে এসেছেন। মুখে বললেন, গুডমনিং সার্।

হেডমাস্টার বললেন, ইনিই আমাদের প্রোপ্রাইটার এবং সেক্রেটারি।

সাহেব বললেন, গুডমনিং।

দারোগা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। বললে, হুজুরের কত দেরি হবে এখানে? আমরা ডাকবাংলোয় হুজুরের খানার সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। জিনিসপত্র সেখানে পাঠিয়েছি, বাবুর্চী খবর পাঠিয়েছে—

ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সাহেব দেখলেন, উঃ, দেড়টা বাজে প্রায়! তিনি উঠলেন। হেডমাস্টারকে বললেন, ভেবো না হেডমাস্টার, আমি ব্যবস্থা করব একটা, আজই করব। স্বর্ণবাবুকে বললেন, বিকেল পাঁচটার সময় ডাকবাংলোয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সাব ইন্সপেক্টর, তুমি গ্রামের জমিন্দার এবং ভদ্রলোকদের খবর দাও, সাড়ে

পাঁচটায় যেন আমাকে ডাকবাংলোয় সেলাম দেয়। হেডমাস্টার, তুমি আমার সঙ্গে আসবে? আমি তোমাদের এই গোপীচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্বর্ণবাবু সেলাম জানিয়ে বললেন, আমি পাঁচটায় যাব। তিনি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেবের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়াটাই বিধি, কিন্তু সে বিধি তিনি লঙ্ঘন করলেন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি চলেছেন সাহেব, সেখানে যেতে তিনি বাধ্য নন।

গোপীচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জের বাড়িতে। নায়েব হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল। সাহেব বারান্দায় একখানা চেয়ারে ব'সে ছড়িটা মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন, দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল গোপীচন্দ্রের নবনির্মিত ঠাকুর-দালান ও নাটমন্দিরের দিকে। হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হ'ল, সাহেব যেন লাঠির প্রান্ত দিয়ে গোপীচন্দ্রের কীর্তির ভিতের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছেন, যেমন ডাক্তারে বুকের উপর আঙুলের টোকা মেরে বুক পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ সাহেব প্রশ্ন করলেন, এ সব তো তোমাদের দেবতার জন্যে করা হয়েছে?

হ্যাঁ সার্।

কি হয় এখানে? ফুল আর পাতা দিয়ে পুজো? ড্রাম-ট্রাম্পেট-বেল্স বাজাও? নানা রকম সুখাদ্য খেতে দাও? কতকগুলো গোট্স স্যাক্রিফাইস করা হয়? হাও মেনি? অনেক? না?

না, সার্। গোট্স এখানে স্যাক্রিফাইস করা হয় না। রাধাকৃষ্ণ—বৈষ্ণবের দেবতা—

আই সি। রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন—অ্যাঁ?

ইয়েস সার্।

এ সব তো খুব বেশি দিনের নয়! খুব সম্প্রতি হয়েছে, না?

হ্যাঁ সার্। বৎসর তিনেক বোধ হয়। এই নাটমন্দির শেষ হয়েছে সেদিন—সেভ্ন অর এইট মান্থ্স ওন্লি।

আর কি কীর্তি করেছেন তিনি?

হেডমাস্টার একটু ভেবে বললেন, আর? আরও দুটি শিব প্রতিষ্ঠা করেছেন, এপারকার সর্বসাধারণের দেবস্থান মহাপীঠে দেবীর মন্দির ক'রে দিয়েছেন—

আর কি?

হেডমাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই যে উনি আসছেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলেন সাহেব। বাঙালীর মধ্যে এ চেহারা সুদুর্লভ। ছ'ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, কাঁচা সোনার মত গৌর দেহবর্ণ, তুষারশুভ্র মাথার চুল, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা রক্তাভ দুখানি ঠোঁটের মিলনরেখায় স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি যেন লেগে রয়েছে। পরনে সাদা থানধুতি, গায়ে তেমনই সাদা কফওয়ালা শার্ট, পায়ে দুপাশে স্প্রিংওয়ালা জুতো। গোপীচন্দ্র ঈষৎ অবনত হয়ে সেলাম করলেন—গুডমর্নিং সার্।

সাহেব তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, গুডমর্নিং বাবু। গোপীচন্দ্র হাত বাড়ালেন সসম্ভ্রমে ঈষৎ অবনত হয়ে। সাহেব গোপীচন্দ্রের হাতখানি তুলে নিতে গিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এমন গাঢ় রক্তাভ হাত তিনি কখনও দেখেন নাই। লাল পদ্মের পাপড়ির মত কোমল রক্তাভ।

গোপীচন্দ্র বাংলাতেই বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন, ভাল বলতে পারেন না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একজন বড় কলিয়ারি-প্রোপ্রাইটার এবং কয়লার ব্যবসাদার, তোমাকে নিশ্চয় অনেক ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমি আশা করি, ইংরেজীতে কথা বললে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। অসুবিধা হ'লে আমি হিন্দীতে বলতে পারি।

হেডমাস্টার বললেন, ইংরেজী উনি বুঝতে পারেন সার্, বলার অভ্যাস নাই।

গুড। তারপর একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, তুমি বসতে পার গোপীচন্দ্রবাবু।

রাস্তার সামনে তখন অনেক লোক জ'মে গিয়েছে। জেলার হর্তাকর্তাবিধাতা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন—এ সংবাদে অনেক লোক ছুটে দেখতে এসেছে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের কাশীযাত্রার বিস্ময়কর সংঘটনটি আজই না ঘটলে হয়তো রাস্তা জনতায় ভ'রে যেত। তারা বিস্মিত হয়ে গেল, সাহেব নিজে হাত বাড়িয়ে গোপীবাবুর সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করলেন, তাঁকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। দু-চারজন যারা গোড়া থেকেই সাহেবের সঙ্গে আছে, স্কুলে স্বর্ণবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা দেখেছে, তারা মৃদুস্বরে গুঞ্জন ক'রে উঠল, স্বর্ণবাবুকে বসতেও বলে নাই, শেকহ্যাণ্ডও করে নাই।

সাহেব বললেন, ওয়েল গোপীচন্দ্রবাবু, তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

গোপীচন্দ্র একটু ভীত হলেন। বললেন, আমি তো কোন অপরাধ করি নাই হুজুরের কাছে।

না, আমার কর নাই, কিন্তু তুমি তোমার গ্রামের লোকের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেছ। তাদের কাছে তোমার ত্রুটি রয়েছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর, আমি সামান্য ব্যক্তি। গ্রামের লোকের প্রতি আমার কর্তব্য আমি—

না, তুমি সামান্য ব্যক্তি নও। তুমিই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তোমার মত লোক থাকতে গ্রামের স্কুলের অবস্থা এত খারাপ কেন ?

গোপীচন্দ্রের মুখ এবার কঠিন হয়ে উঠল। তিনি সহসা উত্তর দিলেন না, যোগ্য উত্তর ভাবতে লাগলেন।

সাহেব বললেন, স্কুলে তুমি সাহায্য কর না কেন ?

গোপীচন্দ্র তবু চুপ ক'রে রইলেন।

সাহেব বললেন, কেন ? তোমাকে স্কুলে সাহায্য করতে হবে। স্কুলটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে হবে তোমাকে।

সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা হেতু প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্ণবাবুদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সাহায্য দিতে অনিচ্ছা থাকলেও সে কথা ভদ্রতাসম্মত নয় ব'লেই হোক, অথবা তাঁর মনের সত্য অভিপ্রায়ই হোক, গোপীচন্দ্র এবার বললেন, একটা জীর্ণ এম. ই. স্কুলের উপর অর্থব্যয় করাটা আমার বেশ ভাল লাগে না হুজুর, আমার ইচ্ছা—এখানে আমি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর হাই

ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করি।

সাহেব হাত বাড়িয়ে গোপীচন্দ্রের হাত ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, তোমার এই মহৎ সংকল্পের জন্য তোমাকে আমি অন্তর থেকে অভিনন্দিত করি গোপীচন্দ্রবাবু।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর আমায় মহৎ সম্মান করলেন। আমি সামান্য ব্যক্তি—

নো নো নো। তুমি এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এর পর একটু হাসলেন, হেসে বললেন, দিজ পিপ্‌ল—আমি জানি গোপীবাবু, এরা তোমাকে এখনও মানতে চায় না। তোমার সঙ্গে বিরোধিতা করে। আই নো। এই হ'ল এদের চরিত্র। কিন্তু তোমাকে এ সব জয় করতে হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, সেই বিরোধিতার ভয়ই আমি করছি হুজুর। আমার ভয় হয়, এ কাজে এখানকার সকলে—বিশেষ ক'রে যাঁরা জমিদার, তাঁরা বাধা দেবেন।

সাহেব হাসলেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

তা হ'লে আমি নির্ভয়ে কাজ করতে পারি।

নির্ভয়ে কাজ কর তুমি, এবং আমি আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। ইউ সি। আর এক বৎসর আমি এ জেলায় আছি। আমি স্কুল ওপন করব।

কাল থেকে আমি কাজ আরম্ভ করব।

গুড। আশা করি, দু মাসের মধ্যেই আমি এখানে এসে ফাউণ্ডেশন স্টোন পত্তনের আনন্দ লাভ করতে পারব।

নিশ্চয়ই হুজুর। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি কোনদিন।

সাহেব বললেন, এইটা তোমাদের ভুল ধারণা। সরকার তোমাদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। ভাল কাজের জন্যে পুরস্কৃত করতে পারলে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন গভর্মেণ্ট। কীর্তিমানদের টাইটেল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়, সম্মানিত করা হয়, শাসনকার্যে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে থাকি আমরা। কিন্তু ইউ সি—এই বেঙ্গল অ'জ সুরেন ব্যানার্জি অ্যাণ্ড আরও কতকজন অ্যাজিটেটারের পাল্লায় প'ড়ে হুজুক করছে; দিস রটন বণ্ডেমাটরম্, বিলিতী কাপড় বন্‌ফায়ার, বয়কট—দিজ থিংস ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড।

গোপীচন্দ্র বললেন, না, সে সব আমাদের এখানে কিছু নাই।

সাহেব উঠলেন, বললেন, যাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা তোমাদের মত লোকের কর্তব্য। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাও, সেণ্ড দেম টু ইংল্যাণ্ড ফর হায়ার এডুকেশন। দেখে আসুক ইংরেজ কত বড় জাত। কত বড় তাদের কাল্‌চার। আচ্ছা গোপীবাবু, এখন আমি ডাকবাংলোয় যাচ্ছি। তুমি বিকেলে এসো ওখানে, আমি গ্রামের জমিদারদের সংবাদ দিয়েছি; তারা আসছে। আজই হাই স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করব।...ওয়েল, এ গাড়ি কার? বিউটিফুল পেয়ার অব হর্স! গাড়িও সুন্দর! আমি আশা করি, এ গাড়ি তোমার?

হ্যাঁ সার্।

গোপীচন্দ্রের জুড়ি এসে দাঁড়াল।

গোপীচন্দ্র সবিনয়ে বললেন, হুজুর এই গাড়িতে ডাকবাংলো গেলে আমি খুশি হব।

সাহেব অগ্রসর হলেন গাড়ির দিকে। গোপীচন্দ্র তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরের ভিতরে ঢুকে একটি রেশমী রুমাল্ ঢাকা ছোট একটি পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়ির ভিতরে উপবিষ্ট সাহেবের সম্মুখে রুমালখানি তুলে ধ'রে বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। আপনার সম্মান—। যদি অনুগ্রহ ক'রে হুজুর এই সামান্য—। একখানি রূপার রেকাবির উপর একটি সোনার ঘড়ি। এবারই তিনি এটি কিনে এনেছিলেন নিজের ব্যবহারের জন্য। টাকা বা গিনি দেওয়াটা ঠিক হবে না, হয়তো সাহেব অন্য রকম ভাবতে পারেন—ভেবে এই ঘড়িটিই তিনি উপঢৌকনস্বরূপ রূপার রেকাবির উপর রেখে সাহেবের সামনে ধরলেন। সাহেব একটু হেসে রেকাবখানি সমেত টেনে নিয়ে গাড়িতে নিজের পাশে রাখলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপে আনন্দ পেলাম। অনেকদিন মনে থাকবে আমার। তুমি বিকেলে নিশ্চয় আসছ ? আমি সমস্ত আজ পাকা করতে চাই। কোচম্যান, চালাও।

* * *

সজ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর পরে শিবত্ব-কামনায় কৃষ্ণ চাটুজ্জে কাশী যাত্রা করলেন ওই গাড়িতেই। সাহেবকে ডাকবাংলোয় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে এসে দাঁড়াল চাটুজ্জে মহাশয়ের দরজায়। বয়স্ক সমাজপতিদের সঙ্গে যাত্রাকালে চাটুজ্জের দেখা হ'ল না। সমাজপতিরা সকলেই জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন—দারোগা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন সাহেবের অভিপ্রায় ; তাঁরা সকলেই সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের মধ্যে নাকি আছে, সরকারী কর্মচারী, সরকারী ফৌজ যখন যেখানে যাবে, তখন সেখানকার জমিদারেরা এই বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী তাঁদের তদ্বির-তদারক করবেন, রসদসংগ্রহে সাহায্য করবেন, পুলিসকে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করবেন। এক পুরুষ আগেও—যাঁর জমিদারির সীমানায় খুন-ডাকাতি হ'ত, তাঁকে আংশিকভাবে জবাবদিহি করতে হ'ত। চৌকিদারদের জমি দিয়ে পোষণ করতে হ'ত। বর্তমানে পুলিস বিভাগের দায়িত্ব অনেকটা কমেছে, চৌকিদারী জমি সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিজে তার আয় গ্রহণ ক'রে চৌকিদারকে পুরা-থানার আয়ত্তে এনেছেন। ফৌজও আজকাল যাতায়াত করে না, কিন্তু সাহেবরা যখন আসেন, তখন মুর্গী মাছ ডিম ঘি দুধ কলা, ক্ষেত্র বিশেষে মূলা বেগুন সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে হয়, ডাকবাংলোয় অথবা থানায় সেলাম দিতে যেতে হয়।

সাধারণ মানুষের অশ্রুসিক্ত চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে এক সকরুণ রহস্যের মতই বৃদ্ধ চাটুজ্জে চ'লে গেলেন। গাড়িখানা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। তারা চোখ মুছে ফিরল।

সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামখানি তখন আবার মুখর হয়ে উঠেছে অভিনব উত্তেজনায়। গ্রামে হাই ইংলিশ স্কুল হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন। গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেখানে গিয়েছেন। হ্যাঁ, একটা মহৎ অভাব দূর হ'ল ; গোপীচন্দ্র দীর্ঘজীবী হোন। ভগবান যাঁকে বড়

করেছেন, তাঁর স্তবগান তো করবেই মানুষ। তাঁকে না মেনে উপায় কি?

গ্রামান্তরের মধ্যবিত্তেরা, চাষীরা, যারা এসেছিল পুণ্যবান কৃষ্ণ চাটুজ্জের দর্শনের আশায়, জীবনের-নশ্বরত্ব-হেতু-বৈরাগ্য-অভিভূত মন নিয়ে যারা ফিরে যাচ্ছিল, তারাও না দাঁড়িয়ে, এ আলোচনা না শুনে পারলে না। এ দলের মধ্যে ছিল এক ক্রোশ দূরের চাষী রংলাল পাল। সে বললে, গোপীবাবুর জয় হোক। আমাদের ছেলেগুলানের একটা 'রুপায়' হবে। ঘরের খেয়েই পাসটা তো হবে, মুরুখ্যু নামটা তো ঘুচবে।

রাধাকান্তবাবুদের পাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের মধ্যেও এই আলোচনা চলছিল। রজনী বা রজন-ঠাকরুন-এ পাড়ারই মেয়ে, স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতিকন্যা, সম্বন্ধে ভগ্নী। তিনিই ছিলেন মুখপাত্রী। তিনিই বলছিলেন, আমাদের স্বর্ণের দোষ আছে অনেক স্বীকার করি, তা ব'লে গোপীবাবুর ও কাজটা ভাল হ'ল না। একজনের কীর্তি নষ্ট ক'রে—না, এ আমি ভাল বলতে পারি না। স্বর্ণর বাপের নামে যে ইস্কুল রয়েছে সেই ইস্কুলকেই বড় করলে হ'ত।

বরদা দেবীও অন্যতমা প্রবীণা এবং প্রধানা এ পাড়ার। তিনি বললেন, তা ভাই এ কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না।

কেন?

ধর, একজনা পুকুর প্রতিষ্ঠে করেছে, গাঁয়ের লোকে তার জল খায়। এখন সে পুকুরের জল আর কেউ খাবে না, তাঁর মাহাত্মি নষ্ট হবে ব'লে আর কেউ তার চেয়ে ভাল পুকুর প্রতিষ্ঠে করতে পাবে না?

কিসের সঙ্গে কি? ইস্কুলে আর পুকুরে বরদাদিদি? নতুন পুকুর প্রতিষ্ঠে করলে, পুরনো পুকুরটা তো বুজে যায় না। জল থাক্, না থাক্, কীর্তিটা থাকে। আর এতে পুরনোটা যে উঠে যাবে!

বরদা হেসে বললেন, তা বোন, আমার যেমন বুদ্ধিতে কুলাল বললাম। এখন আমাদের উপকার নিয়ে কথা। ছেলেপুলেরা ঘরের খেয়ে পড়বে।

হ্যাঁ। পড়বে—ইংরিজী প'ড়ে সায়েব হবে, মুর্গী খাবে। এর পর মেয়েরা ইংরিজীতে কথা বলবে—। হঠাৎ রজন-ঠাকরুন থামলেন। বললেন, দাঁড়াও। তারপর দুর্গাঘরের বারান্দার দিকে উদ্দেশ ক'রে কাউকে ডাকলেন, কাশীর বউ, শোন।

কাশীর বউ, রাধাকান্তের স্ত্রী। কাশীতে বাপের বাড়ি, তাই লোকে কাশীর বউ ব'লে ডেকে থাকে। কাশীর বউ উত্তর দিলেন না, ধীরপদক্ষেপে এসে সামনে দাঁড়ালেন, যার অর্থ —বলুন। দীপ্তিমতী মেয়ে, দেহবর্ণের উজ্জ্বলতায় একটা প্রখর প্রভা আছে। চোখ দুটি পিঙ্গল; মাথায় ছোট, মেয়েটির বয়স কুড়ির কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয়, পনরো-ষোলর বেশি নয়। কিন্তু ওই পিঙ্গল চোখের তারায় এবং মুখের গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে তাঁকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

রজন-ঠাকরুন মেয়েটিকে বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। কাশী শহরের এই মেয়েটি এসে অবধি তাঁর সূচীবিদ্যার পারদর্শিতার গৌরব কিছু খর্ব হয়েছে। মেয়েটি সূচীবিদ্যায় অদ্ভুত

পারদর্শিনী। লেখাপড়াও নাকি ভাল জানেন। হাতের লেখাও নাকি রঞ্জন-ঠাকরুনের চেয়ে ভাল। রঞ্জন সে কথা বিশ্বাস করে না।

কাশীর বউ এবার বললেন, বলুন, কি বলছিলেন?

স্কুলের জন্যে মীটিং ডেকেছেন সাহেব। রাধাকান্ত নাকি তাতে যায় নাই?

কাশীর বউ শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, আমি তো জানি নে ঠাকুরঝি।

রাধাকান্ত এ সব ভাল করছে না। গ্রামের লোকের সঙ্গে যা করে তাই করে, সাহেব—জেলার মালিক, তাঁদের সঙ্গে এ সব ভাল নয়। বারণ ক'রো।

একটু হেসে কাশীর বউ বললেন, বলব তাঁকে, আপনি বলেছেন ব'লেই বলব। তিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে চ'লে গেলেন।

রঞ্জন-ঠাকরুন বললেন, সংসারে অহঙ্কারটা কখনও ভাল নয়।

রাত্রে রাধাকান্ত সন্ধ্যা শেষ ক'রে দিনলিপি লিখে থাকেন। বাপ উকিল ছিলেন, তাঁর টেবিলখানার উপরে বাবার শেষ চটিজুতা জোড়াটি একখানি মখমলের আসনের উপর সাজানো রয়েছে, নিত্য চন্দন দিয়ে, ফুল সাজিয়ে অর্চনা ক'রে থাকেন; এই টেবিলের উপর ব'সেই তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, দিনলিপি লেখেন।

দিনলিপি লিখছিলেন তিনি। কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন। কোলে তাঁর ঘুমন্ত শিশু। ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

মুখ তুলে রাধাকান্ত বললেন, বল।

তুমি ইস্কুলের মীটিঙে যাও নি?

না।

অত্যন্ত মিষ্ট এবং কতকটা আবদারের সুরে বললেন, কেন?

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, ভাল লাগল না যেতে। কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে মৃত্যুকামনায় কাশী গেলেন, স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। ইচ্ছা ছিল, গ্রামের বাইরে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে কেমন মুখের ভাব নিয়ে তিনি যান, সেইটুকু দেখব। দেখলাম, নিঃশব্দে চোখ বুজে গেলেন তিনি, দুটি জলের ধারা শুধু গড়িয়ে পড়ছে। দেখে বাগানেই ব'সে রইলাম সারাক্ষণ। মীটিঙে আর যেতে ইচ্ছে হ'ল না। তারপর একটু হেসে বললেন, কেন বল তো? গেলে তুমি খুশী হতে?

কাশীর বউ বললেন, দেশের কাজ ভাল কাজ, তাতে তুমি যাবে না, থাকবে না, এ কি ভাল লাগে আমার?

রাধাকান্ত উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমু খেলেন। বললেন, সে গৌরব বাড়াবে খোকা। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, গোপীচন্দ্র দেশের কল্যাণ করলেন। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। এ গ্রামের এ দেশের আরও উপকার তাঁর দ্বারা হোক। স্কুল হচ্ছে, হাজার হাজার

ছেলে লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু তাঁর এ নামের কাঙালপনা ভাল লাগল না। তিনি স্বর্ণের বাপের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল উঠিয়ে নিজের নামে স্কুল করছেন। নিজের বাপের নামেও করলে পারতেন।

কাশীর বউ বললেন, তবু তোমার এ কাজ ভাল হয় নি। নাম যার হোক, কাজটা যে ভাল। দেশের কত বড় সুপ্রভাত আজ বল তো ?

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আমরা অস্তমিত হলাম। গোপীচন্দ্র উদিত হলেন। একটা দিন গিয়ে আর একদিন এল। তবে সুপ্রভাত এটা ঠিক। কিন্তু যে ডোবে সে থাকে পশ্চিমে, আর যে ওঠে সে থাকে পূর্বে, এমন ক্ষণে দুজনে কি ক'রে মেলে বল তো ?

কাশীর বউ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, রাগ করলে তুমি ?

রাগ ? একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, না।

তিন

গ্রামখানির দিকে দিকে বার্তা র'টে গেল, বড় ইংরেজী ইস্কুল হবে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা দেখবার জন্য যারা এসেছিল, তারাই সংবাদটা বহন ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। চাটুজ্জের এই কাশীযাত্রা দেখে মনের মধ্যে শ্মশান-বৈরাগ্যের যে স্পর্শ তারা অনুভব করেছিল, সে অনুভূতি শরতের মেঘের মত স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য ছায়ার বিষণ্ণতা বিস্তার ক'রেই মিলিয়ে গেল; মানুষের মন এই সংবাদটির আলোকে উত্তাপে প্রসন্ন উষ্ণ হয়ে উঠল।

বর্ষা শেষ হয়েছে। একটা ঋতুর অন্তে নব ঋতুর প্রারম্ভ। চাটুজ্জেই যেন চ'লে গেলেন এখানকার বর্ষাঋতুর শেষ মেঘসঞ্চারের মত। এই স্থানটির জীবন-নাট্যে একটি অঙ্কের শেষ হয়েছে। পরবর্তী অঙ্ক আরম্ভের সূচনা হচ্ছে।

এককালে মুসলমান জমিদারেরা গিয়েছেন। তারপর গিয়েছেন গন্ধবণিকেরা। তারপর উঠেছিলেন সরকার-বংশীয়েরা। পতনমুখে তাঁদের অতিক্রম ক'রে উঠেছিলেন তাঁদের বাড়ির দৌহিত্রেরা—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্ত, রাধাকান্ত এবং আরও কয়েকজন। অকস্মাৎ তাঁদের সকলকে অস্তমিত ক'রে দিয়ে উদিত হচ্ছেন গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের বাপ এখানে আগন্তুক মাত্র। স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতি, তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রেই, এখানে এসে বাস করেছিলেন অনুগৃহীত-রূপে। গোপীচন্দ্র ভাগ্যফলে সায়েবদের কয়লাকুঠিতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে মুন্সীর কাজ করতে গিয়ে লক্ষপতি হয়েছেন। কিন্তু তাতেও এখানকার আকাশে অধিষ্ঠিত হবার স্থান লাভ করতে পারেন নাই। আজ বিধাতার দূতের মত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তাঁকে হাত ধ'রে সকলের মধ্যস্থলে স্থান দিলেন। নবোদিত গোপীচন্দ্রের প্রথম রশ্মির মত নবগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়। মানুষেরা কলরব ক'রে উঠল ভোরের পাখির মত।

রাধাকান্ত, তাঁর দাদা শ্যামাকান্ত এঁরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। রাধাকান্ত তাঁর স্ত্রীকে বলে-

ছিলেন, আমরা অস্তমিত হলাম। কথাটার মধ্যে বেদনা ছিল। থাকা স্বাভাবিক। তাঁর জ্যেঠতুত দাদা শ্যামাকান্ত বিচিত্র ধরনের মানুষ। গোপীচন্দ্রের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এ গ্রামে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী এবং অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু স্বভাবে তিনি অতিমাত্রায় কৃপণ এবং প্রকৃতিতে অত্যন্ত ভীরু ব'লে প্রতিষ্ঠায় কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নাই। সেই কারণে যারাই গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য কোন কাজ বা কীর্তি করে, তাদেরই তিনি গালাগাল করেন। সহজ অবস্থায় নয়, অল্প কিছু মদ্যপান ক'রে চক্ষুলজ্জা ঘুচিয়ে ইংরেজীতে গালাগাল ক'রে থাকেন। গৌরবর্ণ ছোটখাটো মানুষ। নিজের বাড়িতে সকলকে গালাগাল দিয়ে আসেন, আর বাইরে নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে ব'সে অপরের সম্পত্তির অসারতা এবং তাঁদের ঋণের পরিমাণের কথার আলোচনা করেন। একমাত্র পুত্র সেও অহরহ মদ্যপান করে। শ্যামাকান্তের পাশের ঘরেই ব'সে সে মদ্যপান করে। শ্যামাকান্ত ব'সে নিরুপায়ের মত দেখেন। কুলধর্মে তাঁরা তান্ত্রিক, তিনি নিজেও মদ্যপান করেন, সুতরাং মদ্যপানটা দোষের নয়। তিনি নিজেই বলেন, ফার্স্ট গ্লাস ফর থার্স্ট, সেকেণ্ড গ্লাস ফর হেল্‌থ, থার্ড ফর প্লেশার, ফোর্থ ফর ম্যাড্‌নেস। শ্যামাকান্ত খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারেন; সেক্সপীয়র মিল্টন তিনি পড়েন নি, কিন্তু বাল্যকালে তাঁর বাপের কর্মজীবনে তিনি সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারই ফলে তাদের ভাষাটা তিনি প্রায় মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। চিন্তা প্রবল হ'লে নিজে দু পাত্র মদ্যপান ক'রে দুনিয়াকে গালাগাল দিতে শুরু করেন—বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই গালাগালি। তিনি মদ্যপান ক'রে গোপীচন্দ্রকে গালাগালি করছিলেন, সন অব এ বেগার। এ থিফ। হি ইজ এ থিফ। চোর চোর। গোপে চোর।

ঈর্ষাকাতর শ্যামাকান্ত আপন মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আপনার বৈঠকখানা এবং কাছারি বাড়ির সামনের চত্বরে। রাধাকান্ত আপনার অন্দর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন; শ্যামাকান্তের বৈঠকখানার পাশেই তাঁর বৈঠকখানা, সেইখানেই যাচ্ছিলেন তিনি। শ্যামাকান্তকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, দাদা অপ্রকৃতিস্থ। রাধাকান্ত দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরের ভেতরে গিয়ে ব'স দাদা।

শ্যামাকান্ত বললেন, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অব নান, নর ডু আই কেয়ার ফর এনিবডি। হি ইজ এ থিফ।

দাদার প্রকৃতি রাধাকান্ত জানেন, এখন এই মুহূর্তে তাকে বাধা না দিলে তিনি আরও দু-এক পাত্র মদ্যপান ক'রে পথে বেরিয়ে পড়বেন এবং রাস্তায় গালাগালি দিয়ে ঘুরবেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁদের নাতিসম্পর্কীয় অনেকে আছে, তারা তাঁকে নিয়ে কৌতুক আরম্ভ করবে। পিছন থেকে তারা তাঁর কাছা খুলে দেবে, শ্যামাকান্ত কাছাটা টেনে আবার গুঁজবেন এবং গাল দেবেন, শালা। তারপর আরম্ভ করবেন ইংরেজীতে গালাগাল; আরও বারকতক কাছা খুলে দেবার পর, তিনি আর কাছা গুঁজবেন না, উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় অশ্লীল গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন। লোকে অবশ্য বলে, শ্যামাকান্তবাবুর গালাগাল হোক অশ্লীল, তবু শুনতে

ভাল লাগে। রাধাকান্ত জানেন, ভাল লাগে না, তারা কৌতুক অনুভব করে। এই কৌতুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অপমান রাধাকান্ত মর্মান্তিকভাবে অনুভব করেন, কিন্তু শ্যামাকান্ত তা অনুভবও করেন না, গ্রাহ্যও করেন না। পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠা এবং সঞ্চিত সম্পদের সম্মান তাঁর মর্যাদাকে রক্ষা করছে—এ কথা তিনি জানেন। রাধাকান্ত বললেন, যা বলছি শোন, যাও, ঘরের ভেতরে যাও।

ছোট হ'লেও শ্যামাকান্ত ভয় করেন রাধাকান্তকে; রাধাকান্তের সাহসকে ভয় করেন, তাঁর দৃঢ়তা এবং ধীরতাকে সম্ভ্রম না ক'রে উপায় নাই। দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত রাধাকান্তের এই কথা কয়েকটিতে তিনি এবার একটু দ'মে গেলেন।

রাধাকান্ত বললেন, যাও, ঘরের ভেতর যাও।

অকস্মাৎ শ্যামাকান্ত বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে ব'লে উঠলেন, নো নো নো। তারপর আরম্ভ করলেন, আমি মা রাজার ছেলে, প্রণাম নাহি জানি। কারও হুকুম আমি মানি না। কথাটা শেষ করলেন উর্দুতে—ময় নেহি যাউঙ্গা।

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তবে মদ খেয়ে একজন মানী লোককে গালাগাল করবে?

গালাগাল? শ্যামাকান্ত কণ্ঠস্বর উচ্চ ক'রে এবার আরম্ভ করলেন, হি ইজ এ থিফ। ইট ইজ ট্রুথ। ট্রুথ ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ক্যান নেভার বি অ্যান অ্যাবিউজ। গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এবার কঠোর স্বরে বললেন, না। ও কথা সত্য নয়। যাও, ঘরের মধ্যে ব'সে যাকে যা ইচ্ছে তাই বল গিয়ে। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, ছি ছি ছি! জ্যাঠামশায়, বাবা—এঁরা কত বড় লোক ছিলেন, পুণ্যকর্ম তাঁরা ক'রে গিয়েছেন। তাঁদের অযোগ্য সন্তান আমরা। তাঁদের কীর্তিকে আমরা উজ্জ্বল করতে না পারি, তাকে ম্লান করলে আমাদের যে নরকেও স্থান হবে না। সে কথাটাও একবার মনে হয় না তোমার?

শ্যামাকান্ত আর বাইরে থাকতে সাহস করলেন না, তিনি আপনার ঘরের মধ্যে গিয়ে তক্তাপোশের উপর বিছানো ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে আপন মনেই বলতে আরম্ভ করলেন, হি ইজ টেরিবল্, এ ডিস্ওবিডিয়েণ্ট টেরিবল্ ব্রাদার। বাট—বাট—। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ, হি—ছাট গোপে, গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এসে আপনার বৈঠকখানায় বসলেন।

রাধাকান্তের বৈঠকখানাটি অতি চমৎকার; লম্বা ধরনের বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি, মাঝখানে একখানি বড় হল, দু পাশে দুটি ঘর, ঘর দুখানিও বেশ বড়; তিন দিকে বারান্দা, হলের সম্মুখের বারান্দার কোলেই ছোট একটি ফুলবাগান, তারপর তাঁর খামার-বাড়ি। হলের ভিতরেই রাধাকান্তের বৈঠকখানা। আসবাবপত্র খুব বেশি নয়, দু পাশে দুখানি প্রশস্ত তক্তাপোশের দুটি ফরাশ, তক্তাপোশ দুখানির মাঝখানে একখানি টেবিল, টেবিলের দু পাশে তিনখানি চেয়ার। তক্তাপোশ দুখানির দু পাশে দেওয়ালের গায়ে দুখানি বেঞ্চ।

টেবিলে ব'সে তিনি চিঠিপত্র লেখেন, আর লেখেন তাঁর দৈনিক জীবনবৃত্তান্ত। পড়ার সময় তিনি তক্তাপোশেই বসেন। কিছু গ্রন্থ-সংগ্রহ তাঁর আছে। পুরাণ-সংহিতার সংগ্রহই বেশি। বাংলা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী এবং তন্ত্রের অনেক বই। কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক তিনি; সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও একখানি আসে। কিছু উপন্যাসও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চণ্ডীচরণ সেন তাঁর প্রিয় লেখক।

রাধাকান্ত নিজের দিনলিপি খুলে বসলেন। লিখলেন: গোপীচন্দ্র এখানে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। গতকল্য অপরাহ্নে জেলার মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের উপস্থিতিতে সবই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। গোপীচন্দ্র অবশ্যই পুণ্যকর্ম করিতেছেন। তিনি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াও এতাবৎ কাল পর্যন্ত অত্র গ্রামে সর্ব-প্রধান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এই পুণ্যকর্মের ফলে সেই প্রতিষ্ঠা তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। তাহার সূচনা করিয়া দিয়া গেলেন স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি। তিনি গোপীচন্দ্রের সহিত করমর্দন করিয়াছেন, যাহা এ পর্যন্ত এ গ্রামের আর কোন জমিদার বা ধনী লাভ করেন নাই। গতকল্য হইতেই আমি চিন্তা করিতেছি, আমাদের ভবিষ্যতের কথা। মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। কিন্তু অদ্য এই মাত্র দাদাবাবুর কীর্তি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি মদ খাইয়া গোপীচন্দ্রকে গালাগালি করিতেছেন। তাঁহাকে বহুকষ্টে ঘরের মধ্যে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। উচ্চ শব্দে আহ্বান এবং উগ্র হিংসায় পরনিন্দা, ভদ্রতা-বিগর্হিত, শাস্ত্রবহির্ভূত; ইহা অধীরতার লক্ষণ, ইহা পাপ। শুধু উচ্চারণেই পাপ নয়, শ্রবণেও পাপ। অসৎপ্রলাপরূপ তিক্তরসে-দূষিত রসনার মতই এই রস-দূষিত কর্ণেরও একমাত্র শরণ, একমাত্র পরমামৃত রসায়ন ভগবৎনাম কীর্তন, ভগবৎমহিমা স্মরণ। হে প্রভো, মঙ্গলময় মহেশ্বর, তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বাইরের বারান্দায় জুতোর শব্দ উঠল। রাধাকান্তের কতকগুলি অনুভূতি বড় তীব্র; পায়ের শব্দে তিনি পরিচিত আগন্তুককে চিনতে পারেন। চটি টানার শব্দে তিনি বুঝলেন স্বর্ণবাবু আসছেন। তিনি কলম রাখলেন। স্বর্ণবাবু দরজার সামনে আসতেই সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, এস।

হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, এলাম।

চাণক্য পণ্ডিতের কৌটিল্যনীতি অনুযায়ী নয়, এই যুগের অভিজাত সভ্যতার শিক্ষার স্বর্ণবাবুর মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। হাস্যমুখেই স্বর্ণবাবু এসে বসলেন।

রাধাকান্ত চাকরকে ডাকলেন, ওরে বিষ্টু, তামাক দে।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, শ্যামাকান্তদাকে কি বলছিলে? কতক কানে এল, কতক এল না। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। দাদা মদ খেয়েছেন বুঝি?

রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, তবে তো সবই শুনেছ।

কাকে গালাগালি করছেন আজ? আমাকে?

রাধাকান্ত স্বর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়েহেসে বললেন, তোমাকে নয়, সে তুমি জান মনে

হচ্ছে। তা হ'লে মুখখানা তোমার অন্যরকম হ'ত। অন্তত আমি ধরতে পারতাম।

স্বর্ণবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন, বললেন, আমার উপর অবিচার করছ তুমি। শ্যামাকান্তদার গালাগালি আমার গায়ে লাগে না, ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে যখন অশ্লীল গালাগালি করেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, গোপীচন্দ্রকে গালাগাল করছিলেন বুঝি ?

চাকর বিষ্টুচরণ এসে গড়গড়ার মাথায় কল্কে বসিয়ে নলটি স্বর্ণবাবুর সামনে তুলে ধরলে। স্বর্ণবাবু নলটি হাতে নিয়ে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, এ ব্যাটার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হয়। যেমন ব্যাটা চা তৈরি করে, তেমনই তামাক সাজে—টানতে এতটুকু জোর লাগে না, তেমনই ব্যাটা কাপড় কোঁচায়।

বিষ্টুচরণ স্মিতমুখে স্বর্ণবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্বর্ণবাবু আবার একটি টান দিয়ে বললেন, তামাকটা বোধ হয় কাষ্টগড়ার, না ?

হ্যাঁ।

আবার একটি টান দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, দাদা কি এমন গালাগাল দিচ্ছিলেন গোপীচন্দ্রকে যে, তুমি তাঁকে—। স্বর্ণবাবু হাসলেন, তারপর হেসে বললেন, মনে হ'ল, যেন ধমক দিচ্ছিলে তুমি।

রাধাকান্তও হাসলেন এবার, বললেন, তুমি বলছিলে—কতক তোমার কানে যায় নি। না গেলেও, সবই তুমি সঠিক অনুমানে বুঝে নিয়েছ। সুতরাং ও কথার বেশি আলোচনা ক'রে লাভ কি ?

স্বর্ণবাবু নলটি এগিয়ে রাধাকান্তের হাতে দিলেন, নাও, খাও। তারপর একটু এগিয়ে এসে বললেন, চোরকে যদি কেউ চোর বলে, তবে সেটা কি গালাগালি ? প্রশ্নটা ক'রে তিনি রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, বল, আমার কথার জবাব দাও।

রাধাকান্তবাবু বললেন, স্বর্ণ, ও আলোচনা থাক্।

স্বর্ণবাবু আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, গোপীচন্দ্র তার প্রথম কয়লার কুঠী মনিব সাহেব কোম্পানির নামে ডাকতে গিয়ে, ওই মনিব-কোম্পানির টাকায় বেনাম ক'রে ডাকে নি ?

রাধাকান্ত কোন উত্তর দিলেন না।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, এটা চুরি নয় ?

রাধাকান্ত বললেন, না, চুরি নয়।

চুরি নয় ?

চুরি করলে বলতে হয়, গোপীচন্দ্র চুরি করেছিলেন কোম্পানির টাকা। কয়লার কুঠীটা নয়। কারণ ওটা সাহেবদের সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে জিনিস মানুষ চুরি করে, তা চোর ফেরত দেয় না। গোপীচন্দ্র সাহেবদের টাকা তো পাই-পয়সা ফেরত দিয়েছেন।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, উকিল হ'লে তুমি খুব বড় উকিল হতে রাধাকান্তদা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, "কারও দোষ নয়কো গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছি, তার ফলে আজ বংশগত প্রতিষ্ঠা হারাতে বসেছি। অপরকে তার জন্য দোষ দিয়ে কি হবে, সেই জন্যই দাদাকে যে সক্ষম, যে কৃতী, তাকে গালাগাল করতে বারণ করছিলাম।

স্বর্ণবাবু হাত বাড়িয়ে নলটা নিলেন, দাও, তামাকটা মজেছে ভাল। তামাক টানতে টানতে তিনি অস্বীকারের ভঙ্গীতে বার বার মাথা নাড়লেন।

রাধাকান্ত বললেন, এ কথা তুমি অস্বীকার করছ ? 'না' বলছ ?

স্বর্ণবাবু নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, তুমি বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছ, আমিও হারিয়েছি, ও কথায় আমি 'না' বলছি না। কিন্তু গোপীচন্দ্রও কিছু বিদ্যালাভ ক'রে অর্থ উপার্জন করে নি। চুরি না বল, প্রবঞ্চনা তো বলতেই হবে। প্রবঞ্চনার অর্থ লাভ ক'রে অর্থের জোরে আজ সে গ্রামের মাথায় বসতে চাইছে। সে আমি হ'তে দোব না—কিছুতেই না। আমার সূচ্যগ্র মেদিনী থাকতে না।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

স্বর্ণবাবু হাসলেন, বললেন, আমরা এককালে শখের যাত্রার দল খুলেছিলাম। তুমি সাজতে যুধিষ্ঠির, আমি সাজতাম দুর্যোধন। উর্বশী-উদ্ধার পালায়, পাণ্ডব কৌরব এক হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে ?

রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মাইনর-ইস্কুলকে হাই-ইস্কুল করবে ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণবাবু বললেন, সে একটা আকাশকুসুম রাধাকান্তদা, এত টাকা কোথায় আমার ? তোমারও টাকা নাই। টাকা আছে শ্যামাকান্তদার, সে তিনি খরচ করবেন না।

তবে ?

গোপীচন্দ্রের সব কাজে আমরা বাধা দোব।

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, দেখ স্বর্ণ, তোমাকে ভালবাসি, তুমি বন্ধুলোক, তাই বলছি—। তিনি চুপ করলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ ?

ভয় নয় স্বর্ণ। শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ছে। শাস্ত্রে বলে, গৃহের ভূষণ পুত্র, সভার ভূষণ পণ্ডিত, পুরুষের ভূষণ সদ্‌বুদ্ধি, রমণীর ভূষণ লজ্জা। গোপীচন্দ্রের সব কাজে বাধা দিতে চাও বলছ, তার মানে সৎ-অসৎ সব কাজেই বাধা দিতে চাও। সৎকার্যে বাধা দেওয়া কখনও সদ্‌বুদ্ধির নয় !

স্বর্ণবাবু বললেন, কোন্ শাস্ত্র আওড়াচ্ছ জানি না। কিন্তু সদ্‌বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভূষণ হ'ল পুরুষের বীর্য।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, বীর্য ভূষণ নয়, বীর্যই হ'ল পৌরুষের প্রাণ। বীর্যহীন পৌরুষ

হয় না, হ'লে তার নাম হয় ক্লীবত্ব।

তবে ? স্বর্ণবাবুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাধাকান্ত বললেন, সৎকার্যের বিরোধিতা করে যে বীর্য, সে হ'ল অসুর বীর্য। তার—

স্বর্ণবাবু অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন। রাধাকান্তের কথার মাঝখানেই বললেন, উঠলাম।

রাধাকান্ত বললেন, ব'স ব'স।

না। কাজ মনে প'ড়ে গেল। স্বর্ণবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দরজার একপাশে এসে কিন্তু থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, তা হ'লে সুরশক্তির সঙ্গেই যোগ দেবে ঠিক করেছ ?

রাধাকান্ত বললেন, না।

অর্থাৎ ?

রাধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন, অর্থ জটিল নয়, তবু পরিষ্কার ক'রে বলি। তুমি বিরোধ করতে না চাইলে, তোমার সঙ্গে আমি বিরোধ করব না। গোপীচন্দ্র আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাইলে, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হব না।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। এই আমার পথে যথেষ্ট রাধাকান্তদা। আচ্ছা। কথা শেষ ক'রে স্বর্ণবাবু বেরিয়ে গেলেন। রাধাকান্ত দাঁড়িয়েই রইলেন।

রাধাকান্তদা! আবার ফিরলেন স্বর্ণবাবু। এই দেখ, যার জন্য আসা, তাই ভুলে গিয়েছি।

রাধাকান্ত বললেন, তাই তো বলছিলাম স্বর্ণ, তুমি অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছ। ধীরতাই হ'ল মানুষের সু-বুদ্ধি। যা সুন্দর তাই শিব, সুতরাং তাই সৎ।

রাধাকান্তের এসব কথার কোন জবাব দিলেন না স্বর্ণবাবু, বললেন, এসেছিলাম একটি জিনিস চাইতে ভিক্ষা বল—ভিক্ষা।

রাধাকান্ত হাসলেন, বস্তুটা কি ?

আগে বল দেবে ?

রাধাকান্ত একটু ভেবে বললেন, বস্তু হ'লে যা অদেয় নয়, তা দোব। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি হ'লে না ভেবে দিতে পারব না।

স্বর্ণবাবু বললেন, বস্তুও বটে, দেয়ও বটে।

বল।

মানিকচকের জোলে, আমার জমির পাশে গোপথের গায়ে তোমার দু টুকরো জমি আছে ; দু টুকরো আমাকে দিয়ে আমার অন্য জায়গার জমি তুমি নাও।

কেন বল তো ?

বলব। আগে দেবে বল।

সে তো আগেই বলেছি।

উঁহুঁ, ত্রিসত্য কর।

আচ্ছা ভাই। হাসলেন রাধাকান্ত, বললেন, দিলাম দিলাম দিলাম।

স্বর্ণবাবু বললেন, তা হ'লে শোন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকে যেখানে ইস্কুল হবে, সেখানে যাবার সোজা পথ হ'ল ওই গোপথ। গোপীচন্দ্র ইস্কুলের পাশেই আস্তাবল করছে। গাড়ি ঘোড়া আনবার জন্যে ওই গোপথকে বাড়িয়ে বড় রাস্তা করতে চায়। তাই গোপথের দু পাশের জমি আমার চাই। ও পথ বড় ক'রে গাড়ি আনতে আমি দোব না। তা ছাড়া, 'লড়িয়া' ব'লে মজা পুকুরটাও নাকি কাটাবে। সিচ নিয়ে আমি মামলা করব। সিচ বন্ধ করতে আমি দোব না।

রাধাকান্তের মুখ থমথমে হয়ে উঠল, বললেন, আমি তোমাকে বলেছি স্বর্ণ, গোপীচন্দ্র বিরোধ করতে চাইলে পেছুব না। তুমি কি আমাকে অক্ষম মনে কর?

স্বর্ণবাবু বললেন, না, তা নয়। ওখানে আমার জমি অনেকখানি, তোমার মাত্র ওই দুই টুকরো। আমার পোষাবে, তোমার পোষাবে না। তা ছাড়া গোপীচন্দ্র বিনয় ক'রে চাইলেই বা তুমি 'না' বলবে কি ক'রে? প্রশস্ত সুগম রাস্তা করাটা তো ভাল কাজ। ভাল কাজে তো তুমি বাধা দেবে না, নিজেই বলেছ। স্বর্ণবাবু হাসতে লাগলেন। তিনি সত্যই পুলকিত হয়েছেন এবার। শুধু তাঁর একটা কার্যোদ্ধার হয়েছেই নয়, বাক্‌চাতুর্যে এবং বুদ্ধি-কৌশলে তিনি রাধাকান্তকে পরাস্ত করেছেন। এর মধ্যে বেশ একটি মানস-বিলাস আছে—আত্মগৌরব এবং জয়ের তৃপ্তিতে মন ভ'রে ওঠে। হাসতে হাসতেই স্বর্ণবাবু চ'লে গেলেন।

রাধাকান্তও হাসলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আঘাত বা পরাজয়টা বেদনাদায়ক নয়। তাঁর আভিজাত্যের অহংকার, স্বর্ণবাবুর সঙ্গে একমত; তাঁর দৈবপ্রবৃত্তি সুলভ ঈর্ষা স্বর্ণবাবুর মতই ক্ষুব্ধ; কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর জীবনে আরও কিছু সম্পদ আছে, যার তৃপ্তিতে অহংকার নম্র হয়েছে, অন্তঃসলিলা হতে বাধ্য হয়েছে। হাসির মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। সে দীর্ঘশ্বাস স্বর্ণবাবুর জন্যও হতে পারে, আবার তাঁর অন্তঃসলিলা ক্ষোভের অজ্ঞাত অবাধ্য স্ফুরণও হতে পারে; হয়তো দুইই হতে পারে।

চার

দুপুরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা রাধাকান্তের অন্দরে একটি ছোটখাটো মজলিস বসে। রাধাকান্তের স্ত্রীর নাম কিরণবালা; সে নামটা কিন্তু চাপা প'ড়ে গিয়েছে, কিরণবালা নামটা পাড়ার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ জানে, সাধারণ্যে তিনি কাশীর বউ নামেই পরিচিত। কাশীর বউ ভাল লেখাপড়া জানেন, সেলাইয়ের কাজেও তাঁর হাত অতি চমৎকার। পাড়ার তরুণী মেয়েদের অনেকে তাঁর কাছে দুপুরে আসে চিঠি পড়াতে, চিঠি লেখাতে, এবং সংসার-জীবনের সমস্যায় উপদেশ নিতে। নিজেদের দুঃখের কথাও তাঁকে জানিয়ে তারা তৃপ্তি পায়, যেহেতু এই বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী মেয়েটি কথার মধ্যে দরদ মিশিয়ে সান্ত্বনা দিলে সত্যই যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় মজলিসে তিনি কোনদিন বই পড়েন, কোনদিন গল্প বলেন।

রাধাকান্তের নিজের ধর্মশাস্ত্রে অনুরাগ আছে, উপন্যাসও পড়েন ; শুধু তাই নয়, বইও তিনি মধ্যে মধ্যে কেনেন। কাশীর বউ তাঁর বইগুলির যত্ন করেন, ঝাড়েন-মোছেন, সদ্ব্যবহারও করেন। রাধাকান্তও এতে আনন্দ পান। এর পূর্বকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে সমাজ সুচক্ষে দেখত না। অনেক বাড়ির সংস্কার এমনও ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের অকালবৈধব্য ঘটে ব'লে বিশ্বাস করত। সে যুগটা পার হয়ে আসছে। কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য শহরেও সে আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করছে, তারই ঢেউ ক্রমশ পল্লীতেও এসে লেগেছে, বিশেষ ক'রে নবগ্রামের মত গ্রামে। আশেপাশে প্রায় আশি-একশোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থল নবগ্রাম। তাই বিয়ের সম্বন্ধের সময়, ভাবী বধূ লেখাপড়া জানে জেনে, রাধাকান্তের উকিল পিতা এবং রাধাকান্ত নিজেও খুশি হয়েছিলেন। কখনও কখনও রাত্রে কাশীর বউ বই প'ড়ে শোনান তাঁকে। শুনতে শুনতে রাধাকান্ত মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দেন, পত্নীভাগ্যের জন্য।

আজ সন্ধ্যার মজলিসে কাশীর বউ গল্প বলছিলেন। গল্পের মজলিসের প্রধান শ্রোতা তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে গৌরীকান্ত এবং গৌরীকান্তের খেলার সাথী চারু। রাধাকান্তের নিকট-আত্মীয় সম্পর্কে এক ভাইপোর মেয়ে চারু। চারুর বাপ রাধাকান্তের সমবয়সী, বন্ধু এবং অনুগত জনও বটে। ভদ্রলোক বিদেশে থাকেন, সেখানে এম. ই. ইস্কুলে মাস্টারি এবং সেখানকার এক্সপেরিমেণ্টাল পোস্ট-আপিসে পোস্টমাস্টারি—দুটো চাকরি করেন। চারুর মাও কাশীর বউয়ের অনুরক্ত ভক্ত। চারু গৌরীকান্তের চেয়ে এক বছরের বড়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসার,—ভাশুর, দেওর, জা নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার, চারুর মায়ের কাজ অনেক। পালা ক'রে কাজ করতে হয়, কোনদিন পড়ে বাসন-মাজা ঝাঁট-দেওয়া এঁটো-কাঁটা-পরিষ্কার এই সবের কাজ, কোনদিন পড়ে বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা জল-তোলার কাজ। বিলেতেও ঘরের কাজে রবিবার নাই, এখানে তো নাই-ই। চারুর মা গৌরীকান্তের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে যায়। গৌরীকান্ত হুকুম করে, চারু শোনে, না শুনলে গৌরীকান্ত তাকে পিট্টি লাগায়। কাশীর বউয়ের চোখে পড়লে তিনি ছেলের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, গৌরীকান্ত তখন চারুকে আদর ক'রে ডাকে। চারু মায়ের একমাত্র সন্তান, তার উপর সাধারণত বাঙালীর মেয়ের যে বয়সে সন্তান হয়, সেই বিচারে চারুর মায়ের একটু বেশি বয়সেই চারু মায়ের কোলে এসেছে, তাই সে বেশ একটু আদরিণী মেয়ে এবং স্বাস্থ্যও তার ভাল। মারধোরের পর গৌরী তাকে আদর ক'রে ডাকলে সে বিদ্রোহিণীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে দেখে, গৌরীকান্তের মায়ের চোখে শাসনের দৃষ্টি রূঢ় থেকে রূঢ়তর হয়ে উঠছে, তখন সে হাসিমুখে গৌরীকান্তের কাছে এগিয়ে এসে বলে, না ভাই, আর আমি দুষ্টুমি করব না।

মধ্যে মধ্যে গৌরীকান্ত যায় বাপের কাছে বৈঠকখানায়। রাধাকান্ত পুত্রের সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেন। এখন থেকেই তাকে অনেক বড় বড় কথা বলেন, কখনও কখনও

মনের আবেগে ডায়েরির মধ্যেও পুত্রকে সম্বোধন ক'রে অনেক কথা লেখেন। গত বৎসর গৌরীকান্তের হাতে-খড়ি হয়েছে। এ বৎসর সরস্বতীপুজোর সময় ছেলেকে নিয়ে পুজাস্থানে গিয়েছিলেন। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, গৌরী বাপি, কি ব'লে মাকে প্রণাম করলে? গৌরীকান্তের বয়স মাত্র ছয়, কিন্তু বাপের বড় বড় কথাগুলি তাকে এদিক দিয়ে অনেকটা বেশি বয়সী ছেলের মত পরিপক্ব ক'রে তুলেছে। ময়নাপাখির বুলি বলার মত, মানে না বুঝেও বেশ ভাল ভাল কথা বলতে পারে। সে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, "বললাম, মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি খুব ধুম ক'রে তোমার পুজো করব। পুজোর দালান করব।" ঘটা ক'রে পুজো করার কথা, পুজোর দালানের কল্পনা মা-বাপ দুজনের কাছেই সে শুনেছে। রাধাকান্ত সে কথা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। ঘটনাটি লিখে তিনি নিজের মন্তব্য লিখেছেন, "বালকের মুখে এবম্বিধ উক্তি পরমাশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলাম। এ বালক অবশ্যই আমার কুল উজ্জ্বল করিবে। বাবা গৌরীকান্ত, তোমার কথা আমি লিখিয়া রাখিতেছি। মা-সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যালাভ হইলে (অবশ্যই হইবে) যেন তোমার এই কথা স্থির থাকে। কদাচ বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং ঈশ্বরের কার্যে এই অনুরাগ এবং দেবতার প্রতি ভক্তি তোমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; তাঁহার কৃপায় গ্রামে দেশে তুমি সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ কর। গ্রামের ধনোদ্ধত ব্যক্তিদের দম্ভকে চূর্ণ করিয়া প্রমাণ কর—স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

রাধাকান্ত তাঁর নিজের জীবনের সকল ভরসায় আপনার অজ্ঞাতসারে হতাশ হয়েছেন, গোপীচন্দ্রের উন্নতির গতিবেগ হিসাব ক'রে নিজের চেষ্টায় প্রাধান্যলাভের ভরসা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে, তাই ছেলের উপর সকল আশা-ভরসা স্থাপন ক'রে, তার কানের কাছে সেই কথাগুলি গুঞ্জন করেন। শখের পোষা-পাখির স্পষ্ট ভাষায় বুলি বলার মত গৌরীকান্ত তার পুনরুক্তি করলে হতাশার গ্লানি কাটিয়ে তাঁর অন্তর আশার আনন্দে ভ'রে উঠে। সেই জন্য গৌরীকান্তকে মধ্যে মধ্যে যেতে হয় বাপের কাছে। বিজ্ঞের মত বাপের পাশে ব'সে থাকে।

গৌরীকান্ত যখন বৈঠকখানায় থাকে, তখন চারু সেটা অনুভব করে। তাই কাশীর বউ তাকে বৈঠকখানায় যেতে বললে সে বলে, বাবা! বাবুর যে চোখ! দেখলে ভয় লাগে! তা হ'লেও সে বাড়ি যায় না। কাশীর বউয়ের কাছেই সে ব'সে থাকে, অনর্গল বকবক ক'রে ব'কে যায়। ছড়া বলে, গান করে, ঝুমুর-নাচ দেখায়, নিজের বিয়ের গল্প বলে—দান আঙাদিদি, আমার বিয়ে হবে, বর আসবে, গয়না পরব, চুড়ি বালা অনন্ত বাজু হার সাতনরী চিক ছাপটা কান-মল তোড়া প'রে ঝমঝম্ ক'রে চ'লে যাব শ্বশুরবাড়ি। গৌরীকাকা একলা ব'সে থাকবে ঘরে আ—র কাঁদবে, ঝরঝর ক'রে কাঁদবে। কার সঙ্গে খেলা করবে তখন?

সন্ধ্যাবেলা গৌরীকান্ত এবং চারুকে নিয়ে কাশীর বউ গল্প করতে বসেন। স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সংসার, রাঁধুনী রান্না করে, ঝি সাহায্য করে, চাকর বাইরের বাড়ির বরাত যোগায়,

প্রয়োজন হ'লে সেও এসে অন্দরের কাজ সেরে দিয়ে যায়; কাশীর বউকে ব'সে থাকতে হয়। গল্প ব'লে তাঁরও সময় কাটে। আরও কয়েকজন তাঁর সখী আসেন। ভাশুর শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ, মহাদেবের স্ত্রী, চারুর মা, চারুর খুড়ী। আরও দুইটি নিয়মিত শ্রোতা আছে—প্রতিবেশী-কন্যা দুই বোন—সরো এবং নীরো; সরোজা এবং নীরজা পিতৃগৃহবাসিনী দুই কুলীনকন্যা। চুলের দড়ি চিরুনি নিয়ে আসেন, এক দিকে গল্প শোনেন, অন্য দিকে চুল আঁচড়ান, বেণীরচনাপর্ব শেষ করেন, পায়ে তেল মালিশ করেন, মধ্যে মধ্যে পান-দোক্তা খান।

আজ গল্প হচ্ছিল,—এক ছিলেন রাজা। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী ছিলেন তিনি। বহু রাজা তাঁকে কর দিত। সসাগরা ধরার অধীশ্বর বললেও চলে। রাজকোষ মণি মুক্তা হীরা জহরৎ সোনা রূপায় পরিপূর্ণ, সৈন্যশালায় রাজভক্ত সুশিক্ষিত বিক্রমশালী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সেনাপতি, হাতিশালায় ঐরাবতের মত হাতি, অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবার মত ঘোড়া, অসংখ্য দাস-দাসী নিয়ে রাজার সৌভাগ্য বর্ষার নদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাজা নিজেও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। প্রজা থেকে, কর্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত রাজার মুখের দিকেও চাইতে সাহস করেন না। সূর্যের দিকে যেমন চাওয়া যায় না, অমিততেজী সেই যে রাজাধিরাজ, তার মুখের দিকেও তেমনই চাওয়া যায় না। কিন্তু রাজার একমাত্র দোষ—রাজা ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে মহা অহঙ্কারী। তিনি যখন চ'লে যান, তখন পায়ের শব্দে তাঁর দম্ভ লোকে অনুভব করে, রাজপ্রাসাদ যেন কাঁপে। রাজার পুত্র-সন্তান নাই, আছে দুটি কন্যা। বড়টির নাম মুক্তামালা, ছোটটির নাম কাজলরেখা। রাজার রাণী নাই। মেয়ে দুটির শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাজা আর বিবাহ করেন নাই। মেয়ে দুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন যা চায়, তাই দেন। মেয়েদের ধাইমা মেয়েদের মানুষ করে। তারা আপন মনে নিজের নিজের খুশিমত খেলা করে, গান গায়, হাসে খায় দায়; রাজপণ্ডিত আসেন, তাঁর কাছে পাঠ নেয়। দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে যেমন একটু একটু ক'রে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, তেমনই ক'রে তারা বড় হয়ে ওঠে। এক বাপ-মায়ের দুই মেয়ে, কি আশ্চর্য, রূপে গুণে দুই মেয়ে ঠিক বিপরীত। বড় মেয়ের রূপ দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়, আয়নাতে রোদের ছটা প'ড়ে তার আভা যেমন ঝকঝক করে—তেমনই রূপ তাঁর। গুণেও ঠিক তাই। শাণিত অস্ত্রের মত তাঁর স্বভাব। দাসদাসী সকলে তাঁর কাছে জোড়হাত ক'রে সশঙ্কিত হয়ে থাকে। আর ছোট রাজকুমারী কাজলরেখার রূপ শান্ত, স্নিগ্ধ, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার মত; স্বভাবও ঠিক তেমনই, মধুভরা ফুল যেমন মধুর ভারে নুয়ে পড়ে, মিষ্ট গন্ধে বুক ভরিয়ে দেয়, তেমনই ধারা মধুর প্রকৃতি তাঁর, ঠোঁটের ডগায় হাসি লেগেই আছে—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের মত হাসিটুকু। বড় রাজকন্যা মুক্তামালা মেয়ে হ'লেও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, তিনি ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করতে যান, তাঁর তীর ছোটে উল্কার মত। আকাশের বুকে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় যে সব পাখি, তাঁর তীর তাদের বিঁধে মাটির বুকে নামিয়ে আনে ঝড়ে-ঝ'রে-পড়া ফুলের মত। কাজলরেখাও রাজকন্যা, সেই হিসাবে

তিনিও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন ; অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ বেশি। তিনি ঘরে ব'সে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন, পড়তে পড়তে দিন শেষ হয়ে যায় ; ঘরের আলো ক'মে যায়, তিনি গিয়ে বসেন তখন জানলার ধারে। আকাশের বুকে পাখির ঝাঁক উড়ে যায় গান ক'রে, তাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। আঁচলে ক'রে নিয়ে যান পঞ্চশস্য, ছাদের উপর অঞ্জলি ভ'রে ছড়িয়ে দেন, ডাকেন তাদের—আয় আয় আয়! ওরে পাখিরা, তোদের আমি ভালবাসি, তোরা খেয়ে যা। তারা শনশন শব্দে পাক দিয়ে নেমে আসে,—কেউ বসে তাঁর মাথায়, কেউ বসে কাঁধে, কেউ বসে হাতে, বসবার জায়গা যারা না পায় তারা পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে—যেমন ভ্রমরেরা ওড়ে ফুলের চারদিকে, মাছেরা ঘোরে জলবালার চারদিকে, তারার দল ঘোরে চাঁদের চারদিকে, তেমনই ভাবে তারাও কাজলরেখাকে প্রদক্ষিণ ক'রে উড়তে থাকে।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে মেয়েরা বড় হয়ে উঠলেন। একদিন রাজবাড়ির বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে বললেন, মহারাজ, কন্যাদের এইবার বিবাহের কাল হয়েছে। মহারাণী নাই, থাকলে তিনিই রাজাধিরাজকে এ কথা বলতেন। তাঁহার অভাবে কর্তব্য আমার, আমিই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলেন, হাঁ, তাই তো, মুক্তা-মালার বয়স হ'ল আঠারো, কাজলরেখার যোল। তিনি ডাকলেন মেয়েদের! দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন সদ্যফোটা দুটি পদ্মফুল। ছোট মেয়ে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। রাজা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কাজলরেখাকে বললেন, এ কি, তুমি মাটিতে বসলে কেন? উঠে ব'স। কাজল বললেন, বাবা, শাস্ত্রে আছে—পিতা দেবতা, তাঁর সঙ্গে সমাসনে বসা উচিত নয়, তাঁর পায়ের তলাতেই বসা কর্তব্য। আর আসন হিসাবে মৃত্তিকাই হ'ল শ্রেষ্ঠ আসন। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন তাই বস'ছি।

এ উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তারপর কন্যাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমরা এইবার বড় হয়েছ। বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পাত্র সন্ধান করবার পূর্বে আমি জানতে চাই, তোমাদের কার কিরূপ আকাঙ্ক্ষা, কে কেমন স্বামী প্রার্থনা কর? মা মুক্তামালা, তুমি বড়, তুমি বল আগে।

মুক্তামালা বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা—আমার স্বামী হবেন তিনি, যিনি শৌর্যে বীর্যে তেজস্বিতায় হবেন আপনার যোগ্য জামাতা। রূপে হবেন তিনি ঝড়ের সদৃশ, পবনদেবতার মত।

রাজা হেসে কন্যার কথায় বাধা দিয়ে রহস্য করলেন, তা হ'লে তোমার ছেলের একটি প্রকাণ্ড লেজ থাকবে মা। কেননা, পবননন্দন হলেন হনুমান। পিঠের উপরে লেজ তুলে দিয়ে 'জয় রাম' ব'লে এক লাফে সাগর ডিঙিয়েছিলেন জান তো?

মুক্তামালা একটু লজ্জিত হলেন। রাজা হেসে বললেন, বল বল।

মুক্তামালা বললেন, তিনি পবনের মত হবেন এইজন্য যে, শত্রুকুল তাঁর বীরত্বের সম্মুখে বড়

বড় গাছের মত ভেঙে পড়বে। তেজে তিনি হবেন অগ্নির মত, তাঁর রক্তচক্ষুর দৃষ্টির উত্তাপে, যারা দুষ্ট, যারা হবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা অগ্নির সম্মুখে তৃণের মত ম্লান হয়ে শুকিয়ে যাবে ; তাতেও যারা সংযত না হবে, তারা সেই তেজে হবে ভস্মীভূত। তাঁকে হতে হবে খ্যাতিমান প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। যেহেতু সকল গুণের আকরই হ'ল বীজ, অমৃত-ফলের বীজ হতে জন্মায় যে গাছ সে গাছের ফল কখনও বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত হয় না। সংসারে জন্মগুণই শ্রেষ্ঠ।

রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কন্যার কথা শুনে। হ্যাঁ, তাঁর মত রাজাধিরাজের উপযুক্ত কন্যা। রাজকন্যার উপযুক্ত কথা বলেছে সে। কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বাপ আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তুমি ইন্দ্রাণীর মত ভাগ্য লাভ কর। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার মনোমত স্বামীই আমি অনুসন্ধান করব। পৃথিবীতে না পাই, দেবলোক গন্ধর্বলোক পর্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে অবশ্যই নিয়ে আসব। মুক্তামালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর রাজা ছোট মেয়ের দিকে ফিরে হাসিমুখে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, মা, এইবার তুমি বল তোমার মনের কথা।

কাজলরেখা চুপ ক'রে রইলেন। বাপকে নিজের বিয়ের কথা—বরের কথা বলতে লজ্জা হ'ল তাঁর।

রাজা হেসে আবার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লজ্জাবোধ করছ? আচ্ছা, থাক্‌। আমি বুঝেছি, তোমার দিদি যা বলেছেন, তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা, তোমারও কল্পনা তেমনই, বক্তব্যও তোমার তাই।

কঞ্চুকী বিনয় ক'রে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, অন্য প্রকার বাসনা বা বক্তব্য থাকবে কেন? পর্বতের কন্যা হ'ল নদী। নানা ধারায়, নানা দেশের মধ্য দিয়ে তারা স্বয়ম্বর হবার জন্য ছুটে চলে। তাদের গুণও এক—দেশকে করে উর্বর, আর তাদের লক্ষ্যও এক—মহাসাগরে মিলিত হবারই তাদের একমাত্র কামনা। সুতরাং মা কাজলরেখার বক্তব্যও ওই এক।

এবার কাজলরেখা ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে বল তোমার কামনার কথা।

কাজলরেখা মৃদুস্বরে বললেন, আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি যেন হন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাজপুত্র হতে পারেন, আবার অতি সাধারণ, এমন কি দীনদরিদ্রের সন্তানও হতে পারেন। কান্তিতে তিনি কন্দর্পতুল্যও হতে পারেন, আবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের মত রূপহীনও হতেও পারেন। তিনি গুণে হবেন মহাজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানই হ'ল প্রশান্তির একমাত্র আকর, এবং যেহেতু অন্তরের প্রশান্তির রশ্মিই হ'ল সাম্যতা, সেই হেতু তিনি রূপহীন যদি হন, তবুও হবেন সৌম্যদর্শন এবং শান্তপ্রকৃতি। পুণ্যকর্মই হবে তাঁর অস্ত্র, ক্ষমাই হবে তাঁর ধর্ম। মানুষকে তিনি জয় করবেন না, মানুষের সেবায় তিনি তাদের সেবক হবেন, মানুষই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে বিজয়ী ব'লে। সাম্রাজ্য তিনি কামনা করবেন

না, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে তিনি মোহগ্রস্ত হবেন না, সাম্রাজ্য উথলে উঠবে তাঁর পদক্ষেপে, রাজপ্রাসাদ কাঁদবে তাঁর পদধূলির জন্য। তাঁর রক্ষী থাকবে না কেউ, যেহেতু জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নয়, এবং সেই হেতুই তিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সামান্য ব্যক্তির মতই সর্বসাধারণের একজন হবেন, সেই হেতুই তিনি হবেন অসামান্য।

রাজা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর কন্যা হয়ে এ কি বলছে কাজলরেখা! তার কথার মধ্যে সে বার বার রাজত্বকে তুচ্ছ করছে, রাজাকে হেয় করছে। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার মস্তিষ্কের বোধ হয় ঠিক নাই কাজলরেখা। তাই বরাবর তুমি অসম্ভব কথা বলছ। রাজপুত্রকে কামনা না ক'রে, সাধারণ মানুষকে বরণ করবার কথা বলছ।

কাজলরেখা বললেন, সাধারণের মধ্যে থেকেই তিনি হবেন অসাধারণ।

রাজা বললেন, সাধারণ কখনও অসাধারণ হয় না। মুক্তামালার কথা সত্য। বীজই সকল গুণের আকর। সুতরাং জন্ম যার উচ্চকুলে নয়, সে কখনও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ হতে পারে না।

কাজলরেখা বললেন, কন্যার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু মনে করি অন্যরূপ। জন্ম থেকেও কর্ম শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। কর্ম থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই হয় একটি বংশের প্রতিষ্ঠা। আবার সেই বংশের বংশধরের অপকর্মে হয় সেই বংশের অধঃপতন। আপনার এই মহৎ বংশ—এই বংশের মহিমা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করছে পুণ্যকর্মী উত্তরাধিকারীর উপর। উদ্ধত উগ্র ক্ষমাহীন প্রেমহীন উত্তরাধিকারী আপনার দৌহিত্র, হোক না কেন মাতৃকুলের দিকে তার আপনার বংশে জন্ম, হোক না কেন পিতার দিক থেকে অন্য কোন মহৎ রাজবংশে জন্ম, সে কখনও আপনার বংশমহিমা এবং কুলগরিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে পারবে না। বিধাতার লিপিও খণ্ডিত হয় মানুষের কর্মফলে, সুতরাং কেবল আপনার ইচ্ছা এবং আশীর্বাদই আপনার উত্তরাধিকারীকে ভাবীকালে রক্ষা করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন কাজলরেখার উপর। কেন না, তাঁর মনে হ'ল কাজলরেখা তাঁর অপমান করেছে। রাজার পুত্রকে কামনা না ক'রে সাধারণ মানুষকে কামনা ক'রে, সে বংশের অপমান করেছে। তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে সে তাঁর অপমান করেছে। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, প্রহরীকে ডেকে এক্ষুনি এই হীনমতি কন্যাকে বন্দিনী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তারপর একটা কথা তাঁর বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। ভাল, তাই হবে। কাজলরেখা রাজাকে উপেক্ষা করে, সাধারণ মানুষকে বিবাহ করতে তার প্রবৃত্তি! তাই তিনি করবেন। সেই বিবাহই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। রাজকন্যা হয়ে সে গরিবের বউ হবে। দাস থাকবে না, দাসী থাকবে না, রাজভোগ পাবে না, মোটা কাপড় পরবে, নিজে ভাত রাঁধবে, ঘুঁটে দেবে, নিজের হাতে ঝাঁটা ধরবে—এই তো উপযুক্ত শাস্তি।

তিনি তাই স্থির ক'রে দুই কন্যার পাত্র-সন্ধান করতে লাগলেন। মুক্তামালার বর খুঁজতে চারিদিকে রাজ্যে-রাজ্যে রাজ-ঘটক গেল; আর গরিবদের ঘটকালি করে যারা, তাদের কয়েক

জনকে ডেকে কাজলরেখার পাত্র সন্ধান করতে বললেন। এই ঘটকদের মধ্যে এক বৃদ্ধ, তিনি বললেন, মহারাজ, যদি অনুমতি করেন, তবে ছোট রাজকন্যার মুখ থেকে একবার তাঁর কথা শুনতে চাই। রাজা অনুমতি দিলেন। বুড়ো ঘটক রাজকন্যাকে প্রশ্ন করলেন, মা, কয়েকটি প্রশ্ন করব? মহাদেবের বয়সের গাছপাথর ছিল না। জান তো? তিনি শ্মশানে বাস করেন। জান তো? দেবতারা যখন অমৃত পান করেন, তখন তিনি বিষ পান করেন। জান তো? দক্ষরাজার কন্যা তাঁকে বিবাহ করার ফলে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। জান তো?

কাজলরেখা বললেন, জানি।

বৃদ্ধ বললেন, তবে?

তবে? কাজলরেখা বললেন, বৃদ্ধ, আমি সতীকন্যা। আমার সংকল্প কখনও ভঙ্গ হয় না।

হ্যাঁ। বুঝলাম। তুমি সমস্ত কিছুই সহ্য করতে প্রস্তুত।

নিশ্চয়।

* * *

হঠাৎ গল্পে বাধা পড়ল। চারুর মা এসে দাঁড়াল। গল্পে বাধা দিলে সে-ই, বললে, গল্প চলছে বুঝি?

কাশীর বউ হেসে বললেন, হ্যাঁ। তারপর গল্পে আবার মন দিলেন, হ্যাঁ তারপর, রাজ্যে একদিন মহাউৎসব আরম্ভ হ'ল—মুক্তামালার বিবাহ।

চারুর মা বললে, আমি ভাবলাম, গল্প তোমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে। সারাদিনের মধ্যে ছুটি নাই। দাসী-বাঁদীর ভাগ্য নিয়ে সংসারে এসেছি, সেই খেটেই জীবন গেল। আমার যে একখানা চিঠি প'ড়ে দিতে হবে;

ব'স। গল্পটা শেষ করি।

বসব? বসবার ভাগ্যি ক'রে তো আসি নাই মা। তুমি বরং আমার চিঠিখানা প'ড়ে দাও। তারপর গল্প করবে।

চারিদিক থেকে আপত্তি উঠল। বিবাহের আসর সেজে উঠছিল গল্পে, বর আসছে, বাদ্যভাণ্ড বাজছে, হঠাৎ বাধা পড়ল। সকলেরই মন উতলা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। মেয়ে চারুই বললে, না না। মাকে সে বললে, না, তুমি এখন যাও।

একজন বয়স্কা শ্রোত্রী বললে, কাল পড়াবে চিঠি।

কাল? কাল তো সকাল থেকে এই রাত্রি পর্যন্ত সময় থাকবে না মা।

কাশীর বউ উঠলেন। বললেন, দাও। কই চিঠি?

একটু ঘরে চল খুড়ী। অর্থাৎ চিঠিখানি তাঁর স্বামীর, চারুর বাপের চিঠি।

ঘরের মধ্যে এসে চিঠিখানি হাতে দিয়ে চারুর মা বললে, দেখ তো মা, কি লিখেছে। আমার নামে সাতখানা ক'রে লাগিয়ে চিঠি গিয়েছে এখান থেকে আমি জানি। ভাশুর

আমার নিজে লিখেছে।

বাদামী রঙের বালি-কাগজে লেখা চিঠি। বিশেষণহীন নামে সম্বোধন করেছে স্বামী—ইন্দুমতী, অগ্রজ মহাশয়ের পত্রে তোমার ও ছোট বধূমাতার বিবাদ-বিসম্বাদের কথা অবগত হইয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলাম। শুনিলাম, তোমরা উভয়ে একজোট করিয়া মধ্যে মধ্যে পূজনীয়া মানিকবধূর সহিত ঝগড়া কর, সমান উত্তর কর। তুমি আপনাকে কি ভাবিয়াছ? একটা মেয়ের মা হইয়া তুমি কি হইয়াছ তুমিই জান। মনে করিয়াছ, একটা গোলমাল করিয়া পৃথক হইব। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, আমি অগ্রজ মহাশয়ের বা পূজনীয়া মানিকবধূর অমতে কখনই যাইব না। আমি তোমাকে শেষ কথা বলিয়া দিতেছি যে, বাটিতে যদি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পার, থাকিবে; নতুবা যেখানে সুখে থাক, সেইখানেই যাইবে।

চারুর মা খপ ক'রে কাশীর বউয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে বললে, থাক্। আর পড়তে হবে না। চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল।

কাশীর বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বাইরে থেকে গৌরীকান্ত ডাকলে, মা!

চারু ডাকলে, আঙাদিদি!

কাশীর বউ এসে আবার বসলেন।

তারপর? মুক্তামালার বিয়ে—

হ্যাঁ, মহাসমারোহ ক'রে মুক্তামালার বিয়ে হ'ল এক রাজপুত্রের সঙ্গে। যেমন বর চেয়েছিলেন মুক্তামালা তেমনই বর।

আর কাজলরেখা?

হ্যাঁ। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘটক নিয়ে এল এক বর। সাধারণ একটি লোক। এক কবি। গরিব, কিন্তু খুব পণ্ডিত। দেখতে মোটেই সুন্দর নন, কিন্তু মুখের হাসিটা বড় শান্ত। দেখলে মানুষও শান্তি পায়। রাজা কন্যাদান করবার সময় ভেবেছিলেন, মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন, মুখ দেখবেন না। হঠাৎ একবার দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির দিকে। তার মুখের হাসিটি বড় ভাল লাগল। তিনি একবার ভাল ক'রে দেখলেন। আবার দেখলেন। কন্যাদান শেষ ক'রে উঠে একবার ভাবলেন, তাদের ডেকে ধনরত্ন দিয়ে তাদের আদর ক'রে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু না। নিজেকে কঠোর ক'রে তুললেন। কর্তব্য করতেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আজ রাত্রে তোমরা আমার রাজ্য থেকে চ'লে যাও। প্রভাতে যেন দেখতে না পাই। কেউ যেন জানতে না পারে। কাজলরেখার বিয়ের কথা কাউকে জানান নি তিনি। আলো জ্বলে নাই, শুধু দুবার চারবার শাঁখ বেজেছিল। দুটি প্রদীপ জ্বলেছিল। তাও ঘর বন্ধ ক'রে। অন্ধকারের মধ্যে বর আর কনে—কবি আর কাজলরেখা হাত ধরাধরি ক'রে পায়ে হেঁটে রাজ্য থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় রাজা কিছু ধনরত্ন দিতে চাইলেন জামাইকে। জামাই বললেন, আমাকে ওসবের বদলে কিছু চাল দিন, যা নাকি রান্না ক'রে দশজনকে ভোজন করিয়ে, অবশিষ্টাংশ আমরা ভোজন

ক'রে তৃপ্তি পাব। ধনরত্ন অলঙ্কার—এর মূল্য আমি বুঝি না। কন্যা কাজলরেখা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে বাপের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন।

আবার বাধা পড়ল। খিড়কির দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে, রাঙাদি!

কে?

আমি কিশোর।

কিশোর? এস। কবে এলে তুমি কলকাতা থেকে?

খিড়কির দরজার ওপারের অন্ধকার থেকে একটি দীর্ঘাকৃতি তরুণ এসে উঠানে দাঁড়াল। দৃপ্ত এবং দীপ্ত চেহারার আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে। মেয়েরা যারা গল্প শুনছিল, তারা উঠে সংযত এবং সম্বৃত হয়ে বসল। চারু গৌরীকান্ত দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিশোরের দিকে। ছেলেটি এই বাড়ির দৌহিত্র-বংশের ছেলে। কিশোরের পিতামহের কালে তারা এই বাড়িতেই বাস করত। এখনও তাঁদের বাড়ি এই বাড়ির পাশেই। এদের বাড়ির সকলেই চাকুরে। ছেলেটি এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলকাতায় পড়ে।

একজন গল্প-শ্রোত্রী বললে, ব'স ভাই, ব'স। গান শুনিয়ে যেতে হবে কিন্তু। বল ভাই কাশীর বউ, তুমি বল।

কিশোর জন্মগায়ক; মধুক্ষরা তার কণ্ঠস্বর, বাঁশী হার মানে। শুধু তাই নয়, সে কবিতা লিখতে পারে; খেলায় শক্তিতে সে নাম-করা ছেলে।

মেয়েটির অনুরোধ শুনে কাশীর বউ হাসলেন। বললেন, শুনছ কিশোর?

কিশোর বললে, আজ নয় রাঙাদি, অন্য দিন। আজ আমি বিপদে পড়েছি, আপনাকে উদ্ধার করতে হবে।

কি হ'ল? বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কিশোরদের বাড়িরও ওই চারুদের বাড়ির মত অবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার। কিশোরের বাপের ছয় সহোদর, সাত বউয়ের বাড়ি; বাড়ির কর্ত্রী কিন্তু কিশোরের পিসীমা। তাঁর শাসনে মধ্যে মধ্যে কিশোরের মাকে কাঁদতে হয়, কিশোর বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করেন কিশোরের এক কাকা, নির্মম হস্তে দমন করেন, এখনও কিশোরের পিঠে বেত পড়ে। কিশোরের বাপ ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, তবু তিনি এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি অগ্রজভক্ত চারুর বাপের মতই অনুজভক্ত। ভক্তি বা প্রীতিই এখানে একমাত্র কারণ নয়, প্রধান কারণ—এই রীতিই হ'ল সমাজ-প্রচলিত প্রশংসিত রীতি এবং বিধান। কিশোর এক-একদিন রাগ ক'রে বাড়ি থেকে চ'লে আসে। কাশীর বউ বুঝলেন, আজ তারও চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে, নতুবা বাড়ি থেকে রাগ ক'রে চ'লে এসে কিশোর তো অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করবার ছেলে নয়, প্রয়োজন হ'লে সে গাছতলায় আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না।

আপনি একটু উঠে আসুন।

উঠে যেতে হবে? হাসলেন কাশীর বউ।

খিড়কি দরজার ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। কিশোর বললে, একে আশ্রয় দিতে হবে আপনাকে।

একটি মেয়ে। বিস্মিত হয়ে গেলেন কাশীর বউ। কিশোরের প্রতি একটা বিরূপতা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর অন্তরে মাথা ঠেলে জেগে উঠছিল।—এ কে কিশোর?

একটি অনাথা মেয়ে রাঙাদি। গোয়ালপাড়া জানেন? গোয়ালপাড়া বাড়ি মেয়েটির, নাম ষোড়শী।

কাশীর বউ বললেন, ওর নাম আমি শুনেছি কিশোর। তুমি ওকে কোথায় পেলে?

কিশোর বললে, তা হ'লে তো আপনি অনেক কিছু জানেন রাঙাদিদি, গ্রামের লোকে ওর ওপর বিরূপ হয়েছে, ওকে সমাজে ঠাঁই দিতে চায় না। ও চ'লে এসেছে বাড়ি থেকে। কোথায় যাচ্ছিল ও-ই জানে, কিন্তু আমরা কজন বেড়িয়ে ফেরবার পথে দেখলাম, অমূল্য ভূপতি আরও কজন চেনাচামুণ্ডী নিয়ে, ওকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। মেয়েটি আমাদের দেখে কেঁদে উঠল। আমরা ওদের সঙ্গে মারামারি ক'রে বেচারাকে উদ্ধার করলাম। এখন কি করব? গ্রামেও ফিরে যাবে না। বিদেশে গেলে ওর অবস্থা যে কি হবে ভেবে দেখুন। আমার বাড়ির কথা তো আপনি জানেন। তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে। আমাদের দেশের এই সব হতভাগিনীদের দশা আপনি বুঝবেন। আপনি ওকে ঝি হিসেবে রাখুন। ও তা থাকতে চায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, আজ রাত্রির মত আশ্রয় আমি ওকে দিচ্ছি। বরাবরের কথা ওঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তো বলতে পারব না ভাই।

কিশোর হেসে বললে, দাদাকে?

হ্যাঁ।

রাঙাদি, আপনাকে লোকে ডাকে কাশীর বউ ব'লে, কিন্তু আমরা ছেলের দল আপনার নাম দিয়েছি 'অন্নপূর্ণা'। রুদ্রদেবের মত রাধাকান্তদাদাকে আপনি ভিখিরী শিব বশ মানিয়েছেন, শিবের রাজ্য কাশী এই দাদার রাজ্যেই। ওটা ক'রে আপনি আমাকে ছলনা করছেন।

কাশীর বউ হেসে বললেন, ও তোষামোদের চেয়ে একখানা গান শোনালে আমি বেশি তুষ্ট হতাম নাতি।

আর একদিন। কাল দুপুরে এসে পেট ভ'রে গান শুনিয়ে যাব। কিন্তু আশ্রয় দিলেন তো তা হ'লে?

ওঁকে জিজ্ঞেস না ক'রে নয় ভাই। শিবই যখন বললে তোমার দাদুকে, আমাকে বললে অন্নপূর্ণা, তখন দক্ষযজ্ঞের কথাটা মনে করিয়ে দি তোমাকে। জোর ক'রে শিবের অনুমতি আদায় করার ফলে শিবানীকে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল, তার ফলে হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ।

কিশোর বললে, দাঁড়ান দিদি, আপনাকে একটা প্রণাম করি।

কাশীর বউ হেসে বললেন, আশীর্বাদ করছি, টুকটুকে একটি বউ হোক শিগগির।

কিশোর বললে, রাঙাদি বুঝি আমাদের দেশের রসিকতাগুলো শিখছেন?

না শিখলে চলে? তোমাদের দেশের অন্নজল যখন বরাদ্দ করলেন ভগবান, তখন এই দেশের সব কিছুই যে শিখতে হবে ভাই। জান, বিয়ের পর এখানে এলাম; স্নান করব, বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, জল কোথায়? বলে, ঘাটে যাও। এই গোনে-গোনে আমার সঙ্গে এস, কেউ নাই এ গোনে, তবু সান কেড়ে লাও। আমি গোনও বুঝতে পারি না, সানও বুঝতে পারি না। তিনি হাসলেন। তারপর আবার বললেন, তখন তো ভাই, তোমাদের এ কালের ছেলেদের মত শহরের ভাষায় এ কালের ভাবের কথা কেউ বলত না, তোমরাও তখন শেখো নি। কাজেই এ দেশের কথা শিখতে হয়েছে বইকি।

তা শিখুন। গোন শিখুন, সান শিখুন, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, এ দেশের ওই রসিকতা আর বঁড়শির মত পাঁজরা-বেঁধা বাঁকা কথাগুলো শিখবেন না রাঙাদিদি। আর গালাগালগুলো শিখবেন না।

ভিতর থেকে চারুর কান্না ভেসে এল। চারু কাঁদছে, বোধ হয় গৌরীকান্ত তাকে মেরেছে। কাশীর বউ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা ভাই, কাল দুপুরে এসো, ওর পাকা ব্যবস্থা যা হয় হবে তখন। তারপর ষোড়শীকে বললেন, এস গো মেয়ে, আমার সঙ্গে এস।

কিশোর সম্ভবত কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্মদের ছোঁয়াচ লাগিয়েছে। কাশীর মেয়ে তিনি, ব্রাহ্মদের শুদ্ধ রুচিবাতিকের কথা জানেন। টুকটুকে বউ হোক—এ পরিহাসও কিশোরের কাছে অরুচিকর ঠেকছে। তা ভাল, দেশের ছেলেদের মধ্যে হাওয়া ফিরুক।

চারু চীৎকার ক'রে কাঁদছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হ'ল? গৌরী মেরেছে বুঝি? গৌরী!

গৌরীকান্ত বললে, না, আমি মারি নি।

শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্যতমা গ্রামের মেয়ে পুঁটি বললে, না মা, তুমি চ'লে গেলে, ও শুল। আমি তাই উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম,—ওঠ্‌, চারু, মা আসছে, গল্প বলবে, শুনবি। এই কান্না! কে জানে মা, এমন রঙ্গের রাধা তো আমি দেখি নাই। তা আবার শুইয়ে দিলাম, বলি—তবে শো, ঘুমো। তাও শোবে না। কাঁদছে। এ কি আদর মেয়ের মা! ডাক্তারের ঘর করবে কি ক'রে এসব মেয়ে?

কান্নার মধ্যেই চারু ফোঁস ক'রে উঠল, বেশ, তা তোর কি ডাক্তারখাকী?

শুনলে, শুনলে? কাশীর বউ, তুমি শুনলে? কষা ধ'রে মাটিতে ঘ'ষে দিতে হয় না মেয়ের? সাঁড়াশি তাতিয়ে ব্যাভ (জিভ) ছিঁড়ে নিতে হয় না? বল তুমি?

কাশীর বউ বিব্রত হলেন। বললেন, চুপ কর, চুপ কর। ছোট মেয়ে। যাক গে, মরুক গে, গল্প শোন।

পুঁটি উঠে দাঁড়াল। বললে, অ! ভালবাসার লোক যে চারুর মা, তাই বুঝি তার বেটীর দোষ হয় না? দোষ বুঝি আমাদের? তা বেশ। চললাম ভাই, আর আসব না।

কাশীর বউ বললেন, না না। ব'স পুঁটি, ব'স।

না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ মহাদেবের স্ত্রী স্থূলকায়া, সে নির্বিকারের মত শুয়ে ছিল, সে বললে, গল্পটা শুনে যাও ভাই। গল্প আধশোনা রাখলে আধকপালে হয়।

পুঁটি এবার থমকে দাঁড়াল। এটা এখানকার প্রচলিত বিশ্বাস। তার উপর মাথা তার মধ্যে মধ্যে ধরে। সে ফিরে এসে বসল। বললে, তাই বল, 'বলেছি গুখেকোর ব্যাটা আর তো ফেরে না!' আধখানা যখন শুনেছি, তখন গু খেয়েছি, তা বল, শেষ কর, গু খেয়ে শেষই করি।

কাশীর বউ আশ্বস্ত হলেন। পুঁটি কুলীনের ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নামে, স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, বাপের ঘরেও ভ্রাতৃবধূর বিষদৃষ্টি তার উপর; পুঁটির উপর রাগ করতে গেলে ওই কথাগুলিই মনে হয় কাশীর বউয়ের, তিনি রাগ করতে পারেন না। মায়ায় তাঁর মন ভ'রে ওঠে। যাক, পুঁটি যখন ফিরে বসেছে, তখন আর ভাবনা নাই। গল্প শেষ হতে হতে তার সব রাগ জল হয়ে যাবে। চারুটাও আবার শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। ওটার ওই রোগ। আর গল্প-পাগল যেমন তাঁর শ্রীমানটি! গল্প যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ জেগে থাকবে। সস্নেহে ছেলেকে কাছে একটু টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তারপর—। কতদূর বলেছি বল তো?

পুঁটি বললে, বিয়ে হ'ল গো ছোট রাজকন্যের। কি নাম যেন?

গৌরীকান্ত বললে, বর-কনে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল অন্ধকারে। কাজলরেখা গয়না খুলে বাবার পায়ে নামিয়ে দিলে।

পুঁটি বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তোতাপাখি ছেলে তোমার মা! ঠিক মনে রেখেছে। আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের মনে নেই। বাবা আমাকে খ্যাপা বলে, তা মিছে নয় ভাই। কিছুই আমার মনে থাকে না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ বললে, বলুন খুড়ী, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

সত্য কথা। কাশীর বউয়েরও অনেক কাজ বাকি। রাধাকান্তের জন্য তিনি নিজে হাতে রুটি তরকারি তৈরি ক'রে থাকেন। তারও সময় হয়ে এল। তিনি আরম্ভ করলেন, হ্যাঁ, তারপর—

তারপর কবি আর কাজলরেখা এলেন কবির ঘরে। গরিবের ঘর। কাজলরেখার তাতে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। প্রসন্ন মনে সমস্ত করেন,—ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্নাবান্না, বিছানা-পাতা, জল-আনা সমস্ত। কবি কাব্য লেখেন। রাত্রে কাজলরেখাকে শোনান। কাব্যে কবি ভগবানের স্তব করেন, প্রার্থনা করেন—হে ভগবান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দীনদরিদ্রের বন্ধু, তাদের দুঃখ তুমি দূর কর। সকল বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তাদের

বড় কষ্ট, তুমি তাদের দিকে তাকাও। শুনতে শুনতে কাজলরেখার চোখ জলে ভ'রে ওঠে, কবি সকালে বার হন একতারা নিয়ে। গ্রামের পথে পথে গান গেয়ে চলেন—ধনী, তুমি অহঙ্কার ক'রো না, ধনসম্পদ হ'ল পদ্মপত্রের জল। দরিদ্র, তুমি দারিদ্র্যদুঃখে পরের হিংসা ক'রো না, অসৎ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা ক'রো না; হিংসা হ'ল নিজের-কাপড়ে-ধরানো আগুন, তাতে তুমিই পুড়ে মরবে; অসৎ উপায়ে উপার্জন হ'ল পাপ, পাপ তোমাকে ধ্বংস করবে। উপরের দিকে চাও, সেখানে আছেন সকল মানুষের পরম বন্ধু এবং সকল রাজার রাজা; তিনি তোমাদের রক্ষা করবার জন্য, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ব'সে আছেন, সকল অবিচারের বিচার করবার জন্য ন্যায়দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দ্বারস্থ না হ'লে তিনি কি করবেন? তাঁর শরণ নাও, তাঁর শরণ নাও, তোমরা সকলে তাঁর শরণ নাও।

এদিকে রাজা মুক্তামালার বরকে তাঁর প্রতিনিধি ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মুক্তামালার বর মহাবীর মহাযোদ্ধা, তিনি মৃগয়ায় যান, পশুপক্ষী বধ করেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ জয় করেন। রাজাদের বন্দী ক'রে এনে দাস করেন, রাণী-রাজকন্যাদের এনে মুক্তামালার দাসী ক'রে দেন। আবার তিনি কঠোর শাসক। সামান্য দোষও কেউ করলে তার নিষ্কৃতি নাই। চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। কে কোথায় রাজার নিন্দা করছে, সন্ধান করে গুপ্তচরেরা। কে কোথায় রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছে, সে সন্ধান রাখে তারা। জামাই-রাজা কঠোর শাস্তি দেন।

প্রজারা সবাই সশঙ্কিত হয়ে দিন যাপন করে। কার কোন্‌দিন কি হয়! শস্য উঠলে সর্বাগ্রে রাজার কর আদায় দেয়, শস্য যদি নাও হয়, তবুও ঋণ করে অথবা কিছু বিক্রি ক'রে —যেমন ক'রেই হোক, রাজার কর দিয়ে আসে।

ক্রমে দুই কন্যারই দুটি ছেলে হ'ল। ছেলে দুটি আপন আপন বাপ-মায়ের কাছে বড় হতে লাগল। মুক্তামালার ছেলে ভবিষ্যৎ রাজা, রাজপ্রাসাদে সোনার ভাঁটা নিয়ে খেলা করে। তীর ধনুক নিয়ে পোষা-পাখি বিঁধে লক্ষ্যভেদ শেখে। কাজলরেখার ছেলে ভোরে উঠে জোড়হাত ক'রে বসে, কাজলরেখার সঙ্গে তার বাপের রচনা করা ভগবানের স্তব গান করে, আঙিনায় খেলা করে, পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে। যেগুলিতে ময়লা মাটি লেগে থাকে, সেগুলিকে বলে, মা, এরা গরিব দুঃখী, নয়? গায়ে ময়লা মাটি লেগে রয়েছে; তাদের সে স্নান করায়। বলে, এদের সেবা করছি। সন্ধ্যায় শাস্ত্র পড়ে বাপের কাছে—নানা শাস্ত্র।

এমন সময়, সেবার একবার দেশে এল মহা হাহাকার। একেবারেই বৃষ্টি হ'ল না। দারুণ অনাবৃষ্টি। বর্ষা না হ'লে শস্য হয় না। শস্য না হ'লেই দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'ল। লোকেরা অন্নের অভাবে, গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করলে, স্ত্রী-পুত্র বেচতে আরম্ভ করলে।

জামাই-রাজার কঠোর শাসন। রাজকর আদায়ের জন্য নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত দেওয়া হ'ল।

কাজলরেখার স্বামী কবি, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে অবিরাম কাঁদেন। ভগবানকে ডাকেন,

উপায় কর, প্রভু, তুমি উপায় কর। মানুষকে তুমি রক্ষা কর। কাজলরেখা জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকেন স্বামীর পাশে। ছেলেটিও থাকে। রাত্রে কবিকে স্বপ্নাদেশ হ'ল। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ দেশে রাজা রয়েছে। তুমি প্রজাদের সঙ্গে ক'রে তাঁর দরবারে যাও। জানাও তাঁকে তোমাদের দুঃখের কথা। তিনি যদি প্রতিকার না করেন, তখন আমার কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার আমি করব।

সকালে উঠেই কবি কাজলরেখাকে সব বললেন। বলে বললেন, দেখ, তোমার দিদি মুক্তামালার স্বামীর যে প্রকৃতির কথা আমি শুনেছি, তাতে ভগবানের অভিপ্রায় যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমাকে যেতে হবে। সত্যপ্রিয় (ছেলের নাম সত্যপ্রিয়) তোমার কাছে রইল। আমি যদি না ফিরি, তার ভার তোমার উপর রইল।

তারপর তিনি দুঃখীদের নিয়ে রাজধানীতে গেলেন। যত যান, তত দলে দলে লোক তাঁর পাশে জমা হয়। এমনই ভাবে তারা প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে জোড়হাত ক'রে ডাকলে, হে মহারাজ, আমাদের দয়া করুন, আমাদের অন্ন দিন।

মুক্তামালার স্বামী ঘুমুচ্ছিলেন। চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায় রক্তচক্ষু হয়ে, ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে। বিছানা থেকে তরবারি হাতে নিতেই কিন্তু চীৎকার শুব্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সম্ভবত তারা তাঁর তরবারি হাতে নেওয়া জানতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বারান্দায় এসে দেখলেন, শক্তিপ্রিয় (তাঁর ছেলের নাম শক্তিপ্রিয়), তারই ভয়ে প্রজাদের চীৎকার শুব্ধ হয়ে গেছে ; শক্তিপ্রিয় ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, আর নীচে প্রজাদের সামনে—সর্বাগ্রে একটি মানুষের দেহ প'ড়ে আছে। তার বুকে একটা তীর বিঁধে রয়েছে। দেখেই ছেলেকে তিনি মহাগৌরবের সঙ্গে বুকে তুলে নিলেন। উপযুক্ত পুত্র। বিদ্রোহ দমন করতে সে পারবে।

ওদিকে প্রজারা কবির মৃতদেহ তুলে নিয়ে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল। কবিই ছিলেন সকলের সম্মুখে, সর্বাগ্রে। শক্তিপ্রিয়ের তীর তাঁরই বুকে এসে বিদ্ধ হয়েছিল।

কাশীর বউ একটু থামলেন।

তারপর মা ? সত্যপ্রিয় কি করলে ? মা, তাকেও মেরে ফেললে ?—গৌরীকান্তের গলা কাঁপছে। কান্না এসেছে তার।

পুঁটি বললে, না ভাই, এ গল্প তোমার ভাল নয়। বিয়ে নাই, রাজকন্যে নাই। মারামারি কাটাকাটি। না ভাই।

চাকর বিষ্টুচরণ এসে দাঁড়াল।—মা !

কাশীর বউ বললেন, ভাঁড়ারে ময়দা বের করা আছে বাবা, তুমি নিয়ে মাখতে আরম্ভ কর। আমার হয়ে গেছে।

কাশীর বউ গল্প বলার ভঙ্গির ঈষৎ পরিবর্তন করলেন। সংক্ষিপ্ত ক'রে ব'লে গেলেন। বললেন, ওদিকে কাজলরেখা স্বামীর দেহ নিয়ে নদীর ধারে দাহ করলেন। চিতার পাশে মাতাপুত্রে হাতজোড় ক'রে ভগবানকে ডাকলেন। বললেন, প্রভু, তোমার আদেশে সে

গিয়েছিল। তাকে রাজা বধ করেছে। তার প্রতিহিংসা আমরা চাই না, আমরা চাই, তুমি বলেছিলে রাজা প্রতিকার না করলে তখন তোমার কাছে নালিশ জানাতে। রাজা প্রতিকার করে নাই, তুমি এইবার প্রতিকার কর, দুঃখীদের বাঁচাও, ত্রাণ কর। এইবার ভগবানের আসন ট'লে উঠল। তিনি ডাকলেন ক্রোধকে। বললেন, যাও তুমি গিয়ে প্রজাদের বুকের মধ্যে অধিষ্ঠান হও, দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠ, তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে—এমনভাবে তাদের ক্রুদ্ধ ক'রে তোল। ক্রোধ এল।

অনাহারে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল পেটের জ্বালায়। পথে প'ড়ে মরছিল। সেই সব মড়ার মাংস খাচ্ছিল। তারা দেখতে দেখতে অন্যরকম হয়ে উঠল। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ, তেমনই মূর্তি হ'ল তাদের। তারা ছুটল দলে দলে—মার্-মার্ শব্দে। মার্, ওই রাজাকে মার্। রাজার পাপেই হয় অনাবৃষ্টি, রাজার পাপেই হয় দুর্ভিক্ষ, রাজার অত্যাচারেই আমাদের এই দশা। রাজাকে মার্।

সকলের নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আসছিল।

গৌরী বললে, মা, কি করলে তারা?

তারা ছুটে গিয়ে পড়ল দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ক্ষেপে উঠল, হাতি খেপে উঠল, ঘোড়া খেপে-উঠল, আকাশে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধিনী; সে এক প্রলয়ের মত ব্যাপার। ভেঙে পড়ল রাজার সিংহদ্বার। ছিঁড়ে পড়ল ঝাড়-লণ্ঠন। দাউদাউ ক'রে জ্বলতে লাগল কাঠের আসবাব। প্রজারা হুঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল উপরে। মুক্তামালার বর কিন্তু মহাবীর, শক্তিপ্রিয়ও বীর, মুক্তামালাও যুদ্ধ করতে জানেন। তাঁরা পালালেন না, যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু এত মানুষের কাছে তাঁরা কি করবেন? কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। প্রজারা তাদের দেহ মাড়িয়ে এর পর ছুটল—কোথায় সেই বুড়ো রাজা! এইবার তাকে আমরা বধ করব। কোথায়? অথর্ব বৃদ্ধ রাজা ব'সে ছিলেন আপনার ঘরে। তিনি ইষ্ট স্মরণ করতে লাগলেন। কোলাহল এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু রাজা আশ্চর্য হলেন, হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশির আওয়াজের মত একটি মিষ্টি আওয়াজ তাঁর কানে এল—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হিংসাকে সম্বরণ কর। বাঁশির আওয়াজ শুনে ছুটন্ত হরিণের দল যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই পাগল লোকেরা থমকে গেল। রাজার ঘরে এসে ঢুকল ষোল-সতেরো বৎসরের একটি ছেলে, সে যেন কুমার কার্তিক। কিন্তু তার হাতে ধনুর্বাণ নাই, অঙ্গে রাজবেশ নাই। পিছনে পিছনে এসে ঢুকলেন বিধবা কাজলরেখা। বাবা! রাজা চমকে উঠলেন, মা কাজলরেখা?

হ্যাঁ, বাবা। এই আপনার দৌহিত্র।

জামাই?

তাঁকে তো বধ করেছে শক্তিপ্রিয়।

রাজা কাঁদতে লাগলেন। কাজলরেখা বললেন, বাবা, জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাই সেই

কর্মপুণ্যবলে মানুষের সেবার পুণ্যে উন্মত্ত মানুষ আজ সত্যপ্রিয়ের অনুগত। সেই পুণ্যেই আপনাকে আজ রক্ষা করতে পেরেছি—এই আমার মহাভাগ্য।

রাজা উঠলেন, নিজের মাথার মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন সত্যপ্রিয়ের মাথায়। প্রজারা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। রাজা বললেন, আমার নাতির বিবাহ দেব। সেই বিবাহে রাজকোষ রাজভাণ্ডার তোমাদের খুলে দিলাম।

* * *

রাত্রে রাধাকান্ত খেতে বসেছিলেন। কাশীর বউ বললেন ওই ষোড়শী মেয়েটির কথা।—একটি মেয়েকে আমি আশ্রয় দিয়েছি তোমার মত না নিয়েই।

কে?—চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। কে সে মেয়ে?

নাম ষোড়শী, গোয়ালপাড়ায় বাড়ি।

রাধাকান্ত বললেন, ষোড়শীর অনেক অখ্যাতি কাশীর বউ।

কাশীর বউ বললেন, খ্যাতি-অখ্যাতিই কি সব? মানুষের দাম কি কিছুই নাই?

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কাশীর বউ, তুমি নতুন কালের কথা বলছ। আমি পুরনো কালের মানুষ। বয়সে না হ'লেও মনে মনে আমরা পুরনো কালের। আমাদের কালের কথা হ'ল—মানুষের দাম খ্যাতি-অখ্যাতিতেই। মানুষ জন্মায়, তারপর একদিন মরে, মরতে হবেই। কিন্তু যে খ্যাতি অর্জন করে, সে ম'রেও বেঁচে থাকে; আর জীবনটা যার অখ্যাতিতে কলঙ্কিত, তার মৃত্যুতে সংসার নিশ্চিন্ত হয় ব্যাধিমোচন হ'ল ব'লে। চুপ করলেন রাধাকান্ত। একটু পর বললেন, আশ্রয় দিয়েছ—প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

কাশীর বউ বললেন, আমি অবশ্য আশ্রয় দিই নি। তোমার ঘর, তোমার অমতে আশ্রয় দোব কোন্ অধিকারে? রাত্রের মত থাকতে দিয়েছি। বলেছি সে কথা কিশোরকে। কিন্তু কিশোরের একটা কথা আমার প্রাণে বড় লেগেছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাধাকান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

কাশীর বউ বললেন, কিশোর বললে—আশ্রয় না পেলে ওর পরিণামটা ভেবে দেখুন। ভাবতে গিয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাধাকান্ত বললেন, ভাবনা তো শুধু ওর পরিণামই নয়। ভাবনার যে অনেক কিছু আছে কাশীর বউ।

এবার কাশীর বউ সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন।

রাধাকান্ত বললেন, ওর ভাবনা ভাববার আগে, আমার নিজের ভাবনা ভাবতে হবে।

কাশীর বউ হেসে ফেললেন, বললেন, বাঁশি শুনে এত, তা হ'লে না জানি তাকে দেখলে কি বলবে তুমি! কিন্তু তুমি এত দুর্বল, তা জানতাম না।

রাধাকান্তও হেসে ফেললেন। বললেন, বাক্পটুতা পুরুষের পক্ষে ভাল লক্ষণ, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে আজ মুখরা বলতে হ'ল আমাকে। নিজের ভাবনা হ'ল—আমার ঘরের ভাবনা। জান, চরিত্রহীনা নারী যে সংসারে থাকে, সে সংসারে লক্ষ্মীর আসন টলে?

কাশীর বউ বললেন, তুমি আমাকে মুখরা বললে, আর আমার কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে না ব'লে পারছি না। তুমি তো শাস্ত্র অনেক পড়েছ। কোজাগরী লক্ষ্মীর কথায় আছে, আশ্রয় চাইতে আসায় অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ। তাতে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু তাঁর ধর্ম তাতে বলীয়ান হয়েছিলেন। লক্ষ্মীকে ফিরতে হয়েছিল সে বলে। এ মেয়েটিও তো আশ্রয়প্রার্থী তোমার কাছে।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

হঠাৎ একটা ডাক কানে এল :—রাধাকান্তদা! রাধাকান্তদা!

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত উত্তর দিলেন, কে?

আমি স্বর্ণ। বাড়ির ছাদের উপর থেকে ডাকছি।

কি? কি হ'ল?

ধোঁয়াতে যে গ্রাম ভ'রে গেল! কিছু বুঝতে পারছ না?

ধোঁয়া?

কাশীর বউ বললেন, হ্যাঁ গো, তাই তো! কথার মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলাম। সত্যিই তো ধোঁয়া এসে ঢুকছে ঘরে।

রাধাকান্ত উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়ে, নিজের ছাদের উপর গিয়ে উঠলেন। দেখলেন, গ্রামের মাথার উপরে যেন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে নেমেছে। আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে গ্রামের আকাশ। আকাশের গ্রহলোক পর্যন্ত অস্পষ্ট আবছা দেখাচ্ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, শুধুই ধোঁয়া, আগুনের আভাস কিন্তু কোথাও দেখা যায় না।

স্বর্ণ!

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার?

অন্য একটি ছাদ থেকে কেউ ডাকলে, কে? রাধাকান্তমামা?

গোপীচন্দ্র ডাকলেন। তাঁরও ঘুম ভেঙেছে। রাধাকান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। গ্রাম ধোঁয়ায় ঢেকে গেল, দেখেছেন? কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

গোপীচন্দ্র বললেন, ও ভয়ের কিছু নয়। ইঁটের ভাটার ধোঁয়া। ইস্কুল-ঘরের জন্য ইঁটের ভাটায় আজই আগুন দেওয়া হয়েছে। তারই ধোঁয়া। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চিলে-কোঠার দরজা-বন্ধের শব্দে বুঝা গেল, গোপীচন্দ্র ছাদ থেকে নেমে গেলেন। স্বর্ণের আর সাড়া পাওয়া গেল না। সে নিঃশব্দে নেমে গিয়েছে নিশ্চয়। ইঁটের ভাটার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। হ্যাঁ, ইস্কুল-ঘরের জন্য ইঁট-পোড়াই শুরু হয়েছে বটে! খবরটা তিনি শুনেছিলেন। গ্রামে দিনমজুর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। সকলেই ওখানে খাটতে যায়।

কাশীর বউ এসে ডাকলেন, কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত বললেন, চল, যাই।

কি ভাবছ বল তো ?

ভাবছি ? চল যাই, শুই গিয়ে। আর একদিন বলব।

চল। গৌরী জেগে রয়েছে। গল্প শুনে ঘুম আসছে না তার। গল্প না শুনেও ছাড়বে না ; আবার শুনে ছেলের ঘুম আসবে না।

* * *

সকালে উঠে রাধাকান্ত জানলার ধারে দাঁড়ালেন। গৌরী এখনও ঘুমুচ্ছে। বেচারা কাল রাত্রে বার দুই চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে উঠেছে। গল্পের কথা স্বপ্ন দেখেছে। সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপর তিনি চেয়ে দেখলেন জানলার বাইরে গ্রামের আকাশের দিকে। এখনও পর্যন্ত ধোঁয়ার স্তর পাতলা ছিল্‌কে মেঘের মত গ্রামের মাথায় উড়ে চলেছে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালেন। নীচে না নেমে, ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদে থেকে গ্রামের পশ্চিম দিকের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন। পশ্চিম প্রান্তে একটি অনুর্বর কাঁকর-বালি-মেশানো মাটির উঁচু প্রান্তর। মাটি এত অনুর্বর যে, ওটা অনাবাদী হয়েই প'ড়ে আছে ; গোচারণের জন্যও কেউ ওদিকে যায় না। ওই যে বটগাছটা, ওটাতে—লোকে বলে—ভূত আছে। ওই প্রান্তরটার মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে—এখান থেকে সাত মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশন যাবার পাকা সড়ক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রোড। ওই প্রান্তর কিনেছে গোপীচন্দ্র। ওই প্রান্তরে ইস্কুল হবে। ওরই ইঁটের ভাটা পুড়ছে—একটা দুটো তিনটে। তিনটে ভাটার প্রায় সর্বাঙ্গ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আরও একটা দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন, পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর দিকে মাঠের পথ ধ'রে আসছে কালো পিঁপড়ের সারির মত মানুষের সারি। বুঝলেন, মজুরেরা আসছে খাটতে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন।

মাটি কাটছে, জল ঢালছে, কাদা ছানছে পায়ের কৌশলে, ফর্মায় ফর্মায় ফেলে ইঁট পেড়ে যাচ্ছে। গাড়ি গাড়ি কয়লা আসছে। শুকনো ইঁট তুলে ভাটা সাজানো হচ্ছে। ইঁট পুড়ছে। কাঁচা ইঁট লাল হয়ে কালজয়ী শক্তি অর্জন করছে। ঘুটিং আসছে। চুন হচ্ছে। ভিত খোঁড়া হচ্ছে। গাঁথনি গাঁথা হচ্ছে, গ'ড়ে উঠছে ইমারৎ। ইস্কুল-বাড়ি। তারপর আরও, আরও ইমারতে ভ'রে উঠল ওই প্রান্তর। গ্রামের লোক ছুটে চলছে ওখানে। গ্রামান্তরের লোক আসছে ওখানে।

তিনি পূর্ব দিকে একবার ফিরে চাইলেন। নদীর ধারে বন্দরঢিপির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে দূরে। গাছের মাথায় পাখিরা উড়ছে। নীচে ? নীচে বেড়াচ্ছে সাপ। অসংখ্য কীট পতঙ্গ ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম। নির্জন স্তব্ধতার মধ্যে অবিরাম ডেকে চলেছে তারা।

ওই চণ্ডীতলা। ও পথে চলেছে কয়েকটি পুণ্যার্থিনী মেয়ে মাত্র। মাঠে কজন চাষী ঘুরছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরাও চ'লে আসবে। চণ্ডীতলার মাঠ খাঁ-খাঁ করবে।

উত্তর-পূর্ব দিকে গন্ধবণিকপাড়া। ভাঙা দালানখানা দেখা যাচ্ছে শুধু। তিনি বেশ

দেখতে পেলেন, ওখানে দুপাশে ছোটখাটো মুদীর দোকানের মাঝখানে রাস্তায় দু-চারখানি গাড়ি, দু-দশজন মানুষ শুধু ঘুরছে।

নিজেদের পাড়ায় অবশ্য কলরব উঠছে, গমগম করছে। তাঁর ওখানেই হয়তো পাঁচ-দশজন ব'সে আছে।

আবার তিনি চাইলেন পশ্চিম দিকে। উঃ, এখনও মানুষ আসছে! গ্রামান্তর—ওই ব্যাপারীপাড়া, গোগ্রাম, দেবীপুর, সজলপুর, মিলনপুর থেকে মানুষ আসছে। মাঠে-মাঠে চ'লে আসছে। ওই প্রান্তরে গোপীচন্দ্রের যে কীর্তিপল্লী গ'ড়ে উঠছে, যেখানে একদা গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ আসবে; পদচিহ্নে পদচিহ্নে সেখানে আসবার পথ রচনা ক'রে আসছে তারা।

রাধাকান্ত কাল রাত্রি থেকেই ভাবছিলেন এই কথাটা। নবগ্রাম, এই অঞ্চলের সত্তর-আশিখানা গ্রামের কেন্দ্রস্থল, জনপদতুল্য এই নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মী পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে ওই দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন। একদা তিনি ছিলেন চণ্ডীতলা-অভিমুখিনী। দেশ-দেশান্তরের যাত্রী আসত। চণ্ডীতলার ঘণ্টাধ্বনিতে মানুষের ঘুম ভাঙত। চণ্ডীতলায় যেত মানুষ দলে দলে। শান্তি নিয়ে ফিরে আসত। তারপর গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছিলেন ঘাটবন্দরের দিকে। দেশান্তর থেকে নৌকা আসত। ঘাট থেকে গ্রাম পর্যন্ত গ্রামান্তর পর্যন্ত চলত বোঝাই গাড়ির সারি। মানুষ—মানুষ—মানুষ। তারা চলত পাশে পাশে। তারপর রেল হ'ল, নদী মজল। বন্দরটিপি জঙ্গলে পরিণত হ'ল। গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফেরালেন তাঁদের পল্লীর দিকে—উকিল, জমিদার, চাকুরে, এদের পল্লীর দিকে। মা আবার মুখ ফেরাচ্ছেন। ফেরাচ্ছেন ওই ধুধু-করা প্রান্তরের দিকে। চঞ্চলা! তুমি চঞ্চলা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। 'চঞ্চলা' ব'লে মাকে দোষ দেওয়া কেন? কালের রথ চলেছে। সেই রথে গ্রামলক্ষ্মী পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, তারপর দক্ষিণ দিক দিয়ে চলেছেন, এইবার কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে থামবেন পশ্চিমে। জনপদতুল্য নবগ্রামে লক্ষ্মীর রথ চলেছে। দিল্লী গিয়েছিলেন তিনি। দেখে এসেছেন—হস্তিনাপুরী থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হিন্দু রাজাদের দিল্লী, তারপর পাঠান, তারপর মোগলের দিল্লী, এই চক্রে রথে চ'ড়ে ঘুরেছেন সেখানকার লক্ষ্মী। দীর্ঘকাল তাঁর রথ থেমে আছে। হয়তো আবার চলবে তাঁর রথ কোনদিন, অকস্মাৎ নতুন দিকে মুখ ফেরাবেন। মনে পড়ল বাংলার কথা। গৌড়, গৌড় থেকে ঢাকা, রাজমহল; সেখান থেকে মুরশিদাবাদ, মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে থেমেছেন বাংলার লক্ষ্মী।

নবগ্রামের পল্লীলক্ষ্মীর রথ চলেছে। মানুষ বুঝতে পারে না, দেখতে পায় না। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এক-একবার হয়তো বুঝা যায়, লক্ষ্মীর মুখ ফিরেছে। মা এবার ওই ইস্কুলের দিকে মুখ ফেরালেন।

পাঁচ

রাধাকান্ত ছাদ থেকে যে দৃশ্য দেখলেন—গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ পিঁপড়ের সারির মত প্রান্তর এবং ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে নতুন পথ রচনা ক'রে গোপীচন্দ্রের ইঁটখোলা এবং ইস্কুল-ইমারতের কাজে আসছে, সে দৃশ্য স্বর্ণবাবুও দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামপ্রান্তে তাঁর কলমের আমবাগানের মধ্যে। কলমের গাছের শাখাপল্লবের আড়াল পড়ায় দেখতে অসুবিধা অনুভব করলেন তিনি। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে স্বর্ণবাব খোলা মাঠের উপর দাঁড়ালেন।

এত লোক? এত লোক কত কাজ করছে? কি এত কাজ? গুড়ের সন্ধান পেয়ে চারিদিকের গর্ত থেকে পিঁপড়ে ছুটে আসে। কিন্তু গুড়ের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের সংখ্যার তারতম্য হয়। এক ফোঁটা গুড় পড়লে, পিঁপড়ে খুব বেশি আসে না। গুড়ের হাঁড়ি ভেঙে গেলে, এক বেলার মধ্যেই উঠোন ভ'রে যায় অসংখ্য পিঁপড়েতে। বোলতা আসে, আরও অনেক পোকা আসে। একটা ইস্কুলের ইমারৎ, এক ফোঁটা গুড়ের চেয়ে আর কত বেশি? বাঁ হাতে গোঁফে এবং ডান হাতে টিকিতে পাক দিতে শুরু করলেন স্বর্ণবাবু। নিশ্চয়ই অনেক কিছু আয়োজন করছেন গোপীচন্দ্র। কি করছেন, সেটা জানার প্রয়োজন হয়েছে তাঁর। গ্রামের উন্নতি, দেশের উপকার, কীর্তিতে অনুরাগ, যে যাই বলুক, স্বর্ণবাবু জানেন—গোপীচন্দ্রের সকল আয়োজনের অর্থ কি? স্বর্ণবাবুর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করে, খর্ব করে, গোপীচন্দ্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনের জন্য। স্বর্ণবাবুর পক্ষে এ এক রকম জীবনমরণ-সমস্যা। এক রকম কেন, একেবারে সঠিক, স্থির। তিনি ডাকলেন মালীকে, তিতুয়া! সহিসকে টমটম জুততে বল্‌

* * *

নবগ্রামের বাজারের মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে পাকা সড়ক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পাকা সড়ক জেলার সদর-শহর থেকে বেরিয়ে এ জেলা অতিক্রম ক'রে পূর্ব দিকে অন্য জেলায় গিয়ে ঢুকেছে। গিয়ে থেমেছে গঙ্গার তটভূমি—প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ একটি বন্দরতুল্য স্থানে। স্বর্ণবাবুর টমটম বাজারের পাকা সড়কে এসে পশ্চিমমুখে মোড় ফিরল।

বাজারে বিকিকিনি শুরু হয়েছে। দোকানগুলির সামনে খরিদ্দারেরা দাঁড়িয়ে আছে। পথে লোক চলছে। স্বর্ণবাবুর টমটম দেখে দোকানীরা দোকানের বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালে। খরিদ্দারেরাও অধিকাংশ স্থানীয় লোক, তারাও ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে পথ ছেড়ে এক পাশে দাঁড়াল। স্মিতমুখে স্বর্ণবাবু মাথা নুইয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

হাজার হ'লেও নবগ্রাম শহর নয়; বাজারের পথের পাশে যাদের বাড়ি, তাদের মেয়েরা পথে বের হয়। মেয়েরা ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এ সম্মান স্বর্ণবাবুর পৈতৃক। তিনি এ সম্মানকে জন্মগত ভাগ্যফল ব'লে জানেন। গ্রামে আরও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি আছেন, তাঁরাও জমিদার; প্রাচীন সরকার-বংশের মধ্যে অবস্থাশালী বংশলোচন আছেন; রাধাকান্তের জাঠতুতো ভাই শ্যামাকান্ত আছেন, সম্পদ এবং সম্পত্তির দিক দিয়ে তিনি স্বর্ণবাবুর চেয়েও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; রাধাকান্ত আছেন, তিনি অবশ্য জমিদার নন, জোতজমাসম্পন্ন গৃহস্থ, তবু তাঁরও সম্মান আছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নন, এবং গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা এই ভাবে প্রণাম জানিয়ে সকলকে সম্মান জানালেও, তাঁর ধারণা—তাঁকে যতখানি হেঁট হয়ে তারা প্রণাম জানায়, অন্য কাউকে ততখানি নত হয়ে প্রণাম জানায় না। এই শ্রেষ্ঠ প্রণাম কেড়ে নেবার জন্য গোপীচন্দ্র আয়োজন করছেন। এ তাঁর জীবনমরণ-সমস্যা। এ সম্মান হানি হওয়ার চেয়ে, সত্য সত্যই মৃত্যু শ্রেয়। কানের দুই পাশ তাঁর গরম হয়ে উঠল, ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘোড়াটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলছিল, তবু স্বর্ণবাবু মনের অধীরতায় চাবুকটা তুলে নিয়ে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন ঘোড়াটার পিঠে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা দুলকি চাল ছেড়ে ছন্নকে লাফিয়ে চলতে লাগল। স্বর্ণবাবু ক'ষে লাগাম টেনে ধরলেন দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে, নিষ্ঠুর আনন্দে। দুর্দান্ত জানোয়ারটাকে বাগ মানিয়ে মন তাঁর ঈষৎ তৃপ্ত হ'ল, সুস্থ হ'ল।

বাজার পার হয়ে সড়কটা চ'লে গিয়েছে। প্রথমেই খানিকটা ধানক্ষেত দু ধারে। তারপর একটা মজা দিঘির বুকের মধ্যে দিয়ে। দিঘিটার সীমানা পার হয়ে ওই ঊষর প্রান্তর, যে প্রান্তরে গোপীচন্দ্র ইস্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন।

মজা দিঘিটার মুখে এসেই তিনি ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে ঠোঁটে শব্দ ক'রে থামবার ইঙ্গিত করলেন। পিছন থেকে সহিসটা ছুটে এসে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়াল, ঘাড়ে আদর ক'রে দুটো চাপড় দিয়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিলে।

এখানে মজুর জমায়েৎ হয়েছে অনেক। পাকা সড়কটা থেকে একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মজা দিঘিটার মাঝামাঝি চ'লে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক; এই সড়কটাকে ধনুকের জ্যায়ের মত রেখে অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে ধনুকের দণ্ডের মত নতুন সড়কটা তৈরি হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

স্বর্ণবাবুর বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। অনুমানে তিনি বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। মজা দিঘিটা গোপীচন্দ্রের সম্পত্তি। মজা পুকুরটাকে কাটিয়ে পঙ্কোদ্ধার করার পথে একমাত্র বাধা দিঘির মাঝের এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। দিঘিটার জলকর পাশে রেখে সড়কটাকে এই ভাবে অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে দিতে পারলে, সে বাধা থাকবে না।

গাড়িটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বর্ণবাবু এক হাতে ঘোড়ার রাশ ধ'রে, অন্য হাতে গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করলেন। একজন মজুরকে বললেন, ওরে, এই, ওভারসিয়ারবাবুকে ডাক্ তো।

মজুরেরা প্রায় সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে সভয় সম্ভ্রমে স্বর্ণবাবুকে দেখছে; মজুর-মেয়েদের চোখে অপরূপ বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এটুকু স্বর্ণবাবুর বড় ভাল লাগে।

ওভারসিয়ারবাবু এগিয়ে এলেন। স্বর্ণবাবুকে তিনি চেনেন। তাঁর দায়িত্ব এই রাস্তা-মেরামতের কাজের জন্য, স্বর্ণবাবুর মত বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের চিনতে হয়; তাঁদের সহায়তা ভিন্ন মজুর এবং গরুর গাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।

ধন্য দেশ! এ দেশকে ওভারসিয়ারবাবু ধন্য ধন্য করেন। বিংশ শতাব্দী নাকি পৃথিবীতে কলকারখানার যুগ। দুনিয়া ভ'রে গেল কলে আর মজুরে। কিন্তু এই উনিশ শো ছ সালে এ দেশে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না। তাও চালের মণ পাঁচ সিকে থেকে দু টাকা। টাকায় তেরো সের চাল, অর্থাৎ তিন টাকা মণ হ'লে, দেশে আকাড়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে ব'লে হাহাকার ওঠে; চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণ-জীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিসেবে ওই চাষেই খাটে। আর আছে বছরে একবার খ'ড়ো ঘরের চাল-ছাওয়ানোর কাজ। তাও তারা আপন আপন গ্রামের মধ্যেই মজুর-খাটার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। কেবল স্বর্ণবাবুর মত ব্যক্তিদের হুকুমে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে আসতে বাধ্য হয়; কারণ তাঁরা জমিদার; জমিদারদের হুকুম অমান্য করতে নাই—এইটাই চলিত শিক্ষা, এবং অমান্য করবার মত সাহস, সাহস দূরের কথা, কল্পনাও তারা করতে পারে না। তা ছাড়া নিজেদের গ্রামের গৃহস্থদের চাপ থেকে, অত্যাচার অবিচার থেকে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই জমিদার। তাই ওভারসিয়ারবাবুর রাস্তা-মেরামতের কাজের প্রয়োজন হ'লে, ঠিকাদারকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয় এঁদের কাছে। স্বর্ণবাবুর কাছে প্রতি বৎসরই তিনি আসেন। ঠিকাদার কখনও সদর শহর থেকে ভাল তামাক এনে দেয়, কখনও আনে গড়গড়া-ফুরসির নল, তাওয়াদার কলকে, কখনও আনে মোরব্বা—এমনই অল্পস্বল্প উপঢৌকন। এ ছাড়া বছরে লাগে একটা খাওয়া-দাওয়ার খরচ—একটা পাঁঠা, পোলাওয়ের চাল, ঘি, মিষ্টি। নুন তেল মসলার খরচ দিতে চাইলেও স্বর্ণবাবু প্রত্যাখ্যান করেন, ওগুলো ছোট জিনিস—আর লাগে 'কারণ' অর্থাৎ মদ। ওভারসিয়ার-বাবুরাও এ প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রণ পান। সেসব এক একটা মাইফেলি' অর্থাৎ মহফিলের কাণ্ড।

ওভারসিয়ারবাবু একটু চিন্তিত হয়েই এগিয়ে এলেন। এবার লোকজনের সাহায্যের জন্য স্বর্ণবাবুর কাছে তিনি যান নাই। প্রয়োজনও হয় নাই, অবকাশও ছিল না। কিন্তু না-যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। এতকাল পর্যন্ত স্বর্ণবাবুই এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে এসেছেন, সে হিসেবে এটা তাঁর অকৃতজ্ঞতার কাজ হয়েছে। নৈতিক অপরাধ অন্যায় চুলোয় যাক, তাঁর পক্ষে এটা বিপদের কথা। স্বর্ণবাবুরা যত উদার, তত ভয়ঙ্কর। এঁদের দ্বারস্থ হ'লে এঁরা মাথায় করেন, কিন্তু দ্বারস্থ না হয়ে দরজার সামনের রাস্তা দিয়ে চ'লে গেলে ধ'রে এনে লাথি মারেন। তিনি তো সামান্য ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের ওভারসিয়ার! পুলিসের দারোগা পর্যন্ত এ বিষয়ে সাবধান হয়ে চলেন। বেশি দিনের কথা নয়, মাস কয়েক আগে স্বর্ণবাবুদের শ্রেণীর এক জমিদারের হাতে এই নবগ্রাম থানার দারোগার লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ল। দারোগাবাবু এক ফেরারী আসামীর সন্ধানে দূর পল্লী-অঞ্চলে যাচ্ছিলেন। পথে পড়ে ওই

জমিদারবাড়ির দেউড়ি। দেউড়ি মানে পলকা কাঠের আগড়। জমিদার খুব উল্লাস প্রকাশ ক'রে দারোগাকে আহ্বান করলেন। ফেরারী আসামী পালিয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় ব্যস্ত দারোগাবাবু সে আহ্বান না রেখেই চ'লে যান। ফলে আসামী তো ধরা পড়লই না, উপরন্তু দারোগাবাবু নাজেহাল হয়ে যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দারোগা ফেরার পথে সরল বিশ্বাসে আশ্রয় নিলেন ওই জমিদারের বাড়িতে। জমিদার খাওয়ালেন প্রচুর—মদ্য মাংস মৎস্য পোলাও ইত্যাদি, এবং শীতের রাত্রে পাকা-মেঝে ঘরের মধ্যে পুরু বিছানা পেতে শোওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। ক্লান্ত দারোগা এবং তাঁর সিপাহীরা শীতের রাত্রে বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে প্রচণ্ড শীত বোধ হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, বিছানাপত্র সব ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। ঘর অন্ধকার, আলোটা কখন তেলের অভাবে নিবে গিয়েছে। দেশলাই জ্বেলে দেখলেন, ঘরের মেঝেতে জল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, জল নির্গমের নর্দমার মুখও বন্ধ; জানলার একখানা পাল্লায় ছিদ্র ক'রে একটা টিনের নল পরিয়ে কেউ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে জল ঢালছে। ভদ্রলোক দরজায় ধাক্কাধাক্কি ক'রে চীৎকার আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলে না। ভদ্রলোককে সমস্ত রাত্রি ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছিল। সকালে জমিদারবাবু ফেরারী আসামীটিকে দারোগার হাতে সমর্পণ ক'রে বললেন, দিনের বেলা যখন আমি বলেছিলাম তখুনি যদি কষ্ট ক'রে এইখানে উঠতেন, তবে ব্যাটাকে কালই ধ'রে এনে দিতাম। রাত্রেও আপনাকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। নিয়ে যান ব্যাটাকে। লোকটাকে বললেন, যা ব্যাটা, ঘুরে আয় দিন কতক। তোর ছেলেপুলে পরিবার রইল, আমি রইলাম। তারপর দারোগা সিপাহীদের আবার একবার সর্দির ওষুধ খাইয়ে শরীর তাজা ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন।

মাত্রাতিরিক্ত বিনয়সহকারে নমস্কার ক'রে গভীর সম্ভ্রম-প্রীতি ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে ওভারসিয়ারবাবু বললেন, ভাল আছেন ?

প্রতিনমস্কারে স্বর্ণবাবু মাথাটা একটু নোয়ালেন মাত্র। গোঁফে তা দিতে দিতেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ? কি হচ্ছে এসব ?

আজ্ঞে, রাস্তা।

হ্যাঁ, রাস্তা তো বটেই। কিন্তু পাশেই যেন ঘাট হবার আয়োজন হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে ?

ওভারসিয়ার কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না, তিনি হাসতে লাগলেন; এমন রসিকজনোচিত উক্তি যেন তিনি এর পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, রাস্তাটা যাবে কোথায় ? স্বর্গে, না, নরকে ?

আজ্ঞে, সড়কটাকে বেঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে—

মানে, গোপীবাবু মজা দিঘিটা কাটাবেন, তাঁর সুবিধার জন্য দিঘির মাঝখানের রাস্তার অংশটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আজ্ঞে, গোপীবাবুই সমস্ত খরচ বহন করছেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডও রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য—

কত? কত টাকা দিয়েছেন? দানই বা কত, দক্ষিণাই বা কত? মানে, আপনারা কে কি পেলেন?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না স্বর্ণবাবু, হাতের ঝাঁকিতে ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিয়ে চলবার ইঙ্গিত জানালেন। গাড়ি ছুটল।

ক্ষোভে দাঁতের উপর দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন ওভারসিয়ারবাবু, তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি মজুরদের উপর।—হারামজাদা ব্যাটারা, ছুঁচো শূয়ারের দল, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে সব! ঠাকুর উঠেছে যেন! এতেও তাঁর ক্ষোভের নিবৃত্তি হ'ল না, সকলের চেয়ে কাছে ছিল যে লোকটা তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন এক চড়।—চালাও, কাম চালাও, শালা, শূয়ারকি বাচ্চা! চালাও, দশ পয়সা মজুরি চোদ্দ পয়সা হয়েছে, তবু ফাঁকি, তবু ফাঁকি?

* * *

গোপীচন্দ্র দশ পয়সা মজুরির রেট বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করেছেন। গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে তিনি দীনদরিদ্রের দৈনন্দিন জীবনের চার পয়সা মূল্যবৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। জমিদারের প্রতিষ্ঠা এখনও তিনি অর্জন করতে পারেন নাই; নিজে ব্যবসায়ী ব্যক্তি, কয়লার খনির মালিক, শুধু মালিকই নন, খনির সামান্য কাজ থেকে সকল কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। চাষ-জীবিকা ছাড়িয়ে সাঁওতাল ও বাউরীদের পয়সার খেলা দেখিয়ে কি ভাবে খনির কাজে আনতে হয় তাও তিনি জানেন, তাই তিনি পাইক পেয়াদা পাগড়ি লাঠি উপেক্ষা ক'রে চার পয়সার উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এর ফল যে সুদূরপ্রসারী, তাও তিনি জানেন। প্রয়োজন হয় চোদ্দ পয়সাকে চার আনা করবেন তিনি।

ইঁট-পাড়াইয়েই রেট বাড়িয়েছেন দু আনা। ভাটা-সাজাইয়ের রেটও বেড়েছে। গাড়ির ভাড়া, তাও বাড়িয়েছেন। দু পয়সা থেকে দু আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি। রাজমিস্ত্রীর মাইনে বেড়েছে একেবারে চার আনা—ছ আনা থেকে দশ আনা। আবার মুরশিদাবাদ বেলডাঙা থেকে রাজমিস্ত্রী আসছে, তাদের মাইনে বারো আনা।

গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মজুরেরা এসেছে দলে দলে। এ অঞ্চলের মধ্যে জনপদতুল্য গ্রাম—নবগ্রাম। জমিদার এইখানে বাস করেন—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্তবাবু, সরকার-বংশীয় বংশলোচনবাবু এবং আরও ছোটখাটো কয়েকজন; তাঁদের বাড়িতে তারা পালে-পার্বণে বেগার দিতে আসে; উৎসবের সমারোহে রবাহূত হয়ে এসে উৎসবক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করে উৎসবের আনন্দ; জমিদারের নির্দেশমত প্রয়োজনে মজুর খাটতেও আসে; এইখানেই অর্থশালীদের বাস, তাঁরাই মহাজন। তাঁদের কাছে অল্পস্বল্প প্রয়োজনে যেতে পারে না, যায় তাঁদের অন্দরের দরজায়, বাড়ির মেয়েরা এসব 'পেটী' মহাজনি করেন, থালা-ঘটি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেন, সুদ টাকায় মাসিক দু পয়সা থেকে চার পয়সা, অনেক ক্ষেত্রে নেপথ্যে গাই-গরু বন্ধক দেয় অর্থাৎ গরু থাকে খাতকের বাড়িতেই, সেই খাওয়ায়, পালন করে, সুদ বাবদ দুধের একটা অংশ দিতে হয়; গাই যখন দুধ বন্ধ করে তখন সুদ

চলে পয়সার চাকায়। এই নবগ্রামেই এ অঞ্চলের বাজার হাট, এখানে তারা কাপড় কিনতে আসে, হাটে ঘরের তরিতরকারি বেচতে আসে, মসলাপাতি কিনে নিয়ে যায়; দেশে আকাড়া হ'লে তারা এখানে প্রসাদের জন্ম আসে; রোগে অথবা বয়সে যারা জীর্ণ হয়, তারা এখানে নিত্য আসে ভিক্ষার জন্ম, উচ্ছিষ্টের জন্ম। কিন্তু এমন ভাবে চারিদিকের গ্রাম থেকে সকলে একসঙ্গে কখনও এই ভাবের মজুরি খাটতে আসে না। এ অঞ্চলে এমন বিপুল খরচের ক্ষেত্র কেউ কখনও খোলে নাই; এইভাবে ষোল আনা মজুরি, ষোল আনা কাজ—এ রেওয়াজ কেউ প্রবর্তন করে নাই। ইচ্ছা হয় কাজ কর, অনিচ্ছা থাকে এসো না; জবরদস্তি নাই, এমন সম্মানজনক শর্তও কখনও তারা শোনে নাই।

পুরুষেরা এসেছে টামনা-কাওড়া নিয়ে; মেয়েরা নিয়ে এসেছে ঝুড়ি বিঁড়ে। খড়ের পাকানো বিঁড়ের উপর এরই মধ্যে তারা ন্যাকড়ার ফালি জড়িয়ে মনোহর ক'রে তুলেছে পুরুষেরা টামনা-কাওড়ার বাঁট কাচভাঙা দিয়ে চেঁচে চিকন ক'রে তুলেছে।

পথের পাশে কয়েকটা গাছ। গাছগুলির তলায় বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জাতি ও দলের ছোট ছেলেমেয়েরা ব'সে আছে, খেলা করছে এবং ন্যাকড়ায়-বাঁধা খোরাবাটিতে-আনা খাবার পাহারা দিচ্ছে।

ওরা কাজ করছে, সে কাজ করার মধ্যেও যেমন একটি নতুন ধরনের শৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তেমনিই চালে-চলনেও দেখা দিয়েছে একটা নতুনতম ভাবভঙ্গী; স্বর্ণবাবুর মনে হ'ল, এটা উচ্ছৃঙ্খলতা; পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, না, এ তার চেয়েও বেশি, বেয়াদপির চাল। পুরুষগুলো হি-হি ক'রে হাসছে দাঁত মেলে, মেয়েগুলো চলছে হেলে দুলে।

স্বর্ণবাবু ঘোড়ার রাশ আবার টেনে ধরলেন। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। কে? কে? কে এই মেয়েটা?

পনরো-ষোল বছরের মেয়ে একটা। নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরি কষ্টিপাথরের বাসুদেব মূর্তির পাশে চামরধারিণী ক্ষীণকটি নিটোলদেহ দেবদাসীর মত অবয়ব; এক হাতে মাথার ঝুড়ি ধ'রে মেয়েটা ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়েছে; ওর দেহে কটিতটে ফুটে উঠেছে সেই দেবদাসীর মতই বঙ্কিম ভঙ্গিমা—সেই লাস্য। আর একজনের সঙ্গে মাথায়-বোঝাই ঝুড়ি বদল ক'রে খালি ঝুড়িটা হাতে নিয়ে সে ফিরল। কালো নিটোল মুখে বড় বড় দুটি চোখ। আঁটসাঁট-ক'রে-পরা কাপড়খানা দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে বসেছে। মাথায় কাপড় নাই মেয়েটার, ঝিউড়ি মেয়ে নিশ্চয়। মাথার চুলগুলি ভ্রমরের মত কালো এবং কোঁকড়ানো।

কে এ মেয়েটা?

পিছন থেকে সহিসটা মৃদুস্বরে বললে, ও আমাদের গাঁয়েরই। সাতকড়ে বাউরীর বুন—পরী।

হুঁ।

তাই বটে। মেয়েটা সত্যই তো চেনা। ছোট অবস্থায় দেখেছেন। দু-তিন বৎসর দেখেন নাই, সম্ভবত শ্বশুরবাড়িতে ছিল। মেয়েটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে এই দু-তিন

বৎসরের মধ্যে। ওই যে সাতকড়ের মা রয়েছে এদের মধ্যে। আরও অনেককে চিনলেন, কুলীন বাউরী, বাঁকা বাউরী, বিন্দাবন, সাতকড়ে, নকড়ে, যগন্দ, কালাচাঁদ, অটল—সব এসেছে খাটতে। গোষ্ঠবালা, সত্যদাসী, সুরধুনী, ভজুদাসী, ললিতে, গোপালীবালা, সিধুবালা, মধুমতী, ময়না—বাকি আর কেউ নাই। সব এসেছে। সামনে একসারি গাড়ি আসছে। গাড়োয়ানদের সহজে চেনা যায় না, কালিতে সর্বাঙ্গ ভ'রে গেছে। সম্ভবত কয়লা ঢালাই করছে; সাত মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশন থেকে ইঁট পোড়াবার জন্ত কয়লা ব'য়ে আনছে। ক্রমে তাদের চিনলেন স্বর্ণবাবু। পাশের মুসলমানের গ্রাম—ব্যাপারীপাড়ার অধিবাসী এরা। ব্যাপারীপাড়ার জমিদারির অংশ তাঁরই সবচেয়ে বেশি, এবং প্রতাপে তিনিই প্রায় একচ্ছত্র। এই যে, দিলদার শেখ সর্বাগ্রে! দিলদার—দিলুই ওদের মাতব্বর। দিলদারের পিছনে নাদের, তারপর গফুর, ফাজিল, ইদু, মাতাহর, ওসমান, বাহারুদ্দিন, হোসেনী—প্রত্যেককে তিনি চেনেন।

দিলু শেখ গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে, কালি-মাখা কালো মুখে সাদা দাঁত বার ক'রে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলে, সালাম হুজুর।

দিলুর পিছনে পিছনে সকলে নামল গাড়ি থেকে। গাড়ির সারিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে স্বর্ণবাবু স্তব্ধভাবে টমটমের উপর ব'সে রইলেন। ওদিকে ওরা কারা? ওই দূরে, যেখানে পাশাপাশি তিনটে প্রকাণ্ড ইঁট ভাটার সর্বাঙ্গ থেকে মাটির প্রলেপের ফাটল দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে, তার পাশেই যেখানে ইঁটের জন্ত মাটি কাটা হচ্ছে, সেখানে ইঁট-পাড়াইয়ের কাজে পারদর্শী শেখের পাড়ার হাবু শেখ, হেদায়েৎ, রহমৎ, হাফিজ, এদের তিনি ধোঁয়ার আবছায়ার মধ্যেও চিনতে পারছেন। তার পাশে? মাটির কাজে ওস্তাদ, দেবীপুরের বাগদীর দল নয়? হ্যাঁ, ওই যে, বিরাট চেহারার লোকটা নাচের ভঙ্গীতে পায়ে পায়ে মাটি ছাঁটছে, ওই তো নকুড় বাগদী।

স্বর্ণবাবুর চারিদিকে সেলাম পড়ছে, সেলামির মত।

সালাম হুজুর।

সালাম গো বাবু।

সালাম কর্তা।

সালাম।

সালাম।

সালাম হুজুর। সকালবেলা কোথা যাবেন বাবু?

সালাম মালিক। হাওয়া খেতে বেইরেছেন হুজুর?

পেনাম বাবুমাশায়।

পেনাম।

মুসলমান গাড়োয়ানদের দেখাদেখি, বাউরী হাড়ী ডোম মজুরের দল এগিয়ে এসে প্রণাম জানাচ্ছে।

একটু দূরে পাশাপাশি তিনটে লম্বা খড়ের চালা তৈরী হয়েছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মুসলমান। এই—এই কয়লার গাড়ি, এখানে, এই—এখানে ঢাল্ সব। ওখানে ওই ইঁট-খোলায় যাবে না। এইখানে—। লোকটি স্বর্ণবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।—আদাব বড়বাবু।

লোকটির আপাদমস্তক ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন স্বর্ণবাবু। এখানকার সালেবেগ মের্জা। জোতজমাসম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে, গায়ে একখানা চাদর দিয়ে, একজোড়া খসখসে বহুকালের পুরনো চটি পায়ে দিয়ে, নবগ্রামের দক্ষিণপাড়ায় আসত খাজনা দিতে, খাতকের কাছে ধান টাকা আদায়ের নালিশ নিয়ে, জমি কিনে বিক্রেতার নাম খারিজ ক'রে নিজের নামে দাখিলা নেবার আরজি নিয়ে। তার গায়ে আজ পিরান, পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো।

ভবিষ্যৎ ভাল হুজুরের-? কোথায় যাবেন ?

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে সালেবেগ ?

হেসে মের্জা বললে, গোপীবাবু অনেক ক'রে বুললেন, কাজ-কাম আমার অনেক হবে, মের্জা, তুমাকে দেখেশুনে দিতে হবে।

হুঁ। অনেক কাজ হবে, না ?

আজ্ঞা হাঁ। এলাহি কাণ্ড-কারখানা। ছ-সাত লাখ ইটা হবে। তাও আপনার পগমিল বসিয়ে, মাটি বানিয়ে বাক্স ফর্মায় পাড়াই হবে। ইস্কুল হবে, বোর্ডিং হবে—

পুকুর কাটাই হচ্ছে না ?

আজ্ঞা হাঁ।

মজা পুকুরের মধ্যে দিয়ে এই যে নালাটা চ'লে গিয়েছে, এটা থাকবে তো ?

আজ্ঞা, তা ঠিক—

সারি সারি চালার ওপাশ থেকে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন গোপীচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে সরকার-বংশীয় লচুকাকা—বংশলোচনবাবু। স্বর্ণবাবু ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিলেন।

গোপীচন্দ্র তাঁকে সম্ভাষণ জানাবার পূর্বেই ঘোড়াটা চলতে আরম্ভ করল। বংশলোচন উচ্চকণ্ঠে বললেন, আরে—আরে, স্বর্ণভূষণ যে! দাঁড়াও হে, দাঁড়াও, থাম। বলি, আজকাল কি দৃষ্টি খারাপ হয়েছে, না, দৃষ্টি আজকাল উচ্চমার্গে, মানে আকাশে চোখ তুলে চলছে ? মাটির মনুষ্যকে দেখতেই পাও না ?

স্বর্ণবাবু টেনে ধরলেন একটা রাশ, ঘোড়াটার মুখ বেঁকে গেল, সে ঘুরল গাড়ি নিয়ে। তিনি হেসে বললেন, তুমি এখানে লচুকাকা ? ঘোড়ার রাশ সহিসের হাতে দিয়ে তিনি নামলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, এস এস। লচুকাকা এসেছিলেন এই ইস্কুলের সব ব্যবস্থা দেখতে। তোমরা সকলে না এলে, আমি একা কি করব বল ? দশজনের কাজ—

লচুকাকা বললেন, নিশ্চয়। 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। তা

আমাদের এ গ্রামে তো দশের সে প্রবৃত্তি নাই। হিংসা—হিংসা—হিংসা—কেবল হিংসা! পুড়ে খাক হয়ে গেল সব।

স্বর্ণবাবু গোঁফের সঙ্গে আবার টিকিতে পাক দিতে শুরু করলেন, হেসে বললেন, তুমি পণ্ডিত লোক লচুকাকা। ঠিক ধরেছ।

বংশলোচন বললেন, বাবু আমাদের চিমটি কাটতে সিদ্ধহস্ত! স্বর্ণ, তুমি ভাল ক'রে নখ কেটো বাবা।

স্বর্ণবাবু বললেন, গুরুর দিব্যি লচুকাকা, এ যদি তোমার চিমটি মনে হয় তো নখ আমার নয়, এ নখ আমাদের রাধাকান্তদাদার। আমি তো এত শাস্ত্র-টাস্ত্রের ধার ধারি না, তুমি জান। রাধাকান্তদাদাই সেদিন বললে—পণ্ডিতের লক্ষণই হ'ল, স্বর্ণ, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু', সমস্ত জগৎকেই তারা নিজের মত দেখে।

বংশলোচন বললেন, তার মানে, হিংসে আমারই! তাই আমি দুনিয়া-জোড়া কেবল হিংসেই দেখছি! তা বেশ, উত্তম কথা। কিন্তু তুমি এমন ক'রে পলায়ন করছিলে কেন? তোমার পালানো দেখে আমার রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা মনে প'ড়ে গেল। রামের বাণে রাবণের মুকুট কাটা গেলে রাবণ অমনই ক'রে পালিয়েছিল।

সেইজন্যেই বুঝি তুমি লাফ দিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করছিলে?

বা—বা—বা! বলিহরি—বলিহরি—বলিহরি! এই না হ'লে আক্কেল! কাকাকে তো হনুমানই বলতে হয়!

গোপীচন্দ্র মনে মনে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন না এমন নয়, কিন্তু তবু তিনি অস্বস্তিও অনুভব করছিলেন। এই নবগ্রাম-সমাজের শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যেই তাঁর জীবন গণ্ডিবদ্ধ নয়, নবগ্রামের বাইরে সুবিস্তৃত দেশব্যাপী ক্ষেত্রে তিনি ঘোরাফেরা করেন; ব্যবসাসূত্রে দেশ থেকে দেশান্তরে,—ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা ইংলণ্ড পর্যন্ত তাঁর জীবনক্ষেত্র পরোক্ষভাবে প্রসারিত। এই ধারার বক্রোক্তির মধ্যে তাঁর নবগ্রাম-সমাজ-পীড়িত মন তৃপ্তিলাভ করলেও তাঁর বৃহত্তর জীবন এবং মানসিকতা এতে অস্বস্তি বোধ না ক'রে পারলে না। গোপীচন্দ্র উভয়ের মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, এস এস ভাই স্বর্ণ। আসুন লচুকাকা, ইস্কুলের জায়গাটা আর প্ল্যানটা স্বর্ণ-ভায়াকে দেখাই। ওসব কথা মজলিসে ব'সে হবে। পথের মধ্যে—দশজন ইতর শুনবে, ওরা আবার গিয়ে এই নিয়ে পাঁচ কথা কইবে।

স্বর্ণবাবু বললেন, আজ থাক্ দাদা। আজ আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে। নেহাত লচুকাকা পেছনে কামড় দিয়ে ডাকলে—

বংশলোচন বললেন, লচুকাকার পেছনে কামড়ানো অভ্যেস নাই হে, লচুকাকা কুকুর নয়। পেছন ফিরে পালাচ্ছিলে, পেছনে হাত দিয়ে ডাকলাম, তা পশ্চাদ্‌ভাগে যে তোমার ঘা আছে, সে আমি কি ক'রে জানব?

স্বর্ণবাবু ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গোপীচন্দ্রকে বললেন, আচ্ছা, আমি চলি এখন গোপীদা।

বংশলোচন ছাড়লেন না, প্রশ্ন করলেন, যাবে কোথায় শুনি? যাবে তো বাড়ি, তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? এসেছিলে তো কাণ্ডকারখানা দেখতে, তা দেখেই যাও ভাল ক'রে।

নিজেকে সংযত ক'রে স্বর্ণবাবু বললেন, সিদ্ধিলাভ করে করলে বল দেখি? মানুষের মুখ দেখেই সব ব'লে দিচ্ছ দেখছি! আমি কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি না। যাব মামুদপুর স্টেশন।

মামুদপুর স্টেশন? কোথায় যাবে? মালপত্র কই?

এই দেখ। স্টেশনে গেলেই যে আমাকে কোথাও যেতে হবে, তার মানে কি? কেউ আসতেও তো পারে!

সে তো গাড়ি পাঠালেই পারতে, এমন কে লাটসাহেব আসছেন যে, স্বয়ং হুজুর চলেছেন আগু বাড়িয়ে আনতে?

স্বর্ণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, লাটসাহেবকে আনতে যাচ্ছি না, লাটসাহেবের কাছে তার করতে যাচ্ছি। এই 'লড়িয়া' পুকুর কাটানো হচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে যে নালা রয়েছে, সে বন্ধ হ'লে অনেক জমির চিরস্থায়ী ক্ষতি হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, ন্যায্য সিচ আমি বজায় রাখব স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণ বললেন, তা ছাড়া, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা এই ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়াতে আমাদের আপত্তি আছে, তাও জানাব।

তোমাদের মানে? তুমি আর কে কে হে? রাধাকান্ত?

রাধাকান্তের কথা ব্রজবাসীরা, মানে, বৈষ্ণবেরা জানেন। তার অর্ধেক কথা আমি বুঝতেই পারি না, বরং তুমি পার; কারণ তোমার বৈষ্ণব মন্ত্র। 'ক' বলতে কেষ্ট মনে প'ড়ে তোমার চোখে জল আসে দেখতে পাই। গ্রামে রাধাকান্ত ছাড়াও লোক আছে লচুকাকা।

স্বর্ণবাবু গাড়িতে উঠে ঘোড়ার পিঠে শিথিল রাশের আছাড় দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন। পিছনের সহিসটা লাফিয়ে উঠে বসল। গাড়িটা মসৃণ গতিতে বেরিয়ে গেল।

* * *

পাকা সড়কের ধারেই ইস্কুলের বনিয়াদ কাটা হচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে দেখবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করলেন স্বর্ণবাবু। চলন্ত গাড়ি থেকেই দেখলেন। বড় ইমারৎ হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে তিনি পারলেন না। মনে মনে নিজের ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ ক'রে বললেন, মা, তোমার পূজায় তো এতটুকু অঙ্গহানি আমি করি না। জীবনে তো কোনদিন তোমায় স্মরণ না ক'রে জলগ্রহণ করি না! তবে?

সবই ভাগ্য। মনে হ'ল, রাধাকান্তদা প্রায়ই বলেন, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। বিদ্যা, পুরুষকার—সবাই হার মানে ভাগ্যের কাছে। পুরাণে আছে, শ্রীবৎস রাজার হাতের পোড়া শোলমাছ জীবন্ত হয়ে জলে পালিয়েছিল। শনিপূজার ব্রতকথায় আরও বিচিত্র কথা রয়েছে, কাঠের ময়ূরে সোনার হার গিলে ফেলেছিল, যার জন্যে রাণীকে পেতে হয়েছিল চোর অপবাদ, আশ্রয়চ্যুত হতে হয়েছিল। তাঁর নিজের কোষ্ঠীর কথা মনে হ'ল। পাপগ্রহের দশা চলছে

এখন। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আসবার কথা আছে। ত্রিপাপের বৎসর আসবে। গোপীচন্দ্রের কোষ্ঠীর কথা তিনি শুনেছেন। শনি এবং মঙ্গল তুঙ্গি আছে গোপীচন্দ্রের। পাপগ্রহের সাহায্যে গোপীচন্দ্রের এই বৃদ্ধি। তা হোক। যত পাপ সহায়তা করুক গোপীচন্দ্রের এবং তাঁর নিজের সময় যত খারাপই হোক, তিনি কাপুরুষের মত ঘরে ব'সে বৃথা আক্ষেপ করতে পারবেন না। বাধা তিনি দেবেনই। যে দিক থেকে হোক, যেমন ভাবে হোক, বাধা দিতেই হবে।

ছয়

"ভাগ্যকে মানিলে কোন কথাই থাকে না, শাস্ত্রেই নির্দেশ আছে 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্'। ভাগ্য এখানে বিধাতার অভিপ্রায়, মহাবীর কর্ণের সকল পুরুষকার, সকল তপস্যা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। একালে ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় জাগিয়াছে। অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির মুখেই এ কথা শুনিতে পাই। আমি সৌভাগ্যহীন, পুরুষকার আমার বলবান নয়, ইংরাজী-বিদ্যাও আমি অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং আমার ভাগ্যে বিশ্বাস না-করিয়া গত্যন্তর কোথায়? স্বর্ণও ভাগ্য মানে, ইংরাজী-বিদ্যা সে আমাপেক্ষাও কম জানে, তাহার পুরুষকারের শক্তি কতখানি তাহা আমি জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাহার পুরুষকারের দম্ভের পরিমাণ অতি প্রবল। সেই কারণেই আমি তাহার জন্য শঙ্কিত হইয়াছি যে, তাহার সংকল্প তো সিদ্ধ হইবেই না, উপরন্তু সে সংসারে উপহাসের পাত্রে পরিণত হইবে। হয়তো কাল তাহার এই বিরোধিতার জন্য তাহার নামে ও জীবনে কালি লেপন করিয়া দিবেন। গোপীচন্দ্রের এই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগে কোন বাধাই কার্যকরী হইতে পারে না। কারণ ইহা কালের অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হইতেছে।"

বৈঠকখানার সামনে বাগানের মধ্যে একটি বেদীর উপর ব'সে রাধাকান্ত নিজের ডায়রি লিখছিলেন। কলম থামিয়ে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ঠিক এই সময়েই সাজি এবং আঁকশি হাতে এসে বাগানে ঢুকলেন সন্তোষ মুখুজ্জে—স্বর্ণবাবুর ভগ্নীপতি। ছোটখাটো মানুষ, সোনার মত সুগৌর গায়ের রঙ, কাঁচা-পাকা চুল, সৌম্য সুদর্শন ব্যক্তি। রাধাকান্ত মধ্যে মধ্যে বলেন, নামটা আপনার চেহারার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে মুখুজ্জে।

মুখুজ্জে হাসেন, রাধাকান্ত এর পর কি বলবেন, তিনি তা জানেন। রাধাকান্ত বলবেন, সন্তোষ না হয়ে প্রসন্ন হ'লেই নির্ভুল নিখুঁত হ'ত। প্রসন্নবাবু কে?—এ প্রশ্ন কেউ করলে অনায়াসে বলা যেত, চেহারা দেখে বেছে নাও।

সন্তোষ মুখুজ্জে আজ বাগানে ঢুকেই বললেন, জয় রাধাকান্ত!

রাধাকান্ত মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আসুন আসুন, অন্তরে আসন গ্রহণ করুন।

মুখুজ্জে বললেন, বাঁড়ুজ্জে, ধনকামী যশোকামী প্রতিষ্ঠাকামী সর্ববিধ কামীর অন্তরে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ আমার প্রকৃতি শীতল, কামীর অন্তর উত্তপ্ত—সেই হেতু

ওখানে প্রবেশমাত্র আমার বিলুপ্তি ঘটে।

তারপর একটু হেসে বললেন, রাধাকান্তবাবু, যদি বা কোন কালে আপনার অন্তরে সন্তোষের সংস্থান হয়ও, স্বর্ণের আশা নাই।

রাধাকান্ত এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। সন্তোষ মুখুজ্জে কুলীন-সন্তান, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশধর। স্বর্ণের বাবা কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, কুলীন। মেয়েদের বিবাহ দিয়ে তিনি জামাতাদের ঘরে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, প্রত্যেককে বাড়িতে দুখানি হিসাবে ঘর, কিছু জমি, কিছু জমিদারির মুনাফা, পুকুর প্রভৃতিতে কিছু অংশ দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে শরিক ক'রে দিয়ে গেছেন। অন্যথায় এই সব কুলীনসন্তান জামাতারা এখানে থাকবেন কেন? বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কাল—একালে এখনও সমাজে পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় কুল-বিচারে। দুষ্কুল হতে কন্যা আনতে দোষ নাই। কিন্তু কৌলীন্যমর্যাদাহীন পুরুষ সম্পদ শিক্ষা স্বাস্থ্য রূপ সমস্ত থাকতেও সুপাত্র ব'লে গণ্য হয় না। প্রতি কালেরই এক-একটি জীবনবোধ বা দর্শন আছে, সেই অনুযায়ীই সাধারণ মানুষ চলে, সমাজপতিরা সেই দর্শনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আদর্শ স্থাপন ক'রে এই কালধর্মকে সনাতন মানবধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সমাজে বরণীয় এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবার চেষ্টা করেন। স্বর্ণের বাপও তাই ক'রে গেছেন, লোকে আজও তাঁর নাম স্মরণ ক'রে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার ক'রে, কিন্তু সম্পত্তির অংশীদার হিসাবে সন্তোষবাবু এবং স্বর্ণবাবু পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন নন। এই কারণেই রাধাকান্ত সন্তোষ মুখুজ্জের এ মন্তব্যের উত্তরে নীরব হয়ে রইলেন। মুখুজ্জে ফুল তুলতে তুলতেই কথা বলছিলেন, কথার কোন জবাব না পাওয়ায় তিনি মুখ তুলে রাধাকান্তের দিকে তাকালেন, তাকিয়েই বুঝতে পারলেন রাধাকান্তের মনোভাব। ফুল তোলা বন্ধ ক'রে তিনি ধীরে ধীরে এসে সাজি আঁকশি নামিয়ে রাধাকান্তের পাশে ব'সে বললেন, ও একটা পাষণ্ড রাধাকান্তবাবু—মহাপাষণ্ড। জান, গোপীচন্দ্রবাবু হাই-ইস্কুল করছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে খাতির করে শেকহ্যাণ্ড করেছে, সামনে চেয়ারে বসতে বলেছে, এর জন্য লোকটা হিংসায় ফেটে যাচ্ছে! প্রতি রাত্রে মদ্যপান ক'রে যা চীৎকার আর গালাগাল করছে, সে কি বলব তোমাকে!

কাকে? গোপীচন্দ্রকে?

না। সে সাহস কোথায়? বাড়ির লোককে, চাকর-বাকরকে, আমাকে তোমাকে। কাল নাসের শেখ চাপরাসীর টুঁটি টিপে ধ'রে সে এক কাণ্ড!

নাসের শেখ চাপরাসীর গলা টিপে ধরেছিল? কেন?

মদ্যপান ক'রে অক্ষম হিংসায় মানুষ দেওয়ালে মাথা ঠোকে রাধাকান্তবাবু।

আপনি বলছেন—শুধু শুধু; কোন কথাবার্তা নাই—স্বর্ণ মদ খেয়ে হঠাৎ নাসেরের গলা টিপে ধরলে?

না, ঠিক তা নয়। একটু কথা ছিল। স্বর্ণভূষণ হুকুম দিয়েছিল নাসের শেখকে যে, মজুর লাগিয়ে গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকে যে রাস্তাটা ইস্কুলডাঙার দিকে গেছে, ওই রাস্তার

পাশে স্বর্ণবাবুর যে সব জমি রয়েছে সেই সব জমির পাশে কোঁড়াকাঁটার গাছের বেড়া লাগাতে। মানে বুঝেছ? ওই কোঁড়ার গাছগুলি ঝাড় বাঁধলে রাস্তাটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। নাসের হুকুম তামিল করতে গিয়েছিল, কিন্তু—। হাসলেন সন্তোষ মুখুজ্জে।

কিন্তু কি? গোপীচন্দ্র উঠিয়ে দিয়েছেন?

উঠিয়ে দিতে চাইলেও নাসের কোথাও থেকে ওঠে না, ওকে জখম অবস্থায় উঠিয়ে আনতে হয়। গোপীচন্দ্র এখানে নেই। তিনি কাল রাত্রে কলকাতা গেছেন। তিনি থাকলে হয়তো তাই হ'ত।

তবে?

বেচারা নাসের নিজে থেকেই উঠে এসেছে। কতকগুলি ছেলে গিয়েছিল ইস্কুলের আয়োজন দেখতে। ইঁট পুড়ছে, পুকুর কাটানো হচ্ছে—ছেলেরা এখন ওখানেই যায় সকালে বিকেলে। ছেলেরা রাস্তার ধারে কোঁড়াগাছ লাগাতে দেখে নাসেরকে বলে, এ কি হচ্ছে শেখজী?

* *

দশ-বারোটি বারো-তেরো বছরের বয়সের ছেলে। তিন-চারটি আরও অল্পবয়সী ছেলেও ছিল। রাধাকান্তের ছেলে গৌরীও এদের মধ্যে একজন। গ্রাম থেকে বেরিয়েই হাত চারেক চওড়া একটি গোপথ। এক পাশে পর-পর তিনটি পুকুর, অন্য পাশে জমি। এই গোপথটিকে প্রশস্ত এবং উঁচু ক'রে তৈরি করবার কল্পনা করেছেন গোপীচন্দ্র। এ দিক দিয়ে ইস্কুল গ্রামের খুব কাছেই হবে। অন্যথায় গোটা গ্রাম ঘুরে যাওয়া-আসা করতে হবে। তা ছাড়া তাঁর নিজের সমস্যা আরও জটিল। গ্রামের প্রায় সকলেই এখানে পদাতিক। যে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন আছেন, তাঁরা বিশেষ উপলক্ষে কোথাও যেতে হ'লে যান পালকিতে; এবং পূর্বকাল থেকে তাঁরা গ্রামের মধ্যবর্তী প্রধান রাস্তাটির সম্মুখ ভাগ দখল ক'রে ব'সে আছেন। সদর রাস্তা থেকে গোপীচন্দ্রের বসতবাড়িতে আসতে হ'লে আসতে হয় একটি দীর্ঘ গলিপথ ধ'রে। এই গোপথটি কিন্তু একেবারে গোপীচন্দ্রের অন্দরের পশ্চিম দিকের দরজায় এসে পৌঁচেছে। সেই হিসাবে এ পথটি তৈরি হ'লে তাঁর জুড়ি, কি টমটম, একেবারে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতে পারবে। গোপীচন্দ্রের মনে কোন্ হিসাবের গুরুত্ব বেশি সে তথ্য তিনিও হয়তো সঠিক বলতে পারবেন না, কিন্তু এ রাস্তাটি ভাল ক'রে তৈরি করবার অভিপ্রায়ের প্রেরণার মূলে যে দুটি উদ্দেশ্যই আছে—এ কথা নিঃসন্দেহ। স্বর্ণবাবু দুই উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। নাসের শেখ এটুকু জানত না। সে জানত, গোপথের পাশের জমির ধান গরুতে খায়, অপচয় করে, সেই হেতু গরু ছাগল আটকাবার জন্য বেড়া দেওয়ার হুকুম হয়েছে। কোঁড়াকাঁটার গাছ গরু, ছাগল খায় না, কেয়াফুলের পাতার মত গড়ন, অথচ কেয়াপাতার চেয়ে অনেক বেশি চওড়া ও মোটা পাতা এবং গাছগুলির তেমনি কি জীবনশক্তি! মাটিতে ফেলে রাখলেও সেই অবস্থাতেই সে মাটির

মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে বাঁচে এবং বাড়ে। এ ছাড়া কোঁঙাগাছের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ; কেয়াগাছের তলায় সাপ বাসা বাঁধে, সেটা কেয়াফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নয়, এই জাতীয় গাছের মূলের আশে-পাশে মাটি এমনি ফোঁপরা হয় যে, সাপ পায় তৈরি-করা ঘর, মাঠের সাপ এখান ওখান থেকে এসে কোঁঙাগাছের বনের মধ্যে প্রায় উপনিবেশ স্থাপন ক'রে ফেলে। জন্তু জানোয়ার জন্মগত বোধ দিয়ে এ তথ্য জানে, তাই কোঁঙা দেখলে সে পথে তারা হাঁটে না। নাসের ভেবেছিল, কোঁঙাগাছ লাগিয়ে বাবু গোপথের খানিকটা অংশ এই ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ আত্মসাতের সুযোগ নেবেন। সে কোঁঙার গাছ লাগানো শুরু করিয়ে পরমানন্দে গাছতলায় ব'সে একখানা পাকা বাঁশের মোটা কঞ্চি ছুরি দিয়ে কেটে ছড়ি তৈরির কাজে নিমগ্ন ছিল। ছেলেদের দলটি ইস্কুলভাঙা অভিমুখে বেরিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তাটি ইতিমধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তার উপর কাঁটাগাছ স্তূপীকৃত হয়ে রাস্তার উপর প'ড়ে রয়েছে, শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করবার মত আয়োজনও রয়েছে। লোকজন, কীট-পতঙ্গ, পতঙ্গভুক পাখির দল উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা দাঁড়িয়ে গেল।

একজন বললেন, এ কি হচ্ছে শেখজী ?

নাসের মুখ না তুলেই বললে, দেখতে পাছ না কি হছে ? বেড়া—বেড়া হছে।

কেন ? বেড়া দেবে কেন ?

বুড়ো নাসের ছেলেদের বড় ভালবাসে, সে হেসে বললে, ছড়া জানছ না ? আঁা ? কি রকম তোমরা ?

কি ছড়া ?

আমার গল্প ফুরাল, নটেগাছটি মুড়াল। হাঁ নটে, তুই মুড়ালি ক্যানে ? তোর গরুতে খায় কেনে ? নাসের হেসে বললে, গরুতে ধান খায় ক্যানে ? নাসের গম্ভীর রসিক ব্যক্তির মত অতি মৃদু হেসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুখুজ্জেদের খোকা—কিশোরের খুড়তুত ভাই, সে খুব আইনজ্ঞ এবং তার্কিক। সে বললে, বারে বাঃ। গরুতে ধান খায় তো আমরা কি করব ?

নাসের বললে, তোমরা খুদি পিঁপড়া মার গিয়া। পিঁপড়াতে না কামড়ালি পরেই আর ছাওয়ালে কাঁদবে না। ছাওয়াল না কাঁদলি পরেই বউয়েরা ভাত রাঁধবে। রাখালকে ভাত দিবে। ভাত পালি পরেই রাখালে গরু আগুলি রাখবে। তা হ'লেই আর গরুতে ধান খাবে না। তা হ'লেই আমরা বেড়া কেটে দিব।

খোকা বললে, ওসব আমরা শুনব না। আমরা যাব কোন্ দিকে ?

যাবা কোন্ দিকে ? ভালা বিপদ, এ গোনে তুমরা যাবা কোথা ? এ পথে তো গরুতে যায় ঘাস খেতে !

আমরা ওই ডাঙায় যাব। ইস্কুলের ইঁট-পোড়া দেখতে।

হুঁ। তা পথ থেকে এখন সরায়ে দিছি কাঁটা।

এখন সরিয়ে দিলেই তো হবে না শেখজী। এই পথেই তো এর পর ছেলেরা দিন দুবেলা

হাঁটবে, ইস্কুলে যাবে পড়তে।

নাসের মুখ তুলে তাকালে, প্রসন্ন হাসি হেসে সেলাম ক'রে বললে, কিশোরবাবু! সালাম গো!

কিশোর কখন এর মধ্যে ছেলেদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও যাচ্ছিল ওই ইস্কুল-ডাঙার দিকে। ওখানে আজ বড় ছেলের দল একটা ফুটবল ক্লাবের পত্তন করবে।

কিশোর বললে, বেড়া দেবে দাও। গরুতে ধান খায়, বেড়া দিতে কে বারণ করবে? কিন্তু কোঁড়ার বেড়া দিলে যে দু বছরের মধ্যেই রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যাবে শেখজী। তার উপর হবে সাপের উপদ্রব। ছোট ছেলেরা ইস্কুলে যাবে, যদি কাউকে কামড়ায়, তবে কি হবে বল তো?

নাসের হাতের কলকেটা ফেলে দিয়ে শিউরে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইটা তো বাবু খেয়াল করে নাই কিশোরবাবু। ঠিক বলেছেন আপনি। হাঁ, ঠিক বলেছেন। তা—া সে খানিকটা ভাবলে, বাবুর কাছে গিয়ে কথাটা ব'লে হুকুম নিয়ে আসবে? কিন্তু নাসের তো জানে, কথাটা শুনে বাবু কি বলবেন! বলবেন, বুড়ো হ'লু নাসের, ভুল না হয় আমার হয়েছিল, কথাটা না হয় আমার খেয়ালে আসে নি ; কিন্তু তুমি কি ব'লে ছেলেদের কাছে কথাটা শুনেও বুঝেও সেই কোঁড়ার বেড়াই লাগিয়ে এলে? আরে, আমার ছাওয়ালও তো যাবে ইস্কুল! ছি-ছি-ছি! যাও এখন, যা হয়েছে হয়েছে, আবার ওগুলো তুলে ফেলে অন্য বেড়া লাগিয়ে দাও গিয়ে। কি, হয়তো বলবেন, না, কোন বেড়া লাগিয়েই কাজ নাই। যে কোন গাছের বেড়া হোক না কেন, খানিকটা রাস্তা তো মরবেই তাতে, দল বেঁধে হৈ-হৈ ক'রে ছেলেদের যেতে অসুবিধে হবে।

নাসের তাকালে ইস্কুলডাঙার দিকে। খাঁ-খাঁ করছে পাঁচ সাত শো বিঘা রুক্ষ লালচে বালি-কাঁকর- মেশানো মাটির পতিত প্রান্তর। ওদিকে মানুষ বড় একটা যায় না। কি জন্য যাবে? গোপীচন্দ্রবাবু কয়লার কুঠির মালিক হয়ে লাখে লাখে টাকা রোজগার ক'রে আবাদী জমি কিনতে না পেয়ে ওই পতিত ডাঙাই কিনেছেন। ভেবেছিলেন, ওই ডাঙা ভেঙেই জমি তৈরি করবেন। কিন্তু সে হবে কেন? প'ড়েই আছে। ওই যে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়কের ধারে, ওই গাছটাকে বলে 'মড়া-গাছানের গাছ'। নবগ্রামের পশ্চিম অঞ্চল থেকে যে সব হিন্দুর মড়া গঙ্গায় উদ্ধারণপুরের ঘাটে যায়, তারা নবগ্রাম পর্যন্ত এসে বিশ্রাম করে, গাছের ডালে মড়া বেঁধে রাখে, নিচে রেঁধে-বেড়ে খায়। তারপর গ্রামের বাইরে বাইরে চ'লে গিয়ে আবার সড়ক ধ'রে চ'লে যায় উদ্ধারণপুর। ওই গাছটা থেকে খানিকটা পশ্চিমে মুসলমানদের কবরস্থান। ব্যাপারীপাড়া, ছোট গোগা প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদের ওইখানে কবর দেওয়া হয়। ওই খাঁ-খাঁ-করা শ্মশান কবরস্থান পাকা ইমারতে সেজে হেসে উঠবে, কত ছেলে আসবে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, তাদের কলকলিতে মনে হবে আশেপাশেই কোনখানে বর্ষার ভরা দরিয়া ব'য়ে যাচ্ছে—কলকল খলখল শব্দ ক'রে। নাসেরের মনে পড়ল, স্বর্ণবাবুর বাবা যখন মাইনর ইস্কুল করেন তখনকার কথা। গ্রামের শেষ সীমানায় আবাদী জমির উপর কাঁচা ইমারত

বানিয়ে ইস্কুল হ'ল। তখন নবগ্রাম থেকে দক্ষিণ দিকে একটা সরু খালপথ ছিল, পথটা দক্ষিণের গ্রাম মন্তলী কাদপুর, সেখান থেকে নদী পেরিয়ে মেলানপুর শাওড়াপুর মোটর চ'লে গিয়েছিল। দিনে দু-চার জনের বেশি লোক হাঁটত না। কি জন্ম হাঁটবে? নেহাত বাজারে আসবার না হ'লে কেউ নবগ্রাম আসে না। কিন্তু যেই মাইনর স্কুলটা হ'ল, অমনি কাদপুর মন্তলী থেকে ছেলে স্কুলে আসতে শুরু করলে। প্রথম দু জন, তিন জন; তারপর পাঁচ-সাত জন; তারপর দশ-বারো-পনেরো জন। পনেরো জনের ত্রিশখানা পা দু বেলায় ষাটখানা হয়ে সরু খালপথের ঘাস কাঁটা ঘুচিয়ে চমৎকার চোখ-জুড়ানো চওড়া খালপথে পরিণত করছে। এই যে গোপথ, যে পথের অবস্থা এখন খানা-খন্দকে ভরা, এই পথ ওই ছাওয়ালদের পায়ে পায়ে পাকা সড়কে পরিণত হবে। চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে নাসের। পথের উপর ছাওয়ালদের কচি পায়ের ছাপ আলপনার মত ফুটে উঠছে। স্বর্ণবাবুর ছেলে—একমাত্র সন্তান—সে নাসেরের খুব প্রিয়। তাকে নিয়ে নাসের অনেক কল্পনা করে। স্বর্ণবাবু নাসেরের চেয়ে বয়সে ছোট। স্বর্ণবাবুর বাপের আমলের লোক নাসের, স্বর্ণবাবুকে সে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করে। স্বর্ণবাবুর বাপের আমলে নাসেরের মনিব-বাড়িই ছিল এ গ্রামের প্রধান বাড়ি, নাসের বলত—বড় বাড়ি। সে বাড়ির অহঙ্কারের সেও ছিল অংশীদার। এখন গোপীবাবু তার মনিব-বাড়ির সে প্রাধান্য খর্ব করেছে, তাতে নাসেরও মনে মনে বেদনা অনুভব করে। একলা ব'সে থাকে যখন, তখন সে এই সব কথা ভাবে,—ভাবে, কেমন ক'রে আবার তার মনিব-বাড়ি প্রধান হয়ে উঠবে। গোপীচন্দ্রের বিপুল সম্পদের প্রত্যক্ষ পরিচয়—হাটে বাজারে শোনা গল্প তার কল্পনাকে উপহাস করে, মধ্যে মধ্যে সে চমকে ওঠে, মনে হয়, গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে রাজার পোশাক প'রে মাথায় তাজ প'রে হা-হা ক'রে হাসছে। নাসেরের মনের কথা বুঝতে পেরেই তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। কোন ক্রমেই সে স্বর্ণবাবুর ছেলে—তার পরম আদরের খোকাবাবু সম্পর্কে এমন কল্পনা করতে পারে নি, যাতে গোপীচন্দ্রের ছেলের ওই হাসি থেমে যায়। সম্প্রতি সে গিয়েছিল সদরে একটা ফৌজদারী মামলায় ডেপুটি-আদালতে সাক্ষী দিতে। স্বর্ণবাবু এবং গোপীবাবুর মধ্যেই মামলা। আদালতে গিয়ে ডেপুটিকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণবাবুর পুরনো উকিলের ছেলে ডেপুটি হয়ে এজলাসে ব'সে আছে। উকিল-বাবু নিতান্ত ছোট উকিল। তার ছেলে কত খাতির করত স্বর্ণবাবুকে। স্বর্ণবাবু যখন তাদের বাসায় যেতেন, তখন ওই ছাওয়ালটি টেনে চেয়ার এগিয়ে দিত, বাড়ির ভিতর বাপকে খবর দিতে ছুটত, চাকর হাজির না থাকলে ঘটিতে গাড়ুতে জল এনে দিত। সেই ছেলে ডেপুটি হয়ে ব'সে আছে, গোপীবাবুর বড় ছেলে তাকে সেলাম করলে, 'হুজুর' ব'লে কথা বললে। অবাক হয়ে গেল নাসের। কি গুণে এত বড়ঘরনা ছেলে থাকতে ওই ছেঁড়া-চাপকান উকিলবাবুর ছেলে ডিপুটি হ'ল তার কারণ সন্ধান ক'রে জানতে পারলে, ছাওয়ালটা লিখাপড়াতে বড় তেজী ছিল। সব পরীক্ষায় নাকি ফাষ্টো হয়েছে। পাঁচ-পাঁচটা পরীক্ষা দিয়েছে। তাই আংরেজ সরকার তরফে লাটসাহেব তাকে ডেকে তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে ডিপটি হাকিম করিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে নাসেরের হতাশ কল্পনার মাটিতে লুটিয়ে

পড়া লতা একটা শক্ত আশ্রয় পেয়েছে, সেই আশ্রয় জড়িয়ে ওপরে ওঠে। স্বর্ণবাবুর ছাওয়াল খুব লিখাপড়া শিখবে, ডিপটি হাকিম হবে।

সেও তো যাবে এই পথে ওই ইস্কুলে।

নাসের আর দ্বিধা করলে না। মজুরদের হুকুম দিলে, উঠায়ে দে বাবা, কৌঙাকাঁটার গাছ উঠায়ে দে।

উঠায়ে দিব?

হাঁ হাঁ হাঁ। খোকাবাবুরা ইস্কুলে যাবে এই পথে। এই পথের ধারে কৌঙা পুঁতলে রাস্তা মেরে দিবে, রাক্ষুসে গাছে সাপ হবে। দে, তুলে দে।

স্বর্ণবাবু রাত্রে এই কথা শুনে পাগল হয়ে গেলেন ক্রোধে। মদ্যপান করেছিলেন, নেশায় এবং ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে নাসেরের গলা টিপে ধরলেন।

নাসেরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে তো স্বর্ণবাবুকে ছেলেবেলা থেকে জানে। সে জানে, স্বর্ণবাবু মদ্যপান করেন; সে জানে, স্বর্ণবাবুর আরও অনেক দোষ আছে, কিন্তু স্বর্ণবাবু তো কখনও এমন কোন ছোট কাম করেন না, যাতে লোকের কাছে মাথা হেঁট হয়। এমন কোন কাম করেন না, যাতে দশজনের অনিষ্ট হয়, অসুবিধা হয়।

শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল তার। মনিবের হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে দেওয়া বেআদপি, তবু না ছাড়লে মরতে হবে তাকে, জ্ঞানহীন স্বর্ণবাবু তাকে খুন ক'রে ফেলবেন। নাসের তার লোহার মত শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে স্বর্ণবাবুর দুই হাতের কব্জীতে চেপে ধ'রে টেনে ছাড়িয়ে দিলে। তারপর সেলাম ক'রে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

* * *

সন্তোষবাবু বললেন, বল তো রাধাকান্তবাবু. এর পরও কি মনে কোনও সন্দেহ থাকে যে, স্বর্ণের অন্তরে সন্তোষ কোনকালে আসবে?

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

সন্তোষবাবু একটু হাসলেন। বললেন, তুমি হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'লে রাধাকান্ত। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা কথা আমি বলি নি।

রাধাকান্ত এবার বললেন, মুখুজ্জে, আমি আপনার উপর রাগ করি নি ভাই। আমি অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি ঠিক নয়, মনে মনে অনুভব করছি।

সন্তোষবাবুও একটু ভাবুক লোক, রাধাকান্তের ভাবপ্রবণতা তাঁর ভাল লাগে। তবুও রাধাকান্ত যতখানি আবেগ প্রকাশ করেন তাঁর ভাবুকতা প্রকাশের মধ্যে, ততখানি তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ভগ্নীপতি হিসাবে রহস্যও ক'রে থাকেন এজন্য। আজও রহস্য ক'রে বললেন, কি? বল তো শুনি।

রাধাকান্ত বললেন, স্পষ্ট অনুভব করছি মুখুজ্জে, কাল আমরা গণনা করি দিনরাত্রির হিসাবে। সে কালের একটা রূপ বটে। গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে বসন্তে—এ কাল

পৃথিবীর কাল, জড় প্রকৃতির কাল। মানুষের মধ্যে কালের আর একটা রূপ আছে, আর একটা প্রকাশ আছে। কালের অভিপ্রায়ই বল আর নূতন রূপই বল, সেটা মানুষের মনের রূপের মধ্যেই নব নব ভাবে কালান্তরে প্রকাশ পায়; তাতে বাধা দেওয়া যায় না। এই ইস্কুল হওয়াটার মধ্যেই সে সত্যটা বুঝতে পারছি ভাই। নাসেরও চায় ইস্কুল হোক। নাসেরও ভাবছে, ওই ইস্কুলে পড়েই স্বর্ণের সন্তান করবে লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধার। মানুষের ভাবনাই হচ্ছে কালের নূতন রূপ। কিন্তু—

কিন্তু কি?

পরে বলব। এখন নয়। এখন সুরভিরা ডাকছে। রাধাকান্ত উঠলেন।

কতকগুলি গরু আহ্বানের সুরে ডাকছে।

এই সময় তিনি নিজে হাতে কিছু ভুষি এবং খোল খাইয়ে থাকেন। গরু বলদ তাঁকেই ডাকছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বাংলা দেশ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। মানুষের অর্থের অভাব থাকলেও, গোলায় শস্যের অভাব ছিল না, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাইয়ের অভাব ছিল না, জীবনধারণের ধারাধরন ছিল অন্য ধরনের। ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের অবসর ছিল প্রচুর; সাধারণ শ্রমিক চাষীরা তাঁদের জমি চাষ ক'রে ফসল ফলিয়ে মাথায় ব'য়ে তুলে দিত মালিকের বাড়িতে; দেশাচারপ্রচলিত তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে যেত নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ, একমাত্র চাষের কাজেই আবদ্ধ বললে ভুল হবে না। কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়ার অর্থই ছিল, আসামের চা-বাগানের কুলী হিসাবে চালান যাওয়া। তার অর্থ কালান্তক জ্বরে অথবা সাহেবের বুটের লাথিতে পিলে ফেটে অবধারিত মৃত্যু। তাই কর্মান্তরহীন শ্রমিকদের শ্রমের কল্যাণে জমির মালিক গৃহস্থের ঘরে পল্লীলক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। শ্রমিকদের মধ্যে যারা দুর্বল এবং যাদের চাষের বয়স হয় নাই, তারা এদের ঘরেই করত গো-সেবা। মালিকদেরও মূল জীবিকা চাষের তত্ত্বাবধানের অল্পস্বল্প কাজের মধ্যে নিশ্চিন্ত গৃহস্থের অবসর-যাপনের বিলাস ছিল এটি। অন্য দিকে গো-সেবা শাস্ত্রানুমোদিত পুণ্যকর্মও বটে। রাধাকান্ত তাই নিজে হাতে ওদের দুবেলা কিছু কিছু খাওয়াতেন। ঘরের এক কোণেই বস্তায় খোল এবং ভুষি থাকে, একটা ডালায় তাই ভর্তি ক'রে নিয়ে রাধাকান্ত বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের খড়মের শব্দ বেজে উঠবামাত্র গরুগুলি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলে। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল রাধাকান্তের মুখে।

গরুগুলির প্রত্যেকটির নাম আছে। সবচেয়ে যেটি তাঁর প্রিয়, সেটি আকারে সবচেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে বেশী দুগ্ধবতী; প্রকৃতিতে গাইটি সবচেয়ে উগ্র। রাধাকান্ত গাইটির নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী' অর্থাৎ গোমাতা সুরভির কন্যা 'নন্দিনী,' কিন্তু রাধাকান্তের পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র গরুটির উগ্র প্রকৃতির জন্য নামকরণ করেছে 'মারহাট্টানী' অর্থাৎ মার-হট্টানী। রাধাকান্তের দেওয়া নাম ছেলের দেওয়া নামের কাছে চাপা প'ড়ে গিয়েছে। রাধাকান্ত হেসে নন্দিনীকে বলেন, কি করব বল্? গৌরীর দেওয়া নামটা তুই যে শিও

নেড়ে মাথায় তুলে নিলি। তিনি সস্নেহে তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেন, মারহাট্টানী আরামে চোখ বুজে ঘাড় তুলে নির্বোধ বড় চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্নেহ-বিগলিতা নন্দিনীর মত। মারহাট্টানীর পরেই তাঁর প্রিয় হ'ল রঙ্গিণী ব'লে গাইটি। রঙ্গিণীর গায়ের রঙটি খড় সুন্দর, তাই তার নাম রঙ্গিণী, প্রকৃতিতে রঙ্গিণী মারহাট্টানীর বিপরীত। রাধাকান্তের রাখাল প্রহ্লাদ বাউরী বলে, প্যাটের তলায় ছেলে শুইয়ে দাও ক্যানে, রাঙী নড়বে না। এ ছাড়া শ্যামলী আছে, কালী আছে, মঙ্গলা বুধি সোমেশ্বরী আছে—এদের নাম হয়েছে জন্ম-বার থেকে।

প্রহ্লাদের বড় শখ, মারহাট্টানীর গলায় ঘুঙুরের মালা পরিয়ে দেয়। মারহাট্টানী পথে চলে ঘাড় তুলে বেশ একটু প্রখর গতিতে, তাতে সে কল্পনা করে, ঘুঙুরগুলো বেশ ঝমঝম ক'রে বাজবে। প্রহ্লাদ আজও মাথা চুলকে সবিনয়ে তার আরজি পেশ করলে, মারহাট্টানীর গলায় ঘুঙুর দোব বলেছিলেন!

রাধাকান্ত হেসে বললেন, দোব।

ওদিক থেকে সন্তোষবাবু হাঁকছেন, রাধাকান্ত! ওহে রাধাকান্ত!

কি ব্যাপার?

ও মশাই!

রাধাকান্ত খোল-ভুষির ডালাটি প্রহ্লাদের হাতে দিয়ে ফিরলেন। প্রহ্লাদ পিছন থেকে বললে, আজ্ঞে বাবু, আজ নন্দ ছোঁড়া আসে নাই।

নন্দলাল গরুর রাখাল। প্রহ্লাদেরই স্বজাতি অর্থাৎ বাউরীর ছেলে।

আসে নি? কেন?

প্রহ্লাদ অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললে, আজ্ঞে—

কি?

আজ্ঞে, ইস্কুলডাঙায় নগদ পয়সার কাজ। বাবু মজুরি বাড়িয়েছেন। সেইখানেই খাটতে গিয়েছে, কাজ আর করবে না।

রাধাকান্ত কোনও উত্তর দিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ'লে এলেন। এ হ'ল আর একদিক! ভগবান মালিক! মনে প'ড়ে গেল মহাভারতের কথা। ভীষ্ম দ্রোণ শল্য সকলেই বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির যখন তাঁদের কাছে গেলেন যুদ্ধের অনুমতির জন্য, তখন তাঁরা বলেছিলেন, ধর্মরাজ, এ সংসারে অর্থ কারও অধীন নয়। সংসারই অর্থের অধীন। দুর্যোধনের অর্থের দ্বারা আমরা ক্রীত। ভীষ্ম দ্রোণ অর্থের দ্বারা ক্রীত হয়েছিলেন।

* * *

সন্তোষবাবু বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে গোপীচন্দ্রের চাকর। সাহেব অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন; ফুলদানিতে সাজাবার জন্য কিছু ফুলের প্রয়োজন। রাধাকান্তের বাগানে গোলাপফুল আছে, সেই গোলাপফুলের জন্য গোপীচন্দ্র লোক পাঠিয়েছেন। সাহেব মাত্রেই গোলাপফুল ভালবাসে।

রাধাকান্তের বাগানে ফুল প্রচুর হয়—বেল টগর জবা স্থলপদ্ম ইত্যাদি। সে সব তুলতে কারও কোন বাধা নাই। বাগানে একটি মাত্র গোলাপফুলের গাছ আছে। ওই ফুলটি রাধাকান্ত তুলতে নিষেধ করেন। বিনয় ক'রেই নিষেধ করেন। সে নিষেধ সকলে মেনেই চ'লে থাকে। মধ্যে মধ্যে শুধু সন্তোষবাবু ব্যঙ্গ ক'রে বলেন, একেই বলে নাকছাবি-মায়া।

হেসে রাধাকান্ত বলেন, অর্থাৎ ?

সে একটা মায়াবাদ। পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে গল্প বলতে হয়। ব'লেই তিনি আরম্ভ করেন।—

সে একটা চিরসত্য গল্প, বুঝেছ না রাধাকান্তবাবু, একেবারে চিরকালের সত্য। একটি মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরেছে, মহাপুণ্যবতী ; সমারোহ ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেছে। অবস্থায় যাকে বলে রাজরাণী, কাজেই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়েই নিয়ে গেছে। ওদিকে স্বর্গ থেকে বিষ্ণুদূত রথ এনেছে—বিষ্ণুলোকে নিয়ে যাবে। রাণী রথে উঠলেন, কিন্তু রথ আর আকাশে ওঠে না। কি হ'ল ? এ কি অঘটন ? এমন সময় দৈববাণী হ'ল—স্বর্ণ হ'ল পার্থিব সম্পদ, ওর ভারে রথ ভারী হয়েছে, ও না পরিত্যাগ করলে রথ শূন্যে উঠবে না। রাণী বললেন, বেশ তো। এ আর বেশি কথা কি ? খুলে ফেললেন অলঙ্কার। ফেলে দিলেন ধুলোয়, গঙ্গার গর্ভে। কঙ্কণ খুললেন, চুড় খুললেন, কণ্ঠহার খুললেন, বাজুবন্ধ খুললেন, কানের আভরণ খুললেন, কণ্ঠহার খুললেন, খুলে ফেলে উঠে বসলেন রথে। তবু রথ ওঠে না। আবার কি হ'ল ? দৈববাণী হ'ল—নাকে নাকছাবি খুলতে ভুলেছ। রাণী চমকে উঠলেন। নাকে হাত দিলেন। সত্যিই তো, ওটা খোলা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে আয়নায়-দেখা মুখের ছবি মনে পড়ল। সারথি বললেন, দেবী, ওটা খুলে ফেলুন। রাণী বললেন, বাবা, ওটার ওজন এক আনার চেয়েও কম। আমি বরং ওর ডবল ওজনের একটা অঙ্গ কেটে ভার কমিয়ে দিচ্ছি। ওটা থাক্। সারথি বললে, তা তো হয় না মা, দেবতাদের আদেশ তো স্বকর্ণেই শুনেছেন, যত সামান্য ওজন হোক, ও থাকলে—। রাণী তাকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন, বললেন, তবে থাক্ বাবা, নাকছাবি ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারব না। মা গো, মুখের চেহারা হবে কি বিশ্রী! ব'লেই তালগাছের মত লম্বা ঠ্যাঙ বের ক'রে একেবারে এক শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ ক'রে নীচে একটা ডোবার পাঁকাল জলে নিজের মুখ দেখতে গেলেন আর ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলেন।

আজ সন্তোষবাবু হেসে বললেন, নাও। দেবতাকে দাও না ফুল। এইবার দাও—ম্লেচ্ছ রাজার প্রতিনিধিকে দাও।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গোপীচন্দ্রের চাকর মনিবের অনুরোধ নিবেদন করলে আবার, সাহেব গোলাপ ফুল ভালবাসেন।

সন্তোষবাবু নিজেই ফুলগুলি তুলে গোপীচন্দ্রের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন, যা বাবা। ফুল তো পেয়েছিস, এইবার চ'লে যা।

সন্তোষবাবু যাবার সময় মৃদু হেসে ব'লে গেলেন, দুঃখ ক'রো না ভাই। তোমার সমস্যা আমি সহজ ক'রে দিয়েছি।

সন্তোষবাবু চ'লে যেতেই রাধাকান্তবাবু ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সাত

পরের দিন সকালবেলা রাধাকান্ত ওই ফুল কয়টির জন্য অভিনন্দন পেলেন। গোপীচন্দ্রের ছেলে কীর্তিচন্দ্র নিজে এসে জানিয়ে গেলেন। রাধাকান্ত গ্রাম-সম্পর্কে গোপীচন্দ্রের মামা, সেই হিসাবে কীর্তিচন্দ্র তাঁর নাতি। গোপীচন্দ্রের জন্ম নিঃস্ব পিতার গৃহে, বাল্যে তিনি এখানকার প্রাচীন প্রতিষ্ঠাবান বংশগুলিকে সম্ভ্রম করতে শিখেছিলেন, এঁদের কাছে বাপকে অনুগ্রহ নিতে দেখেছেন ও অনেক ক্ষেত্রে সে অনুগ্রহ তিনিই নিজে হাত পেতে নিয়ে এসেছেন, তা ছাড়া তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন মিষ্টতা আছে যা এ সংসারে সুদুর্লভ, কাজেই তিনি অবস্থায় আজ সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম্য প্রধানদের সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্র ধনী পিতার সন্তান; তিনি জন্মেছেন ঐশ্বর্যের মধ্যে। গোপীচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কয়লা-কুঠিতে এবং কলকাতার ব্যবসায়ী-মহলে তিনি বাল্যকাল থেকেই সম্ভ্রম এবং সমাদর পেয়ে আসছেন,—কয়লা-কুঠির কর্মচারী শ্রমিক তাঁকে সেলাম দিয়েছে, ব্যবসায়ী ধনীদের কাছে নমস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর প্রকৃতিও গোপীচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র। কীর্তিমান গোপীচন্দ্রের প্রকৃতির সুদুর্লভ মাধুর্য পৃথিবীতে বোধ করি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়াও যায় না, কীর্তিচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই দাম্ভিক এবং প্রকৃতিতে তিনি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। এই দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতা এই নবগ্রামের পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রচণ্ড উগ্রতায় উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরের বিপুলপরিসর কর্মক্ষেত্রে কীর্তিচন্দ্রের দম্ভ নিষ্ঠুরতা প্রতিহিংসাপরায়ণতা সংযত রুদ্ধমুখ আগ্নেয়-গিরির মত, নবগ্রামে পা দিলেই কীর্তিচন্দ্র ক্ষোভে জ্ব'লে ওঠেন, হয়ে ওঠেন অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয়গিরি। ক্ষোভ তাঁর স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর রীতি অনুযায়ী সঙ্গত। গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী তাঁর পিতা, গুণেও তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু তিনি এ গ্রামে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে স্বীকৃত নন কেন? কোন্ অধিকারে চটকের সঙ্গে তুলনীয় এই গ্রাম্য প্রধানেরা গরুড়ের মত অমিতবীর্য এবং ভাগ্যবান তাঁর পিতার উর্ধ্বে পক্ষবিস্তার ক'রে আকাশলোকের অধিকার চায়? তাঁর ইচ্ছা হয়, এই নবগ্রামের আকাশে একবার পক্ষ আস্ফালনে এমন ঝড় তোলেন যে, ঝড়ের বেগে এই চটকগুলি মাটিতে আছাড় খেয়ে ধূলিস্তূপের মধ্যে সমাধি লাভ করে, কিন্তু গোপীচন্দ্র তা কখনও হতে দেন না। তবুও কীর্তিচন্দ্র পদক্ষেপে ব্যবহারে বাক্যালাপে নিজেকে প্রকাশ করেন। গ্রামের প্রধানেরা গোপীচন্দ্রকে ঈর্ষা করেন, অবজ্ঞা করতে চেষ্টা করেন, তবুও অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু কীর্তিচন্দ্রকে তাঁরা ভয় করেন। সেই কীর্তিচন্দ্র অভিনন্দন জানাতে এলেন। রাধাকান্তের বৈঠকখানায় তখন চায়ের আসর বসেছে—স্বর্ণবাবুও আছেন, আরও অনেকে আছেন, আলোচনা চলছে ওই তন ইস্কুলের। কীর্তিচন্দ্র এসে দরজায়

দাঁড়িয়ে বললেন, আসব ঠাকুরদা ?

রাধাকান্ত সমাদরের সঙ্গেই তাঁকে আহ্বান জানালেন, এস, এস ভাই, এস।

এলাম। কিন্তু আলোচনায় বাধা দিলাম যে!

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আলোচনা তো ষড়যন্ত্র নয় ভাই যে, তোমার সামনে সেটা চলতে পারবে না। তবে হয়তো একটু সংযত হয়ে করতে হবে। আর কোন অন্যায় বা নিন্দামূলক আলোচনাও হয় নি আমাদের। ব'স তুমি।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, অন্যায় করলে সমাজ তার প্রতিবাদ করবে, নিন্দার কাজ হ'লে লোকে নিন্দা করবে, সে মুখের সামনেই করবে। রাজার মাকে হাত জোড় ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরে এসে যারা ঘরের কোণে 'ডাইনী' ব'লে গাল দেয়, তাদের দলে আমাদের ফেলছ কেন ?

রাধাকান্ত বললেন, আমাদের আলোচনা হচ্ছিল ভাই, এই ইস্কুল স্থাপনের ফলাফল নিয়ে। ভবিষ্যতে কেউ আর কারুকে মানবে না, সিকিপাদ ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাবে, কলির ফল পরিপূর্ণ হবে—এই আলোচনা হচ্ছিল। তোমার বাবা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, কালধর্ম অনুযায়ী পুণ্যকর্মই করছেন। তিনি করছেন বিদ্যাদানের কল্পতরু প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কালের ধর্মে বিদ্যা যদি অবিদ্যায় পরিণত হয়, তবে সে দায়িত্ব তাঁর নয়, সেটা হ'ল কালের অভিপ্রায়। কালের অভিপ্রায়ে এ হবেই। আজ তোমার বাবা যদি এই সব কথা ভেবে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিরতও হন, তবুও কি সমাজ-সংসারের এই গতি রোধ হবে ? হবে না। এই গ্রামে যারা ইংরিজী লেখাপড়া ইতিমধ্যেই শিখেছে—বেশি-কম যেমনই হোক তারা শিখেছে যে কালধর্মে, সেই কালধর্মে দিন দিন বেশি সংখ্যায় লোক ছেলেপিলেদের বাইরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবে। ক্রমে এইখানেও ইস্কুল হবে। তোমার বাবা না করেন, তুমি করবে ; তুমি না কর, তোমার ছেলে করবে।

কীর্তিচন্দ্র আভিজাত্যসম্মত ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে একটু হাসলেন, হেসে বললেন, আমাদের ছেলেদের আমলে ইস্কুল কলেজে পরিণত হবে ঠাকুরদা। বাবা যখন সংকল্প করেছেন, তখন ইস্কুল হবেই। ম্লেচ্ছাচারে দেশ ভ'রে যাবে, সিকি-পা-ওয়ালা ধর্মের ষাঁড়টার ওই সিকিখানা পাও ক্ষ'য়ে যাবে—এ সব তত্ত্ব আমরা পাপী তাপী মানুষ আমরা তো বুঝিই নে, বাবাও বোঝেন না। পাপী-তাপীদের সঙ্গেই তো তাঁর কারবার। সায়েব-সুবো ইংরিজী-লেখাপড়া-জানা অনেক লোকের সঙ্গে মেলমেশ ক'রে তাঁর এ ধর্মভয়টা লোপ পেয়েছে। বুঝলেন না, ও ধর্মভয়ই বলুন আর পথ বন্ধের ভয়ই বলুন, কোন ভয়েই তাঁকে কাবু করা যাবে না। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব বাহাদুর এসেছিলেন, তিনি তো শুনে হেসেই আকুল। হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, ঘোস্টের ভয় দেখায় নি লোকে—মানে ভূতের ভয় ? বলে নি, ভূতের ঈশ্বর মহাদেব কি গডেস কালী তাঁদের চেলা-চামুণ্ডা পাঠিয়ে তোমাকে ছেলেপুলে সমেত ঘাড় মটকে দেবে ?

কথা শেষ ক'রে কীর্তিচন্দ্র নিজেই হেসে উঠলেন। কীর্তিচন্দ্র হো-হো ক'রে উচ্চ হাসি

হাসতে পারেন না। ওটা তাঁর উপর নূতন যুগের সভ্যতার প্রভাব নয়, ওটা তাঁর স্বভাব। এ ক্ষেত্রে তাঁর হো-হো শব্দে হাসতে না পারাটা ভালই হ'ল, কারণ তাঁর হাসিতে আর কেউ হাসল না; সমস্ত মজলিসটি স্তব্ধ হয়ে রইল। কীর্তিচন্দ্রের হাসি, সায়েবের এই মন্তব্য মজলিসের প্রতিটি জনকেই ক্রুর আঘাতে ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত ক'রে তুলেছিল; কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস আছে কার? রাধাকান্ত মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন। স্বর্ণবাবুর মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল, অবরুদ্ধ ক্ষোভ এবং ক্রোধের উত্তেজনায় রক্তের চাপে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, রগের শিরা দুটো ফুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে দড়ির মত; ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যায়—শিরা দুটো লাফাচ্ছে।

কীর্তিচন্দ্র আবার মৃদু হেসে বললেন, হাসি-তামাসা ছেড়ে সায়েব শেষে বললেন, একটা কথা—তুমি তোমার গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রো দেখি গোপীচন্দ্রবাবু। জিজ্ঞাসা ক'রো, ইস্কুল তুমি যদি নাই প্রতিষ্ঠা কর, তবে কি তোমার গ্রামের বাবুরা ছেলেদের ইংরিজী লেখা-পড়া শেখাবেন না? কে কে চান না তাঁদের ছেলে মুনসেফ কি ডেপুটি, কি সব-রেজিস্ট্রার কি সব-ইন্সপেক্টার হয়? তাঁদের নামগুলো আমাকে জানালে আমি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট লিখে রেখে যাব। গভর্মেণ্টকে জানাব—

স্বর্ণবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনি অত্যন্ত অকস্মাৎ মজলিস থেকে উঠে পড়লেন, বললেন, চললাম রাধাকান্তদা।

উঠছ?—মৃদুস্বরে নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্যই রাধাকান্ত কথাটা বললেন।

হ্যাঁ। কানের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

কীর্তিচন্দ্র গম্ভীর হয়ে উঠলেন। মুখের হাসি তাঁর মিলিয়ে গেল।

ফট ফট শব্দে চটি টেনে স্বর্ণবাবু বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসটা আসন্ন কাল-বৈশাখীর মুহূর্তের মত অসহনীয় স্তব্ধতায় ভ'রে উঠল। এর পরই একটা বিসদৃশ কিছু ঘটবে, এমনই আশঙ্কায় সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই রাধাকান্তের চাকর বিষ্ণু গৌরীকান্তকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেটির হাতখানি রক্তাক্ত—বিড়াল কুকুর জাতীয় কোন জন্তুর ধারালো নখের আঁচড়ের মত চিহ্ন কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্ত লম্বা হয়ে ফুটে উঠেছে। বিষ্ণু গৌরীকান্তকে রাধাকান্তবাবুর কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, গোলাপের ডালে চিরে গিয়েছে। ও বাড়ির খোকাবাবু—

সন্তোষ মুখুজ্জে ব'লে উঠলেন, সর্বরক্ষে, আমি ভাবলাম বেড়াল কি বেঁজী কি বাঁদর কি কুকুর আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে। গোলাপের ডালে ছ'ড়ে গিয়েছে—তবু ভাল।

বিষ্ণু বললে, ওদের বাড়ির খোকাবাবুর সঙ্গে গোলাপের ডাল নিয়ে—

বাধা দিয়ে রাধাকান্ত বললেন, তুই যা। ছেলেকে তিনি পাশে বসিয়ে কাটা দাগগুলি দেখলেন। গৌরীকান্ত কাঁদে নি, সে চুপ ক'রেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলে। কীর্তিচন্দ্র বললেন, গোলাপের ওই এক জালা—কাঁটা আছে। নইলে এমন ফুল আর হয় না। আপনার বাগানের গোলাপ পেয়ে সায়েব খুব খুশি; দশবার বললেন—সো বিউটিফুল রোজ

গোপীচন্দ্রবাবু, ওঃ, সো বিউটিফুল! এ তোমার বাগানের ফুল? বাবা তখন বললেন—না ইওর অনার, এ ফুল আমাদের গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—রাধাকান্তবাবু, ভাল লোক, ধার্মিক, ন্যায়বান আবার শৌখিন লোকও বটেন, তাঁর বাগানের খুব শখ—এ ফুল তাঁর বাগানের। হুজুর আসবেন জেনে এ ফুল তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। সায়েব বললেন—চমৎকার ফুল! রাধাকান্তবাবুকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো। ব'লো, আমি খুব খুশি হয়েছি।

সন্তোষ মুখুজ্জে রাধাকান্তের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর মুখে কৌতুকহাস্যরেখা ফুটে উঠেছে। রাধাকান্ত মুখ নামিয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কিছু ভাবছেন। সম্ভবত কি বলবেন—তাই ভাবছেন। রাধাকান্তকে কিছু বলার দায় থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই তিনি বললেন, তা ফুলের জন্যে রাধাকান্তবাবুর হাত দুখানি অনেক পুণ্য অর্জন করেছে। সায়েব ধন্যবাদ দিয়েছেন—এটা একটা জবর খবর, নতুন খবরও বটে। তবে আমার ইষ্টদেবতা তো নিত্য আশীর্বাদ করেন রাধাকান্তবাবুকে। শুধু আমার ইষ্টদেবতা কেন, এ গ্রামের দেবদেবী যতগুলি আছেন সকলেই পূজা নেন রাধাকান্তের বাগানের ফুলে।

কীর্তিচন্দ্র সন্তোষ মুখুজ্জের কথায় কান দেন নি। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনদের সন্তান নূতন যুগে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসছে। কীর্তিচন্দ্র উঠে গৌরীকান্তের কাছে এসে তাঁর হাতখানি ভাল ক'রে দেখে আত্মীয়তা প্রকাশ ক'রে হেসে বললেন, গাছ থেকে ফুল পাড়তে গিয়েছিলে বুঝি?

গৌরীকান্ত ঘাড় নেড়ে বললে, না। বাবা গাছটা কেটে ফেলে দিয়েছেন যে। ওদের খোকা—

গাছ কেটে ফেলে দিয়েছেন?

সন্তোষবাবু মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। রাধাকান্তকে তিনি চেনেন। কিন্তু সে কথা প্রকাশ পেলে রাধাকান্তের কল্যাণ হবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন, ভাল করেছ। কতদিন থেকে তোমাকে বলছি—ডালগুলো বুড়ো হয়েছে, ছেঁটে দাও। তা দাও নি। এবার যা হোক কথাটা যেন শুনেছ; ভাল করেছ। দেখবে, এবার কেমন ফুল দেয়!

গৌরীকান্ত ব'লে উঠল, না পিসেমশাই, বাবা গাছটা গোড়া থেকে কেটে ফেলে দিয়েছেন।

গোড়া থেকেই কাটতে হয় বাবা। অনেক দিনের বুড়ো ডাল কিনা। এর পর শেকড়ের মাটি খুলে দিলে একেবারে গোড়া থেকে মোটা হয়ে সতেজ ডাল বের হবে।

রাধাকান্ত দীর্ঘক্ষণ মনে মনে ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। যে ফুল তিনি দেবতার পূজার জন্যও তুলতে দিতেন না, সেই ফুল ম্লেচ্ছরাজার প্রতিনিধি মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টির জন্য দিতে বাধ্য হয়েছেন, সাহস ক'রে 'না' বলতে পারেন নাই, নিজের সেই দুর্বলতার অনুশোচনায় গাছটাকে তিনি সমূলে তুলে ফেলে দিয়েছেন। এ কথাটা কীর্তিচন্দ্রের কাছে প্রকাশ পেলে ম্যাজিস্ট্রেটের কানে উঠবার সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত। এবং প্রবলপ্রতাপ ইংরেজের প্রতিনিধির কানে উঠলে তার ফল হবে মর্মান্তিক। তবু আর তিনি চুপ ক'রে

থাকতে পারলেন না। বৈষয়িক বুদ্ধি অপেক্ষা তাঁর হৃদয়াবেগ প্রবল, বাস্তবতা-বোধের যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা ভাব-বোধের নির্দেশ তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি। সত্য গোপনের আত্মপীড়া তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, না সন্তোষবাবু, মিথ্যা কথা ব'লে আর পাপ বাড়াতে চাই না। তা ছাড়া ছেলেকেও মিথ্যাচার শিখিয়ে বংশকে পাপগ্রস্ত করতে চাই না। গাছটা আমি কেটে ফেলেছি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য।

তারপর কীর্তিচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ওই গোলাপগাছের ফুল আমি কাউকে তুলতে দিই নে। প্রথম যে ফুলটি হয়েছিল সেই ফুলটি কেবল তুলে নিজে ইষ্টপূজা করেছিলাম। তারপর থেকে ও গাছের ফুল গাছেই শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে।

একটু হেসে বললেন, সন্তোষবাবু কতদিন আমাকে কত রহস্য করেছেন। গোলাপফুলের মায়াকে বলতেন—নারীর নাকছাবি-মায়া। মনে মনে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হ'ত, যে ফুল দেবতার পূজায় লাগবে তার জন্য মায়া করা আমার অন্যায় হচ্ছে। মনকে প্রবোধ দিতাম, ব্রহ্মাণ্ড-অধীশ্বরের পূজা—ও কি তুলে মন্ত্র প'ড়ে পূজা করলাম বললেই হয়, তাঁর গাছের ফুল গাছে ফুটে থাকলে হয় না? এও তো এক ধরনের পূজা। কিন্তু সায়েবের অভ্যর্থনার আসর সাজাবার জন্য তোমার বাবা ফুল চেয়ে পাঠালেন, ব'লে পাঠালেন—সায়েব নাকি গোলাপফুল ভালবাসেন, তখন সঙ্কটে পড়লাম। 'না' বলতে সাহস পেলাম না। 'তুলে নাও' এও বলতে পারলাম না! সন্তোষবাবু একটু হেসে ফুলগুলি তুলে তোমাদের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন—তোমার সমস্যা সহজ ক'রে দিলাম রাধাকান্তবাবু। সন্তোষবাবু চ'লে গেলেন, আমি একখানা ধারালো দা নিয়ে গাছটাকে কেটে ফেললাম। তাতেও মন তুষ্ট হ'ল না, মাটি খুঁড়ে শেষে নির্মূল করেছিলাম। প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

মজলিসটায় প্রত্যেকটি লোক অভিভূত হয়ে পড়েছিল, রাধাকান্তের গাঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর অসহায় অবস্থার হৃদয়বেদনার কাহিনী সকলকেই স্পর্শ করেছিল, কীর্তিচন্দ্রও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি কলকাতা থেকে এবার ভাল গোলাপের কলম আপনাকে এনে দেব ঠাকুরদা!

রাধাকান্ত বললেন—তোমার মঙ্গল হোক ভাই। কিন্তু গোলাপগাছ আর লাগাতে ইচ্ছা নাই।

এবারের কণ্ঠস্বর তাঁর আরও সকরুণ। কীর্তিচন্দ্রও এবার স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সমস্ত মজলিসটা নীরব। দু-একজন কেবল গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিলেন, সম্ভবত সকরুণ হৃদয়াবেগের প্রভাবে গলার ভিতরটা ভারী হয়ে উঠেছিল। এই স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে গৌরীকান্ত বললে, ওই গোলাপের ডাল কি আবার লাগাতে আছে বাবা?

ম্লান হেসে ঘাড় নেড়ে রাধাকান্ত জানালেন, না।

গৌরীকান্ত বললে, সারের গাদায় ডালগুলো প'ড়ে ছিল, ও-বাড়ির খোকা এসে ডালগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, লাগাবে বলছিল, তাই আমি বারণ করলাম—না, ও গাছের ডাল আর লাগাতে নেই, ও-গাছটার পাপ লেগেছে। ডালটা আমি ধ'রে আটকাতে গেলাম

তো খোকা জোরে আচমকা টেনে নিলে। আমার হাতটা ছ'ড়ে গেল।

রাধাকান্তবাবু সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, যাও, বাড়ির মধ্যে যাও। মাকে গিয়ে বল, তিনি একটু তেল-টেল লাগিয়ে দেবেন, কাঁটা ফুটে থাকলে বের ক'রে দেবেন।

গৌরীকান্ত চ'লে গেল। কীর্তিচন্দ্রও উঠে দাঁড়ালেন।—আমিও উঠলাম ঠাকুরদা।

উঠবে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, এস ভাই।

রাধাকান্তও উঠে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা যেন দুঃখিত হয়ো না। কারণ দেবতার জন্যও ফুল তুলতে দিতাম না—এ কথা তোমরা জানতে না। জানলে, সায়েবের টেবিল সাজাবার জন্য ফুল চেয়ে পাঠাতে না।

কীর্তিচন্দ্র হেসে বললেন, না না ঠাকুরদা, এতে আমাদের মনে করবার কি আছে?

* * * *

মনে করবার নাই? কীর্তিচন্দ্র মুখে ব'লে এলেন বটে—এতে তাঁদের কিছু মনে করবার নাই। হয়তো যুক্তিতে তর্কে মনে করবারও কিছু নাই, কারণ দেবতার পূজার জন্য যে ফুল তুলতে দিতেন না, রাজরোষের ভয়ে রাজপ্রতিনিধির পরিতুষ্টির জন্য সেই ফুল তিনি দিতে বাধ্য হয়েছেন, এর জন্য আত্মগ্লানি-তাড়নায় যা করেছেন তার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নাই। এতে যদি কারও ক্ষোভের কারণ থাকে তবে সে আছে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবটির। ক্ষোভ তাঁর নিশ্চয়ই হতে পারে। দেবতাকে না দিয়ে মানুষকে দেওয়ার জন্যই তো রাধাকান্তের এতখানি আত্মগ্লানি নয়, এতখানি আত্মগ্লানির কারণ বিধর্মী রাজার—যে ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ বলা হয়, সেই রাজার প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধিটিও ধর্মে মুসলমান, সেই মানুষকে দেবতাকেও অদেয় মমতার বস্তু দিয়েছেন তিনি ভয়ের অনুবর্তী হয়ে। বিধর্মী ব'লে এই যে ঘৃণা, এর জ্বালা বড় মর্মান্তিক। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কানে উঠবা মাত্র তিনি বিষাক্ত সরীসৃপের দংশনের জ্বালার মত জ্বালায় অধীর হয়ে উঠবেন। শুনবা মাত্র তাঁর মনে হবে, তিনি মুসলমান ব'লেই ওই হিন্দু রাধাকান্তের এতখানি আত্মগ্লানি হয়েছে।

গোপীচন্দ্র বা তাঁর সন্তানেরা এই ঘটনাটির মধ্যে নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জ্বালা অনুভব না ক'রে যেন উপায় নাই। কীর্তিচন্দ্র অনুভব না ক'রে পারলেন না।

ঘটনাটি শুনে গোপীচন্দ্র বেদনা এবং লজ্জা দু-ই অনুভব করলেন। গোপীচন্দ্র সংসারে শুধু কৃতী পুরুষই নন, তাঁর মন হৃদয় সত্য সত্যই উদার এবং প্রসন্ন। সংসারে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি ধনী হয়েছেন, জীবনে বহু বেদনা তিনি সহ্য করেছেন, বেদনার দুঃখের সমুদ্র তিনি ভেলা বেঁধে উত্তীর্ণ হয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখ-বেদনার অনুভূতির স্মৃতি তাঁর মনে আছে, সে সব তিনি ভুলে যান নি। তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা

মনে প'ড়ে গেল, অনেকটা মিল আছে, এই ঘটনার সঙ্গে। সায়েবদের কয়লা-কুঠিতে তখন তিনি সামান্য বেতনের কর্মচারী, কুলী সংগ্রহের জন্য সাঁওতাল-বাউরীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরবার সময় খুব ভাল এক ছড়া মর্তমান কলা সংগ্রহ করেছিলেন। ছেলেরা মেয়েরা অবোধ, তিনি বাড়ি ফিরলেই ছুটে আসত তাঁর কাছে, প্রশ্ন করত—কি এনেছ বাবা? কখনও কখনও ময়ূরের পাখা বা সজারুর কাঁটা আনতেন, তাই তাদের দিতেন। এবার এমন সুন্দর কলা-ছড়াটি পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু কুঠি ঢুকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল সাহেব এবং মেম সাহেবের সঙ্গে, তাঁরা ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। গোপীচন্দ্র সসম্ভ্রমে সেলাম জানালেন। সাহেব গ্রাহ্য করলেন না, তাঁর ঘোড়া বেরিয়ে গেল কিন্তু মেম সাহেবের ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল, মেম সাহেব ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তুমি ওই সুন্দর কেলা কোথায় পেলে?

মেম সায়েবকে দাঁড়াতে দেখে সায়েবও ঘোড়া ফিরিয়ে কাছে এলেন। গোপীচন্দ্রকে দেখে প্রশ্ন করলেন, ওয়েল গোপীচন্দর, ফিরেছ তুমি? কুলী পেয়েছ?

গোপীচন্দ্র উত্তর দেবার পুর্বেই মেম সাহেব বললেন, তোমার কুঠির লোক? চমৎকার কলা সংগ্রহ করেছে দেখ। কি দাম নিয়েছে জিজ্ঞাসা কর।

গোপীচন্দ্রকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়েছিল, এ কলা-ছড়াটা আমি হুজুরের জন্যেই নিয়ে এসেছি। গ্রামে কুলীদের বাড়িতে পেলাম। অন্তরের বেদনা সযত্নে গোপন ক'রে তাঁকে বিনীত মিষ্ট হাসি হাসতে হয়েছিল। মনে প'ড়ে গেল কথাটা।

গোপীচন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সংসারে পৃথিবীতে এই মর্মবেদনার বোধ হয় প্রতিকার নাই। সংসারে যারা বড়, যারা প্রতিষ্ঠাবান, তাদের পরিতৃপ্তির জন্য সাধারণ মানুষ এমনি ক'রেই নিজেদের বঞ্চিত ক'রে আসছে, ভয়ে ক'রে আসছে—প্রলোভনে প'ড়ে ক'রে আসছে।

কীর্তিচন্দ্র বললেন, কথাটা শুনে প্রথমটায় আমার দুঃখ হয়েছিল। আমি বললাম—এবার কলকাতা থেকে আমি আপনার জন্য ভাল গোলাপের কলম নিয়ে আসব। তা—। তা উত্তর হ'ল—গোলাপগাছ আর লাগাব না।

গোপীচন্দ্র ছেলের মুখের দিকে চাইলেন, বললেন, দেখ, একটা কথা তোমায় বলি কীর্তি, কথাটা যেন অমান্য ক'রো না। আমি তাতে দুঃখ পাব।

বলুন।

এই কথা তুমি আর তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ ক'রো না। সায়েবের কানে উঠলে রাধাকান্তবাবু বিপদে পড়বেন। রাজরোষ বড় ভয়ঙ্কর, কীর্তি। তা ছাড়া রাধাকান্তবাবুর দুঃখ তোমরা ঠিক বুঝবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে কীর্তিচন্দ্র বললেন, উনি যদি স্বর্ণবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন—আমাদের ভাল কাজেও বাধা দেন—

বাধা দিয়ে গোপীচন্দ্র বললেন, ভাল কাজে বাধা দেওয়া যায় না কীর্তি। তা ছাড়া

রাধাকান্তবাবু স্বর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবেন—এ অনুমান তোমার ভুল।

তিনি উঠে পড়লেন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তিনি ইস্কুলডাঙায় যাবেন ওখানকার কাজকর্ম তদারকের জন্য। কীর্তিচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। বিচিত্র মানুষ কীর্তিচন্দ্র। সম্ভবত ধনী-সন্তানদের প্রকৃতি জেদের দিক দিয়ে এই রকমই হয়। ঘটনাটার জন্য প্রথমে তাঁর ক্ষোভ ছিল না, তারপর ক্রমে ক্রমে অল্প খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র যে মুহূর্তে তাঁকে এই ঘটনা নিয়ে রাধাকান্তের বিরুদ্ধতা করতে নিষেধ করলেন—আদেশের সুরে নিষেধ করলেন, সেই মুহূর্তে রাধাকান্তের বিরুদ্ধে বিপুল ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এ গ্রামের প্রধানদের বিরুদ্ধে তাঁর আবাল্য-পোষিত আক্রোশ গোপীচন্দ্রের নিষেধের অজুহাত পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল গল্পের সাপের মত। যে সাপ নিরপরাধকে দংশন করতে এসে ভাবে, কোন্ অপরাধে একে দংশন করব? তারপর ঘুমন্ত হতভাগ্যের পায়ের স্পর্শ গায়ে ঠেকতেই সেই অজুহাতে চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে দংশন করে।

*   *   *

গোপীচন্দ্রের গাড়ি চলল বাজারের মধ্য দিয়ে। টমটমে চ'ড়ে চলেছিলেন। গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ দীর্ঘকায় মানুষটির ভাগ্যও যেমন সুদুর্লভ, কান্তিও তেমনই অপরূপ। বাজারের লোকেরা সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানালে। যারা দোকানে ব'সে ছিল তারা উঠে দাঁড়াল, নমস্কার জানালে। যারা পথ চলেছিল তারা পাশে স'রে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। শুধু তাই নয়, তাদের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভ'রে উঠল। এই হাসিটুকুর প্রত্যাশাই করেছিলেন গোপীচন্দ্র। সাধারণ মানুষ, নগণ্য মানুষ, দরিদ্র মানুষ, এদের গ্রাহ্য কেউ করে না, কিন্তু এদের মুখের এই হাসিটুকুকে অগ্রাহ্য করতেও কেউ পারে না—রাজা প্রজার মুখে এই হাসি প্রত্যাশা করে, গুরু শিষ্যের মুখে এই হাসি প্রত্যাশা করে, কবি পাঠক-মণ্ডলীর মুখে এই হাসি দেখতে চায়। মানুষ দূরের কথা, দেবতা ভক্তের মুখে এই হাসি দেখে তাঁর দেবত্বকে সার্থক জ্ঞান করেন। গোপীচন্দ্র এই হাসি দেখে শুধু খুশিই হলেন না, মনের মধ্যে বল পেলেন। করুক গ্রাম্য-প্রধানেরা তাঁর বিরোধিতা। সে বিরোধিতার কোন মূল্য নাই। যেটুকু মূল্য আছে, সেটুকু নিতান্তই এই প্রধানদের কূটবুদ্ধি এবং আর্থিক সঙ্গতির মূল্য। গোপীচন্দ্রের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। বুদ্ধি আর অর্থ? তাঁর বুদ্ধিবল, তাঁর অর্থবলের পরিমাণ ওই নিতান্ত গ্রাম্য-প্রধানেরা জানে না, অনুমান করতে পারে না। কূপমণ্ডুক সাগরের পরিধি, সাগরের গভীরতা অনুমান করবে কি ক'রে?

গোপীচন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে ভগবানকে প্রণাম জানালেন। জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী। রাজকুল তাঁর প্রতি প্রসন্ন, তাঁর সহায়। সাধারণ মানুষের মুখ তাঁকে দেখে প্রসন্ন হাসিতে ভ'রে ওঠে, আর তাঁর কি চাই! নইলে প্রণাম নমস্কার—ওকে তিনি মূল্য দেন না। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলার পল্লী। তাঁর কালকে গোপীচন্দ্র জানেন চেনেন। শূদ্র ব্রাহ্মণকে দেখলেই প্রণাম করে, প্রজা জমিদার হ'লেই প্রণাম জানায়, হোক না কেন ব্রাহ্মণ কদাচারী মূর্খ, হোক না কেন জমিদার সর্বস্বান্ত অধঃপতিত

অত্যাচারী। স্বর্ণবাবুকেও এরা ঠিক এমনি ভাবেই জানায়। শ্যামাকান্ত রাধাকান্ত বংশ-লোচন এদেরও জানায়। কিন্তু প্রণাম করার পর মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। ঠোঁট বেঁকিয়ে অথবা মাটিতে থুথু ফেলে, যাদের মুহূর্ত-পূর্বে প্রণাম করেছে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে।

হুজুর!—গাড়ি থামিয়ে ঘোড়াটার মুখের লাগাম ধ'রে কোচম্যান ডাকলে, হুজুর!

গোপীচন্দ্র আজিকার এই আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত, চিন্তায় একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি ইস্কুলডাঙায় এসে থামল ; তাঁর খেয়াল ছিল না।

ঈষৎ চকিত হয়ে গোপীচন্দ্র বললেন, অ্যাঁ! তারপরই তাঁর সমস্ত খেয়াল হ'ল, তিনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

নেমে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে।

ইস্কুলডাঙায় কর্মোদ্যমের সমারোহ চলছে। মানুষের কলরব উঠছে। নতুন নবগ্রাম গড়বেন গোপীচন্দ্র, তার আয়োজন চলছে। ইট পুড়ছে, ইট পাড়াই হচ্ছে, চুন পুড়ছে, গাড়ির সারি আসছে ঘুটিং বোঝাই নিয়ে। ওদিকে একটা লম্বা খড়ের চালার মধ্যে কাঠের কাজ চলছে। কাঠের চালাটার সামনে প্রায় বিশ-পঁচিশখানা গাড়ি নামানো রয়েছে, বড় বড় কাঠের গাদি বোঝাই নিয়ে এসেছে, পাটকিলে রঙের মোটা কাঠের গুঁড়ি—শালকাঠ মনে হচ্ছে। গোপীচন্দ্র এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, শালকাঠই বটে। দুমকা থেকে সাঁওতালেরা কাঠ এনেছে। ভাল কাঠ। যেমন সোজা, তেমনই পাকা।

একজন সাঁওতাল তাঁকে নমস্কার ক'রে বললে, পনম গো বাবু মশয়। লাগছে আপুনি বাবু মশয়, মালিকবাবু বট।

গোপীচন্দ্র হেসে চমৎকার সাঁওতালী ভাষায় বললেন, কেমন ক'রে বুঝলে গো মাঝি মহাশয়?

সবিস্ময়ে মাঝি ব'লে উঠল, আমাদের ভাষা আপুনি জানেন গো বাবু মশয়?

জানি বইকি। ভারি ভাল লাগে তোমাদের ভাষা আমার। ভারি মিষ্টি।

ভারি মিষ্টি?

ভারি মিষ্টি। তেমনই মিষ্টি কি তোমাদের মেয়েদের নাচ, পুরুষদের বাঁশি!

পঁচিশখানা গাড়ির গাড়োয়ান তাঁকে চারি পাশে ঘিরে দাঁড়াল। বিশাল কর্মজীবনের পটভূমি গোপীচন্দ্রের। সাঁওতালদের জীবন তাঁর যেন নখাগ্রে। তাদের ক্ষেত-খামার পালা-পার্বণ, দেবতা-অপদেবতা সম্পর্কে সংবাদ নিলেন তিনি। সাঁওতাল-পরগনার অরণ্যসম্পদ, ভূমিসম্পদ সম্পর্কে নূতন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, তোমরা কোথায় এসেছ—কাঠ বিক্রি করতে?

সাঁওতালদের প্রধান হাতজোড় ক'রে বললে, আমরা কুথা যাব গো বাবু মশয়, আপনকার নামটি শুনলম হুই সিহুড়ি বাজারে, শুনলম, আপুনি রাজা হয়েছিস—হেই বাড়ি করছিস,

পাঠশালা করবি, দেবতা বাবাদের মন্দির করবি, তাথেই বুলি আপোনার দুয়ার-জাংলা করবার লেগে ভাল ভাল শালকাঠ নিয়ে এলম গো।

গোপীচন্দ্র কাঠ এ ভাবে কেনেন না। সাঁওতাল পরগনায় লোক পাঠিয়ে সেখানে কাঠ কেনেন প্রচুর পরিমাণে। ইমারত তাঁর একটার পর একটা হয়ে চলেছে। কাঠ তাঁকে মজুত রাখতে হয়। কিন্তু এই সাঁওতালগুলিকে ফিরিয়ে দিতে কেমন যেন বাধল, করুণাও হ'ল, আবার খানিকটা যেন লজ্জাও অনুভব করলেন তিনি। এত দূর থেকে বেচারীরা এসেছে, তিনি ফিরিয়ে দিলে বেচারীদের কায়দায় পেয়ে স্থানীয় অবস্থাপন্নেরা এবং ব্যবসাদারেরা অত্যন্ত কম দামে কাঠগুলি কিনবে। দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ ওরা বোঝাই গাড়ি নিয়ে এসেছে—এতখানি পথ আবার বোঝাই নিয়ে ফিরে যাওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব। গরুগুলির অত্যন্ত কষ্ট হবে। গরুকে কষ্ট ওরা দেবে না, তার চেয়ে ওরা লোকসান ক'রেই বিক্রি করবে। তা ছাড়া পঞ্চাশ মাইল দূরের অরণ্যভূমে এই সরল শিক্ষা-সভ্যতাবঞ্চিত বন্য মানুষগুলি তাঁর কথা শুনেছে—তিনি রাজা হয়েছেন, তারা প্রত্যাশা ক'রে এখানে এসেছে তাঁর কাছে তারা ন্যায্য মূল্য পাবে, তাদের তিনি ফেরাবেন কি ব'লে? ফিরে গিয়ে সেখানে কি বলবে তারা?

একটু ভেবে তিনি বললেন, তাই তো মাঝি, আমি তো এমন ভাবে কাঠ কিনি না রে। আমি একেবারে তোদের দেশে জঙ্গলে লোক পাঠিয়ে কাঠ কিনি। তা তোরা এনেছিস যখন, তখন দেখি। ব'স্ তোরা, ব'স্।

তিনি এগিয়ে গিয়ে কাঠের কাজের চালার মধ্যে ঢুকলেন। বিস্তীর্ণ খড়ে-ছাওয়া চালা, চারিপাশে কাঠ প'ড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। এক দিকে কতকগুলি দরজা-জানলার ফ্রেম, তার পাশে কতকগুলি অর্ধসমাপ্ত দরজা-জানলার পাল্লা। চালার মধ্যে ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। গোটা চালাটা খাঁ-খাঁ করছে, কেউ কোথাও নাই। ছুটির সময় হয়েছে, ছুতোর মিস্ত্রীরা যারা আশপাশের গ্রাম থেকে কাজ করতে আসে তারা না হয় চ'লে গিয়েছে; কিন্তু তাঁর স্থায়ী মাইনে-করা মিস্ত্রী বুড়ো বৈষ্ণবচরণ গেল কোথায়? তার থাকা উচিত ছিল। বুড়ো পাকা মিস্ত্রী, সূক্ষ্ম কাজে নৈপুণ্য অসাধারণ, কাজ বুঝতেও পারে ভাল, কিন্তু কর্মক্ষমতা ক'মে এসেছে; তার জন্য তিনি অভিযোগ করেন না, অন্যান্য মিস্ত্রীদের কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য, কাজ বুঝে নেবার জন্য তিনি বৈষ্ণবকে স্থায়ীভাবে রেখেছেন। সমস্ত কাঠ-কাঠরার দায়িত্ব বৈষ্ণবের, পাশেই তার জন্য টিন দিয়ে একখানা ঘর তৈরি ক'রে দিয়েছেন। ঘরে শিকল দেওয়া, চালা জনশূন্য; বুড়ো নিশ্চয় কোথাও বেরিয়েছে। বিরক্ত হলেন গোপীচন্দ্রবাবু। সম্ভবত বেশ একটু বেশি বিরক্ত হলেন, যার জন্য স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে তিনি সেই শূন্য চালায় দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন, নাঃ, এ বুড়ো অত্যন্ত ফাঁকিবাজ হয়েছে। চারটে বাজতে না-বাজতে পালিয়েছে। এর একটা ব্যবস্থা—

তাঁর কথার মধ্যেই মূর্তিমান বাধার মত শীর্ণকায় কালো একটি মানুষ কাঠের গুঁড়ির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল, হাত জোড় ক'রে বললে, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি পালাই নাই

হুজুর, এইখানে আছি।

গোপীচন্দ্র চমকে উঠলেন, লজ্জায় চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এত সামান্য কারণে লজ্জিত হন না। কিন্তু গোপীচন্দ্র স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। লজ্জায় চমকে উঠে তিনি স্মিত হাসি হেসে বৈষ্ণবের কথায় বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, আমি তোমাকে দেখি নি বৈষ্ণব, আমি তোমাকে দেখতে পাই নি বাবা—আমি তোমাকে দেখতে পাই নি। তুমি যে ওখানে ব'সে আছ তা আমি দেখি নি, ওদিকে আমি তাকাই নি।

আজ্ঞে, বাটালির ধার পড়েছে, ব'সে ব'সে শান দিচ্ছিলাম বাবা।

বেশ করছিলে বাবা, বেশ করছিলে, আমি তোমাকে দেখতে পাই নি।

বৈষ্ণব একটু হাসলে, বললে, পাহাড়ের মত কাঠ জ'মে আছে—

কাল থেকে তুমি একটু উঁচু জায়গায় বসবে বৈষ্ণব। কাঠের একটা মাচা ক'রে নিয়ে তার উপর বসবে তুমি। ব'সেই সব দেখতে পাবে, তোমাকেও সবাই দেখতে পাবে।

হেসেই বৈষ্ণব বললে, তাই বসব আজ্ঞে। তারপর এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বললে, আমাকে কি বলছিলেন ?

এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন গোপীচন্দ্র। বললেন, সাঁওতালেরা শালকাঠ নিয়ে এসেছে, বলছে—একটু হাসলেন গোপীবাবু—বলছে, ওরা নাকি ওদের দেশে শুনেছে আমি এখানে অনেক ইমারত করছি, আমি নাকি রাজা হয়েছি! ফড়িংয়ের কাছে চড়াইপাখিই মস্ত পাখি বৈষ্ণব, গরিব সাঁওতালদের চোখে আমি রাজা। তা রাজার নাম শুনে যখন কাঠ এনেছে, তখন কাঠ না নিলে মান থাকে কি ক'রে বল ? কাঠগুলো একবার দেখে নাও। দাম-দর একটা ঠিক কর।

যে আজ্ঞে। কাঠ আমি আগেই দেখেছি। খুব সরেস না হ'লেও খারাপ নয়। মধ্যম রকমের বেশ ভাল কাঠ।

গুড় ছেকেন কেলাস—কি বল ? হাসলেন গোপীবাবু।

এবার মুখ নিচু ক'রে খুক্‌খুক্ ক'রে হেসে উঠল বৈষ্ণবচরণ। মনিবের সামনে এমনভাবে হাসা বেয়াদপি, কিন্তু আত্মসম্বরণ করতে পারলে না বৈষ্ণব। কথাটার পিছনে বৈষ্ণবচরণের নিজেরই একটি কৌতুককর ইতিহাস লুকানো আছে। গোপীবাবুর প্রয়োজনেই তাকে কিছুদিনের জন্য কয়লা-কুঠিতে যেতে হয়েছিল, সেখানে সে অনেক ইংরেজী কথা শিখে আসে। কয়লা-কুঠির ইংরিজী। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, গুড সেকেণ্ড ক্লাস, হোল্ডিংনাট বোল্ট, স্ট্রাক্‌চার প্রভৃতি অনেক। সেগুলি সে শিখেছিল ফাস্‌টো কেলাস, ছেকেন কেলাস, হরিনারান বল্টু, ইষ্টিরাক্‌চার ইত্যাদি। একদিন সে কর্তাবাবুর সামনেই ওই গুড় ছেকেন কেলাস কথাটা ব'লে ফেলেছিল। একজন মিস্ত্রী সম্পর্কে বলেছিল, খুব ভাল নয়, তবে ভাল বটে—বেশ ভাল। গুড় ছেকেন কেলাস বটে।

বাবু লিখছিলেন, কলম ফেলে বৈষ্ণবের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কি কেলাস বললে ? তখনও বুঝতে পারে নি বৈষ্ণব, সে বলেছিল—আজ্ঞে, গুড় ছেকেন কেলাস।

হো-হো ক'রে গোপীবাবু হেসে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তোমার মত মধু কাদ্‌টো কেলাস কি সবাই হয় বৈষ্ণব! তা দাও, ওকে লাগিয়ে দাও, সংসার মধুর অভাবে গুড়েই চলে, তুমিও গুড় ছেকেনেই কাজ চালিয়ে নাও।

মধ্যে মধ্যে গোপীচন্দ্রবাবু সাধারণ চাকরবাকরের সঙ্গেও এমনি মিষ্ট রসিকতা ক'রে থাকেন। চাকরেরাও এই উদার এবং মধুর-প্রকৃতি মনিবটির সামনে নির্ভয়ে এই ভাবে হেসে থাকে। বৈষ্ণব মধ্যে মধ্যে বলে, আমার কর্তাবাবু আষাঢ়ের মেঘ, যেমন রূপ তেমনই শেতল, ও মেঘে জল আছে—বাজ নেই। গাঁয়ের আর-বাবুদের মত কালবোশেখীর মেঘ নয়, দোষে বিনাদোষে চড়াম্‌ ক'রে ডেকে উঠে মাথায় পড়ে না।

গোপীচন্দ্র বললেন, যাও, তা হ'লে কাঠগুলো ন্যায্য দর ক'রে কিনে নাও। ওদের লোকসান ক'রে দিও না যেন। বহুদূর থেকে এসেছে, গরিব লোক, ওদের একটা পয়সা আমাদের এক টাকার চেয়ে বেশি। আর দস্তুরি আমার কাছে নিও। ওদের কাছে নিও না। আচ্ছা, ওটা বরং নিয়েই যাও।

ব'লে দুটি টাকা পকেট থেকে বের ক'রে বৈষ্ণবের হাতে দিলেন।

* * *

এসে দাঁড়ালেন সেই মড়াগাছ না বটগাছটার ধারে। এইখানেই ইস্কুল হবে। পশ্চিমে দক্ষিণে অবারিত প্রান্তর। লাল মাটি এবং কাঁকর-ভরা অনুর্বর বন্ধ্যা জমি। তাঁর উন্নতির প্রথম সময়ে তিনি চাষের জমির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন তিনিও কল্পনা করতে পারেন নাই এই ভবিষ্যৎ। এ গ্রাম থেকে ষোল বছর বয়সে তিনি সামান্য চার টাকা মাইনে এবং খোরাকির চাকরি পেয়ে বেরিয়েছিলেন। সেদিন সামান্য এক টুকরো বাস্তুভিটে ছাড়া আর কিছু তাঁর ছিল না। ভিটের ঘরখানাও ছিল 'ভাঙা-ভগ্ন'।

তারপর—! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন গোপীচন্দ্র। গোটা জীবনের সুখ-দুঃখ মুহূর্তে যেন তাঁর চোখের উপর দিয়ে ভেসে চ'লে গেল।

মধ্যে মধ্যে তাঁর ক্ষোভ হয়, ক্রোধ হয়। রক্তমাংসের শরীর তাঁর, তিনিও তো মানুষ! কি প্রতারণাই না তাঁকে করেছে এখানকার প্রধানেরা। চাকরি-জীবনে উন্নতির প্রথম সময়ে তিনি চাষের জমি সংগ্রহ ক'রে অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থ হয়ে শেষ-জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, ভগবানকে ডাকবেন—এই ছিল কল্পনা। সেদিন তিনি এই গ্রামের প্রধানদের সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—তাঁর বেশ মনে আছে, তিনি লিখেছিলেন—"আপনি গ্রামের প্রধান জমিদার, আমার পিতৃতুল্য। আমি আপনার আশ্রিত স্নেহের পাত্র, আপনার কাছে আমার নিবেদন—আমাকে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। চাকুরি মানুষের স্থায়ী নয়, কথায় আছে—চাকুরির আশ্রয় আর তালপত্রের ছত্রাশ্রয় ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। শরীর অপটু হইলে চাকরি থাকিবে না। অর্থও স্থায়ী নয়। সুতরাং শেষ-কালের দিন কয়টা যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিতে পারি, এই জন্য কিছু চাষের জমি কিনিতে চাই। বিদেশে থাকি, ইহা ছাড়াও আমার অগ্রসর হইয়া কেনায় এবং আপনার অগ্রসর হইয়া কেনায় আকাশ-

পাতাল প্রভেদ। আপনি যে জমিতে হাত দিবেন তাহা ক্রয় করিতে অন্য কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। আমি আপনার উপর ভরসা রাখি, আপনি পিতৃতুল্য পূজনীয়, আপনি আমাকে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া দিন। যখন যে মুহূর্তে লিখিবেন, আমি টাকা পাঠাইয়া দিব। অথবা যদি অনুমতি করেন তবে কিছু টাকা আপনাকে এখনই পাঠাইয়া দিই, আপনার নিকট মজুত থাক, জমি পাইলে ক্রয় করিবেন।"

টাকা তিনি পাঠিয়েছিলেন, অগাধ বিশ্বাস করেছিলেন। তার ফলে এই বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা ভূমিখণ্ডের অধিকারী হয়েছেন তিনি। বহু অর্থ তিনি এর উপর খরচও করেছেন।

এই মরুভূমির মত বালি আর কাঁকরে ভরা ডাঙা কেটে, পাহাড়ের মত উঁচু মাটি কেটে, তিনি চাষের জমি তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। আকারে জমি হয়েছে, নামে জমি হয়েছে, কিন্তু সে জমিতে ফসল হয় না। এই প্রান্তরে তিনি পুকুর কাটিয়েছেন, সে পুকুরে জল থাকে না। বহু টাকা খরচ ক'রে শুধু একটি বাগান তৈরি করেছেন, একটি ছোট পুকুর কাটিয়েছেন। সেই দুটি শুধু সার্থক হয়েছে। পুকুরের নামে কিনে দিয়েছিলেন একটা মজা দীঘি—লড়িয়া পুকুর, তার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে একটা জল-নিকাশী নালা, পাশের একাংশ জুড়ে চ'লে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ভিতরে থাকে এক হাঁটু জল, সে জল দেখা যায় না। মজা দীঘির পাঁকের উপর জন্মায় এক বুক উঁচু ঘাস।

এতে যদি তাঁর ক্ষোভ হয়, তবে কি সে ক্ষোভের অপরাধ আছে?

নারায়ণ! নারায়ণ!

অকস্মাৎ চকিত হয়ে উঠলেন গোপীচন্দ্র, নারায়ণ স্মরণ করলেন। এ কি করছেন তিনি? বার বার নারায়ণ স্মরণ করে তিনি অন্তরের ক্ষোভকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করলেন।

দূরে ছেলেরা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ইস্কুলের আয়োজন-উদ্যোগ দেখতে আসে। ওই ওরাই হ'ল নিষ্পাপ মানুষ, ওরাই হ'ল দেবতার প্রতিনিধি, ওরাই বলবে তাঁর জীবন তাঁর কীর্তি কি ভাবে কোন্ মূল্যে গৃহীত হবে বিশ্বনাথের দরবারে, মহাকালের হিসাব-নিকাশের পাতায়! গোপীচন্দ্র এগিয়ে এলেন ছেলেদের কাছে।

ছেলেরা সসম্ভ্রমে স'রে গেল, পথ ছেড়ে দিলে। ভাবলে, গোপীচন্দ্র ওইখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাবেন। গোপীচন্দ্র দাঁড়ালেন। বললেন, কোথায় এসেছ গো তোমরা?

ছেলেরা চুপ ক'রে রইল, উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল যেন। গোপীচন্দ্র বললেন, কোথায় এসেছ গো? বল? ভয় কি?

মুখুজ্জেদের খোকা বললে, ইস্কুল হবে, দেখতে এসেছি।

ইস্কুল হ'লে তোমরা খুশি হবে? পড়বে এ ইস্কুলে?

হ্যাঁ।

তোমার নাম কি? অতুল নয়?

হ্যাঁ, অতুলচন্দ্র মুখার্জি।

তোমার? তুমি তো জগদীশের ছেলে পঞ্চানন?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভটচাজ্জি মশায়ের নৈবিভ্যির কলা বাতাসা চুরি ক'রে খাও তুমি। আমি শুনেছি। আর তুমি? তুমি কে গো—সব চেয়ে ছোট, আমাকে এমন ক'রে একদৃষ্টে দেখছ?

আমার নাম শ্রীগৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়! রাধাকান্তমামার ছেলে তুমি?

গৌরী ছোট পায়ে দ্রুত এসে গোপীচন্দ্রের পা দুটি স্পর্শ ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। গোপীচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, এমন ক'রে আমাকে কি দেখছিলে বল তো?

গৌরীকান্ত লজ্জিত ভাবে মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল।

বল? চুপ ক'রে রইলে কেন? কি দেখছিলে এমন ক'রে? আমার পাকা চুল?

ঘাড় নাড়লে গৌরীকান্ত—না।

তবে? আমি খুব লম্বা?

আবারও ঘাড় নাড়লে গৌরীকান্ত—না।

তবে? তবে কি দেখছিলে? আমি খুব দুষ্টু লোক?

গৌরীকান্তের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। শিশুর চোখের সে বিস্ময় দেখে গোপীকান্ত অপ্রতিভ হলেন, বললেন, তবে?

এবার গৌরীকান্ত বললে, আপনি মহাপুরুষ, তাই আপনাকে দেখছিলাম।

মহাপুরুষ? চমকে উঠলেন গোপীচন্দ্র: কে বললে? আমি মহাপুরুষ, কে বললে তোমাকে?

মা বলছিলেন। বাবা বলছিলেন। আপনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইস্কুল করেছেন, দীঘি কাটাচ্ছেন, আরও কত করবেন আপনি! আমাদের গ্রাম কত বড় হবে। আপনি নিজে বড়লোক হয়েছেন। আর—

গৌরীকান্তের শ্যামবর্ণ মুখখানি লাল হয়ে উঠল, অকস্মাৎ চুপ ক'রে গেল।

গোপীচন্দ্র মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, আর? বল, আর কি?

আপনার কপালে চাঁদ আছে।

দীর্ঘক্ষণ গোপীচন্দ্র অভিভূত হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস। চল, মিছু ময়রার দোকানে যাব।

গৌরীকান্তকে নামিয়ে দিলেন তিনি।

বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন গোপীচন্দ্র। ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন। ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন ভাগ্যকে, প্রণাম জানাচ্ছিলেন ভাগ্য-বিধাতাকে, সার্থক মানছিলেন নিজের জীবনকে। এত দানে তাঁর জীবন ভ'রে উঠল, এত পাওয়া তিনি পেলেন! বাস্তব পারিপার্শ্বিককে আবরিত ক'রে ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে বাজারের লোকের মুখের সেই প্রসন্ন হাসি; কানের পাশে নূতন

ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠল সাঁওতালদের কথা—আপুনি রাজা হয়েছিস ; ধ্বনিত হয়ে উঠল ওই ছেলেটির কথা, রাধাকান্তের ছেলে গৌরীকান্ত বললে—আপনি মহাপুরুষ, আপনি নিজে বড় হয়েছেন, কত কীর্তি করেছেন, ইস্কুল করেছেন, আরও কত করবেন।

করবেন, গোপীচন্দ্র আরও অনেক করবেন। যেতে যেতে তিনি আবার থমকে দাঁড়ালেন। প্রান্তরটার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরালেন। সমস্ত প্রান্তরটায় তিনি কীর্তির মালা গেঁথে নবগ্রামের গলায় কণ্ঠহার ক'রে পরিয়ে দেবেন। সারি সারি সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ি তৈরি করবেন, মধ্যে মধ্যে চ'লে যাবে লাল মাটির পাকা রাস্তা—লাল সুতোয় সাদা স্ফটিকের হার। বাড়িগুলি হবে ধবধবে সাদা। ইস্কুল হবে, বোর্ডিং হবে, দাতব্য চিকিৎসালয় হবে, টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে, অনাথ আশ্রম হবে, আরও অনেক—অনেক কিছু হবে এই আদিকাল থেকে বন্ধ্যা পতিত প্রান্তরটা জুড়ে। ওই প্রান্তরটা বোধ করি এতকাল ধ'রে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল।

অবারিত পশ্চিম দিগন্তের দিগ্বলয়ে সূর্য তখন পাটে বসেছে, রক্তাভ সূর্য যেন চাকার মত প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। অস্তায়মান সূর্যের রক্তচ্ছটা গোপীচন্দ্রের সুগৌর মসৃণ ললাটের উপর এসে পড়েছে, তাঁর পলকহীন স্বপ্নবিভোর চোখের শুভ্রচ্ছদে তার প্রতিবিম্ব যেন রাঙিয়ে তুলেছে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন। যুগ চ'লে যাবে, যুগান্তর হবে। তিনি থাকবেন না, তাঁর কীর্তি থাকবে, তাঁর নাম থাকবে, লোকে তাঁকে স্মরণ করবে। ভাবতে ভাবতে চোখ তাঁর জলে ভ'রে উঠল। এই তো সার্থক জীবন, এই তো অমৃত। নবগ্রামের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকবে গণেশ-জননীর কোলের গণেশের মত। কোনও আক্ষেপ নাই তাঁর—বর্তমানে সমাজের প্রধানেরা তাঁকে স্বীকার না করুক, ভবিষ্যৎ তাঁকে স্বীকার করেছে। রাধাকান্ত স্বীকার না করুন, তাঁর ছেলে গৌরীকান্ত তাঁকে স্বীকার করেছে। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে ছেলেদের দিকে চাইলেন, খুঁজলেন গৌরীকান্তকে।—কই? ছেলেটি কই? সবিস্ময়ে গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কই, সে কোথায় গেল? রাধাকান্তমামার ছেলে?

মুখুজ্জেদের খোকা বললে, সে চ'লে গেল।

চ'লে গেল? কোথায় গেল?

বাড়ি চ'লে গেল।

বাড়ি চ'লে গেল? কেন?

সে সন্দেশ খাবে না। আপনি ওই দিকে কি দেখছিলেন, তখন সে বললে—আমি সন্দেশ খাব না ভাই, আমি বাড়ি যাই, দেরি হ'লে মা রাগ করবে।

গোপীচন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পঞ্চানন বললে, ওরা বাবু কিনা। ওরা পরের কাছে সন্দেশ খাবে কেন?

গোপীচন্দ্র বললেন, চল, তোমরা চল। তোমরা খাবে চল।

আট

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীকে লোকে বলে—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দেহের গঠনের মধ্যে নাকি লক্ষ্মী-আশ্রিতা নারীর সকল লক্ষণ পরিস্ফুট, বিশেষ ক'রে তাঁর পায়ের পাতায়। এমন সুলক্ষণযুক্ত পায়ের পাতা দেখা যায় না। গোটা পাতাটি মাটির উপর সমান হয়ে পড়ে, এতটুকু ফাঁকা কোথাও থাকে না। তেমনই কি সুন্দর কপালের গড়ন তাঁর! অন্নপূর্ণা দেবীকে ঘরে এনেই গোপীচন্দ্রের ভাগ্যের এত উন্নতি।

ভাগ্য, লক্ষণ, জন্মান্তরের পুণ্যফল এ সমস্তের উপর একালের মানুষের অগাধ বিশ্বাস। এ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই যে—রাজার ফকির হওয়া, কি ফকিরের রাজা হওয়ার রহস্যের অর্থ করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ বিশ্বাসের ভিত্তি পাহাড়ের মত শক্ত। সে কথা বাদ দিয়ে, অর্থাৎ ভাগ্য লক্ষণ জন্মান্তরের পুণ্যফল গুণে এবং পরিমাণে যতই এবং যেমনই হোক সে কথা বাদ দিয়ে, অন্নপূর্ণা দেবীর সাংসারিক গুণপনা বিচার ক'রে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, লক্ষ্মী-আশ্রিতা কথাটা তাঁর সম্পর্কে এক বিন্দু অতিরঞ্জন নয়। যেমন তাঁর স্বাস্থ্য, তেমনই তাঁর কর্মক্ষমতা, তেমনই তিনি মিতব্যয়ী। ভোরবেলা উঠে তিনি এই বিশাল সংসারের দশ দিকে দশভূজার মত হস্ত বিস্তার ক'রে দেন। গোটা তিন-মহলা বাড়িটার প্রতিটি কোণ সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে, যেখানে যে ময়লাটুকু ঝি-চাকরের মার্জনা এড়িয়ে থেকে গেছে, সেটুকু পরিষ্কার ক'রে বাড়ির বাসন গুনে নেন। ছেলে বউ মেয়ে জামাই কর্মচারী চাকরবাকরে বাড়িতে নিত্য প্রতি বেলায় পাতা পড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশখানা। গোপীচন্দ্রের মত ধনীর বাড়িতে বাসনের ব্যবস্থা একখানা থালা, একটা বাটি, একটি গেলাসে চলে না, অনেক বেশি লাগে। ডালের, ঝোলের, দুধের তিনটে বাটি, অম্বলের একটা পাথর বাটি, ঘিয়ের জন্য একটা ছোট বাটি, নুনের জন্য একটা ছোট চাকতি—এ লাগে নিত্য। খাওয়াদাওয়ার বিশেষ আয়োজন হ'লে তার জন্য বের হয় পৃথক বাসন। বিশিষ্ট অতিথি এলে বের হয় রূপোর বাসন। সেই সব বাসনের হিসাব তিনি নিত্যনিয়মিত ক'রে থাকেন, একটি একটি গুনে দেখে নেন। তারপর বসেন তরকারির ডালা এবং বঁটি নিয়ে—ভাতে দেবার আলু, ভাজবার পটল বেগুন উচ্ছে, ঝোলের আলু ছেলেমেয়েদের জন্য গুনে হিসাব ক'রে পাত্রে সাজিয়ে ঠাকুর রামতারণকে বুঝিয়ে দেন। তারপর ঝি শঙ্করীকে সঙ্গে নিয়ে যান ঠাকুরবাড়ি, সেখানকার পূজা-ভোগের আয়োজন দেখেন, সেখানকার বাসনপত্রও মিলিয়ে দেখেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেই এক দিকে গোপীচন্দ্রের জমিদারির কাছারি এবং বিশাল কয়লার ব্যবসায়ের ছোট আপিস একটি। সেখানেও অন্নপূর্ণা দেবী গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরে [illegible] স্মরণ ক'রে জল খেয়ে বসেন গোবরের তাল নিয়ে। বাড়ির পাকা পাঁচিলে নিজে গোবর মেখে ঘুঁটে দেন। ঘুঁটের পয়সার জন্য যে তিনি ঘুঁটে দেন তা নয়, তিনি বলেন—স্বামীর সংসারে যখন আসি তখন ঘুঁটে দিয়েছি, আজ অবস্থা ভাল হয়েছে, মা-লক্ষ্মী দয়া করেছেন ব'লে ঘুঁটে

দেওয়া ছেড়ে দেব ? মা যদি আমার ঘুঁটে দেওয়ার পুণ্যেই এসে থাকেন, তবে সে পুণ্যের অভাবে যে মা ছেড়ে যাবেন। মধ্যে মধ্যে ভাজুনীর সঙ্গেও ব'সে যান মুড়ি ভাজতে। এর পর স্নান-আহার, স্বল্প বিশ্রাম, তারপর আবার বিকেলে সকালবেলার কাজের প্রায় পুনরাবৃত্তি; এর মধ্যে নূতন আছে—দুধ ভাগ করা। বলতে ভুলেছি, সকালের দিকে আর একটা কাজ আছে দুধ দেখে নেওয়া। গোপীচন্দ্রের গোশালা প্রকাণ্ড। সেখানে তিনি দেশী গাই বড় একটা রাখেন না। বড় বড় পাঞ্জাবের গাই, এক-একটায় দুধ দেয় পাঁচ সের সাত সের; এমন গাই আছে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা। এর মধ্যে একসঙ্গে দুধ দেয় তিন-চারটে। পনরো সের আধ মণ দুধ নিত্য হয় গোপীবাবুর বাড়িতে। সেই দুধ দেখে নেওয়া একটা বড় কাজ। মাপ দেখে নিতে হয়, দুধের ঘনত্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিতে হয়। পরিমাণে না কমিয়ে জল মিশিয়ে দুধ চুরি করলে ধরা মুশকিল, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী ঠিক বুঝতে পারেন। মধ্যে মধ্যে তিনি দু-একদিন হুট করে গিয়ে গোশালায় হাজির হন ঠিক গাই দুইবার সময়টিতেই। ওই দুধ আবার জাল দেওয়ার ব্যবস্থা দু-তিন রকমে। আধা জল, সিকি জল মিশিয়ে, জল ঠেকিয়ে, খাঁটি দুধ জাল দেওয়ার ব্যবস্থা, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে ক'রে থাকেন। বিকেলবেলা গেলাসে বাটিতে সেই সব দুধ ভাগ ক'রে সাজিয়ে রেখে দেন। রাত্রে তিনি গিয়ে বসেন ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে। আরতির পর কাছারির নায়েব জমা-খরচের খাতা নিয়ে তাঁর সামনে বসে। সমস্ত দিনের জমা-খরচের হিসাব তাঁকে শুনিয়ে দেয়। অন্নপূর্ণা দেবীর বয়স পঞ্চাশের উপর, অর্থাৎ তাঁর জন্মকাল গিয়ে পড়ে ইংরেজী পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে; সেকালে বাংলার পল্লীগ্রামে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ তো ছিলই না, উপরন্তু বিশ্বাস ছিল—লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের ভাগ্যদেবতা বিরূপ হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকালবৈধব্য ঘটে ব'লে প্রবাদ ছিল। সভ্য বর্ধিষ্ণু-সমাজসম্পন্ন দু-চারখানা গ্রামে বড় বড় ঘরে দু-চারটি মেয়ে লেখাপড়া শিখত। তাও সে লেখাপড়া আঁকাবাঁকা হরফে, ভুল বানানে ভরা লেখা, এবং কোন রকমে রামায়ণ মহাভারত পড়া—কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের পয়ারের রামায়ণ-মহাভারত, সংস্কৃত-ঘেঁষা গদ্য রামায়ণ-মহাভারত নয়। অন্নপূর্ণা দেবীও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু স্বামীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সম্পত্তি যখন তাঁর নামে হতে লাগল, দলিলে দুস্তাবেজে সই করবার প্রয়োজনে তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সে সংসারের কাজের অবসরে লেখাপড়া শিখলেন। লেখাপড়া যৎসামান্য হ'লেও এই মেয়েটির হিসাবজ্ঞান এবং বৈষয়িক বুদ্ধি অসামান্য প্রখর ছিল। নায়েবের হিসাব-নিকাশ শুনে তিনি সে হিসাব বুঝে এবং বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাঁর নিজের একটা স্বতন্ত্র সুদি কারবার আছে। সামান্য টাকার কারবার নয়, অন্তত দশ-পনরো হাজার টাকা নিয়ে তিনি তাঁর এই নিজস্ব কারবারটি চালিয়ে থাকেন। তাঁর নামে গোপীচন্দ্রের লাখ লাখ টাকা খাটে, সে টাকা বাদ দিয়ে এ টাকা তাঁর নিজস্ব।

ভাগ্যবতী অন্নপূর্ণা দেবী ভাগ্যের অহঙ্কারে স্বাভাবিক ভাবেই অহঙ্কৃতা, তার উপর ভাষা তাঁর কর্কশ এবং বাক্য অত্যন্ত রূঢ়। গোপীচন্দ্রের বিনীত প্রকৃতি এবং মধুর ভাষার ঠিক বিপরীত। ছেলে মেয়ে বউ অন্নপূর্ণা দেবীর ভয়ে অস্থির, গোপীচন্দ্রও অন্নপূর্ণা দেবীকে

ভয় ক'রে চলেন।

খেতে ব'সে গোপীচন্দ্র স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মেজাজটা বুঝে নিলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ গম্ভীর। গোপীচন্দ্র নীরবেই আহারে মনোনিবেশ করলেন। ভেবে পেলেন না, কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করলে স্ত্রীর মেজাজ নরম হয়ে আসবে।

দুটি প্রস্তাব আছে তাঁর।

প্রথম প্রস্তাব, অন্নপূর্ণা দেবীর নামে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। এর জন্য অন্নপূর্ণা দেবীকে একটি কাজ করতে হবে। এবার সাহেব আসবেন হাই ইংলিশ ইস্কুলের ভিত্তি-স্থাপন করতে, তখন অন্দরের বাইরের দিকে উঠানে ছোট একটি মণ্ডপে অন্নপূর্ণা দেবীকে উপস্থিত হয়ে একটা রূপার থালায় এক হাজার টাকা সাহেবের টেবিলের উপর নামিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে—অবশ্য গোপীচন্দ্রই তাঁর হয়ে ব'লে দেবেন—এই টাকা আমি আপনার হাতে দিচ্ছি একটি বালিকা-বিদ্যালয় যাতে স্থাপিত হয়, তাই করতে হবে হুজুর বাহাদুরকে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, তিনি অন্নপূর্ণা দেবীকে রাধাকান্তের স্ত্রীর কাছে পাঠাতে চান। গৌরী-কান্তের জন্য কিছু মিষ্টি পাঠাবেন তিনি।

প্রথম প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর খুব আশঙ্কা নাই। অন্নপূর্ণা দেবী রাজী হবেন। প্রথমে হয়তো 'না' বলবেন, কিন্তু রাজী হবেন, নিজে রাজী না হ'লেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে রাজী করাবেই। আশঙ্কা তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে। হয়তো জ্ব'লে উঠবেন অন্নপূর্ণা দেবী। হয়তো বলবেন—কি বললে? আমি যাব থালা হাতে নিয়ে?

দাদা!

গোপীচন্দ্র মুখ তুললেন। তাঁর বোন জ্ঞানদা এসে ঘরে ঢুকল।

অন্নপূর্ণা দেবী মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন। গোপীচন্দ্র মিষ্ট হেসে সম্ভাষণ জানালেন, জ্ঞানো! আয়, ব'স।

জ্ঞানদা বসলেন, হাঁটুতে হাত দিয়ে একটু কষ্ট ক'রে বসতে হ'ল তাঁকে, বললেন, বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি দাদা। একবার বেলেগাঁয়ে ধরমবাবার কাছে না গেলে আর চলছে না। এই রবিবারে পাড়ার এক দল যাবে, তা তোমার মত না নিয়ে তো—। একটু হাসলেন জ্ঞানদা, তারপর বললেন, বউকে শুধালাম তো বউ বললে—আমি জানি না, তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর। কি করব বল? যাব?

গোপীচন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, আমি কি বলব? যা বলবার তুমি বল। ওরা সব যাবে হেঁটে। ঠাকুরঝিকে হেঁটে পাঠাতে চাও, পাঠাও। লোকে যখন শুনবে—অমুক গাঁয়ের অমুক বাবুর ভগ্নী হেঁটে এসেছে, তখন তারা বলবে কি!

গোপীচন্দ্র বললেন, ওঁদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয় যাও, বারণ করব না। কিন্তু গিন্নী ঠিক বলেছে, হেঁটে যাওয়া হবে না তোমার, গাড়ি ক'রে যাও। গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

হাঁটুতে হাত বুলিয়ে জ্ঞানদা বললেন, তাতে কথা হবে না? সকলে হেঁটে যাবে, আর—। থেমে গেলেন জ্ঞানদা। একটু থেমে আবার বললেন, বলবে—বড়লোকের—

বাধা দিয়ে অন্নপূর্ণা বললেন, তা বলুক।

গম্ভীর ভাবে গোপীবাবু বললেন, তা হ'লে তুমি আলাদা যাও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সঙ্গী-সাথী নিয়ে দল বেঁধে দেবস্থলে যাওয়া মেয়েদের একটা বড় আনন্দ। বললেন, তাই যাব। তোমার মান খাটো হয় এমন কাজ করব কেন?

ঠাকুর এসে গোপীচন্দ্রের থালার পাশে অম্বলের পাথরবাটি নামিয়ে দিলে। জ্ঞানদা পাথরবাটির দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে যেন অবাক হয়ে গেলেন, তারপর লম্বা টানা সুরে বললেন, হ্যাঁ বউ, আমার দাদার পাতে ভাঙা পাথরবাটিতে অম্বল! কি ব'লে তুমি ওই ভাঙা পাথরবাটি দিতে বললে ঠাকুরকে?

অন্নপূর্ণা দেবী অপ্রস্তুত হলেন। কথাটা অন্যায় বলেন নি জ্ঞানদা। জ্ঞানদা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, তারণ—রামতারণ!

গোপীচন্দ্র পাথরবাটিটি তুলে নিয়ে ভাঙা মুখে অম্বলের ঝোল গড়িয়ে নিয়ে, হেসে বললেন, তুমি জান না জ্ঞানদা, ভাঙা পাথরবাটিটায় অম্বল খেতে আমি ভালবাসি, দেখ না—অম্বলের ঝোল গড়িয়ে নিতে কত সুবিধে!

অন্নপূর্ণা হেসে ফেললেন। জ্ঞানদাও হাসলেন। গোপীচন্দ্র বললেন, বগি থালার চেয়ে কানা-উঁচু থালায় ভাত খেতে আমি ভালবাসি। বাটিতে ডাল খাওয়ার চেয়ে ভাতের মাথায় গর্ত ক'রে ডাল নিয়ে খাওয়া আমার পছন্দ বেশি। কিন্তু করব কি? বাইরে হবার তো জো-ই নেই, ঘরেও তোমরা সব হাঁ-হাঁ করবে।

জ্ঞানদা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তর এনে ফেললেন, তিনি বোধ হয় এমনই একটি মিষ্ট আবহাওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। বললেন, আর একটি কথা বলছিলাম আমি দাদা।

কি? কলকাতায় একবার বাতের চিকিৎসা করাবে?

সে পরে হবে দাদা। আগে বাবার দয়া দেখি। তারপর না সারে তো তখন তুমি আছ, ভাইপোরা রয়েছে, সে কি আর না-দেখানো হবে! পবিত্র তো বলছিল—চল না কেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। সে কথা নয়।

তবে?

পবিত্র বলছিল, ওরা সব ছেলেপিলেরা মিলে একটা থিয়েটার করবে। কলকাতার মত।

থিয়েটার করবে?

হ্যাঁ। তোমার দৌলতে আমরা কলকাতা যাই আসি, আমরা কলকাতায় না হয় থিয়েটার দেখেছি। গাঁয়ের লোকে তো দেখে নাই। গাঁয়ের সব ছেলেদেরও খুব সাধ। তা আমাকে এসে ধরেছিল—তুমি বাবাকে ব'লে দাও পিসীমা।

গোপীচন্দ্রের কপালে সারি সারি চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি চিন্তিত হলেন। থিয়েটার! তাঁর আমলেই এ গ্রামে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ওই রাধাকান্ত স্বর্ণকমল—এরা এক সময় যাত্রার দল গড়েছিলেন। দীনবন্ধুবাবু উকিল ছিলেন, রাধাকান্ত তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান; আদর পেয়ে লেখা-পড়া করেন নি, কিন্তু শখ ছিল প্রচুর, তিনি উদ্যোগী হয়ে যাত্রার দল করেছিলেন। পবিত্র—!

অন্নপূর্ণা বললেন, আমাকে বলেছিল। আমি বলেছি—বাবু মত করেন তো আমার অমত নাই। আমাকে টাকার জন্তে ধরেছিল। তাতেও ওই কথা আমার, বাবু বললে দোব।

ছোট ছেলে পবিত্র সম্পর্কে তিনি অনেক আশা করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কল্পনা করতেন, এই ছেলেটির বিদ্যাগৌরবে তাঁর এই সম্পদগৌরব ধন্য হবে, সোনার কলসের চূড়া-বসানো মন্দিরের মত সমগ্র দেশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। ছেলেটিকে ভালও বাসতেন প্রাণের তুল্য। সে যা যখন চেয়েছে, তাই তখনই দিয়েছেন। পবিত্রের রুচি এবং ব্যবহার দেখে এ আশা তাঁর আরও উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। পবিত্রের ভাষা তাঁর মত মধুর, প্রকৃতিও তাঁর মত মিষ্ট, সে ইস্কুলে পড়তে পড়তেই পদ্য রচনা করে, গানবাজনায় গাঢ় অনুরাগ, প্রচুর বই কেনে এবং পড়ে। বেশভূষায় এমন সুন্দর বৈশিষ্ট্য তার ফুটে ওঠে যে গোপীচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে যান। সেই পবিত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল। তিনি এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও করেন নি। তবুও ছেলেকে ডেকে তিনি তিরস্কার করলেন না, সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ভাল ক'রে পড় এবার।

পবিত্র আবার এক বৎসর পড়লে। ভাল ক'রে পড়লে, তাতে সন্দেহ রইল না কারুর। বই পড়ার বিরাম ছিল না তার। লেখারও বিরাম ছিল না। বৎসর শেষ হতে না হতে ছোট একখানি উপন্যাসও ছাপিয়ে ফেললে। কিন্তু পরীক্ষাতে আবারও ফেল ক'রে বসল।

পবিত্রের জীবনে তখন বাংলা দেশের অন্য হাওয়া লেগেছে। গোপীবাবু তাকে পণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীভূষিত দেখতে চেয়েছিলেন। পবিত্র তাঁর প্রেরণা গ্রহণ করেছে নিজের মত ক'রে ; সে হতে চেয়েছে সাহিত্যিক কবি। বাংলা দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে নূতন জাগরণ হয়েছে সেই জাগরণের স্পর্শ তার মর্মকে উতলা করেছে। এদিক দিয়ে তার আর একজন সহযাত্রী এবং বন্ধু আছে এই নবগ্রামেই। মুখুজ্জেদের কিশোর তার সমবয়সী, সহপাঠী এবং সহযাত্রী। কিশোরের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা আজীবন। কিশোর কিন্তু বুদ্ধিতে এবং স্মৃতিশক্তিতে পবিত্র অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সে প্রথম বারেই এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়ছে। দ্বিতীয় বার ফেল করার সঙ্গে সঙ্গে গোপীচন্দ্র সচেতন হলেন। পবিত্রের লেখা উপন্যাসখানি গোপনে কিনে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটি প্রেমের কাহিনী। ছেলেকে ডেকে বললেন, আর ইস্কুলে পড়তে হবে না। ঘরে মাস্টার থাকুন, ইংরিজী পড়। আর আপিসে বের হও।

কলকাতায় আপিসে ভর্তি হ'ল পবিত্র। হঠাৎ আজ শুনলেন, সে গ্রামে থিয়েটার করতে চায়।

অন্নপূর্ণা দেবী পবিত্র সম্পর্কে স্বামীর মনোবেদনার কথা জানেন, তাই কথাটা নিজে না ব'লে জ্ঞানদাকে দিয়ে বলালেন। ঠিক সেই কারণেই এতখানি বিনয় এবং ভক্তির আতিশয্য।

গোপীচন্দ্র হাসলেন এবার। হাসলেন অন্নপূর্ণার বিনয় এবং তাঁর প্রতি ভক্তির আতিশয্য দেখে। পবিত্র লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য গোপীবাবুর মনে আক্ষেপ আছে। মনে মনে তাঁর এই দিক দিয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি নিজে দরিদ্রের সন্তান, লেখাপড়া শেখবার

অবকাশ পান নাই, তাঁদের কালে লেখাপড়া শেখার সুযোগও ছিল না। তাঁর বাল্যকালে ফারসী মক্তব উঠি-উঠি করছে, দেশে ফারসীর বদলে ইংরেজী ভাষার প্রচলন সবে শুরু হয়েছে। বাংলাছাত্রবৃত্তি ইস্কুল সত্য সত্য দেশে দু-চারটে হচ্ছে, সংস্কৃত টোলের পণ্ডিতদের তখন দুরবস্থার একশেষ বললেই হয়, জমিদার-রাজাদের বাড়িতে টোল আছে বটে, ছাত্র বিশেষ হয় না। অনেক পণ্ডিত নিজেদের বাড়িতে টোল রাখেন, সেখানে ছাত্র দুটি একটি। সংস্কৃত শিখে পুরোহিতপূজক হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। পণ্ডিতদের খ্যাতি ও সম্মান তখন এক রকম বিলুপ্ত হয়েছে বললেই হয়, বরং বিপরীত খ্যাতি রটেছে। সভ্যসমাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শুনলেই ঠোঁট ওলটায়, অন্তরালে বলে—গোঁড়া। লোভী স্বার্থপর ব'লে অবজ্ঞা করে। নইলে হয়তো গোপীচন্দ্র সংস্কৃত পড়তেন। ওই বিদ্যাটি বিনামূল্যে পাওয়া যেত। ছাত্রবৃত্তি প'ড়ে চাকরি-বাকরি পাওয়া যেত; কিন্তু বেতনের জন্য পড়া তাঁর হয় নি। তাই তাঁর জীবনে যখন প্রতিষ্ঠা এল, যখন তিনি ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের সমাজে ঘোরাফেরা শুরু করলেন, তখন তাঁর এই আক্ষেপ জাগল। বড় বড় পণ্ডিতদের নাম এবং সম্মান তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। দেশে তখন ইংরেজী শিক্ষার হাওয়াও জোর বইতে শুরু করেছে।

বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্র জেদী। অত্যন্ত জেদী। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকেই তার ব্যবসায়ে প্রবল অনুরাগ। প্রচুর সযত্ন ব্যবস্থা সত্ত্বেও সে অল্প দূর প'ড়েই ইস্কুল ছেড়ে দিলে, গোপীচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে সে শুরু ক'রে দিলে কয়লা-কেনা-বেচা ব্যবসা। অগত্যা গোপীচন্দ্র তাকে ব্যবসায়ের গদিতে বসিয়ে দিলেন। প্রয়োজনও ছিল। তাঁর ব্যবসা তখন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে; শুধু ভারতবর্ষ কেন, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, এডেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ইংলণ্ড পর্যন্ত কারবার চলছে; বাংলা দেশের ঝরিয়া ও বরাকর কয়লা-এলাকায় তাঁদের খনির সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতবর্ষে ইংরেজ কয়লা-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসায়কে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। এই ব্যবসায়ে তিনি কীর্তিচন্দ্রকে বসিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন, অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে ব্যবসায়বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় কীর্তিচন্দ্র হার মানবে না।

অন্নপূর্ণা দেবী ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, হাসলে যে! গোপীচন্দ্রের হাসিটুকু তাঁর গায়ে স্বাভাবিক ভাবেই বেজেছে।

হাসি হ'ল আনন্দের লক্ষণ গিন্নী, আনন্দ হ'ল ব'লে হাসলাম। ভারি মিষ্টি লাগল তোমার কথাগুলি। তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। ছেলেবেলায় যাত্রা দেখে আমার ভারি শখ হয়েছিল—যাত্রার দলে যাবার। টুকটুকে চেহারা ছিল—অধিকারী মহাখুশি। বলে—রাধা সাজাব তোমাকে। গেলে কি হ'ত বল দেখি?

ভালই হ'ত। চন্দ্রলগ্নে পুরুষ তুমি, শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলের অধিকারী হতে। পাটি-পাড়া চুল মাথায় দিয়ে দূতী সেজে আসর আলো ক'রে বসতে।—বুদ্ধিমতী অন্নপূর্ণা রসিকতাটুকু শেষ ক'রে স্বামীর আসল বক্তব্যের জবাব দিলেন, বললেন, তা পবিত্র তো পেশাদারী থিয়েটারে চাকরি করতে যাচ্ছে না। শখ ক'রে দু-চার বার থিয়েটার করবে।

আলোচনায় বাধা পড়ল। নায়েব প্রসন্ন মিত্র এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলে, কর্তাবাবু!

প্রসন্ন।—ঈষৎ চকিত হলেন গোপীচন্দ্র। এই কিছুক্ষণ আগে তিনি কাছারি থেকে উঠে এসেছেন। কাজকর্ম শেষ ক'রে এসেছেন। আবার কি কাজ পড়ল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কাজ ছিল।

এস, ভেতরে এস।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কেরানী এসেছেন। সাহেবের চিঠি এনেছেন।

কি চিঠি ? কি লিখেছেন ? চিঠি কই ?

বিশেষ জরুরী চিঠি না হ'লে কেরানীকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা নয়। সাধারণত চিঠি ডাকেই আসে। সরকারী হুকুম, আদালতের নির্দেশ এ আসে পিওন মারফৎ, তারা জারি ক'রে যায় নোটিশ এবং সমন।

প্রসন্ন মিত্র বললেন, অমরবাবু চিঠি পড়ছেন, কীর্তিবাবু আছেন, পবিত্রবাবু—

অমরবাবু ? আমাদের অমর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে কোথা থেকে এল ? কখন এল ? গোপীচন্দ্রের মুখের শুভ্র বর্ণে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। উত্তেজনার স্পর্শ লেগেছে তাঁকে। অমরচন্দ্র অন্নপূর্ণা দেবীর বোন-পো। বাল্যে পিতৃহীন অবস্থায় দরিদ্র ছিলেন। গোপীচন্দ্রই তাঁকে মানুষ ক'রে তুলেছেন। ছেলেরা তাঁর লেখাপড়া শিখলে না, কিন্তু অমরচন্দ্র তাঁর মর্যাদা রেখেছে। কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস ক'রে এলাহাবাদে কলেজে প্রফেসারি করছে। অমর এমন হঠাৎ চ'লে এল ? তবে এসেছে ভালই হয়েছে, আজ তাকেই যেন প্রয়োজন তাঁর সব চেয়ে বেশি। তিনি প্রসন্নকে বললেন, চল, যাই।

দুধের বাটিটা তিনি টেনে নিলেন।

ভালই হয়েছে। অমরকে তিনি এখন ছেড়ে দেবেন না। ইস্কুলের কাজকর্মের সকল ভার তার উপরেই তুলে দেবেন। সায়েব আসবেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে, তার উদ্যোগ অমরই করুক। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে অন্নপূর্ণাকে রাজী সে-ই করাবে।

পবিত্র থিয়েটার খুলবে: তার ভাল-মন্দও অমরের কাছেই ভাল ক'রে বুঝবেন তিনি।

* * *

আহম্মদ সাহেব কেরানী পাঠিয়েছেন।

কমিশনার সাহেবের আপিস থেকে জরুরী পত্র এসেছে—"নবগ্রামে জনৈক গোপীচন্দ্র লড়িয়া নামক সিচের পুকুর কাটিয়ে ওখানকার উত্তরাংশের জমির জল-নিকাশী নালা এবং দক্ষিণাংশের জল-সেচনের নালা বন্ধ করছে। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারের আপিসের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগে এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে ব'লে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। স্থানীয় লোক প্রতিবাদ ক'রে তারযোগে আবেদন জানিয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য জেলার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি যেন স্বয়ং এর তদন্ত ক'রে যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেরানীকে পাঠিয়েছেন। যথারীতি নোটিশ হাতে দিয়ে নোটিশে জানিয়েছেন—"এতদ্বারা গোপীচন্দ্র ব্যানার্জি, তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তদন্ত-সাপেক্ষ তুমি লড়িয়া নামক পুষ্করিণী কাটানো বন্ধ রাখিবে। আগামী মাসের দোসরা তারিখে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গিয়া তদন্ত করিয়া সত্যাসত্য নির্ধারণপূর্বক আদেশ দিবেন।"

আরও একখানি পত্র পাঠিয়েছেন সাহেব। ডি. ও. অর্থাৎ আধাসরকারী আধা-ব্যক্তিগত পত্র। নিজ হাতে লিখেছেন। আগামী দোসরা স্কুলে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন স্থির করা হ'ল। এখান থেকে সরকারী কর্মচারীরা এই অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দেবেন। প্রত্যেককে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়। এস. ডি. ও. এস. পি. সিভিল সার্জন, দুজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, পাশের সাব-ডিবিশনের এস. ডি. ও., নবগ্রামের চৌকির মুন্সেফ, সার্কেল পুলিস ইন্সপেক্টর—এঁরা প্রত্যেকেই গোপীচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে বিশেষ আনন্দিত হবেন।

কেরানীটি বিনীত হাসি হেসে বললে, পুকুর নিয়ে ওই নোটিশটার জন্য ভাববেন না। সায়েব খুব চ'টে গিয়েছেন। বেনামী ব্যাপার হ'লেও তিনি বুঝতে পেরেছেন—কে করেছে দরখাস্ত। তবু আইন মেনে তো চলতে হবে। একটা তদন্ত তিনি করবেন।

পকেট থেকে দুখানি পত্র বার ক'রে দেখিয়ে আবার বললে, স্বর্ণবাবুকেও পত্র দিয়েছেন। একখানা নোটিশ, একখানা পত্র। নোটিশে লিখেছেন—এই তদন্তের সময় মতামত জানাবার তোমার প্রয়োজন হবে ব'লে মনে করি। তুমি দোসরা তারিখে বেলা দশটার সময় পুকুরের ওখানে উপস্থিত থাকবে।

অপর পত্রখানি পত্রই, নোটিশ নয়। কিন্তু গোপীচন্দ্রের পত্রের মত সাহেবের নিজের হাতে লেখা ডি. ও. অর্থাৎ আধা-সরকারীও নয়, রীতিমত সরকারী ভঙ্গিতে কেরানীর হাতে লেখা পত্র—প্রতিটি শব্দ ও ছত্র হাকিমী সুরে গাঁথা। পত্রখানি বন্ধ ছিল, কেরানীবাবুটি মুখেই গড়গড় ক'রে ব'লে গেলেন ভিতরের পত্রমর্ম, তিনিই নিজে হাতে লিখেছেন। পত্রে জেলার রাজপ্রতিনিধি লিখেছেন—নবগ্রাম শিবচন্দ্র এম. ই. স্কুল পরিদর্শন ক'রে স্কুলের অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ওই স্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে তোমাকে কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটির কথা জানাতে চাই। স্কুলের বাড়ির যে রকম শোচনীয় অবস্থা, তাতে, ওই বাড়িতে স্কুল থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং তাদের মন এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কখনই স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না। স্কুলের প্রতিটি আসবাবও অনুরূপ ভাবে জীর্ণ। আরও দুঃখের কথা, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিত ভাবে বেতন পান না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি প্রতিনিধি-মূলক নয়, কমিটির মনোভাব স্কুল সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে উদাসীন, সেক্রেটারি হিসাবে তোমার পরিচালনা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এই সব বিবেচনা ক'রে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি অবহিত হয়ে তিন মাসের মধ্যে স্কুলের যাবতীয় সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ ক'রে ফেল, নূতন ক'রে ম্যানেজিং কমিটি গঠন কর। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, গ্রাম্য বিবাদ হেতু যোগ্যতম ব্যক্তিদের সযত্নে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অবিলম্বে বর্তমান মাসের

মধ্যেই হালফিল পরিশোধ করা চাই। অন্যথায় স্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হবে। প্রয়োজন হ'লে সরকার হস্তক্ষেপ ক'রে সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

নিচে লেখা আছে—জেলা স্কুল ইন্সপেক্টারের কাছে পত্রের নকল পাঠানো হ'ল।

কীর্তিচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। অমরচন্দ্র চুপ ক'রেই ব'সে ছিলেন। পবিত্র যেন একটু লজ্জিত হয়েছে। তার মনে হয়েছে, এ যেন গোপনে পরচর্চা হচ্ছে।

গোপীচন্দ্র গম্ভীর স্তব্ধ। নীল চোখের দৃষ্টিতে এতক্ষণ পর্যন্ত একটি পলক পড়ে নাই। এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষীণ এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। কেরানীবাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আপনি তা হ'লে বিশ্রাম করুন আজ। কাল সকালে সাহেবকে পত্র লিখে দেব।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবার বললেন, তাই হবে। সাহেব যা হুকুম করেছেন, তাই করব আমি। পুকুর কাটানো বন্ধই রইল। আর দোসরা তারিখেই ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন লেইংয়ের আয়োজন করছি আমি।

কেরানীবাবু বললেন, আমি একবার স্বর্ণবাবুর ওখান হয়ে আসি। সকালে দেখা ক'রে ফিরতে আমার দেরি হবে।

বেশি দেরি করবেন না। এখানে আহার প্রস্তুত হয়ে গেছে বোধ হয়। মিত্রের দিকে ফিরে বললেন, ওঁর বিছানা তৈরি করিয়ে রাখ মিত্তির।

গোপীচন্দ্র বাড়ি ফিরে খাটের উপর স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। ফুরসীতে তামাক পুড়ে যাচ্ছে, কল্কের মাথা থেকে সরু সাপের মত এঁকে-বেঁকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে, মিষ্ট গন্ধে ঘরখানা ভ'রে গেছে, নলটা বিছানার উপরেই প'ড়ে আছে, গোপীচন্দ্র নলটা স্পর্শও করেন নাই। অমরচন্দ্র কীর্তি পবিত্র—এরা খেতে বসেছে দরদালানে। অমরচন্দ্রের সঙ্গে দু-তিনটি কথা বলেছেন মাত্র। প্রশ্ন করেছেন—ভাল আছ ?

হ্যাঁ। আপনার শরীর—

শারীরিক ভালই আছি। তুমি হঠাৎ—। আচ্ছা থাক্, কথাবার্তা পরে হবে। খাওয়া-দাওয়া ক'রে উপরে এস। হাত মুখ ধোও।

ব'লেই তিনি উপরে এসে বসেছেন। মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় বইছে। দুরন্ত ক্ষোভে তাঁর সারা অন্তরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কি কদর্য এই সব মানুষ! আর এরাই হ'ল সমাজের প্রধান, এরাই হ'ল গ্রামে দেশে সম্মানিত; এদেরই প্রশংসায় লোকে পঞ্চমুখ! তিনি সিচ বন্ধ করতে চান না, জল-নিকাশী নালার মুখও বন্ধ করবেন না, সে কথা তিনি নিজে সবিনয়ে সেদিন স্বর্ণকে বলেছেন। কিন্তু অকারণে শুধুমাত্র গভর্মেণ্টের ঘরে তাঁকে নিন্দাভাজন করবার জন্যই এই টেলিগ্রাম স্বর্ণ করেছে।

একা স্বর্ণকেই বা দোষ কেন? এই নবগ্রামের সমস্ত ভদ্র সমাজ আজ তাঁর বিরোধী। তাঁর অপরাধ—তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্রের ঘরে। কুলগৌরবে তিনি কারুর চেয়ে খাটো

নন, উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান, ওই স্বর্ণকমলেরই জ্ঞাতি। দরিদ্র হয়ে জন্মেছিলেন; কিন্তু নিজের কর্মবলে, ভাগ্যফলে তিনি আজ ধনের অধীশ্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না, তবুও ওই এক অপরাধে তাঁকে নবগ্রামের এই ক্ষুদ্র জমিদার-বংশধর-সম্প্রদায় অস্বীকার করতে চায়, তাঁর সকল কর্মে বাধা দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। ঈর্ষাতুর কুটিলচিত্ত চরিত্রভ্রষ্ট এই গ্রাম্য অভিজাতগুলি অন্তরে যত ক্ষুদ্র, প্রকৃতিতে তেমন জটিল। এই হাই ইংলিশ স্কুল হ'লে সর্বাপেক্ষা উপকৃত হবে এরাই। এদের সন্তান-সন্ততিদেরই লেখাপড়া শেখার সুবিধা হবে সব চেয়ে বেশি। তিনি খুব ভাল ক'রেই জানেন যে, বাইরের স্কুলে বোর্ডিংয়ে রেখে ছেলে পড়াবার সাধ্য এদের নাই। দেশের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে লেখাপড়া হোক বা না-হোক—ছেলেদের পড়াতে হয়। গোপনে দেনা করে, জমি বিক্রি করে। বিক্রি করে না, প্রজাদের জমি বন্দোবস্ত করে, দুদিন পরে কোন একটা কুটবুদ্ধির আশ্রয়ে ওই জমিতে গোলমাল বাধিয়ে আবার টাকা আদায় করে। ছেলেরা বোর্ডিংয়ে থেকে শহরের ফ্যাশান এবং চাল ও বুকনি শিখে কয়েক বৎসর এক ক্লাসে থেকে বাড়ি ফিরে এসে বসে। গ্রামে স্কুল হ'লেও লেখাপড়ার দিক দিয়ে হয়তো তাইই হবে—বেশি কিছু হবে না, কিন্তু দেনার দায় থেকে তো অব্যাহতি পাবে। আর লেখাপড়ার দিক থেকেই বা হবে না কেন? বাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করলে দু-চারটি ছেলে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেও পারে। গোপীচন্দ্রের ক্ষুব্ধ মন ঝ'ড়ো মেঘে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মত সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরে দিতে চাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, থাক্, স্কুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প থাক্, এই নবগ্রামের জন্য তিনি কিছু করবেন না। চ'লে যাবেন তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে। কলকাতায় বাড়ি করবেন, সেইখানেই থাকবেন তিনি। এই অকৃতজ্ঞ মানুষেরা, এই কুটিলচিত্ত ঈর্ষাতুরেরা পচুক এইখানে থেকে। তিনি জানেন, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন—স্বর্ণকমলের ওই মাইনর ইস্কুল, ও আর বেশিদিন চলবে না। উঠে যাবে। অন্ধকার নবগ্রামে আরণ্য জন্তুর মত এরা পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধ'রে ছেঁড়াছিঁড়ি করুক। গোপীচন্দ্রের নীল চোখের দৃষ্টি রোদের ছটায় প্রদীপ্ত দুটি নীলা পাথরের মত প্রখর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু গোপীচন্দ্রের মনের পরিধি এত ছোট নয়, আকাশের যেটুকু উচ্চতায় পৃথিবীর মৃত্তিকার উত্তাপের ফলে মেঘ জ'মে ঝড় ঘনিয়ে ওঠে, ততটুকুর মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ নয়; কোন মানুষেরই তা নয়। মনের আরও একটা অংশ আছে, মাটির উত্তাপ মাটির ধুলা উত্তপ্ত করে না, মলিন করে না—এমন একটা ঊর্ধ্বলোক আছে। গোপীচন্দ্র কৃতী মানুষ, বিশাল কর্মজগতে তাঁর ঘোরাফেরা, তাঁর মনের সে ঊর্ধ্বলোক সাধারণের চেয়ে অনেক বিস্তৃত, অনেক উচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত, দিনে সেখানে সূর্যোদয় হয়, রাত্রে সেখানে ওঠে চাঁদ; মাটির উত্তাপে যখন ঝড় ওঠে, নিচের আকাশে তখনও সেখানে সূর্য চন্দ্র পালাপালি ক'রে জাগে; তখনও সে অংশ থাকে আলোকোজ্জ্বল প্রসন্ন স্থির। সেখানকার আলো মেঘের আবরণকে ছিন্নভিন্ন ক'রে সরিয়ে দিয়ে প্রসারিত হতে চায় মাটির বুক পর্যন্ত। মেঘের ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে আলো এসে পড়ে ওই মাটির বুকের উপরের স্তরের মত মনের অংশে। মধ্যে মধ্যে মেঘস্তর

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আলোর প্রভার প্রসন্নতায়।

ওই মনে গোপীচন্দ্র এই ক্ষোভ এই ঘৃণার উর্ধ্বে, তিনি বার বার এই ক্ষোভ এই ঘৃণাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, মুছে ফেলতে চান। ওখানে ক্ষমাপ্রসন্ন মনে বার বার এই কথাই বলেন—না না না। কার উপর ক্রোধ! কার উপর বিদ্বেষ! মানুষ হয়ে সংসারে এসেছি, আমার কর্তব্য—দশের সেবা, সমাজের কল্যাণ; মানুষের সংসারে মানুষের চেয়ে দুঃখী আর নাই। দুঃখের অবধি নাই, প্রতিটি জন দুঃখে জর্জরিত অহরহ। হায় রে, তবু মানুষ মানুষকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু দেয় না! দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ দিয়ে এ পৃথিবীতে দুঃখের বোঝা মানুষ বাড়িয়েই চলেছে। পূর্বজন্মের পুণ্যফলে সংসারে এক-আধজন সুখের অধিকারী হয়! দুঃখী মানুষের দুঃখ দেওয়ার প্রতিশোধে সেও যদি মানুষকে দুঃখ দেয়, তবে আর মানুষের পরিত্রাণ কোথায়? দুর্যোগ-ভরা অন্ধকারে মানুষ যখন অধীর অস্থির হয়ে পরস্পরকে আঘাত করে, তখন যে দু-চারজন ভাগ্যবশে আলো পেয়েছে হাতে—তারা যদি আলোর বদলে অন্ধকারই দিতে চায় মানুষকে, তবে সে আলো নিবিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু তাতে তো শুধু অন্ধকারের ভাগ্য নিয়ে যারা এসেছে তারাই অন্ধকারের দুঃখ ভোগ করে না, যারা হাতের আলো নিবিয়ে দেয় তাদেরও ভোগ করতে হয় অন্ধকারের দুর্যোগের দুর্ভোগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম গোপীচন্দ্রের, তিনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন; এ জন্মের সৎকর্মের পুণ্যফল জন্মান্তরে মহত্তর বৃহত্তর সুখ এবং সৌভাগ্যের অধিকারের কল্পনা তাঁর এই ভাবনাকে প্রেরণা দেয়, এই প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। তাঁর বিক্ষোভের মেঘকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে মনের উর্ধ্বলোকের প্রসন্ন আলোর ধারা। আলোক এবং অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকেন, খাটের উপর সামনে ফুরসিতে তামাক পুড়ে যায়, নলটা প'ড়েই থাকে, তিনি তা স্পর্শ করেন না।

অমরচন্দ্র এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে কীর্তিচন্দ্র। অমরচন্দ্র গলা পরিষ্কার করার অজুহাতে শব্দ ক'রে সাড়া দিলেন। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে অমরচন্দ্রকে দেখে স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হেসে বললেন, এস। ব'স।

কীর্তিচন্দ্র বিনা ভূমিকায় সোজা ব'লে দিলেন, আপনি কাদের জন্যে ওসব করতে যাচ্ছেন? এ সব বন্ধ ক'রে দিন।

হাসলেন গোপীচন্দ্র, নলটা তুলে নিলেন—দু-একটা টান দিয়ে বললেন, কারও জন্যেই তো আমি কিছু করতে যাচ্ছি না। আমি যা করতে যাচ্ছি সব নিজের জন্যে।

তামাকে আরও দু-একটা টান দিয়ে বললেন, নিজের জন্যে ছাড়া যদি কারও কিছু হয় এ থেকে, সে হবে তোমাদের—মানে, আমার বংশের।

অমরচন্দ্র কোন প্রশ্ন করলেন না, তবে অনুমান করতে পারলেন সবই। এমন ক্ষেত্রে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়। তাঁকে প্রশ্ন করার অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

গোপীচন্দ্র আবার বললেন, শুধু ইস্কুল আমি করব না, আরও অনেক কিছু করব।

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অপরূপ প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তাঁর নীল চোখের

দৃষ্টি। কানের পাশে ভেসে উঠল বাল-কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, তিনি শুনতে পেলেন—আপনি মহাপুরুষ; আপনি আরও অনেক করবেন।

গাঢ়স্বরে বললেন, গার্লস স্কুল করব, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি করব, টোল করব, হাই স্কুলের ছেলেদের জন্যে বোর্ডিং করব।

তারপর অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মনে মনে কয়েক দিন থেকেই তোমার কথা ভাবছিলাম অমর। এ কাজে আমাকে সাহায্য করতে পার একমাত্র তুমি। তুমি এ সবের মূল্য বোঝ, তুমি এ সবের পদ্ধতি জান, তোমাকেই ভার নিয়ে সব করতে হবে। পবিত্রকে বরং তুমি সঙ্গে নাও।

অমরচন্দ্র বললেন, এলাহাবাদ থেকে এসেছিলাম কলকাতায়, সেখানে বাসায় শুনলাম ইস্কুলের কথা। আমার কি যে আনন্দ হ'ল! প্রথমে ভাবলাম, চিঠি লিখি আপনাকে। কিন্তু চিঠি লিখে মন খুশি হ'ল না। চলে এলাম। তা আমাকে ভার দিতে চাচ্ছেন, নিচ্ছি আমি, এর চেয়ে ভাল কাজ কি হতে পারে! আমি কালই এলাহাবাদ গিয়ে ছুটি নিয়ে এখানে চ'লে আসছি। আগামী মাসের দোসরা ভিত-পত্তন হবে—আজ মাসের সাত তারিখ, আমার যেতে-আসতে সেখানকার কাজ সারতে সাত দিন। চোদ্দই-পনরোই আমি এসে পড়ব। এ কয়েক দিন যা করতে হবে, সে পবিত্রকে বুঝিয়ে দেব।

গোপীচন্দ্র বললেন, পবিত্র আবার কি ঝোঁক ধরেছে—থিয়েটারের দল খুলবে। ওটা সম্পর্কে—

অমরচন্দ্র বললেন, খুব ভাল আইডিয়া। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অনেক উপকার, অনেক শিক্ষা হয় দেশের। তা ছাড়া এই সব বেকার ছেলের দল সন্ধ্যের সময় কত বদ খেয়ালে কাটায়, তার চেয়ে থিয়েটারের আসরের মধ্যে সব আসবে, বসবে, আলোচনা করবে—খুব উপকার হবে। গুড আইডিয়া। ওর সঙ্গে একটা লাইব্রেরি করুক। পড়াশুনাও করবে কিছু কিছু।

তুমি বলছ—ভাল?

নিশ্চয়। সে আমলে অবশ্য অনেকে খারাপ ভাবতেন, এখনও অনেকে ভাবেন; কিন্তু আমি তা ভাবি না। কই, পবিত্র কই?

পবিত্র এসে দাঁড়াল। গোপীচন্দ্র বললেন, তা বেশ, থিয়েটার কর, অমর বলছে—ভাল হবে। লাইব্রেরিও কর, তবে ইস্কুলের এই ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িংয়ের সময় একটা কিছু পালা-টালা করতে পার না?

অমরচন্দ্র উত্তর দিলেন, জিজ্ঞাসা করছেন কেন? বলুন, করতেই হবে। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? বেশি খাটতে হবে একটু। সে খাটবে ওরা। দিনে দশ ঘণ্টা খেটে দশ দিনে যেটা করা যায়, পনেরো ঘণ্টা খেটে সেটা ছ'দিন-সাতদিনে হয়, আরও বেশি খাটলে আরও কমে হয়। খাটার মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে আরও কম সময়ে হয়, কারণ খাটুনির মধ্যে মানুষের খানিকটা ফাঁকি থাকেই। খাটবার লোক বুদ্ধিমান হ'লে আরও কম

হয়। ইট মাস্ট্ বি ডান।

পবিত্রের দিকে চেয়ে বললেন, ইউ মাস্ট্ ডু ইট। কি পালা করবে ?

পবিত্র উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বিল্বমঙ্গল আর হরিশ্চন্দ্র।

অমরচন্দ্র বললেন, গুড। এস, কাজ আরম্ভ ক'রে ফেলা যাক। পার্ট ডিস্ট্রিবিউশান ক'রে ফেলবে চল। তোমার ঘরে চল।

কীর্তিচন্দ্র গেলেন না।

গোপীচন্দ্র হেসে বললেন, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। অমর যখন বলেছে—ভাল হবে, তখন ওতে আপত্তি ক'রো না।

কীর্তিচন্দ্র বললেন, ও নিয়ে আমি কোন কথা বলছি না। আমি অন্য কথা বলছি। স্বর্ণবাবুর সঙ্গে যে সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি মামলা করতে দেন নি, সে মামলা কালই দায়ের করব আমি। খাজনা, দেনা, পাওনা—সব বন্ধ করতে হবে।

কর। আর আমি আপত্তি করব না।

রাধাকান্তবাবু, শ্যামাকান্তবাবু—

বাধা দিলেন গোপীচন্দ্র, না।

কিন্তু—

আমি আরও দেখতে চাই কীর্তি। যাও, শুয়ে পড় গে। কাল অনেক কাজ আছে।

অনেক কাজ আছে। কাজের কি শেষ আছে ? শুধু কি কালই অনেক কাজ ? কাজের আর অন্ত নাই। কাজ ক'রে কুলিয়ে উঠবে কি না সেই সন্দেহ মধ্যে মধ্যে গোপীচন্দ্রকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে। অনেক কাজ। ঝরিয়া অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লীজ নিয়েছেন। কয়লাভরা পতিত প্রান্তর, উপরে পলাশবন আর পাথর। ওগুলিতে খনি গ'ড়ে তুলতে হবে। অংশীদার নিয়ে তাঁর সমৃদ্ধ ব্যবসা আজ খুব সমারোহে চলছে, কিন্তু তবুও তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন,—মনে হচ্ছে সমৃদ্ধির আড়ম্বর এবং সমারোহের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বোধ হয় ভিতরের মাটি স'রে যাচ্ছে। তিনি নিজে এই সময় থেকে স্বতন্ত্র একটি ব্যবসায়ের পত্তন করতে চান। আয়োজনও সব করেছেন। এখন তাকে শক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে।

কীর্তিচন্দ্র ব্যবসাবুদ্ধিতে কৃতী এবং কুশলী, তার উপরে এসব বিষয়ের ভার দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত; কিন্তু তাঁর এই শেষ জীবনের কাজ, কীর্তির সাধনা—এ তাঁকে নিজে করতে হবে। দেবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, নাটমন্দির গড়েছেন, জলাশয়প্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা তাও করেছেন। এক সময় ভেবেছিলেন এই সমস্ত হ'ল তাঁর এদিকের কর্তব্য। হঠাৎ আরম্ভ হ'ল নূতন অধ্যায়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উপলক্ষ ; তিনি দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর পদোন্নতি হোক, মঙ্গল হোক। নবগ্রামের গ্রামদেবতা তাঁর পূজা নিতে নিজে হাত বাড়িয়েছেন। তিনি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অনেক করতে হবে। স্কুল, বোর্ডিং, গার্লস স্কুল, টোল, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি, লাইব্রেরি, থিয়েটার, আরও অনেক—অনেক কিছু। পুত্রগৌরবে

বংশ ধন্য হয়, জননী কৃতার্থ হন, তেমনই কীর্তিমানের কীর্তিতে গ্রাম ধন্য হয়, সমৃদ্ধ হয়, কীর্তিমানের পরিচয়ে গ্রাম বিখ্যাত হয়। তাঁর মনে আছে এক সময়ে এই জেলার মধ্যে নিবাস বলতে যখন বলতেন—নবগ্রাম, তখন লোকে আরও প্রশ্ন করত—কোন্ নবগ্রাম? সরকার-নবগ্রাম? মুসলমান আমলে সরকারেরা এখানে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁরই এই ষাট বৎসর বয়সের মধ্যে সরকার-বংশের খ্যাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। নবগ্রামের নাম লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছে। মধ্যে উকিল দীনবন্ধুবাবুদের পরিচয়ে কিছু লোক নবগ্রামকে চিনত, স্বর্ণবাবুর বাপের পরিচয়েও কিছু লোক চিনত। এখন সে পরিচয়ও বিগত। এখন তাঁর পরিচয় দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর পরিচয় তো শুধু জিলার মধ্যে আবদ্ধ নয় সমগ্র বাংলা দেশে প্রসারিত, শহরে শহরে ব্যবসায়ীরা তাঁকে চিনতে শুরু করেছে। শুধু বাংলা দেশ নয়—সমগ্র ভারতবর্ষ। যেখানে আছে কয়লার ব্যবসায়ী, যেখানে আছে, কয়লার ব্যবসায়ের সঙ্গে সংস্রব, সেইখানেই গোপীচন্দ্র ব্যানার্জিকে তারা জানে। এই পরিচয় উজ্জ্বল থেকে যত উজ্জ্বলতর হবে, ততই লোকে গোপীচন্দ্রের সঙ্গে নবগ্রামকে বেশি ক'রে চিনবে। চিনতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু তারপর? তাঁর জীবনের একদিন অস্ত হবে। তারপর? তারপরের জন্য তিনি আজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অন্নের সমস্যায়, বস্ত্রের সমস্যায় একদা তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন। সেদিন এমন কথা কোনদিন চিন্তাও করেন নি। কিন্তু আজ সে চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই মনে জেগেছে।

নূতন নবগ্রাম তিনি গঠন করবেন। গোপীচন্দ্রের নবগ্রাম। পুরুষ থেকে পুরুষান্তর হবে, কাল থেকে কালান্তর হবে, তাঁর নাম নবগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

কল্পনার উত্তেজনায় গোপীচন্দ্র সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ষাট বৎসর বয়সে তাঁর দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নমিত হয়ে পড়েছে। জীবনে পরিশ্রমও করেছেন প্রচুর। প্রথম জীবনে সাহেব-কোম্পানির কুঠিতে মাসিক সাত টাকা বেতনে কাজ করতেন—কুলিদের কাজ তদারক করা ছিল কর্তব্য, তখন উদয়াস্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন রোদ-বৃষ্টির মধ্যে, রাত্রে জলন্ত কয়লার গাদার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর কুলি-সংগ্রহের কাজে মানভূম-বাঁকুড়ায় বন-জঙ্গল-পাথর-সমাকীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করেছেন সাঁওতাল-বাউরীদের পল্লীতে পল্লীতে। তারপর কোম্পানির দপ্তরে কাজ করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে; ক্রমে নায়েব হলেন, তখনও রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দিনের সমস্ত হিসাবনিকাশ শেষ ক'রে তবে আসন পরিত্যাগ করেছেন। নিজের জীবন সম্বন্ধে যখনই ভাবেন গোপীচন্দ্র, তখনই মনে হয়, তিনি যেন পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম ক'রে চলেছেন। প্রতিবারই মনে হয়, এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেই তাঁর যাত্রা শেষ হবে; কিন্তু সেখানে উঠে দেখেন, সামনে আর একটা চূড়া। সে চূড়া থেকে কে যেন তাঁকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে—চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনই দুর্নিবার সে আকর্ষণ। চলতেই হয় তাঁকে, চলেছেনই তিনি। এইবার মনে হচ্ছে, এই সামনের চূড়াই শেষ। ওই চূড়ার মাথায় তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কামনা

পরিপূর্ণ হবে। ওইখানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন—নবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি তাঁকে পূজা করবেন, তিনি তাঁকে বরদান করবেন। বর দেবেন, আজ থেকে তোমার মা—এই হ'ল আমার পরিচয়; আমার পরিচয়েই হবে তোমার পরিচয়।

সাপ! সাপ!

চমকে উঠলেন গোপীচন্দ্র। উচ্চ অথচ চাপা গলায় কে চীৎকার ক'রে উঠল। তাঁর খাটের পাশেই প্রকাণ্ড বড জানলা, তার ওপারে তাঁর বাড়ির পাশেই স্বর্ণবাবু-রাধাকান্ত-বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ; চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখান দিয়ে পাড়ার লোকের এবাড়ি-ওবাড়ি যাওয়ার পথ, ওই পথের উপর কে চীৎকার ক'রে উঠল।

গোপীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাইরে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝলমল করছে, সেই জ্যোৎস্নায় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন দুটি মূর্তি। সাপটাকেও দেখতে পাচ্ছেন। চ'লে যাচ্ছে সাপটা। মূর্তি দুটি দাঁড়িয়ে আছে। কে ওরা—অল্পবয়সী দুটি ছেলে! তিনি ডাকলেন, কে? কে?

মুহূর্তে ছেলে দুটি সাপটাকে সামান্য দূরে পাশে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। কে? কে ওরা?

কিশোর নয়? মুখুজ্জেদের কিশোর? পবিত্রের বাল্যবন্ধু এই ছেলেটিকে চিনতে তো তাঁর ভুল হবার নয়। আর একটি—ওটি কে?

এই এতখানি রাত্রে অমনভাবে চোরের মত ওরা কোথায় গেল? সাপকে পাশে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল?

পরক্ষণেই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হতভাগ্য সমাজ, হতভাগ্য দেশ! মাটির দোষে অমৃতবৃক্ষও বিষবৃক্ষে পরিণত হয়: এই মাটির বিষ নিঃশেষে মুছে দিয়ে অমৃতসিঞ্চনে উর্বর ক'রে তুলতে হবে তাঁকে।

নয়

গোপীচন্দ্র ভুল দেখেন নাই। ছেলেটি কিশোরই বটে। কিশোরের সঙ্গে ছিল সরকারদের শূলপাণি। শূলপাণিই সাপটাকে দেখে চাপা গলায় চীৎকার ক'রে উঠেছিল। বিচিত্র সম্মেলন। শূলপাণি এবং কিশোর! চরিত্রে সংস্কারে শিক্ষায় দুজনে প্রায় বিপরীত। শূলপাণি অতি প্রাচীন জমিদার সরকার-বংশের সন্তান, আর্থিক অবস্থায় কালক্রমে আজ সরকার-বংশ প্রায় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, প্রাচীন অভিজাত বংশের স্বাভাবিক পরিণতিতে বংশটির মধ্যে অনেক দোষও ঢুকেছে, শূলপাণির মধ্যেও সে সব দোষ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। শূলপাণি এখন স্কুলের ছাত্র, নামেই অবশ্য ছাত্র—কাজে নয়—যে দিন খুশি যায়, যখন খুশি চ'লে আসে, শিক্ষকেরা কেউ কিছু বলেন না। সরকার-বংশ কুলাচারে তান্ত্রিক। একদিন এ বংশের অনেকে সাধনা করতেন, এখন সাধনা নাই, তন্ত্রের মন্ত্রোপলব্ধি দূরের কথা, শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণও সকলে করতে পারেন না, আছে শুধু আচার। অনেকের তাও নাই, শুধু আচারের দোহাই দিয়ে মদ্য-মাংসে আকণ্ঠ পূর্ণ

ক'রে চরমানন্দ ভোগ ক'রে পরকালে অক্ষয় স্বর্গবাসে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে নিশ্চিন্ত, এবং মন্তপদক্ষেপে জীবনপথ অতিক্রম ক'রে চলেছেন। শূলপাণিকে এই ছাত্রবয়সেই তার ছোঁয়াচ লেগেছে। সে মদ খেতে শুরু করেছে, গাঁজা নিয়মিত খায়। মধ্যে মধ্যে নদীর ধারে শ্মশানে গিয়ে ব'সে থাকে, কালী কালী তারা তারা ব'লে ডাকে। একদা কিশোর ওর সঙ্গেই পড়ত, কিন্তু কিশোর মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস ক'রে জেলার সদরে গভর্মেণ্ট হাই স্কুলে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে এখন এফ. এ. পড়ছে। চরিত্রের দিক দিয়ে কিশোর সম্পূর্ণরূপে নূতন কালের তরুণ। নবগ্রামে সে নূতন দিনের প্রতিভূ। তবুও শূলপাণি কিশোরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুগ্ধ ভক্ত।

সাপ দেখে দুজনেই সতর্ক এবং শঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

চণ্ডীমণ্ডপের এই সাপটি বিখ্যাত। গভীর রাত্রে সে গোটা পাড়াটায় কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়ায়, চণ্ডীমণ্ডপ তার কেন্দ্রস্থল। চণ্ডীমণ্ডপের আশেপাশের বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে ঢোকে। ইঁদুর ব্যাঙ খেয়ে আবার শেষ রাত্রে বেরিয়ে আসে। বিচিত্র পল্লীসভ্যতা! এখানকার মানুষ বিষধরটাকে দেখেও মারে না। আজও পর্যন্ত সাপটাও কাউকে আক্রমণ করে নি। সেই কারণে ওই মৃত্যুমুখ সরীসৃপকেও ওরা কিছু তো বলেই না, বরং যেন বেশ খানিকটা প্রীতি-স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। ও যেন এই গ্রামের বাসীদের একজন। দেখলেই অবশ্য প্রথমটায় আতঙ্কিত হয়ে চমকে দু-পা পিছনে হ'টে দাঁড়ায়, তারপর সাপটাকে দেখে বলে, ওঃ, বুড়োটা! যা যা, চ'লে যা। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দেয়। সাপটাও গতি দ্রুত ক'রে জঙ্গলের দিকে চ'লে যায়। ঠিক এই সাহসে ভর ক'রেই গোপীচন্দ্রের সাড়া পেয়ে কিশোর এবং শূলপাণি সাপটার পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে এসেছে।

গোপীচন্দ্রের বাড়ির পিছনেই গ্রামের বসতি শেষ হয়েছে। তার পরই সেই মাঠের ধারের রাস্তা, যে রাস্তাটার ধারে বেড়া দিতে এসে নাসের শেখ ফিরে গেছে। ছুটে এসে ওরা ওই রাস্তাটার মুখে থামল। শূলপাণি বিপুল কৌতুকে হি-হি ক'রে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। ওঃ, আচ্ছা বেরিয়ে এসেছি! আর একটু হ'লেই চিনে ফেলত বুড়ো! যা জ্যোৎস্না, ফিট সাদা—শালা, ফট-ফট করছে চারিদিক। ঠিক চিনে নিত।

এত জোরে হাসিস নে শূলপাণি। একটু বরং পা চালিয়ে চল্। এখুনি যদি চোর ডাকাত ভেবে চেঁচায়, কি দেখতে লোক পাঠায় তো মুশকিল হবে। পুঁটলিটা বরং আমাকে দে। অনেকক্ষণ বয়েছিস তুই।

শূলপাণির ঘাড়ে একটা মাঝারি আকারের পোঁটলা। বেশ ভারী কোন জিনিস অর্থাৎ ধান চাল ডাল জাতীয় বস্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে। শূলপাণি বললে, না। চল্ না তুই।

না, দে আমাকে। কষ্ট হবে তোর।

আরে নাঃ। ভারি তো পোঁটলা তোর। আধ মণ চাল। এ কাঁধে ক'রে আমি বিশ কোশ পথ তো একটানে চ'লে যাব না থেমে, হ্যাঁ।

গোপথটার এক দিকে মাঠ, এক দিকে পাশাপাশি তিনটে পুকুর। মাঝেরটার পাড়ের

উপর প্রকাণ্ড বড় শিমুলগাছ ; লোকে বলে ওখানে ভূত আছে ; তার পরেরটা কাশীর পুকুর, ঘন বাঁশ তাল এবং আম কাঁঠাল গাছের বাগানে ঘেরা, ওখানে আছে সাপ এবং শেয়ালের বসতি। শূলপাণি বললে, আমি আগে যাই। তুই পিছনে আয়।

কিশোর হাসলে, কিন্তু আপত্তি করলে না। সাহস এবং শক্তি নিয়ে শূলপাণির অহঙ্কার আছে, অহঙ্কারের চেয়ে বেশি,—ওইটি তার জীবন-গৌরব। কিশোর নিজেও শক্তিশালী এবং সাহসী ছেলে, শূলপাণির সঙ্গে কুস্তি এবং পাঞ্জাও সে লড়েছে। তাতে প্রতিবারই সে শক্তি থাকতেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছে—নইলে শূলপাণির সঙ্গে চিরজীবনের মত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। শূলপাণির শক্তি এবং সাহসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেই সে পরিতৃপ্ত ; বিনিময়ে সে জীবনের অন্য সকল বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব তালবেতালের আনুগত্য স্বীকারের বরদানের মত দান করবে।

শিমুলগাছটার সামনে এসে শূলপাণি দাঁড়াল। বললে, এক-একদিন আমার মনে হয় কি জানিস ?

কি ?

গাছটার গোড়ায় এসে মড়ার আসন ক'রে বসি। হেঁকে বলি, নেমে আয়, কে আছিস ? লড়ি এক হাত তোর সঙ্গে।

কিশোর তার পিঠে মাঝের আঙুলটা দিয়ে টিপ দিয়ে তাকে ইঙ্গিত ক'রে মৃদুস্বরে বললে, চুপ। পেছনে কালী সায়রের তালগাছের ফাঁকে আলো বাজছে। আলো নিয়ে কেউ আসছে।

বিদ্যুৎগতিতে শূলপাণি ঘুরে দাঁড়াল। এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শক্তি ও সাহসগরবী শূলপাণির ওটা স্বভাব।

কালী সায়র স্বর্ণবাবুদের শখের পুকুর, গোপীচন্দ্রের বিশাল অট্টালিকাকে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে পাড়ের আম লিচু গোলাপজাম প্রভৃতি মূল্যবান ফলের গাছের বাগান দিয়ে, বাগানের চারিপাশে ঘন তাল এবং তেঁতুলের বেড়। সেগুলি গোপীচন্দ্রের দোতলার মাথা ছাড়িয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে। বেড়ার ঘন তালগাছের ফাঁকে আলোর ছটা দুলছে। কেউ আসছে। সম্ভবত গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকেই কেউ আলো হাতে বের হয়েছে এবং তাদেরই অনুসরণ করেছে বোধ হয়।

শূলপাণি কিশোরের হাত ধ'রে বললে, ছোট্। কাশীর পুকুরে ঢুকে পড়ি চল্।

কিশোর পেছন থেকে তাকে টেনে বাধা দিয়ে বললে, না।

ভয় নাই। আয়। আমি আছি।

সাপ আছে। ভয়ঙ্কর সাপ ওখানে।

ধ্যেৎ! আচ্ছা ভয় তোর! এখুনি সাপের মুখ দিয়ে পার হয়ে এলাম।

ও-সাপটা জানা সাপ। মানুষের সঙ্গে বাস ক'রে ওর স্বভাব খানিকটা পাল্টে গিয়েছে। তা ছাড়া—

অসহিষ্ণু শূলপাণি এবার দাঁত বার ক'রে খানিকটা হিংস্র ভঙ্গিতে বললে, বেরুলি কেন

তবে? তোরই তো কাজ। ভয় নাই। আয়।

না রে না। দাঁড়া।

তুই ভারি ভীতু। বলি, সাপে মানুষ মারে বেশি, না, মানুষে সাপ মারে বেশি? মানুষের সাড়া পেলে স'রে যাবে। চ'লে আয়। তা ছাড়া কপালে লেখা না থাকলে সাপে কামড়ায় না। মা-কালী মা-মনসার নাম নিয়ে চ'লে আয়।

চিন্তাকুল কিশোর বললে, জঙ্গলের সাপ মানুষের সাড়ায় হিংস্র হয়ে ওঠে বেশি। তার ওপর অন্ধকার। অন্ধকারে জঙ্গলে সাপেই মানুষ মারে বেশি শূলপাণি, ওখানে কপালের লেখা না থাকলেও কামড়ায়, মা-কালী মা-মনসার দোহাই মানে না। দাঁড়া।

নে। তবে কি করবি কর্। আমার কচু। আমি বলব—আমি চুলোয় যাচ্ছি তোমার বাবার কি? ভয় তোর। ভাল ছেলে তুই। তুই কি বলবি ভেবে দেখ্।

ওদিকে তালগাছ-তেঁতুলগাছের ফাঁকগুলি উজ্জ্বলতর আলোয় ভ'রে উঠেছে, গাছের মাথার উপর থেকে আলো নেমে এসে নিচের দিকটায় ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তৃততর পরিধিতে। কিন্তু লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শূলপাণি হঠাৎ চালের পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে পথের উপর থেকে কুড়িয়ে নিলে কয়েকটা শক্ত মোটা মাটির ঢেলা। শূলপাণির হাতের লক্ষ্য অদ্ভুত। ঢেলা মেরে গাছের মাথা থেকে নির্দিষ্ট ফলটিকে বাজি রেখে পেড়ে আনে। পত্রপল্লবহীন শুকনো ডালে কি বাঁশের ডগায় কি খুঁটির ওপর পাখি ব'সে থাকলে ইট কি ঘুঁটি মেরে শিকার করে। গ্রামের হনুমানেরা শূলপাণিকে চেনে—তার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের ঢিল খেয়ে চিনে রাখতে বাধ্য হয়েছে, শূলপাণি ঢেলা তুললে ওরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে না, মাথা সরিয়ে কি নামিয়ে শূলপাণির ঢেলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ভরসা করতে পারে না। দেখবামাত্র শব্দ ক'রে চালে চালে লাফ দিয়ে পালায়।

শূলপাণিকে ঢেলা তুলতে দেখে সশঙ্কিত হয়ে বললে, কি করবি? মাথায় লাগলে খুন হয়ে যাবে।

মাথা নয়, আলো। আলোটা ভেঙে দোব।

মানুষটা চলছে, আলোটা দুলছে শূলপাণি। হাতের ঢেলা—এত ঠিক যায় না। তার চেয়ে এক কাজ কর্।

কি?

বলছিলি না—অর্জুনগাছের ভূতটাকে দেখাবি? চল্, তাই দেখি।

অ্যাঁ?

ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই চল্।

কথাটা মন্দ লাগল না শূলপাণির। বহুকালের অর্জুনগাছ, মাথাটা প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, বিশাল কাণ্ড, তিনজন মানুষ হাতের বেড় দিয়ে গাছটাকে ঘিরতে পারে কি না সন্দেহ, গাছটার মসৃণ কাণ্ডে বর্ষায় ছাতা ধ'রে ছাতার দাগ বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত ক'রে রেখেছে

কাণ্ডটাকে। নীচের দিকের প্রবীণ শাখাগুলি নাই, সেখানে আছে গহ্বর, দু-চারটি নূতন ডাল গজিয়েছে ওগুলির গোড়া থেকে। উপরের দিকে প্রায় পনরো ফুট উপর থেকে মোটা শাখা-প্রশাখাগুলি সুদীর্ঘ বিস্তারে প্রসারিত। গাছটার গোড়াটায় কোন জঙ্গল নাই, ঘন ছায়ায় গাছে ডাল জন্মায় না। জন্মাতে পারে ঘাস কালুকাঁটা প্রভৃতির জঙ্গল, কিন্তু সমস্ত তলদেশটা ভাঙা হাঁড়িতে একেবারে বোঝাই হয়ে আছে। প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণ-পল্লীর অশৌচ হেতু হাঁড়ি ফেলার স্থান এটা। সেই হেতু স্থানটা প্রায় শ্মশানের কাছাকাছি—আধা শ্মশান। জনমানব গাছটার পরিধির মধ্যে যায় না। অশৌচ হ'লে বাধ্য হয়ে আসে হাঁড়ি ফেলতে। পুরুষানুক্রমে লোকে এ গাছে প্রেত-পুরুষের অধিষ্ঠান-প্রবাদে বিশ্বাস ক'রে আসছে। এই প্রেত-পুরুষ এক উদাসীন, মাথায় তার জটা আছে, বিষন্ন ক্লান্ত দৃষ্টি তার চোখে; শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁকে মধ্যে মধ্যে লোকে দেখতে পায়। স্থির মূর্তির মত উদাসীন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আকাশের দিকে আঙুল তুলে কিছু যেন দেখিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়। যে দেখে, ছ মাস বা এক বৎসরের মধ্যে তার উপর কোন মর্মান্তিক নিষ্ঠুর আঘাত নেমে আসে। হয় সে নিজে মারা যায় অথবা তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন চ'লে যায়। দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত শূলপাণির গাছটার দিকে চাইলেই ইচ্ছা হয়, একবার সেই পুরুষকে দেখে আসি। তার এ সাহস ভূত-প্রেত অবিশ্বাসের জন্য নয়, তার অসম-সাহসিকতা ও শক্তি প্রমাণ করবার জন্যই তার এই অভিপ্রায়, হয়তো আর একটু আছে, সেটা হ'ল সে তান্ত্রিক বংশের সন্তান—সে বিশ্বাস করে যে ওই পুরুষ নিজে থেকে দেখা দিলে যা হয়, সে এক কথা; কিন্তু কেউ যদি সাহস ক'রে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, তবে তার ফল অন্য রকম হতে বাধ্য। আজও কয়েক মুহূর্ত পূর্বে সে কিশোরকে বলছিল তার মনের কথা। কাজেই কিশোরের প্রস্তাবটা তার ভাল লাগল। উৎসাহিত হয়ে উঠল সে।

চল্।

সাবধানে কিন্তু! হাঁড়িগুলোর তলায় সাপখোপ থাকতে পারে।

অই! অই তোর এক কথা! সাপ, সাপ, সাপ! কলকাতায় পড়তে গিয়ে তোর এক বাতিক হয়েছে। আয়। সে কিশোরের কথার প্রতিবাদ ক'রেই ওই হাঁড়িগুলোর উপর দিয়ে মড়মড় শব্দে সেগুলোকে ভেঙে-চুরে এগিয়ে গেল গাছটার গোড়ার দিকে।

আয়—চ'লে আয়।

বহুযুগের বিশাল বনস্পতির তলায় ছায়া জ'মে আছে, একেবারে গোড়ার চারি পাশটা পরিষ্কার; নিস্তব্ধতা থমথম করছে। মধ্যে মধ্যে ঊর্ধ্বলোকে শাখাপল্লবের মধ্যে বাতাস এসে দোলা দিয়ে শব্দ তুলছে খস-খস—খস-খস।

কিশোর উপরের দিকে চাইলে। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা দেশের গ্রামের ছেলে সে, কলকাতায় পড়তে গিয়ে নূতন কালের ভাবধারা যতখানি গ্রহণ করতে পেরে থাক্ না কেন, এখনও শৈশব ও বাল্যের সংস্কার একেবারে যায় নি। সে উপরের দিকে চাইলে ওই পুরুষটির ছায়াময় কায়ার সন্ধানে; কালবৈশাখীর মেঘের পূর্বাভাস উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল এবং

রৌদ্রপাণ্ডুর আকাশের মত ভয়ঙ্কর ভয়ের পূর্বাভাসে বুকের ভিতরটা শুব্ধ, মন ওই ভয়ের প্রতীক্ষায় একাগ্র। শূলপাণিও চাইলে। তারও বুক এবং মন কিশোরের মতই ভয়ঙ্করকে দেখে শঙ্কিত এবং কম্পিত হবার জন্ম ব্যগ্র।

কিন্তু কই ? বিশাল পল্লবপরিধির নিচে মাটি পর্যন্ত ছায়ার অন্ধকার জ্যোৎস্নার রেখায় রেখায় বিচিত্রিত, পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। একটি বড় ফাঁক দিয়ে খণ্ড আকাশের গায়ে দুটি চারটি তারা দেখা যাচ্ছে। আর পাতায় পাতায় জ্বলছে অজস্র জোনাকি, ফাঁকগুলো দিয়ে দীপ্তির ঝিকিমিকি টেনে উড়ে বেড়াচ্ছে, জ্বলছে, নিবছে, মধ্যে মধ্যে ঝ'রে পড়ছে মাটিতে। কিশোর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে কবি, তার উপর ভয়ঙ্কর কিছুকে নিশ্চিত আশঙ্কা ক'রে তার বদলে এমন সুন্দর শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে এসে মনে হ'ল, এ রূপ অপরূপ, এমনটি যেন কখনও তার চোখে পড়ে নাই।

শূলপাণি মৃদুস্বরে ব'লে উঠল, দাও বাবা, দেখা দাও। মহাপুরুষ !

কে ? কারা ওখানে ?—নিস্তব্ধতা চকিত হয়ে উঠল, শান্ত ছায়ান্ধকার চঞ্চল হয়ে উঠল। গভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন ক'রে দীর্ঘাকৃতি গোপীচন্দ্র একাই বেরিয়ে এসেছেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে, হাতের লণ্ঠনটা অল্প অল্প দুলছে, গাছতলার অন্ধকার টলছে যেন।

* * *

গোপীচন্দ্র একা বেরিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে।

জানলা থেকে জ্যোৎস্নালোকিত চণ্ডীমণ্ডপের খোলা আঙিনায় তিনি দুটি ছেলেকে স্পষ্ট দেখেছেন। সাপটাও তিনি দেখেছেন। স্পষ্ট না দেখতে পেলেও সবুজ ঘাসের উপর এক সর্পিল গতিশীলতা তাঁর চোখে যেন পড়েছে। ছেলে দুটি মরণ-বাঁচন-জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে বেরিয়ে গেল, সম্ভবত সাপটার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঘাসের উপর ওই গতিশীলতা সঞ্চারিত হয় ছেলে দুটি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সাপটাকে তিনিও জানেন, চেনেন। দীর্ঘ ষাট বৎসর তিনি এই চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়েই বাড়ি যাওয়া-আসা করেন, ওই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে দিয়েই তাঁর বাড়ি থেকে সদর রাস্তায় যাওয়ার পথ। অনেক কাল থেকেই ওকে তিনি দেখছেন। প্রথম যৌবনে দেখেছেন, তখন সাপটা ছোট ছিল অনেক। তখন ওর গতি ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্র। পথ চলতে চলতে অকস্মাৎ চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মনে হয়েছে, পাশের ঘাসের বনে বা কালুকাঁটার বনের মধ্যে কি যেন ন'ড়ে উঠল, চ'লে গেল। দু-চারবার এমন হয়েছে—একেবারে সামনাসামনি পড়েছেন, আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে এসেছেন, সাপটাও ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে, কিন্তু পিছনে যাওয়া মাত্র সাপটা ফণা নামিয়ে চ'লে গেছে। একবার মনে আছে, তখন তাঁর প্রথম উন্নতির অবস্থা, সঙ্গে লোক আলো নিয়ে আসছে, সাপটার সঙ্গে এমনই মুখোমুখি অবস্থায় পড়েছিলেন। তখন উকিল বৃদ্ধ দীনবন্ধুবাবু বেঁচে ছিলেন। 'সাপ সাপ' চীৎকার ক'রে তাঁর সঙ্গের লোকটা সাপটাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই। তিনি জানলা খুলে বলেছিলেন, চ'লে যেতে দাও না। অবসর দিলেও ও যদি চ'লে না গিয়ে আক্রমণ করতে

চায়, তবে ওকে নিশ্চয় মারবে। কিন্তু ও যদি তা না ক'রে চ'লে যায়, তবে কেন অনর্থক মারবে ওকে ?

তাঁর সঙ্গের লোকটা তাঁর অনুমতি চেয়েছিল—হুজুর ?

তিনি বলেছিলেন, দেখ্ না। তোর হাতের লাঠি তো তুলেই রেখেছিস। ওখান থেকে ছোবল মেরে তোকে নাগালও পাবে না। যদি এগিয়ে এদিকে আসতে চেষ্টা করে, মারবি।

সাপটা মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা ক'রেই ফণা নামিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল। পরের দিন দীনবন্ধুবাবু বলেছিলেন, গোপী, সাপটাকে মার নি ভালই করেছ। আমি খুশি হয়েছি ভাই। যতক্ষণ অনিষ্ট করতে চেষ্টা না করে, ততক্ষণ ওদের থাকতে দাও। জগন্মাতার পৃথিবী, ওরাও তাঁরই সৃষ্টি, বেঁচে থাকবার ওদেরও তো অধিকার আছে।

গোপীচন্দ্র তখন সায়েব কোম্পানির কুঠিতে চাকরি ক'রে অনেকটা বদলে গেছেন, দীনবন্ধুবাবু যে যুক্তি দিয়েছিলেন সে যুক্তি তাঁর অন্তরকে তেমন স্পর্শ না করলেও তিনি প্রতিবাদ করেন নাই, আগের রাত্রে সাপটাকে যেমন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির অনুরোধেই মারতে দেন নি, তেমনই ভাবেই মৃদু বিনীত হাসি হেসে তাঁর যুক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

দীনবন্ধুবাবু সেদিন আরও একটা কথা বলেছিলেন—বলেছিলেন, জান ভাই নাতি, একটা কথা বলতেন আমার মাতামহ। আমাদের তখন বিশ-বাইশ বছর বয়স, পরীক্ষা দেব, রাত জেগে পড়ছি, মামার বাড়িতে মাস্টার থাকতেন, তিনি পড়াতেন। হঠাৎ জানলার বাইরে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা গোখরো। 'সাপ সাপ' ব'লে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে দিলাম পিটিয়ে। মেরে ফেললাম। মাতামহ জেগে উঠে বাইরে এসে দেখে বললেন, মেরে ফেললি দীনো ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, সাপ মারাতে দোষ হ'ল কর্তাদাদা ? তিনি বললেন, দোষ একটু হ'ল বইকি। ও তো কোন দোষ করে নি তোর কাছে! তোর কাছে কেন, এ বাড়িতে ও অনেক দিন আছে। তা তোর জন্মের আগে থেকেই ওকে দেখছি। পঁচিশ-তিরিশ বছর তো হবেই। কিন্তু ভাই, আজও পর্যন্ত ও কাউকে মাথা তুলে ফোঁস ক'রেও ভয় দেখায় নাই। ইঁদুরটা ব্যাঙটা ধ'রে খায়। রাত্রে সবাই ঘুমুলে তখন বের হয়। জানিস, একদিন গলিপথে বৈঠকখানা থেকে বাড়ি ঢুকছি, হঠাৎ মনে হ'ল, ঠিক সামনে দিয়ে সাপ চ'লে গেল। গলিটা কত সরু তা দেখেছিস তো! ভয় পেয়ে 'দেখ্ দেখ্' ক'রে এগিয়ে এলাম বাড়ির দিকে। কোথাও পেলাম না। শেষে দেখি, গলির এক পাশে বাড়ির দেওয়ালের ভিতর আর গলির গায়ে একেবারে লম্বা হয়ে লেগে রয়েছে। নড়ে না পর্যন্ত। আমি দুবার ওরই খোঁজে পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি। কিন্তু ও আমাকে সহ্য করেছে। আমি আর ওকে মারতে দিই নি।

দীনবন্ধুবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, জান, সেদিন আমার কথাটা ভাল লাগে নাই ভাই। তোমার চেয়েও কম বয়স, রক্ত আরও তাজা, আরও গরম। কিন্তু ভাই, বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই কালের যা দেখলাম বুঝলাম, তাতে এখন মনে হয়, কথাটা কর্তাদাদা অন্যায় বলেন নাই হে। মানুষের সঙ্গে গ্রামের ভেতরে যে সব সাপ বাস ক'রে, তারা মানুষকে মহামান্যে সম্ভ্রম

ক'রেই বাস করে। তা-ই যখন করে ভাই, তখন ওদিগে যদি বিনা অপরাধে বধ কর, তবে যিনি সব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে জবাবদিহি কি করবে?

গোপীবাবু বৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমবশতই এ সব কথা বিনা প্রতিবাদে শুনেই মেনে নেওয়ার ভান করেছিলেন। আজও যে ঠিক মানেন তা নয়। তবে খানিকটা সত্য ব'লে মানতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামের ভিতরে মানুষের সঙ্গে বাস করে যে সব সাপ, তাদের স্বভাব এই সাপটার মত হয়।

এই কারণেই আজ ছেলে দুটি সাপটার পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে যাওয়ায় তিনি শঙ্কিত হন নি, কারণ সাপটা আক্রমণ করলে কি কামড়ালে ওরা চীৎকার করত। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন, অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন এই রকমের দুটি ভদ্রসন্তান কোন্ কাজে এই রাত্রে এমন গোপনে চলেছে? তাঁর সাড়া পাওয়া মাত্রেই এমন ভাবে সাপের পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে গেল কেন? তাঁর বয়স হয়েছে, চোখে চালশে ধরেছে, কাছের জিনিস কম দেখতে পান, কিন্তু দূরের দৃষ্টি তো স্পষ্ট। তাঁর মনে হচ্ছে একজনকে তিনি চিনেছেন। কিশোর পবিত্রের সহপাঠী ছিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। ওদের দুজনের মধ্যে প্রীতিও যত, প্রতিযোগিতাও তত। কিশোর পাঠ্যজীবনে পবিত্রকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। ছেলেটির আকৃতির মধ্যে মহিমা আছে, রূপের মধ্যে দীপ্তি আছে, কণ্ঠ সঙ্গীতের দানে ভ'রে দিয়েছেন ভগবান। বয়সের বশে দূরের দৃষ্টি যদি বা একটু আধটু ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তো থাকতে পারে, কিন্তু বয়সের ফলে তাঁর সার্থক বিপুল কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দূরদৃষ্টি যে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাঁর নাই। তিনি দিব্য দেখতে পান এই ছেলেটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই কিশোর এই রাত্রে এমন ভাবে কোথায় যাচ্ছে? কয়েক মিনিট ভেবে তিনি আলোটি কমিয়ে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে উপর থেকে সকলের অলক্ষিতে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলোটা জোর ক'রে দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সামনে রাস্তাটার প্রসারসীমার মধ্যে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। জ্যোৎস্নায় সমস্ত মাঠখানা যেন দুধে সদ্য স্নান ক'রে উঠেছে। এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে তো মানুষ থাকলে মিলিয়ে যাওয়ার কথা নয়। ঠিক এই মুহূর্তেই মড়মড় শব্দ তাঁর কানে এল। চমকে উঠলেন তিনি। এ কি দুর্দান্ত অসমসাহসিকতা! অশৌচের হাঁড়িগুলো ভেঙে ওরা এগিয়ে চলেছে ওই অর্ধশ্মশান অর্জুনতলার দিকে! সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসিও এল। ছেলে দুটি তাঁকে জানে না। তারা তাঁকে আশৈশব ধনীস্বরূপে দেখে আসছে। দেখে আসছে কাছারি থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসেন তিনি—তাঁর আগে থাকে আলো হাতে একজন চাকর, লাঠি হাতে একজন চাপরাসী, পিছনে থাকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বাক্স কাঁধে একজন চাকর এবং প্রায়ই কর্মচারীও একজন থাকে। বাড়ি থেকে তিনি ওই ইস্কুলডাঙা পর্যন্ত যান—গাড়িতে যান, কোচম্যানের পাশে থাকে একজন চাপরাসী। তাঁর এই রূপ দেখে ছেলে দুটি ভেবেছে, ধনী তিনি, এ পৃথিবীতে কীট-পতঙ্গ জীব-জন্তু

মানুষ-প্রেত সমস্ত কিছুর আতঙ্কে আতঙ্কিত। তারা আর একু গোপীচন্দ্রকে দেখে নি, তাঁকে তারা জানে না। এ পৃথিবীর কোন স্থানে যেতে তাঁর কোনও আতঙ্ক হয় না। পাঁচ টাকা বেতনের দীর্ঘাকৃতি যুবক, পরনে কয়লার কালিতে অপরিচ্ছন্ন কাপড়, কাঁধে চাদর, পিঠে কম্বল আর লোটা নিয়ে অকুতোভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—বনের ধারে গাছতলায় রাত্রি কাটিয়েছেন, রাত্রে একলা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন; কুঠিতে ডাকাত পড়েছে, তিনি নির্ভয়ে অল্পদূরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, লড়েছেন তাদের সঙ্গে; বসন্ত-কলেরায় কুলি-বস্তি উজাড় হয়েছে; তিনি নির্ভয়ে তাদের মধ্যে কাটিয়েছেন; শবদেহ কোলে নিয়ে অন্ধকার রাত্রে গাছতলায় একলা ব'সে থেকেছেন, এ পৃথিবীর সমস্ত ভয়াবহতার সঙ্গে একদা তিনি যুদ্ধ করেছেন—আঘাত বহুবার পেয়েছেন, কিন্তু হার কখনও মানেন নি, ভয় কখনও পান নি। তাঁকে ওরা ওই অর্জুনগাছের প্রেত-প্রবাহের ভয়ের আড়াল দিয়ে এড়িয়ে চ'লে যেতে চায়! এই কারণেই ক্ষুব্ধ চিত্তেও তিনি অল্প একটু না-হেসে পারলেন না। নিঃশঙ্ক চিত্তে তিনি পুকুরটার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে গাছটার অল্প একটু দূরে দাঁড়ালেন এবং প্রশ্ন করলেন, কে? কারা তোমরা?

শান্ত নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি চকিত হয়ে উঠল। অদ্ভুত এখানকার প্রতিধ্বনি! ওদিকে কালীর পুকুরের জঙ্গলে প্রতিহত হয়ে তাঁর প্রশ্ন বেজে উঠল—এদিকে বাড়ির পুকুরের ওপারে তাঁর বাড়ির গায়ে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি উঠল।

কোন উত্তর এল না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কে? কারা ওখানে? বেরিয়ে এস।

এবারও কেউ কোনও উত্তর দিল না। গোপীচন্দ্র গাছটার তলার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হয়েই থেমে গেলেন। চারিপাশের ওই পরিত্যক্ত হাঁড়িগুলি মাড়িয়ে যেতে তাঁর শরীর ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল, খানিকটা ভয়ও হ'ল,—ওর মধ্যে সাপ থাকতে পারে, ভাঙা হাঁড়ির টুকরোয় পা কেটে যেতে পারে। সেটা বিষাক্ত হতে পারে। পল্লীর লোক না জানুক, গোপীচন্দ্র এ তথ্য জানেন। তিনি পিছিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আবার একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নাঃ, আর সেকালের সে অসমসাহসী দিগ্‌বিজয়ী গোপীকান্ত তিনি নন। ভয় দেখাতে চেয়ে ছেলেরা ভুল করে নি। অদ্ভুত মানুষ গোপীকান্ত। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরলেন। যাক, ওরা যেখানে যাচ্ছে যাক। তিনি ওদের অনুসরণ ক'রে বিব্রত করবেন না। তিনি ফিরতে গিয়েও এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সেই কথাটা ওদের জানিয়ে গেলেন—আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরা বেরিয়ে এস। ওখানে অনেক কিছু বিপদ হতে পারে। চলে যাও যেখানে যাচ্ছ।

অভ্যাসমত ঈষৎ অবনমিত হয়ে দীর্ঘাকৃতি মানুষটি নীরবে ফিরে গেলেন। তাঁর হাতের লণ্ঠনটা দুলছিল, স্বর্ণবাবুর কালীসায়রের তালগাছের মাথায় সে আলোর ছটা চকিত প্রতিফলন তুলে পর মুহূর্তেই নেমে আসছিল। তাঁর পদক্ষেপের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অসমতালে আন্দোলিত

হওয়ায় সেই সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, একটা নয়—দুটো আলো চলেছে আগে পিছনে।

শূলপাণি গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে, শালা!

কিশোর বললে, ছি!

কি? কি করলাম?

গালাগাল দিচ্ছিস কেন?

ওকে গালাগাল দিয়েছি নাকি? কি বিপদটা গেল বল্ দেখি? শালা! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—শূলপাণি গোপীচন্দ্রকে গাল দেয় নি, উৎকণ্ঠার ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে তাই এটি তার স্বস্তিবাচক অভিব্যক্তি।

কিশোর একটু হেসে বললে, আমি ভাবলাম ওঁকেই বললি তুই।

বাপ রে! ভাই প্যারি! কত বড় লোক, মহাশয় ব্যক্তি! মুখ্যুই হই আর গোঁয়ারই হই, আমরাও বুঝি রে কিশোর, আমরাও বুঝি। পাস ক'রে কলেজে পড়েছিস ব'লে এত হেণ্টাকেণ্টা করিস না।

এই দেখ্! রাগ করছিস তুই!

তু ও কথা বললি কেনে?

আমি মনে করলাম—

মনে করবি কেনে এমন?

আঃ, তা হ'লে তো বোকা হলাম আমি। তুই নয়।

ভারি ফিচেল তু। কথার প্যাঁচে 'হ্যাঁ'-কে 'না' করতে ওস্তাদ হয়েছিস একটি!

চল্, এখান থেকে চল্ এখন। আবার কি গোলমাল হয় কে জানে! চল্, এই পাড়ের আড়াল দিয়ে পুকুরের গর্ভে গর্ভে চ'লে যাই। রাস্তা সোজা হবে। ডাক্তারবাবু হয়তো ভাবছেন, আমরা এলামই না।

ডাক্তারটাকে আমার ভাল লাগে না। কি রকম লোক, যত সব উদ্‌ভুট্টি কথা! হুঁ! যেমনটি উদ্‌ভুট্টি, তেমনি চ্যাটাং চ্যাটাং!

না না না। ভারি ভাল লোক। দেখ্ না দিন কয়েক আলাপ ক'রে।

দেখেছি। আরে আরে!—দাঁড়িয়ে গেল শূলপাণি।

জলের মধ্যে একটা মাছ উথল মেরে উঠেছে। বড় মাছ নিশ্চয়। কিশোর হেসে বললে, জলে মাছ উথল মারছে, পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? তোর পায়ের কাছে তো লাফিয়ে এসে পড়বে না?

ততক্ষণে শূলপাণি ঘাড়ের পোঁটলা নামিয়েছে। জলের কিনারায় নেমে পায়ে পায়ে কিছু যেন হাতড়ে চলেছে। খানিকটা গিয়েই সে ব'সে প'ড়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

কি রে?

শালাঃ—। আমার নাম শূলপাণি, আমাকে এড়িয়ে যাবে! এই দেখ্।

সে জলের ভিতর থেকে কালো মোটা মজবুত একগাছি সুতো হাতের শক্ত মুঠোয় ধ'রে

টানতে শুরু করলে। সুতোটা টান হয়ে জলের ভিতর নেমে গিয়েছে। কিশোর এবার বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। কোন মৎস্যলোলুপ রাত্রে 'ডগি' ফেলে গিয়েছে। স্বয়ংক্রিয় শিকারের যন্ত্রটি টোপ গেঁথে ফেলে রেখে বেচারী প্রতীক্ষমাণ হয়ে শুয়ে আছে এখন। শেষ রাত্রে এসে তুলে নিয়ে যাবে।

শূলপাণি মাছটা টেনে তুললে। বড় মাছ—দশ-বারো সের পাকা রুই! শালা:! মাছটাকে আছাড় দিয়ে ফেলে নাচতে লাগল সে। হঠাৎ নাচ বন্ধ ক'রে সে বললে, তুই যা কিশোর। আমি আর তোর ওসবে নাই আজ বাবা। ফিরে আসবার সময় আসিস, কণ্ট্রোল আপিসে মাছভাজা খেয়ে যাবি।

শূলপাণিকে আর বলা বৃথা। কিশোর নীরবে পোঁটলাটা তুলে নিয়ে চ'লে গেল। গ্রামের বসতির মধ্যেই খানিকটা পুষ্করিণীবহুল বসতিহীন স্থান অতিক্রম ক'রে দাঁড়াল একটা বাড়ির পিছন দিকে। ডাক্তারের বাড়ি। খিড়কির দরজার শিকলটাকে মৃদু শব্দে বাজিয়ে ছেড়ে দিলে। মিনিট খানেক পরেই দরজাটা খুলে গেল। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, কিশোর! আমি ভাবছিলাম তোমার জন্মে।

ভাবছিলেন—এল না এরা।

না না। আমি লোক চিনি মিস্টার। আমি ভাবছিলাম, ঘটল কি? কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।

ঘটেছে। রাধাকান্তদাদার বাড়ি থেকে বেরিয়েই চণ্ডীমণ্ডপে পড়লাম সাপের সামনে—

সর্বনাশ! তারপর?

সাপটা আমাদের পাড়ার পুরনো সাপ, অনিষ্ট কারও কখনও করে না, কিন্তু সাপ তো! শূলপাণি উঠল চেঁচিয়ে। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন গোপীকান্তবাবু, তিনি শুনতে পেয়ে কি একটা বলতেই আমরা সাপটার পাশ দিয়েই ছুটলাম।

তারপর? চিনতে পেরেছেন?

কিশোর সমস্তটুকু ঘটনা ব'লে বললে, চিনতে বোধ হয় পারেন নি। কিন্তু গাছতলার দিকে এগিয়ে এলে আমাদের বেরিয়ে ছুট দিতে হ'ত কিংবা ধরা দিতে হ'ত। এগিয়ে এসে উনি পিছিয়ে গেলেন।

ডাক্তার হেসে বললে, বোঝা গেল না ঠিক। যাকগে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। পিছিয়ে ফিরে গেছেন এইটাই লাভ। এখন চল, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু—

কি কিন্তু?

ওষুধের বাক্স, চালের পোঁটলা—দুটো নিয়ে যেতে হবে। পথও ক্রোশ খানেক। শূলপাণি এল না, আমরা দুজনে কি বোঝা ব'য়ে যেতে পারব? অভ্যাস নেই তো!

খুব পারব, চলুন। ওষুধের বাক্স না নিয়ে অল্প কিছু ওষুধ বেছে নিন।

রোগী না দেখে অনুমান ক'রে ওষুধ নেওয়া, না-পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার মত কিশোর; দু-একজন হয়তো পাস ক'রে যায়। সেগুলো নেহাতই আকস্মিক ঘটনা—অ্যাক্সিডেণ্ট,

বুঝছ না। নইলে ফেল হওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম। প্রথমটাকে ভাগ্য বলতে পার, বুঝেছ না। মানে, গুরু-বল বা একাদশে বৃহস্পতি বা কবচ মাদুলীর ম্যাজিক—যা খুশি বল না, চ'লে যাবে।

খি-খি-খি-খি ক'রে এক বিচিত্র ধরনে হেসে থাকেন ডাক্তার। হঠাৎ খি-খি-খি শব্দে হেসেই সারা হয়ে গেলেন। আবার হঠাৎ হাসি থামিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, দু-চারজন খুব চতুর ছোকরা, বুঝেছ না, অ-তি—চতুর ছোকরা, যোগাড় করতে পার? যারা খুব ভাল ছেলে নয়, আবার মন্দও নয়, খেলে বেড়ায় খুব, রাত্রি জেগে প'ড়ে পাস করে নিয়মিত—এমনই ছেলে, স্রেফ তারা ব'লে বেড়াবে, সরস্বতী-কবচ নিয়ে পাস করি। বুঝেছ না। কি হবে বুঝেছ? সওয়া পাঁচ আনা, বাস্, বেশি নয়। এইবার হিসেব কর। বছরে দুবার পরীক্ষা—হাফ-ইয়ার্লি, অ্যানুয়েল। হাই ইস্কুল হচ্ছে। অন্তত পক্ষে একশো ছেলে। ব'লেই আবার খি-খি-খি-খি হাসি। গমকে গমকে হাসি ব্যঙ্গে এবং কৌতুকে তীক্ষ্ণ সরস হয়ে উঠল।

কিশোর প্রাণভরে হাসলে ডাক্তারের সঙ্গে। কিছুক্ষণ হেসে ডাক্তার বললেন, চল, তোমার কথাই মেনে নিলাম। আজ অনুমানের চান্সটাই নেওয়া যাক।

কাঠের ওষুধের বাক্স খুলে কতকগুলি শিশি পকেটে পুরে ডাক্তার ছাতাটা হাতে নিয়ে বললেন, চালটা দু ভাগ কর—আমার এখান থেকে গামছা নাও একখানা।

নতুন কাপড় আছে একখানা। রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী কাশীর দিদি দিয়েছেন। ওতেই বেঁধে নিই।

না, কাপড়খানায় কুঁড়ো মাখিয়ে লাভ কি? নাও, একখানা গামছাই নিয়ে নাও। চল, খিড়কি দরজা দিয়েই বেরিয়ে পড়ি। সামনে থানায় দারোগার আড্ডা রাত্রি পর্যন্ত চলে।

* * *

জ্যোৎস্না রাত্রি। শরৎকালের প্রারম্ভ। দুজনে ওই ইস্কুলডাঙা পার হয়ে চলেছিলেন। ডাক্তার ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছিলেন। হঠাৎ ছাতাটা বন্ধ ক'রে দিলেন—ধুর! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে, এমন জ্যোৎস্নাকে তা ব'লে উপেক্ষা করা চলে না।

ডাক্তারের এইটি একটি বাতিক। বারো মাস রাত্রে পথ চলতে হ'লেই ছাতা মাথায় দিয়ে থাকেন। ঠাণ্ডাকে ডাক্তারের অত্যন্ত ভয়। বলেন, আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, অসুখ যত হয় তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হয় ঠাণ্ডা লেগে।

ডাক্তারের দুটি ছেলে মারা গেছে নিউমোনিয়ায়।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন, ইউ সি কিশোর, বঙ্কিমচণ্ডর ইস এ গ্রেট রাইটার। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীং—ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং। মহাশয় ব্যক্তি, সত্যকারের কবি। দেশের রূপটা দেখেছেন বটে! গাও না, গানখানা গাও না হে। মনে মনে ভাবি, 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী চলেছি দুজন।

তরুণ কিশোরের মনেও রূপের মোহের ছোঁয়াচ লেগেছিল। এমন অবারিত মাঠে

জ্যোৎস্নার অপরূপ প্লাবন না-দেখা নয়, এই গ্রামের ছেলে সে, এই প্রান্তর এই জ্যোৎস্না বরাবরই আছে। আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে শরৎকালও এসেছে প্রতি বৎসর; কিন্তু এই ডাক্তারের মত সঙ্গীর সঙ্গে এমন উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলার কালের যে মন, সে মন নিয়ে কখনও এ রূপ দেখে নি। সঙ্গে সঙ্গেই সে গাইতে শুরু করলে। কিশোরের মত কণ্ঠস্বর বিরল, এত মাধুর্য সে কণ্ঠস্বরে, আর এমনই ভরাট ও উচ্চ সে কণ্ঠস্বর যে, গোটা মাঠখানা যেন গানের সুরে ভ'রে উঠল—চারিদিকে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল বর্ষার উতল বাতাসে উচ্ছ্বসিত বেগবতী ভরানদীর ঢেউয়ের আছাড়ের মত।—

শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
মাতরং—
বন্দেমাতরং—

খোলা মাঠে প্রতিধ্বনি ওঠে স্বাভাবিক নিয়মে। বর্ষা-বাদলের পর সে প্রতিধ্বনি স্পষ্টতর হয়, জোরালো হয়ে ওঠে। কিশোর নিজের গানের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে আচ্ছন্ন আবৃত হয়ে ছিল—সুরের মোহ এনেছিল আচ্ছন্নতা, শব্দঝঙ্কার রেখেছিল তার শোনার শক্তিকে ডুবিয়ে। কিন্তু ডাক্তার যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন, তিনি কিশোরের হাত ধ'রে ইঙ্গিত করলেন। কিশোর চকিত হয়ে থেমে গেল।—কি ?

কিছু নয়, শোন। মন দিয়ে শোন।—মৃদুস্বরে ডাক্তার বললেন। কিশোর একাগ্র হয়ে উঠল, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল তার আভাস।

মাতরং—মাতরং—মাতরং—মাতরং। 'বন্দে'র কম্পিত রেশটুকু জড়ানো আছে প্রতিটি 'মাতরং'য়ের আগে।

বন ও গ্রাম সমাবেশের আকস্মিক বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে স্থানটা হয়ে উঠেছে ভাঙনে ভাঙনে আঁকাবাঁকা নদীর মত, অথবা খিলানে-ভরা বিচিত্রগঠন প্রাসাদের মত, যেখানে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেই শব্দ মিলিয়ে যায় না, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ওঠে, একটা ধ্বনি দশবার বিশবার ফিরে ফিরে বেজে ওঠে।

কিশোর মৃদু হেসে বললে, অদ্ভুত তো!

সে আবার গাইলে— বন্দেমাতরম্!

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীং
কমলা কমলদলবিহারিণীং
বাণী-বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্!
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মা-তরং—
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্—
বন্দে-মা-তরম্।

গমকে গমকে সুর উঠে ছড়িয়ে পড়ল, আবার ধাপে ধাপে নেমে এল।

ডাক্তার এক সময়ে বললেন, গ্রাম কাছে এসেছে, চুপ কর।

*   *   *   *

কিশোর চুপ করলে, সঙ্গে সঙ্গে চোখও মুছলে। উনিশ শো ছয় সালের বাংলা দেশের কলেজে-পড়া ছেলে। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দুটি এক-ভাবের ভাবুক একসঙ্গে চলেছে, স্বাভাবিক ভাবেই মনে তার আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। চোখের উপর ভাসছে তার 'আনন্দমঠে'র জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রির ছবি। চোখে জল এসেছিল। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেছেন। কিন্তু ডাক্তার যে আশঙ্কা ক'রে তাকে চুপ করতে বললেন, সে আশঙ্কা ইতিমধ্যেই সত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বর্ষার শেষে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত শূন্যলোক বর্ষণে বর্ষণে ধূলিমালিন্যহীন গাছপালার পল্লবে পল্লবে ঘন নিবিড় হয়ে উঠেছে, বাড়ি ঘর জলে জলে ভারী হয়েছে। তার উপর কিশোরের দুর্লভ মধুর এবং দীপ্ত কণ্ঠস্বর খোলা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে ধ্বনি তুলেছে।

পাশে বড়গোগা ছোটগোগা—দুখানি গ্রামে চাষীর বাস। সদ্‌গোপ তন্তুবায় গৃহস্থ বৈষ্ণব সকলেই কৃষিজীবী। ছোটগোগায় মুসলমান আছে—তারাও চাষী। দুখানি গ্রামেরই লোক বিস্মিত হয়ে এ গান শুনলে। বড়গোগায় মহাপ্রভুর আখড়ায় চরিতামৃত পাঠ চলছিল, ছোট-গোগায় মসজিদের বারান্দায় মজলিস চলছিল, সকলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্দেমাতরম্ শব্দটি অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়, অর্থ কেউ জানে না, শহরে আন্দোলন হচ্ছে। শুনেছে, মর্ম কেউ বুঝতে পারে না—চায়ও না বুঝতে। শুধু জানে; বাবুরা হঠাৎ মোটা তাঁতের কাপড় পরবার হুজুক তুলেছে। এই গানও কেউ জানে না, অধিকাংশ লোকেই শোনেও নাই—সংস্কৃত শব্দ-সমন্বয়ে রচিত এমন অভিনব গান এবং এমন অপরূপ মধুর কণ্ঠস্বর শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, অভিভূত হয়ে গেল বিস্ময়ে।

মসজিদে ছোটগোগার মাতব্বর মকবুল খাঁ তারিফ ক'রে উঠল। কয়েকজন ছোকরা বলল, দেখব নাকি চাচা, কে এমন গাইছে এত রাতে? তা পহর তো পার হয়ে গিয়েছে গো।

মকবুল বললে, না। গান শুনে বুঝছিস না—বড় তামাশার লোকে গাইছে না। হিঁদুদের কেউ ফকির-দরবেশ হবে। রাতে-বিরাতে একা চলে উয়ারা, দিনমানে মানুষের ভিড়ে তো আসে না, চলছে হয়তো এক আস্তান থেকে অন্য আস্তানে ঠাকুর-দেবতার ঠাঁইয়ে। দেখতে গিয়ে কেনে তাকে বেখুশ করবি বাবা? ব'স্। বড় মিঠা গাইছে কিন্তু।

বড়গোগায় মহাপ্রভুর আখড়ায় চরিতামৃত পড়তে পড়তে চুপ ক'রে গেল মহান্ত বাবাজী। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। তার দেখাদেখি সকলেই নমস্কার করলে। সংস্কৃত গান! হয়তো সন্ন্যাসী, নয়তো—

নয়তো?

কপালে আবার একটু হাত ঠেকিয়ে হাসলে মহান্ত। কে জানে, কত সময় কত দৈবখেলা

হয়! এমন সুর, এমন গান! দেবলোকের স্তবপাঠ কি—, কে জানে!

সামনের গাঁ ডাঙাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা নিজ হাতে চাষ করে না ব'লে ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত, তাদের বাস। সেখানেও গিয়ে গান পৌঁছেছিল।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। বন্দেমাতরম্। কে গাইছে? কিন্তু যেতে সাহস হ'ল না। চোর-ডাকাত হ'লে হৈ-হৈ ক'রে বের হ'ত ওরা, কিন্তু বন্দেমাতরম্ গান যারা গাইছে এই রাত্রে মাঠের মধ্যে, তাদের দেখতে যেতে ওদের সাহস নাই। শুধু প্রবীণ কবিরাজ গুপ্ত মহাশয় জানলা খুলে ব'সে রইলেন মাঠের দিকে চেয়ে। কেমন যেন হয়ে গেছেন তিনি।

নবগ্রামে কিশোরের কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়। সেখানে লোকে বিস্মিত হ'ল না, শুধু মুগ্ধ হ'ল, অনুমান করলে—কোথাও গ্রামপ্রান্তে জ্যোৎস্নার মধ্যে ব'সে কবি কিশোর—গায়ক কিশোর গান গাইছে।

পবিত্র ও অমরবাবু অভিনয়ের আলোচনা করতে করতে চুপ ক'রে ব'সে শুনলেন। অমরবাবু বললেন, গাইতে গাইতে চলেছে কেউ।

পবিত্র বললে, আমাদের কিশোর।

নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে গোপীচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিশোরকে তিনি চিনেছেন। কিন্তু কেন সে এমনভাবে সাপকে পাশে রেখে ছুটে চ'লে গেল? কেন সে এমন ক'রে ওই অর্ধশ্মশানে, ওই বহু প্রবাদের আশ্রয় অর্জুন-গাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল? প্রথমে অনুমান করেছিলেন তিনি, কিশোর জীবনে ভ্রষ্ট হয়েছে, অধঃপতন হয়েছে তার। কিন্তু সে তা হ'লে এই গান গায় কেন? চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। নীল আকাশ জ্যোৎস্নায় গাঢ় উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করছে, একটানা প্রসারিত উজ্জ্বল নীলের যেন প্রশান্ত সমুদ্র। ওই আকাশের মধ্যে যেন তিনি দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। কোনমতেই কিছু অনুমান ক'রে উঠতে পারছেন না। শুধু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। একটা অসহনীয় অস্বস্তি ভোগ করছেন; কিসের এত গোপনীয়তা, কি করতে চলেছে ওরা?

* * *

এত গোপনীয়তার সত্যই প্রয়োজন ছিল না। অতি নির্দোষ এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার। কিশোর একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়েছে। সভ্য মাত্র চার-পাঁচজন। কাজ দুঃস্থ ভদ্রপরিবারদের সাহায্য করা। পাছে প্রকাশ্যে সাহায্য নিতে তাঁরা লজ্জা পান, বেদনা অনুভব করেন, সেই কারণে গোপনে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছে। রাত্রিতে সাহায্য দিয়ে আসে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে মহম্মদ মহসীনের কাহিনী থেকে। স্থানীয় উদাহরণের প্রেরণা আছে। রাধাকান্তের জ্যেঠামহাশয় এবং বাবা দুজনেই ছিলেন উকিল। তাঁরা গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের বিচিত্র কৌশলে সাহায্য করতেন। দুঃস্থ পরিবারের দূরান্তরের আত্মীয়ের নাম ক'রে তত্ত্ব পাঠাতেন। অপরিচিত তত্ত্ববাহক আসত কাপড়, মিষ্টি, কিছু অর্থ নিয়ে। সে কাহিনী আজও এখানে খুব পুরোনো হয় নি। প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ হ'ল কিশোর এবং ওই ডাক্তারটি। কিশোর প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিল ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু তার সামর্থ্য কোথায়? তার বাড়ির

ব্যবস্থা এবং শাসন অত্যন্ত কড়া। একমাত্র তার মা ছেলের সকল কাজকে স্নেহের গভীরতায় সমর্থন করেন। সংসারের ভাণ্ডারের কর্ত্রী হলেন কিশোরের পিসীমা। শাসন তাঁর ক্ষমাহীন, বাক্য নিষ্ঠুর মর্মচ্ছেদী, দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সন্দিগ্ধ, ভ্রাতৃবধূদের প্রতিটি পদক্ষেপ, বিশেষ ক'রে ভাঁড়ারী ঘরের দাওয়ার উপর তারা পা দিলেই তিনি চকিত হয়ে ওঠেন। দোষও অবশ্য তাঁর নাই, একালে বধূদের নিরেনব্বই জন চাল চুরি ক'রে থাকে। বউরা বলে, না করলে আমরা পাই কোথা? আমাদেরও তো হাত-পা চলা চাই! চুলের দড়ি কাঁটা, মাঝে মধ্যে দু-একখানা খাম পোস্টকার্ড, কখনও কখনও দু-চার পয়সার তেলে-ভাজা বা মিষ্টি—এর সংস্থান তারা করে কোথা থেকে? কিশোরের মায়ের নিজের জীবনের প্রয়োজন কম, চুলের ফিতে তেলে-ভাজা পোস্টকার্ডের দরকার তাঁর হয় না, তাঁর নিজের দরকার তেলের পয়সার, তাঁর হাতেই সংসারের রান্নার ভার, বরাদ্দ তেলে রান্না ক'রে কুলানো হয়তো যায়, কিন্তু সে রান্না রেঁধে তৃপ্তি হয় না। সেই কারণে তেল তাঁকে গোপনে কিনতে হয়। আর প্রয়োজন হয় কিশোরের হাত-খরচের। এর উপর কিশোর যখন এই কাজ আরম্ভ করলে, তখন তাঁকে বিব্রত হতে হ'ল; কোথায় পাবেন তিনি এত চাল? দু সের চার সের চাল সরালে বুঝতে পারা কঠিন, কিন্তু আধ মণ এক মণ চাল সরালে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন কিশোরের পিসীমা। তা ছাড়া আঁচলে লুকিয়ে এত চাল সরানোও অসম্ভব। তিনি বারণ করেছিলেন কিশোরকে, বলেছিলেন, বাবা, গরিব গেরস্ত যারা, তারা কি সাহায্য করতে পারে, না, দানধর্ম তাদের সাজে? ও সব কাজ বড়লোকের। ভগবান যাদের অখিল পুরে দিয়েছেন, এ কাজ তাদের।

কথাটা তাঁর সান্ত্বনা দেবার জন্য মুখের কথা নয়, একালের বিশ্বাস তাই। গৃহস্থের দান মুষ্টিভিক্ষায় সীমাবদ্ধ। আয়ের অতিরিক্ত দানে পুণ্য হয়তো হয়, কিন্তু তাতে গৃহস্থলক্ষ্মী চঞ্চল হন, রুষ্ট হন।

কিশোর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে প্রায় একটা বেলা সে বসে ছিল। মায়ের তা সহ্য হবার কথা নয়, সহ্যও হয় নি তাঁর। অনেক ভেবে তিনি গিয়েছিলেন খুড়ীর অর্থাৎ খুড়শাশুড়ী কাশীর বউয়ের কাছে। কাশীর বউ—রাধাকান্তের স্ত্রী বয়সে তাঁর কন্যার বয়সী, কিন্তু সম্পর্কে তিনি খুড়শাশুড়ী, কয়েকটি বাড়িতে তিনি খুড়ী নামেই চলেন। মেয়েটিকে শুধু ভালই লাগে না, শহরের এই গুণবতী মেয়েটিকে সম্ভ্রমও করতে হয়। এই মেয়ে নিশ্চয় কিশোরের এই ভাল কাজের উদ্দেশ্য বুঝবে। বুঝেওছিলেন কাশীর বউ। বলেছিলেন, বউমা, আপনার এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। এ গ্রামের অনেক কল্যাণ আপনার কিশোর করবে। ওকে আপনি পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, আমি চাল দেব।

কাশীর দিদির সঙ্গে এই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রথম সূত্র। শুধু তাই নয়, সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ারও প্রথম পর্ব। তিনিই বলেছিলেন, এক কাজ কর ভাই, আরও দু-পাঁচজনকে ব'লে তাঁদের কাছ থেকেও চাল টাকা নিয়ে জমা কর। তারপর যাকে যেমন, বিবেচনা ক'রে সাহায্য করবে।

কিশোর হেসে বলেছিল, আপনি শহরের লোক দিদি, এ সব পাড়াগাঁয়ের বড়লোকদের জানেন না। যে দানে নাম জোটে না, সে রকম দান এঁরা করেন না। তা ছাড়া দান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করতে হ'লে গরিবকে নিজে হাতে তুলে নাকি দিতে হয়। দাতাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে গ্রহীতা, তবে তো দান ক'রে আনন্দ। ওঁরা এমন গোলে হরিবোল দেবেন কেন ?

তাতেও কাশীর বউ দমেন নি। বলেছিলেন, একটা কথা এখানে এসে শিখেছি নাতি, কথাটা হচ্ছে—সংসার বহু রঙ্গের পুরী, কেউ কাঁদছেন কেউ হাসছেন কেউ করছেন চুরি। সবাই হাসে না, সবাই কাঁদে না, সংসারে সবাই চোর নয়। ভাল মন্দ নিয়েই ভগবানের পৃথিবী। এমন ভাল কাজে রাজী হবেন এমন লোক এখানে নেই, এ কি হয় ? তোমাদের নূতন কালের ছেলেদের মধ্যে দেখ না।

কিশোর উৎসাহিত হয়ে কাজ শুরু ক'রে ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে। সব চেয়ে বড় আশ্রয় হয়েছেন এখন ওই ডাক্তারটি। ডাক্তারই সংগ্রহ করেছেন কয়েকজন সাহায্যদাতা। তার মধ্যে জন পাঁচেক আছেন, যাঁরা গ্রামেই থাকেন। কালাচাঁদ চন্দ, ফকির দত্ত—এঁরা বণিক সম্প্রদায়ের মাথার লোক, ব্যবসা আছে। তাঁরা ডাক্তারের বাড়িতে মাসে নিয়মিত এক মণ হিসাবে চাল পাঠিয়ে দেন, ডাক্তার বলেছেন—ভাল কাজে লাগবে, তাই তাঁদের কাছে যথেষ্ট, জানতেও চান না, কি সে ভাল কাজ অথবা কত খরচ কত জমা ! আর তিনজনের একজন স্বর্ণবাবু মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার। একজন মণি দত্ত, সেও বণিক সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট লোক—বিশিষ্ট শুধু অবস্থার দিক দিয়েই নয়, অন্য দিকেও সে বিশিষ্ট ; জেলার হাই স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে এবং গ্রামের সকল বিধানে বিধিতে সে একটা না একটা হাঙ্গামা বাধিয়েই আছে সর্ব সময়ে। গ্রামে সে ব্যবসা পর্যন্ত করে না, ব্যবসা করে এখান থেকে সাত মাইল দূরে রেল-স্টেশন যেখানে আছে সেখানে। মণি দত্ত এ সব ব্যাপারের অনেকটা জানে। আর দুজনের একজন—ননীমাধব দত্ত জাতিতে কায়স্থ, পেশায় কবিরাজ এবং ডাক্তার দুই। শেষের জনটি রাধাকান্তবাবু। ডাক্তারের সঙ্গে রাধাকান্তের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ডাক্তার ঠিক বিদেশী লোক নন, তবে গ্রামের লোকও নন। এ গ্রামে প্রথম প্র্যাকটিস করতে এসে রাধাকান্তের বাড়িতেই উঠেছিলেন। রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই তাঁর ডাক্তারখানা ছিল প্রথম প্রথম, কিছুদিন তাঁর বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করতেন। ডাক্তার তখন অবিবাহিত। তার কারণ ডাক্তার গোত্রে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় হ'লেও চলিত উপাধিতে ছিলেন চক্রবর্তী, কুলীন ছিলেন না, সেই কারণে ডাক্তারী পাস করা সত্ত্বেও স্থানীয় কুলীনের সমাজে কেউ তাঁকে কন্যাদান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাধাকান্ত এর প্রতিবাদ ক'রে গোত্র অনুযায়ী ডাক্তারের চক্রবর্তী উপাধির পরিবর্তে মুখোপাধ্যায় উপাধি দিয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে বর্ধমান শহরে তাঁর বিবাহ দিয়েছেন। এখন ডাক্তার স্বতন্ত্র বাস করছেন, নিজে বাড়িও করেছেন ; কিন্তু রাধাকান্তের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। সেই কারণেই রাধাকান্তকে না ব'লে তিনি কিছু করেন না। রাধাকান্তকে সবই বলেছেন,

রাধাকান্ত অনুমোদনও করেছেন সব। কিন্তু তাঁকে সভ্যদের নাম বলেন নি ডাক্তার, তিনিও জানতে চান নি। সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও তিনি উদাসীন। শুধু সাহায্য তিনি দিয়ে থাকেন। কাশীর বউ সাহায্য করেন, সে কথাও তিনি জানেন না। কাকে সাহায্য করা হয়, সে প্রশ্নও কোনদিন করেন না।

আজ তাঁরা কিন্তু চলেছেন নির্ধারিত গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে। সে ভৌগোলিক গণ্ডির দিক থেকেও বটে, বিধি-নিয়মের গণ্ডির দিক থেকেও বটে। নবগ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে শেখেরবাঁধ গ্রামে এক অতি দুঃস্থ হরিজন-পরিবারকে সাহায্য দিতে। নবগ্রামের গণ্ডির বাইরে এত দূর তাঁরা কখনও এই কাজে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। ডাক্তারই বলতেন, চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম। অন্য দিক দিয়ে শুধু ভদ্র সম্প্রদায়ের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে হরিজন-সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন ব'লেই নয়, আরও অন্য কারণে তাঁরা আজ এমন ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে চলেছেন, যে ক্ষেত্রটি সমাজের চক্ষে, দেশের চক্ষে অপবিত্র অস্পৃশ্য ব'লে পরিগণিত। এই হরিজন-পরিবারটি এ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ জগা ডাকাতের পরিবার। জগা ডাকাতের জাতিবাচক উপাধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে; নিষ্ঠুর নৃশংস তার প্রকৃতি। ব্যভিচারী জগা এ অঞ্চলের ভয়ঙ্করদের একজন, নবগ্রামের অর্জুনগাছের ওই কালপুরুষের চেয়ে লোকে তাকে কম ভয় করে না। প্রচণ্ড তার শক্তি, দুর্দান্ত তার সাহস, একা লাঠি ধ'রে সে হাঁক মেরে একশো লোকের জনতাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। শেখের বাঁধ গ্রামখানি শেখ অর্থাৎ মুসলমান-প্রধান; এখানকার শেখেরা সকলেই কৃষিজীবী, তাদের সঙ্গে জগার সম্প্রদায়ের জাতিগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে। মুসলমানেরা জগাদের বলে—ছোটলোক, জগাও তাদের বিধর্মী ব'লে ঘৃণা করে, মুখে মুখেই গাল দিয়ে কথা বলে। সেই জগা এখন জেলে। নবগ্রামের পাশের গ্রামেই ডাকাতির অপরাধে তার সাজা হয়েছে। দলের একজন বেইমানি ক'রে সরকারী সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্যথায় জগার সাজা হওয়া অসম্ভব ছিল। ডাকাতি সে'রেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর মধ্যে বিশ মাইল পথ হেঁটে সদর শহরে এক উকিলবাবুর দাওয়ায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে সকালে উঠেই নারীঘটিত একটা বাজে নালিশ দায়ের ক'রে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিল। যাক সে কথা। জগা আজ জেলে, তার স্ত্রী দুটি কন্যা এবং দুটি ছেলে নিয়ে চরম দুর্দশায় প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দিন কাটাচ্ছে। একটা ছেলের বুকে সর্দি বসেছে,—শ্লেষ্মা বুকে নিয়ে জ্বর অর্থাৎ নিউমোনিয়া। পাশের গ্রামে কবিরাজ আছেন, তিনি দয়াপরবশ হয়ে প্রথম প্রথম ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু ওদের বাড়ি যেতে সাহস করেন নি। থানা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে,—কে বা কারা এই সময়ে জগার বাড়ি যায়, তাদের সাহায্য করে, সে সমস্ত তথ্য তাদের নথিতে লিখে রাখছে। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই জগার পরিবারের এই দুর্দশাকে বিধাতার দেওয়া শাস্তি ব'লে মনে করছে। মনে মনে দুঃখ তাদের হয় না এমন নয়, তবে একালের এই ধারণা।

ডাক্তার বলেন, বিচিত্র ব্যাপার, বুঝেছ না কিশোর! সাপ যতক্ষণ অনিষ্ট না করে ততক্ষণ এরা তাকে মারতে চায় না। কিন্তু মানুষকে ক্ষমা নেই এদের।

একটু থেমে থেকে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলেন, তবে রাধাকান্তবাবু একটা কথা বলেন কিশোর, সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। বুঝেছ না! উনি বলেন, দেখ ডাক্তার, একটু ভেবে দেখ। বিধাতা বহু বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টির কর্ম নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী তার প্রকৃতি গঠন করেছেন, সেই অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে দিয়েছেন। সাপের মুখে দিয়েছেন বিষ, বাঘের পায়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড শক্তি—তেমনই ধারালো ভীষণ নখ, মুখে দিয়েছেন তেমনই দাঁত। ওদের প্রকৃতিও তিনি ঠিক সামঞ্জস্য রেখে গড়েছেন। জীব-জগতে হিংসাই ওদের কাজ, ধ্বংসকার্যে বিধাতার ওরা অনুচর। সৃষ্টির রাজ্যে জীবনের ক্ষেত্রে তারা এলেই তাদের মারে মানুষ। এখন ভেবে দেখ, কোন সাপ যদি মানুষের রাজ্যে নিজের স্বভাবকে সংযত ক'রে বাস করে, কোন বাঘ যদি নিজের প্রকৃতিকে নম্র ক'রে বাস করে, তবে তাদের জন্য করুণা মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই হবে। কিন্তু মানুষকে বিধাতা যে প্রকৃতি দিয়ে কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন মানুষ যদি তাকে লঙ্ঘন করে, তবে তাকে ক্ষমা কি ক'রে কোন্ যুক্তিতে করবে তুমি? শাস্তি দেবার অবশ্য তোমার আমার অধিকার নাই, আছে এক ভগবানের আর আছে রাজার; আমরা শাস্তি দিতে গেলে যেমন অন্যায় করব, তেমনই অন্যায়ই করব যে শাস্তি সে পেলে তার কর্মফলে, তাকে লাঘব করতে গেলে। ভেবে দেখ তুমি।

কিশোর ঠিক এর উত্তর খুঁজে পায় না। কিন্তু ডাক্তারের মতই রাধাকান্তের এই প্রাচীন-কালের মতামতকে সত্য ব'লে মানতে পারে না। তা হ'লে কি জগন্নাথের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র না খেয়ে মরবে? ওর ছেলেটা নিউমোনিয়ায় বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে মরবে?

জগন্নাথের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে একখানা দুর্গন্ধযুক্ত শতছিন্ন বেনারসী শাড়ি প'রে আজই সকালে এসে ডাক্তারের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। জগন্নাথের স্ত্রী স্বামীর শক্তির উদ্ধত মর্যাদাকে মান্য ক'রে চলে, স্বামীর অহংকারে সে অহঙ্কৃতা। তার জন্য সে দুঃখ সহ্য করতে কাতর নয়। সুখের প্রতি লোভ অনেক, কিন্তু দুঃখেতে ভয় করে না। জগন্নাথ যখন এক-একটা কীর্তি ক'রে ফেরে, তখন জগার স্ত্রী খাওয়াপরায় বিলাসে সত্যসত্যই নেশায় মেতে থাকে, পাকিমদ্যের বোতল তখন ঘরে জমা করা থাকে। বড় বড় মাছ তখন কিনে খায়। আবার জগন্নাথ যখন জেলে যায় তখন দুর্দশা হয়, সে দুর্দশা নীরবেই সহ্য করে। তখন জালিতে মাছ ধ'রে পাড়ায় বিক্রি করে। কিন্তু এবারের মত দুর্দশা এবং বিপদ কোনবার হয় নি। অন্যবার জগন্নাথের মহাজনেরা গোপনে সাহায্য ক'রে থাকে। এবার সে সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, বিরোধ ক'রে জগন্নাথ এবার একজন মহাজনের বাড়িতেই ডাকাতি করেছে। অন্য মহাজনেরা এ দৃষ্টান্তে ভয় পায় নি, বরং ক্রুদ্ধ হয়েছে। মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা একবাক্যে ব'লে দিয়েছে—না। তাতেও জগন্নাথের স্ত্রী দমে নি। বাড়িতে ঢেঁকি পেতে দুই মেয়েকে নিয়ে ধান ভানতে শুরু করেছিল।

কিন্তু দেহে শক্তি থাকতেও ঢেঁকি চলল না। ধান দিলে চাল পাওয়া যাবে কি না

এই সন্দেহে প্রায় সকলেই ফিরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছিলেন কিছু ধান পাশের গ্রামের কবিরাজ ওই গুপ্ত মহাশয়। জগন্নাথের স্ত্রী দশজনের সন্দেহকে সত্যে পরিণত ক'রে সে ধান ভেঙে খেয়েছে। জগন্নাথের স্ত্রীরও দোষ ছিল না, ধান অল্প, তার বাড়ির খরচ অনেক। এক সের দু সের হিসেবে খেতে গিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই সব ধানের চাল শেষ হয়ে গিয়েছে। গুপ্ত মহাশয় উৎপীড়ন বা তিরস্কার করেন নি, কিন্তু আর ধানও দেন নি।

তারপর জগন্নাথের স্ত্রী জাল নিয়ে মাছ ধরার কাজ আরম্ভ করেছিল। দুই মেয়েকে নিয়ে তিনখানা জালিতে গৃহস্থের পুকুরে কুঁচোচিংড়ি তার সঙ্গে কিছু মৌরলা পুঁটি ধ'রে গৃহস্থকে অর্ধেক ভাগ দিয়ে সেই মাছ বিক্রি করত। তিনজনে গড়পড়তা তিন সের মাছ ভাগে পেত। ছ পয়সা সাত পয়সা সের দরে সাড়ে চার আনা পাঁচ আনা উপার্জন হ'ত, তাতে চ'লে যেত সংসার। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা দেশে কাঁচির মাপ অর্থাৎ ষাটের ওজন দেশে প্রচলিত; দেড় টাকা দু টাকা চালের মণ, দৈনিক পাঁচ আনা উপার্জনে ছ জনের সংসার চ'লে যেত এক রকমে। কিন্তু জালি দিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা বারো মাস চলে না। বর্ষায় পুকুর ভ'রে গিয়েছে। মাঠে এখন প্রচুর মাছ, খুচরো মাছের দর এখন দু পয়সা থেকে চার পয়সা। জগন্নাথের পরিবারে অর্ধাশন আরম্ভ হ'ল। এত দুর্দশার মধ্যেও কিন্তু জগন্নাথের স্ত্রী ভিক্ষা করতে বের হয় নি, অথবা ছেলে দুটিকে রাখালির কাজে লাগতে দেয় নি। জগন্নাথ সর্দারের ছেলে তারা, জগন্নাথের পরিবার বলে—বাঘের বাচ্চা শেয়াল-কুকুরের কাজ করবে? সর্দার যখন ফিরে আসবে, তখন তাকে মুখ দেখাব কি ক'রে?

বড় ছেলেটার বয়স বছর বারো। সে কিছু সাহায্য করতে পেরেছে। মাঠ থেকে বাগান থেকে ফসল ফল আনতে পেরেছে। চুরি ক'রে নয়, প্রকাশ্যেই নিয়ে আসে। মধ্যে মধ্যে মার খায়। কিন্তু তাতে দমে না। বর্ষার সময়, মাঠে এখন ফসল শুধু ধান, তাও কাঁচা; বাগানের গাছেও এখন ফল নাই, কচি পাতায় পাতায় গাছগুলি ভ'রে উঠেছে।

ছোটটির বয়স আট। এটির শরীরও জন্মাবধি দুর্বল। এইটিই পড়ল জ্বরে। প্রথমে কম্পজ্বরে পড়ল। শ্রাবণের শেষ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তিনবার জ্বর হ'ল, চারবারের বার বুকে বসল সর্দি। কবিরাজ গুপ্ত ব'লে দিয়েছিলেন, শিউলিপাতার রস খাওয়াতে। জগন্নাথের স্ত্রী অবহেলা করে নি তাঁর কথা। তবে নিয়মিত কিছুদিন ধ'রে খাওয়ানো হয় নি। যখন জ্বরে পড়েছে তখন খাইয়েছে। যখন জ্বর সেরেছে তখন বলেছে—এইবার ভাল ক'রে খা। শরীরে বলাধান হ'লেই জ্বর পালাবে। এবার জ্বর হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গলায় সাঁই সাঁই শব্দে একটা ডাক উঠতে শুরু করল। আগে জ্বর ছেড়ে ছেড়ে আসত, এবার আর জ্বর ছাড়ল না। জগন্নাথের স্ত্রী কবিরাজের ওখানে গেল ছেলেকে কোলে নিয়ে। কবিরাজ দেখে বললেন, তাই তো রে, এ যে বেশ পাকিয়ে ফেলেছিস, অ্যাঁ! বুকে বেদনা-টেদনা আছে?

আছে বাবা। সারারাত কুঁতিয়েছে।

হুঁ। ওষুধ আমি দিচ্ছি বাবা। তবে রোগটি বড়লোকের মা। পুলটিশ মালিশ অনেক

কিছু চাই। তা নিয়ে যাস। ওষুধ আমি দোব। ঠাণ্ডাকে সাবধান। বুঝেছিস? আর একটি কথা। চল্, ওই ওদিকে চল্।

আড়ালে ডেকে বললেন, এখানে আসবি বাবা, একটু সাবধানে, বুঝেছিস? সন্ধ্যের পর বরং একেবারে বাড়ির ভেতরে আসবি। তোকে সেবার ধান দিয়েছিলাম, দফাদার বেটা এসে বললে—কবরেজ মশাই নাকি জগন্নাথের পরিবারকে ধান দিয়েছেন? বুঝলি না বাছা?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জগন্নাথের স্ত্রী বললে, জানি ওসব বাবা, বুঝিও সব। বেকায়দায় পড়লে হাতী, চামচিকেতে মারে লাথি। তা মারুক। আমিও একদিন এ বেকায়দা থেকে উঠব। বাবা, দফাদার আমার বড় মেয়েকে সেদিন ডেকে হেসে কথা বলেছে। বলেছে—। দাঁতে দাঁতে ঘ'ষে জগন্নাথের স্ত্রী নিষ্ঠুর আক্রোশে বললে, আমি থাকলে বেটার কষে আঙুল ভ'রে মুখের হাসির দাগে দাগে মুখখানাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম। তা আসুক, সর্দার আসুক।

কবিরাজের ওষুধে ফল হয় নি। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নাই। প্রবল জ্বর, তার উপর বিকারের ঘোরে বকছে, চীৎকার করছে, বিছানা ছিঁড়ছে। জগন্নাথের স্ত্রী যেন পাগল হয়ে গেল। কবিরাজ বললেন, আমার হাতে আর নাই সর্দার-বউ। আমার ওষুধ আমি সবই দিয়েছি মা। কিন্তু ধরল কই? তুই বরং এক কাজ কর্; যদি পারিস, সাধ্যিতে কুলোয়, তো নবগ্রামের ডাক্তারকে একবার ডেকে দেখা। ওদের ওষুধ বিলাতে তৈরী ওষুধ, তেজ ভাল, ফল হ'লেও হতে পারে। নাড়ী দেখে অবিশ্যি—। তা দেখা না কেন একবার।

নবগ্রামের ডাক্তার নবগ্রামের বাইরে দু টাকা ভিজিট নেয়, তার ওপরে ওষুধের দাম। কোথায় পাবে জগন্নাথের স্ত্রী?

বড় মেয়ে বিধবা। সে বললে, মা!

মা কথা বললে না, ফিরে মেয়ের দিকে তাকালে।

মেয়ে বললে, জানবি না হয় আমি ম'রে গিয়েছি।

দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল সর্দারের স্ত্রীর চোখ। মেয়ে কি বলতে চাচ্ছে তার আভাস পেয়েছে সে।

মেয়ে বললে, মহম্মদ টাকা দেবে মা।

মহম্মদ জগন্নাথ সর্দারের লাঠির শাকরেদ একজন। এই গ্রামেই বাড়ি। মহম্মদ তরুণ জোয়ান। সে আজ নিজেকে সমগ্র অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর ব'লে মনে করে। একমাত্র জগন্নাথকে স্বীকার করতে হয় তাকে। আজও তার সঙ্গে লাঠি ধ'রে শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ হয় নি। সংকল্প ক'রেও সাহসে কুলোয় নি। মনে মনে একটা কঠিন আক্রোশ আছে জগন্নাথের উপর—ওস্তাদ-শাকরেদ সম্পর্ক সত্ত্বেও আছে। শেখের পাড়ার শেখেদের জগন্নাথের সঙ্গে জাতি নিয়ে যে বিসম্বাদ, যে আক্রোশ, আসল আক্রোশ বোধ হয় তাই। শেখেদের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর মহম্মদ জগন্নাথের অনুপস্থিতির সুযোগে তার কন্যাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ তুলতে চায়।

শেখের পাড়ার প্রধান মকার্থা এর বিরোধী, নইলে এতদিন কোন্‌দিন বাঘে যেমন লাফ দিয়ে প'ড়ে হরিণীকে মুখে নিয়ে পালায় তেমনই ক'রেই মহম্মদ জগন্নাথের বড় মেয়েকে তুলে নিয়ে আসত। মকার্থা বলেছে, খবরদার! ওসব চলবে না। হাঁ। আমার জানটা থাকতে না।

মহম্মদ টিটকারি দিয়েছিল, কেনে গো, জগন্নাথের ডরে নাকি?

ডর? মু সামলে বাত বলিস মহম্মদ, নোড়া দিয়া দাঁতগুলান তোর ভেঙে দিব।

মহম্মদ বত্রিশটা দাঁত বের ক'রে হেসে বলেছিল, নিয়ে এস তোমার নোড়া, দেখি ভ্যালা নোড়াটাই কেমন!

দেখবি। একদিন আমাকেও দেখাতে হবে। তোকেও দেখতে হবে। সে আমি বেশ জানি। বুঝলি, হিঁদুরা বলে—রাম না জন্মাতে রামায়ণ, তোরে নিয়েও তাই হবে।

মহম্মদ বলেছিল, হিঁদুদের ডরেই তুমি গেলে, বুঝেছ!

ডর হিঁদুরও লয় রে বেতমিজ, জগন্নাথেরও লয়। ডর ওই উনার। সে হাত তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। শুন্, হিঁদুর মেয়ে ঘরে তুললে তোর যে বাহাদুরি হবে, সে বাহাদুরি শয়তানের বাহাদুরি। খোদাতালা তাতে খুশি হন না। পয়গম্বর তা বলেন নাই। ডর তারই।

একটু চুপ ক'রে থেকে মকার্থা আবার বলেছিল, হাঁ, আসুক কেউ হিঁদু, মর্দানা হোক মেয়েলোক হোক, নিজে থেকে এসে বলুক—আমি কলমা পড়ব, মোসলমান হব, তখন যদি আমি ডর করি তখন বলবি। মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে তখন কসুর আমি মানব। তুই যা বলছিস সে হ'ল জানোয়ারের কাম, শয়তানের হদিস,—উ আমি করতে দিব না।

মহম্মদের সমর্থক আছে, তরুণ দলে তার সমর্থক অনেক। কিন্তু মকার্থা গ্রামের প্রধান বিশিষ্ট চাষী, ধার্মিক লোক; তাকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় নি। আরও যে ভয়ের অপবাদ মকার্থাকে দিতে চেয়েছিল মহম্মদ, সে ভয় তার না থাক্, তার দলের আছে। জগন্নাথ যে দিন ফিরবে সে দিনের কথা মনে ক'রে তারা শিউরে ওঠে। মহম্মদ বলে, আর রাখ্ তোর জগন্নাথ। আর জগন্নাথ জন কয়েক লোক নিয়ে কি করবে? আমরা এখানে কত জনা, গোটা গাঁ আমরা এক দিক।

সে কথাও সত্য। জগন্নাথ এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তবু ভয়। জগন্নাথ ও তার সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো তাদের জনবলের সম্মুখে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যেতে যেতে তাদের সমসংখ্যক প্রতিপক্ষকে নিয়ে যাবে এ কথাও ধ্রুব সত্য। সেই ভয়ে তারা পিছিয়ে আসে।

অবশেষে মহম্মদ অন্য পথ আবিষ্কার করেছে।

জগন্নাথের মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় আসে? খাঁ সায়েব তখন কি বলবে?

জগন্নাথের সংসারে চরম দুর্দশার সংবাদ পেয়ে সে খান কয়েক নোট হাতে নিয়ে চাঁপার সামনে এসে দাঁড়াল।

জগন্নাথের স্ত্রী সমস্ত শুনে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর? তোর বাবা যখন ফিরবে, তখন? তখন কি হবে?

চাঁপা হেসে বললে, ভালই হবে। পিচাসটার সাজা হবে। ওর রক্তে চান ক'রে শুদ্ধ হয়ে বাড়ি আসব।

তোকে ছাড়বে তোর বাপ?

না। মরব। ম'রে জুড়োব।

তারপর?

তারপর আবার কি!

তারপর আবার কি? তাকে যে ফাঁসি যেতে হবে!

চাঁপা শিউরে উঠল, বললে, তবে? তবে কি হবে?

অনেকক্ষণ ভেবে জগন্নাথের স্ত্রী বললে, দাঁড়া। শেষ একবার দেখব। তোরা দুই বোনে শম্ভুকে নিয়ে থাকতে পারবি তো? আমি একবার ঘুরে আসি।

কোথা যাবে?

যাব, ওই নবগেরামেই যাব। ডাক্তারের কাছেই যাব।

চাঁপাই ওই পুরানো ঢাকাই শাড়িখানা বার ক'রে দিয়ে বলেছিল, কাপড় ছেড়ে যাও, ওই কাপড়ে যায় না। হাজার হ'লেও বাবার তো একটা নাম আছে!

জগন্নাথের স্ত্রী এসে দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ডাক্তারের খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে উঠানে দাঁড়াল। ডাক্তার তখন কিশোরের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। ডাক্তার বিস্মিত হন নি, এমন ভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসারের অনেক মেয়েছেলেই বিপদে প'ড়ে ডাক্তারকে ডাকতে আসে। কিশোরের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কে? কি বলছেন?

জগন্নাথের স্ত্রী জীবনে কখনও কারও পায়ে ধ'রে মিনতি করে নি। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তার ইচ্ছা হ'ল ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাও সে পারলে না।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলেন, অকপট সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন, বলুন মা, কি হয়েছে? বাড়িতে অসুখ? কার অসুখ?

জগন্নাথের স্ত্রী ওই সহানুভূতির স্পর্শে বিগলিত হয়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল, আমার ছেলের।

পর-মুহূর্তে সে ডাক্তারের পায়ে আছড়ে প'ড়ে বললে, স্বামীর নাম ধরতে নাই, তবু আজ ধরছি বাবু, আমি জগন্নাথ সদ্দারের পরিবার। আমার ছেলের বুকে ঠাণ্ডা ব'সে সান্নিপাতিক জ্বর। স্বামী আমার ডাকাতি মকদ্দামায় জেলে আছে। আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরছে। আপনি তাকে বাঁচান বাবু।

ডাক্তার বললেন, বেশ তো, আমি যাব দেখতে।

আমি ভিজিট দিতে পারব না, ওষুধের দামও দিতে পারব না। দিতে হ'লে আমার বেধবা মেয়েকে বেচতে হবে বাবু, মহম্মদ শেখ কিনতে চেয়েছে। হয় তাই করতে হবে, নয়, আমার ছেলেকে যমকে দিতে হবে

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলেন। প্রথম মুহূর্তে একটা দ্বন্দ্ব জেগে উঠল মনে। প্রচলিত সমাজের চিন্তাধারা—নিষ্ঠুর নৃশংস জগন্নাথ ডাকাতের জেল হয়েছে, সে শাস্তি দিয়েছে রাজশক্তি ; এ শাস্তি দিচ্ছেন বোধ হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন যে শক্তি সেই শক্তি। তা ছাড়া মনে হ'ল থানার সতর্ক দৃষ্টির কথা। এ কথা প্রকাশ পেলে থানার খাতায় তঁার নাম লেখা হবে।

তরুণ কিশোর ব'লে উঠল, ওঠ তুমি, ওঠ। যাবেন ডাক্তারবাবু, নিশ্চয় যাবেন।

ডাক্তার হাসলেন। ইংরেজীতে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার সমস্যার তুমি সমাধান ক'রে দিলে।

কেন ?

পরে বলছি। তার আগে শোন মা ; আমি যাব রাত্রে। বুঝেছ না ? নিশ্চয় যাব।

ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন বাবা। আমার মত দুঃখিনীকে তিনি দয়া করেন না, কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করবেন তার জন্যে তাঁকে আপনাকে দয়া করতে হবে। আর সর্দ্দার ফিরে এলে সে আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁতে ক'রে সে কাঁটা বের ক'রে দেবে।

হেসে ডাক্তার বললেন, ভগবানের কথা ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও। যা ভাল বুঝবেন তিনি করবেন। তোমার স্বামী ফিরে এসে যা ভাল বুঝবে করবে। এখন গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দাও দেখি। সত্যি জবাব দেবে কিন্তু।

বলুন বাবু।

ছেলের অসুখ হয়েছে—আমি যাব, দেখব, ওষুধ দেব, কোন টাকাকড়ি লাগবে না। যথাসাধ্য করব। তবে বাঁচা মরার কথা কেউ বলতে পারে না, সে তুমিও বোঝ। কিন্তু এতেই কি তোমার সব দুঃখ বিপদ অভাব যাবে ?

জগন্নাথের স্ত্রীর মুখে বেদনার্ত হাসি ফুটে উঠল. সে বললে, তাই কি ঘোচে বাবু ?

হ্যাঁ, তাই বলছি। খুলেই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি বললে, মহম্মদ শেখ তোমার বিধবা মেয়েকে কিনতে চেয়েছে। এখন ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'লেই কি তা আর করতে হবে না ? তোমাদের এখন খাওয়া-পরা চলছে কি ক'রে ?

একে একে ডাক্তার সকল সংবাদ সংগ্রহ ক'রে একটু ভেবে বললেন, তুমি বাড়ি চ'লে যাও। একটা ওষুধ এখন দিচ্ছি, নিয়ে যাও। রাত্রে আমরা যাব, আমি আর এই বাবু। কিছু চাল, পারলে দু-একখানা কাপড় আমরা নিয়ে যাব।

জগন্নাথের স্ত্রী চ'লে গেল।

ডাক্তার কিশোরকে বললেন, কিশোর, এক মুহূর্তে সমস্যার যে সমাধান মনে জাগে, তাই

হ'ল তাঁর নির্দেশ। আমাদের সমিতির নিয়ম ছিল গরিব ভদ্রলোকের সাহায্য করা। গণ্ডি ছিল এই গ্রামটি। আজ যখন তাঁর নির্দেশ এসেছে, তখন সে নিয়ম সংশোধন ক'রে ফেল। বুঝেছ না ? কিছু চাল আর কাপড় যোগাড় করতে হবে।

আজকার এই যাত্রা সেই শেখেরপাড়ায় জগন্নাথের ছেলেকে দেখবার জন্য এবং তার স্ত্রীকে সাহায্য দেবার জন্য। শেখের পাড়ার প্রান্তদেশে এসেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

শেখেরপাড়ার প্রান্তদেশে একটা বড় পুকুর।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে একটি স্ত্রীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। জগন্নাথের স্ত্রী। সে ডাক্তারবাবুদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

দশ

দিন কয়েক পর গোপীচন্দ্র কিশোরকে ডাকলেন। অনেক সন্ধান ক'রেও তিনি কিছু জানতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি। অবশেষে সেদিন অমরনাথ এবং পবিত্রকে বললেন, থিয়েটার পার্টি যখন করবে তখন সকলকে নিয়ে কর।

পবিত্রের সে উদারতা যথেষ্ট আছে। উদারতা তার স্বাভাবিক তো বটেই, তার উপর সে প্রায় সাধনা ক'রে সে উদারতাকে উদারতর মহিমায় উজ্জ্বল এবং প্রশস্ত ক'রে তুলে চলেছে। সে বললে, আমরা সকলকেই নেব। এখন তাড়াতাড়ি এই কজন মিলে নামাব।

কে—কে ?

চন্দ্র জামাই, মঙ্গল, উরু, শূলপাণি—

কিশোর ? কিশোরকে নাও নি ? চমৎকার গলা, গান গেয়ে মন কেড়ে নেয়। সেদিন রাত্রে গাঁয়ের বাইরে কোথাও ব'সে গান গাইছিল, বন্দেমাতরম্ গান ; শোন নি ?

শুনেছি।

ওকে নাও নি ?

আমি তো কয়েকবার ওকে বলেছি। কিন্তু থিয়েটার করবার ঝোঁক ওর নেই।

ঝোঁক নেই ? কেন ?

তা কি ক'রে বলব ?—একটু মিষ্ট হাসি হাসলে পবিত্র।

এ বয়সে তো এ সবের ঝোঁক স্বাভাবিক। এই তোমার পিসীমাকে, মাকে বলছিলাম, সেকালে গ্রামে যাত্রার দল এসেছিল, আমার বয়স তখন অল্প। আমার চেহারা দেখে অধিকারীর আমাকে দলে নেবার জন্যে কি আগ্রহ! আমারও নেশা কম হয় নি। গোপীচন্দ্র হাসলেন। আমি তখন মাথায় ছোট, এমন লম্বা মানুষ হবার কোন লক্ষণই ছিল না। অধিকারী বললেন, তোমায় রাধা সাজাব। আমার মনে হ'ল, আমি স্বর্গে চ'লে গেলাম। সেই জরির কাপড়, মাথায় মুকুট, মুখে অলকা তিলকা, নাকে নোলক, গায়ে পুঁতির গয়না, আর সেই সব বক্তৃতা, সেই সব গান! ওঃ! যাত্রা হয়ে যেত, যাত্রা চ'লে যেত, দু-তিন দিন

কান্না পেত, রাত্রে রাধাকে স্বপ্ন দেখতাম। সেই রাধা সাজব আমি! তা শেষ পর্যন্ত হ'ল না, কপালে রয়েছে কয়লা ঘেঁটে জীবন যাবে, রাধা সাজা ঘটবে কেন? মা আমার কিছুতেই যেতে দিলেন না।

কিছুক্ষণ হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, ডাক, কিশোরকে ডাক। আমি বলছি তাকে।

কিশোর প্রণাম ক'রে কাছে বসল। এক কথাতেই জবাব দিয়ে দিলে। বললে, আমি এখন পড়ছি। এখন কি আমার থিয়েটার করা চলে?

কথাটা গোপীচন্দ্র ভুলেই গিয়েছিলেন। এ গ্রামের ছেলেদের মধ্যে এক কিশোরই এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়ছে। পবিত্র পাস করতে পারে নি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, তাই তো! কথাটা আমার মনে ছিল না।

অমরবাবু বললেন, তাতে কি হয়েছে! তুমি কলেজের ছাত্র, নাটক তোমার পাঠ্য, তোমাকে শেক্সপীয়র পড়তে হবে, আরও বড় বড় নাট্যকারের নাটক পড়তে হবে। আর অভিনয় হ'ল একটা আর্ট। ওদের দেশে ইস্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত অভিনয় করে। কলেজে পড়ছ, তাতে কি হয়েছে?

কিশোর সবিনয়ে বললে, না। আমার নিজের ভাল লাগছে না, তা ছাড়া আমার বাবা কাকা—এঁরাও পছন্দ করবেন না।

থাক্ অমর। কিশোর ঠিক বলেছে। ও এখন ছাত্র, ভাল ক'রে পড়াশুনা করুক। তোমাকে কিন্তু এম. এ. পাস করতে হবে। খুব ভাল ক'রে পাস করতে হবে। নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করা চাই।

পবিত্র এবার বলে, বেশ তো, পার্ট না হয় নাই করলে, কিন্তু অন্য কাজও তো আছে। হারমোনিয়ম বাজাবে গানের সঙ্গে, প্রম্‌ট্ করবে—এগুলো করতে আপত্তি কি?

কিশোর হেসে ফেললে, ও ভাই পারব না। সাজলে রাজা রাণী সাজাই ভাল। তামাক সাজা ঠিক নয়: ওসবগুলো এক রকম তামাক সাজার পার্ট।

গোপীচন্দ্র বললেন, থাক্ পবিত্র, কিশোর ঠিক বলেছে। আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি কিশোর। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমরাও যাও, ব্যবস্থা যা করবার তুমি কর অমর। কীর্তিকে পবিত্রকে সঙ্গে নাও। আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

বলে তিনি নিজেই উঠে পড়লেন। সর্বাগ্রে তিনিই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। তাঁর নীল চোখ দুটি নিষ্পলক স্থির হয়ে উঠেছে। কিশোরকে তিনি বুঝতে পারেন নি। এই উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে, তাকে তিনি বুঝতে পারলেন না? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, কই, সে তো লজ্জায় মুখ নামালে না? কথা বলতে কণ্ঠস্বর কুণ্ঠায় একবারের জন্যও জড়িয়ে গেল না? তিনি কি সেদিন রাত্রে ভুল দেখেছেন? এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে তবে সেই দীর্ঘাকৃতি তরুণ কে? তারপর সে রাত্রের সেই গান? সে গান

যে কিশোরের কণ্ঠের গান, সে কথা তো পবিত্রও বললে। তবে? দুটো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? না। আপন মনেই তিনি ঘাড় নাড়লেন। না, তাঁর ভ্রম নয়।

কিশোর রাস্তার উপর নেমে চ'লে গেল।

গোপীচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত পরেই নেমে পড়লেন রাস্তার উপর। দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে ডাকলেন, দাঁড়াও কিশোর, চল, আমিও যাব ওদিকে।

অমর এবং পবিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আসছি।

বিস্ময় জেগে উঠল দুজনের মুখে। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতে সাহস করলে না। নিজেই গোপীচন্দ্র বললেন, আমি যাব একবার রাধাকান্তমামার ওখানে।

বাধ্য হয়ে কিশোরকে দাঁড়াতে হ'ল। গোপীচন্দ্র কিশোরের পাশে এসে মৃদু হেসে বললেন, চল।

কয়েক পা অগ্রসর হয়েই তিনি বললেন, কিশোর!

কণ্ঠস্বর শুনেই কিশোর চকিত হয়ে উঠল, মুহূর্তে বুঝতে পারলে গোপীচন্দ্র কি বলবেন। ক্ষণেকের জন্য তার বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়ে তারপর বললে, বলুন।

তোমার কাছে সেদিন আমি হার মেনেছি।

কিশোর চুপ ক'রে রইল।

গোপীচন্দ্র বললেন, ভূতের ভয় প্রেতের ভয় আজও আমার নেই। সামনে পড়লে লড়াই করতে পারি না-পারি, কথা বলতে পারি। প্রথম জীবনে আমার যে সাহস ছিল, সে সাহস তোমারও আজ নেই। কিন্তু বুড়ো হয়ে, অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে জীবনের ভয় হয়েছে। কোথায় কোন খোলায় পা কেটে যাবে, কি কোন প'ড়ো হাঁড়ির মধ্যে সাপ থাকবে—এই ভয়ে আর অর্জুনগাছটার গোড়া পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম না। ফিরে এলাম। তুমি আর তোমার সঙ্গে কে ছিল ঠিক চিনতে পারি নি, তোমরা দুজনে দিব্যি চ'লে গেলে ওগুলো মাড়িয়ে। সাপটার মুখের সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেলে তাও দেখেছি। সেটাও আমি পারতাম না। জীবনের দাম হয়ে ভীতু হয়ে গিয়েছি।

একটু ম্লান হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, কিন্তু কেন? আমার সাড়া পেয়ে কেন তোমরা এমন ভাবে সাপের মুখ অগ্রাহ্য ক'রে পালালে, কেন তোমরা ওই প্রেতের আশ্রয়—ওই গাছটার তলায় গিয়ে লুকুলে?

কিশোর ভাবছিল, ভাবছিল মিথ্যা কথা ব'লে অস্বীকার করবে কি না? মন সায় দিচ্ছিল, আবার সাহসও হচ্ছিল না।

গোপীচন্দ্র বললেন, কিশোর!

আজ্ঞে।

আমার কথার উত্তর দাও।

কিশোর আবার চুপ ক'রে গেল।

আমি কি সাপের চেয়েও হিংস্রক, সাপের চেয়েও কি আমার বিষ বেশি? ওই যে অর্জুনগাছে যে কালপুরুষ আছে লোকে বলে, তার চেয়েও কি আমি বেশি ভয়ঙ্কর?

কিশোর তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, আপনি মহাপুরুষ। এ কথা কি কেউ ভাবতে পারে আপনার সম্বন্ধে?

তবে? তবে কেন এমন ভাবে আমাকে এড়াতে চাইলে?

কিশোর সংযত পরিষ্কার কণ্ঠে বললে, আমরা কোন অন্যায় কাজ করতে যাই নি।

গোপীচন্দ্র হাসলেন। বললেন, তুমি খুব চতুর কিশোর। এক কথাতে তুমি আমার মুখ চাপা দিতে চাচ্ছ। তুমি যা বললে কিশোর, সে কি আমি বুঝি নি? তা যদি না বুঝতাম, যদি ভাবতাম যৌবনকালের ধর্মে তুমি এখানকার আর পাঁচটা ছেলে যা করে, এই ধর না, আমার ছেলে পবিত্রের কথা—ওর অনেক গুণ, তবু সে সব দোষ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তোমার সম্পর্কে তাই যদি ভাবতে পারতাম, তবে তোমাকে ডেকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করব কেন? তোমরা যুবা হয়ে উঠেছ, যৌবনের দোষই যদি পেয়েই বসে, তবে সে নিয়ে দুঃখ করব মনে মনে, ডেকে জিজ্ঞাসা করব কোন্ মুখে?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, প্রথমটা এমন সন্দেহই হয়েছিল আমার। রাগ হ'ল তোমার উপর। এমন রাগ হ'ল যে, থাকতে পারলাম না, আলোটা হাতে নিয়ে তোমাকে ধরবার চেষ্টায় বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে, তোমরা অর্জুনগাছের আড়ালে লুকুলে। এগিয়ে যেতে না পেরে হার মেনে ফিরেই এলাম, মনে মনে দুঃখও করলাম অনেক যে, নবগ্রামের মাটিতে বোধ হয় বিষ আছে—হলাহল বিষ। শরীরে এ বিষ ঢুকলে কারও নিষ্কৃতি নাই। বাড়ি ফিরে এসে ওই কথাটাই ভাবছিলাম। এমন সময় তোমার গান কানে ঢুকল। অনেকটা দূরেই গাইছিলে, কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রি আর বাধাবিঘ্নহীন ফাঁকা মাঠ—আমার দোতলা পর্যন্ত অস্তত এসেছিল। প্রথমটা মনে হ'ল, উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস তোমার এত বেশি হয়েছে যে, কুৎসিত কাজ করতে গিয়েও এমন গলা ছেড়ে গান গাইতেও বাধছে না তোমার। কিন্তু গানের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্ শব্দ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে যা ভেবেছিলাম এতক্ষণ, সব মিথ্যা ব'লে মনে হ'ল। এই গান—এ গান তো ব্যভিচারীর মুখ দিয়ে বেরুবে না। মাতাল তো কখনও দুধের বাটি মুখে তোলে না, ও বস্তু তো তার জিভে রোচে না, পেটেও সয় না। তবে? আমি কদিন ধ'রে ভেবেছি, কিন্তু কিছু অনুমান করতে পারি নি। লোক দিয়ে সন্ধান করবার চেষ্টা করেছি। সন্ধান যা পেয়েছি, তাতে আরও জটিল হয়ে উঠেছে সমস্ত ব্যাপারটা। তোমরা পশ্চিম দিক ধ'রে গিয়েছিলে, শেখের পাড়ার বড় মাঠটার চারিপাশের গাঁয়ের লোকে তোমার গান শুনেছে—এ খবর পেয়েছি, তার বেশি কোন কিছু জানতে পারি নি। আমি যে বুঝতে পারছি না আর না-বুঝে না-জেনেও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এই এত রাত্রে এমন ভাবে কোন্ কাজে ওদিকে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? কি সে কাজ, যা আমার কাছে লুকোবার জন্যে সাপের মুখ দিয়ে ছুটে পালালে, ওই অর্জুনগাছটার মত ভয়ের জায়গায় অনায়াসে গিয়ে লুকোলে? আমাকে যে জানতে হবে। বল, তুমি

নির্ভয়ে বল, আমা থেকে কোন অনিষ্ট হবে না তোমার, আর তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না। এমন কি আমার দীক্ষাগুরু পর্যন্ত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে তোমার অনুমতি না নিয়ে তাঁর কাছেও প্রকাশ করব না আমি।

কিশোর অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

গোপীচন্দ্র তাঁর দেহ ও রূপমহিমায়, জীবনের কর্ম-সাফল্যের অসামান্যতায় তার কাছে বিরাট পুরুষ। এবং তাঁর জীবনসাধনায় তিনি শুধু সম্পদই অর্জন করেন নি, একটি মহৎ ব্যক্তিত্বও অর্জন করেছেন। সেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তার অভিভূত হয়ে পড়ারই কথা। তিনি যদি তাকে কড়া কথা বলতেন, শাসন করতেন, তা হ'লেও হয়তো কিশোর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। কিন্তু এত বড় ব্যক্তিটি এমন মিষ্ট ভাষায় সস্নেহে তাকে গ্রহণ করলেন যে, সে আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না। বললে, আমরা গিয়েছিলাম শেখের পাড়াতেই। গিয়েছিলাম—

বল। আমি তো বলেছি—কোনও সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই।

জগন্নাথ সর্দারের পরিবারের খুব দুর্দশা হয়েছে, সে জেলে আছে—

ডাকাত জগন্নাথ?

হ্যাঁ।

মাটির দিকে তাকিয়ে কিশোর ব'লে গেল সব কথা। গোপীচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন, একটা বিচিত্র অনুভূতিতে মন ভ'রে উঠল। তার মধ্যে বিস্ময় আছে, তার মধ্যে অকারণ একটা শঙ্কা আছে, গৌরব অনুভবের আনন্দ আছে, তাঁর নিজের সন্তান পবিত্র ও-কাজে অগ্রণী হয় নি তার জন্য বেদনা আছে, আরও যেন কিছু আছে।

কথা শেষ ক'রে কিশোর মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। গোপীচন্দ্র যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন। তিনি ভাবছিলেন, নবগ্রাম তো তাঁর অজানা নয়, এখানকার মাটিকে তিনি জানেন, নবগ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে স্বর্ণের পুষ্করিণীর নীচে এক স্তর মাটি আছে, যার রঙ গাঢ় লাল, সে মাটি পুকুর কাটবার সময় দক্ষিণ পাড়ের ঠিক মাঝখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, লোকে সেই মাটিতে দেওয়াল লেপন করে। তিনি জানেন, দক্ষিণে রাধাকান্তের বাগানের মধ্যে মাটি আছে, যে মাটির মধ্যে মানভূম-সাঁওতাল পরগনার মাটির আমেজ। তিনি জানেন, পূর্বদিকে মহাপীঠের পাশে মাটি আছে, যে মাটির রঙ কালো, যার মধ্যে অপরিসীম উর্বরতা। তিনি জানেন, ওখানে ছিল একদা কোন নদীগর্ভ, যে নদী আজ ম'জে গিয়েছে, যার খানিকটা অংশ আজও পঙ্কিল জলাশয়ের মত মাঠের মধ্যে জেগে রয়েছে। তিনি নবগ্রামের মানুষকে জানেন, এখানকার মানুষের জীবনধারাকে জানেন; যে প্রবাহের জলের পলিমাটির দাগ এখানকার সকল মানুষের গায়ে লেগে রয়েছে, যার দাগ তার সন্তানদের গায়েও লেগেছে নবগ্রামের বাইরে, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনধারায় স্নান করিয়েও তাদের অঙ্গ থেকে সে মালিন্য ওঠে নি। সবই তিনি জানেন। কিন্তু এ যে তাঁর সকল কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। কোথা থেকে পেলে এমন জীবনধারার সন্ধান এই ছেলেটি! ভগীরথের মত শাঁখ বাজিয়ে

কলরোলমুখর ধারাকে সে নবগ্রামে আনতে পারে নি, কিন্তু জীবন-ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ ক'রে নিয়ে এসেছে, তাতে তো সন্দেহ নেই। স্তব্ধ হয়ে তিনি ভাবছিলেন।

কিশোর বললে, আমি যাই।

না।

কিশোর এবার অস্বস্তি অনুভব করলে। আবার কি?

ওই ডাক্তারকে নিয়ে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কেমন?

বলব তাঁকে।

না। তুমি বিকেলবেলা আমার কাছে আসবে। আমরা একসঙ্গে যাব ডাক্তারের কাছে।

কেন? আমরা কি অন্যায় করেছি?

হাসলেন গোপীচন্দ্র। বলব, তখন বলব।

ফিরলেন তিনি। ফিরেই দেখলেন, তাঁর চাকর দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দূরে তাঁর বৈঠকখানার বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে অনেক লোক জ'মে রয়েছে। কীর্তিচন্দ্র পায়চারি করছে। গোপীচন্দ্র এখান থেকেই দেখতে পেলেন কীর্তির কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে।

বৈকালে নিজেই গোপীচন্দ্র কিশোরদের বাড়ির দুয়ারে এসে গাড়ি নিয়ে দাঁড়ালেন। কিশোরের অভিভাবকেরা অবাক হয়ে গেল। লক্ষপতি গোপীচন্দ্রের সঙ্গে গ্রামের জমিদার-বংশোদ্ভূত স্বর্ণবাবু, শ্যামাদাসবাবু, সরকারপাড়ার বংশলোচন, এমন কি রাধাকান্তেরও প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা আছে, গ্রামের অ-জমিদার মধ্যবিত্তদের সঙ্গে নাই। বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় গোপীচন্দ্রের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা। তার কারণ তারা নিজেরা প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী নয়, তারা যোগ্যতম ব্যক্তিকেই গ্রামের প্রধান হিসাবে চায়,—গোপীচন্দ্র নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ব্যক্তি। উনিশ শো ছয়-সাত সালের গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের সুগৌর মসৃণ প্রসন্ন ললাটে চাঁদের আভাস দেখতে পায় তারা। সেই হেতু তাদের কাছে তিনি নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য এবং এখানকার অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য দেবতা-প্রেরিত ব্যক্তি। আরও একটি কারণ সম্ভবত আছে। প্রতিষ্ঠাবান সমাজপতিদের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অদৃশ্য দ্বন্দ্ব আছে; মানব-সমাজের এই ফল্গুর মত প্রবহমাণ দ্বন্দ্ব চিরন্তন সত্য। ভাঙা-গড়ার মধ্যে এই শক্তিই সম্ভবত প্রধানতম শক্তি। সেই দিক দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান গোপীচন্দ্র নিজের কর্মবলে সম্পদ এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন ক'রে প্রাচীন প্রধানদের পরাজয় ঘটিয়ে প্রভুত্ব এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলে তাদের গোপনতম অন্তর প্রসন্নতায় ভ'রে উঠবে—এটা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে গোপীচন্দ্র তাদের গোপন মানসের প্রতিভূ। তাই তিনি তাঁদের সত্যকারের প্রিয়জন। এই কারণেই কিশোরের বাড়ির প্রত্যেকে যেমন হ'ল বিস্মিত, তেমনই হ'ল আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

কর্তাবাবু নিজে এসেছেন গাড়ি নিয়ে! কি ভাগ্যি কিশোরের, কি ভাগ্যি আমাদের!

কিশোর কিন্তু স্তিমিত হয়ে আছে। সকাল থেকেই সে চুপ ক'রে ব'সে ভেবেছে। প্রথমটায় তার মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কর্তাবাবুর মত মানুষ তার সঙ্গে যে সস্নেহ অন্তরঙ্গতার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে সে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে তার বিগলিত চিত্ত কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার হিমানী-প্রবাহের স্পর্শ পেয়ে জ'মে কঠিন হয়ে গিয়েছে। সে ঠিক এই নবগ্রামের সাধারণ মানুষ নয়। সে কলকাতায় পড়তে গিয়ে নূতন মানুষ হয়ে উঠেছে। এই নূতন মানুষদের কাছে ধনী জমিদার—এরা সাধারণ মানুষদের ঠিক আপন জন নয়। এরা যেন একটা আলাদা জাত। এদের ভয় না করলেও বিশ্বাস করতে সে পারে না। সে বেরিয়ে আসতেই গোপীচন্দ্র তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোচম্যানকে বললেন, চল্, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।

ডাক্তার সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। কিশোরই খবরটা দিয়ে এসেছিল। ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ভেবে হেসে বলেছেন, ভাল, আসুন তিনি, দেখি!

আরও খানিকটা ভেবে আবার বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ভালই হবে। আরও খানিকটা ভেবে বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, ভালই হবে। বুঝেছ না কিশোরচন্দর, ভালই হবে।

গোপীচন্দ্র ডাক্তারের বাড়িতে এসে স্মিতহাস্যে ডাক্তারকে অভিনন্দিত ক'রে বললেন, তোমাদের দলে আমাকে ভর্তি ক'রে নাও ডাক্তার। আধ মণ পঁচিশ সের চাল ঘাড়ে নিয়ে দু-চার ক্রোশ হাঁটবার ক্ষমতা আমার আজও আছে। হেসে উঠলেন তিনি।

ডাক্তার তাঁকে নমস্কার ক'রে হেসে বললেন, আমাদের কিন্তু আরও অনেক বেশি ওজনের বোঝা বইবার লোকের প্রয়োজন।

আরও বেশি? না ডাক্তার। এ বয়সে সে শক্তি আর নাই।

আছে। অপার শক্তি আছে ব'লেই বিনয় ক'রে ওটা বলছেন।

থাকলে নিশ্চয় বইব। বল, কি বইতে হবে?

মানুষের দুঃখের বোঝা। দুঃখী মানুষের সেবা করবার জন্যেই আমরা কজনে মিলে একটু-আধটু চেষ্টা করি; কিন্তু শক্তি আমাদের নেই, আমরা পারি না। আপনার মত লোকেরই প্রয়োজন। ভগবান আমাদের ডাক শুনেছেন, তিনি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের ভাবনা কি?

গোপীচন্দ্র হেসে বললেন, যে চিন্তামণি চিনি যুগিয়ে থাকেন তিনি আমাদের গাঁয়ের মুদী চিন্তামণি নন। আমিও ওই মুদীর মত নামে শুধু দুঃখহরণ ডাক্তার, আসল দুঃখহরণ ছাড়া দুঃখের বোঝা বইবার শক্তি পৃথিবীতে কারুর নাই। আমাকে পেয়ে ভাবনা চ'লে গেল—এ ধারণা ক'রো না।

ডাক্তার হার মানলেন না। বললেন, কথাটা না-মেনে উপায় নাই। আসল চিন্তামণি—আসল দুঃখহরণের কথা তুললে আর কথা থাকে না। তবে কি জানেন কর্তাবাবু, চিন্তামণি

মুদী যদি ইচ্ছে করে তবে যেটুকু চিনি ওজনে মারে সেটুকুও সে যোগাতে পারে, আর দুঃখহরণ যদি না বাঁচাতে চায় তবে আধ মণ পঁচিশ সের দুঃখের বোঝার জায়গায় এক মণ দেড় মণ দিব্যি বইতে পারে। আপনি তো নামেই শুধু দুঃখহরণ নন, কাজেও দুঃখহরণ। এইচ. ই. ইস্কুল করছেন—

আরও করব ডাক্তার, আরও করব। গোপীচন্দ্র থাকতে পারলেন না, ডাক্তারের কথার মধ্যস্থলেই ব'লে উঠলেন, আরও করব। বোর্ডিং করব। চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্‌সারি করব। টোল করব। গার্লস ইস্কুল করব।

এই তো—এই তো—এই তো হ'ল কর্তাবাবু। বোঝার পর বোঝা ঘাড়ে ক'রে তুলে চলেছেন, এর পরেও কি বলবেন, আপনি শুধু নামেই দুঃখহরণ? আমাদের নবজীবন সমিতি লোকের যে দুঃখ-কষ্টের পোঁটলা-পুঁটলি জড়ো করেছে, কি আরও দু-চার আঁটি যোগাড় করবে —তা আপনার ঘাড়ের বোঝার ওপর ফালতু আঁটির মত বইতে পারবেন না?

হেসে গোপীচন্দ্র বললেন, পারলে পিছিয়ে যাব না। কিন্তু কি নাম বললে তোমাদের সমিতির।

নবজীবন সমিতি

নবজীবন সমিতি বাঃ, বড় ভাল নাম ডাক্তার বাঃ

সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন গোপীচন্দ্র নবজীবন সমিতির ছোট্ট ঘরখানি দেখে। ডাক্তারের বাড়ির খ'ড়ো বারান্দার একটা কোণ ঘিরে ছোট্ট একখানি ঘর—এক দিকে তিন হাত, অন্য দিকে চার হাত কি পাঁচ হাত। তেমনই ছোট দরজা। এক দিকে ততোধিক ছোট একটি জানলা—চওড়ায় এক হাতেরও কম, লম্বায় হাত দেড়েক।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন,—দেওয়ালের গায়ে মোটা হরফে লেখা একখানা কাগজ চার কোণে পেরেক দিয়ে আঁটা রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে—মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

আর একটা কাগজে লেখা রয়েছে—বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির জন্য বীর রাজপুত জাতির অধঃপতন হইয়াছে। বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত ছিন্নভিন্ন, তাহাদের অধঃপতন দেখিয়া কি মনে হয় না যে, ইহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে? আইস, আমরা ইহার প্রতিবিধান করি। রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ বিভেদ তুলিয়া দিই—গাঁই গোত্র মেলের বেড়া ভাঙিয়া দিয়া এক হইয়া যাই। আজ হইতে আমরা রাঢ়ী বারেন্দ্র নই, আমরা কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান—সেই পরিচয়ে কান্যকুব্জব্রাহ্মণ। বাংলা দেশে বাস করি, সেই হিসাবে আমাদের পরিচয়—বঙ্গমেল। পঞ্চগোত্র আমাদের পরিচয়, গাঁই তুলিয়া দিলাম। দীক্ষা একমাত্র ব্রহ্মদীক্ষা। শাক্ত বৈষ্ণব শৈব দীক্ষা বর্জন করিলাম। আমরা গঠন করিলাম, শপথ করিয়া নবজীবনে গঠন করিতেছি—সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ। আমরা শৈব নই, আমরা শাক্ত নই, বৈষ্ণব নই—আমরা ব্রাহ্মণ।

ডাক্তার!

আজ্ঞে?

কিছু মনে করবে না তো? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন?

কিছু মনে করবে না তো?

সে কি? মনে করব কেন?

তোমাদের কি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

না—না—না। ওই তো আমরা স্পষ্ট লিখে রেখেছি—আমরা ব্রাহ্মণ। আমাদের প্রত্যেক সভ্যকে শিখা রাখতে হবে, ত্রিসন্ধ্যা করতে হবে, কেউ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করতে পারবে না, কোন অখাদ্য খেতে পারবে না।

তবে মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার ভাই হবে কি ক'রে?

হবে। সে যখন আমার ভাই হবে, তখন তাকে আমি পবিত্র ক'রে নোব। আমরা হব অগ্নির মত। ঘৃত বলুন, আবর্জনা বলুন, অমৃত বলুন, বিষ বলুন, যা আসবে তাই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করব, তখন আর ঘৃত আবর্জনা অমৃত বিষ ভেদ থাকবে না—কারণ সে হবে অগ্নি।

এসব কি তুমি ভেবে ঠিক করেছ ডাক্তার? এসব তোমার কথা?

মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার ভক্ত, তোমার ভাই—ও হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য? শুনেছি তাঁর কথা।

আর, সনাতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ার কথাটা আমার বটে। আমি অনেক ভেবেছি কর্তাবাবু। আমি জানি—ভুক্তভোগী ভিন্ন ভাবতে পারে না, দুঃখটা বুঝতে পারে না। আমি ভুক্তভোগী। ডাক্তারি পাস করলাম, বিধু চক্রবর্তী উপাধি—বংশজের সন্তান ব'লে আমাকে কেউ বিয়ে দিতে চাইলে না। রাধাকান্তবাবু আমাকে জোর ধ'রে মুখুজ্জে উপাধি দিয়ে কুলীন ব'লে চালালেন আমাকে। তিনি নিজে বললেন, সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে আমার শ্বশুর আমাকে কন্যাদান করেছেন। নইলে—

হাসলেন ডাক্তার। বললেন, সবাই তো জানেন। কিন্তু আমার মনের কথা জানেন না। কর্তাবাবু, বিয়ের পর আমি আর শ্বশুরবাড়ি যাই নি। তাঁরা এখনও জানেন না যে, আমি কুলীন নই। কিন্তু আমার নিজের মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। আমার স্ত্রীর বড় ভগ্নীকে আমার শ্বশুর এক বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি বিধবা। মধ্যে মধ্যে আমার এখানে আসেন। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও উন্মাদ হয়ে যান। সেই অবস্থায় কতবার বলেছেন—ঘর থেকে চ'লে যাবেন, বোষ্টম হয়ে যাবেন, মালাচন্দন করবেন। কখনও বলেন, না হয় পাদরীদের কাছে যাব—কৃশ্চান হব। বলতে সে সব লজ্জা হয়। মনের দুঃখে লজ্জায় অনেক ভেবেছি, শাস্ত্র-টস্ত্রও পড়েছি। ভেবে-চিন্তে এই ঠিক করেছি। এ না-হ'লে আর পথ নেই। গ্রামের ছোকরাদের দেখি, বখাটে মুখ্যু। কুলীনের ছেলে,

জমিদারের ছেলে কি ভাইপো—ষোল বছর পার হতে না-হতে বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েদের দেখি, যুবতী সুন্দরী গুণবতী মেয়ে বুড়োর হাতে পড়েছে, আটটা-দশটা সতীন, বাপের বাড়িতে দাসী-বাঁদীর মত কাল কাটাচ্ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন—আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি জানেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না—কত ভ্রূণহত্যা যে হয় তার হিসেব নেই।

গোপীচন্দ্র বললেন, ঠিক বলেছ ডাক্তার, ঠিক বলেছ।

সেই জন্য ভেবে আমি এই ঠিক করেছি। বুঝেছেন না? এ ছাড়া পথ নেই। আমরা সব উল্টে-পাল্টে সনাতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ব। যারা ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করবে না, তাদের পতিত করব। আমাদের নবজীবন সমিতির এই হ'ল প্রধান কাজ। এ কথা এখনও আমরা দুজন—কিশোর আর আমি—ছাড়া কেউ জানে না। রাধাকান্তবাবুর উদারতা আছে, আমার উপকার করেছেন অনেক, তাঁকেও আজও বলি নি। তবে ওঁর স্ত্রী জানেন কিছু কিছু। মেয়েটি আশ্চর্য মেয়ে। আজ আপনাকে দেখালাম।

গোপীচন্দ্র বললেন, এ নিয়ে তুমি বড় ক'রে কাজ আরম্ভ কর ডাক্তার। আমাকে দিয়ে যা হবে তাই আমি করব। তোমার দল বাড়িয়ে তোল, গ্রামের ছেলেদের নাও। কিশোর, যাও তো বাবা, আমার গাড়ি নিয়ে পবিত্রকে আর অমরকে নিয়ে এস। বল, আমি ডাকছি। কিংবা চল না ডাক্তার, আমার সঙ্গে ইস্কুলের ওদিকে চল না। ওখানে ওদের পাব, ফাঁকা জায়গায় ব'সে কথাবার্তাও হবে।

গোপীচন্দ্র অস্ফুট একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ডাক্তারের বারান্দা-ঘেরা ঘরের ছোট দরজায় দীর্ঘাকৃতি গোপীচন্দ্রের মাথায় আঘাত লেগেছে। ডাক্তার অপ্রতিভ হলেন।—কেটে গেল? দেখি দেখি!

না—না। চল, কিছু হয় নি। একটু লেগেছে, অপ্রস্তুত অবস্থা কি না! হাসলেন গোপীচন্দ্র।

ডাক্তার বললেন, একেই আমাদের দেশের দরজা ছোট করবার রেওয়াজ, তার উপর বারান্দা-ঘেরা ঘর। ঘর এবার পালটাব। বড় ক'রে আন্দোলন করতে হ'লে ঘর পালটাতেই হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, নবজীবন সমিতির ঘর পালটালেও দরজার মাপটা যেন কখনও বড় ক'রো না ডাক্তার। ওই মাপটাই বজায় রেখো। সভ্যেরা বিনয় শিখবে। উদ্ধত হয়ে মাথা উঁচু ক'রে যারা চলে, তারা দরজার ভয়েই আপনা থেকেই ঢুকতে ভয় পাবে। এই ব্যাপারটি তোমার একটি সত্যকারের শিক্ষা ডাক্তার।

কিশোর সমস্ত ক্ষণটা স্তব্ধ হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গোপীচন্দ্র এবং ডাক্তার কথাবার্তার মধ্যে এমনই মগ্ন ছিলেন যে, কিশোরের স্তব্ধতা লক্ষ্য করেন নি। এমন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার কথাও নয়; তাঁদের কথাবার্তার সময়ে কিশোরের বয়সের যুবকের সম্ভ্রমভরে চুপ ক'রে থাকারই কথা।

ডাক্তার এবং গোপীচন্দ্র দুজনেই বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন। কিশোর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, নামল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার পিছন ফিরে তাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, আরে এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

গোপীচন্দ্র দৃষ্টি দিয়ে আহ্বান করলেন।

কিশোর বললে, আপনারা কথাবার্তা বলুন গিয়ে। ওর মধ্যে আমি থেকে কি করব? আমি বরং একবার শেখের পাড়া ঘুরে আসি। জগন্নাথের স্ত্রী আজ তিন দিন আসে নি, কোন খবরও পাই নি।

গোপীচন্দ্র বললেন, ভাল কথা ডাক্তার, তোমাদের বোঝার ওই পোঁটলাটাই আমি প্রথম ঘাড়ে নিলাম। জগন্নাথের মেয়ে-ছেলের ভার আমার উপর রইল। শেখের পাড়া আমার জমিদারি। আমি গমস্তাকে লিখে দিচ্ছি, ওদের খাবার ধানটা সে মাসে মাসে দেবে আমার ওখানকার কাছারি থেকে। ওর ছেলে তো একটু ভাল আছে?

হ্যাঁ। সে জন্যে ভাববেন না। ও ভারটা আমার। আপনার ধান আছে আপনি ধান দেবেন; আমার ওষুধ আছে ওটার ভার আমার রইল। কিশোর, তা হ'লে আর ওখানে আজ গিয়ে কাজ নেই। কালই একেবারে ওঁর চিঠিপত্র নিয়ে আমরা দুজনে যাব।

কিশোর বললে, না। আমি আজ একবার ঘুরে আসি। আমার মন যেন কেমন বলছে। হয়তো খারাপ কিছু হয়েছে।

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার এবং গোপীচন্দ্র দুজনেই বিস্মিত হলেন। স্তব্ধ শান্ত কিশোরকে প্রথমটায় যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, কিন্তু এই কয়েকটা কথা বলতে বলতেই কিশোরের মুখ গভীর কোন বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

বিচিত্র বস্তু বেদনা, যে মানুষকে সে স্পর্শ দেয়, মুহূর্তে সে মানুষ চ'লে যায় নাগালের বাইরে। তাকে ছুঁতে গিয়ে মানুষ সসঙ্কোচে পিছিয়ে আসে। বোধ করি, লক্ষ্মণ সীতার চারি পাশে যে গণ্ডী টেনেছিলেন সে গণ্ডী ছিল বেদনার গণ্ডী; সীতা যতক্ষণ রামের ভাবনায় বেদনায় সমাহিত হয়ে বসেছিলেন, ততক্ষণ রাবণের মত দুর্ধর্ষ শক্তিশালীও তাঁকে স্পর্শ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিল; ছদ্মবেশী তপস্বীর কথাবার্তায় যে মুহূর্তে এই বেদনার সমাধি থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন, তখনই রাবণ তাঁকে অপহরণ করবার মত মানসিক দুর্ধর্ষতাকে সচেতন করতে পেরেছিল। কিশোরও যেন আজ কোন বেদনায় প্রায় সমাহিত হয়ে যেতে চলেছে। উদাস বিষণ্ণতা ফুটেছে তার দৃষ্টিতে, তার মুখে, তার সর্ব অবয়বে।

ডাক্তার গোপীচন্দ্র প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত তখন। তবুও কিশোরকে তাঁরা স্পর্শ করতে পারলেন না। সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। ডাক্তার মৃদুস্বরে শুধু একবার বললেন, যাবে? তা যাও।

গোপীচন্দ্র বললেন, আমি একজন লোক দিই সঙ্গে, কেমন?

শান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললে, না, দরকার হবে না।

সে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে।

তার যেন কান্না পাচ্ছে। কেন, সে তা জানে না।

পথের মধ্যে একটা গাছতলায় ব'সে সে বহুক্ষণ ভাবলে। তবু কোন কিনারা পেলে না সে। শুধু একটা অভিপ্রায় ধীরে ধীরে মনের মধ্যে বীজ ফেটে অঙ্কুরের মত মাথা তুলছে; নবজীবন সমিতির কাজ আর সে করবে না। ভাল লাগছে না।

জগন্নাথের ছেলে ভালই আছে। কিশোরের মন যা বলেছিল সেটা মিথ্যে হয়েছে। জগন্নাথের স্ত্রী তার সামনে ব'সে হাত জোড় ক'রে বললে, আপুনি আমার আর-জন্মে বাপ ছিলেন বাবা।

এতক্ষণে কিশোর হাসলে, বললে, আর ডাক্তারবাবু? জ্যাঠামশায়, না, কে?

জগন্নাথের বউও হাসলে, বললে, দুজনাই বাবা ছিলেন, বাবা।

কিশোর বললে, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না সর্দার-বউ, আরও আরও জন্মের বাবার খোঁজ মিলবে। এবার থেকে তোমাদের জমিদার—আমাদের গোপীচন্দ্রবাবু তোমাদের ভার নিয়েছেন। কাল বরাত আসবে গমস্তার কাছে। মাসে মাসে ওখানকার কাছারির ধানের গোলা থেকে তোমাদের খোরাকির ধান দেবার হুকুম হয়েছে।

চমকে উঠল জগন্নাথের বউ।—জমিদারবাবু খোরাকির ধান দেবেন?

হ্যাঁ।

ক্যানে বাবা? তার চেয়ে—

তার চেয়ে কি?

মাটির উপর নখের আঁচড় কাটতে কাটতে সর্দার-বউ বললে, তার চেয়ে আপনারা যা পারতেন দিতেন, আমরা খেটে খুটে বাকিটা জোগাড় করতাম। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, ওনারা মাশায় বড়নোক। বড়নোকের—

উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সামনের দিকে। ঠিক যেন কূলকিনারা পাচ্ছে না। হাঁটুর উপরে হাত দুখানি ঝুলতে লাগল, যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কিশোর একটু বিস্মিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত হয়ে উঠল, প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে তাতে? বড়লোক, তাতে কি হয়েছে?

আজ্ঞে?—নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে।

বড়লোক তো কি হয়েছে?

বড়নোকের দেনা মাশায়—

দেনা কোথায়? আমরা তোমাদের চাল দিচ্ছিলাম পাঁচজনের কাছে দু সের পাঁচ সের ক'রে চাঁদা নিয়ে। উনি একা সেইটা দেবেন, শোধ দিতে হবে না—ধার-দেনা নয়, বুঝেছ!

বুঝেছি মাশায়।

বুঝেও কিন্তু সর্দার-বউয়ের বিষণ্ণতা কাটল না। তেমনই ভাবেই ব'সে রইল। কিন্তু

কিশোরের বিষণ্ণতা কেটে গেল। সে অকারণে যেমন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তেমনই ভাবেই অকস্মাৎ আনন্দচঞ্চল না হ'লেও প্রসন্ন হয়ে উঠল। অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়াল, যেন দেহের অবসন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিলে; বললে, আজ আমি চললাম সর্দার-বউ।

যাবেন ?

হ্যাঁ। আমি ডাক্তারবাবুকে বলব।

কি বলবেন ?

বলব, বাবুদের ধান নিতে সর্দার-বউয়ের ইচ্ছে নাই।

আজ্ঞে না। তা বলবেন না বাবা।

কেন ? ভয় করছিস ?

তা, ভয় বটে বইকি। জমিদার বড়লোক, রাগ করলে যে বিপদ হবে বাবা। তা ছাড়া—

কি, তা ছাড়া ?

তা ছাড়া, খেয়ে বাঁচতে হবে তো বাবা, নোব, তাই নোব। বাবুর জয়-জয়কার হোক, বাড়বাড়ন্ত হোক। রাজা—মহারাজা হবেন বাবু। নোব, তাই নোব বাবা।

কিশোর এবার একটু হাসলে।

সে ফিরল। দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে সে হাঁটতে শুরু করলে; একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ তাকে যেন টানছে।

* * *

এখানে ইস্কুল-ডাঙায় বিচিত্র আসর বসেছিল তখন।

ডাক্তারকে নিয়ে গোপীচন্দ্র এসে দেখলেন, অমরচন্দ্র এবং পবিত্র নবগঠিত থিয়েটার পার্টির সভ্যদের নিয়ে ব'সে গিয়েছেন। গ্রামের তরুণ ছেলেদের প্রায় সকলেই এসেছে। থিয়েটারের পার্ট দেওয়ার আলোচনা চলছে। গোপীচন্দ্র আসতেই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। গোপীচন্দ্র বললেন, ব'স, ব'স সব, ব'স।

পবিত্র বললে, আমরা সব ওদিকে গিয়ে বসি। থিয়েটারের কথা হচ্ছে, আপনাদের কাজের ব্যাঘাত হবে।

ব'স ব'স। তোমাদের সকলকেই দরকার আমার। আমরাও একটি দল গড়েছি। বুঝেছ ? তোমাদের থিয়েটারের দলের সঙ্গে আমরা যোগ দেব, আমাদের দলের সঙ্গে তোমাদের যোগ দিতে হবে।

দল! গোপীচন্দ্র দল গড়েছেন! অবাক হয়ে গেল সকলে।

বিস্মিত হলেন না শুধু অমরচন্দ্র। তিনি ইস্কুলের ভিত্তি স্থাপনের আয়োজনের পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন এক দিকে ব'সে। ইতিমধ্যেই তিনি নিমন্ত্রণ-পত্রের খসড়া ক'রে ফেলেছেন। নিমন্ত্রণের তালিকা তৈরি করেছেন। এখন তৈরি করছিলেন কর্মসূচী। তিনি চোখ তুলে একবার গোপীচন্দ্রের দিকে চাইলেন, তারপর আবার কাজে মন দিলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, অমর, তুমিও একটু শোন।

লিখতে লিখতেই অমরচন্দ্র বললেন, বলুন, আমি শুনছি।

লেখা রাখতে হবে একটু। আমাদের ডাক্তার একটি সমিতি করেছে—নবজীবন সমিতি। আমি তার একজন সভ্য হয়েছি। আমার ভারি ভাল লেগেছে। অবাক হয়ে গিয়েছি আমি। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ—বঙ্গমেল। এ যদি আমরা ক'রে উঠতে পারি, তবে কত উপকার যে হবে আমাদের, কত উন্নতি যে হবে! বল, ডাক্তার বল।

ডাক্তার মুখর হয়ে উঠল। বলতে শুরু করলে তার কল্পনার কথা।

অমরচন্দ্র কাগজগুলি গুছিয়ে কলম রেখে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন।

দীর্ঘক্ষণ ধ'রে ডাক্তার ব'লে গেলেন তাঁর কথা। তারপর বললেন, নবজীবন সমিতির আজ মহা সৌভাগ্য, আপনাকে পেয়েছি।

অমরচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখে চোখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, গ'ড়ে তুলুন ডাক্তারবাবু। আজই একটা এক্‌জিকিউটিভ কমিটী তৈরি ক'রে ফেলুন। তিনি আবার চেয়ার সরিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। বলুন, প্রেসিডেণ্ট কে হবেন?

ডাক্তার বললেন, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীচন্দ্র—

না ডাক্তার। আমি থাকব একজন সভ্য—সেবক একজন।

ডাক্তার বললেন, সেবক আমরা সকলেই। প্রেসিডেণ্ট আপনাকে হতে হবে। আগে যিনি চলবেন, যাঁর হাতে থাকবে আমাদের দলের ধ্বজা, তিনি ছোটখাটো মানুষটি হ'লে তো চলবে না; সব চেয়ে মাথায় উঁচু যিনি, সব চেয়ে শক্তি যাঁর বেশি, তাঁকেই নিতে হবে সে ভার। তবে তো ধ্বজা উঠবে উঁচুতে, চারি পাশের দূর-দূরান্তর থেকে দেখতে পাবে সে ধ্বজা। দেখবে আর ভাববে, এত উঁচুতে উড়ছে, কাঁপছে না, টলছে না—কিসের ধ্বজা এটি? তারপর তারা এগিয়ে আসবে। কাছে আসবে। লিখুন অমরবাবু, প্রেসিডেণ্ট—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীচন্দ্র দেবশর্মা। উপাধি আমাদের দেবশর্মা। রাঢ় না, বারেন্দ্র না, বৈদিক না, আমরা কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ; ফুলে না, খড়দা না, বিস্তাধরী না, আমাদের এক মেল—বঙ্গমেল, উপাধি এক—দেবশর্মা। বাস্।

অমরচন্দ্র বললেন, বলুন, তারপর বলুন। সহকারী সভাপতি কে, নাম বলুন?

লিখুন—শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেবশর্মা, তারপর লিখুন শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেবশর্মা। লিখে গেলেন অমরচন্দ্র।

নিজের নাম লিখতে এতটুকু আপত্তি করলেন না।

ঠিক এই সময়ে ফিরে এল কিশোর।

এসে নীরবে পিছনে এক জায়গায় বসল। গোপীচন্দ্র তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—সস্নেহ মিষ্ট হাসি।

সমস্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার উঠলেন।

অমরচন্দ্র বললেন, এর জন্যে একদিন একটা সভা ডাকুন। শুধু এ গ্রাম নয়, পঞ্চগ্রামের

ব্রাহ্মণ-সমাজকে ডাকুন।

ডাক্তার বললেন, ডাকব। তার আগে আমাদের নিজেদের শক্ত হয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছেন না? হ্যাঁ, ঠিক, এই কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ বঙ্গমেল—এই ব'লে আমরা যদি দু-একটা বিয়ে দিতে পারি, বুঝেছেন না, ধরুন কর্তাবাবুর বাড়ির কোন ছেলের; কি মেয়ের এই ব'লে যদি বিয়ে হয়, তবে না সেটা নিয়ে সাড়া উঠবে দেশে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, আর যদি সভা করতেই হয়, বুঝেছেন না, তবে আপনার ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িংয়ের সময় সভা ডাকুন; পঞ্চগ্রাম কেন, গোটা জেলার বড় বড় লোক আসবেন।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

কিশোর পিছন থেকে ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

কিশোর! কখন এলে তুমি?

এসেছি কিছুক্ষণ আগে।

কোথায় ছিলে?

এখানেই ছিলাম, পিছনে ব'সে ছিলাম।

ও। আমি দেখতে পাই নি।

হেসে কিশোর বললে, অত্যন্ত মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, খেয়াল করবার অবকাশ ছিল না।

হ্যাঁ। বুঝেছ না কিশোর, ওই আমার একটা ডিফেক্ট। যখন যা নিয়ে পড়ি তখন তাতেই, কি বলে, একেবারে ডুবে যাই। ভাল না ওটা। বুঝেছ না—গল্প আছে না, দাবা খেলছিল দুজনে, একজন লোক এসে খবর দিলে, খেলোয়াড়দের একজনের স্ত্রীকে সাপে কামড়েছে, তাতে খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করলে—কাদের সাপ? এও প্রায় তাই তো। বুঝেছ না, একটু তফাত। আমাদের মেডিকেল ইস্কুলের দারোয়ান বলত—জেরাসে ফরক।

হেসে উঠলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, ওখানকার খবর কি? জগন্নাথনন্দন কেমন আছে?

ভাল আছে।

গুড। সেরে যাবে।

আমি একটা কথা বলছিলাম।

বল।

আমি কাল ভোরেই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।

কাল ভোরে কলকাতা চ'লে যাচ্ছ? হঠাৎ? ছুটি রয়েছে এখনও—

থাক্। আমাকে যেতেই হবে।

কেন? এই তো এসেছ সবে। এরই মধ্যে—

জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কালই যাব। আমার কাছে যে টাকাপয়সা আছে সমিতির, সেগুলো নিয়ে নেবেন চলুন। না হ'লে আপনাকে না ব'লেই আমি চ'লে যেতাম।

কিন্তু সমিতির এই এমন একটা সুসময়, এই তো গড়বার সুবর্ণ সুযোগ, বুঝেছ না, সুবর্ণ

সুযোগ। দেখ না, কি করি দেখ না! ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িংয়ের সময় সভা করব। চোখ দুটিকে ছোট ক'রে যেন দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত ক'রে দিলে ডাক্তার, ডান হাত মুঠি বেঁধে উপরে তুলে গভীরস্বরে বললে, ইট উইল বি এ গ্রেট মুভমেণ্ট।

কিশোর হাসলে। ডাক্তার গ্রাহ্যই করলে না, বললে, এ সময় তুমি না থাকলে কি ক'রে চলবে?

চলবে। আমাকে যেতেই হবে।

* * *

আর একজনের কাছে বিদায় নিতে হবে—কাশীর দিদির কাছে।

কিশোর এসে দাঁড়াল রাধাকান্তের বাড়ির উঠানে।—রাঙাদি! কেউ সাড়া দিলে না। বাড়ির নীচেটা যেন জনশূন্য। একটু বিস্মিত হ'ল কিশোর। এখন রাত্রি সবে আটটা। রাধাকান্ত এখন বৈঠকখানায়। তাঁর মজলিস রাত্রি এগারোটার আগে কোন দিন ভাঙে না। বাড়িতে রাঙাদিদির মজলিস বসে। পাড়ার মেয়েরা আসে তাঁর কাছে গল্প শুনতে অথবা বই-পড়া শুনতে। হঠাৎ কি হ'ল?

আবার সে ডাকলে, রাঙাদি!

একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে ওদিকের অন্ধকার বারান্দার ভিতর থেকে সামনের থামের পাশে দাঁড়াল।

কে মেয়েটি? রাধাকান্তদার বাড়িতে ঝি আছে, সে প্রৌঢ়া; রাঁধুনী আছে একটি মেয়ে, সেও প্রৌঢ়া। এ মেয়েটি যুবতী। এ কে?

মৃদুস্বরে মেয়েটি বললে, মা উপরে আছেন, বাবার মাথা ধরেছে সন্ধ্যে থেকেই, শুয়েছেন—

ও। কিশোর ফিরল। রাধাকান্তবাবুর অসুখ, এখন কাশীর দিদিকে ডাকা ঠিক হবে না, ডাকলে তিনি আসতে পারবেন না।

বাবু!—মেয়েটি ডাকলে।

আমাকে বলছ?—কিশোর চমকে ফিরে দাঁড়াল।

হ্যাঁ।

আমাকে? তুমি কে?

আমি ষোড়শী, বাবু।

ষোড়শী! কিশোরের মনে প'ড়ে গেল। সেই সদ্‌গোপ মেয়েটি, যাকে সে একরকম উদ্ধার ক'রে এনেছে এই গ্রামের জন কয়েক ভদ্রসন্তানের লালসার গ্রাস থেকে, এনে কাশীর দিদির কাছে রেখে গিয়েছে—মনেই ছিল না তার কথা।

বল, কি বলছ? আমি তোমাকে চিনতে পারি নি।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বললে, আমি যে আর এখানে থাকতে পারছি না বাবু।

কেন? কি হ'ল?—বিস্মিত হ'ল কিশোর।

আমার জন্তে এ বাড়ির মাকে বাবুকে যে গালাগাল করছে তারা।

কারা? ভূপতি অমূল্য—এরা?

হ্যাঁ।

রাধাকান্তদাদাকে গালাগাল করছে? অবাক হয়ে গেল কিশোর।

আমি খিড়কির ঘাটে নামি, ওরা খিড়কির পুকুরের ও-পাড়ে তালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি স্নান করতে যাই—। স্তব্ধ হয়ে গেল ষোড়শী।

তাই তো!

আজ সন্ধ্যেবেলা এ বাড়ির বাবার সঙ্গে রাস্তায় ভূপতিবাবুর দেখা হয়েছিল। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল ভূপতিবাবু—

দেখা হওয়া মাত্র ভূপতি পরমভক্তিভরে রাধাকান্তকে প্রণাম করেছিল—কে? মামা? পেনাম! পেনাম!

তার অবস্থা দেখে রাধাকান্ত স্বল্প কথায় উত্তর দিয়ে নিজের বৈঠকখানায় উঠবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমি। বাড়ি যাচ্ছ?

ভূপতিও নিজের বাড়ির দিকে অর্থাৎ স্বর্ণবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে খানিকটা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে গালাগালি শুরু করেছিল, হাঁ, শালা শূয়ারকি বাচ্চা, বাড়ি যাচ্ছি! শালা নচ্ছার, বাড়িতে খানকী পুষে রেখেছ শালা, আমার ধার্ম্মিক যুধিষ্টির শালা।

রাধাকান্ত কানে আঙুল দিয়ে বৈঠকখানায় চ'লে গিয়েছিলেন, শোনবারও অভিপ্রায় ছিল না, অবসরও ছিল না। বৈঠকখানায় দারোগা এসে ব'সে ছিলেন তাঁর অপেক্ষায়। নিত্য সকাল দুপুর সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্বর্গত পিতার পাদুকা তাঁর নিত্যব্যবহার্য শেষ চটিজোড়াটিকে প্রণাম করেন। দুপুরে চন্দন এবং ফুল দিয়ে পূজা করেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি প্রণাম ক'রে উঠেই দেখলেন, চাকর বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছে। সে খবর দিলে যে, দারোগা এসেছেন, জরুরী কাজ আছে। তিনি বাড়ি থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আসছিলেন, পথে ঘটনাটা ঘ'টে গেল। ভূপতির চীৎকার শুনে দারোগা এবং আরও কজন ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাধাকান্তের সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম ক'রে উঠেছিল প্রথমটা, পর-মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ ক'রে কানে আঙুল দিয়ে তিনি বললেন, চলুন, ভিতরে চলুন।

ষোড়শী বললে, দারোগাবাবু চলে যাবার পরই বাবু এসে বাড়ি ঢুকলেন। বললেন—কাশীর বউ, উপরে একটা প্রদীপ জ্বেলে দাও তো, আমি শোব। বড় মাথা ধরেছে। আর ঠাণ্ডা জল এক ঘটি দাও, মাথাটা ধুয়ে ফেলব। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। সেই এসে শুয়েছেন। আমার জন্তে যখন এই লাঞ্ছনা এঁদের, তখন আমি এখানে কি ক'রে থাকব বাবু?

কিশোর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা যা ব্যবস্থা হয় করছি আমি।

কি ব্যবস্থা করবেন।

বিরক্ত হ'ল কিশোর।—জানতে পারবে। আজ রাত্রেই এসে ব'লে যাব আমি।

বেরিয়ে গেল কিশোর। আবার ফিরে গেল সে ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। ছিলেন থানায়। ডাক্তারের বাড়ির সামনেই থানা, থানায় ব'সে তিনি দারোগাবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। নবজীবন সমিতির কথা বলছিলেন দারোগাকে। ডাক্তার আজ যেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে নবজীবন সমিতির কথা না বললে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। এতদিন সঙ্গোপনে এ কাজ করার মধ্যে তাঁর মনে যেন ক্ষোভ ছিল, অতৃপ্তি ছিল; সেই ক্ষোভ সেই অতৃপ্তি আজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খি-খি-খি-খি শব্দে ভেসে চলেছিল। যেন অবরুদ্ধ একটা জনস্রোত অকস্মাৎ পথ মুক্ত পেয়ে বেরিয়েই চলেছে। কিশোর ডাক্তারের বারান্দায় ব'সেই রইল অপেক্ষা ক'রে।

অত্যন্ত অকস্মাৎ যেন ডাক্তারের হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন। রাস্তার এ পারে ডাক্তারের বারান্দায় ব'সে কিশোর সেটা যেন অনুভব করলে। ডাক্তার ঝুঁকে পড়েছেন টেবিলের উপর। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার উঠলেন ক্লান্ত মানুষের মত। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে তিনি ফিরলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন তিনি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন মাথা নীচু ক'রে।

কিশোর ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

ধীরে ধীরে মাথা তুললেন ডাক্তার, অন্ধকারের মধ্যে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? কোথায় বাড়ি?

আমি আবার ফিরে এলাম ডাক্তারবাবু। আমি কিশোর।

কিশোর! ভালই হয়েছে। খবর শুনেছ?

কি?

বলছি। রাধাকান্তবাবুর বৈঠকখানার সামনে দিয়েই তো এলে? আলো জ্বলছে? আছেন তিনি বৈঠকখানায়?

না। তিনি আজ সন্ধ্যেবেলাই শুয়ে পড়েছেন। মাথা ধরেছে তাঁর।

হুঁ।

আমি তাঁর বাড়ি থেকেই আসছি।

কিশোর ব'লে গেল সব কথা। বললে, মেয়েটি ওখানে থাকতে চাচ্ছে না। বলছে, আমার জন্যে এ অপমান ওঁরা সহ্য করবেন, আর আমি থাকব কি ক'রে?

কিন্তু যাবে কোথায়?

আপনি বরং গোপীকান্তবাবুকে ব'লে ওঁর বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। উনি যখন নবজীবন সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তখন এটা কর্তব্যও বটে ওঁর, আর সে কর্তব্য উনি খুশি হয়েই করবেন। তা ছাড়া ওঁর বাড়িতে কাজেরও অভাব নেই—একটা কেন, দশজন অনাথকে ঠাঁই দিতে পারেন উনি।

হুঁ। কিন্তু—

কিন্তু কি?

আগে রাধাকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

কেন? তাঁকে আর এ নিয়ে বিরক্ত করা কেন?

প্রয়োজন আছে। রাধাকান্তবাবুর মাথা ধরেছে বললে না! সেটা ভূপতির গালাগালির জন্যে রাগেই শুধু নয়। আরও আছে। আজকের মত অপমান বোধ হয় রাধাকান্তবাবুর জীবনে কোনদিন হয় নি। সেই জন্যেই তাঁর খবর তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এক কড়া হুকুম পাঠিয়েছেন রাধাকান্তকে, গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। দারোগা সন্ধ্যেবেলা সেই হুকুমই জারি ক'রে এসেছেন রাধাকান্তবাবুর উপর।

ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে!

হ্যাঁ, হাত জোড় ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। দারোগা দেখালেন সে চিঠি আমাকে। সত্যি সত্যি লেখা আছে—উইথ ফোল্‌ডেড হ্যাণ্ডস!

কেন? কি অপরাধ হ'ল তাঁর? আর এ রকম হুকুম ম্যাজিস্ট্রেট দেবেনই বা কোন্ আইনে?

ম্যাজিস্ট্রেটের কথাই আইন, রাজপ্রতিনিধি তিনি। মহিষাসুর যদি সেকালের দৈত্যপতি না হয়ে একালের ম্যাজিস্ট্রেট হ'ত কিশোর, তবে দুর্গাপ্রতিমার চেহারাই অন্য রকম হ'ত। দেখতে মা-দুর্গা দশ হাত জোড় ক'রে আছেন, আর তাতে পাঁচ জোড়া হাতকড়ি পরানো রয়েছে।—তিক্ত হাসি হাসলেন ডাক্তার।

কিন্তু অপরাধটা কি?

অপরাধ, তিনি নিজের বাগানের গোলাপ গাছটা কেটে ফেলেছেন। গাছটার ফুল তিনি নিজেও তুলতেন না, কাউকে তুলতেও দিতেন না। পুজোর জন্যও না। সেই ফুল গোপীবাবু ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য—

কিশোর বললে, জানি। ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের জন্য। কাটা গোলাপের ডাল নিয়ে রাধাকান্তদার ছেলে গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গৌরীর হাত ছ'ড়ে গিয়েছে গোলাপের কাঁটায়। রাধাকান্তদার মজলিসে কীর্তিবাবু ছিলেন তখন। গৌরীই কথাটা ব'লে ফেলেছিল।

ডাক্তার বললেন, সেই ঘটনা কোনক্রমে সাহেবের কানে পৌঁছেছে। তিনি ধ'রে নিয়েছেন গোপীকান্তবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্যটাই এর মূল কারণ। তাঁর ধারণা, তিনি যদি রাধাকান্তবাবুর ওখানে যেতেন, তবে রাধাকান্ত নিজেই ফুল তুলে তাঁকে দিতেন এবং গাছ কাটার কল্পনাও তাঁর মনে উঠত না। সুতরাং—

চুপ ক'রে গেলেন ডাক্তার।

কিশোরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আপনি রাধকান্তদাকে বলুন তিনি যেন ক্ষমা না চান।

ডাক্তার বললেন, আগে একটা মিটমাটের চেষ্টা করব আমি।

মিটমাট! মিটমাট হবে?

হবে বইকি। চল, তোমাদের পাড়ায় যাব আমি। গোপীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

গোপীচন্দ্রবাবুর দরজায় এসে কিশোর বললে, ওই মেয়েটির জন্যেও বলবেন। ভুলে যাবেন না।

ভুলব না, বলব।

কিশোর চ'লে এল।

আর তার মনে কোন দ্বিধা নাই। নবজীবন সমিতির সঙ্গে সম্বন্ধ তার চুকে গেল। একটু হাসলে সে। ধনী গোপীচন্দ্র গভর্মেণ্টের কাঠামোর স্তম্ভে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আঘাত করলে, তাঁকে অপমান করলে গভর্মেণ্ট বিচলিত হয়ে উঠছে। ডাক্তারবাবু নবজীবন সমিতিকে ওই স্তম্ভের পাদমূলে শুইয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু—

সে এসে আবার উঠল রাধাকান্তের বাড়ি।

কাশীর বউ নীচে নেমে এসেছেন। দুধ গরম করছেন।

রাঙাদি!

কিশোর? তুমি আর একবার এসেছিলে?

এসেছিলাম।

কিছু বলছিলে?

বলছিলাম।

বল।

আমি শেষরাত্রেই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।

এখন হঠাৎ?

অনেক কথা। আপনার আজ সময় হবে না আমি জানি। দাদার মাথা ধরেছে।

হ্যাঁ।—ক্ষোভে ধারালো হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। উনানের আগুনের লাল আভা পড়েছে তাঁর গৌরবর্ণ মুখে, চোখে তার প্রতিচ্ছটা জ্বলছে। হ্যাঁ, তাঁর মাথা ধরেছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললে, আমি সব শুনেছি রাঙাদি।

হ্যাঁ, ষোড়শী বলছিল আমাকে, সে এখানে থাকতে চাচ্ছে না।

শুধু ভূপতির কথাই নয় রাঙাদি, দারোগা এসেছিলেন তিনি যা ব'লে গেছেন সে কথাও আমি শুনেছি।

কাশীর বউ মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, কে বললে তোমাকে?

ডাক্তারবাবু। দারোগা তাঁকে বলেছেন।

কাশীর বউ কোন কথা বললেন না।

আপনি দাদাকে বারণ করুন রাঙাদি, তিনি যেন কিছুতেই ক্ষমা না চান।

কাশীর বউ আবার মুখ তুলে কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই

সে হাসি মিলিয়ে গেল। বিচিত্র রূপান্তর ঘ'টে গেল, তাঁর চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল,—মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি পেশী কাঠিন্যে কঠোর হ'য়ে উঠল। বললেন, বলেছিলাম। কিন্তু—। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, তাঁর সে সাহস নাই, শক্তি নাই। তবে—

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, এটা দেনা হয়ে থাকল আমাদের। ওঁর যা দেনা, সে আমারও দেনা। এ দেনা আমার গৌরীকান্ত শোধ করবে।

কাশীর বউ উঠে চ'লে গেলেন।

এগারো

রাধাকান্ত ক্ষমা প্রার্থনাই করলেন। একটু অভিনব ধরনে ক্ষমা চাইলেন তিনি। একেবারে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার অন্যায় হয়েছে, গোলাপের গাছটা কেটে আপনাকেই অসম্মান করেছি আমি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

গোপীচন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। গোপীচন্দ্রের মজলিসে আরও অনেক লোক ছিল, সকলেই মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। দারোগা সকালেই এসেছিলেন রাধাকান্তের কাছে,—সাহেবের কাছে রাধাকান্তের উত্তর জানাতে হবে। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই রাধাকান্ত গোপীচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে বললেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

গোপীচন্দ্র প্রথমটায় চমকে উঠলেন।

গত রাত্রে ডাক্তার এসে তাঁকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। তিনি সত্যই কিছু জানতেন না। কিন্তু অনুমান ক'রে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল না। এ কাজ কীর্তি করেছে। বার বার তিনি নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কীর্তি শোনে নাই। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তাঁর মত সক্ষম কীর্তিমানের এক্ষেত্রে ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গোপীচন্দ্র জীবনে ক্রোধকে সংবরণ করতে শিখেছেন এবং কীর্তিকে তিনি ভয় করেন। ভয় না ক'রে উপায় নাই। তাঁর শক্তি আছে, কীর্তি তাঁর শক্তির তুলনায় সামান্য জীব; কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি দুর্বল। তার উপর কীর্তিই আজ তাঁর বিরাট ব্যবসায় পরিচালনায় ডান হাত, সুতরাং শক্তি থাকতেও তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে হয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তারকে বললেন, বিশ্বাস কর ডাক্তার, এর কিছুই আমি জানি না। সাহেবকে আমি এ কথা জানাই নি।

কীর্তিচন্দ্র নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করলে, গোপীচন্দ্রের পাশের ঘরেই সে থাকে, সে সব শুনতে পেয়েছে; কীর্তিচন্দ্র ঘরে ঢুকে বললে, আমি জানিয়েছি।

গোপীচন্দ্র তার মুখের দিকে চাইলেন। কীর্তিচন্দ্র বললেন, এতে নিশ্চয়ই আমাদের অপমান হয়েছে। গাছটা কেটে তিনি মহাধার্মিক সাজবার চেষ্টা করেছেন, বিধর্মী রাজার বিধর্মী কর্মচারীকে ফুল দিতে বাধ্য হয়েছেন; লোকে ভাবছে, ওঃ, রাধাকান্ত কি ধার্মিক, দেখ কি মনের তেজ! ম্যাজিস্ট্রেট হোক আর যাই হোক, তাকে সে পূজা করবে না। আর

আপনার নাম ক'রে বলবে—অমুক বাবুর যতই টাকা থাক, যতই বড়লোক হোন, যতই দেব-প্রতিষ্ঠা করুন, সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে পুজো করেছেন। বিধর্মীকে যে পুজো করে, সে আবার ধার্মিক হয়? ঠিক করেছি আমি। এই কথাই আমি সাহেবকে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম—আপনার জন্মেই আমাকে আজ গ্রামের সমাজের কাছে এইভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। আপনাকে এ অপমান স্পর্শ করবে না, কিন্তু আমার অবস্থা আপনাকে ভেবে দেখতে প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং প্রতিকার করবার জন্ম হুজুরের কাজে আরজি পেশ করছি।

গোপীচন্দ্র শুধু বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে নিষেধ করেছিলাম।

কীর্তিচন্দ্র অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ব'লে উঠল, এ আপনার অন্যায় নিষেধ, মানতে গেলে কোন কালে এ গ্রামে আপনি সম্মান পাবেন না। চুনোপুঁটিতে বড় মাছের গায়ে ঠুকরে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তাকে মেরে ফেলে শেষ পর্যন্ত, বড় মাছকে সেই জন্মে চুনোপুঁটি ধ'রে খেতে হয়।

তুমি এখন যাও কীর্তি। যাই বল তুমি, কাজটা ভাল কর নি।

আমি ঠিক করেছি। এই ক'রেই এরা সব মাথায় চ'ড়ে বসেছে। আমি এদের প্রত্যেককে সায়েস্তা করব। কাউকে আমি ছেড়ে কথা কইব না।

তুমি এখন যাও কীর্তি। আমার কথা শুনতে পেয়েছ?

যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কোন রকম আপস ক'রে ভদ্রতা দেখাতে যাবেন না। তা হ'লে আমি ঘর থেকে চ'লে যাব।

কীর্তি বেরিয়ে চ'লে গেল।

ডাক্তার এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন কীর্তিচন্দ্রের কথা। তিনি শুধু স্তম্ভিত হয়েই যান নি, কীর্তিচন্দ্রের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তিনি ভয়ে যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষপতি ধনীর পুত্র কীর্তিচন্দ্রের ও আস্ফালন শূন্যগর্ভ পাত্রের ধ্বনি নয়।

গোপীচন্দ্র বললেন, তুমি রাধাকান্তমামাকে ব'লো ডাক্তার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলব?

গোপীচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন, ব'লো—আমার লজ্জার সীমা নাই, কীর্তি আমাকে না জানিয়েই কাজটা ক'রে ফেলেছে, ছেলেমানুষ, ওদের এখন রক্ত গরম; ক'রে ফেলেছে অভিমানের বশে। ক'রে এখন তারও লজ্জার সীমা নাই।

কিন্তু সে কথা তিনি বললেন না, বলতে পারলেন না। তিনি চ'লে যাবেন। বয়স অনেক হয়েছে। সামনের বড় আয়নাতে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব ভাসছে; সুগৌর ললাট দিনে দিনে শুভ্র থেকে শুভ্রতর হয়ে উঠছে, মাথার সাদা চুলগুলি মৃদু বাতাসে উড়ছে।

তাঁর অবর্তমানে কীর্তি থাকবে। আজ সকলের বিদ্বেষ, সকলের ক্রোধ তিনি বহন ক'রে নিয়ে যাবেন। কীর্তির শত্রু তিনি কি বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেন? তাই কথাটা মুখে এনেও উচ্চারণ করতে পারলেন না। থেমে গেলেন? ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ব'লো—যা হয়ে গেছে তার জন্মে তিনি যেন কিছু মনে না করেন। সে সময়ে বড় দুঃখ বড় অভিমান হয়েছিল। ব্যাপারটা সাহেবকে জানানো হয়ে গেছে। এখন নিজেই

লজ্জা পাচ্ছি। সাহেব দারোগাকে হুকুম করেছেন—নিজে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখে তাঁকে জানাতে, নইলে এইখানেই শেষ ক'রে দেওয়া যেত ব্যাপারটা। তা একবার আমার এখানে এলেই হবে, পায়ের ধুলো দেবেন, তাতেই হবে।

ডাক্তার রাধাকান্তের কাছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এ প্রশ্ন তিনি তুলতেই পারেন নি। রাধাকান্ত শুব্ধ হয়ে শুয়েই ছিলেন। কথাও খুব কমই বলেছিলেন। ডাক্তার আসতেই বলেছিলেন, এস ভাই। শরীর খুব খারাপ।

কি হয়েছে ?

হয় নি কিছুই। শরীর খারাপ কথাটা হয়তো ভুল বলেছি। আত্মা অসুস্থ।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে ভাবলেন কিছুক্ষণ। কি ব'লে কথাটা তুলবেন ? কিন্তু কোন সূত্রই যেন হাতড়ে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর শুধু বললেন, হাতটা একবার দেখি!

দরকার নেই। দেহে কোনও রোগ নেই।

ডাক্তার এবার বললেন, নবজীবন সমিতি নিয়ে আজ—

বাধা দিয়ে রাধকান্ত বললেন, আজ থাক্ ভাই।

তবুও ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। আবার বললেন, মানে—মানে—আজ গোপীচন্দ্রবাবু—

ভাল লাগছে না ভাই ডাক্তার।

আচ্ছা, তা হ'লে আজ উঠি।

এস। রাধাকান্ত পাশ ফিরে শুলেন।

কিছুক্ষণ পর কাশীর বউ এসে বসলেন পাশে, বললেন, আমার একটা কথা। তুমি যদি ক্ষমাই চাও, যদি 'না' বলবার সাহস তোমার না-ই থাকে—

না, নাই সে সাহস আমার। আত্মহত্যাও হয়তো করতে পারব, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম!—তিনি হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লেন। সে সাহস তাঁর নাই। সন্ধ্যা থেকে তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। মনে কোনমতেই সাহস পান নি। ইংরেজ রাজশক্তিকে তাঁর দুরন্ত ভয়। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর মামার বাড়ি। সাঁওতাল-হাঙ্গামার ঢেউ সে গ্রাম পর্যন্ত এসেছিল। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে সেই গ্রামে। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহ দমনের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে সেই গল্প শুনেছেন তিনি। ঘনজঙ্গল-ভরা ক্ষুদ্র গ্রাম—রেড়ির তেলের প্রদীপের স্বল্প আলোতে তাঁর মাতামহী সেই গল্প বলতেন। মুখে সিঁদুর মেখে রক্তমাখা টাঙি হাতে সাঁওতালেরা মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে নরহত্যা করেছিল, গ্রাম জ্বালিয়েছিল; কিন্তু তাদের দমন করবার জন্য ইংরেজদের ফৌজ যে অত্যাচার করেছিল, সে অত্যাচার গ্রামের নিরীহ নরনারী কল্পনাও করতে পারে না।

দিদিমা বলতেন, ভাই, গুলি খেয়ে সাঁওতালেরা মরল, ভেসে গেল ময়ূরাক্ষীর বানে।

তারপর গড়ের বাজনা বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে এল গোরা পল্টন। লাল লাল মুখ, কটা কটা চোখ, এই পোশাক পেন্টুলন কোট জুতো—একসঙ্গে খট খট ক'রে পা ফেলে ময়ূরাক্ষী পেরিয়ে গাঁয়ে এসে ঢুকল। ঘোড়ার উপর চ'ড়ে তাদের কাপ্তেন। সাঁওতালদের মত কালো যাকে দেখলে, দুম ক'রে গুলি ক'রে দিলে। ঘোষালদের কর্তা কালো ছিলেন, চান ক'রে ঠাকুরদের নাম করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন, গলায় পৈতে ধবধব করছে, তাঁকে মেরে দিলে ভাই, বুকে গুলি বিঁধল, পিঠের দিকে—গোটা পিঠ ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গোটা বাগদীপাড়া তো একেবারে মেরে নি-মানুষ ক'রে দিলে। তারপর হুকুম দিলে, লিয়ে আও গাঁয়ের মাতব্বর লোককো। ঘাড়ে ধ'রে ঘর থেকে বার করলে, তারপর বন্দুকের ডগায় লাগাল খোঁচা, উঁচিয়ে হাঁকিয়ে উঠল—চল্ শালালোক। ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সব গেল। কাপ্তেন বললে, সাঁওতাললোক কাঁহা থাকে, দেখলাও। জোড় হাত ক'রে সব বললে, হুজুর, জঙ্গলে থাকে, কোথা পালাল। ভাই, কথা শেষ করতে দিলে না, বললে, লাগাও কোড়া। ভাই, গাছে বেঁধে উলঙ্গ ক'রে দিলে। হরিহরপুরের গোসাঁই-বাড়ির গোসাঁই ছিলেন এ অঞ্চলের ঠাকুর-দেবতার মত মানুষ। সাঁওতালেরা তাঁকে ভক্তি করত। সেই অপরাধে গোসাঁইকে গুলি করলে। গোসাঁইয়ের একটি বিধবা কন্যে, তাকে ভাই—

দিদিমা বলতে পারতেন না, ঝরঝর ক'রে কাঁদতেন, আঁচলে চোখ মুছতেন।—আমার বাড়ি হরিহরপুর, সে আমার সই ছিল। অত্যাচারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকল রক্তচন্দন-মাখা পদ্মফুলের মত। কারও সাহস হ'ল না—মুখে জল দেয়, ঘরে তুলে এনে সেবা করে। পরের দিন সকালে লোকে দেখলে, সই আমার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এত বড় গোসাঁই-ঘরের কন্যে এই অপমানের পরে, এই পাপের বোঝা ঘাড়ে চাপানোর পড়ে সে বাঁচবে কি ক'রে?

সাঁওতালদের মেয়ের কাপড় কেড়ে নিয়ে ন্যাংটা ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল সব। তারপর—

শিউরে উঠতেন দিদিমা, রেড়ির তেলের প্রদীপের শিখার মৃদু এবং স্বল্পায়তন আলোর মণ্ডলটির বাইরে অন্ধকারের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন, প্রদীপের আলো পড়ত সেই বিস্ফারিত চোখে। রাধাকান্ত দেখেছেন সে ভয়ার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি। বুকের মধ্যে সে দৃষ্টি যেন পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম কালের শিল্পীর হাতের খোদাই করা ভয়াল এক মূর্তির মত খোদিত হয়ে গিয়েছে। তারপর রাধাকান্ত বয়সের সঙ্গে বহু বিচিত্র পরিবর্তিত আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে চ'লে এসেছেন, কিন্তু ওই ভয়াল মূর্তি অনাবিষ্কৃত পর্বতগুলার মধ্যে তেমনই অক্ষয় হয়ে রয়েছে। রাজসরকারের সঙ্গে বিরোধিতার কল্পনা মনে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভয়াল মূর্তি যেন সেই অনাবিষ্কৃত গুহা থেকে মুখ বাড়ায়; মুহূর্তে রাধাকান্ত পঙ্গু হয়ে যান। শুধু রাধাকান্তই নন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিটি মানুষেরই ছিল এমনই ভয়। রাধাকান্ত শত চেষ্টা ক'রেও ম্যাজিস্ট্রেটের এই হুকুমকে অমান্য করবার সাহস পান নি। একবার ভেবেছিলেন, গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা না-চেয়ে চ'লে যাবেন সদর শহরে, একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে বলবেন, অপরাধ হয়ে থাকলে আমায় অন্য যে দণ্ড দেবেন

দিন, শুধু এই দণ্ড থেকে অব্যাহতি চাই আমি হুজুরের কাছে। কিন্তু পরে সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করেছেন, নাঃ, ভাগ্যফল অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হোক। এ তো শুধু আমার অদৃষ্টফল নয়, এ আমার এই জীবনের কর্মফল।

কাশীর বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বামীর হতাশা দেখে।

রাধাকান্ত বললেন, তুমি হয়তো আমাকে মনে মনে ঘেন্না করবে।

এ কি বলছ তুমি?

তুমি শহরের মেয়ে, তোমার মনের সাহস, তোমার তেজ তো আমার অজানা নয়। তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছ, তোমার তেজ, তোমার সাহস আমার মনে সঞ্চার করতে। কিন্তু—

তুমি দুঃখ ক'রো না। তুমি তো নিজেই বল—ভাগ্যবশে মহারাজ নলকে দাসত্ব করতে হয়েছিল, অত বড় রাজা—হয়েছিলেন অশ্বপরিচারক।

ঘোড়ার সহিস কথাটা মুখে তাঁর বেধে গেল।

ও সব কথা থাক্ কাশীর বউ। শাস্ত্র পুরাণ এ সব তো অনেকই পড়লাম, জানিও তো সবই। কিন্তু মনে বল পেলাম কই? এ দেহ বস্ত্রের মত, এ সংসার মায়া। নির্যাতন বল, বিপদ বল, এ সব জীবনের পরীক্ষা, এ জেনেও যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। তুমি কি বলছিলে, বল?

কাশীর বউ স্থির দৃষ্টিতে জানলার দিকে চেয়ে বললেন, ক্ষমাই চেয়ে এস তুমি। কিন্তু ক্ষমা চাইতে হ'লে যেমন ভাবে চাইতে হয়, তেমনি ভাবে চেয়ে এস, এতটুকু বাকি রেখো না। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে, মাথা নীচু ক'রে, গোপীচন্দ্রবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—আমার অন্যায় হয়েছে, আমার গোলাপ গাছটা কেটেছি, আপনার তাতে অসম্মান হয়েছে; আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাধাকান্ত উঠে বসলেন। বললেন, তাই বলব।

তারপর আবার বললেন, ভাল বলেছ। ভাগ্যকে যখন যুঝতেই পারব না, তখন এমনি ক'রেই তার লাঞ্ছনা একান্ত অনুগতের মত মাথায় তুলে নেওয়াই ভাল।

কীর্তিচন্দ্র ব্যাপারটার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। কতকগুলি বাক্য বেছে রেখেছিলেন, শানিয়ে রেখেছিলেন। হস্তপদবদ্ধ শত্রুকেও আঘাত করতে তাঁর বাধে না। কিন্তু রাধাকান্ত তাঁকে সে অবসর দিলেন না। এক রাত্রের নিদারুণ মানসিক যুদ্ধের ছাপ তাঁর সর্ব অবয়বে সুপরিস্ফুট। কীর্তিচন্দ্রও বিস্মিত হলেন তাঁর মুখ দেখে। রক্তাক্ত বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্র দেখে বিজয়ীর উল্লাস যেমন গাম্ভীর্যে পরিণত হয়, তেমনই ভাবেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন আপনা-আপনি। শুধু বললেন, আসুন।

দারোগা প্রশ্ন করলেন, বাবা আছেন?

হ্যাঁ। রয়েছেন ভিতরে।

আপনি একবার গিয়ে বলুন—আমার একটু নিরিবিলি কাজ আছে। সাহেবের একটা

চিঠি দেখাব। সেখানে তিনি, রাধাকান্তবাবু আর আমি থাকব শুধু।

না।—রাধাকান্তবাবু সংযত স্থির কণ্ঠে বললেন, না। তার প্রয়োজন নেই দারোগাবাবু। সাহেব চিঠিতে সে কথা লেখেন নাই। বরং 'প্রকাশ্যভাবে' কথাটাই তিনি লিখেছেন। আসুন, কোনও দ্বিধা করবেন না। তিনিই এগিয়ে গেলেন। সর্বাগ্রে ঘরে ঢুকে তক্তা-পোশের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি গোপীকান্তবাবু। আসুন দারোগাবাবু।

দারোগা মাথা হেঁট ক'রে ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের এক পাশে ব'সে পত্রখানা গোপীচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। গোপীচন্দ্র চিঠিখানা নিলেন, কিন্তু পড়লেন না। রাধাকান্তকে বললেন, আপনি বসুন। কথাটা ব'লে নিজেই একটু স'রে বসলেন, পাশেই স্থাননির্দেশ করলেন।

রাধাকান্ত বসলেন না, বললেন, সাহেব লিখেছেন, আমার বাড়ির গোলাপ গাছ কাটার ব্যাপারে আপনি দুঃখিত হয়েছেন, নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন; তিনি প্রকাশ্যভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার হুকুম করেছেন দারোগাবাবুর মারফৎ। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

দুই হাত জোড় করলেন রাধাকান্ত।

গোপীচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি রাধাকান্তের হাত ধ'রে বসাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাধাকান্তের হাত জোড় করা দেখে ব'সে পড়লেন তিনি।

হাত জোড় ক'রে রাধাকান্ত বললেন, উত্তাপ ছিল না, রুক্ষতা ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বরে, ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি অন্যায় করেছি। গোলাপ গাছটা কেটে আপনারই অসম্মান করেছি আমি, আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমাভিক্ষা করছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সমস্ত মজলিসটা অবশ স্তব্ধ হয়ে গেল।

মুখরপ্রকৃতি বংশলোচনের মুখেও কথা যোগাল না। ক্রুদ্ধ কীর্তিচন্দ্রও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাধাকান্তের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ উত্তাপ কিছু থাকলে বড় ভাল হ'ত, এই আক্ষেপটাই মনের মধ্যে নদীর বাঁধ-বাঁধা জলের আবর্তের মত পাক খেয়ে সারা হয়ে গেল।

রাধাকান্ত বললেন, দারোগাবাবু, এইবার আমি যেতে পারি?

হ্যাঁ, আমি লিখে দেব সাহেবকে।

কোন ত্রুটি যদি থাকে তো বলুন।

না।

রাধাকান্ত ঘর থেকে চ'লে গেলেন।

* * *

ফিরে তিনি বৈঠকখানায় এলেন না।

তাঁর বৈঠকখানাতেই গ্রামের সবচেয়ে বড় মজলিস বসে। সকালে সন্ধ্যায় বিশ-পঁচিশজন

ভদ্রলোক ব'সে থাকেন। গল্পগুজব হয়, নানা আলোচনা হয়, স্বর্ণবাবু পর্যন্ত এ মজলিসের নিয়মিত সভ্য। গোপীচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে আসেন। কীর্তিচন্দ্রকেও আসতে হয়। বংশলোচনও আসেন।

এই কারণেই রাধাকান্ত বৈঠকখানায় গেলেন না। বাড়ির ভিতর গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘরটার এক পাশে একখানা পুরানো আমলের খাট, একটি আলমারি, খাটের পাশে একটি ছোট টেবিল, দেওয়ালে গোটা কয়েক ব্র্যাকেট এবং একটি কাচের দেওয়াল-আলমারি। এক দিকে ছোট চৌকির উপর পাঁচ-সাতটি বাক্স, বাক্সগুলির পাশে ঘরের কোণে একটি একনলা বন্দুক এবং একখানি তলোয়ার ও একটি ঢাল; অন্য দিকে মেঝের উপর একখানি গালিচার আসন বিছানো, আসনের সামনে দেওয়াল ঘেঁষে তাঁর পূজার্চনার সরঞ্জাম এবং ছোট একটি জলচৌকির উপর তাঁর পিতার পাদুকা—রাধাকান্তের অর্চনায় চন্দনলিপ্ত এক জোড়া চটিজুতা। রাধাকান্ত ঘরে এসে খাটের উপর ব'সে পড়লেন। সবলদেহ বিশালকায় পুরুষ রাধাকান্ত। সুপুরুষ নন তিনি, রঙ তাঁর কালো, কিন্তু সর্ব অবয়বে আছে একটি সম্ভ্রান্ত পরিচয় এবং পৌরুষের ছাপ। মুখখানা তাঁর থমথমে হয়ে উঠেছে।

ঝড়ে-ওড়া লাল-ধুলো-মাখা কালো মেঘের মত বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত তাঁর অবস্থা। হাতের উপর কপাল রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি। বুকের ভিতর তাঁর ঝড় উঠেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গোপীচন্দ্রের ওখানে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অসাধারণ সংযমে নিজেকে স্থির দৃঢ় ক'রে রেখেছিলেন; কিন্তু বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠেছে। এখনও পর্যন্ত বার বার তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছেন—তিনি যে যুক্তিতেই এ কাজ ক'রে থাকুন, যে অধিকারেই তিনি তাঁর গাছটা কেটে থাকুন, তাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং গোপীচন্দ্রের অসম্মান হয়েছে; স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আঘাত পেয়েছেন। অপরাধ তাঁর। মমতায় এবং মোহের বশে তিনি দেব-পূজার জন্য ফুল তুলতে দিতেন না। এ সেই মোহের শাস্তি। গোপীচন্দ্র তাঁর এ মোহের কথা না-জেনেই ফুল চেয়েছিলেন। তখন তিনি এই দুর্বলতার কথা জানালেই পারতেন। কেন তিনি জানাতে ভয় করলেন? এ তাঁর কাপুরুষতার শাস্তি। তিনি ভয় করেছিলেন, ফুল না-দিলে ঠিক এমনই ঘটনা ঘটবে। সাহেবের ভয় তাঁকে কণ্ঠরোধ করেছিল।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। আর আত্মসম্বরণ অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি দুই হাত জোড় ক'রে উপরের দিকে তুলে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, হে বিশ্বনাথ—হে ভগবান!

তারপর খাট থেকে নেমে তাঁর বাপের পাদুকার উপর মাথা রেখে ব'সে পড়লেন। ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকল। বুঝলেন, কাশীর বউ। কিন্তু মাথা তুললেন না তিনি। এক মুহূর্ত পরেই তিনি মাথার উপর স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেলেন। তবুও তিনি মাথা তুললেন না। এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও তাঁর হাসি পেল, বিক্ষুব্ধ অন্তরের তিক্ত হাসি। তুমি মূর্খ কাশীর বউ, এ জ্বালা বাতাসের স্পর্শে স্নিগ্ধ হয় না, এ আগুন জল দিলে নেবে না।

হঠাৎ ঝনাৎ শব্দে কি যেন একটা ভারী জিনিস প'ড়ে গেল।

রাধাকান্ত বিরক্ত হয়ে মাথা তুললেন। দেখলেন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাশীর বউ

বন্দুকটা এবং তলোয়ারখানা সরাচ্ছে। তলোয়ারখানাই প'ড়ে গিয়েছে। হাসলেন তিনি। বললেন, ভয় নেই কাশীর বউ, মরব না। মরতে আমি চাই না। আমি বাঁচব দেখবার প্রত্যাশায়—

বাধা দিয়ে কাশীর বউ বললেন, ছি, অভিসম্পাত কাউকে ক'রো না।

রাধাকান্ত একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার অপমান করলে কাশীর বউ। আমি এত নীচ, আমি এত অক্ষম! ছি—ছি—ছি! আমি—

হঠাৎ তিনি চুপ করলেন। হঠাৎ নয়, পিঠের উপর পাখার মৃদু আঘাত অনুভব করছেন। বিস্মিত হয়ে কথা বন্ধ ক'রে পিছনে তাকালেন তিনি। কাশীর বউ ওখানে, তবে বাতাস করে কে? উত্তেজনায় বাতাসের স্পর্শ সত্ত্বেও কথাটা মনে হয় নি। গৌরীকান্ত পাখা দিয়ে বাতাস করছিল, অসাবধানতায় অথবা চাঞ্চল্যবশত পাখা তাঁর পিঠে লেগেছে। গৌরী অপ্রস্তুত হয়েছে, সে পাখাখানা মাটিতে ঠেকাচ্ছে। পাখা গায়ে লাগলে মাটিতে ঠেকাতে হয়। রাধাকান্তের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল; অগ্ন্যুত্তপ্ত মানুষ যেমন অধীর আগ্রহে ছোট একটি আধারের জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তেমনই ব্যাকুল আগ্রহে তিনি তাকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যেন একেই আশ্রয় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। গভীর স্বরে বললেন, আমি বাঁচব কাশীর বউ, গৌরীকে মানুষ করবার জন্যে। জীবনে আমি হোম করব, ওই আমার অগ্নি—আমার জীবনের সমস্ত হবি আমি মন্ত্রপাঠ ক'রে বিন্দু বিন্দু ক'রে ঢালব, বলব—তুমি অকলঙ্ক হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি অদমিত হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রজ্বলিত হও, তুমি আকাশস্পর্শী হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রজ্বলিত হও, মানুষের শ্রদ্ধার ছবিতে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রজ্বলিত হও; কখনও যেন গৃহস্থের গৃহ তোমার দ্বারা দগ্ধ না হয়। শিশু নারী বৃদ্ধ নিরীহ ধার্মিক তোমার উত্তাপে যেন কখনও উত্তপ্ত না হয়; পূর্ণ-প্রজ্বলিত তোমার শিখার মধ্যে যেন আমাকে পূর্ণাহুতি দিয়ে আমার সকল কলঙ্ক সকল অপমানের অবসান হয়। এই জন্যে আমি বাঁচব কাশীর বউ।

রাধাকান্তের চোখ ধকধক ক'রে যেন জ্বলছিল। গৌরীকান্ত বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতই। কাশীর বউ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

রাধাকান্ত এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধ'রে বললেন, রাখ বন্দুক, তলোয়ার রাখ।

তারপর বললেন, তুমি কি রাগ করলে? দুঃখ পেলে?

না। ব'স তুমি, আমি বাতাস করি।

বাতাস করতে করতে বললেন, কাল রাত্রি থেকে কিছু খাও নি—

হেসে মধ্যপথেই বাধা দিয়ে রাধাকান্ত বললেন, আজও কিছু খাব না। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে বলেছে, পিতামাতার তুল্য আশ্রয় নাই, ভার্যার তুল্য সান্ত্বনা নাই, পুত্রের তুল্য আশা নাই, উপবাসের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত নাই—আমি নিরম্বু নির্জলা উপবাস করব।

* * *

স্নানান্তে প্রসন্ন মনে পূজার্চনা শেষ ক'রে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। গত রাত্রে ঘুম হয় নি। স্নান করার পরই চোখে যেন ঘুম ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। কোনমতে পূজা শেষ ক'রে তিনি শুয়ে পড়বামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অপরাহ্নে যখন উঠলেন, তখন কার্তিক মাসের ছোট দিনের আলো প'ড়ে এসেছে। শরীরটা হালকা এবং মন প্রশান্ত হয়ে উঠেছে।

চাকর বিষ্ণু এসে তামাক দিয়ে নলটি বাড়িয়ে ধরলে। তিনি বললেন, না। উপবাস ক'রে তামাক খেতে রুচি ছিল না। বললেন, আমার ডায়রি আর দোয়াত কলম দিয়ে যা।

ডায়রি লিখতে বসলেন।

অদৃষ্টবাদে গভীর বিশ্বাস রাধাকান্তের। অর্থকরী-কর্মজীবনহীন রাধাকান্তের পুরুষকার স্বাভাবিক ভাবেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। নবগ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রীতির নির্দেশে পৈতৃক সম্পত্তির স্বল্পায়তন আধারের মধ্যে ব'সে থেকে বিকলাঙ্গ মানুষের মত অবস্থা তাঁর পুরুষকারের। দ্রুত ধাবমান পৃথিবীর সঙ্গে চলবার ক্ষমতার অভাবে পথে ব'সে গ্রহ এবং দেবতার সাহায্যের জন্য চীৎকার না ক'রে তাঁর গত্যন্তর নাই। আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে তিনি অদৃষ্টবাদসম্মত বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত ক'রে সান্ত্বনা খুঁজে বের করেছেন। তিনি লিখলেন—

"চরমতম অপমান আজ হইয়া গেল। দোষ কাহাকে দিব? দায়ী আমার বাল্যজীবনের কর্মফল এবং দায়ী আমার অদৃষ্ট। আমার মন্দ কর্মের ফলে অদৃষ্ট প্রবল বলশালী হইয়া কঠিন দণ্ড দিল। মহৎপিতার সন্তান, বাল্যে লেখাপড়া শিখি নাই। বুদ্ধি ছিল, মেধা ছিল; অবহেলায় মন্দ মতির মত্ততায় সবই বৃথা হইয়াছে। আজ রোদন করিলে কি হইবে? একমাত্র সান্ত্বনা—আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছি যে, মন্দ ভাগ্যের ইহাই সম্ভবত শেষ প্রান্ত। শাস্ত্রে বলে—সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয়; অদৃষ্টচক্রে ঘুরিয়া মানুষ যখন দুঃখ এবং মন্দ ভাগ্যের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয় তখনই তাহার দুঃখের শেষ, তাহার পরই চাকা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছিলাম, এক মহাপরাক্রান্ত রাজার এক পরম বিচক্ষণ এবং সাধু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিচক্ষণতা শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে কাচমণ্ডিত আলোকশিখার মত স্থির দীপ্তিতে প্রজ্বলিত থাকিত। ভাগ্যও ছিল প্রসন্ন। সকলেই বলিত, এ রাজ্যের মধ্যে সর্বসুখসৌভাগ্যে সুখী এবং ভাগ্যবান ওই একটি ব্যক্তি—এ রাজ্যের মহামন্ত্রী। পরাক্রমশালী রাজা নবীন যুবক, মহামন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি পর্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে সংবাহন করিতেন। একদা মন্ত্রী এক পুণ্যময় যোগে গঙ্গাস্নানে গেলেন। গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় গাত্রমার্জনাকালে তাঁহার অনামিকা হইতে অঙ্গুরীয়টি পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল। দুর্লভ একটি রত্নখচিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়, রাজভাণ্ডারেও তেমন রত্ন ছিল না। মন্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন। এমন রত্ন—হায়! তাঁহার আক্ষেপ মুখেই থাকিয়া গেল, চরম বিস্ময়ে পরিণত হইল। জলের একটি আকস্মিক আলোড়নে নীচের জিনিস উপরে ভাসিয়া উঠার সঙ্গে সেই অঙ্গুরীয়টিও জলের উপরে ঠিক তাঁহার সম্মুখেই ভাসিয়া

উঠিয়া যেন তাঁহার অঞ্জলিতেই নিক্ষিপ্ত হইল। অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করিলেন—এ কি হইল ? স্বর্ণ এবং রত্ন সকল ধাতুর মধ্যে গুরুভার। রত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয় জলে ভাসিল ? কে ভাসাইল ? কেন ভাসিল ? চিন্তিত মনেই ঘরে ফিরিলেন। গভীর চিন্তার পর উপলব্ধি করিলেন—ভাগ্য। ভাগ্য তাঁহার সৌভাগ্য এবং সুখের চরমতম ঊর্ধ্ববিন্দুতে উপনীত হইয়াছে। সেই হেতুই এমন অসম্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিলেন, এইবার চাকা নীচের দিকে নামিবে। তাঁহাকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি মনে মনে প্রস্তুত হইলেন,—বাহ্যিক ব্যবস্থা করিতেও ভুলিলেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে রাজ্যান্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। বহুমূল্য রত্নসম্ভার মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। ভগবানে মন সমর্পণ করিলেন।

দুর্ভাগ্য আসিল। করালমূর্তিতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ শত্রুতে দেশ আক্রমণ করিল। মন্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাতুর সেনাপতি মন্ত্রীর পরামর্শগুণেই শত্রুকে পরাজিত করিয়া রাজার প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল; এবং সেই সুযোগে সে এক জাল পত্র উপস্থিত করিয়া প্রমাণিত করিল যে, মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রফলেই দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; সেনাপতির রণপাণ্ডিত্যে এবং নৈপুণ্যেই কোনক্রমে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, শত্রু পরাজিত হইয়াছে। ভাগ্যের চক্রান্ত। মন্ত্রীর প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান রাজা একবার মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিলেন না, বিচারের প্রবৃত্তি পর্যন্ত হইল না। তিনি আদেশ দিলেন, মহামন্ত্রীকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর এবং তাহার ধনসম্পত্তি রাজভাণ্ডারভুক্ত কর। স্ত্রী পুত্র কন্যা যে আছে, তাহাদেরও কারাগারে নিক্ষেপ কর। মন্ত্রী নিজের বাড়িতে তখন সদ্য প্রাতর্ভোজনে বসিয়াছেন, একটি পাকা আতাফল খাইবার জন্য হাত মুখে তুলিয়াছেন, এমন সময় সেনাপতি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন।—তুমি বন্দী।

মন্ত্রী নীরবে ক্ষীণ হাস্য করিলেন। প্রতিবাদ করিলেন না, ভীত হইলেন না, রাজাকে বারেকের জন্যও অনুনয় করিলেন না। সংযত ধীর পদক্ষেপে প্রশান্ত মুখে কারাগারের লৌহদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন, প্রহরী তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। আশ্চর্য ভাগ্যের চক্রান্ত, সমগ্র দেশের যে জনসাধারণ মহামন্ত্রীকে দেবতা জ্ঞান করিত, তাহারা তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী পিশাচ জ্ঞান করিতে একটি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করিল না।

মন্ত্রী ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বারো বৎসর চলিয়া গেল।

মহামন্ত্রীর কথাই লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। কারাগারের অন্ধকারে মহামন্ত্রীর দেহ হইয়া গেল কঙ্কালসার, বর্ণ হইয়া গেল পক্ব পত্রের মত, মুখ শ্মশ্রু-গুম্ফে আচ্ছন্ন হইল, মাথার তৈলহীন চুলে জটা বাঁধিল। মন্ত্রীর মনে হইল, ভাগ্যচক্র ফিরিতে ফিরিতে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কি বাসনা আছে তাঁহার!

একটি পাকা আতাফল তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িল, পাকা আতাফল মুখে তুলিতে গিয়া তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, খাওয়া হয় নাই। তিনি কারাগারের প্রহরীকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন বাসনার কথা।

প্রহরী তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল।

পরের দিন আবার তিনি প্রহরীকে বলিলেন, একজন মরণোন্মুখ বৃদ্ধের শেষ বাসনা পূর্ণ করিলে ভগবান তোমার উপর সদয় হইবেন।

প্রহরী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, দণ্ডপাণি মহারাজ প্রত্যক্ষ। তাঁহার এক কথায় আমার মুণ্ডচ্ছেদ হইবে বৃদ্ধ। ভগবান কেহ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলে তাহার ফল তোমার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং ভগবানের দয়ায় আমার কোন প্রলোভন নাই।

পরের দিন তিনি আবার প্রহরীকে বলিলেন, তোমার ভাগ্যপতি তোমার প্রতি সদয় হইবেন। যেহেতু না মৃত্যুপথের পথিকের অভীপ্সা পূরণ মহাধর্ম। অচিরে তুমি সৌভাগ্যের মুখদর্শন করিবে।

প্রহরী চুপ করিয়া রহিল সেদিন।

পরের দিন বৃদ্ধ মন্ত্রী আবার নিবেদন করিলেন, তোমার দয়াধর্মের নিকট এই আমার শেষ আবেদন। তুমি প্রহরী হইলেও মনুষ্য।

প্রহরী সেদিন বিচলিত হইল। চিত্ত তাহার আলোড়িত হইল। সে কারাগারের দরজার ছিদ্র দিয়া বৃদ্ধকে একবার দেখিল। দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। বহু চিন্তার পর দয়াধর্মই বলবতী হইল। পরের দিন সে বাজার হইতে একটি সুপক্ক আতাফল আনিয়া বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল, এই লও, ভোজন করিয়া মরিয়া যাও। আমি কয়েক দিন এইখানেই শুইয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া ধন্য হই।

সুপক্ক আতাফলটি লইয়া এককালের মহামন্ত্রী—বহু সৌভাগ্যের অধীশ্বর—বুকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন; কাঙাল স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা পাইয়াছে। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া ফলটি সেখানে রাখিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া নিবেদন করিলেন। নিবেদনান্তে তিনি ফলটি তুলিয়া লইবার জন্য যে মুহূর্তে হাত বাড়াইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ভূগর্ভস্থ কারাগারের ছাদের একটা ফাটল হইতে কিছু একটা বস্তু ঠিক ফলটির উপরেই খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা অসহনীয় দুর্গন্ধে ভরিয়া গেল, সুগন্ধ ফলটি কাটিয়া ওই দুর্গন্ধ-যুক্ত বস্তুটির সঙ্গে একেবারে মাখামাখি হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল। ভাগ্যহত বৃদ্ধ স্তম্ভিত এবং মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, খানিকটা ছাদের ভাঙা টুকরা ও তাহারই সঙ্গে কোন রোমশ জন্তুর গলিত দেহ। ভাল করিয়া দেখিলেন, পচা ছুঁচার দেহ। উপরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন একটা গর্ত। সম্ভবত ওই গর্তের মধ্যেই জীবটা মরিয়া পচিয়া ছিল এবং এই মুহূর্তটিতে ছাদের ওই ভগ্ন অংশ পড়িবার সময় ওটা সুদ্ধ খসিয়া পড়িয়াছে। পড়িয়াছে কি তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত আতা ফলটির উপর!

আশ্চর্য, তিনি বাছিয়া বাছিয়া ওই পড়িবার স্থানটিতেই ফলটি রাখিয়াছিলেন। চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলেন, হইয়াছে। যে রত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয় জলে ভাসাইয়াছিল, সে-ই আজ বহু আকাঙ্ক্ষার—জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষার ফলটির উপর গলিত জীবদেহ নিক্ষেপ করিল। চাকা ঘুরিল। ইহার অপেক্ষা নিম্নতম বিন্দু আর কি হইতে পারে?

তিনি ইষ্টদেবতার ধ্যানে বসিলেন।

অকস্মাৎ অন্ধকার কারাগৃহ আলোয় ভরিয়া গেল। তিনি কি আসিলেন?

তিনি নন, স্বয়ং রাজা লৌহদ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা নিজে আসিয়া মন্ত্রীর লৌহশৃঙ্খল মোচন করিয়া কহিলেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতৃতুল্য মহামন্ত্রী, আমি আপনার সন্তানতুল্য। আমি মহাভ্রমে পতিত হইয়া মহাপাপ করিয়াছি। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি স্বীয় ষড়যন্ত্রের অপরাধ আপনার উপর আরোপ করিয়াছিল, আমি ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়া আপনার প্রতি অমানুষিক দণ্ডবিধান করিয়া ছিলাম, বিচার করি নাই, বিবেচনা করি নাই— আমি রাজধর্মে পতিত হইয়াছি, আমি মনুষ্যধর্মে পতিত হইয়াছি, যেহেতু না আপনি আমার গুরুতুল্য, পিতৃবন্ধু, পরমহিতৈষী, আপনাকে আমি অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছি। আজ সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে। আজই প্রত্যুষে বন্দী শত্রু-সেনাপতি মারা গিয়াছে। এই কারাগৃহের ঠিক উপরের কক্ষেই সে বন্দী ছিল। মৃত্যুকালে সে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিল, আমার নিকট অনুতাপের সঙ্গে অকপটে সমস্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছে। আপনাকে আমি মুক্ত করিতে স্বয়ং আসিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মন্ত্রী হাস্য করিলেন, বলিলেন, বৎস, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। তুমি আমি কে? যে করিয়াছে তাহাকে, এস, তুমি আমি—উভয়েই প্রণাম করি। পরম বিস্ময়ের সহিত রাজা প্রশ্ন করিলেন, কাহার কথা বলিতেছেন? কে তিনি?

ভাগ্য।

মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া উপরের কক্ষ অতিক্রমকালে দেখিলেন, মেঝের একটি গর্তে একটি ছুরিকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন করিলেন, ওটা কি?

রাজা বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ওই গৃহে প্রবেশ করিয়া ওই গর্তে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া গুপ্ত দলিল উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিল। ওই গর্তে শত্রুসেনাপতি দলিল লুক্কায়িত রাখিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে সতর্ক প্রহরী সেনাপতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছে। দলিল হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু এমন দুর্গন্ধ তাহাতে যে, সে দলিল আমি এখনও দেখিতে পারি নাই। শুনিয়া মন্ত্রী আবার হাস্য করিয়া প্রণাম করিলেন।"

গল্পটি শেষ ক'রে রাধাকান্ত আবার লিখলেন, "আজ আমার এই অপমান কি তদনুরূপ দুর্ভাগ্যের নিম্নতম বিন্দু নহে? ভাগ্য, তোমাকে প্রণাম করিতেছি—কোটি কোটি বার প্রণাম করিতেছি; যদি নিম্নতম বিন্দুতে আমার ভাগ্যফল আজও না আসিয়া থাকে, তবুও সে বিন্দু আর খুব দূরে নয়, তুমি সেই স্থানে আমাকে সত্বর উপনীত কর। এইটুকু করুণা তোমার

নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

এর পর গৌরীকান্তকে সম্বোধন ক'রে লিখলেন, "বাবা গৌরীকান্ত, যখনই ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত হইবে, দুঃখে-কষ্টে মনের মধ্যে গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই এই গল্পটি স্মরণ করিও। ইহা মিথ্যা নয়। আমাদের শ্রীবৎস রাজার গ্রহ কর্তৃক নিপীড়ন, নলরাজার কলি কর্তৃক নির্যাতন—সবই এক কথা বলে। কিন্তু এই গল্পে ভাগ্যের উর্ধ্বতম বিন্দু এবং নিম্নতম বিন্দুর যে দৃষ্টান্ত, সে দৃষ্টান্তের কথাটিই বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিও। ইহার শুধু একটি স্থানে সংশয় আছে। মহামন্ত্রী মুক্তিকালে রাজাকে বলিয়াছিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই—সবই ভাগ্য। ইহাতেই আমার সংশয়। ভাগ্য দুর্ভোগ আনে, তাহাকে ঠেকানো যায় না। কিন্তু ভাগ্য মন্দকর্মে মতি যখন দেয়, তখন মানুষ স্বকীয় বিচক্ষণতা এবং শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে সেই মতিভ্রম হইতে অবশ্যই বিরত থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে রাজার অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে। রাজধর্মে মনুষ্যধর্মে অবশ্যই তিনি পতিত হইয়াছেন। রাজাকে শাস্ত্রে বলে, ভগবানের প্রতিনিধি, সকল দেবতার অংশ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি হইবেন বায়ুর মত নিরপেক্ষ। আলোকের মত সকল জটিলতার কুজ্ঝটিকাভেদী হইবে তাঁহার দৃষ্টি। রাজা যদি পক্ষপাত করেন, তাঁহার দৃষ্টি যদি ভ্রমান্ধকারে বদ্ধ হয়, প্রতারিত হয়, তবে প্রজার আশ্বাস কোথায়, শান্তি কোথায়? তুমি এই রাজকুল হইতে সাবধান হইবে। ইংরাজের অত্যাচারের কথা আমি মাতামহীর কাছে শুনিয়াছি। আমাদের এ অঞ্চলে বর্গীদের অত্যাচারের পর অমন অত্যাচার স্মরণাতীত কাল হইতেও কখনও হয় নাই। তবুও শান্তির কালে ইহারা ন্যায়বিচার করে বলিয়া প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। আজ আমার সে ভ্রমও ভাঙিয়া গেল। ইহারা আমাদিগকে 'নেটিভ' 'নিগার' বলিয়া ঘৃণা করে, আমাদের ধর্মকে ঘৃণা করে। তাহার উপর দারুণ পক্ষপাতী। ইহারা ধনীর প্রতি প্রসন্ন—দরিদ্রের প্রতি প্রচণ্ড অবজ্ঞা ইহাদের। আদালতে ন্যায়বিচারের অভিনয় করে, কিন্তু শাসনের ব্যাপারে ইহারা ন্যায়-অন্যায় মানে না—সে সব ক্ষেত্রে অনুগত ধনীর সাতখুন মাফ; মানুষের বিচার ইহাদের মানুষ হিসাবে নয়, সে বিচার ইহাদের কাহার কত সম্পত্তি, কত অর্থ আছে তাহারই হিসাবে। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া এই যে আজ দেশব্যাপী আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে। এই চৈতন্যোদয় হইয়াছে ইহাদেরই এইরূপ রাজধর্মের আচরণে। বীরত্বের লীলাভূমি ভারতের গৌরবোজ্জ্বল রাজস্থান একদা বাদশাহ আকবরের মোহে পড়িয়া এইরূপ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এক মেবারের চন্দ্রবংশকুলতিলক মহামতি মহারাণা প্রতাপসিংহ সে মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন, অরণ্যে পর্বতে কন্দরে বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও অধীনতা স্বীকার করেন নাই। একদা তিনিও ভাঙিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময় আকবরের সভাকবি পৃথ্বীরাজের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল অনুরূপ ভাবে। নিদারুণ আঘাত, মর্মান্তিক অপমান। নওরোজের মেলায় আকবর পৃথ্বীরাজ মহিষীর অমর্যাদা করিতে উদ্যত হইলেন—রাজপুত-ললনা ছুরিকার সাহায্যে ধর্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া স্বামীর সম্মুখে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিলেন। পৃথ্বীরাজ-কবি সেদিন সমগ্র রাজপুত জাতিকে জাগ্রত করিবার সংকল্প করিয়া মহারাণা প্রতাপ সিংহকে

কবিতায় পত্র লিখিলেন। মহারাণা প্রতাপ সেই পত্র পড়িয়া সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তে কবির কাব্য পড়িয়া একে একে বহু রাজপুত নরপতির চৈতন্যোদয় হইল। রাজস্থানের দুর্গের পর দুর্গ উদ্ধার হইল। রাজা রাজধর্মচ্যুত হইলেই প্রজার শ্রদ্ধা হারায়। শুধু অনুগত ধনীরা রাজাকে সাহায্য করে। আজ দেশের ঠিক সেই অবস্থা। বাবা গৌরীকান্ত, তুমি কখনও ধনী হইতে চেষ্টা করিও না, ধনী হইলেই রাজ-উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণে রুচি জন্মে। গুণী হইও। সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহস অর্জন করিও। সাহসই শক্তি। আমি দেহের শক্তিতে বিপুল বলশালী, আমি ধনীকে ভয় করি না, দস্যুকে ভয় করি না ;—না, দস্যুকে আমি ভয় করি না, সাধারণ দস্যুকে ভয় না করিলেও সর্বাপেক্ষা বড় দস্যুকে ভয় করি। রাজা—এই বিদেশী রাজাই সর্বাপেক্ষা বড দস্যু। আমি—"

মনের আবেগে পাতার পর পাতা তিনি লিখে চলেছিলেন। এক সপ্তাহের দিনলিপির স্থান—এক দিনের লেখাতেই ভ'রে গিয়েছে। তখনও লিখে চলেছেন, গৌরীকান্ত ঘরে এসে প্রবেশ করল।

বাবা !

লেখা রেখে রাধাকান্ত বললেন, কি বলছ বাবা ?

সন্তোষ পিসেমশায় এসেছেন।

সন্তোষবাবু ? কোথায় ?

নীচে।

সে কি ! নিয়ে এস তাঁকে। কই, কোথায় সন্তোষবাবু ? আসুন ভাই।

সন্তোষবাবু এসে বসলেন। কি বলবেন ! কথা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাইরে গোটা গ্রামখানা আজ এই প্রসঙ্গ নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু অধিকাংশ জনই এ কথা নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লজ্জা বোধ করছে ব'লেই আসতে পারে নি। রাধাকান্তের সকাল-সন্ধ্যায় হাসিতে আলাপে বাদে প্রতিবাদে মুখর বৈঠকখানাটা আজ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। রাধাকান্ত বাড়িতে না-থাকলেও মজলিস বাদ পড়ে না। এ বন্দোবস্ত তাঁর করা আছে। কেবল সন্তোষবাবু থাকতে পারেন নি। বৈঠকখানায় এসে বার-দুয়েক কিছুক্ষণ ব'সে তামাক খেয়ে ফিরে গেছেন। তৃতীয় বারে বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বললেন, দুঃখের ভাগ তো দেওয়া চলে না ভাই রাধাকান্তবাবু, তবু যে যাকে ভালবাসে সে তার দুঃখের ভার নিতে চায়। প্রাণটা আকুল হয়ে ওঠে। বার বার নিজেকে বললাম, তুই না-হয় ঘরজামাই, তোর না-হয় অন্য কোথাও ঠাঁই নাই—রাধাকান্তবাবুর এখান ছাড়া ; কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ তো মানতে হয় ! তবু পোড়া স্বার্থপর মন মানে না ভাই ;—প্রাণটা সারাদিন মনের কথা প্রাণের কথা না-ব'লে হাঁপিয়ে উঠেছে, ঠেলে নিয়ে এল তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে।

রাধাকান্ত প্রসন্নকণ্ঠে যেন অন্তর ঢেলে ব'লে উঠলেন, বাঁচলাম ভাই। আমিও যেন মনে মনে আপনাকেই ডাকছিলাম। আপনি বোধ হয় সেই ডাকে এসেছেন।

সন্তোষবাবু বিস্মিত হয়ে রাধাকান্তের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন না।

রাধাকান্ত আবার বললেন, বসুন।

কি বলছিলে যেন? মনে মনে ডাকছিলে, বললে না'?

আপনি আমাকে যে সত্যই ভালবাসেন সন্তোষবাবু।

তা বাসি। নিশ্চয় বাসি। আজ তোমাকে ভাই আরও অনেক বেশি ক'রে ভালবেসে ফেললাম। দেখা হ'লেই বল—আসুন, অন্তরে স্থান গ্রহণ করুন। আজ তা বললে না। প্রথমটা ভাবলাম, অসন্তোষ আজ তোমার অন্তর জুড়ে, তাই ও-কথাটা বললে না। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম কথা শুনে, তোমার মুখ দেখে, দেখি—আমিই তোমায় জুড়ে ব'সে রয়েছি, মুখে চোখে মনে সন্তোষ যেন উপচে পড়ছে। কি ক'রে হ'ল তা জানি না। কিন্তু এর পর তোমাকে আমার অন্তর জুড়ে না বসিয়ে উপায় কি বল? কিন্তু—। কিছু মনে করবে না তো?

রাধাকান্ত হাসলেন।—নাঃ। মনে আর কিছু করব না।

কি ক'রে এমন হ'ল?

শুনবেন?

শুনব না?

ডায়েরি লিখছিলাম। প'ড়ে শোনাই শুনুন।

হেসে সন্তোষবাবু বললেন, একটা কথা কিন্তু—

বলুন।

কাশীর বউয়ের কথা থাকলে কিন্তু বাদ দিয়ে পড়তে পারবে না। অন্য কোন কথা যদি ইচ্ছে হয় বাদ দিও।

হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন রাধাকান্ত। হেসে বললেন, না। সব প'ড়ে শোনাব আজ।

পড়তে শুরু করলেন রাধাকান্তবাবু। সন্তোষবাবু চোখ বন্ধ ক'রে শুনে গেলেন। পড়া শেষ ক'রে রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, কি মানুষের সঙ্গে, কি ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে লাভ নেই সন্তোষবাবু।

কিন্তু তবু যুদ্ধ করছ।—হাসলেন সন্তোষবাবু।

না। অনেক করেছি। আর না। হার মানলাম। যুদ্ধ শেষ।

উঁহু।—ঘাড় নাড়লেন সন্তোষবাবু।—নতুন যুদ্ধের বীজ পুঁতলে ভাই।

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। বললেন, আমি কি—? আপনার কথা তো বুঝতে পারলাম না ভাই।

বীজ পুঁতলে ভাই। অঙ্কুর বের হতে দেরি আছে। গৌরীকান্তের বয়স তো সবে ছয়-সাত। পরশুরাম অস্ত্রত্যাগ ক'রে ভীষ্মকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভাই, তোমার শিক্ষা তেমনই অজেয় হবে। গৌরীকান্ত, এদিকে এস তো বাবা।

গৌরীকান্তের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, গৃহজামাতা পরান্নভোজী, তবু এইটুকু ভরসা—

নিত্য ইষ্টদেবতাকে পূজা করি। আশীর্বাদ করি, তোমার বাপের দুঃখ-বেদনা তুমি মোচন করতে সক্ষম হও।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আপনি কি আশীর্বাদ করলেন ভেবে দেখেছেন?

রাধাকান্তের ইঙ্গিত সন্তোষবাবু মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, স্মরণ হয়ে গেল পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু তিনি অপ্রতিভ হলেন না। বললেন, ভেবে দেখেছি বইকি। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ—শাস্ত্রে বলে, এই তো গুরু এবং পিতার পরমকাম্য। সেই তো হবে তোমার সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয়। জীবনের পরম জয়।

বারো

বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম; মন্থর জীবন। তার উপর নবগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার নিয়ে গঠিত। জমিদারেরা ব্রাহ্মণ। আচারসর্বস্ব বিশ্বাসপ্রধান ধর্ম আর পরস্পরকে বাঁকা পথে মর্মান্তিক আঘাত করবার নৈপুণ্য ও আভিজাত্যসম্মত ভদ্রতার বিচিত্র সমন্বয়ে সৃষ্ট এখানকার মানুষের মন। নিম্নতম স্তরের মানুষেরা সভয়ে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই লীলা দর্শন করে আর জীবনের বোঝা টেনে চলে। ব্যবসায়বৃত্তিধারীরা কৌতুক এবং ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখে, সুযোগও গ্রহণ করে; কিন্তু ব্যবসায়বৃত্তিকে এই এদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত পন্থায় পরিচালিত ক'রে চলে, এবং সতৃষ্ণ অন্তরে এদের জীবনের কোন প্রচণ্ড আঘাতের প্রতীক্ষায় ক্ষণ দণ্ড প্রহর দিন মাস বৎসর গণনা ক'রে চলে। ভাবজীবন এবং কঠোর বাস্তবের বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে তারা ভেসে চলে ছোট ছোট ডিঙির মত। জমিদারেরাই এখানকার জমির মালিক, এবং তাঁরাই তাদের দোকানদানির প্রধান খরিদ্দার। জমিদারদের বিপদে এরা অন্তরে অন্তরে দুঃখও অনুভব করে, আবার অতি অজ্ঞাতে অন্তরে অন্তরে পুলকিতও হয়। দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে, আবার ভগবানকে অতি সূক্ষ্ম বিচারকর্তা ব'লে অভিনন্দিত করে।

একই সময়ে বিপরীতধর্মী দুই আলোড়ন সমগ্র গ্রাম্য জীবনকে আলোড়িত ক'রে তুললে। রাধাকান্তবাবু হাত জোড় ক'রে গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছেন, স্বয়ং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন—এ সংবাদ একটি আলোড়ন তুললে। আর একটি আলোড়ন উঠল আগামী সপ্তাহে এখানে হাই ইংলিশ ইস্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হবে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন, জেলার অন্য রাজকর্মচারীরা আসবেন, উকিল মোক্তার ধনী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসবেন। মস্ত বড় সভা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রূপার কর্ণিক হাতে নিয়ে হাল বছরের টাকা-আধুলি-সিকি-দুআনি-ডবলপয়সা-পয়সা-ভর্তি একটা শিল-মোহর-করা বোতল সেখানে রেখে গোলাপ জলে ভেজানো মশলায় ইট গেঁথে ভিত পত্তন করবেন। বড় বড় লোকে বক্তৃতা দেবেন, রাত্রে বাবুদের ছেলেরা থিয়েটার করবেন। এ এক অভূতপূর্ব সমারোহ নবগ্রামে। প্রবল বন্যা যখন আসে, তখন যেমন ভাটির টানেও নদীর বুকের কাদা-

মাটি জাগতে পায় না, তেমনি ভাবেই সমারোহে অভূতপূর্বতায়, সবিস্ময় উল্লাসের প্রভাবে মানী রাধাকান্তের অবমাননার বিষণ্ণতা নবগ্রামে পরিস্ফুট হতে পেল না।

সে সমারোহের উদ্যোগ দেখে লোকে বললে, রাজসূয় যজ্ঞ।

রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই ব'সে সে দিন বংশলোচন এই মন্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে বললেন, মূর্খ, মূর্খ, হস্তীমূর্খ সব। রাজসূয় যজ্ঞ! মূর্খ কি আর গাছে ফলে?

সন্তোষবাবু হেসে বললেন, মূর্খ কোন কালেই ফলের বিশেষণ হয় না লচুকাকা, ওটা মানুষেরই বিশেষণ। মধ্যে মধ্যে আবার পণ্ডিত শব্দটা মূর্খের বিশেষণ হয়। লোকে বলে —পণ্ডিত মূর্খ। কিন্তু মূর্খেরা তো খুব মূর্খের মত বাক্যপ্রয়োগ করে নাই। ব্যাপারটা নবগ্রামে রাজসূয়ই বটে।

রাজসূয়ই বটে?—তামাকের নলটা ফেলে দিলেন একজনকে লক্ষ্য ক'রে।—রাজসূয়ই বটে?

অঃ! করলে কি লচুদাদা, একেবারে চোখের কোণে এসে লাগল নলের মুখটা! অঃ! উত্তেজনাবশে নলটা এমন ভাবে ছুঁড়েছেন বংশলোচন যে, সটকার নলটা একেবারে ছোবল-মারা সাপের মত গিয়ে বংশলোচনের জ্ঞাতিভাই মহীন্দ্রের মুখে আছড়ে পড়েছে।

বংশলোচন মহীন্দ্রের কথা গ্রাহ্যই করলেন না। বেচারীর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না, বললেন, মরি মরি মরি, একেই বলে উপমায় কালিদাস। হ্যাঁ, তুমি কালিদাস বটে। কালিদাস যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডাল কাটতে শুরু করেছিলেন দেখে রাজ-অনুচরেরা ধ'রে এনে রাজার গৃহজামাতা ক'রে দিয়েছিলেন। তোমার বুদ্ধিও কালিদাসের মত, নবগ্রামের রাজচক্রবর্তী-বাড়ির জামাতাও বটে। বলি, বাপধন, এটা রাজসূয় যজ্ঞ হ'লে গোপীচন্দ্র নিশ্চয় যুধিষ্ঠির, এবং কি বলে, মহা অভিমানী শ্রীমান স্বর্ণকে আমার সুযোধন হতে হবে। তা হ'লে তুমি যে মানিক জয়দ্রথ হবে, তার হিসাব রেখেছ? মুণ্ডটি যে কাটা যাবে কুরুক্ষেত্রে!

বাক্‌পটু বংশলোচনের বাক্যভঙ্গিই এমনি। অর্জুন বাণ নিক্ষেপ ক'রে প্রণাম জানাতেন; সে বাণে অঙ্গ বিদ্ধ হ'ত না; বংশলোচনের বাক্যবাণ আঘাতের জন্যই, কিন্তু সেটা ব্যবহারে ব্যবহারে এমনিই ভোঁতা হয়ে গেছে যে, লোককে বিদ্ধ করতে পারে না। সন্তোষবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে আমার শ্বশুর সম্পর্ক। আপনি জয়দ্রথ ব'লে যে গালটা দিলেন, ওটা আমার গায়ে লেগেছে। মুণ্ড কাটা যাবে ব'লে নয়, শ্যালকপত্নী দ্রৌপদীর প্রতি সে যে আচরণ করতে উদ্যত হয়েছিল, সেটা পিশাচের আচরণ।

তারপর আবার বললেন, ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে, সেটাকে রাজসূয় বলা অসম্ভব মনে হতে পারে। এক কথায় নাকচও ক'রে দিতে পারেন। দুটো যজ্ঞের হিসাবের খাতা বের ক'রে খরচ দেখলেই আমি হেরে যাব। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, উপমা লোকে ঠিকই দিয়েছে। আরব্য-উপন্যাসের গল্পের আকাশে-মাথা-ছোঁওয়া দৈত্য আর ছোট-বোতলের-মধ্যে-বদ্ধ দৈত্য যদি একই দৈত্য হয়, তবে খরচের যত তফাতই থাক্, দ্বাপরের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয়ে আর কলিতে নবগ্রামের হাই-ইস্কুল স্থাপন-উৎসবে স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যায়।

লচুকাকা, অনুধাবন ক'রে দেখুন—দুটিরই যজ্ঞফল এক। রাজসূয় ক'রে যুধিষ্ঠির হয়েছিলেন রাজচক্রবর্তী, সকল রাজার কাছ থেকে প্রণাম আদায় করেছিলেন। এ যজ্ঞে নবগ্রামে গোপীচন্দ্র হলেন রাজচক্রবর্তী; প্রণাম সকলকেই করতে হবে। বিশ্বরূপধারী চক্রহস্ত গোবিন্দের মত বেত্রহস্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন সম্মুখে। তাঁকে সেলাম দিতেই হবে, এবং সাহেব সেলামগুলি সহাস্যে গোপীচন্দ্রকে নিবেদন ক'রে দেবেনই। লোকেরা মূর্খ বটে, কিন্তু তার পণ্ডিতের মত সূক্ষ্ম কথা বলেছে। আর আয়োজন? সে বোধ হয় আপনার না-দেখা নেই। দু বেলাই ওখানে যান, সে আমি জানি।

বংশলোচন সহজে অপ্রস্তুত হন না। তিনি এতেও অপ্রস্তুত হলেন না, এমন কি নিরুত্তরও হলেন না, তেমনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতেই বললেন, বাহবা বাহবা! বলেছ ভাল হে। উকিল হতে হ'ত হে তোমাকে। তা বৎস, শিশুপালটি কে হবে? সভায় মাথাটা কাটা যাবে কার?

স্বর্ণবাবু বললেন, আমার দিকে তাকাচ্ছ কি লচুকাকা? আমি দুর্যোধন হয়েই রইলাম। আমার শেষ হবে কুরুক্ষেত্রে। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। শিশুপাল! শিশুপালবধ এ যজ্ঞে আগেই হয়ে গিয়েছে, উদ্যোগপর্বেই রাধাকান্তের শিরশ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। কিছু মনে ক'রো না রাধাকান্তদা, কথাটা বোধ হয় খুব বড় হয়ে গেল। কিন্তু যারা রাজসূয়-রাজসূয় বলছে, এও তাদেরই কথা। লোকে বলছে, রাধাকান্তবাবুর মাথাটা কেটে গোপীবাবু ধুলোয় ফেলে দিলে।

•

সন্তোষবাবু সত্য বলেছেন। সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। নবগ্রামে এত বড়, এমন অভিনব সমারোহ এবং এত বিপুল ও এমন বিচিত্র জনসমাগম অন্তত নবগ্রামের ইতিহাসে বহুকালের মধ্যে কখনও হয় নাই। কেউ কেউ বললে, কোন কালেই হয় নাই।

পল্লীর কাহিনীকারেরা কাহিনী বলেন, রাজা-রাজড়ার বাড়ির উৎসব-সমারোহের কাহিনী বলেন—"সে এক মহাসমারোহ, গোটা দেশে সাড়া প'ড়ে গেল, ঘরে ঘরে মানুষেরা দিন গুনতে লাগল। তারপর দিনটি এল। হেলেতে হাল ছাড়লে, জেলেতে জাল ছাড়লে, কুমোরে চাক ছাড়লে, তাঁতিতে তাঁত ছাড়লে, নাপিতে ক্ষুর ছাড়লে, বদ্যি রোগী ছাড়লে, পোয়াতি পো ছাড়লে, বাসী ঘরে ঝাঁটা পড়ল না, শয়নঘরের 'শিজ' উঠল না, উঠোনে 'ছাচ' পড়ল না (নিকানো হ'ল না), উনোনে আঁচ পড়ল না; মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো 'দে-দুয়েরী' (প্রতি ঘরে) ছুটল।" এ উৎসবেও তাই হ'ল বলা যায়। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভিড় ক'রে দেখতে এল। সত্য-সত্যই সেদিন অনেক চাষার হাল বন্ধ থাকল। সেখমপুর গ্রামের কয়েকজন কুম্ভকার এসেছিল, তাদের চাক বন্ধ থাকল। ডেপুটি, সাবডেপুটি, সাবজজ, মুন্সেফ, পেশকার, নাজির, উকিল, মোক্তার, জমিদার, ব্যবসায়ী, কয়েকটি ইস্কুলের হেডমাস্টার নিয়ে জেলার সম্ভ্রান্ত লোকের সে এক বিরাট সভা। আসেন নাই কেবল জজসাহেব। কলকাতার ব্যবসায়ী এবং গোপীচন্দ্রের ব্যবসায়ে কর্মচারীদের মধ্যে দুজন সাহেব ছিলেন। গ্রামের সকলেই গিয়েছিলেন। সামাজিক রীতির সঙ্গে সভার আসরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্ব হেতু

তাঁদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ক'রে তুলেছিল। গোপীচন্দ্র কালো সার্জের চোগা-চাপকান, সাদা সিল্কের প্যান্ট, মাথায় কালো পাগড়ি প'রে বসলেন ; দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন মানুষটিকে এই পোশাকে সমস্ত সভার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মনোহারিত্বে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল।

কীর্তিচন্দ্রও এই পোশাক পরেছেন ; ছোট ছেলে পবিত্র চাপকান পরে নাই, পেন্টলুন কোট টাই-এর সঙ্গে মাথায় পাগড়ি পরেছে। অমরচন্দ্রের পোশাক খাঁটি সাহেবী, তিনি হাট মাথায় দিয়েছেন। বিরাট জনতা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছিল। থানার কনস্টেবল, চৌকিদার, জমাদার—এরা সে গণ্ডগোল সংহত করবার চেষ্টায় ঘুরছে, তাদের সঙ্গে ঘুরছে পবিত্রের সঙ্গীরা—মঙ্গল, শূলপানি, গুড়ম্বা, ওদের সঙ্গে অমূল্য ভূপতিও আছে। ওরা দুজনে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে গোপীচন্দ্রকে গালাগালও দিচ্ছে আবার গোলমাল থামাবারও চেষ্টা করছে। দু-চারজনকে ধাক্কাও দিচ্ছে। সমগ্র জনসমাজ দেখতে পেলে আজ গোপীচন্দ্রের বিরাট রূপের যথার্থ মহিমা। তিনি যে এতবড় মানুষ—এ কথা লোকে ভাবতে পারে নাই। ডেপুটি, মুনসেফ, উকিল কয়েকজন থেকে আরম্ভ ক'রে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বক্তৃতা ক'রে বললেন, নবগ্রামের বহু তপস্যার ফলে, এখানকার অধিবাসীদের অসীম সৌভাগ্যের বলেই গোপীচন্দ্রের মত কীর্তিমান সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে এখানে। গোপীচন্দ্রের এ কীর্তি অক্ষয় কীর্তি। নবগ্রাম সে কীর্তিকে বক্ষে ধারণ করে গৌরবান্বিতা হ'ল। আরও অনেক কীর্তিই নবগ্রাম তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এবং সে প্রত্যাশা অচিরে পরিপূর্ণ হবে। কীর্তির্যস্য স জীবতি, কীর্তিবলে গোপীচন্দ্র নবগ্রামে অমরত্ব লাভ করলেন।

সাহেব বক্তৃতা করলেন ইংরেজীতে। বাংলা বলতে পারেন না, বেহার প্রদেশের অভিজাত বংশীয় মুসলমান, হিন্দীও ভাল বলতে পারেন না। উর্দু বলতে পারেন, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে ইংরেজীতে বক্তৃতা করাই বিধি। তাঁর বক্তৃতা অধিকাংশ লোকেই বুঝতে পারে নাই। সে কথা অমরচন্দ্র সাহেবকে জানিয়ে বাংলায় অনুবাদ ক'রে বলবার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। সাহেবের অনুমতিক্রমেই অনুবাদ ক'রে দিলেন অমরচন্দ্র। অনুবাদ শেষ ক'রেই কিন্তু থামলেন না তিনি। ব'লে গেলেন নিজের কথা। বললেন, আজ আমরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি। অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিমজ্জিত, আত্মকলহে অহরহ মগ্ন এবং মত্ত। পশু অপেক্ষাও অধম হয়েছি আমরা। দেশ-বিদেশ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মন নিয়ে কুসংস্কার বর্জন ক'রে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করছে, তখন আমরা টিকি আন্দোলিত ক'রে পঞ্জিকা খুলে তিথি নক্ষত্র ত্র্যহস্পর্শ দগ্ধা অশ্লেষা মঘা বারবেলা যোগিনী দিক্‌শূল প্রভৃতি বিচারের কচকচি ক'রে চুপচাপ ব'সে আছি। আজ বেগুন খেতে আছে কিনা, কাল মুলো খাওয়া নিষিদ্ধ কি না—এই বিচারে ব্যস্ত। ইংরেজকে ছুঁলে আমরা স্নান করি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেউ বিলাত গেলে তাকে আমরা পতিত করি। পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে চন্দ্র এসে প'ড়ে সূর্যে ছায়া পড়লে, সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী এসে প'ড়ে চন্দ্রের ছায়া পড়লে, বিশ্বাস করি—রাহু এসে হাঁ করে গিলে

ফেলছে সূর্যকে চন্দ্রকে। এমন কি, যে মানুষ মরছে, তাকে আমরা মরবার জন্ত, ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে তুলসীতলায় শুইয়ে দিয়ে তার কানে চীৎকার ক'রে বলি—হরি বল, তুমি মরছ। কাউকে কাউকে ঠেলে পাঠিয়ে দিই গঙ্গাতীরে কিংবা কাশীতে। আঁতুড়ের ছেলে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে, আমরা বলি—পেঁচোয় পেয়েছে। আমাদের বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, শ্যাওড়া-গাছে পেত্নী, অন্ত গাছে ভূত থাকে—অশিক্ষা কুশিক্ষার ভূত। এসব থেকে মুক্ত হবার জন্ত আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষার। নূতন ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজই আজ শ্রেষ্ঠ জাতি। এতবড় যে ফরাসী জাতি, সে পর্যন্ত তার কাছে পরাভূত হয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেছে। আমাদের চরম অধঃপতনের সময় বিধাতা যে সেই ইংরেজকে ভারতের সিংহাসন দান করেছেন, এর জন্ত আমরা বিধাতাকে ধন্তবাদ দিই। ইংরেজের কল্যাণেই আমরা রেলওয়ে পেয়েছি, টেলিগ্রাফ পেয়েছি, ডাক্তারী শাস্ত্র পেয়েছি, মুদ্রাযন্ত্র পেয়েছি। ইংরেজের কাছে আমাদের অনেক শিখতে হবে। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। শান্তিপূর্ণ ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণে একে একে সে সব করতে পারব আমরা।

গোপীচন্দ্র এই সময় উঠে অমরচন্দ্রের কানে কানে কয়েকটি কথা বললেন।

অমরচন্দ্র আবার বললেন, ইস্কুল হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বোর্ডিং-হাউস স্থাপন করব এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করব। এ বিষয়ে আমরা মহামান্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি, সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সাধুবাদে সমস্ত সভা ভ'রে গেল। সভা শেষ হ'ল। এর পর পান-ভোজন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সাহেবী হোটেলের বাবুর্চিদের ব্যবস্থায় কেউ খেলেন না। সেখানে বসলেন ডেপুটি, সাবডেপুটি, মুনসেফ এবং উকিলেরা কেউ কেউ। কলকাতার ব্যবসায়ীরা সকলেই সেখানে বসলেন। সাবজজবাবু স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেশী ব্যবস্থায় জলখাবার-চায়ের আসরে এলেন। স্বর্ণবাবু আজ অত্যন্ত ধীর। তিনিও বসলেন। বংশলোচন বিলিব্যবস্থা করছিলেন। রাধাকান্ত সাবজজবাবুর পাশে বসলেন, কিন্তু খেলেন না। বললেন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সান্ধ্যকৃত্য না সেরে তো—। একটু হাসলেন।

গোপীচন্দ্র ঠিক এই সময়ে এলেন সেখানে। অতিথিদের আপ্যায়নের প্রয়োজন আছে, সে কথা তিনি ভোলেন নাই। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

দূরে চাষীরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। সন্ধ্যার পর বাঈনাচের আসর বসবে। সে দেখে তবে তারা যাবে।

এবারৎ হাজী সালেবেগকে বললে, সরকার থেকে গোপীবাবুকেই ই ঠেনের রাজা খেতাব দিবে, এমুনি মালুম হচ্ছে মেরজা।

হাঁ। খোদা যাকে রাজা করে, সরকার তাকে রাজা ব'লে মানবে না কেনে, কও? আলবৎ খেতাব দিবে।

খাওয়ার টেবিলে ব'সেই সাহেব ডাকলেন দারোগাকে। মৃদুস্বরে কি বললেন।

দারোগা ব্যস্ত হয়ে এসে রাধাকান্তকে বললেন, সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তারপর স্বর্ণবাবুর দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, আপনাকেও। ওঁর পরে আপনি যাবেন।'

রাধাকান্ত অন্তরে অন্তরে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন। কে জানে, আরও কি ভাগ্যে আছে তাঁর!

ধীরে ধীরে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সাহেবের সামনে। প্রথামত ঝুঁকে সেলাম করলেন। সাহেব কাঁটায় আটকে এক টুকরা খাদ্যের উপর ছুরি চালাচ্ছিলেন। তিনি মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নামিয়ে খাবার টুকরাটা কাটতে মনোনিবেশ করলেন। সে টুকরাটা কেটে আর এক টুকরায় কাঁটা বিঁধলেন।

রাধাকান্ত দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর পা কাঁপতে লাগল। ভয়ে নয়, ক্ষোভে।

সমস্ত লোকের দৃষ্টি গিয়ে তাঁর উপর পড়েছে। বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে যে, সাহেব তাঁকে অপমানিত করবার জন্যই এমন ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

রাধাকান্ত অবশেষে অধীর হয়ে বললেন, হুজুর, আমি অসুস্থ, আমাকে—

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হোয়াট?

সাধ্যমত ইংরেজী ক'রে রাধাকান্ত বললেন, আমি অসুস্থ।

অসুস্থ! হুঁ। তুমি তো রাধাকান্তবাবু?

হ্যাঁ হুজুর, আমিই সেই হতভাগ্য।

হোয়াট? হোয়াট ইজ হটভাগ্যা?

অমরচন্দ্র হেসে ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলেন।

সাহেব বললেন, আই সি। তোমার মন্দ ভাগ্যের প্রতিকার আমার হাতে নেই। আমি দুঃখিত। ওয়েল তুমি গোপীচন্দ্রবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন রাধাকান্ত—তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঝিমঝিম করছে। কণ্ঠস্বরও পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন।

ব্যস্ত হয়ে গোপীচন্দ্র এগিয়ে এলেন, বললেন, হ্যাঁ সাব্, উনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

সাহেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই রাধাকান্ত বললেন—তাঁর অসহনীয় ক্ষোভ বোধ হয় মাত্রা অতিক্রম করেছিল—বললেন, আপনার সামনে সর্বজনসমক্ষে আবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি রাজপ্রতিনিধি, পৃথিবীতে দেবশক্তির পরই প্রবলতম শক্তি—রাজশক্তি, সেই শক্তির বলে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি কোনও অন্যায় করেছি ব'লে মনে করি না। কিন্তু আপনার আদেশ অমান্য করবার মত শক্তি আমার নাই—সাহস আমার নাই। গোপীচন্দ্রবাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাধাকান্তের কণ্ঠস্বরে, তাঁর শেষ কথা কয়টিতে সমস্ত সমারোহের উল্লাসের সুর যেন কেটে গেল। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে সকলে তাঁর দিকে

চেয়ে রইল। রাধাকান্ত টলছিলেন। টলতে টলতেই সেলাম ক'রে তিনি বেরিয়ে আসবার জন্ম অগ্রসর হলেন। কিন্তু শক্তি নাই যেন তাঁর। তিনি খুঁজছিলেন একটি আশ্রয়—কারও সাহায্য। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেউ উঠল না—কেউ হাত বাড়াল না। স্বর্ণবাবু পর্যন্ত না।

রাধাকান্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে ডাকলেন, গৌরীকান্ত! গৌরী!

অকস্মাৎ দূরে সমবেত জনতার মধ্য হতে দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ কিশোর দ্রুতপদে এগিয়ে এসে রাধাকান্তের হাত ধ'রে বললে, শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে দাদা?

রাধাকান্ত বিহ্বলের মত প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি কিশোর।

আঃ, ধর তো ভাই হাত।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। সকলে নিষ্পলক হয়ে ব'সে রইল, শুধু দৃষ্টির সঙ্গে চোখের তারা দুটি রাধাকান্তের অনুসরণ-প্রচেষ্টায় তিল তিল ক'রে তির্যক ভঙ্গীতে স'রে স'রে যাচ্ছিল।

শুধু একজন উঠল—সে ডাক্তার।

* * *

বাড়িতে এসে রাধাকান্ত বললেন, এইবার আমি সুস্থ হয়েছি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমাকে ভাবতে দাও। কেউ না—কেউ না। কাশীর বউ, তুমিও না।

বহুক্ষণ টেবিলের উপর মাথা রেখে তিনি ব'সে রইলেন।

তারপর টেনে নিলেন নিজের ডায়রি।

গৌরীকান্তকে সম্বোধন ক'রে আজকার বিবরণ লিখে শেষ করলেন। তারপর আবার লিখলেন—"নবগ্রাম দশমহাবিদ্যার মত এক হতে আর এক রূপ গ্রহণ করছে। গোপীচন্দ্রের সেবায় মা বোধ হয় ভুবনেশ্বরী রূপ গ্রহণ করছেন। শেষ রূপ 'কমলা-রূপ' কবে কার সেবায় গ্রহণ করবেন কে জানে?"

বহুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে হঠাৎ তিনি উঠে এসে দাঁড়ালেন বাইরের বারান্দায়। অন্ধকার সমস্ত। গ্রাম নিস্তব্ধ। কোলাহল ভেসে আসছে গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্থল ওই প্রান্তর থেকে। সেখানে এখন বাঈনাচ হচ্ছে। হাসলেন তিনি।—মা মুখ ফেরালেন আজ। এর পর গ্রামের কলরব ওখানে ভেসে গিয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের সাড়া তুলবে না। ওখানকার সাড়া এসেই এখানকার স্তিমিত পল্লীর মানুষদের অভয় দেবে। যুগ চ'লে যাবে। আবারও পরিবর্তন ঘটবে। কে ঘটাবে? তিনি থাকবেন না। তাঁর বংশ? তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার হাসলেন। মায়া! বংশের মায়া!

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত রাধাকান্ত মায়াবাদের আশ্রয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলেন অন্ধকারের দিকে চেয়ে। হঠাৎ আবার একটা কলরব ভেসে এল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ফিরে এলেন। ডায়রি খুলে লিখলেন—

"মৃত্যুর রূপ অন্ধকার। শাস্ত্রেও বলিয়া থাকে, মনে মনে যুক্তির দ্বারাও তাই অনুভব করি। কারণ মৃত্যুর অন্যতম লক্ষণ দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি। মৃত্যুর স্পর্শ গাঢ়তম হিমবৎ। কারণ

মৃত্যুর লক্ষণে দেহ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়।

"রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে সে স্পর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে আছে, কালরাত্রিরূপে মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়াছিলেন। তবে কি—? মৃত্যুর কায়া না হোক, রাত্রি মৃত্যুর ছায়া। মৃত্যু সম্ভবত দিনান্তে পৃথিবীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার ছায়া পড়ে পৃথিবীর উপর। সেই রাত্রি। আজ রাত্রিকে কাঁপিতে দেখিলাম। অন্যে দেখিয়াছে কি না জানি না, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। শব্দতরঙ্গ বহিয়া গেল। রাত্রি কম্পিত হইল। ছায়া কাঁপিল। ছায়া যখন কাঁপিল, তখন নিশ্চয় কায়াও কাঁপিয়াছে। জীবনের জয়ধ্বনিতে মৃত্যু কি কম্পিত হয় ?"

ভাবপ্রবণ রাধাকান্ত ভাবাবেগের এই বিচিত্র সান্ত্বনাকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত রাত্রি স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

কাশীর বউ বললেন, শোবে না ?

না। একটু চিন্তা করছি।

শোন—

কি ?

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, একটা কাজ করবে ?

কি ?

এখানে একটা মেয়েদের ইস্কুল আর একটা লাইব্রেরি কর। একা না হয়, দশজনে চাঁদা ক'রে কর।

গভীর রাত্রি তখন।

কাশীর বউ ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর পাশে গৌরীকান্ত ঘুমুচ্ছে।

রাধাকান্তের বিছানা স্বতন্ত্র। গৌরীকান্তের জন্মের পর থেকেই তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঘুমের অভিনয় করেছেন। কাশীর বউ মাথার শিয়রে ব'সে ছিলেন, বাতাস করছিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাও এসেছিল। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে উঠেছিল, সেই দেখেই কাশীর বউ পাখাখানি রেখে অত্যন্ত সন্তর্পিত ভাবে উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন। গৌরীকান্তও ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে তাঁকে খুঁজছিল ; তাঁকে না পেলে হয়তো উঠে পড়বে, ভয় পেয়ে কেঁদেও উঠতে পারে—এই আশঙ্কাতেই তিনি স্বামীর শিয়র ছেড়েছিলেন, নইলে হয়তো উঠতেন না। বিছানায় উঠে গিয়েও গৌরীর গায়ের উপর হাত রেখে ব'সে ছিলেন ; রাধাকান্তের ঘুম ভাঙে কি না লক্ষ্য করছিলেন। রাধাকান্ত ছিলেন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন। হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে মানুষ মগ্ন হয় যেমন ভাবে, তেমনই ভাবে নিস্পন্দ হয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। তার সঙ্গে অভিপ্রায়ও ছিল, এ ভাবনার কথা তিনি স্ত্রীকে জানতে দেবেন না। অমর্যাদার প্রচণ্ড

আঘাতে অভিমান তাঁর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত একটি প্রশ্নই তাঁর অন্তরলোকে ধ্যানের অনন্ত অসংখ্য প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "এ অপমানিত জীবনে প্রয়োজন কি?" "প্রয়োজন কি?" "প্রয়োজন কি?" প্রয়োজন কি?" সে প্রতিধ্বনির যেন শেষ নাই।

কয়েক দিন আগেও তিনি গৌরীকান্তকে বুকে ক'রে কাশীর বউকে বলেছিলেন, আমার জীবনের সমস্ত হবি আহুতি দিয়ে গৌরীকান্তের জীবন হোমাগ্নির মত প্রজ্বলিত করব আমি। কিন্তু আজ সে সংকল্পও ভেঙে গিয়েছে। জীবনে আর আশা নাই, ভরসা নাই—চারিদিক নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ভ'রে উঠেছে, তার যেন পারাপার নাই, এ যেন অনন্ত রাত্রি, দিগন্ত নাই, উদয়াচল নাই; পারাপারহীন তমসার মধ্যে তাঁর ইষ্টদেবতা পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছেন মাটির প্রতিমার মত। শুধু থরথর ক'রে অন্তরে অন্তরে কাঁপছেন তিনি।

তিনি উঠলেন।

অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুললেন। বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পথের উপর। একবার আকাশের দিকে চাইলেন। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

নিস্তব্ধ সুষুপ্ত সারা গাঁ।

নবগ্রামের মানুষ আজ প্রত্যাশার সুখস্বপ্ন দেখছে। কর্মজীবনের নূতন তোরণদ্বার মুক্ত হ'ল আজ। তারা স্বপ্ন দেখছে, ওই তোরণ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎপুরুষেরা চলবে রাজপথের দিকে—জীবনের মহানগরের দিকে। শুধু তিনি লাঞ্ছিত হয়ে গৃহত্যাগ ক'রে চলেছেন। হয়তো স্বর্ণও আজ বিনিদ্র হয়ে রাত্রিযাপন করছে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। মনকে সংযত করলেন। মনে মনে বললেন, তোমার কল্যাণ হোক গোপীচন্দ্র, তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর; তোমার আক্রোশ বিদ্বেষ বিদূরিত হোক। নবগ্রাম নবজীবন লাভ করুক তোমার তপস্যায়।

মনশ্চক্ষে তিনি স্পষ্ট দেখলেন নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মীকে। তিনি রাজসিংহাসনে বসেছেন, গোপীচন্দ্র তাঁকে চামর ঢুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল, একটা বিচিত্রশব্দ সর্পিল কিছু, সরীসৃপ-জাতীয় কিছু অত্যন্ত দ্রুত চ'লে আসছে। সামনের দিক থেকে আসছে। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন বাইসিক্ল আসছে। তিনি পাশের বাড়ির অন্ধকারে আত্মগোপন করলেন। সম্ভবত গোপীচন্দ্রের বাড়ির কেউ। তাঁর বাড়ির তো সকলে জেগে থাকবেই। তাদের ঘুমুলে চলবে কেন? আজ অনেক অতিথি তাঁর বাড়িতে। সভাশেষে সন্ধ্যায় বাঈনাচ হয়েছে। এখনও তার জের চলছে।

হয়তো কোন বরাত নিয়ে কেউ বাড়ি থেকে স্কুলডাঙার দিকে চলেছে।

অত্যন্ত দ্রুতপদে গাড়িখানা বেরিয়ে গেল।

মৃদুস্বরে গান গেয়ে চলেছে আরোহী।

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন তিনি। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, দেখলেন, দীর্ঘদেহ তরুণ চলেছে। কিশোর! এ তো কিশোর।

কিশোর জেগে রয়েছে এত রাত্রে? এত দ্রুতবেগে সে কোথায় চলেছে? বিস্মিত হলেন তিনি।

কিশোর চ'লে গেল, মিলিয়ে গেল, মিশে গেল যেন।

তিনি আবার চলতে শুরু করলেন।

কোথায় গেল কিশোর? পিছন ফিরে আর একবার দেখলেন। সম্ভবত সাত মাইল দূরবর্তী স্টেশনে গেল ট্রেন ধরতে।

তিনি চলেছেন হাঁটা-পথে। গ্রাম পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামদেবতার, একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ অট্টহাসের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ ক'রে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন, পথে পথে গ্রামকে পিছনে রেখে। ধূলিসমাকীর্ণ প্রান্তর। এ দিক দিয়ে মানুষ আজকাল বড় একটা হাঁটে না। সেই প্রান্তরের উপর তাঁর বলিষ্ঠ পায়ের ছাপ ফুটে রইল। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাবে কি? এদিকে আসে না কেউ। সে ভাবনা তিনি ভাবেন নি। তবে এটা ভেবেছিলেন যে, সকালে উঠে সকলেই তাঁর সন্ধানে ছুটবে কিশোর যে পথে গিয়েছে সেই পথে। এ পথে কেউ সন্ধান করবে না। এ পথে গ্রাম থেকে যায় সাধারণত শবদেহ নিয়ে শ্মশানে, বা দশ ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গাতীরের ঘাটের পাশের শ্মশানে। তিনি সেই পথে চললেন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে।

তেরো

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে কাশীর বউ নিজের বিছানা থেকেই খাটের দিকে তাকালেন। ঘরের কোণে হারিকেন জ্বলছিল ক্ষীণ শিখায়, তার উপরে একখানা বই খুলে সে দীপ্তিটুকুকেও ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, উপরের ছাদে প্রতিফলিত আলোর আভা ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অস্পষ্ট হ'লেও দেখা যায় সমস্ত কিছু। চমকে উঠলেন কাশীর বউ। খাটের বিছানা শূন্য; স্বামী নাই। তিনি চকিতে উঠে বসলেন। শূন্য বিছানা। দরজার দিকে তাকালেন, দরজা খোলা। মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন, কি ঘটেছে! পরক্ষণেই শিউরে উঠলেন, চরমতম দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা মনের ভিতর জেগে উঠল।

আত্মঘাতী? মনের মধ্যেও প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হতে গিয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীর বিছানার কাছে এসে বালিশ ওল্টালেন। কিছু নেই সেখানে; ছুটে গেলেন দেওয়ালের কাছে, তলোয়ারখানা তেমনিই ঝুলছে, কোণে বন্দুকটা যথাস্থানে রয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দরদালানে, তাকালেন ছাদের কড়ির দিকে; সেখান থেকে ছুটে গেলেন ছাদে; ছাদ থেকে নেমে দ্রুতপদে নেমে গেলেন নিচের তলায়; নিচের তলায় দরদালানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন; সামনেই দরদালানের দরজা খোলা, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে উঠানের ওদিকে বাড়ির সদর দরজাও খোলা হাঁ-হাঁ করছে। আর

কোন সন্দেহ রইল না তাঁর। আত্মঘাতী তিনি হন নি, নবগ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছেন। কাশীর বউ মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেলেন। দরদালানের দরজার বাজুটা ধ'রে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কতক্ষণ তা তাঁর খেয়াল ছিল না। নিচের তলার ওদিকের ঘর খুলে কে বেরিয়ে চমকে উঠে শঙ্কিত প্রশ্ন করলে, কে? কে ওখানে?

ষোড়শী। ষোড়শী বেরিয়েছে ঘর থেকে। সে আবার প্রশ্ন করলে, কে? মা?

কাশীর বউ এবার সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, হ্যাঁ।

কি মা? বাবা কেমন আছেন? এই রাত্রে? এখনও যে খানিকটা রাত্রি রয়েছে গো।

কাশীর বউ ভেবে পেলেন না কি উত্তর দেবেন! নীরবে সদর-দরজার ওপাশে বাইরের পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন।

ষোড়শী আবার প্রশ্ন করলে, মা? কি হ'ল মা?

কাশীর বউয়ের মুখে এসে গেল কথাটা, বললেন, বাবু কাশী গেলেন মা। ভোরের ট্রেন ধরবেন।

ষোড়শী এবার খোলা দরজার দিকে তাকালে। তারপর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, কাশী!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কাশীর বউ। বললেন, যে কষ্টের উপরে মানুষের হাতে নেই, সেই কষ্ট যখন মানুষ পায় তখন ভগবানের আশ্রয় ছাড়া মানুষ পরিত্রাণ কি ক'রে পাবে মা?

ষোড়শীও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, তা ভালই করেছেন মা। শুধু তো ভগবানই নয় মা, শ্বশুর-শাশুড়ী—এঁরাও মা-বাপের তুল্য, তাঁদের কাছে গিয়েও জুড়োবেন তিনি।

তারপর সে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্রুদ্ধ কঠিন স্বরে ব'লে উঠল, অমনি ক'রে মানুষটাকে যারা এতবড় অপমান করলে মা—

অগ্নিশিখার স্পর্শে বারুদের মত জ্বলে উঠে ফেটে পড়লেন কাশীর বউ। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্ন কঠিন স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, সে অপমান দেনার মত আমার স্বামী-পুত্রের ঘাড়ে বোঝার মত চেপে রইল। শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে বোঝা সুদ চেপে আরও ভারী হোক, বাড়ুক। শোধ যদি করতে না পারে, তবে তারই চাপে তাদের মৃত্যু হোক। ভগবানের কাছে বিচার আমি চাইব না।

কাশীর বউয়ের চোখের তারা দুটি পিঙ্গল, অন্ধকারে তাঁর চোখের পিঙ্গলতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে সত্য সত্যই জ্বলে উঠল।

অকস্মাৎ যে কথাটা তাঁর মুখে এসে গিয়েছিল, যে কথাটা তিনি ষোড়শীকে বলেছিলেন, সে কথাটা যেন ভগবান তাঁকে যুগিয়ে দিয়েছেন ব'লে কাশীর বউয়ের মনে হ'ল। মিথ্যা

তাঁর বলা হয় নি, অথচ মর্মান্তিক লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হয়ে তাঁর গৃহত্যাগের লজ্জা, সে লজ্জাও ঢাকা পড়বে। কাশী তাঁর বাপের ঋড়ি, লজ্জায় বেদনায় পীড়িত হয়ে রাধাকান্ত কাশী গিয়েছেন, শ্বশুর-বাড়িতে উঠেছেন। অপমানের ভয়ে গেরুয়া প'রে ঘর ছেড়ে' পালানোর অপবাদ থেকে রক্ষা পাবেন রাধাকান্ত, এবং কাশীর বউ নিজেও রক্ষা পাবেন স্বামী-পরিত্যক্তার লজ্জা থেকে। মর্মান্তিক বেদনার মধ্যেও তিনি লোকলজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ পেয়ে বুকে খানিকটা বল পেলেন। ভোরবেলা হতেই তিনি বাইরের বাড়িতে গিয়ে চাকর বিষ্টুকে ডেকে তুলে বললেন, বাবা বিষ্টু, উনি কাল রাত্রে কাশী গেছেন। ফিরতে তাঁর কিছুদিন দেরি হবে। বাবুরা সব আসবেন, চা ক'রে দিয়ো তাঁদের, আর কথাটা ব'লে দিয়ো, হঠাৎ মনস্থির করলেন, বললেন—এই রাত্রেই যাব আমি। তোমাদের কাউকে পর্যন্ত ডাকলেন না, ডাকতে দিলেন না।

বিষ্টু অবাক হয়ে গেল। শুধু বললে, একা গেলেন ইষ্টিশান? হেঁটে গেলেন তিন কোশ পথ?

তাই গেলেন বাবা। বললেন—আমি বিশ্বনাথের পায়ে জুড়োতে যাচ্ছি,—আমি হেঁটেই যাব, এক কাপড়েই যাব, সেখানে গেলে তো অভাব কিছুর হবে না; শ্বশুরমশায় আছেন। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন। বিষ্টুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন উদ্যত হয়ে উঠেছে। দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মুহূর্তে অভিমান জেগে উঠল স্বামীর উপর। মনে মনে বললেন, এ কি অবস্থায় ফেলে গেলে আমাকে? কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। রুদ্ধ আবেগ সংযমের বাঁধ ভেঙে তাঁকে অধীর ক'রে তুললে, আর কোন কথা বলতে পারলেন না। দ্রুতপদে বাড়ি ফিরে এলেন, যেন পালিয়ে এলেন বাইরের পৃথিবীর সম্মুখ থেকে। বাড়ি ফিরে উপরে উঠে গিয়ে স্বামীর বিছানার উপর মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়লেন। বিছানায় এখনও তাঁর গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

গৌরীকান্ত বিছানায় জেগে উঠেছিল। সে ডাকলে, মা!

কাশীর বউ ঘাড় নাড়লেন, না—না।

সম্ভবত বললেন—ডাকিস নে, এখন ডাকিস নে।

* * *

দশ দিন পরে পত্র পেলেন কাশীর বউ। রাধাকান্ত দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। লিখেছেন, "এ ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। নবগ্রামে বাস করিয়া এই অপমানিত জীবন বহন করিবার মত শক্তি বা ধৈর্য আমার নাই। আমি কাপুরুষ, আমি দুর্বল, আমি অযোগ্য, আমি অক্ষম। তবুও পরমপিতার অসীম দয়াগুণে আত্মঘাতী হওয়ার মতিচ্ছন্নতা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসিয়া গঙ্গাতীরে 'এক-পা'-বাবার আশ্রমে কয়েকদিন বাস করিলাম। তাঁহার কৃপায় সান্ত্বনা কতকটা পাইয়াছি। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন।"

'এক-পা'-বাবাকে কাশীর বউও জানেন। এখান হ'তে পনেরো-ষোল ক্রোশ উত্তর-পূর্বে

গঙ্গার তটভূমিতে তাঁর আশ্রম। এ অঞ্চলে 'এক-পা' বিখ্যাত সন্ন্যাসী। একটি পা অকর্মণ্য ব'লে তাঁকে লোকে বলে—'এক-পা'-বাবা। প্রবাদ—দীর্ঘকাল 'এক-পদ' হয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরারাধনা করার ফলে একটি পা তাঁর পাকিয়ে গেছে। কাঠের একটা ঠেঙো বগলে লাগিয়ে তিনি চলাফেরা করেন। পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু হাসেন, কোনও জবাব দেন না। পূর্বে পূর্বে তিনি বৎসরে এক-আধবার নবগ্রামের মহাপীঠে তীর্থভ্রমণে আসতেন। রাধাকান্তের সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগের জন্য তাঁর বাড়িতে আতিথ্যও গ্রহণ করতেন। কাশীর বউকে তিনি বড় স্নেহ করতেন। তার হেতু, কাশীর বউ সুন্দর হিন্দী বলেন এবং ছাতু-ভরা রুটি তৈরী করেন চমৎকার। পশ্চিম-প্রদেশের লোক কাশীর বউ জানেন, সন্ন্যাসীর বাস ছিল লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর কাছাকাছি—তাঁর উর্দু ভাষার বুলি শুনে তিনি অনুমান করেছিলেন। ইদানীং প্রায় আট-দশ বৎসর তিনি আর নবগ্রামে আসেন নাই। বয়সের জন্য আসতে পারেন না। এ অঞ্চলে তাঁর বয়স সম্পর্কে অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত। লোকে বলে—তাঁর বয়স আড়াই শো। যাঁরা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও বলেন—নব্বুই-পঁচানব্বুই হবে। বিচিত্র মানুষ 'এক-পা-বাবা। রাধাকান্ত কতবার তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, আমার এ দুর্ভাগ্যের কবে অন্ত হবে বলতে পারেন বাবা? 'এক-পা'-বাবা উত্তর দিয়েছেন, উ হামি জানে না বাবা। সেরেফ্ একটি বাত হামি জানে। দিন আসে, উ যায়; ফির দিন আসে বাবা, উসকে সাথ সব কুছ বদল যায়। বাস্। হেসে বলতেন, হামি বাবা দিল্লীকে বাদ্শাকে দেখিয়েসি, শাহেনশা বাদশা দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। বিচিত্র হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠত, বলতেন, বাদশাকে আম-দরবারে তখ্ত-তাউসে বসতে দেখেছি। শেষ বাদশা। আবার দেখেছি বাবা তাঁর দুই ছেলেকে ফিরিংগী ইংরেজ খুন ক'রে দিল্লীর রাস্তায় দু দিন ধ'রে রেখে দিলে। তাদের সৎকার করতে দিলে না। নিজের চোখে দেখেছি বাবা। তারপর শুনেছি, বাদশাকে ধ'রে পাঠিয়ে দিলে রেঙ্গুন। বাবা, মুসলমানের বাদশাহী গেল। চোখে দেখলাম, আংরেজ ভারতকে রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে কলকাতা চালান করলে, তাও চোখে দেখলাম। ওহিসে আমার মালুম হয়ে গিয়েসে বাবা কি, দিন যাতা হ্যায়, উসকে সাথ সব কুছ বদল যাতা হ্যায়। ব্যাস্। চুপ ক'রে ধৈর্য ধ'রে থাক, বদলে সবই যাবে। তবে তোমার ভাগ্য ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা আমি জানি না।

রাধাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন এ কথা শুনে। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, তা হ'লে বাবা, এ সংসারে পূর্বজন্মের কর্মফলের কি খণ্ডন নাই? ভগবানকে ভজনা ক'রে, ধর্মকে আশ্রয় ক'রে থেকে মানুষের ইহজন্মে কি কোন ফল নাই?

'এক-পা'-বাবা হেসে বলেছিলেন, তুই যে বাবা এমন ফুলবাগান করেছিস, ওতে কোন ফল ফলে বাবা? ভগবানকে ভজনা, ধরমকে আশ্রয় ও দুটোই হ'ল ফুলবাগিচার গাছ। ওতে ফল হয় না। ওর রঙের বাহারে, খুসবয়ের আরামে খুশি হওয়াটাই সব। আরও একটু আছে, মধু আছে বাবা। সে মধু মৌমাছিতে সংগ্রহ ক'রে চাক বাঁধে, তখন চাক ভেঙে এনে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু গুরুগিরি তো তুই করতে পারবি না বাবা।

রাধাকান্ত তবুও ক্ষান্ত হন নাই, প্রশ্ন করেছিলেন, ফুলের গাছ ফল দেয় না বাবা, কিন্তু বীজ তো তার আছে!

আছে বাবা, আছে। আছে, জরুর আছে। এইবার তুই ঠিক ধরেছিস। ফুল গন্ধ দেয়, কিন্তু বীজ রেখে যায়। আঁটির মধ্যে বীজ, ফুল থেকে হয় পাপড়ির গোড়ায় বীজ। সে বীজ তোর থাকবে বাবা। তোর চরিত্র—তোর পিপাসা পাবে তোর লেড়কা।

এমনি ধারার অনেক আলোচনা তাঁর সঙ্গে হ'ত। বড় ভাল লাগত কাশীর বউয়ের। তাঁর উপর 'এক-পা'-বাবার স্নেহ গভীর। তিনি বলতেন, বেটিয়া, আগে এখানে আসতাম শুধু চণ্ডীমায়ীকে দর্শন করতে। এখন আরও একটা টান বেড়েছে মা। সন্ন্যাসী হ'লে কি হবে, মানুষ তো। তোর হাতের ওই যে সত্তু ভরা রোটি—ওই খাবার জন্তেও আসি। যখনই মনে করি, চণ্ডীমায়ীর দরবারে যাব, তখনই মনে পড়ে বেটিয়ার হাতের পাকানো রোটি। আর কাশীর ভাষা-বুলি সে বড় মিঠে লাগে মা। বাঙ্গালী বুলি মিঠে আছে মা, তবে সে কি হামার দেশের বুলির মত মিঠি!

ব'লেই বলতেন, গোস্‌সা করিস নে যেন মায়ী।

কাশীর বউ একবার তাঁকে বলেছিলেন, বাবা, আমি কখনও আপনাকে অদৃষ্ট ফিরিয়ে দেবার জন্তে বলি নে। কিন্তু আমার স্বামীর মনের দুঃখ মধ্যে মধ্যে অসহ্য হয়ে ওঠে বাবা। যত মন্দ হোক, আমাকে যদি ব'লে যান—

'এক-পা'-বাবা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বেটী, আমার কথা বিশ্বাস করবি?

আপনাকে কখনও অবিশ্বাস করেছি বাবা?

করিস বইকি মা। আমি যা জানি, যা বুঝি, তা তো বলি, বার বার বলেছি। কিন্তু তোরা তো মনে করিস, আমি জানি, বলি নে। আমি অদৃষ্ট গুনতে জানি না, আমি অদৃষ্ট ফেরাতেও পারি না। দেবতা বল, ভগবান বল, কারও দেখা পাই নি। 'ভাল হোক' ব'লে আশীর্বাদ করলেই ভাল হয় না মা। বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, সেও আমার এতটুকু। বেদ পড়ি নি, শাস্ত্র পড়ি নি, পড়বার মধ্যে পড়েছি তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস। আর গুরুর মুখে শুনেছি জ্ঞেয়ান, উপদেশ। বাস্‌। বেটী, ঝুট বাত বলি না। আমার এই যে পাঁও, এইটে যে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—লোকে বলে, এক পাঁও পর খাড়া হয়ে আমি ভগোয়ানের তপস্যা করেছি, তাইতে এটার এমন দশা। আমি হাসি, হাঁ বলি না, না বলি না; বলার রুচি নাই, তাই বলি না। ব'লে ফ্যাসাদ বাড়ে, তাই বলি না; তোর কাছে বলছি মা, তপস্যা আমি করি নাই; ওই তোর স্বামীর মতই মনের আগুনে পুড়ছিলাম, হঠাৎ একদিন—

বলতে গিয়ে থেমে পড়েছিলেন 'এক-পা'-বাবা। কিছুক্ষণ পর হেসে বলেছিলেন, বেটী, সে কথা সংসার ত্যাগ ক'রে গুরুকে বলেছিলাম, আর কাউকে বলি নি। গুরু বলতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—বেটা, তোর দুঃখ তোর থাক্‌, কাউকে বলিস না কখনও। মানুষকে বললেই ভগবানকে বলবার জন্তে তোর বাসনা তোলপাড় করবে। ভগবান কারও দুঃখ ঘোচান না, কারও বোঝা তিনি মাথায় তোলেন না। তিনি মনের মধ্যে আসেন,

তাতেই দুঃখ ঘুচে যায়, তাতেই শান্তি পায় মনে। দুঃখ ঘোচাতে এস—ব'লে ডাকলে তিনি আসেন না। দুঃখ ভুললে তিনি আসেন। তোর স্বামী তাকে দুঃখ ঘোচাবার জন্তে ডাকে, তাই সেও আসে না, দুঃখও ঘোচে না। ও দুঃখ পাবে, অনেক দুঃখ পাবে। ওর ধরম আছে, করম নাই। সংসারের দুঃখ যদি ঘোচাতে চায়, তবে করম করতে বল্।

দীর্ঘকাল হয়ে গেল—আট-দশ বৎসর 'এক-পা'-বাবা এদিকে আসেন নাই।

রাধাকান্ত পথে বেরিয়ে স্টেশনের পথ ছেড়ে হাঁটা-পথ ধরেছিলেন। স্টেশনের পথে গ্রামের মুখে ইস্কুলডাঙা; সেখানে সেদিন রাত্রে তখন সমারোহ চলছিল। বাঈনাচ হচ্ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ জনতার সৃষ্টি ক'রে সরকারী পাকা রাস্তার উপর পর্যন্ত আসর জমিয়ে ব'সে ছিল। আসরে জলছিল গ্যাসের আলো অর্থাৎ কারবাইডের আলো। রাধাকান্ত হাঁটা-পথে পূর্বমুখে চলতে শুরু করেছিলেন, কোথায় যাবেন স্থির ছিল না। শুধু লজ্জায় ক্ষোভে নবগ্রাম ত্যাগ ক'রেই চলেছিলেন, কোথায় শান্তি, কোথায় প্রতিকার—এ প্রশ্নও মনে ওঠে নি। কিছু দূর যাবার পর মনে প্রশ্নটা উঠল। উদয়দিগন্তে তখন আলোর আভাস জাগতেও শুরু করেছে। মনে পড়ল 'এক-পা'-বাবার আশ্রমের কথা। এই দিকে—এই তাঁর আশ্রমের পথ। দিনে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে, রাত্রে আবার হাঁটতে আরম্ভ ক'রে ভোরবেলা তাঁর আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন।

রাধাকান্ত লিখেছেন, "বাবা আমার মুখ দেখিয়াই অন্তর্যামীর মত বলিলেন—'কি বাবা, পূর্ণ হয়ে গেল দুঃখের বোঝা? ভার বইতে আর পারলি না? পালিয়ে এলি?' আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলাম। তিনি বলিলেন—'দুঃখের বোঝা মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিস, এইবার তাঁকে পাবি বুকের মধ্যে, সুখও পাবি সঙ্গে সঙ্গে।' আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। তাঁহার চোখ দুইটা প্রখর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'বেটা, তোর অপমানের দুঃখ বুঝতে আমি পারছি। তোকে আজ আমার শিষ্য ক'রে নিলাম, তাই তোকে বলি, তোর চেয়ে অনেক বেশি অপমান আমি সহ্য করেছি। শুন্ রে বেটা, আমি ছিলাম রাজার ঘরের ছেলে। ছোট রাজ্য অবিশ্যি। দিল্লীর নগিজে ছিল আমার বাদশাহী সনদের জায়গীর। ফিরিঙ্গী আংরেজ আমার বাবার জায়গীর নিলে কেড়ে। দোষ কি? না, বাবা গুলি চালিয়েছিলেন এক বেয়াদপ আংরেজ কাপ্তেনের উপর। শিকার করিতে গিয়ে উহ্ কাপ্তেন বাবাকে খারাপ গালি দিয়েছিল। জায়গীর গেল, বাবা অপমান সইতে না পেরে মারা গেলেন; আমি গেলাম আংরেজ দপ্তরে আমার তনখার জন্তে। সে যে বেইজ্জতি করেছিল আমাকে, সে মনে হ'লে রাধাকান্ত, আজও আমার বুকে আগ্ জ্ব'লে যায়। তোর মত আমি ভগোয়ানকে ডাকতে শুরু করলাম, বললাম, হে ভগোয়ান, তুমি তো পাপের দমন কর, তুমি তো আসবে একদিন বিলকুল বিধর্মী লোককে কোতল করবার জন্তে, ধরমকে রাজ প্রতিষ্ঠার জন্তে, কিন্তু ততদিন কি আমি বাঁচব। তুমি এস। তুমি এস। গনৎকার বললে—দিন এসেছে। শও বরিষ পূর্ণ হয়ে গেল কোম্পানির রাজ্যের। ওদের অত্যাচার উঠেছে

চরমে। দাঁতে টোটা কাটিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবারই ধরম নাশ করতে চাইছে। তোমরা সব উঠে পড়ে লেগে যাও। বাস্, তিনিও দেখা দেবেন। আরম্ভ হ'ল মিউটিনি। রাধাকান্ত, ওহি মিউটিনিতে আমার পায়ে লাগল গুলি। প'ড়ে রইলাম জখম হয়ে। ওদিকে আংরেজ মিউটিনি দমিয়ে দিলে। খুঁজতে লাগল আমাদের মত লোককে, ধ'রে ধ'রে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। জখম পা নিয়ে পালিয়ে গেলাম, লুকিয়ে রইলাম জঙ্গলে, জঙ্গল থেকে পাহাড়, সেখান থেকে আর একস্থানে। পা উঠল ফুলে, প্রচণ্ড জ্বর। সেই অবস্থায় দেখা হ'ল গুরুর সঙ্গে। তিনিই আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করলেন। তিন মাস পরে পায়ের ঘা শুকাল, সঙ্গে সঙ্গে পা-খানাও শুকিয়ে গেল। আমার গুরুর পায়ে ধ'রে বললাম, বল, এর প্রতিকার কি নাই?' ঠিক আমারই মতই তিনিও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, 'এক-পা'-বাবা আমাকে তাহাই বলিলেন। বলিলেন—'ভবিষ্যতে কবে কি ঘটবে, তা আমি জানি না। তবে ঘটবে। দুনিয়ায় যা ঘটে, তা কখনও বৃথা যায় না। আজ যা ঘ'টে গেল, মনে হ'ল, এ কাণ্ডের এই খতম হয়ে গেল। চ'লে গেল কত বৎসর। মানুষ ভুলে গেল সে ঘটনার কথা। ভগবানকে কত দোষ দিল; এমন সময় হঠাৎ একদিন ঘটে ওই ঘটনার জের টেনে একটি ঘটনা, সুদে আসলে শোধ তুলে কারবার নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলে।' 'এক-পা'-বাবা বলিলেন—'এইটুকু আমি তোকে বলতে পারি, তাই বললাম। তুই বেটা সংসার থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিস আমার মত, আমার কথা শুন্, সংসারে আর ফিরিস নে, ভগবানকে ডাক্, দুঃখের বোঝা ফেলে দে, সুখ পাবি, শান্তি পাবি। বিশ্বাস রাখ্, যা ঘটল তা হারাল না, কারবার খতম হ'ল না, এর জের চলবে, যে টানবার সে টানবে, তার হুকুমে টেনে চলবে দুনিয়া।' তুমি আমাকে মার্জনা করিও। গৌরীকান্তকে বলিও আমার দুঃখের কথা, অপমানের কথা। এখন আর আমার কোন লজ্জা নাই। আমি তোমাকে যেমন পত্র দিলাম, তেমনই পত্র দিলাম সন্তোষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ। আর জানাইলাম স্বর্ণকে। বৈষয়িক প্রয়োজনে জানাইলাম। জানি, আমি যে লজ্জাকে পিছনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলাম, তাহার গ্লানি তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কি করিবে? আমি অক্ষম, আমি কাপুরুষ, আমি পীড়িত, আমি ক্লান্ত। দুর্যোধন যে লজ্জায় দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়াছিল, আমি সেই লজ্জায় 'এক-পা'-বাবার আশ্রমে আত্মগোপন করিলাম। এখান হইতেও বনগ্রামের ধিক্কার-কলরব আমি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু দুর্যোধনের মত মৃত্যুপণে যুদ্ধের সংকল্প করিয়া আত্মপ্রকাশের সাহস ও শক্তি আমার নাই। আমি মরিব, জলতলেই একদা আমার মৃত্যু হইবে, জলচরেরাই আমার দেহ ভক্ষণ করিয়া সৎকার করিবে।"

* * *

নিঃশব্দে কাঁদলেন কাশীর বউ। নিশ্বাসে প্রশ্বাসেও কোন আবেগ সঞ্চারিত হ'ল না। শুধু চোখের জলের দুটি ধারা নেমে এল। গাল বেয়ে নেমে এসে চিবুকের প্রান্ত থেকে টপটপ করে মাটিতে ঝ'রে পড়ল।

ষোড়শী ঘরে ঢুকল, তার মুখখানাও থমথম করছে। সেও যেন কিছু বলতে এসেছিল, কিন্তু কাশীর বউয়ের মুখ দেখে সে ঈষৎ চকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল, মুখের কথা মুখেই আটক রইল। পর-মুহূর্তেই তার দৃষ্টি পড়ল হাতের চিঠির উপর। সসঙ্কোচে সে আবার প্রশ্ন করলে, বাবার চিঠি মা ?

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল কাশীর বউয়ের মুখে, ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

ষোড়শী বললে, চোখ মুছুন মা। এমন করে কাঁদতে নাই।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাশীর বউ চোখ মুছলেন।

ষোড়শী সাহস পেয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখেছেন বাবা ? কবে আসবেন ? দেহ ভাল আছে ?

উত্তর দিতে গিয়ে চোখ বুঝলেন কাশীর বউ। সম্ভবত ষোড়শীর মুখের দিকে চেয়ে সত্য কথা বলতে লজ্জা পেলেন তিনি, বললেন, তিনি ফিরবেন না মা।

ফিরবেন না ?—চমকে উঠে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল ষোড়শী।

চীৎকার করিস না ষোড়শী। মনের দুঃখে, লজ্জায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন মা।

সন্ন্যাসী !

হ্যাঁ, সেদিন রাত্রে—। কথা বলতে গিয়ে আবার তাঁর চোখ থেকে নেমে এল জলের ধারা। কথা অসমাপ্ত রেখে স্তব্ধ হয়ে আত্মসম্বরণ ক'রে আবার আরম্ভ করলেন, আবার নামল চোখের জল। বার বার থেমে আত্মসম্বরণ ক'রে ষোড়শীকে সব কথা প্রকাশ ক'রে বললেন। সমস্ত নবগ্রামের মধ্যে এই সর্বজননিন্দিতা মেয়েটি ছাড়া আপনার জন আর কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না। পরিশেষে বললেন, আমি কি করব, তা যে বুঝতে পারছি না ষোড়শী।

ষোড়শী বললে, তাই তো মা, এই নির্বান্ধব পুরী, ওই শিশু ছেলেকে নিয়ে আপনি বাস করবেন কি ক'রে ?

কিন্তু বাস যে আমাকে করতেই হবে।

না মা, আপনি বাপের বাড়ি চলুন। কাশী চলুন মা, আমি আপনার সঙ্গে যাব, এক মুঠো ভাত আর দুখানা কাপড় আমাকে বছরে দেবেন, মাইনে আমি চাইব না। আমিও আর এখানে থাকতে পারছি না মা।

জলমগ্ন মানুষ কোন রকমে জলের উপর মাথা তুলে উঠে যে ভাবে নিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ে, সেই ভাবে ষোড়শী মাথা নেড়ে উঠল।

কাশীর বউ বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, কেন ষোড়শী ? এ কথা বলছিস কেন ?

সেই কথা বলতেই এসেছিলাম মা ; কিন্তু আপনার মুখ দেখে, চোখে জল দেখে বলতে পারি নি। আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে মা। আজ সাতদিন বাবা চ'লে গিয়েছেন, সাতদিন পথে বার হওয়া দায় হয়ে উঠেছে। যারা একবার আমার পিছনে লেগেছিল, পথ আগলেছিল তারা আবার উঠে-প'ড়ে লেগেছে। তা ছাড়া আরও আছে মা। গাঁয়ে থিয়েটারের দল

হয়েছে, ময়রা-বাড়িতে আড্ডা তার, ও-পাড়ার উকবাবু এ-পাড়ার মঙ্গলবাবু—সে এক দল মা।
ষোড়শী শিউরে উঠল।

একটু পর সে আবার বললে—এবার চোখ দুটো তার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললে, সতী আমি ছিলাম না মা। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলাম, গাঁয়ে স্বজাতের ছোঁড়ারাই আমাকে নষ্ট করেছিল; তারপর মা, একবার ও দোষ ঘটলে নিস্তার থাকে না, আমিও পাই নি মা। এই গাঁয়ের নষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরা আমার খোঁজ শুরু করলে। ভোরবেলা না হতে বন্দুক ঘাড়ে গাঁয়ে গিয়ে পুকুরের পাড়ে পাড়ে, পাড়ার পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরতে লাগল। গাঁয়ের লোকে, জমিদারবাবু, ব্রাহ্মণের ছেলে এদের কিছু বলতে পারলে না, লাগল আমার ওপর। বলে—ওই পাপকে দূর কর, তা হ'লেই গাঁ ঠাণ্ডা হবে। কথা সত্য মা, পচা জিনিস ঘরে রাখ, মাছি জুটবে, শেষ-মেষ পচা জিনিসের গায়ের পোকায় ঘর ছেয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন আমার বড় রাগ হয়েছিল, মনের দুঃখে বেরিয়েছিলাম মা যে, গাঁ থেকে চ'লে যাব, বর্ধমান। শুনেছি, সেখানে রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে যারা খায়, তাদের বসত আছে, পাড়া আছে। এই গাঁয়েই মা খেমটা-নাচ দেখেছি, যারা নাচতে আসত তাদের বেশভূষা দেখেছি, গহনা দেখেছি, বাবু-ভাইদের কাঙালপনা ভরা দৃষ্টি দেখেছি, শুনেছি মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে তাদের চরণ ধ'রে বাবুরা গড়াগড়ি যান। মনের দুঃখে, মনের ঘেন্নায় তাই ভেবেছিলাম, যাব, তাই যাব, এ গাঁয়ের বাবুরা যদি যায়, চরণে ধরলে—

কথাটা আর শেষ করলে না ষোড়শী, মুখে তার আটকে গেল। সে বলতে চেয়েছিল বোধ হয়—চরণে ধরলে মুখে লাথি মারব। কিন্তু অকস্মাৎ কাশীর বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে প'ড়ে গেল, কার সামনে সে এ সব কথা বলছে। সে থেমে গেল, উত্তেজনাবশে এক নিশ্বাসে এত কথা একসঙ্গে ব'লে হাঁপাতে লাগল, চোখ তার জ্বালা করছে, জল আসছে।

কাশীর বউ বললেন, আমি সব জানি ষোড়শী। তিনি আমাকে সব বলেছিলেন।

কেঁদে ফেললে ষোড়শী, বললে, ওই কিশোরবাবু। আঃ, মা, ওঁর সঙ্গে সেদিন যদি দেখা না হ'ত, তবে যা হবার আমার কপালে তাই ঘ'টে যেত। পথে অমূল্যবাবু, ভূপতিবাবু, ওই স্বর্ণবাবুর ভাগ্নেরা মা, পথ আগলে আমাকে জবরদস্তি বাগান-বাড়িতে আটক করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় এলেন কিশোরবাবু। দেখে শুনে আগুনের মত জ্ব'লে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আপনার বাড়িতে ঠাঁই ক'রে দিলেন। বাবার ভয়ে এতদিন কেউ আর বিরক্ত করে নাই। আমার নিজের, মা, আপনার চরণ পেয়ে আমি শান্তি পেয়েছিলাম, আমার মন জুড়িয়েছিল, আপনার ছেলেটিকে বুকে ক'রে আমার বুক জুড়িয়েছিল। কিন্তু বাবা গিয়েছেন আজ সাত দিন, আজ আর রক্ষক নাই আমার, কিশোর-বাবু গাঁয়ে নাই, আবার আমার পিছনে লেগেছে মা। এবার শুধু অমূল্যবাবু ভূপতিবাবু নয় মা, থিয়েটার-দলের মঙ্গলবাবু, উকবাবু, বেনেপাড়ার ছোকরারা—ওই যশোদা দত্ত, কাশী চন্দ--

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ষোড়শীর। আবার সে হাঁপাতে লাগল। একটু থেমে সে কাশীর বউয়ের পা দুটো চেপে ধ'রে বললে, চলুন মা, কাশী চলুন, তা হ'লে আমি হয়তো বাঁচব।

আপনি—আপনিও বাঁচবেন মা। এখানে আপনিও থাকতে পারবেন না। ওরা সব জানে মা, বলাবলি করে, আমাকে তামাশা ক'রে বলে কি—তোর বাবা পালিয়েছে? সন্ন্যাসী হয়েছে, না রে?

ওরা জানে?—চমকে উঠলেন কাশীর বউ।

জানে মা, ওই কথা বলে আমাকে। পাষণ্ড মা, পিচাশ সব। এত বড় মানুষটার এই অপমান হ'ল, বিবাগী হলেন তিনি, আর লোকে বলে মা—

কি বলে ষোড়শী?

বলে মা—। ওই বেনেপাড়ার মণি দত্ত, মজলিস ক'রে পাঁচজনকে নিয়ে হা-হা ক'রে হেসে বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হবে না? এক বংশের সাজা হ'ল, এখনও তিন বংশ বাকি। তার মধ্যে এক বংশের হতে আরম্ভ হয়েছে। দেখব, আমরা দু চোখ মেলে দেখব আর হা-হা ক'রে হাসব।

নবগ্রামের গন্ধবণিকেরা দেশবিখ্যাত; তারাই এখানে বসিয়েছিল ব্রাহ্মণদের। ওই সরকারবাবুদের পূর্বপুরুষেরা এখানে আসত গুড় বেচতে। দিন কারুর সমানে যায় না। গন্ধবণিকদের অবস্থা খারাপ হ'ল, বামুনেরা উঠল। কিন্তু মানীর মান তা ব'লে যায় না। সেই মানী গন্ধবণিকদের প্রধান ব্যক্তির অপমান সদর-রাস্তার ওপর, সে ধর্ম সহ্য করবে কেন?

শিউরে উঠলেন কাশীর বউ। মনে প'ড়ে গেল তাঁর। অনেক—অনেক দিন পূর্বের ঘটনা। এ বাড়িতে তিনি আসবার অনেক দিন আগে, তাঁর স্বামী রাধাকান্তের জন্মেরও পূর্বে। তাঁর শ্বশুর, স্বর্ণবাবুর বাপ, সরকার-বাড়ির দুজন প্রধান গরমের দিন স্বর্ণবাবুদের কাছারি-বাড়ির সামনে সদর রাস্তার উপর চেয়ার পেতে মজলিস ক'রে ব'সে ছিলেন। গল্পে আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল ঠাঁইটা। হঠাৎ একটি লোক পাশ দিয়ে যাবার সময় ঈষৎ নত হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে পার হয়ে গেল। বাবুরা তখন হাসছিলেন কোন রস-রসিকতায় উচ্ছল হয়ে। হঠাৎ একজন হাসি বন্ধ ক'রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কে? কে গেল?

মুহূর্তে সকলেই সোজা হয়ে বসলেন, গম্ভীর স্তব্ধ হয়ে গেল মজলিসটা।

বৈকুণ্ঠ দত্ত। গন্ধবণিকদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠ দত্ত দাম্ভিক, সে আজও সেই পূর্বকালের সমৃদ্ধির অহঙ্কারে অহংকৃত। মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, বৈকুণ্ঠ দত্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের, ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ পরিবারের অসম্মান করেছে। আজ সে গ্রামের সর্ব-প্রধান ব্যক্তি, জমিদার-ব্রাহ্মণদের অসম্মান না হ'লেও ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে চ'লে গেল।

স্বর্ণবাবুর বাপ সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীকে ডেকে বলেছিলেন, ডাক্, ওই লোকটাকে ডাক্। না আসে গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে আসবি।

বৈকুণ্ঠ দত্ত নিজেই এসেছিল। সে বুঝতে পারে নি, কি অপরাধ হয়েছে। বাবুরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি কি রাজার ছেলে বৈকুণ্ঠ?

আজ্ঞে?

রাজার ছেলেরা প্রণাম জানে না। দেবতাকে প্রণাম করতে হ'লেও নমস্কার করে। বলে—আমি যে রাজার ছেলে, প্রণাম নাহি জানি, কেমন ক'রে করব প্রণাম দেখিয়ে দাও হে তুমি। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ নই—জমিদার, আমরা নিজে প্রণাম ক'রে দেখাই কি ক'রে বল? সামনে কোন দেবতা থাকলেও না হয় প্রণাম ক'রে দেখাতাম। এখন তোমাকেই প্রণাম করিয়ে শিখিয়ে দিই কেমন ক'রে প্রণাম করতে হয়। ওহে ঠাকুর, দাও তো হে ওর ঘাড় ধ'রে মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে আর কানে ধ'রে ব'লে দাও—ব্রাহ্মণ জমিদারকে এমনি ক'রে প্রণাম করতে হয়।

দত্তকর্তার কপালটা ঠুকে দিয়েছিল স্বর্ণবাবুদের পাচক ব্রাহ্মণ। রাস্তার বালির মধ্যে ছিল কাচের টুকরো। টুকরোটা কপালে বিঁধে গিয়েছিল। সে ক্ষতের দাগ আমরণ বহন ক'রে গিয়েছে বৈকুণ্ঠ দত্ত।

এ কথা সেই কথা।

শিউরে উঠলেন কাশীর বউ।

ষোড়শী বললে, আপনি তো শুধু শিউরে উঠলেন মা, আমি থর-থর ক'রে কেঁপে উঠেছিলাম। কেষ্ট চন্দ মশায়ের দোকানে জিনিস নিচ্ছিলাম, চন্দ মশায়ের দোকানের সামনে ওনার ভাইপোর দোকান,—দোকান তো নাই, উঠে গিয়েছে, সেখানে বণিক মশায়দের ছেলেছোকরাদের আড্ডা; সেই আড্ডায়, মা, পাড়া গোল ক'রে সেই সব কথা বলে মা। পোস্তদানার ঠোঙাটা হাত কেঁপে প'ড়ে গেল মেঝেময় ছড়িয়ে। চন্দ মশায় আমার মুখের দিকে চেয়ে বকলে, বললে—ফেললে? তারপরেতে উঠে বাইরে গিয়ে ছোকরাদের বকলে, বললে—এ সব কথা কি? তা ছোকরারা, মা, আলান সাপের ডেঁকার মত ফোঁস ক'রে উঠল।

বাধা দিয়ে কাশীর বউ বললেন, থাক্ ওসব কথা ষোড়শী।

ষোড়শী আবার মাথা নেড়ে উঠল—জলমগ্ন মানুষ কোন রকমে জলের উপরে মাথা তুলে নিশ্বাস নিতে গিয়ে যে ভাবে মাথা নেড়ে ওঠে, সেই ভাবে বললে, না না মা, হেলা ক'রে অগ্রাহ্যি ক'রো না মা। আমার কথা শোন মা তুমি, এখানে তুমি থেকো না। থাকতে পারবে না তুমি; তুমি মেয়েছেলে, তোমার এই শিশু ছেলে, তুমি চল এখান থেকে।

কাশীর বউ এবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে মৃদু ধীর স্বরে বললেন, না। এখান ছেড়ে আমি যাব না ষোড়শী। তিনি চ'লে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যদি চ'লে যাই, তবে আর কখনও এ ভিটেতে ফিরতে পারবে না গৌরীকান্ত।

কিন্তু—

কিন্তু কিছু নেই মা এর মধ্যে। আমি থাকব। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে এ বাড়ির মান-মর্যাদা বজায় রেখে চালিয়ে আমি যাব।

বলতে বলতে তাঁর পিঙ্গল চক্ষুতারকা দুটি তীব্রতায় দীপ্ত হয়ে উঠল। সে দৃষ্টি দেখে ষোড়শী ভয়ও পেলে, আবার যেন ভরসাও পেলে। কাশীর বউয়ের এ মূর্তি সে এই প্রথম

দেখলে, বললে, মা।

কাশীর বউ বললেন, ওদের ওই কথাই যদি সত্যি হয় ষোড়শী, তবে আজ আমার স্বামীর যে অপমান হ'ল, তারও শোধের পালা একদিন আসবে। আমার গৌরীকান্তকে তো সেই দিনের জন্তে তৈরী ক'রে তুলতে হবে। এখান ছেড়ে চ'লে গেলে গৌরীকান্ত মানুষ হয়তো হবে; কিন্তু সেদিন তাকে যা করতে হবে, তা করবার মত মতি ওর হবে না।

তারপর আবার বললেন, ভয় আমি কাউকে করি না। আমি ঘোমটা খুলে দাঁড়াব, যে আমার সীমানায় পা দেবে তাকে আমি এমন ঘা মারব—। আমি যাব না ষোড়শী, তোর সাহস যদি না থাকে, তুই যদি যেতে চাস কোথাও, আমি বারণ করব না।

ঠিক এই সময়ে বাড়ির বাইরে থেকে বিষ্টু চাকর ডাকলে, মা!

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন কেউ গলার সাড়া দিলে। বিষ্টুর সঙ্গে আরও কেউ আছে।

ষোড়শী অবাক হয়ে কাশীর বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল; কাশীর বউ জড়তাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠে সাড়া দিলেন, কি বিষ্টু?

বিষ্টু বাড়ির মধ্যে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে বললে, সন্তোষবাবু এসেছেন মা, বললেন—দেখা করবেন। গৌরীদাদা বাগানের গাছতলায়—

বিষ্টুকে কথা শেষ করতে দিলেন না কাশীর বউ, বললেন, ডাক, ঠাকুরজামাইকে ডাক ভেতরে। আগে আসন পাত।—ব'লে নিজেই তিনি এগিয়ে গেলেন সদর-দরজার মুখে, দেখলেন, গৌরীকান্তকে কোলে নিয়ে সন্তোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কাঁধের উপর মাথা রেখে গৌরীকান্ত সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। বিস্মিত হবার কথা, কিন্তু বিস্ময়কে দূরে সরিয়ে কাশীর বউ বললেন, আসুন ঠাকুরজামাই, আসুন।

সন্তোষবাবুর মুখে প্রথমে ফুটে উঠল বিপুল বিস্ময়, দেখতে দেখতে সে বিস্ময় পরিণত হ'ল শ্রদ্ধায়। স্বল্প একটু হাসি এ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনিই ফুটে ওঠে, আলোর সঙ্গে উত্তাপের মতো হাসি শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজাত। সন্তোষবাবু বললেন, এলাম। একটুখানি রাগ ক'রেই এসেছি, তিরস্কার করতে এসেছি।

করবেন তিরস্কার, অন্যায় ক'রে থাকলে তিরস্কার নিশ্চয়ই করবেন; কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নয়, ভিতরে আসুন।

একটু ইতস্তত করলেন সন্তোষবাবু। নবগ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদারদের সমাজ। নবাবী বাদশাহী এবং আভিজাত্যের অনুকরণ এখানে। পাখার অহঙ্কারে পতঙ্গেরা জটায়ু সম্পাতির ভূমিকায় অভিনয় করে। রাধাকান্ত নিজেও এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। এখানকার মেয়েরাও মুক্ত নয়। এখানকার বধূরাণীরাও বেগম সেজে আনন্দ পান। কন্যারাও প্রায় শাহজাদী। তাঁদের পিত্রালয়ের পোষ্য জামাতারা অসময়ে অন্দরে এলে তাঁরাও ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে থাকেন, এ কি বেতরিবতের সহবত তোমাদের! যখন-তখন হট্ ক'রে বাড়ির মধ্যে চ'লে আস! এ কি তোমাদের উড়ো কুলীনের বাড়ি?

ব্রাহ্মণত্বের চেয়ে এদের জমিদারত্বই বড়। কিন্তু এই মেয়েটি বিচিত্র। এখানকার সমাজ

ও রাধাকান্তের এই বাড়ির ধারা-ধরনের প্রভাব একে হজম করতে পারে নি।

কাশীর বউ বুঝলেন সন্তোষবাবুর সঙ্কোচ। তিনি বললেন, তাঁর চিঠি পেয়েছি আজ। লিখেছেন—আপনাকেও লিখেছেন। পেয়েছেন ?

পেয়েছি। কি যে বলব—

কি বলবেন ? এর উপরে আপনার হাত ছিল না, আমারও হাত ছিল না, আমি শুধু কথাটা তুললাম এই কথাটা বলবার জন্যে যে, এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে এই ভাবে ঘোমটা খুলে কথা না ব'লে আমার উপায় নাই। আর কথা যখন বলতে হবে, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা না ব'লে বাড়ির ভিতর ধীরে সুস্থে কথা বলাই ভাল।

হেসে সন্তোষবাবু বললেন, চলুন, সকল সঙ্কোচ আমার কেটে গেল। আরও দরকার আছে। এসেছিলাম তিরস্কার করতে। এসে মনে হ'ল, সম্পর্কেই শুধু নয়, সত্যিই আপনি আমার প্রণম্য। প্রণামটাও জানিয়ে যাব।

কাশীর বউ বললেন, আমি আপনাকে প্রণাম করব ব'লে যে ব'সে আছি। সেই জন্যেই বেশি ক'রে ডাকছি। নির্বান্ধব পুরীতে যে অবস্থায় পড়লাম, এতে বন্ধু পূজনীয় কেউ না থাকলে স্নেহ পাব কোথা থেকে ? কিন্তু গৌরীকান্তকে আমায় দিন। ওকে আপনি কোথায় পেলেন ?

সেই জন্যেই তিরস্কার করব আপনাকে। ওর কানটা দেখেছেন ?

কাশীর বউ দেখে শিউরে উঠলেন। গৌরীকান্তের কান দুটি লাল হয়ে রয়েছে, একটু যেন ফুলেও উঠেছে। কেউ নিষ্ঠুর পেষণে কান ম'লে দিয়েছে।

আগে ওকে শুইয়ে দিন। বড় কেঁদেছে বেচারী। ফুলে ফুলে সে কি কান্না ওর ! আমি কোনমতে শান্ত করতে পারি না। শেষে বললাম—গল্প বলি শোন।

কিন্তু কি হয়েছিল ? কি করেছিল গৌরীকান্ত ? এমন ভাবে কান ম'লে দিলে কে ?

সন্তোষবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কান ম'লে দিয়েছেন কীর্তিচন্দ্রবাবু।

কাশীর বউ ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে গিয়ে বললেন, আসুন বাড়ির ভিতর।

* * *

গোপীচন্দ্রের ঠাকুর-বাড়ি এবং কাছারির সামনেই একটি স্বতন্ত্র ছোট বাংলো-ধরনের বাড়িতে পবিত্র থিয়েটার-দলের মহলাখানা বসিয়েছে। পবিত্রের বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামের যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ওইখানে মজলিস জমিয়ে বসে। গান-বাজনার আসর বসে, নাটক পড়া হয়। পবিত্র কবিতা লেখে, তাও পড়ে। কখনও গ্রামোফোনের গান হয়। দিবারাত্রির মধ্যে দরজা বন্ধ হয় না। গ্রামের সাধারণ লোক বাংলোটার উঠানে ভিড় জমিয়ে দাঁড়ায়, গান-বাজনা শোনে। পবিত্র আজ দিন কয়েক হ'ল প্রকাণ্ড একটা টেবিল-হারমোনিয়ম এনেছে। মোটা খাদের সুরের সঙ্গে মিশানো এই যন্ত্রটির সুরও যত মিষ্ট, চকচকে পালিশ করা যন্ত্রটি দেখতেও তত সুন্দর, তার হাতে-বেলো টানার বদলে পায়ে-বেলো করার পদ্ধতি অভিনব। গৌরীকান্ত বেরিয়েছিল, কিছু যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাবা তার কাশীতে আছেন —এ কথা তার মা তাকে বলেছেন। মা বলেছেন—তিনি গিয়েছেন বিশ্বনাথের কাছে

আশীর্বাদ আনতে। কিন্তু তাতে তার মনের শান্তি হয় নাই। মনটা যেন তার ফাঁকা হয়ে গেছে। রাধাকান্ত অহরহ ছেলেকে কাছে কাছে রাখতেন, তাঁর অভাবে ছেলেটির মন যেন প্রিয়তম সঙ্গীটিকে হারিয়ে ফেলেছে। ঘুরতে ঘুরতে সে চলেছিল, তার বাবার নিজের হাতে তৈরি করা গ্রামপ্রান্তের বাগানের দিকে। পথে ঐ থিয়েটারের মজলিসের সামনে এসে সে বাংলোটা জনশূন্য দেখে সেখানে উঠে উঁকি মেরে দেখে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ওই টেবিল-হারমোনিয়মটি বাজিয়ে দেখবার কৌতূহল সম্বরণ করতে পারে নি, পায়ে টিপে কেমন ক'রে ওটা বাজে?

সন্তোষবাবু গোপীচন্দ্রবাবুর মজলিসেই ছিলেন। রাধাকান্তবাবু নাই, তাই এখানে ওখানে সময় কাটাবার জন্য গিয়ে থাকেন। হঠাৎ বাংলোটার ভিতর থেকে বেসুরে হারমোনিয়মটা বেজে উঠতেই কীর্তিচন্দ্র উঠে গিয়ে গৌরীকান্তকে বের ক'রে এনে সর্বসমক্ষে কান দুটি সজোরে ম'লে দিয়ে বলেছেন, হবে না তো কিছু, নবগ্রামের বাবুলোকের সন্তান! অকালে লেখাপড়া ছাড়বে, পৈতৃক সম্পত্তি বেচবে, নেশা করবে, গানবাজনা করবে, নাচবে। তা হোক না আরও কিছু বয়স। এখন থেকে কেন? বালকের মুখখানা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। ওর মুখের সে যে কি অবস্থা হয়েছিল, না দেখলে অনুমান করা যায় না। আপনি মা, আপনিও পারবেন না।

সন্তোষবাবু থামলেন। কাশীর বউয়ের মুখের অবস্থা দেখে তিনি থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ ক'রে কাশীর বউ হাত বাড়ালেন, দিন, গৌরীকান্তকে দিন।

তাঁর কোলে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে সন্তোষবাবু বললেন, আপনার ছেলে বড় হবে। ওর আজ যা সহ্যশক্তি দেখলাম, আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। জানেন, যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন, কীর্তিচন্দ্র নিজেও কেমন হয়ে গেলেন এইভাবে কথা ব'লে কান ম'লে দিয়ে। ব্যাপারটা যে কতটা কটু হয়ে যাচ্ছে বা গেল, প্রথমটায় বংশগত বিদ্বেষে বুঝতে পারেন নি কীর্তিচন্দ্র, যখন হয়ে গেল—হাতের তীর বেরিয়ে গিয়ে যখন আঘাত করল তখন উপায়ও ছিল না, আর তখনই বুঝতেও পারলেন ব্যঙ্গ-বাণ মনের আগুনের ছোঁয়াতে বহ্নিবাণ হয়ে বালকের বুকখানাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সর্বাগ্রে অবশ্য উঠে এলেন গোপীচন্দ্রবাবু। তিনি এসে গৌরীকান্তের হাত ধ'রে বললেন, অন্যায়, এ তোমার অন্যায় কীর্তিচন্দ্র। কীর্তিচন্দ্র উত্তর দিতে পারলেন না। গোপীচন্দ্র একটু কৌশলে মূল অন্যায়টাকে ঢেকে নিয়ে বললেন, টেবিল-হারমোনিয়মটা ফেটে গিয়েছে, মেরামত করাতে হবে, তা না হয় হবেই।—ব'লে ওকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। গৌরীকান্ত নিজেকে সামলে নিয়েছিল এরই মধ্যে, বেশ সহাস্য মুখেই বললে, না, আমার পায়ে ধুলো আছে, হাতও নোংরা, আপনার কাপড়-জামা ময়লা হয়ে যাবে। গোপীবাবু বললেন, হোক। আমি ছেড়ে ফেলব কাপড়জামা। ও বললে, না, বাবা-মা বারণ করেছেন। আমি তো এখন বড় হয়েছি, কোলে চাপতে গেলে আপনার গায়ে পা ঠেকবে। গোপীচন্দ্রবাবুও কথা বলতে পারলেন না, গৌরীকান্তই বললে, আমি গান গাইতে যাই নি। ওটার পাশে তো

চামড়ার হাওয়া দেবার সেটা নেই অথচ কেমন ক'রে বাজে, আর—আর বাজনাটার সুর ভারি মিষ্টি কিনা, তাই—। এতক্ষণে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছে ফেলে হেসেই বললে, আমি যাই। এতক্ষণ সকলেই আমরা হতবাক হয়ে ছিলাম, এবার আমার সম্বিত ফিরল, আমি উঠে বললাম, চল গৌরী, আমিও যাই। হাত ধ'রে খানিকটা এসে আমাকে বললে, হারমোনিয়মটা ভেঙে যায় নি। কোন শব্দ হয় নি। ভেঙে গেলে তো শব্দ হয়। হয় না? আমি বললাম, না, খারাপ হয় নি। তবে উনি বোধ হয় ভেবেছিলেন খারাপ হয়েছে। আর ওখানে ঢুকো না। 'ওটা থিয়েটারের আসর তো। ওখানে ছেলেদের ঢুকতে নাই। ওখানে গেলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়। চল, বাড়ি চল। গৌরীকান্ত বললে, আমি এখন বাড়ি যাব না। আমি মা-কালীকে প্রণাম করতে যাব। আমি শিউরে উঠে বললাম, সে কি, গ্রামের বাইরে সেই তোমাদের বাগানে? সেখানে একলা যাবে? না না। সাপ আছে, বড় বড় শেয়াল আছে, নেকড়ে আছে। গৌরী বললে, বাবা বলেছিলেন—গৌরী, মাকে যেন রোজ প্রণাম ক'রো। বাবা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। বাবা কাশী গিয়েছেন, আমি একলাই রোজ যাই। ভয় করে না তো। আমি যাই।—ব'লে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বাধা দিতে পারলাম না। আমিও সঙ্গে গেলাম। বেচারী ঘুরতে লাগল আর দেখাতে লাগল, এই গাছটা বাবা কবে পুঁতেছিলেন, কি বলেছিলেন! বুঝলাম, ও ওই গাছগুলির মধ্যে বাপের কথা মনে করে। আমার চোখে জল এসেছিল। ভোলাবার জন্য গল্প বললাম, ধ্রুবের গল্প শুরু করলাম। ও বললে—জানি, মায়ের কাছে শুনেছি। প্রহ্লাদের গল্প, তাও বললে—শুনেছি। আমি তখন বিব্রত হলাম, বললাম, তুমি তো তা হ'লে সবই শুনেছ, কি বলব তোমাকে? বললে—না, সব শুনি নি, মা এখনও অনেক জানেন। আমি বললাম, তবে তুমিই আমাকে একটা গল্প বল। তুমি তো অনেক শুনেছ মায়ের কাছে। লজ্জা পেলে, বললে—আমি তো মায়ের মত ভাল ক'রে বলতে পারব না। বললাম, বল শুনি। ভাল যদি না লাগে, তবে আমি তখন বলব—হচ্ছে না ভাল। বললে—ঠিক বলবেন তো? প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল। তারপর গল্প শুরু করলে সত্য-প্রিয়ের কাহিনী।

হাসলেন সন্তোষবাবু, বললেন, গল্প বললে, বেশ বললে। তারপর আমিও একটা গল্প বললাম। শুনতে শুনতে বেচারা ঢুলতে লাগল, কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথা কোলে রেখে হাত বুলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে গেল।

কাশীর বউ বোধ হয় কথা শুনছিলেন না, তিনি একমনে ভাবছিলেন।

চৌদ্দ

ঘরের মধ্যে ব'সে সন্তোষবাবু ভাবছিলেন। ধ্যানমগ্নের মত নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন ভাবনায়। ভাবছিলেন নবগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির কথা। নিতান্তই নিস্পৃহ দর্শকের মত তিনি

দীর্ঘদিন ধ'রে নবগ্রামের জীবন-দ্বন্দ্ব দেখে আসছেন,—এখানে তিনি ঘরজামাই। লোকে তাঁকে বাইরে সম্মান করে, স্নেহ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করে, সে তাঁর অগোচর নাই। তিনি সেকালের পেশাদার কুলীন জামাই। ঠিক এই কারণেই এ গ্রামের দীর্ঘদিন বাস ক'রেও তিনি বিদেশী। এখানকার উত্থান-পতনের আনন্দ-দুঃখ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করে না। অতীত কালের গল্পও শুনেছেন নিছক শ্রোতার মত। তিনি নিরাসক্তভাবে ঘটনাগুলি সাজিয়ে দেখে বিচিত্র আনন্দ অনুভব করেন। তবে রাধাকান্তকে তিনি ভালবাসতেন। কাশীর বউয়ের সঙ্গে দুদিন আগে যে কথাগুলি হয়েছে, তা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে। তাই তিনি ভাবছিলেন, ভেবে দেখ্‌ছিলেন।

গোপীচন্দ্র উঠলেন গিড়িচূড়ার মত। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল জীর্ণ খ'ড়ো চালের নীচে মাটির মেঝের উপর। বর্ষার জল, দ্বিপ্রহরে সূর্যের রৌদ্রচ্ছটা, শীতের রাত্রির হিম—শৈশবে তাঁর শিশুদেহের উপর পড়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে যাত্রা করেছিলেন তিনি, দুঃসাহসিক অভিযান—সামান্য পথিকের মত। নবগ্রামের গ্রামজীবনে বহুকাল পূর্বে সরকার-বংশের একটি সন্তান গিয়েছিলেন রাজনগরে নবাব-দপ্তরের অভিমুখে, তিনি ফিরেছিলেন সম্পদ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে। আবারও কিছুকাল পরে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন সরকারদের ভাগিনেয়-বংশ। তাঁরাও ফিরেছিলেন সম্পদ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে। সরকারবাবুরা এখানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন—সংস্কৃত বাংলা উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভাগিনেয়-বংশের স্বর্ণবাবুর বাপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এম. ই. স্কুল। তিনিও পুকুর কাটিয়েছেন, দেবকীর্তি করেছেন। কিন্তু এবার যা হ'ল, এ অভিনব।

হাই-ইংলিশ স্কুল।

নবগ্রামের গ্রাম্য পরিধিতে কখনও কোন কালে এর চেয়ে আর বড় কিছু ধরবে না। যতদূর দৃষ্টি যায়, নবগ্রামের ভাবীকালের আকাশ ও উত্তরমেরুপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরসীমায় মিলিত দিগন্ত পর্যন্ত, ততদূরের মধ্যে আর কোন অভ্যুদয় সম্ভাবনা দেখা যায় না। পক্বকেশ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় গোপীচন্দ্র এই দিগন্ত মধ্যে তুষারমণ্ডিত মহিমায় গিরিচূড়ার মত দাঁড়িয়ে আছেন। এত উচ্চতায় কোন কালে নবগ্রামের কোন ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই। তার প্রমাণ পেয়েছে নবগ্রামের অঞ্চলের মানুষেরা। হিমালয়ের উচ্চতার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে দেবলোক সেখানে নেমে আসেন। গোপীচন্দ্রের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে রাজ-প্রতিনিধিরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন; নবগ্রামে তাঁরা সমবেত হয়ে একবাক্যে সেই সত্য স্বীকার ক'রে গেছেন।

শুধু অভ্যুদয় গোপীচন্দ্রেরই একা হ'ল না।

গোপীচন্দ্র উত্থিত হলেন আপন শক্তিতে, উৎক্ষিপ্ত হ'ল পুরাতন শৃঙ্গগুলি, গোপীচন্দ্রের বলে ধরিত্রীর বিদীর্ণ বক্ষপথে উঠল আরও অনেক পাথরের খণ্ড। প্রাচীন প্রধানদের পতন এবং এই নূতন প্রধানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের সাধারণ অবস্থার মানুষের সমাজের

মধ্যে একটা প্রচণ্ড জীবনালোড়নের সৃষ্টি হ'ল। দীর্ঘকাল পরে এখানকার বিত্তহীন ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক, আশপাশের গ্রামের চাষী গৃহস্থ সমাজ নূতন ভরসায় অভিনব আনন্দে উঠে দাঁড়াল। গোপীচন্দ্র একদা তাঁদেরই একজন ছিলেন,—বেশিদিন আগে নয়, দশ বৎসর পূর্বেও তিনি ছিলেন গৃহস্থ ঘরের সন্তান, আরও বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন আরও সামান্য অবস্থার ব্যক্তি। আজ তিনি উঠলেন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে হ'ল, তারাও মুক্তি পেলে। আজ সকলের মাথার উপরে গোপীচন্দ্র—তিনি একান্তভাবে তাদের, তাদেরই একজন।

প্রদীপের শিখায় জ্যোতিরও উর্ধ্বে ওঠে কালি, তাদের এই আনন্দের সঙ্গে শিখার কালির মত বোধ হয় স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়েছিল দীর্ঘকাল পূর্বের অপমানের ক্ষোভে পরিতৃপ্তির বিকৃতি। ওটুকুর নিচে সত্যই ছিল আশা-ভরসার আনন্দ এবং প্রেরণা। গন্ধবণিক সমাজেই এ আনন্দ-চাঞ্চল্য বেশি।

মণি দত্ত বণিক-সমাজের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। বয়স তার অল্প, ইংরেজী লেখাপড়াও সে কিছু শিখেছে, সাপ্তাহিক ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে, দেশ-দেশান্তরের খবর রাখে; সাধারণ গন্ধবণিকদের মত তার ব্যবসার গণ্ডী নবগ্রামের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে বৃহত্তর পরিধির সন্ধানে এর থেকে সাত মাইল দূরে রেল-স্টেশনে কাপড়ের বড় দোকান করেছে। বেশভূষায় সে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা বজায় রেখে বেশভূষা করে। একালের ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট-বড় ক'রে চুল ছাঁটে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ রেখেছে; সাধারণত সে থাকে তার ব্যবসার স্থানে ওই রেল-স্টেশনের ছোটখাটো আধা শহরটিতে। এ গ্রামে তাদের সমাজে অনেক প্রবীণ আছেন, সামান্য ব্যবসাদার হ'লেও সঞ্চয়ের পারদর্শিতায় মণি দত্ত অপেক্ষা অর্থশালীও বটে; তবু মণি দত্তই এখানকার বণিকসমাজের প্রধান। তরুণ বণিক-সমাজ তার প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষাতুর, নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে মণি দত্তের তারা বিরোধিতাও করে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিদের সঙ্গে বিরোধিতায় মণি দত্তই তাদের অবিসম্বাদী নেতা। সরকারী ব্যাপারে বণিকদের কারও কোন প্রয়োজন থাকলে মণি দত্তের পরামর্শই তারা গ্রহণ ক'রে থাকে।

মণি দত্তের নেতৃত্বেই সেদিন কেষ্ট চন্দ্র মশায়ের ভাইপোর দোকানে বণিকপাড়ার তরুণেরা পাড়া গোল ক'রে উল্লাস প্রকাশ করেছে।

এই মণি দত্তই সেই লাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠ দত্তের বংশের সন্তান। ওই লাঞ্ছনার ক্ষোভ তার বংশের শিক্ষায় দীক্ষায়, বোধ করি রক্তধারার মধ্যেও মিশে ছিল। তাই এই নূতন আশা, নূতন ভরসার পবিত্র আনন্দের মধ্যেও শিখার উপরের কালি ও ধোঁয়ার মতই তাদের ক্ষোভে পরিতৃপ্তির উল্লাসটুকু মানুষের চোখে পড়ল সর্বাগ্রে, আত্মপ্রকাশও করলে সর্বাগ্রে। বণিক-সমাজের প্রধানেরা মাথা হেঁট না ক'রে পারলেন না, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয় ছি-ছি ক'রে সারা হয়ে গেলেন।

মণি দত্তের নেতৃত্বে তরুণ গন্ধবণিকের দল একটা মজলিস ক'রে স্থির ক'রে ফেললেন, ওই অধঃপতিত বাবুদের বাড়ির যে সব মাতাল চরিত্রহীন ছেলে গ্রামের মধ্যে বেলেল্লাগিরি করে, তাদের আর ব্রাহ্মণ বা জমিদারের বাড়ির আত্মীয় ব'লে খাতির করবে না।

লক্ষ্য তাদের স্বর্ণভূষণবাবুর দুজন ভাগ্নে—অমূল্য এবং ভূপতি। সরকার-বাড়িরও জনকয়েক ছেলে আছে। তাদের অসংযমের সত্যই অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন যে উপলক্ষ নিয়ে কথাটা উঠল, সে উপলক্ষ ষোড়শী। কাশী চন্দ প্রভৃতি কয়েক জন তরুণ ষোড়শীর দিকে কটাক্ষপাত করতে গিয়ে চমকে উঠেছিল। কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল অমূল্য এবং ভূপতি।

অমূল্য মাতাল হ'লেও প্রচণ্ড শক্তিশালী। সেই দুই হাতের আঙুলগুলোকে বঁড়শীর মত বেঁকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ভূপতিকে বলার ছল ক'রে বলেছিল, চোখ তুলে নোব। বুঝলি ভূপতি, চোখ—চোখ—ট্যারা চোখে মেয়েদের দিকে তাকাবার সাজা হ'ল তাই।

ভয় পেতে হয়েছিল কাশী চন্দের দলকে।

মণি দত্ত একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সে জানে, খুব ভাল ভাবে জানে। সপ্তাহে একদিন দুদিন সে বাড়ি আসে, গভীর রাত্রে সে তার বাড়ির পাশের রাস্তায় শুনতে পায় এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ-সন্তানদের মত কণ্ঠের বীভৎস চীৎকার, ওই পথেই যেতে হয় মদের দোকান, ওই পথেই তার বাড়ির অদূরে বাস করে দুজন পিতৃমাতৃহীনা বিধবা তরুণী স্বৈরিণী।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাসলেও। কটু তিক্ত হাসি। কিছুদিন আগে এমনই একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান ওই স্বৈরিণী দুটির আনুগত্যের অভাবের জন্য বিরক্ত হয়ে সমাজ ও গ্রামের কল্যাণের জন্য মেয়ে দুটিকে নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবে আশা দিয়ে একদা রাত্রে তাদের নিয়ে গ্রাম ত্যাগ ক'রে ওই সাত মাইল দূরের রেল-স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। হতভাগিনী দুটি তবু নির্বাসিত হয় নি, রেল-কর্মচারীদের দেহমূল্য দিয়ে কোন রকমে ফিরে এসেছিল। গভীর রাত্রে রেল-স্টেশনে নেমে তারই দোকানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, তাদের পাড়ার মধ্যে খিড়কির এবং স্নানের পুকুরের আশেপাশেও এদের মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বন্দুক হাতে মিথ্যা পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

এতদিন এর প্রতিবিধানের চেষ্টা হয় নি এমন নয়, কিন্তু সে হয়েছে অন্যভাবে। স্বর্ণভূষণ-বাবু রাধাকান্তবাবু বংশলোচনবাবুর দরবারে প্রধানেরা যেতেন, সবিনয়ে বলতেন, আপনারা যদি ওদের শাসন না করেন বাবু, তবে আমরা যাই কোথা বলুন?

তাঁরা মিষ্ট কথাই বলতেন। ভরসাও দিতেন, শাসন করবেন। কখনও কখনও ক্ষিপ্ত হয়েও উঠতেন বিনত অভিযোগকারীর উপরেই। চীৎকার করে বলতেন, ঘর সামালো গিয়ে, ঘর সামালো।

মজলিসও মধ্যে মধ্যে হ'ত।

আজকের মজলিসে অকস্মাৎ কথাটা উঠে পড়ল। শুরু হয়েছিল রাধাকান্তের কাশী যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে। যে অপমানে অপমানিত করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, সে অপমান যে

কতখানি নিষ্ঠুর, কতখানি মর্মান্তিক, আলোচনার প্রারম্ভ তারই পরিমাণ-নির্ণয় নিয়ে। তার মধ্যে ছিল সহানুভূতি।

অন্যায় হয়েছে। কাজটা উচিত হয় নি। গোপীচন্দ্রবাবু—

গোপীচন্দ্রকেও দোষ দিতে মন তাদের সায় দেয় নি।

গোপীচন্দ্রবাবু কি করবেন? তিনি তো সাহেবকে বললেন—

তিনি কথাটা সাহেবের কানে না তুললেই পারতেন।

তিনি কখনও তোলেন নি কানে। তিনি পারেন না তুলতে, সে মানুষই নন তিনি। আমি জানি। আমি শুনেছি। থানা থেকে শুনেছি।

এ কথাটা সকলেই স্বীকার করে। সাহেবের কানে কথা তোলবার মত ব্যক্তি তিনি নন। তবু একজন প্রশ্ন করে, তবে কি বাতাসে গেল কথাটা?

তাই যায় হে, তাই যায়। যখন কাল বিরূপ হয়, অদৃষ্ট মন্দ হয়—

মণি দত্ত অকস্মাৎ বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল, ব'লে উঠল, না, কাল নয়,—অদৃষ্ট নয়, ভগবানের শাস্তি।

সমস্ত মজলিসটির চেহারা মুহূর্তে পাল্টে গেল। সকলের বুকের মধ্যে যেন উঠে পড়ল কালবৈশাখীর ঝড়। আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল। প্রায় একশো বৎসর দীর্ঘ একটি দিনের উত্তাপ জমা হয়ে ছিল। একশো বছর ধ'রে ওই কয়েকটি বংশ এখানকার সমাজকে শাসন ক'রে এসেছে। ব্রাহ্মণ জমিদার। কিন্তু ব্রাহ্মণের তপস্যা-ত্যাগ-বিবর্জিত শুধু ক্রোধ আর অহঙ্কার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর আমিরী ও নবাবী প্রভাবিত ভোগলোলুপ ভ্রষ্টচরিত্র জমিদার। উদারতা ছিল না এমন নয়, দানও ছিল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী ছিল শাসনের কঠোরতা, শোষণও ছিল অপরিমিত। তার ফলে উত্তপ্ত হয়েছিল জীবন পৃথিবী। তৃতীয় প্রহরে সূর্যের প্রখরতম উত্তাপের জ্বালার মত দত্ত সমাজপতির কপালে কাচ-ফোটার স্মৃতি হয়েছিল অসহনীয়। তখন থেকেই নবগ্রামের দিগন্তে বাতাসে উঠেছিল এক টুকরো কালো মেঘ। উত্তপ্ত লঘু বায়ুমণ্ডল, দিগন্তে মেঘের টুকরো—আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল। অকস্মাৎ বাতাস বইল। মেঘ প্রসারিত হ'ল, পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ফুলে উঠল, বাতাসে লাল ধুলো উড়ল, বিদ্যুৎ চকিত হয়ে উঠল। কাল দিনান্ত ঘোষণা করবার পূর্বেই পৃথিবীর বুক থেকে ধুলো ওড়ে। আকাশমণ্ডলে মেঘ সঞ্চারিত হয়ে অস্তোন্মুখ সূর্যকে ঢেকে দিয়ে ঘোষণা করলে, উত্তপ্ত অসহনীয় সূর্য, আয়ু তোমার আমরা হরণ করলাম।

ভাবতে ভাবতে সন্তোষবাবু শিউরে উঠলেন। মনে প'ড়ে গেল তাঁর পুরাণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত। কত মহামহিমময় বংশ এই ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুটি হাত জোড় ক'রে তিনি প্রণাম করলেন।

ভগবানকে নয়, ইষ্টদেবতাকে নয়, মানব-প্রকৃতিকে প্রণাম করলেন।

মুখুজ্জে!

সন্তোষবাবু এমনই নিমগ্ন ছিলেন নিজের চিন্তায় যে, দরজার ওপারের ডাক শুনে তাঁর মনে

হ'ল, কেউ যেন বহু দূর থেকে তাঁকে ডাকছে। চোখের পাতা চকিত হয়ে উঠল, তারা দুটি একবার চঞ্চল হয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরল, তিনি যেন তাঁর অন্তরলোকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে চাইলেন, এ কণ্ঠস্বর শুনে কাকে মনে পড়ে? কে?

ঘরে ঢুকলেন স্বর্ণবাবু।

সন্তোষবাবু এবার সচেতন হয়ে উঠলেন, হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তুমি?

গোঁফে তা দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, সংশয় হ'ল কেন?

এবার সন্তোষবাবু হাসলেন, বললেন, সংশয় নয়। ধ্যান করছিলাম, তুমি ডাকলে, ঠিক বুঝতে পারলাম না কার গলা।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন স্বর্ণবাবু—অসময়ে এমন জামা গায়ে দিয়ে বিছানার উপর ব'সেই ধ্যান! কি রকম ধ্যান হে? ভগবানের, না, মানুষের?

তুমি ঠিকই ধরেছ স্বর্ণবাবু। মানুষের ধ্যানই করছিলাম। তোমাদের নবগ্রামে এসে ভগবানকে ধ্যান করা ভুলেই গেলাম একরকম।

আমি জানি তুমি কার ধ্যান করছিলে। তারই কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

সন্তোষবাবু শঙ্কাচঞ্চল হয়ে উঠলেন মুহূর্তে। স্বর্ণবাবুর প্রকৃতি তিনি জানেন।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, রাধাকান্তের স্ত্রী তোমার সঙ্গে ঘোমটা খুলে কথা বলেছে? তুমি রাধাকান্তের বাড়ি গিয়েছিলে, তোমায় সমাদর ক'রে আসন পেতে বসিয়েছে রাধাকান্তের স্ত্রী?

সন্তোষবাবু স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন স্বর্ণবাবু। বললেন, কাজটা তোমার উচিত হয় নি মুখুজ্জে।

এবার ধীর কণ্ঠে সন্তোষবাবু জবাব দিলেন, আমি তোমাদের ঘরজামাই স্বর্ণবাবু, তোমরা আমাকে পোষ্য মনে কর, কথাটা সত্যও বটে। সুতরাং এর জবাবদিহি তুমি চাইতে এসেছ। কিন্তু ভাই, তোমাদের পোষ্য যখন, তখন এর ঠিক সত্য জবাবটা আমি তো দিতে পারব না। কারণ জবাবটা একটু কঠোর হবে। তুমি বরং এর জবাবটা ওই ভদ্রমহিলাটির কাছে চাইলে ঠিক জবাব পাবে স্বর্ণবাবু।

চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু। বলছ কি মুখুজ্জে?

আমি তাঁর ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। রাধাকান্তকে ছেড়ে বেচারী কখনও থাকে নি। আজ দশ-বারো দিন রাধাকান্ত চ'লে গেছেন, ছেলেটি উদাসীর মত ঘুরে বেড়ায়। আজ থিয়েটারের মহলার ঘরে বড় টেবিল-হারমোনিয়ামটি—

আমি শুনেছি সে কথা।—স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিলেন।

শুনেছো? ভাল। ওখান থেকে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, একটু সান্ত্বনা দেব ভেবেছিলাম। ছেলেটি ব'সে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কোলে নিয়ে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলাম, তা রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী ঘোমটা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমি তোমাদের কথা তো জানি, বিব্রত হয়ে ছেলেটিকে দিয়ে পালাতে চাইলাম, তা বললেন

—আমার স্বামী আর ফিরবেন না—

ফিরবেন না?—চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু।—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, রাধাকান্তদা গৃহত্যাগ করেছেন।

হ্যাঁ। বললেন—তিনি গিয়েছেন, কিন্তু আমি যাব না নবগ্রাম থেকে। এইখানে থেকে আমি আমার ছেলেকে মানুষ করব। তাকে রক্ষা যখন করতে হবে, তখন ঘোমটা না খুলে আমার উপায় কি? তাই ঘোমটা খুলেছি। তুমি যাও, গেলে ঘোমটা খুলেই তিনি তোমার কথার জবাব দেবেন।

স্বর্ণবাবু তা-দেওয়া গোঁফের সুচোলো অগ্রভাগ টেনে এবার দাঁত দিয়ে টিপে ধরলেন। একটি তরুণী বধূ এই নবগ্রামের সমাজের মত সমাজে এমন ভাবে সাহস ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে? গ্রামের কন্যারা পারে, কুলীন-সমাজের কন্যাদের অধিকার অবাধ। বধূরা পারে প্রৌঢ়াবস্থায়। তাও যদি ছেলেরা অনুগত হয় তবে, অথবা তিনি যদি নিজেই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন তবে। কিন্তু এই বধূটি! হয়তো কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে মাত্র।

সন্তোষবাবু প্রশ্ন করলেন, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না স্বর্ণবাবু?

ভাবছি।—কিছুক্ষণ পর বললেন, বিচিত্র মেয়ে! কিন্তু—

কিন্তু আবার কি?

ভাবছি! মুখুজ্জে, এখানকার এই কুরুক্ষেত্রে, এই ভীষণ রণতাণ্ডব-কোলাহলের মধ্যে ওই মেয়েটি কি ভাবে কি করবে? শুনেছি, এমন মিষ্ট ভাষা নাকি শোনা যায় না, চীৎকার কেউ কখনও শোনে নি। আমাদের রজনীদিদি লেখাপড়াও জানে, কথাবার্তাও গুছিয়ে বলতে পারে—। স্বর্ণবাবু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে এবার বললেন, আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমারও দিদি, তাঁকে ওই মেয়েটির বয়সেও দেখেছি। এতদিনে তিনি সমাজের মধ্যে কথা বলতে পারেন, কিন্তু চীৎকার ক'রে বলতে হয়। ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলতে 'হারামজাদা' ব'লে গাল দিতে হয়। 'চোপ রও' ব'লে ধমক দিতে হয়। বথা বোনপো ভূপতি অমূল্য মাতাল হয়ে বাড়ি এসে সেদিন দরজায় প'ড়ে গিয়েছিল। কে ওঠাবে? রজনীদিদি গিয়েছিলেন তুলতে। অমূল্য চুলের মুঠি ধ'রে টানতে শুরু করেছিল, রজনীদিদি অমূল্যর গালে ঠাস ঠাস ক'রে চড় মেরেছিলেন। তাই তো ভাবছি মুখুজ্জে, এ মেয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু—

সন্তোষবাবু হেসে বললেন, কিন্তু কিছু নাই স্বর্ণবাবু। ওরা হ'ল শক্তির জাত। দশমহাবিদ্যার মত ওদের রূপ কল্পনা করা যায় না ভাই। শিবের ঘরে শান্তশিষ্ট বধূরূপা সতী, তার মধ্যে ছিন্নমস্তা ধূমাবতী রূপ কি ক'রে লুকিয়ে ছিল বলতে পার? মেয়েটি শহরের মেয়ে, নতুন কালের অনেক কিছু ওর মধ্যে আছে ভাই। কয়েকটা কথা ব'লেই বুঝেছি আমি। বুঝেছ না।—ঘাড় নেড়ে যেন পরম উপভোগ ক'রে বললেন, কালী তারা দেখেছ ভাই, এবার বগলা মাতঙ্গী দেখ।

স্বর্ণবাবু বললেন, তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবে একটা কথা?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তোষবাবু শুধু মুখের দিকে তাকালেন।

ব'লো, আমার উপদেশ নিয়ে চললে ওঁর কোন চিন্তা নাই। রাধাকান্তদাকে আমি ভালবাসতাম সন্তোষবাবু। মনে মনে অনেক আঁকষা-আঁকষি ছিল, কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সে আর সংসারে সংসারী যারা, তাদের মধ্যে কার না হয়! তবু সে-ই ছিল আমার হিতৈষী বন্ধু।

সন্তোষবাবু বলতে গেলেন, ও-মেয়েকে যতটুকু চিনেছি স্বর্ণবাবু, তাতে কারও পরামর্শে চলবার মেয়ে ও নয়। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন, বলব। যদি দেখা—

থাম তো মুখুজ্জে।—চকিত হয়ে স্বর্ণবাবু উঠে উত্তর দিকের জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন, জানলাটা খুলতে খুলতেই বললেন, কে কাঁদছে?

সত্যই কেউ কাঁদছে। নারীকণ্ঠের আর্তবিলাপ। কে? কাশীর বউ? ঘাড় নাড়লেন সন্তোষবাবু। রাধাকান্তের মৃত্যু-সংবাদও যদি এসে থাকে, তবে কাশীর বউ মাটির উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকবে, নিথর হয়ে প'ড়ে থাকবে, দেহখানি পর্যন্ত আবেগে কাঁপবে না।

স্বর্ণবাবু বললেন, কিশোরদের বাড়িতে কান্না। কি হ'ল?

ও-জানলাটা থেকে স'রে এসে পাশের ঘরে গিয়ে আর একটা জানলা তিনি খুলে ফেললেন, ওখান থেকে কিশোরদের বাড়ির উঠানটা স্পষ্ট দেখা যায়।

কি হ'ল? একজন মহিলা আর্তস্বরে কাঁদছেন, ওরে, তুই কি করলি রে?

ও তো কিশোরের মা!

উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিশোরের কাকা। কিশোরের বাপ বিদেশে, সরকারী চাকুরে তিনি। ও কে বেরিয়ে আসছে মাথা হেঁট ক'রে?

ডাক্তার। এখানকার পাগল ডাক্তারটি।

স্বর্ণবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলেন। সন্তোষবাবু বললেন, দাঁড়াও হে স্বর্ণবাবু, আমিও যাব। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? কিশোর—! কিশোর তো কলকাতায়! তার কিছু হ'লে বাড়ি সুদ্ধ লোক—

স্বর্ণবাবু বললেন, মনে হচ্ছে কিশোরের মামার বাড়ির কেউ এসেছিল; তারই বোধ হয় কিছু হয়ে থাকবে। ডাক্তার মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে গেল দেখলে না! অথচ একা কিশোরের মা ছাড়া কেউ কাঁদছে না।

সম্ভবত। তোমার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ স্বর্ণবাবু।—অকপটে স্বীকার করলেন সন্তোষবাবু।

*   *   *

স্বর্ণবাবুর কাছারির বারান্দা থেকে খানিকটা উত্তরেই কিশোরদের বাড়ির বাইরের দরজা। কাছারিতে উঠেই স্বর্ণবাবু ঘরখানাকে অতিক্রম ক'রে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার এবং ঠেস-দেওয়া বেঞ্চি সাজানো থাকে। ভারী ভারী সেকালের চেয়ার, বাগানের উৎকৃষ্ট শিশুকাঠ থেকে মিস্ত্রী দিয়ে বাড়িতে তৈরি করানো আসবাব। এই বারান্দাতেই সাজানো থাকে, গরমের সময় সামনে রাস্তার উপর জল ছড়িয়ে ওখানেই নামানো হয়। এইখানকার মজলিসেই দত্তপ্রধানের সেই মর্মান্তিক অপমান হয়েছিল। আজ বারান্দার

একখানা চেয়ারে ব'সে ছিল মণি দত্ত। মণি দত্ত স্বর্ণবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্বর্ণবাবুর ওদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না, তিনি এসে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন। ওই ডাক্তার চ'লে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, ডাক্তার! ডাক্তার!

মণি দত্ত এসে পাশে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষ যতখানি হেঁট হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলেছিল—প্রণাম, তার চেয়ে অনেক কম হেঁট হয়ে নমস্কার করলে, মুখে কোন কথা বললে না।

স্বর্ণবাবু ফিরে তাকালেন। ভ্রূ দুটি তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কপালে শিরা ফুলে উঠল। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল গোঁফে তা দিতে। গোঁফে তা দিতে শুরু করলেন। দৃষ্টি তির্যক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে শুধু বললেন, কি?

হেসে মণি দত্ত বললে, একটু দরকার আছে।

স্বর্ণবাবু সবিস্ময়ে দেখছিলেন মণি দত্তকে। আধুনিকতম ভদ্র বেশভূষা তার সর্বাঙ্গে। সাদা শক্ত কফওয়ালা শার্ট, কালাপেড়ে ধুতি কোঁচা উল্টে পরেছে, পায়ে পাশে-স্প্রিংওয়ালা বার্নিশ-করা জুতো, কাঁধে চাদর। ঠিক এই ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ধত ব'লে মনে হ'ল। হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে প'ড়ে গেল দীর্ঘকাল আগের কাহিনী। চোখে আগুন জ'লে উঠল।

চোখে আগুন মণি দত্তেরও জ'লে উঠল। ঠিক একই মুহূর্তে তারও ঠিক এই কথা মনে প'ড়ে গেছে।

ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তার এসে রাস্তার উপরে দাঁড়ালেন। বললেন, আমায় ডাকলেন?

কি ব্যাপার ডাক্তার? ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, কে—বোধ হয় কিশোরের মা কাঁদছে—

হ্যাঁ, কিশোর বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়ে মিশনে সন্ন্যাসী হয়েছে।

স্বর্ণবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিস্ময়ে। সন্তোষবাবু সামনের রাস্তাটার দিকে, রাস্তাটা যেখানে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে পড়েছে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। মণি দত্ত শুধু ব'লে উঠল, এর জন্য আপনিই কিন্তু দায়ী ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার উত্তর দিলেন না, মণির মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—ম্লান হাসি। অপরাধ যেন স্বীকার ক'রে নিলেন। মণি দত্ত বললে, দরিদ্রনারায়ণ, সেবাধর্ম—এই সব ঢোকালেন ওর মাথায়—। আক্ষেপে আর কথা বলতে পারল না সে, বার বার ঘাড় নেড়ে নিজের আবেগটুকু প্রকাশ করল।

এবার স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, কি ডাক্তার?

ডাক্তার একখানি পত্র বের ক'রে হাতে দিলেন। কিশোরের পত্র। স্বর্ণবাবু পড়লেন পত্র। গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর লেখা। তাঁদের আমলের মত টানা লেখা নয়। স্বর্ণবাবু বললেন, ছেলেটি লেখাপড়ায় খুব ভাল শুনেছিলাম, কিন্তু হাতের লেখা এমন কাঁচা কেন? এখনও পাকা টান আসে নি!

স্বর্ণবাবুর বিস্ময় কেটে গেছে। মণি দত্ত সম্পর্কে সচেতন তিনি, মনের মধ্যে আভিজাত্যের

হিসাববোধ জেগে উঠেছে, আবেগ বিস্ময় সমস্ত কিছুকে বেঁধে ফেলেছেন, চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্লেষ-মিশ্রিত কৌতুক, কপালে কয়েকটা রেখা দাঁড়িয়েছে ব্যঙ্গহাস্যদ্যোতক প্রশ্ন-চিহ্নের মত, কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠছে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ঔদাসীন্য। কয়েক লাইন প'ড়ে ডাক্তারের দিকে চিঠিখানা বাড়িয়ে বললেন, নাও। 'এ যেন আমার জীবনদেবতার নির্দেশ'! 'জীবন-দেবতা' আবার কে হে? অ্যাঁ? বুঝতে পারলাম না। ভাষাই বুঝলাম না আদ্ধেক।

কিশোর লিখেছে—

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। আপনিই আমার পিপাসায় ভোগবতীর কূলের পথ দেখাইয়াছিলেন। আপনি আমার পথপ্রদর্শক। সেবা-সমিতি গড়িয়া আপনার সঙ্গে কাজ করিতে করিতে কতদিন ভাবিয়াছি, জীবন সার্থক হইবে আমার। নবগ্রামের চারিদিকে একটি অঞ্চল জুড়িয়া এই মহাধর্ম পালন করিয়া যাইব; একদিন বলিতে পারিব—

'পেয়েছি আমার শেষ
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
আমার জীবনে জীবন লভিয়া
জাগ রে সকল দেশ।'

যেদিন সমিতির গণ্ডি বাড়াইয়া জগন্নাথের স্ত্রীকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম, মনে আছে আপনার সেদিনের কথা? জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রান্তরের মধ্যে বন্দেমাতরম্ গান গাহিতে গাহিতে মনে হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র—দুইটি দীপ্ত গ্রহ আমার জীবনাকাশে এক হইয়া মিশিয়া গিয়া সূর্যের মত রূপ ধারণ করিয়া উদিত হইলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব উলোট-পালোট হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে কুক্ষণে গোপীচন্দ্রবাবুর চোখে পড়িয়াছিলাম। তিনি আপনার কাছে আসিলেন; আপনি সাগ্রহে তাঁহাকে লইয়া সমিতিকে বৃহৎ আকার—মহৎ রূপ দিতে গেলেন। আমার মন সায় দেয় নাই। কিছু মনে করিবেন না, আপনি ভুল করিয়াছিলেন। সমিতি কেমন ভাবে সমারোহের ঐকতান-বাদনের উচ্চধ্বনির মধ্যে উপবাসী পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত পূজামন্ত্রের মত ডুবিয়া গেল দেখিলেন? আপনার মনের দুঃখ আমি জানি। আমার দুঃখ-বেদনাও আপনি অনুভব করিতে পারেন। স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সমিতিরও সভা হইবার কথা ছিল। আমি জানিতাম, সভা হইবে একটা বাক্‌সর্বস্ব অনুষ্ঠান। তাই থাকিব না বলিয়া পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু থাকিতেও পারি নাই। সেদিন সভার শেষে আমি যখন অপমানিত রাধাকান্তদাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসি, আপনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমি থাকিব না সঙ্কল্প করিয়া নবগ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়াও কিন্তু থাকিতে পারি নাই। ফিরিয়া গিয়াছিলাম। মনে মনে কতবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, যদি আমারই ভুল হইয়া থাকে, যদি সার্থক হইয়া উঠে! পুণ্যবান কীর্তিমান গোপীচন্দ্রবাবুর সংস্পর্শেরও তো একটা কল্যাণ আছে, শক্তি আছে। তাই ফিরিয়া গিয়াছিলাম। পথে পথে ঘুরিয়া যখন গ্রামে ঢুকিলাম, তখনই দেখিলাম, সাহেবের টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া রাধাকান্তদা কাঁপিতেছিলেন। আমি থাকিতে পারিলাম না।

অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। আপনিও উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু আপনাকে বলিতে কিছু পারিলাম না। রাধাকান্তবাবু বিনা কারণে অপমানিত হইয়াছেন, দুঃখ সেই জন্য। অন্যথায় তাঁহার জন্য কোন বেদনা ন'ই। বেদনা অবশ্য কাশীর দিদির জন্য হয়। কিন্তু সমস্ত বেদনা-দুঃখকে ছাড়াইয়া দুঃখ হইল—সমিতির কিছু হইল না। গোপনে গোপনে আমরা কাজ করিতাম, একটি বীজ হইতে নির্গত অঙ্কুরের মত বাড়িত, আমরা জল দিতাম, পরিচর্যা করিতাম, স্বপ্ন দেখিতাম, একদিন বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হইবে। আজ সেই গাছ রাজার বাগানে গিয়া স্থান পাইল। মালীর হাতে রাজার হুকুমমত তাহার পরিচর্যা হইবে। আমি বেশ বুঝিলাম, ও-অঙ্কুরের মৃত্যু হইল। গাছও যদি হয়, তবে রাজার রুচিমত ডালপালা ছাঁটিয়া হয়তো মন্দিরের মত বা গম্বুজের মত অথবা বরাতমত কোন সুদৃশ্য আকার ধারণ করিবে, উহার স্বাভাবিক ছায়াদানের, ফলদানের মহিমা ভ্রষ্ট হইবে। প্রাণে অসহ্য যাতনা অনুভব করিলাম। সমস্ত সন্ধ্যা ভাবিয়া মনে হইল, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ আমার জীবনদেবতা পথনির্দেশ করিলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্ত্রে সত্য সত্য দীক্ষা লইব। এই আমার পথ। এই পথেই আমার মুক্তি। সেই রাত্রেই সাইকেল করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মঠে আশ্রয় লইয়াছি দীক্ষা লইব কাল। আপনাকেই শুধু জানাইলাম। বাড়িতে জানাইবেন। মা লিখিতে প'ড়তে জানেন না, জানিলে তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। এখান হইতে সাধনা করিয়া একদিন নবগ্রামে স্বামীজীর মন্ত্র-মিশনের পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইব। সেদিন কিন্তু আপনাকে চাই। ইতি

প্রণত
কিশোর

ডাক্তার পত্রখানি নিয়ে সযত্নে পকেটে পুরে বললেন, আমি যাই।

মণি দত্ত হঠাৎ বারান্দা থেকে নেমে পড়ল, বললে, চলুন, আমিও যাব।

স্বর্ণবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, কি হে, কি দরকার ছিল—না ব'লেই চ'লে যাচ্ছ!

ও, হ্যাঁ।—মণি দাঁড়াল।—দরকার অনেকই ছিল। তা—। একটু ভেবে বললে, বড় দরকারের কথাটাই ব'লে যাই। বাকিগুলো পরে হবে। আপনার এম. ই. ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটীতে আমি গার্জেনদের তরফ থেকে মেম্বর আছি। ও-পদে আমি ইস্তফা দিচ্ছি।

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে স্বর্ণবাবুর হাতে দিয়ে বললে, হাই ইস্কুলের কমিটীতে আমাকে নিয়েছেন কিনা। গোপীবাবুকে আমি প্রণাম করতে গিয়েছিলাম হাই ইস্কুল করেছেন—দেশে একটা মহাকীর্তি। তা বাবু বললেন—তোমাকে আমার কমিটীতে নিচ্ছি দত্ত।

মণি হাসলে।—দু জায়গায় মেম্বর থেকে কাজও হবে না, আর—আর ঠিকও হবে না। আচ্ছা—

স্বর্ণবাবু ঠোঁট দুটিতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে কাগজখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

মণি দেখেও দেখলে না, চ'লে গেল ডাক্তারের পিছনে।—ডাক্তারবাবু!

সন্তোষবাবু চেয়ে রয়েছেন পথের দিকে। পথ যেখানে গিয়ে প্রান্তরে মিশেছে সেইখানের দিকে সেই তেমনিই ভাবে চেয়ে রয়েছেন।

স্বর্ণবাবু হঠাৎ পথে নামলেন।

তাঁর বাপের প্রতিষ্ঠিত এম. ই. স্কুল ওই অদূরে। আগে কলরব উঠত, ছেলেরা কলরব ক'রে পড়ত। আজ স্তিমিত কলরব ক্ষীণ ভাবে বাইরে আসছে। তিনি এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। বাড়িখানা জীর্ণ হয় নি, মলিন হয়েছে, অনেক দিন চুনকাম হয় নি, ভেঙেও অবশ্য গিয়েছে কিছু কিছু জায়গা।

রাধাকান্তের মত দেশ ছেড়ে পালালে কেমন হয়? পরিত্রাণ পেয়েছে রাধাকান্ত। লোক ভাল ছিল। মনে পড়ল, একদিন রাধাকান্তের বৈঠকখানায় গিয়েছিলেন, রাধাকান্ত ছিলেন না, তাঁর ডায়রিখানা টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল। খুলে পড়েছিলেন সেদিনের শেষ পৃষ্ঠার লেখা—

"হে আশুতোষ, সম্মুখে আবার মহাসমস্যা। এ সমস্যায় তুমি আমার কর্তব্য নির্দেশ কর। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি পরের কীর্তি লোপ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী। গোপীচন্দ্র স্বর্ণের পিতার কীর্তি লোপে উদ্যত হইয়াছে। আবার শাস্ত্রে রহিয়াছে, পুণ্য কীর্তি করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া বা সাহায্য না করিয়া যে ব্যক্তি পুণ্য কীর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত জন্মায়, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মদ্বেষী। গোপীচন্দ্র যে কীর্তি করিতে উদ্যত, সে মহা পুণ্য কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কর্তব্য কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বর্ণবাবু। সে তাঁর সত্যই বন্ধু ছিল। ইস্কুল-ঘরে ঢুকতেই ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। হেডমাস্টার কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ব'সে ছিলেন। চকিত হয়ে তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন।

স্বর্ণবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, একটা এস্টিমেট করুন দেখি!

এস্টিমেট?

এই সব মেরামতের। মেরামত করানো দরকার।

সরকার থেকে পত্র লিখেছে, দেখেছেন?

কই! না।

পত্র তো আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কালই তো ফেরত দিয়েছে নায়েব।

আমি দেখি নি।

ঘর মেরামতের জন্য সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করা হয়েছিল, লিখেছে—ওখানে হাই-স্কুল হচ্ছে, এম. ই. স্কুলে সাহায্য দেওয়ার সার্থকতা গভর্মেণ্ট দেখতে পাচ্ছেন না।

তা হোক। আমিই দোব টাকা।

হেডমাস্টার ধীরে ধীরে চেয়ারের কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, বাইরের দিকে পা বাড়ালেন, মুখে না ব'লেও স্বর্ণবাবুকে বাইরে নিয়ে যাবার অভিপ্রায় তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ইঙ্গিত জানাল। স্বর্ণবাবু বুদ্ধিমান, তিনি বুঝলেন, এমন কিছু বলবেন যা এই ছাত্রমণ্ডলীর সামনে বলা

উচিত হবে না। এই ছেলেরা—

স্বর্ণবাবু মুহূর্তে বিচলিত হয়ে উঠলেন।

মনের ধীরতা স্থিরতা সব যেন চ'লে গেছে তাঁর জীবন থেকে। তিনি যেন অহরহ অগ্নি-শিখার মত জ্বলছেন, সামান্য বায়ুপ্রবাহে কেঁপে যান, নিবে যাবার ভয়ে প্রবলতর শিখায় জ্ব'লে উঠে নিজেকে দগ্ধ ক'রে যান। মুহূর্তে তাঁর মনে হ'ল, কি অকৃতজ্ঞ এই ছেলেগুলি! এতকাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে এই গ্রাম কত উপকৃত হয়েছে, সে কথা' মনে হয় না ওদের, নিজেরা আজও পড়ছে—সেও মনে করে না, তাঁর ইস্কুলের নিন্দাবাদ প্রচার ক'রে বেড়ায়, নিত্য বিকালে ছুটে যায় গোপীচন্দ্রের ইস্কুলডাঙায়, দেখতে যায় প্রকাণ্ড বড় পাকা ইমারত উঠছে। বড় বড় জানলা বসছে, বড় বড় গোল থাম দেওয়া বারান্দা, প্রশস্ত ঘর দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। গোপীচন্দ্রের প্রশংসায় ভ'রে দেয় নবগ্রামের আকাশ। তারা প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে কবে হাই-ইংলিশ ইস্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন হবে, তারা সেখানে গিয়ে ভর্তি হবে। ভর্তি হ'লেই সপ্তম স্বর্গের অধিকারী হবে তারা, জীবনের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে, সকলেই হবে মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ! নবগ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা হবে মহামানব! তাঁর ইচ্ছে হ'ল, এই মুহূর্তে ছেলেগুলোকে বের ক'রে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে দেন। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেন ইস্কুল-ঘরের খড়ের চালে। সেই আগুন গোটা গ্রামে ছড়িয়ে দেন। গোপীচন্দ্রের পাকা বাড়ি—পাকা ইস্কুল-ঘর পুড়বে না, থাকবে। থাক্। শুধু ওই গোপীচন্দ্র আর তার কীর্তিগুলিই থাক্, সে ভোগ করতে যেন কেউ না থাকে নবগ্রামে। ছারখার হয়ে যাক তাঁর কীর্তি অগ্নিশিখার উত্তাপের স্পর্শে।

হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলেন স্বর্ণবাবু। হেডমাস্টার বিস্মিত হলেন। কি হ'ল? তিনিও দ্রুত অনুসরণ ক'রে বাইরে এসে বললেন, শিক্ষকদের মাইনে বাকি পড়েছে তিন মাসের উপর। আগে—

থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণবাবু।

আগে সেইগুলি দরকার। সকলেই চেষ্টা করছেন ও-ইস্কুলে চাকরির জন্যে।

ইস্কুল আমি বন্ধ ক'রে দিলাম। মাইনে আমার যখন হবে দেব।

চ'লে গেলেন তিনি হনহন ক'রে।

হেডমাস্টার ম্লান হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এসে বসলেন নিজের আসনে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলেন। গোপীচন্দ্রের লেখা ছোট্ট এক টুকরো চিঠি। তাঁকে আজ ছুটির পর ইস্কুলের ডাঙায় গিয়ে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।

চিঠিখানি পকেটে পুরে তিনি আবার উদাস নেত্রে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। এ ইস্কুলে তিনি আজ পঁচিশ বৎসর চাকরি করছেন। আজ মনে পড়ছে এ ইস্কুলের সমৃদ্ধির—সমারোহের দিনের কথা। গুঞ্জন ক'রে পড়ছে ছেলেরা, তিনি পড়াচ্ছেন।—

"ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।"

মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন—তোমরা জান না। এটি হ'ল একটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ।

কিশোর সেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে সত্য, সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, জানি সার্। ব'লেই আবৃত্তি করেছিল—

"Tell me not in mournful numbers
Life is but au empty dream."

কিশোর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়েছিল। ওঃ, সে দিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তাঁর, স্বর্ণবাবুরও সে কি আনন্দ! গোটা ইস্কুলের ছেলেদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন।

বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। মাস্টার ছেলেদের ধমক দিয়ে বললেন, চুপ চুপ। পড়। তিনি জানেন গোপীচন্দ্রের লোক এসেছে। সাইকেল এখানে একমাত্র পবিত্রর আছে।

মুখ বাড়িয়ে হেডমাস্টার দেখলেন, পবিত্র নিজেই এসেছে। সাইকেলের উপর চেপেই একটা পা বারান্দায় নামিয়ে কিছু ভাবছে। সম্ভবত নামবে অথবা তাঁকে ডাকবে, তাই ভাবছে।

মাস্টার নিজেই উঠে এলেন। গোপীচন্দ্রবাবুই পবিত্রকে পাঠিয়েছেন—তাঁর কাছেই পাঠিয়েছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না। গোপীচন্দ্রবাবুর জ্ঞাতি তিনি, গোপীচন্দ্রবাবু তাঁকে ভালবাসেন, কৃতী কর্মী ভাগ্যবান গোপীচন্দ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কতবার গোপীচন্দ্রবাবু তাঁকে বলেছেন, তুমি এ মাস্টারি চাকরি ছেড়ে দাও, আমার কলকাতার আপিসে চল, এ চাকরিতে জীবনে কি পাবে তুমি?

মাস্টার কিন্তু তা পারেন নি। প্রতিবারই মাথা চুলকে বলেছেন, ভেবে দেখি।

ভেবে দেখতে গিয়ে এ চাকরি কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি। এত ছাত্র, তাদের শ্রদ্ধা, গোটা নবগ্রাম অঞ্চলের অভিভাবকদের সম্মান; তা ছাড়া বিদ্যার্জন এবং বিদ্যাদানের একটা নেশা, না, নেশা নয়—একটা আনন্দ পরিতৃপ্তি, এ ছেড়ে কিছুতেই তিনি ব্যবসায়ীর আপিসে চাকরি নিতে পারেন নি। নিজের মনেই বলেছেন, নাঃ। আমার দুঃখ কিসের দেখে এরা, কে জানে! আমি তো বুঝি নে কিছু। কিসের দুঃখ? নিজেই আবৃত্তি করেন—

"Tell me not in mournful numbers
Life is but an empty dream."

আজও আবৃত্তি করতে করতেই উঠে এসে বললেন, কি সংবাদ পবিত্রচন্দ্র?

পবিত্র অপ্রতিভ হয়ে বাইসিক্ল থেকে নেমে বললে, আপনার কাছেই এসেছি।

সে জানি। এবং তোমার বাবা পাঠিয়েছেন তাও জানি।

আজ্ঞে, বাবা নন, আমি এসেছি আপনার কাছে। আমরা থিয়েটার-পার্টি করেছি, তার সঙ্গে একটি লাইব্রেরি করব। দুই মিলিয়ে ক্লাব করব। আজ একটি সভা হবে; আপনাকে যেতে হবে। বাবার সভাপতি হবার কথা ছিল। তা বাবার হঠাৎ কোমরে একটা এমন ব্যথা ধ'রে গেল যে, তিনি উঠতেই পারছেন না। অমরদাদা বললেন—আপনাকে সভাপতি হতে হবে।

প্রণাম মাস্টারবাবু। প্রণাম ছোটবাবু।

দুজনেই মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, গোপীচন্দ্রের কর্মচারী নবীন ঘোষ এসে দাঁড়িয়েছে কখন। —কর্তাবাবু পাঠালেন আপনার কাছে। আপনাকে আজ দেখা করবার জন্যে বলছিলেন—

হ্যাঁ। আমি যাব। পাঁচটার পরে যাব। পবিত্রর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের সভাও তো ইস্কুল-ডাঙাতেই হবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘোষ বললে, আজ্ঞে, কর্তাবাবু আজ—। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, আজ কেন, বোধ হয় চার-পাঁচ দিন নড়তে পারবেন না। ডাক্তার মানাও ক'রে গেল। কোমরে খচ ক'রে এমন খচকি ধরেছে। তাই বললেন, বাড়িতে দেখা করতে।

এবার মাস্টার প্রশ্ন না ক'রে পারলেন না, কি ক'রে এমন বেদনা হ'ল? হঠাৎ—

একেবারে হঠাৎ। এই তো কিছুক্ষণ আগে—। পবিত্র বললে, হঠাৎ কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের মা কেঁদে উঠল, বাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, উনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কে কেঁদে উঠল? 'কিশোর' বলে কাঁদছে, না?

বিলাপের মধ্যে এই নামটা কানে যেতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন—কিশোর! কিশোর!

বিদ্যুতের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা প্রতিফলনের মধ্যে কত ছবি তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠল। সাপের মুখের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কিশোর, শ্মশানের অর্জুন গাছের নীচে দেখলেন কিশোরকে, বর্ষার দূরাগত মেঘধ্বনির মত কিশোরের কণ্ঠের গানও তাঁর কানে বেজে উঠল। তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নবীন সতেজ শিশু বনস্পতির উপর আকাশস্পর্শী বিরাট বনস্পতির যে স্নেহচ্ছায়া প্রসারিত হয় তেমনই স্নেহচ্ছায়াময় দৃষ্টি। তিনি কেঁপে উঠলেন, দ্রুত পদক্ষেপে নীচে নামতে গিয়ে একটা সিঁড়ি লঙ্ঘন ক'রে পা ফেলতেই কোমরে একটা আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ ক'রে ব'সে পড়লেন।

মাস্টারও চমকে উঠলেন।—কিশোর! কিশোর সন্ন্যাসী হয়েছে! রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে। আর তিনি কথা বলতে পারলেন না, গোপীচন্দ্র সম্পর্কে আর কোন কুশল-জিজ্ঞাসা কর্তব্য ছিল, কি ছিল না, সে প্রশ্নও তাঁর মনে উঠল না। স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিশোর! তাঁর ইচ্ছা ছিল কিশোর বিদেশ যায়, জাপান যায়। রুশ-বিজয়ী জাপান।

দ্বিপ্রহর শেষ হয়ে আসছে।

এলোমেলো গরম বাতাস মধ্যে মধ্যে এক-একটা দমকায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—গাছের পাকা পাতা ঝ'রে পড়ছে দুটো চারটে ক'রে। ধুলো উড়ছে, যেখানে গ্রামের পথ গ্রাম পার হয়ে খোলা মাঠে প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে, সেখানে ঘূর্ণি উঠেছে। মাস্টার সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। কিশোর সন্ন্যাসী হয়ে গেল! বিচিত্র মতি এ দেশের মানুষের!

আরও খানিকটা দূরে স্বর্ণবাবুর কাঁছারির বারান্দায় সন্তোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও সেই ক্ষণটি থেকে শুরু ক'রে এখনও পর্যন্ত ওই স্থানটির দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

যেন এই সংবাদটি শুনে ওই পথ ও প্রান্তরের সংযোগবিন্দু ছাড়া আর কোনখানে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, আবদ্ধ হয় না, হতে পারবে না।

ওই সংযোগস্থল থেকে যাত্রা শুরু ক'রে চ'লে যাচ্ছে কিশোর। সন্ন্যাসী কিশোর—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, হাতে দণ্ড। চ'লে যাচ্ছে—চ'লে যাচ্ছে—চ'লে যাচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসী সন্তোষবাবু মনে মনে মহাভারত রামায়ণ সন্ধান করছিলেন উপমার জন্য। পরমতত্ত্বের সন্ধানে, প্রাণের ব্যাকুলতায়, দুঃখের তাড়নায়, শান্তির প্রত্যাশায় দ্বাপর-ত্রেতার মন্দির ও অরণ্যময় ভারতের পটভূমিতে চ'লে গেল কত সন্ন্যাসী, কত যোগী, কত ব্রহ্মচারী, কত যতী, কত দণ্ডী, কত মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধভিক্ষু, কত জৈন তপস্বী কত বাউল, কত বৈষ্ণব, কত শৈব, কত শক্তি তান্ত্রিক বামাচারী, কত অবধূত—তাদের সঙ্গে রাধাকান্তকেও চ'তে যেতে দেখলেন; কিন্তু তাদের মিছিলের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারলেন না কিশোরকে।

নূতন কালে কলিযুগের ভারতোপাখ্যানে কিশোরের উপমা মিলবে। সে উপাখ্যান তাঁর জানা নাই। তবে তার পথ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে আর্তপীড়িত মানুষের পল্লীর মধ্য দিয়ে তার পথ। সেখানেই তার সাধনক্ষেত্র,—যেখানে বেদনার্ত মানুষ, সেইখানেই তার দেবতা।

বিবেকানন্দের বার্তা তিনি শুনেছেন। কিছু কিছু পড়েছেন।

মাস্টারের চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে আসছে ধীরগতিতে, দীর্ঘ রেখায়, প্রান্তে শুধু টলমল করছে দুটি অশ্রুবিন্দু।

তাঁর পঁচিশ বৎসরের সেবা সার্থক হয়েছে। কিশোর এই ইস্কুলের ছাত্র, এ ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল ক'রে সে বৃত্তি পেয়েছিল একদিন। আজ সে চলল সন্ন্যাসী হয়ে। তাঁর মনে হ'ল, জীর্ণ মলিন ইস্কুল-বাড়িটা যেন ঝলমল করছে। এ ইস্কুল উঠে যাবে তিনি জানেন। বোধ হয় নেববার আগে প্রদীপের মত একবার উজ্জ্বল হয়ে জ্ব'লে উঠল। বলে, আমার আলো আমি পাঠিয়েছি আলোক-উৎসের অভিমুখে। এবার আমি নিবব। যাক নিবে।

এ পৃথিবীর, এ দেশের মনীষীদের তপস্যার্জিত জ্ঞানভাণ্ডার—তাঁদের আদর্শ তাঁদের প্রেরণা নিয়ে নবগ্রাম সাধনা ক'রে এসেছে, ঋণ ক'রে এসেছে। আজ বোধ হয় এ দেশের এ বিশ্বের সৃষ্টির রাজসভায় নবগ্রামের প্রথম রাজকর প্রেরিত হ'ল। কিশোর নিয়ে গেল বহন ক'রে।

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অপরাহ্নের শান্তস্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হচ্ছে আকাশ মৃত্তিকা পরিব্যাপ্ত ক'রে। ঘোষণা জানিয়ে কলকল ক'রে ধ্বনি দিয়ে উঠল দ্বিপ্রহরের অবসাদগ্রস্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন বিহঙ্গমেরা।

মাস্টার সচেতন হয়ে উঠলেন।

সন্তোষবাবু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

মাস্টার ডাকলেন, সন্তোষবাবু!

সন্তোষবাবু একটু হাসলেন।

শুনেছেন ? কিশোরের সংবাদ ?

শুনেছি।—ব'লেই সন্তোষবাবু বাড়ির দিকে ফিরলেন। ভাবলেন, স্বর্ণবাবুর ঘরে যাবেন, বলবেন, উঠে যাক ইস্কুল তোমার, দুঃখ ক'রো না। যে যজ্ঞ প্রজ্বলিত করেছিলে তার চরু উঠেছে। আর কেন ? নিবিয়ে দিয়ে শান্তির জল নাও।

কিন্তু না। এ কথা স্বর্ণবাবুকে ব'লে লাভ নাই। শান্তি সন্তোষ স্বর্ণের ভাগ্যে নাই। ও জ্বলবে, অঙ্গারে পরিণত হবে।

সন্তোষবাবু নিজের ঘরে ঢুকলেন।

পনেরো

ইস্কুলের নতুন বাড়ি শেষ হয়েছে। বোর্ডিঙের বাড়ির গাঁথনি চলেছে। নতুন বাসুদেব দীঘি টলমল করছে। দূরে ভাটায় ইঁট পুড়ছে। স্কুলের আর এক দিকে একটি পুকুর, সেটি বৎসর কয়েক আগে কাটানো। তার চারিদিকে বাগানটি বেশ জ'মে উঠেছে। নবগ্রামের নব প্রতিমার মুখমণ্ডল গঠন হচ্ছে। শত শত ছেলের কোমল কচি মুখের লাবণ্য তাতে ফুটে উঠেছে। ইস্কুলের ছেলে এককালের পরিত্যক্ত প্রান্তরকে জীবন-গুঞ্জরণে মধুচক্রের মত সুন্দর এবং রসসমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। তাদের শুভ্র উজ্জ্বল আশাপ্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টি সমষ্টিভূত ক'রে এই গ্রামলক্ষ্মী-প্রতিমার চক্ষুপদ্ম প্রস্ফুটিত হবে ; দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হবে, সেখানকার চিকিৎসিত শত শত রুগ্ন লোকের ভরসায় ঈষৎ করুণ হাস্য ফুটে উঠবে দুটি ওষ্ঠাধরে। অপরূপ সে প্রতিমা! ভাগ্যবান গোপীচন্দ্র।

সন্তোষবাবু ঘরের মধ্যে ব'সে একখানি চিঠি পড়ছিলেন। কয়েক বারই চিঠিখানি পড়েছেন। প'ড়ে রেখে দিয়েছেন, আবার বার ক'রে পড়েছেন। আবার রেখেছেন, আবার পড়েছেন।

রাধাকান্তের পত্র। মধ্যে একদিন রাত্রে রাধাকান্ত নবগ্রাম এসেছিলেন। লিখেছেন, "মা মহাদেবীকে প্রণাম করিতেছি—এইরূপ কয়েক দিনই দেখিয়া গুরুকে নিবেদন করিলাম। গুরু বলিলেন, মা তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন কি না জানি না, তবে তোমার অন্তর মাকে প্রণাম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সংকল্প তুমি প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও অজ্ঞাতে সংকল্প চিত্তের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং তুমি যাইয়া প্রণাম করিয়া আইস।"

রাধাকান্ত এসেছিলেন। দীর্ঘপথ এসে গ্রামান্তরের দেবস্থানে সন্ন্যাসী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর রাত্রে এসেছিলেন অট্টহাসে।

অট্টহাস এককালের সমৃদ্ধ তীর্থস্থল।

সাধু সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীতে দেবস্থলের চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। অট্টহাসের নিকটেই ছিল সে আমলের সমৃদ্ধ বণিকপল্লীর বাজার। সেখানে আশ্রয় নিত তীর্থযাত্রীরা। নদীতে

ছিল বন্দর ঘাট, সেখানে বন্দর-ঢিপির উপর সারি সারি দোকানে জ্বলত বড় বড় প্রদীপ। এক-একটা প্রদীপে আধ সের তেল ধরত। তাতে দেওয়া থাকত দশি-কাটা অর্থাৎ তন্তুবায়দের তাঁত থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া কাটা সুতোর মোটা গুছি, চৌকো লণ্ঠনের মধ্যে ঝুলত সেই আলো। আশে-পাশে নদীর পাড়ের উপর গাছতলায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, চারি পাশে দেশ-দেশান্তরের মানুষ ঘিরে ব'সে থাকত—তীর্থযাত্রী, নৌকার নাবিক, ব্যবসায়ীর দল। অট্টহাসের জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসী-সাধকের ধুনি জ্বলত। জঙ্গলের মধ্যে সন্ন্যাসীরা আসন বাঁধতেন—পঞ্চমুণ্ডির আসন, পঞ্চরত্নের আসন, পঞ্চ ওষধির আসন। এখানে শেষ সাধনা ক'রে গেছেন রঘুবর গোস্বামী, পঞ্চতপা ক'রে গেছেন তিনি। রাধাকান্ত নিজে রঘুবরের ভক্ত ছিলেন। বৈশাখের প্রভাতে পাঁচটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার ভিতরের স্থানটুকুতে আসন বেঁধে তিনি উদয়াস্ত ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। রাধাকান্ত এবার এসে দেখে গেছেন, অট্টহাস প্রায় নিস্তব্ধ। পাঁচ-সাত জন পরিব্রাজক এবং অল্প কয়েকজন যাত্রী ছাড়া বিশেষ কেউ ছিল না। বন্দর-ঘাট অনেকদিন—প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি হ'ল উঠে গিয়েছে। তবু অপরাহ্ণে অট্টহাস মুখরিত হয়ে উঠত গ্রামবাসীদের সমাগমে। তিনি শুনেছেন, আজকাল সে জনসমাগমও নাই। আজকাল নাকি ইস্কুল-ডাঙা জনসমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাধাকান্ত ইস্কুল-ডাঙা দেখে গ্রামলক্ষ্মীকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে চ'লে গেছেন গুরুর আশ্রমে। সেখান থেকে সন্তোষবাবুকে পত্র লিখেছেন, না-লিখে আত্মসম্বরণ করতে পারেন নি সম্ভবত। লিখেছেন—"দেখিয়া মনের মধ্যে হর্ষবিষাদে যে কি এক অভূতপূর্ব ভাবোদয় হইয়াছিল, সে কথা আজ আর লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিব না। ভাব স্থায়ী নয়, সময়ান্তরে ক্ষীণ হইয়া যায়। তবে কাঁদিয়াছিলাম। আপনার জ্ঞাতার্থে আমার সেই দিনের খানিকটা ডায়রি নকল করিয়া দিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল একটি বটবৃক্ষতলে। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ইষ্টদেবতাকে বলিলাম, মার্জনা করিও মা সর্বান্তর্যামিনী। তোমাকে স্মরণ করিবার পুণ্যে এই হর্ষবিষাদ আমার না থাকিবারই কথা। তাই সর্বাগ্রে সেই হর্ষবিষাদের কথাই লিপিবদ্ধ করিব। বলিয়া ঝুলি হইতে দোয়াত কলম ডায়রি বাহির করিয়া লিখিলাম—

আমরা বহুদিন হইতে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত এই নবগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। কালের লীলায় বহুকাল পূর্বেই বহু সাধকের তপস্যার আলোকে প্রদীপ্ত এই মহাপীঠাশ্রিত নবগ্রাম ইদানীং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সমগ্র ভারতেই আজ এই অবস্থা। এই অবস্থায় যেরূপে পল্লীগ্রামের লোকে সাধারণত অজ্ঞান অন্ধকারে জীবননির্বাহ করে, তাহাই করিতেছিলাম। কিন্তু কালের গতির বিচিত্র লীলায় ভারতের এবং বঙ্গদেশে নূতন আলোকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের তপস্যার পুণ্যে অত্র গ্রামেরও সৌভাগ্য-রবি উদিত হইতেছে; তাহারই অরুণ-সারথির মত উদয় হইয়াছেন মহাভাগ্যবান গোপীচন্দ্র। আজ কর্মবলে তিনি পূর্ণপ্রকাশিত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভারতেশ্বরীর অত্র জেলার প্রতিনিধির কৃপাকটাক্ষে এবং উদ্যোগে ও গোপীচন্দ্রের বদান্যতায় এখানে এণ্ট্রান্স ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। দিকে দিকে আরও কত উদ্যোগ আয়োজন দেখিলাম। বোর্ডিং হাউস, দাতব্য

চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে—গৃহনির্মাণ হইতেছে। গ্রামের ভিতরে বালিকা-বিদ্যালয়ের আয়োজন দেখিলাম। থিয়েটারের ঘর, লাইব্রেরির ঘর—আরও কত ইমারত ওই ইস্কুল-ডাঙায় বাসুদেব-দীঘিকে বেষ্টন করিয়া নির্মিত হইতেছে। আমি মনশ্চক্ষে দেখিলাম সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ নবগ্রামের শোভা।

ইতিমধ্যে স্কুলের শিক্ষিত মাস্টার ও পণ্ডিত মণ্ডলীর আগমনে এবং শিক্ষিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্রের শুভাগমনে পল্লীর অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া আলোকোদয়ে এক অভিনব সুখের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে। কারণ জীবন যখন অন্ধকারে থাকে, তখন আর তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার থাকে না, একজনকে অনুসরণ করিয়া অন্যজন চলে অন্ধের মত। কিন্তু যখন ওই জীব আলোকপ্রাপ্ত হইয়া সৎ ও অসৎকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহারা দুই পথের কোন্ পথ গ্রহণ করিবে সেই সমস্যায় পড়ে, —যাহারা সৎকে গ্রহণ করে, তখন তাহারা যদি অসতের দমন করিয়া স্বীয় অধিকারে সৎকার্যের পরিচালন করিতে না পারে, তখন তাহাদের এক মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সর্বাপেক্ষা মর্মযাতনা অনুভব করিলাম আসিবার পথে স্বর্ণভূষণের এম. ই. স্কুলের দুরবস্থা দেখিয়া। হা ভগবান, সেটি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে।"

* * *

সন্তোষবাবু হাসলেন।

রাধাকান্ত! তোমার সন্ন্যাস ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

স্বর্ণবাবুর ইস্কুল-ঘরে আগুন লেগেছিল। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্বর্ণবাবু উন্মত্তের মত আচরণ করেছিলেন ক্রোধে। আগুন নেবাতে দেন নি। সারারাত্রি চীৎকার করেছিলেন, যাক পুড়ে, যাক ছাই হয়ে। খবরদার, কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পাবে না।

কেউ আগুন দিয়েছিল গভীর রাত্রে। গোপীচন্দ্র এ দুর্নামের বহু ঊর্ধ্বে, কিন্তু কীর্তিচন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারত। কীর্তিচন্দ্র কল্পনা অন্তত করেন, সেদিন স্বর্ণবাবুর সম্পর্কে মুখে আস্ফালন ক'রে বলেছিলেন—ওকে সাফ ক'রে দিলেই বা কি হয়! সে কথা থাক্। কিন্তু এ দুর্নাম তাঁকেও স্পর্শ করে নি। স্বয়ং স্বর্ণবাবু তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন, না না না। কখনও না। হতে পারে না।

তবে কে?

তা জানি না। তবে ও হতে পারে না।

একদৃষ্টে বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সন্তোষবাবু। তিনিই প্রথমে দেখেছিলেন আগুন। যেদিন কিশোরের সন্ন্যাস নেওয়ার সংবাদ আসে, সেই দিন থেকে তিনি এক বিচিত্র মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। ঘরের মধ্যে ব'সে থাকেন। ভাবেন, ভাবেন আর ভাবেন। ভোরবেলা উঠে একবার বাইরে বেরিয়ে প্রাতঃকৃত্য-স্নান শেষ ক'রে ঘরে এসে বসেন, ভাবেন। কখনও কখনও লেখেন। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরিয়ে স্বর্ণবাবুর কাছে

যান। অল্প দু-চারটি কথা ব'লে চলে আসেন, তারপর দীর্ঘকাল স্তব্ধ রাত্রে বারান্দায় অথবা ছাদে পায়চারি করেন। নবগ্রামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। মনে মনে কল্পনায় রচনা করেন কলিযুগের ভারতোপাখ্যানে নবগ্রামের উপাখ্যান।—

"কলিযুগে ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপ শাকদ্বীপ একদা পাঠান মোগল নামধেয় মুসলমান জাতির করতলগত হইয়াছিল। তাহার পর এক শ্বেতকায় জাতি এ দেশে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। ইহাদের নাম ইংরাজ। সপ্তসাগরবেষ্টিত পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণাংশে ক্ষুদ্র এক দ্বীপে ইহাদের বসতি। ইহাদের বর্তমান রাজার নাম সপ্তম এডওয়ার্ড। ইঁহার রাজত্বকালে কলিযুগমহিমায় সমস্ত দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমত সময়ে কোন্ কার্যকারণে, কোন্ পুণ্যফলে জানি না, সমগ্র দেশময় এক নূতন তপস্যা যেন জীবন লাভ করিল। পূর্বাপর সত্য ত্রেতা দ্বাপরের তপস্যার সঙ্গে এই তপস্যার ধারার অনেক পার্থক্য। অতীতকালের নানা ঘটনা সংঘটনের ফলে বহু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হইয়াছে। এই কালে এই ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে রাঢ় অঞ্চলে নবগ্রাম একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম; এই গ্রামে বিচিত্র ভাবে এক উপাখ্যান সংঘটিত হইল; সমগ্র জম্বুদ্বীপের ঘটনাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সংযুক্ত। এখানেও একদা মুসলমানেরা আসিয়া হিন্দুর রাজত্ব অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আত্মকলহের মধ্য দিয়া—"

লেখা এইখানেই বন্ধ। খেই হারিয়ে যায়। মনে মনে উত্থান-পতনের কাহিনী স্মরণ ক'রে যান।

শহর শ্যামলাপুরের ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয়েছিলেন। সে কলিযুগের ভারতোপাখ্যানের অংশ নয়। মহাভারতের অংশ অথবা অন্য কোন পুরাণের অংশ।

বাউরী-রাজকে ধ্বংস ক'রে এল এখানে তুর্কীরা। ধীরে ধীরে দিল্লী থেকে মুসলমানের যে অভিযান এগিয়ে এল, তার ঢেউ লাগল নবগ্রামে। ওদিকে রাজনগরে এ অঞ্চলের নবাবী আধিপত্য সুদৃঢ় হ'ল, যুদ্ধ করলে নবগ্রাম ভারতবর্ষব্যাপী ঘটনা-তরঙ্গের সঙ্গে। গন্ধবণিকেরা তুর্কীদের প্রিয়পাত্র হ'ল। বন্দর-ঘাট স্থাপিত হ'ল, গন্ধবণিকেরা হ'ল সর্বেসর্বা।

মাথা নত হ'ল গন্ধবণিকদের। তারপর মাথা তুললে সরকারেরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাগিনেয়রা।

যেটুকু দ্বিধা তাদের হ'ল, সে দ্বিধা সরকারদের শক্তি ঘুচিয়ে দিলে। সরকারবাবুরা—স্বর্ণভূষণ, রাধাকান্ত।

এদের পর এসেছেন গোপীচন্দ্র।

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ ব্যবসায়ীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে দেশান্তর থেকে অপরিমিত সম্পদ আহরণ ক'রে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজপুরুষের সহযোগিতা পেয়েছেন। নত হয়েছে সরকারেরা—স্বর্ণভূষণ।

রাধাকান্ত পলাতক।

নবগ্রামে নূতন জীবনচাঞ্চল্য জেগে উঠেছে।

কলকাতা থেকে দিকে দিগন্তরে যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারই প্রবল উচ্ছ্বাস এসে উপনীত হ'ল।

চারিদিকে জাগল সাড়া।

আবার খেই হারিয়ে যায়, দিগ্‌ভ্রান্তের মত সন্তোষবাবু ঘরের চারিদিকে চান। সেখান থেকে অন্ধকার ছাদে উঠে নবগ্রামের ঊর্ধ্বলোকের দিকে তাকান।

স্বর্ণবাবুর বাড়ি স্তব্ধ। তবু সন্তোষবাবু জানেন, মদ্যপান করছেন স্বর্ণবাবু।

রাধাকান্তের বাড়ি স্তব্ধ। সেখান থেকে যেন অস্ফুট শব্দ শুনতে পান।—শোন সত্য-প্রিয়ের কাহিনী শোন। চোখ বন্ধ ক'রে শুনে যান সন্তোষবাবু। কাশীর বউ গল্প বলছেন।

আরও একটু দূরে কোলাহল শুনতে পান—কলহ-কোলাহল, সরকার-বংশের বাড়িতে শরিকানী কলহ চলছে।

আরও দূরে গন্ধবণিকদের পল্লীতে গান-বাজনা চলছে। উচ্চ হাসি ভেসে আসছে।

আশ্চর্য, উৎসাহের সাড়া পড়েছে ওই পল্লীর কয়েকটি বাড়িতে।

আরও দূরে গোপগ্রামে রঙ্গলাল মণ্ডলের দাওয়ায় সোৎসাহ আলোচনা চলছে—রঙ্গলালের দুই ছেলে হাই-স্কুলে ভর্তি হবে। গল্প হচ্ছে নবগ্রামের ইস্কুল-ডাঙার ঐশ্বর্যের, গোপীচন্দ্রের ঠাকুরবাড়ির সমারোহের। গোপীচন্দ্রের সৌম্য মূর্তির, মিষ্ট মধুর ভাষণের প্রশংসার কথা হচ্ছে।

বার বার মাথা নাড়েন সন্তোষবাবু। দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান। ইষ্ট-দেবতাকে নয়, প্রণাম জানান বিচিত্ররূপিণী মানব-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাকে।

হারায় না, কোন কিছু হারায় না এ সংসারে। অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলেছে প্রতিটি সংঘটন। প্রতিটি উপাখ্যানের মূলে রয়েছে মনঃক্ষোভের প্রেরণা।

মানব-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার বাম চক্ষু রক্তবর্ণ। বাম হস্তে বক্র ভগ্ন নখরমালা। বাম দিকে অধরপ্রান্ত কঠিন শীতল নিষ্ঠুর হাস্যরেখায় ভীষণ। বিষজর্জর নীল মুখবর্ণ। পৃথিবীর প্রতিটি আঘাত, ক্ষুদ্রতম অপমান, সামান্যতম রূঢ় কথার ধ্যানে যে মগ্ন হয়ে আছে। কিছু তার কাছে হারায় না, কিছু সে ভোলে না।

আশ্চর্য!

এ অঞ্চলে দিকে দিকে সাড়া জেগেছে। কিন্তু মুসলমান-পল্লীতে এ সাড়া অতি ক্ষীণ। বুঝতে পারেন না সন্তোষবাবু।

ওই স্তিমিত স্তব্ধ মুসলমান-পল্লী নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

এ-দিকে ইস্কুল-ডাঙা আলোকমালায় ঝলমল করছে। ছেলেরা পড়ছে। সবশেষে ঘুরে দাঁড়ান সন্তোষবাবু উত্তর-পশ্চিম দিকে। এই দিকে—ওই দেখা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের বাড়ি।

একটা দরোয়ান ছাদের উপরে ঘন ঘন হাঁক দিয়ে পাহারা দিচ্ছে—অ-হ! অ-হ! হ-হ! ওই দেখা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের শোবার ঘর। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। উপরে টানা-পাখা চলছে। পালঙ্কের উপর পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ গোপীচন্দ্র শুয়ে রয়েছেন। দীর্ঘদিন গোপীচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কোমরে ব্যথা থেকে বাত হয়েছে।

কিশোরের যে দিন সন্ন্যাসী হওয়ার সংবাদ আসে, সেদিন কিশোরের মায়ের আকস্মিক কান্নার শব্দ শুনে চমকে উঠে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কোমরে ব্যথা ধরিয়েছিলেন। সেই ব্যথা সারে নি, পরিণত হয়েছে স্থায়ী বাতব্যাধিতে। চলতে ফিরতে পারেন না এমন নয়, তবে বেদনাটা অহরহ আছেই। মধ্যে মধ্যে বাড়ে, তখন চলাফেরার শক্তিও থাকে না। স্থানীয় সেই পাগল ডাক্তারটি তাঁর কাছে এসে প্রায়ই ব'সে থাকে। গল্প করে, কল্পনা করে। কান্ত-কুঞ্জ ব্রাহ্মণ, বন্দমেল—এসব এখন কল্পনায় স্থান পায় না। এখন কথা হয় ডাক্তারখানার। ডাক্তার ওখানে চাকরি পাবে। ডাক্তার বলেছে, এ বয়সে এ-ধরনের বেদনা, আকস্মিক আঘাত থেকে বাত হয়। সারতে দেরি হবে।

গোপীচন্দ্র অধীর হয়ে কলকাতায় গিয়ে দেখিয়ে এসেছেন। তারাও বলেছে, সময় নেবে

সে দিন ডাকিয়েছিলেন এখানকার প্রবীণ কবিরাজকে।

সেই স্থানীয় প্রবীণ কবিরাজ, যিনি কৃষ্ণ চাটুজ্জেকে কাশী যেতে সাহস দিয়েছিলেন।

কবিরাজ বলছেন, সারবে না।

গোপীচন্দ্র বলছেন, আমার যে অনেক কাজ কবিরাজ!

সংসারের সৃষ্টিকাল থেকে কাজের আর বিরাম কখন বলুন? চলছে, চ'লে আসছে, লয় কাল পর্যন্ত চলবে। কিন্তু মানুষকে থামতে হয়, যেতে হয়।

যেতে হয়? তবে—?

না। সে আমি বলছি না। যতক্ষণ না এর সঙ্গে আমাশয় দেখা দেয়, ততক্ষণ কোনও চিন্তার কারণ নাই। আমাশয় আপনার সঞ্চিত ব্যাধি। ওটা তখন উঠবেই। তবে উইল বিষয়-ব্যবস্থা এ সব ক'রে রাখতে ক্ষতি কি? ইচ্ছা হ'লে তীর্থস্থানে গিয়ে বাসও করতে পারেন।

মহাকর্মী গোপীচন্দ্র। অনেক কর্ম তাঁর কল্পনায়।

ইস্কুল, বোর্ডিং, ডাক্তারখানা, চতুষ্পাঠী, অনাথ আশ্রম, ধর্মশালা, বহু নূতন দেব-প্রতিষ্ঠা, বড় বড় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা—

আরও কল্পনা আছে।

নবগ্রামের পশ্চিমে প্রান্তর—এই প্রান্তরকে তিনি স্বতন্ত্র অভিধা দিয়ে বিপুল সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাবেন। সে অভিধা তাঁর নাম, তাঁর স্মৃতি, তাঁর গৌরবকে বহন করবে —গোপীচন্দ্রপুর। গ্রাম নয়, নগর। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

শত শত বৎসর পরে ভাবীকালের মানুষ আসবে গোপীচন্দ্রপুরে, বিমুগ্ধ হয়ে দেখবে। নমস্কার ক'রে যাবে তাঁকে।

চেয়ারে ব'সে তাঁর নীল স্বচ্ছ চক্ষু দুটি ভাবীকালে চ'লে যায়।

কবিরাজের কথায় শঙ্কিত হয়ে তিনি কলকাতা থেকে ডাক্তার আনালেন। ডাক্তার বললেন, এ বয়সে বাত একেবারে সারবে না, তবে অচিরেই ক'মে যাবে।

কবিরাজ অন্য কথাগুলি শুনে বলেছেন, বলতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু বলে না।

দূর থেকে গোপীচন্দ্রকে দেখে সন্তোষবাবুর মনে হয়, একটা কালের স্রষ্টা, নবগ্রামের একটা কালের ঈশ্বর। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ নীলচক্ষু গোপীচন্দ্র স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছেন।

গোপীচন্দ্রের পর কে?

সন্তোষবাবু পদচারণা করেন।—কে?

গোপীচন্দ্রের কীর্তি থেকে কে যাবে বিশ্বসৃষ্টির রাজসভায়, কোন্ কর বহন ক'রে, এই কলিযুগের ভারত-জীবন-প্রবাহে নবগ্রামের জীবন-তরঙ্গ বহন ক'রে নিয়ে?

ভাবেন সন্তোষবাবু।—যাবে বইকি কেউ। নইলে পূর্ণ হবে কেমন ক'রে এ উপাখ্যান? প্রতি জনপদ, প্রতি গ্রাম থেকে যাবে জীবন-তরঙ্গ।

ভাবনার খেই হারিয়ে যায় আবার। ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন গোপীচন্দ্রের শয়নকক্ষের দিকে।

গোপীচন্দ্রকে অস্থির মনে হচ্ছে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছেন। কেউ যেন পাশে এসে বসল। কে? ডাক্তার এসেছে।

* * *

ভুল দেখেন নি সন্তোষবাবু। পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ স্বর্ণবাবু এসে ঘরে ঢুকে বললেন, যাবে মুখুজ্জে?

কোথায়?

তোমার মহাভারতের মহানায়ক চললেন কলকাতায়। আজ কদিন থেকে অসুখ খুব বেড়েছে। কাল রাত্রে আমাশয় দেখা দিয়েছে। শ্যামপুরের কবিরাজের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তিনি আসেন নি। অসুখ ব'লে এড়িয়েছেন। চল, দেখা ক'রে আসি। কলকাতায় যাচ্ছেন, চিকিৎসা করাবেন, পাকা বন্দোবস্ত ক'রে উইল করবেন।

সন্তোষবাবু উঠলেন।—চল, যাব।

আজ দিনটি নবগ্রামে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, দু দিন আগে থেকেই একটা বাদলা নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। চৈত্রের শেষ। বসন্তের বাতাস মোড় ফিরিয়ে উত্তর দিক থেকে বইছে, নতুন ক'রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। তবু এর মধ্যে গোপীচন্দ্রের বাড়ির পাশে লোকজনের ভিড়ের আর অন্ত নাই। উৎসুক হয়ে মেয়েরা এসে জমেছে। গোপীচন্দ্র কলকাতায় যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ট্রেন রাত্রে, কিন্তু যাত্রার শুভক্ষণ সকালেই সবোত্তম ব'লে এখনই যাত্রা ক'রে তিনি ভিতর-বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিনটা বিশ্রাম করবেন তাঁর নিজের কীর্তিভূমি ওই স্কুল-ডাঙায়। সেখান থেকে রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রা করবেন ট্রেন ধরতে। এ যাত্রার মধ্যে চারিদিকে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে উঠেছে। লোকে দলে দলে তাঁর যাত্রা দেখতে আসছে, যেন তিনি আর ফিরবেন না। তাই সন্তোষবাবুও আজ এসে দাঁড়ালেন এদের পাশে। গোপীচন্দ্র মহাভাগ্যবান, ভগবানের অনুগৃহীত, বহু পুণ্যের অধিকারী, মহিমময় ব্যক্তি। নবগ্রামের একটি কালের তিনি স্রষ্টা। তিনি খণ্ডকালের মহেশ্বর। তাঁকে দেখবেন বইকি!

আকাশ মেঘম্লান।

সন্তোষবাবুর মনে হ'ল, নবগ্রামের ভাগ্যাকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আকাশে। চারিদিকে গুঞ্জন উঠেছে, সমবেত লোকেরা মৃদু গুঞ্জনে সমবেদনা প্রকাশ করছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আর একদিনের কথা। গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্তম্ভের সূচনা হয়েছিল সেই দিনটিতেই, কুলীনপাড়ার কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা করেছিলেন সেদিন। বর্ষার শেষ ছিল সময়টা। শরতের প্রারম্ভ। শরতের প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল। মধ্যে মধ্যে লঘু মেঘ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ছায়ার বিষণ্ণতায় বিষণ্ণ ক'রে তুলতে পারে নি। মানুষও এসেছিল দলে দলে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হিন্দু এসেছিল, মুসলমান এসেছিল। প্রত্যেকেরই মুখে ওই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। মৃত্যুর মধ্যে যে অভয় অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জে, পার্থিব সমস্ত কিছুর নশ্বরতার অতীত অবিনশ্বর মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের যে স্পর্শ পেয়েছিলেন সেকালের সে বৃদ্ধ, তারই প্রতিবিম্ব যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সকল পটভূমিতে, সকল পাত্রের সর্ব অবয়বে—সেদিনের উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্যন্ত সকল ক্ষণটি পরিব্যাপ্ত ক'রে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের জ্যোতির প্রতিচ্ছটা যেমন তীরবর্তী তরুশীর্ষকে উজ্জ্বলতর উষ্ণতর ক'রে তোলে, তেমনই ভাবে।

গোপীচন্দ্রের যাত্রার রূপ স্বতন্ত্র।

হাসলেন সন্তোষবাবু। কাল যে স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণ চাটুজ্জের প্রয়াণের দিনেই একটি কালে ছেদ পড়েছিল। সেই দিনের সূর্যাস্ত তিনি দেখেন নি। তাঁর দুর্ভাগ্য।

গোপীচন্দ্র নবগ্রামে নূতন কল্পের প্রবর্তন করেছেন। তিনি নূতন কল্পের মানুষ। দেশ-দেশান্তরে অব্যাহত কর্মের মধ্যে তিনি শুধু সম্পদ সংগ্রহ ক'রে আনেন নি, এনেছেন—সে দেশে এসেছে যে নূতন কাল, সেকালের আলোক, সেকালের ধারাকেও বহন ক'রে এনে ছড়িয়ে দিয়েছেন নবগ্রামের চারি পাশে।

রাস্তার দুই ধারে—এখান থেকে ইস্কুল-ডাঙা পর্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে বই বগলে গ্রাম্য কিশোরেরাও এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। যে ঋণ বাইরের জগতের কাছে গ্রহণ ক'রে নবগ্রামকে সমৃদ্ধ করলেন, এদের ঋণী করলেন, এরা সেই ঋণ শোধ করবে। এ তো শুধু গোপীচন্দ্রের ঋণ নয়, এ যে নবগ্রামের ঋণ।

শিউরে উঠলেন সন্তোষবাবু। ঋণ শোধ করবে? কি ভাবে ঋণ শোধ করবে? গোপীচন্দ্রের গৌরবকে অতিক্রম ক'রে, পরাজিত ক'রে, নবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার মুখ তার দিকে ফিরিয়ে?

মূকং করোতি বাচালং—। বংশলোচন এসেছেন। শ্লোক অর্ধসমাপ্ত রেখে স্বর্ণবাবুকে বললেন, তুমি আজ একটা মিটমাট ক'রে নাও স্বর্ণ। লক্ষ্মী ছেলে, বাবা ছেলে, সোনা ছেলে আমার!

স্বর্ণ মুখ ফেরালেন।

অকস্মাৎ সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতার আকস্মিকতায় চিন্তামগ্ন মন চকিত হয়ে উঠল। এ স্তব্ধতা গোপীচন্দ্রের যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। তাঁকে নিশ্চয়ই দেখা গেছে। সম্ভবত বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি পালকি এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াল। পালকির মধ্যে গোপীচন্দ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ হাতখানি দেখতে পেলেন সন্তোষবাবু।

পালকি নামানো হ'ল। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন পালকি থেকে। কীর্তিচন্দ্র ও ছোট ছেলে পবিত্রের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সকলকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন। দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করলেন। পাড়ার মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলেন এক দিকে, তাঁদের মধ্যে থেকে স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী দুর্দান্ত অমূল্যের মা এগিয়ে এসে একটি আশীর্বাদী ফুল তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, শিগগির শিগগির ভাল হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আশীর্বাদ করুন আপনারা।

আশীর্বাদ করছি অহরহ। শতবার। অসুখ শুনে থেকে দেব-দেবীকে ডাকছি, বলছি ভাল ক'রে দাও বাবা, নবগ্রামের আশা-ভরসা, নবগ্রামের কল্পবৃক্ষ আমাদের গোপীচন্দ্র—তাঁকে সুস্থ ক'রে দাও। ইস্কুল করলে, ডাক্তারখানা করলে, বোর্ডিং করলে, তুমি বেঁচে থাকলে আরও অনেক—অনেক হবে, অনেক পাবে নবগ্রাম। নবগ্রাম কেন, সমস্ত অঞ্চলের লোক।

গোপীচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন, ইচ্ছা অনেকই আছে দিদি। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ফিরি তো হবে।

ফিরবে বইকি। আবালবৃদ্ধবণিতা প্রাণ ভ'রে ডাকছে ভগবানকে। তিনি কি শুনবেন না?

গোপীচন্দ্র বললেন, তাঁর ইচ্ছা। তবে যদি না ফিরি, তবু আটকে থাকবে না। ছেলেদের ব'লে গেলাম। যাবার আগে, গ্রামের সকলকে ডেকে, সকলের সামনে তাদের ব'লে যাব। —আমার বাবার নামে টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে।

রজনী-ঠাকরুন এবার এগিয়ে এসে বললেন, ওই ব্যবস্থাটি করবেন না দাদা। লেখাপড়ার সঙ্গে শহরের ফ্যাশান এসে ঢুকবে, মেয়েরা দু-ই মিলিয়ে চতুর্ভুজ হবে। চতুর্ভুজ হ'লে যে কি হয়, সে তো স্বচক্ষে দেখলেন।

রজনী-ঠাকরুন আঙুল দিয়ে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিলেন রাধাকান্তের বাড়ি,—কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি কাশীর বউয়ের কথা বলছেন।

গোপীচন্দ্র বাড়িটার দিকে তাকিয়েই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, রাধাকান্ত আমার মামা। তাঁর স্ত্রী আমার মামীমা, মাতৃতুল্যা। তিনি কই?

মেয়েদের মধ্যে থেকে, বোধ হয় রজনী দেবীর পিছন থেকেই বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন কাশীর বউ। মুখ তাঁর অনাবৃত।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গোপীচন্দ্র। সমস্ত জনতা অবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে ফেলতে গোপীচন্দ্রের বিলম্ব হ'ল না। তিনি প্রসন্ন মুখে মিষ্ট কণ্ঠে বললেন,

আজ আমি আপনাকে প্রণাম করব।

পিছিয়ে গেলেন কাশীর বউ। বললেন, আমার অপরাধ হবে। আপনার প্রণাম নেবার যোগ্যতা কারুও নেই এ অঞ্চলে। বরং আমি আপনাকে প্রণাম করব।

তিনি হাত বাড়ালেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, না, আমিও এমনিই আশীর্বাদ করছি, সমস্ত অন্তর ঢেলে আমি আশীর্বাদ করছি।

কাশীর বউ ডাকলেন, গোরাকান্ত!

সন্তোষবাবু তাকালেন চারিদিকে। ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে ছোট ছেলেটি গৌরীকান্ত!

কই, গৌরীকান্ত?

পুরোহিত বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, না না। কই? গৌরীকান্ত কই?

কাশীর বউ বললেন, সে নিশ্চয় নেই এখানে। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুভ সময় চ'লে যাচ্ছে।

না না। যাবে কোথায়?

সে গেছে—। সে যায় তার বাবার তৈরি করা বাগানে। সেখানে মধ্যে মধ্যে ছুটে গিয়ে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে গেছে বোধ হয়। আপনি আর দেরি করবেন না।

গোপীচন্দ্র গিয়ে পালকিতে উঠলেন।

পালকি উঠল। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কেবলই মনে হতে লাগল, একটি ছোট ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্জন প্রান্তরে, এক গাছ থেকে আর এক গাছের কাছে যাচ্ছে। কেন? কি খোঁজে? কি সুখ পায়? বাপকে খোঁজে? একটু অধীর হয়ে উঠলেন গোপীচন্দ্র।

সন্তোষবাবুও সঙ্গে সঙ্গে চললেন মোহগ্রস্তের মত।

সন্তোষবাবু সারাটা দিন দাঁড়িয়ে রইলেন ইস্কুল-ডাঙায়।

দু চোখ ভ'রে দেখলেন, এত বড় একটি মানুষকে মানুষ কত ভালবাসে! মানব-প্রকৃতির আর একটা দিক তিনি আজ দেখলেন। দক্ষিণ চোখ করুণা-ছলছল, প্রীতি-টলমল দৃষ্টি, প্রসারিত হাতে বুকে টেনে নেওয়ার ব্যগ্রতা, আর চোখে মধুর হাস্য, মুখবর্ণ ক্ষমাময়ী ধরিত্রীর শ্যামকোমল বক্ষবর্ণের মত সুশ্যাম; এ পৃথিবীর সামান্যতম সেবা, ক্ষুদ্রতম উপকার ধ্যান ক'রে সে কি বিভোর! অথচ কি কঠিন দ্বন্দ্ব! এই যে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, এর কোথায় থাকে এ ভালবাসা?

মানব-প্রকৃতির অন্তরবাসিনী বিচিত্ররূপিণী দেবতা।

হারায় না কিছু তার। ভোলে না কিছু সে। ওই কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রীতি এবং আক্রোশ দুই ধারায় চলেছে জীবন-কুরুক্ষেত্র। মৃত কুরুদের তর্পণ করে পাণ্ডবেরা, চোখে নামে বেদনার্ত অশ্রু, স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কত স্মৃতি! কত উচ্চহাস্যমুখরিত অপরাহ্ণ, কত প্রভাত, কত উর্বশী-উদ্ধারের স্মৃতি!

হঠাৎ একটা আলোর ছটা তাঁর চোখে এসে লাগল। বাইসিক্লের আলো, গ্যাসের আলো। কখন সন্ধ্যা হয়েছে, খেয়াল ছিল না তাঁর। ওদিকে গাজনের ঢাক বাজছে। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ। সংক্রান্তির আর দেরি নাই। এই বাজনার মধ্যে গোপীচন্দ্র চলেছেন খণ্ডকালের মহেশ্বরের মত। ইস্কুলের বোর্ডিঙে ছেলেরা পড়ছে। শব্দ আসছে তার। গোপীচন্দ্রকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে সন্তোষবাবু বাড়ি ফিরলেন।

নির্জন মাঠের পথ। এ পথ সেই পথ, যে পথের পাশে পাশে কোঙা-কাঁটা বসাতে আদেশ দিয়েছিলেন স্বর্ণবাবু। নাসের ছেলেদের কথা শুনে কাঁটা বসায় নি, তুলে ফেলে দিয়েছিল ব'লে স্বর্ণবাবু নাসেরের গলা টিপে ধরেছিলেন। পথখানি আর সে পথ নাই। মন্থর পরিচ্ছন্ন পথ। ছেলেদের পায়ে পায়ে সুন্দর পথে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। কে, কে কথা কইছে? এই মাঠের পথে, স্ত্রীকণ্ঠ শুনে চমকে দাঁড়ালেন সন্তোষবাবু। শুনতে পেলেন, কে যেন নারীকণ্ঠে কাকে বলছে, যাও, চ'লে যাও, চ'লে যাও। আমি এইখানেই রয়েছি। ভয় নেই। ভয় নেই।

আমি পারব। আমি পারব।—বিস্ময়ের অবধি রইল না সন্তোষবাবুর। শিশুকণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে, আমি পারব। আমি পারব।

অন্ধকারের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

চ'লে আসছে একটি ছেলে। কে? গৌরীকান্ত?

ওদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, ভয় নেই।

সন্তোষবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, গৌরী!

আপনি? পিসেমশায়?

কোথায় যাবে তুমি?

গোপীচন্দ্রবাবুকে আমার প্রণাম করা হয় নি। প্রণাম করতে যাচ্ছি।

সঙ্গে যাই?

না। মা দাঁড়িয়ে আছেন ওই গ্রামের ধারে।

শব্দ ভেসে আসছে—চ'লে যাও। ভয় নাই। চ'লে যাও।

কাশীর বউয়ের কণ্ঠস্বর এবার চিনতে পারলেন সন্তোষবাবু।

গৌরীকান্ত চ'লে গেল। সন্তোষবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন।

ওদিকে গাজনের ঢাক বাজছে।

এদিকে কলরব উঠছে। বোধ হয় গোপীচন্দ্রের পালকি উঠবে।

সন্তোষবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। মনে হচ্ছে, যেন নবগ্রামের রঙ্গমঞ্চে জীবননাট্যে একটি অঙ্কশেষে পটক্ষেপণ হচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে।

চ'লে যাও। ভয় নেই। চ'লে যাও।—কাশীর বউ হেঁকেই চলেছেন।

যতিভঙ্গ

শ্রীমান বিশ্বনাথ রায়

কল্যাণীয়েষু

কতদিন ঠিক মনে নেই, তবে বছর দু'তিনের বেশী নয়, একজন সাংবাদিক একটি ফিচার লিখেছিলেন—দিল্লী সম্পর্কে ফিচার—তাতে লিখেছিলেন একটি বিচিত্র-চরিত্র মোহিনী নারী সম্পর্কে।

দিল্লী আজকাল আর অনেক দূর নয়, সাংবাদিকদের কাছে তো নয়ই; তাঁদের কাছে আজ মস্কো, পিকিং, লণ্ডন, নিউইয়র্ক সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া চলে; দিল্লী আজ এবেলা গিয়ে কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যেতে খানিকটা কনটপ্লেসে ঘুরে ওবেলা এই সব রহস্যময়ীদের দেখে কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ ফিরে আসা সম্ভবপর। এবং দিল্লীর কাছে—কলকাতার কথা থাক—বোম্বাই শহর, রোমাঞ্চকর সংবাদ এবং রোমাঞ্চ সংবাদের কেন্দ্রবিন্দুও, এই বিচিত্র-চরিত্র নারীর অস্তিত্ব-গৌরবে হার মেনে যায় এ স্বীকার করতে হয়।

রূপে এবং সজ্জায় হয়তো বোম্বাই শহরের মনোহারিণীরা দিল্লীর কাছে হার মানবেন না কিন্তু চরিত্রবৈচিত্র্যে হার মানতেই হবে বোম্বাইকে। কারণ রাজধানী দিল্লীর পার্লামেণ্ট হাউস থেকে চাণক্যপুরী পর্যন্ত যে প্রসারিত ক্ষেত্র—সে ক্ষেত্রে যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য, তা শুধু আর্থিক সমৃদ্ধিতে উর্বর বোম্বাই-ক্ষেত্রে কখনও ফোটে না। ওর জন্যে প্রয়োজন হয় রাজনীতির রাসায়নিক সার প্রয়োগের।

যাক গল্পটা মনে করিয়ে দি। এই সাংবাদিক কুতুবের ওখানে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীকে দেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও-অঞ্চলের রুজ লিপস্টিক মাখা মুখ, আঁকা ভুরু, চোখে কাজল, কেটে ফেলে ছোট করা খুকীবয়েসী কেশসজ্জা, পেটকাটা ব্লাউস, ভারতীয় মনোহারিণী শাড়ি বাংলার ঢঙে পরা একটি মেয়ে, মুখে সিগারেট নিয়ে চপ্পল পায়ে গায়ে গায়ে যেন সেঁটে ছিলেন। বয়স তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ। একেবারে আবদেরে খুকির মত সাহেবের কাঁধে ঝুলেই ঘুরছিলেন একরকম।

ওখানকার রমণীরা স্বাস্থ্যবতী, শক্তিমতী, সাহসিনী—এই বেশভূষা তাঁদের অর্থাৎ নাগরিকাদের আটপৌরে। বাজারে দোকানে তাঁরাই বাজার করেন, দর করেন, বাড়িতে এই বেশ-বাসকেই শক্ত করে ঘুরিয়ে কোমর বেঁধে গৃহকর্ম করেন, আপিস যাঁদের আছে তাঁরা এইভাবেই সেজেগুজে আপিস করেন। অফিসারের পদ থেকে কেরানীর পদ পর্যন্ত, টেলিফোন অপারেটারের কাজ থেকে রেলওয়ে বুকিং ক্লার্ক তক্। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন্ দপ্তর নয়! মেয়েরা আজ জীবনের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশীদার হতে চলেছেন। সেখানে পুরুষদের কোট প্যাণ্ট টাই-পরা সাহেবীআনা বা অফিসারিআনার সঙ্গে বা বেশভূষাতেও তাল না রাখলে চলবে কেন?

তবে বাংলাদেশে আমাদের মেয়েরা বেশভূষায় চলনে বলনে এখনও বাঙালী ঘরের বিনম্র মাধুর্য যেটা বজায় রেখেছে তা ওরা ফেলে দিয়েছে। তার সঙ্গে দিল্লী বোম্বাইয়ের তফাত অনেক—ওখানে রঙ চড়া এবং জীবনের ঢঙ কড়া। দিল্লী বোম্বাই-এর মধ্যে ফারাক—বোম্বাই রঙে চড়া, দিল্লী ঢঙে কড়া। বোম্বাইয়ে মেয়েরা ব্যস্ত এবং উল্লাসময়ী, দিল্লীতে মেয়েরা ব্যস্ততার মধ্যে শক্ত এবং উল্লাস প্রটোকলের ইস্তিরিতে পরিপাটী।

বোম্বাইএর জীবনে টাকার দেমাক বেশী, দিল্লীর জীবনে টাকার চেয়ে মেজাজের দেমাক বেশী। দিল্লীর এই রঙ ও ঢঙের মধ্যে এই মেয়েটি আবার সেই মেয়ে, যাকে দেখবামাত্র মনে হয় এ মেয়ে বিশেষ নাগরিকা—যে নাকি দিল্লীর এই রঙ-ঢঙকে দুনিয়ার যে কোন দেশের রঙ ও ঢঙের মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যার আঁচলে ওই শ্বেতাঙ্গনন্দনটি অনায়াসে বাঁধা পড়েছেন, উনি কে, এবং শ্বেতাঙ্গটিই বা কে সাংবাদিকের জানা ছিল না। তবে উনি কোন বিদেশের ধুরন্ধর গোপন তথ্যসন্ধানী এবং ইনি এদেশের গোপন পরিচয় সন্ধানকারিণী বা সংবাদ সরবরাহকারিণী হলে বিস্ময়ের কিছু নেই এটুকু তাঁর জানা ছিল। সুতরাং ক'দিন ঘুরে ঘুরে সংবাদ নিয়ে জানলেন, মেয়েটি নিছক বিলাসিনী। ওই শ্বেতাঙ্গনন্দনকে পাকড়াও করে জীবনে ধন্য হয়েছেন।

তিনি নিজেই বলেছিলেন, মদের গ্লাস হাতে বলেছিলেন, ওর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। মিছে আমার পিছনে ঘুরো না, চলে যাচ্ছি আমি এদেশ থেকে। এখন আমি আলেয়া, অনর্থক ঘুরে হয়রান হবে। বলে তিনি খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন ব্যঙ্গভরে।

সুতরাং তোগলকাবাদে পুরনো কেল্লার যে অংশটায় বাজারের ধ্বংসাবশেষ, যেখানে রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট খুপরি দোকানঘরগুলির চিহ্ন আছে, সেখানে এমনই এক বিচিত্র কন্যাকে দেখে বিস্ময়ের কিছু আমিও দেখতে পাইনি। একলা একটি তরুণী বড় কুলুঙ্গির মত একটা দোকানঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দোকানের সেই ভাঙা ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—পাঞ্জাবের রঙ, টকটকে রক্তাভ, গৌরী। মেয়েটি সুন্দরীও বটে। এবং লাস্যময়ী যা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। পরনের কাপড়ের জামার রঙ ফিকে নীল বা সবুজ দুটোর একটা, পাদুখানিকে খানিকটা ভেঁজে দুই হাতে মুঠো বেঁধে ধরে রেখেছে; লম্বা আঙুলগুলির নখের উপর টকটকে নেলপালিশ। হ্যাঁ, সেই মুঠোর মধ্যে একটা গগল্‌স ধরা ছিল। ওটা তো এযুগে আধুনিকতার বোধ করি একনম্বর সিগন্যাল। মুখে রঙ না থাকতে পারে, চুলও খাটো করে না কাটতে পারে কিন্তু গগল্‌স থাকবেই। চোখ তুলে অসংকোচে যার মুখের দিকে খুশি তাকাতে সংকোচের বালাই ঘুচে যায়, চোখে চোখে মেলে না; এবং যার চোখে গগল্‌স থাকে তার পরিচয়টাও একটু ঢাকা থাকে। পাশে পড়ে একটা ভ্যানিটী ব্যাগ আর একটা ঝোলা। কিন্তু এ তো বড় বিচিত্র ভঙ্গি!

এমন করে সাতশো বছরের পুরনো ভাঙা কেল্লার দোকানের কুলুঙ্গিতে সাজানো পুতুল হয়ে বসতে ইচ্ছে হল কেন ওর?

বিরহিণী?

অথবা অভিমানিনী কলহান্তরিতা?

কেল্লা দেখতে এসে প্রিয়জনের সঙ্গে কলহ করে এই ধ্বংসস্তূপের অলিগলির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এমন করে বসে আছে? ধ্বংসস্তূপ বলে খেয়ালই নেই, এখানে সাপ কম বটে কিন্তু বিছু কম নয়; কীটপতঙ্গ তো আছেই। এবং ধ্বংসস্তূপের ফাটল, গর্ত তাদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান; হাজার হলেও বাদশাহী ধ্বংসস্তূপ—সমতলের বা অনাবৃত মাটির গর্তের

থেকে অনেক আরাম পায়। কীট-পতঙ্গের কামড় বা দংশন মারাত্মক হয়তো নয় কিন্তু মর্মান্তিক; একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালেই সারা শরীরটা চমকে ওঠে, অর্ধেক দিন জ্বালা করে।

মনে মনে একটি সরস কৌতুক এবং কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়েছিল। এবং ক্যামেরা নেই বলে আপসোস হয়েছিল। একখানা ছবির মত ছবি হত!

ওই দিকে তাকিয়েই এগিয়ে চলছিলাম। তার চোখের গগল্‌স খোলা ছিল; অনাবৃত মুখখানাই দেখতে পাচ্ছিলাম। যে যেমন ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিই রইল, আমাকে আমলেই আনল না।

অল্প বয়স হলে এক্ষেত্রে প্রেমে পড়বারই কথা কিন্তু ষাট বছর বয়সের পর যখন 'বিদায় দে মা ফিরে আসি' গান মনে গুঞ্জন তোলে তখন দুনিয়ারই চেহারা পালটে যায়, ও-ভাবনা উঁকি মারলেও মানুষ তাকে ঘাড়ধাক্কা দেয়। অন্তুতঃ সজ্জনে দেয় এবং অসজ্জন আমি নই। যেতে যেতে থমকে না-দাঁড়িয়ে পারলাম না; কারণ মনে হল—যা মনে হল সে কথাটা সে আমার দিকে তাকাতেই বলে ফেললাম, এক্‌সকিউজ মি মাদার, ডু ইউ ফীল আনওয়েল?

কারণ একটি বেদনার ছায়া যেন মেয়েটির রঙকরা মুখের রঙ ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল বলো মনে হয়েছিল আমার।

তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল, অন্যথায় একটু চাঞ্চল্যও সারা শরীরে দেখা গেল না। সে বললে, হোয়াট? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমি বললাম, আমার মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ অথবা ক্লান্তি বোধ করছ। সেইজন্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করছি।

—ধন্যবাদ তোমাকে। না, দুটোর কোনটাই নয়। কিন্তু তুমি আমাকে মা বললে কেন? সঙ্গে সঙ্গে বক্র হেসে বললে, আমি তোমার মা? তা হলে তো আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তোমারই তো মরবার বয়স হয়েছে।

তারপর আরও একটু হেসে বোধ করি তার শক্ত কথাগুলিতে একটু রসিকতার সিঞ্চন দিয়ে মোলায়েম করবার জন্যে বললে, তুমি খুব রসিক লোক। আমি কি খুব বুড়ো?

আমিও হেসে বললাম, তোমার এ কম্‌প্লিমেণ্টের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি দুঃখিত, আমাকে মার্জনা করো তুমি, তোমাকে আমার ছোট্ট মা—লিট্‌ল্ মাদার বা ইয়ং মাদার বলা উচিত ছিল।

সেইভাবে আধ-শুয়েই সে কথা বলছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ে নি। যেন লীলাচ্ছলে কথাগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। সে হেসেই বললে, কিন্তু তাই বা বলবার দরকার কি ছিল?

বুঝলাম, এ মেয়ে চিরযৌবনের স্বপ্নে বিভোর, আধুনিকতার কড়া নেশায় আচ্ছন্ন; একটু রাগও হল, সংবরণ করেই বললাম, দেখ, আমাদের ভারতবর্ষে সাধারণ মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক দুটি—

বাধা দিয়ে সে বললে, থাক, আমাকে বিশ্রাম করতে দাও। অনুগ্রহ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ যাও।

আমি কথা না বাড়িয়ে পা বাড়ালাম। মনের মধ্যে মেয়েটির কথাগুলো কাঁটার মত

খচখচ করছিল, জবাব না দিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, তবুও এগিয়ে চললাম। মনে মনে বার বার বাংলাদেশের মেয়েদের কথা স্মরণ হল। তারা এমন কথা কখনও বলত না। সেখানেও মহেন্দ্রাণীর মত রূপসী আছে। তারুণ্য এবং রূপ সম্পর্কে প্রতি পদক্ষেপে সচেতন মেয়েকেও মা বলে সম্বোধন করলে তারা শ্রদ্ধায় বিনম্র হয়। এরা, বিশেষ করে ইয়োরোপের শিক্ষায় মোহমুগ্ধা দিল্লীর মেয়ে যারা, তারা জাত হারিয়েছে।

হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনলাম, হ্যালো! হ্যালো ওল্ড জেণ্টেলম্যান!

ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে কুলুঙ্গি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ফিরতেই সে ডাকলে, মেহেরবানী করে একবার শুনবে?

ফিরে এলাম। হয়তো সে অনুতপ্ত হয়ে থাকবে। নিজের পাওনাটুকু পাবার প্রত্যাশাতেই বোধ হয় ফিরে এলাম, বললাম, বল।

সে-ধার দিয়েও সে গেল না; ওর জাতই আলাদা। বললে, তোমার কাছে ফ্লাস্ক রয়েছে, কি আছে ওতে? জল না চা-কফি, না—। থেমে গেল কিন্তু এরপর বলাই বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, না, সে পানীয় আমি রাখি নে। ওতে বিশুদ্ধ জলই আছে।

—আমায় একটু জল দেবে? তিয়াস পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

ফ্লাস্ক খুলে ঢাকনি-গ্লাসটা জলে ভরতি করে দিয়ে বললাম, নাও।

সেটা নিঃশেষ করে বললে, যদি পারো আরও একটু দাও।

তাও দিলাম। এরপর সে বললে, ধন্যবাদ। কিছু মনে করো না, তোমাকে কড়া কথা বলেছি হয়তো।

বললাম, না, না। কি মনে করব? মরবার বয়স তো হয়েছে আমার। এবং সে সম্বন্ধে আমি একটু বেশী সচেতন। আমার বন্ধুরাও বলেন, এত বেশী ভাব কেন মৃত্যু মৃত্যু করে?

—তুমি দার্শনিক?

—না।

এক কথায় ছেদ টেনে দিতে চাইলাম। এবং যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। কিন্তু সে বললে, অনুগ্রহ করে আর একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ালাম।

—তোমার সব দেখা শেষ হয়েছে?

—আমি আগেও এখানে এসেছি। আজও এসেছি অনেকক্ষণ। এবার ফিরব। কিন্তু কেন বল তো?

—আমাকে নীচে রাস্তা পর্যন্ত নেমে যেতে একটু সাহায্য করবে? এর পর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, দেখিয়ে, ময় নে আপকো ঠিক বাত নেহি বোলি থি।

এবার ইংরিজী ছেড়ে দিল্লীর উর্দু ঘেঁষা হিন্দী ধরলে সে। বললে, পা-টা আমার জখম হয়েছে। একটা ঠোক্কর খেয়েছি। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটার নখটা ছেড়ে গেছে। কাউকে না ধরে নামতে পারব না মনে হচ্ছে। বাসেও চড়িয়ে দিতে হবে।

কথা কেড়ে নিয়েই বললাম, নিশ্চয়। আমার সঙ্গে ট্যাক্সি আছে, সঙ্গেও কেউ নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আনন্দের সঙ্গে নিয়েও যাব। কিন্তু তুমি কি একা? সঙ্গে কেউ নেই?

সঙ্গের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে ধারণাটা তখনও মাথার মধ্যে ঘুরছিল।

সে বললে, না। আমি একাই।

আমি সুযোগ পেলাম, ছাড়লাম না। বললাম, তাতে কোন সংকোচ করবার নেই। আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে বৃদ্ধ ছেলে ভেবে অসংকোচে তুমি চল।

সে হেসে ফেললে এবার। বললে, এবার আর প্রতিবাদ করব না। তবে দোস্তিতে দোষ কি? দোস্তি আমি বেশী ভালবাসি।

সে পা বাড়াল কিন্তু বাড়িয়েই যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। এবং ঝুঁকে জখম আঙুলটার উপর হাত বুলিয়ে বললে, যা ভেবেছিলাম তার থেকে বেশী জখম হয়েছে দেখছি।

আমিও দেখলাম, নখটা ফেটে প্রায় উঠে গেছে, শুধু একদিকটায় খানিকটা লেগে আছে। পা ফেলতে গেলেই উঠেপড়া দিকের প্রান্তভাগ চেপে বসে যাচ্ছে নরম ক্ষতটার উপর। ওর শাড়ির প্রান্তভাগ টেনে এতক্ষণ আহত আঙুলটা ঢাকা ছিল; হয় মাছির জন্য অথবা কেউ যাতে না-দেখতে পায় তার জন্য। অথবা দুয়ের জন্যই।

আমি বললাম, আমার কাঁধে না হয় ভর দাও। আবার বলছি, ভেবে নাও আমি তোমার ছেলে।

সে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে, উঁহু, যা সত্যি তাই ভেবে নিচ্ছি। দোস্তি হয়ে গেছে, দোস্তের কাঁধের উপর ভর দিয়ে চলছি।

আমিও নাছোড়বান্দা। বোধ হয় খুন চাপার মত জেদ চেপেছিল, বললাম, কেন? এমন পবিত্র সম্পর্কে তোমার আপত্তি কি?

—ওটা মন-গড়া। সত্যি নয়। সেই জন্যে।

—আমি মরে যদি তোমার কোলে ফিরে আসি?

ঘাড় নেড়ে সে বললে, পুনর্জন্ম আমি মানি না এবং বিয়ে আমি করব না। সুতরাং—। সে হেসে ফেললে, বললে, কিন্তু আশ্চর্য লোক তো তুমি।

ওখান থেকে বেরিয়ে নীচে নামবার মুখে সে হঠাৎ দাঁড়াল। বললে, দাঁড়াও। আঙুলটায় বেশ লেগেছে, ভুগতে হবে হয়তো। বলে সে সমস্ত ধ্বংসস্তূপটার চারিদিক যেন দেখে নিলে। কারণটা ঠিক বুঝলাম না।

তারপর বললে, চল।

বললাম, তুমি ডাক্তারের কাছে বরং অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন নিয়ে নিয়ো।

—নেব। অন্যমনস্কভাবেই বললে। মনটা যেন তার দৃষ্টির সঙ্গে ওই তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তূপের বিশাল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'চল' বলেও সে দাঁড়িয়ে রইল, বললে, পা জখম হল, ওখানটায় বসলাম। যন্ত্রণার মধ্যে ভাবছিলাম কি জান? ভাবছিলাম সে আমলে হয়তো

ওই দোকানটায় কোন দোকানদারনী ছিলাম।

—তবে যে তুমি বললে তুমি পুনর্জন্ম মান না?

হেসে উঠল সে। বললে, তুমি উকীল?

—না।

—খুব ধরেছ তো! পুনর্জন্ম আমি সত্যিই মানি না। তবে ভাবতে ভাল লাগে।

নীচে নেমে রাস্তার মুখটায় এসে বলল, কতকগুলো জোয়ান এসেছিল, এমন হৈচৈ করছিল! যাক, তারা চলে গেছে। যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে মেয়েটি।

প্রশ্ন করলাম, জোয়ান—। সাম্ ইয়ং স্টুডেণ্টস অর ইয়ং মেন ইউ মীন?

—নো—নো—নো। আমাদের আর্মি মেন, আমরা জোয়ান বলি।

—কিন্তু তারা তো খুব ভদ্র। বদনাম তো শোনা যায় না।

—আমার কিন্তু—মানে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। বিলকুল ভাল লাগে না ওদের।

ট্যাক্সির দরজাটা খুলে দিলাম। সে উঠে বসে কোণে ঠেস দিয়ে যেন নিজেকে এলিয়ে দিলে। আমি পাশে বসতেই বললে, আমাকে বিনয়নগরের পথে নামিয়ে দিয়ো। ওখানে একটা ফট্‌ফটিয়া নিয়ে নেব।

—কেন, বল না কোথায় নামবে তুমি—

—না—না—না। সে আমাকে কয়েক জায়গায় ঘুরতে হবে।

তাই গেল সে। সফদরজঙ এরোড্রোমের কাছে রেলওয়ে ক্রসিংটার সামনে এসে একটা ফট্‌ফটিয়া ডেকে বিনা বাক্যব্যয়ে সে নেমে চলে গেল। ফট্‌ফটিয়ায় উঠে বিলিতী বা অত্যাধুনিক ঢঙে হাত নেড়ে কি বললে, বাই বাই না গুড-বাই—ফট্‌ফটিয়ার বিশ্রী আওয়াজের মধ্যে ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে দুটোর একটা বটে।

গাড়ির ভিতরটায় এবং আমার নিশ্বাসে তখনও একটি মিষ্ট গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটি কথাও ঘুরছিল—বিচিত্র মেয়ে।

দুই

দিন দশেক পর। সাপ্রু হাউসে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। দাদাসাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের নাট্যকার দাদা মঞ্জরেকর ভারতবিখ্যাত; এমন ভাল মানুষ আর এমন নাটক-পাগল মানুষ বিরল। ওঁকে আমিও বলি দাদাসাহেব। দাদাসাহেব হাসেন আর বলেন, আরে ভাই তুমি তো বড় ভাল খেতাব দিলে এবং তুমিও খেতাব নিলে। আমাদের দেশে আমার ভাইদের বলে দেব, তোমাকে বলব—ছোটেদাদা শঙ্করজী।

সুরসিক মানুষ এবং সেই হেতু সুমধুর। এখন ডেরা দিল্লীতেই; নাতনী পরিবৃত হয়ে বাস করেন। সংসারে সকল কন্যা এবং কন্যার কন্যারা। সন্ধ্যাতে নাটকের সংগীতের কোন-

না-কোন আসরে থাকবেনই। আমাকে অনেকদিন থেকে ধরেছিলেন, তুমি কিছু নাটক দেখ ; বিভিন্ন প্রদেশের নাটক। সন্ধ্যেবেলা কর কি এখানে?

—করি না কিছুই। ঘুরে বেড়াই।

কনট সার্কাসে গিয়ে ঘুরি, দিল্লীর জীবনযাত্রা দেখি। নিঃসন্দেহে একটা বলশালী জীবনযাত্রা। বলের সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ারের মত প্রকাশভঙ্গির একটা নিকট সম্পর্ক আছে। কেউ উদ্দাম বললে বলব না—না—তা নয়। কেউ দৃপ্ত বললে তাতেও প্রতিবাদ করব না। অত্যাধুনিকতার ফেনার সঙ্গে আবর্জনা আবিলতার অভিযোগ করলে বলব, তা তো গোড়াতেই বলেছি। পয়সার প্রাচুর্য কত তা অর্থনীতিবিদেরা বলতে পারবেন, তবে পয়সা খরচ ওরা বেশী করে তাতে সন্দেহ নেই। যত স্যুট যত টাই, মদের দোকানে বিক্রী তত বেশী; আর মেয়েদের পোশাক এবং প্রসাধনদ্রব্যের প্রাচুর্যও দোকানে তত বেশী। এবং প্রতি পাঁচটি মেয়ের চারটির ঠোঁটে লিপস্টিক।

আরও বৈচিত্র্য আছে ; ফুটপাতে পাকৌড়ি ভাজছিলেন একজন প্রৌঢ় শিখ। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন পূর্বে; এখন বেকার তাই এই বেকার দশায় জীবিকার জন্যে পাকৌড়ি ভেজে বিক্রি করছেন। জন দুই তিন গ্রাজুয়েট ড্রাইভারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। একজন ফট্‌ফটিয়া চালায়।

শুধু পাঞ্জাবী শিখেরাই নয় বাঙালীর ছেলেকেও দেখেছি। বি-এ পাস করে ডি-এ সুদ্ধ একশো চল্লিশ টাকা মাইনেতে লবী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে ঢুকেছে, তারই মধ্যে সন্ধ্যেতে ক্লাস করে এম-এ পাস করেছে। নতুন চাকরি খুঁজছে। আর্দালীর কাজ করে পড়ে আই-এ পাস করেছে। সে হয়তো আরও অনেক শহরেই করে কিন্তু এখানে বলিষ্ঠতা আছে, তার জন্যই মুখখানা হাসি-হাসি।

মেয়েরাও এমনই। দোকানে বাজারে ক্রেতা হিসেবে তারাই প্রধান। দশটা থেকে অসংখ্য বাইসিকল চলে। কাজে আসে মানুষ, তাদের মধ্যে মেয়ে সংখ্যায় কম নয়, বেশি। আর মেয়েদের অধিকাংশকে দেখেই ভ্রম হয়, ওই সব বিলাসিনী মেয়েদের আর একজন বলে। তবে তা হয় তো সত্য নয়।

এ ক'দিনে বেশ কয়েকজনকে আমার সেই মেয়েটি বলে ভুল হয়েছে ; দু'চারজনের পায়ের দিকে তাকাতে হয়েছে বুড়ো আঙুলটায় ব্যাণ্ডেজ আছে কিনা দেখবার জন্যে। সেই দেখে তবে নিশ্চিত হয়েছি যে—না, এ সে নয়।

তবে এই ঘোরার মধ্যে আমার একটা অন্য নেশা আছে। সেটা হল, ফুটপাথে তিব্বতীদের পুরনো মূর্তির দোকান। ইতিমধ্যেই অনেকগুলো মূর্তি কিনেছি আমি। আর দেখি কাঠের এবং ধাতুর উপর রিলিফে ফোটানো ছবি। কাশ্মীরী কাঠের কাজ, লতাপাতা, হরেকরকম নকশা-আঁকা কাঠের বাক্স, কলমদান, বইরাখা, ছোট ত্রিপদী—তারপর বাঁশের, বেতের ঘাসের তৈরি হরেকরকম শিল্পদ্রব্য। আশ্চর্য মনোহারি এগুলি। জনকতক নেপালী নিয়ে আসে মালা, কাঠের উপর গালা দিয়ে পিতল বসানো গোল ঢালের মত জিনিস, অ্যাশট্রে

—এগুলি ওরা তৈরি করে এখানেই, কিন্তু চালায় খাঁটি তিব্বতী মাল বলে। প্লাস্টার অব প্যারিস এবং কাগজের মণ্ডে সিমেন্ট মিশিয়ে ছাঁচ থেকে ছবি তুলে চমৎকার ঘর সাজাবার শিল্পবস্তু তৈরি করেছে। কোনটায় রামসীতা, কোনটায় আদিবাসী দম্পতি, ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের ওমর খৈয়ামের সাকী ও ওমর পর্যন্ত কত বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি। ঘোড়া, হাতি, হরিণ, পাখি নানান ধরনের সুন্দর পুতুলও বিক্রি করে। কাগজের ফুল নিয়ে ঘোরে ফিরিওলা।

আমি এগুলি দেখে বেড়াই, কিনিও কিছু কিছু। এতেই সাড়ে আটটা বাজে; বাড়ি ফিরি। নটা বাজতে বাজতে গোটা নয়াদিল্লী জনশূন্য হয়ে যায়। নিওনের বিজ্ঞাপনগুলো সারারাত্রি জ্বলে কিনা বলতে পারি না। রিসেপশন, চা-পার্টি, সভাসমিতিরও অন্ত নেই; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে নাট্য আন্দোলন। হিন্দী গুজরাটী মারাঠী—তামিল মালয়ালম—বাংলা ওড়িয়া অসমীয়া সকল ভাষার নাটক অভিনয় হয়। এর সঙ্গে লোকনৃত্য লোকসংগীত আছে। কিন্তু সর্বত্রই মেয়েরা যায় মুখে রং মেখে, পুরুষকে যেতে হয় মুখোশ পরে খোলস পরে—মুখোশটা রাজধানীর ভদ্রতার কানুনের—প্রটোকল বা যা খুশি বলুন—আর খোলস হচ্ছে পোশাকের।

এখানে মেয়েদের আর দোষ দেওয়া যায় না। তারা শাড়ি স্যাণ্ডেল বজায় রেখেছে। পুরুষদের সবাই কোট প্যাণ্ট, অবশ্য গলাবন্ধ কোট। আর শেরওয়ানী চুস্ত পায়জামা। দুটোতেই আমার নিজের চোখে নিজেকে খুব বেমানান লাগে, কাজেই পরবার ভয়ে ওদিকে হাঁটি নে। এমন কি বাংলা নাটকেও না।

এবার কিন্তু দাদাসাহেবের হাত এড়াতে পারলাম না। তিনি নাটক নিজে সংশোধন করেছেন, এবং অভিনয়ের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর উপদেশ নির্দেশ এ নাটকে এক বিশেষ অঙ্গ এবং তা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। দাদা নিজে যাবার সময় আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ ধরে নিয়ে গেলেন। আসন পেলাম প্রথম সারিতেই। নাট্যানুরাগী এবং নাট্যানুরাগী না-হয়েও কর্তব্যের দায়ে নাট্যান্দোলনে উৎসাহদাতা হিসেবে বিশিষ্ট-ব্যক্তিরা বসে আছেন। দাদাসাহেব প্রসন্ন উদার মানুষ, সকলকে সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বসলেন।

আলো এবং সাজসজ্জার চমৎকারিত্বের প্রশংসা না করে পারলাম না।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নয়া জমানার জীবন নাটক "এক-হিসাব"।

দাদাসাহেব বললেন, আমরা এ লিখতে পারি নে শঙ্করজী। বলতে বলতেই লাউডস্পীকারে ঘোষণা হল—"১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ সাল"।

ভিতর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠল শঙ্খধ্বনি, তার সঙ্গে কাঁসর-ঘণ্টা। তার ধ্বনি মৃদু হল—থামল না, তারই মধ্যে "আওয়াজ" উঠল—'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ'—'আজাদ হিন্দোস্তান'—জনতাকে রাজ—!

"জিন্দাবাদ"! তারপর একে একে —জয়—জয়—জয়। 'স্বাধীন ভারত কি'—'মহাত্মা গান্ধী কি'—'পণ্ডিত নেহরু কি—!' জয়—জয়—জয়!

যবনিকা উঠল। গভীর অরণ্য গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে কয়েকটি গাছের আভাস। অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে সড়ক চলে গেছে। একটি কাঠের ফলক পোঁতা রয়েছে পথের ধারে, তাতে আরবী দেবনাগরী এবং ইংরেজী হরফে লেখা রয়েছে কিছু; ফোকাসের আলো পড়ল; ইংরিজীতে পড়লাম 'দিল্লী টু দেবগিরি।'

পিছনে সানাইএর সঙ্গে রোশনচৌকি বাজতে লাগল। তার সঙ্গে গান আরম্ভ হল; এক বিখ্যাত হিন্দী কবির স্বদেশী সংগীত।

এরই মধ্যে ওই একটা গাছের পিছন থেকে একটি মূর্তি খোঁড়াতে খোড়াতে বেরিয়ে এল, লোকটার একটা পা নেই; একটা খাঁজওয়ালা গাছের ডালকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে তার উপর ভর দিয়ে চলছে। দাঁড়াল স্থির হয়ে, শুনতে লাগল গান। গান থামলে আবার ধ্বনি উঠল—'আজাদ হিন্দোস্তান'—

—জিন্দাবাদ!

—স্বাধীন ভারত—

—জিন্দাবাদ!

—জনতাকে রাজ—

—জিন্দাবাদ!

লোকটির মুখের উপর আলো পড়ল। শিউরে উঠলাম।

লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কঙ্কাল-আঁকা পোশাক। কবর থেকে উঠে এল যেন। জিন্দাবাদ শেষ হতেই সে প্রশ্ন করলে, জনতাকে রাজ হয়ে গেছে? হো—ভেইয়া!

—হাঁ—হয়ে গেল। আজই। শুনছ না, আওয়াজ উঠছে—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে!

কঙ্কালের পোশাকটা এবার খুলে পড়ে গেল। বের হল মানুষ। একজন অন্ধ। প্রাচীন ইসলামী আমলের পোশাক। অন্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ডাল-ক্রাচের উপর ভর দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, আমার পা—! তা হলে আমার পা ফিরিয়ে দাও!—আমার পা!

—কি হল তোমার পা?

—ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

—কে?

—কে আবার? রাজা। সোলতান!

—কোন্ রাজা? কোন্ সোলতান? কবে?

—তা হলে শোন আমার ফরিয়াদ!

—পর্দা নেমে এল।

আবার নেপথ্য অভিনয়। ঘোষণা হল, করিব সাত শও বরিষ। দেহলিতে তখন তুঘলকাবাদে সোনালী মিনা করা ইঁটে গড়া সোলতানি মহল, সকালবেলা সূর্যদেবের আলোর ছটায় ঝকমক করে ওঠে। মানুষের চোখে সে ছটা লেগে দৃষ্টি অন্ধ করে দিত। হাঁ—সেই

'তুঘলকাবাদ'।

কণ্ঠস্বর এই লোকটির।

বলতে বলতেই পর্দা উঠল।

এবার একেবারে পশ্চাৎপটে সোনালী রঙে আঁকা সোলতান মহলের মাথাটা জেগে রয়েছে। আর সম্মুখে তুঘলকাবাদের সেই বাজার। সেই আট-দশ ফুট চওড়া রাস্তার দু'পাশে কুলুঙ্গির মত দোকান।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেই বিচিত্র মেয়েটিকে। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠল, "সে আমলে হয়তো এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" তা থাক বা না থাক, জন্ম-জন্মান্তরের অনেক নদী নালা সমুদ্র বা খাড়ি পার হয়ে সে আবিষ্কার করা অসম্ভব কিন্তু তার সঙ্গে এই নাটকটার মনে হল যেন সম্বন্ধ আছে; অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্ভব। কারণ সে যে মেয়ে তাতে এখনই যদি দেখতে পাই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সে আমলের নাচুনীর সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে নাচতে নাচতে সে বেরিয়ে আসছে তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। সম্ভাবনাটা দূরে ফোটা ফুলের গন্ধের মত মনের মধ্যে একটি বিচিত্র ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু না, দোকানের দোকানদার দোকানদারনী যারা, তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম না তাকে। দোকানদারনী একজনই ছিল, দোকানদারনীও তাকে বলা চলে না, ফিরিওয়ালী—পথের ধারে—একেবারে সম্মুখেই সবজীর পসরা নিয়ে বসে ছিল। নেপথ্য থেকে দিল্লী অঞ্চলের ছোট ঢেঁড়া বেজে উঠল, তার সঙ্গে দেশী শিঙা। ঘোষণা শুরু হল, "লা ইলাহি ইলাল্লা। প্রিয় নবী পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদের রসুলাল্লার অনুগামী, হিন্দোস্তানের সোলতান—হাতিমের চেয়ে বড় দানী—অদ্বিতীয় জ্ঞানী—রুস্তমের থেকেও বীর, মালিক সুলতান মহম্মদ তুঘলকের এই হুকুমৎ আজ থেকে জারি হল হিন্দোস্তানে।"

হুকুমৎ—আজ থেকে হিন্দোস্তানে "চাঁদি আওর সোনেকা সিক্কা রূপেয়া আর চলবে না। নতুন সিক্কা রূপেয়া চল হল—সিক্কা তৈরী হবে পিতল আর তামার। আরও চল হল চামড়ার নতুন মোহরের। যারা কারবার করবে 'পুরানি' সিক্কা মোহরে তাদের উপরেই সোলতানের এই হুকুমতকি জোরসে সাজাই হো যায়েগা।"

আবার নাকাড়া শিঙা বাজল, বাজাতে বাজাতে তারা চলে গেল। এতক্ষণ দোকান থেকে দোকানীরা মুখ বাড়িয়ে শুনছিল, মেয়েটি দাঁড়িপাল্লা ধরে ওজন করছিল—সেই পাল্লার দড়ি ধরেই শুনছিল—অবশ্য চতুরতার সঙ্গে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল কিছু সবজি; এবার তারা একসঙ্গে হায় হায় করে চঞ্চল হয়ে উঠল। হায়—হায়—হায়! মেয়েটা কপালে চাপড় মেরে বললে, হা রে নসীব—হা!

দোকানীরা রাস্তায় নামল।

—পিতলের সিক্কা? হা রে হা!

—চামড়ার মোহর! হে ভগোয়ান!

—হায় পরমাত্মা!

—হে আল্লা! হায় রসুলাল্লা! তোমরা ছাড়া কে এই সোলতানকে সমঝে দেবে?

—কিন্তু এত বড় জ্ঞানী লোক! এত ভারী পণ্ডিত দুনিয়াতে নাই। অ্যাঁ!

—আরে যদি মদ খেতো তো বুঝতাম মাতালের খেয়াল!

—চু—চু-চু! কি আপসোস! যে লোক মদ খায় না—কসবী তো কসবী কোন ঔরৎ—যতই কেন সুরত্ থাকুক তার দিকে তাকায় না; তার এ কি উদ্ভট খেয়াল! তামা পিতল—চাঁদি সোনার ফারাক বুঝতে পারে না।

—বাপকে মারে দরবারের মেরাপ চাপা দিয়ে—

—আরে—চুপ—চুপ!

—চুপ করব কি করে? আমার ঘরের চাঁদি সোনার সিক্কা মোহর নিয়ে আমি করব কি? একজন বললে, মিট্টির তলায় গেড়ে রাখ শেঠজী। নেহি তো—

কথা কেড়ে নিয়ে এবার মেয়েটি বলে উঠল, নেহি! শেঠ মেহেরবান কদরবান আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে গয়না গড়িয়ে দাও। আমার পিতলের কাঁকনি খাড়ু সব—সব তোমাকে দেব। চাও তো আমার জোয়ানি ভি দিয়ে দেব তোমাকে। আঃ হা—কি খুবসুরত্। তুমি শেঠ! কি খুবসুরত্!

এই সময় শোনা গেল গান—

গানটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে হিন্দী উর্দু গানের মধ্যে যে ভারতীয় সংগীতের আমেজ আছে, বোম্বাই ছবির অত্যুগ্র ইউরোপীআনা অনুকরণের মধ্যেও যে আমেজটি মরে নি, নাটকের গানখানির মধ্যে সেই আমেজ আরও স্পষ্ট এবং গাঢ়।

দাদাসাহেব বাঃ বাঃ বলে উঠলেন এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে যে মনে হল তাঁর রসোপলব্ধির উল্লাস বা আনন্দ—অজ্ঞাতসারে, অন্ধকার রাত্রি নামার মুহূর্ত-প্রতীক্ষার মধ্যে সুইচ অন করে আলো জ্বেলে সামনে দাঁড়ানোর আনন্দের মতো অকৃত্রিম এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

সুর আমারও ভাল লেগেছিল কিন্তু কথা বুঝি নি, তাই আলো জ্বলায় যে আনন্দ সে আনন্দের বেশি আমার কিছু হয় নি। যে আলো জ্বেলেছে তাকে চিনতে পারি নি। দাদা বললেন, চমৎকার গানটি। সুন্দর।

—আমাকে বুঝিয়ে দেবে? উর্দু ঠিক বুঝি না।

হেসে দাদা বললেন, অনুবাদে তো রস নেহি মিলেগা ভাই। দেখ, আমের তার কি আমসিতে কি আমসত্ত্বতে মেলে?

হেসে আমিও জবাব দিলাম, যে আম খায় নি তার পক্ষে আমসত্ত্ব ছাড়া আমের স্বাদ বুঝবার উপায় কি বল? না-হলে সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কা যেতে হয়।

—চুপ কর। ওরা ঢুকছে।

—কারা?

—হিরো হিরোইন।

আবার চকিতের জন্য মনে হল, সে ঢুকছে। মনে হল নয়, একেবারে প্রায় নব্বুই নয়া পয়সা বিশ্বাস হয়ে গেল।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক আর তার হাত ধরে ভিক্ষুণী। দুজনের হাতে দুটি বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষে করছে গান গেয়ে। আলোর ফোকাস পড়ল তাদের মুখে—আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, এ তো সেই। সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, সেই—। না, মুখের ঢঙটা তো ঠিক। এমন রঙ তার মুখে সেদিনও ছিল কিন্তু আজকের রঙ অনেক চড়া। তা ছাড়া দু'পাশে লম্বা বেণী, কেশ প্রসাধনে সে আমলের ছাঁদ, পরনে ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না, হাতে মোটা রূপদস্তার বালা কাঁকনি। নাকে নাকছাবি। পালটে যাবারই কথা, কিন্তু এতখানি পালটাবে?

দাদাসাহেব ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, গানের অর্থ হল—"ইমাম সাহেব তোমার বসবার জন্যে মসজিদ তৈরী করেছে—হীরা মতি দিয়ে কতই না নকশা কেটেছে আসনে। শাহানশাহ বিশাল কেল্লা বানিয়ে তার উপর গম্বুজ তুলে, সেই উচ্চ লোকে বসবার জন্যে তোমাকে ডেকেছে। ইমাম কত বয়েৎ তৈরী করে তোমার স্তব করেছে; শাহানশাহ ঘোষণা করে বলেছে সে তোমারই প্রতিনিধি। কিন্তু কি বিচিত্র তুমি! আমি অন্ধ, সামান্য আমার কুটীরে এসে দাঁড়ালে তুমি। আমি বললাম, কোথায় বসাব তোমাকে রাজ-রাজেশ্বর? তুমি বললে, তোমার এবং তোমার প্রিয়ার যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত বিনম্র কোমল হৃদয় সেখানেই বসব আমি। বললাম, কি বলে স্তব করব তোমার? তুমি বললে প্রেমের গুণগান কর, তাতেই আমার স্তব হবে। জ্ঞানের আসনে আমি উত্তাপ অনুভব করি, সম্পদের আসনে সোনার তৈরী কণ্টক আছে—আমাকে বিদ্ধ করে। প্রেমের আসন দূর্বাঘাসের আস্তরণের কোমল মখমল। ওই ঘাসের ফুলের মালা গেঁথে আমাকে বন্দনা কর। ওই ঘাসের বীজ থেকে অন্ন তৈরী করে আমার ভোগ দাও।"

মিথ্যা বলব না, মনে হল এ যদি আধুনিক রচনা হয় তবে তো—। একটু কাঁটা ফোটার মত খচ্ করে কিছু বিঁধল। প্রশ্নই করলাম, এ কোন আধুনিক কবির রচনা?

—হাঁ। অবশ্য মির্জা গালিবের কাছে ধার করেছে। তবে হিন্দু কবি তো—ফুলের মালা, ভোগ এগুলি ভুলতে পারে নি।

একটু চুপ করে থেকে দাদাসাহেব বললেন, তোমাদের রবিবাবু আর উর্দুওয়ালাদের গালিব মস্ত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

কথা শেষ হতে হতেই নেপথ্যে কলরব উঠল, সোলতান—সোলতান! শাহানশা আসছেন! শাহানশা!

একজন সিপাহী এল: হঠ যাও—হঠ যাও! হঠ যাও! সরে যাও সব—সরে যাও!

একজন নকীব সুলতানের নাম ঘোষণা করলে।

লোকজন সব মাথা ঈষৎ নত করে দাঁড়াল।

তারই মধ্যে একজন আতঙ্কিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলে উঠল, এর আল্লা! আরে ব্বাপ্!
—কার শির গেল?

সকলে আড়চোখে তাকালে। একজন জল্লাদ ঢুকল। তার কোমরে কুঠার, হাতে একটা বর্শা, তার মাথায় একটা মুণ্ডু।

তার পিছনেই ঢুকল সুলতানের তাঞ্জাম।

জল্লাদ বললে, দেখ, এই আদমীর মাথা গেল। এই আদমী কে জান? এ হল সুলতানের মীরবক্সী, আমীর উল উমরা ফিরোজজং সিপাহ্‌সরদার জাফর খাঁ। এ আমীরের দেমাক ছিল কি, সে বহুৎ পণ্ডিত লোক। পাদশাহী-মমালক্ সোলতানকে সে বেওকুফ মনে করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল, সুলতান যে হুকুম জারি করছেন, তামা পিতলের সিক্কা চাঁদি সোনার সিক্কার বদলে চলবে—তা ভুল। তামা পিতল আর চাঁদি সোনা এক নয়। চাঁদি সোনার কদর বেশী। তকরার করেছিল। বলেছিল, পাদশাহ বিচার করুন—আমীর ওমরাহ রইস-আদমী, আর গরীব যারা ছোট কাম করে, ভিখারী যারা ভিক্ষা করে খায় তারা যেমন এক নয়—তেমনি তামা পিতল আর সোনা চাঁদিও এক নয়। সুলতান বলেছিলেন, বল, কি কারণে নয়? এরাও মানুষ, ওরাও মানুষ। ওমরাহ বলেছিল, পাদশাহ মালিক, কিন্তু বুঝে দেখুন, যিনি দিন-দুনিয়ার মালিক তিনি পাদশাহকে তাঁর হাত প্রসারিত করে রক্ষা করেন। তাঁর চেয়ে কম হলেও আমীর ওমরাহদের রক্ষা করেন, কিন্তু এই গরিবান, এদের উপর কি সেই হাত তেমনি করে রক্ষা করে? করলে এরা হামেশা হামেশা এমন করে দলে দলে মরে কেন? রোগে অনাহারে হরদম মরে। তেমনি সেই নিয়মে পিতল কাঁসাও মরে—তুরন্ত জলদি ক্ষয়ে নষ্ট হয়। পাদশাহ বলেছিলেন, তবে আল্লাহ্‌তায়লার মর্জিতে পাদশাহ খুন হয়, হেরে যায়, পালিয়ে ভিখারী হয়; ভিখারী পাদশা হয় কেন? তুমি জান, পাদশা কুতুবুদ্দিন ছিল মহম্মদ ঘোরীর খরিদ-করা বান্দা। এই তুঘলক পূর্বপুরুষ—আমার পিতামহ একজন করৌনা তুর্ক—সেও ছিল বলবনলোকের খরিদ করা বান্দা! আজ কি করে আমি সোলতান? ওমরাহ বলেছিল, খোদার মর্জি! পাদশা বলেন, হাঁ ঠিক। বেশক্। কিন্তু খোদার মর্জিতে যেমন বান্দা হয় পাদশা তেমনি পাদশার মর্জিতে তার শিলমোহরের ছাপে সিক্কা মোহর পায় মোহরের ইজ্জত আর কিস্মৎ। সে সোনা হোক আর চাঁদি হোক। কি দাম সোনার চাঁদির যতক্ষণ তাতে পাদশাহী ছাপ না পড়ে? খোদাতায়লার মর্জিকে মানুষ বলে, খেলা! তাঁর মর্জি হলে পাদশা আমীর বসে থাকতে থাকতে মরে। হয়তো তিনি বসান সেখানে কোন গরীবকে। ঠিক কি না? মীরবক্সীকে মানতে হয়, হাঁ হুজুর। এ ঠিক বাত। পাদশা তখন হুকুম দেন: পিতল তামা পাবে এতদিনের সোনা চাঁদির সিক্কার ওমরাহী পাদশাহী মর্জিতে, তার শিলমোহরের ছাপে। আর সেই সঙ্গে খোদার মর্জিতে মীরবক্সী হবে দেওয়ানখানার কোন গোলাম। সোনা-চাঁদির আমলের মীরবক্সী জাফর খাঁয়ের শির যাবে জল্লাদের কুড়ালির ঘায়ে। তা না-হলে তো কায়েম হবে না পিতল-তামার সিক্কার ওমরাহী। এই সেই বেওকুফ্ মীরবক্সীর মুণ্ডু। তোমরা হুঁশিয়ার হবে এই বেওকুফি থেকে।

দীর্ঘ বক্তৃতাদি সে করছিল উইংসের মুখে দাঁড়িয়ে। পিছনে ভিতরে তাঞ্জামের মুখটা দেখা যাচ্ছিল। বাজারের লোকেরা স্থির। আমি দেখছিলাম, অন্ধ ভিক্ষুক, তার চেয়ে বেশী করে

তার সঙ্গিনীকে। মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন—এ কি সেই? কিছুতেই যেন জ্যামিতির দুই কোণ সমান ও দুটি বাহু সমান দুটি ত্রিভুজের মত এক হয়ে মিলে যাচ্ছিল না। মেয়েটি এবং অন্ধ লোকের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টা যেন বিশেষ চেষ্টা।

ঘোষণার পর মুণ্ডশীর্ষ বর্শাধারী জল্লাদ এগিয়ে গেল, পিছনের তাঞ্জাম এসে ঢুকল রঙ্গমঞ্চে; কুর্নিশ পড়তে লাগল অজস্র এবং বার বার।

সুলতান স্মিতহাস্যে ঘাড় নাড়লেন; তারপর বললেন, কে আছে এখানে গরীব? সামনে আ-যাও!

এল সেই সবজিওয়ালী, দুনিয়ার মালিক, মেহেরবান শাহানশা, আমি বড় গরীব!

—আচ্ছা। লে, ইয়ে লে।

মুঠোভরে মুদ্রা বাড়ালেন পাদশা, সে আঁচল পাতলে। পড়ল ঝরে পাদশাহের মুঠো থেকে।

—আর কে আছে?

ব্যস্ত হয়ে একজন দোকানী অন্ধকে বললে, জলদি যাও! জলদি করো!

সঙ্গিনী অন্ধের হাত ধরে নিয়ে এল সামনে। দাঁড়াল। পাদশাহের হাত উঠল মুদ্রামুষ্টি নিয়ে। উঠে অকস্মাৎ থেমে গেল। একটু ঝুঁকলেন, বললেন, আরে, এ কে? তুমি তো—কবি—সৈফুদ্দিন—! শায়রে শের!—আঁ্যা?

কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ শাহানশা, আমি সেই সৈফুদ্দিনই বটে!

—আচ্ছা! তুমি দিল্লীতে আছ এবং বেঁচে আছ?

ফের কুর্নিশ করে অন্ধ বললে, হাঁ দুনিয়ার মালিক মেহেরবান্ সোলতান!

—হাঁ—হাঁ। জরুর আমি মেহেরবান। জরুর। হাজারোবার।

—হাঁ—পাদশাহ। সে কথা কেউ না বললেও লাখোবার সত্য। সূর্যের উত্তাপ প্রখর, তার মেহেরবানীই ওই উত্তাপের মধ্যে, সে কথা না বললেও সত্য।

—এই তো, এই জন্যেই তোমাকে বলতাম, শায়রের মধ্যে তুমি শের। কবির মধ্যে সিংহ। ওঃ, কতকাল তোমার এমন মূল্যবান কথা শুনি নি! তাই মধ্যে মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তবে তুমি বড় দুর্বলচিত্ত। কবি, কাদায় নরম মাটিতে ফসল হয় মানি, কিন্তু হীরে দুনিয়ায় সব থেকে কঠিন—শক্ত। মাটিতে গাছে ফুল হয় মানি, কিন্তু আজ ফুটে কাল ঝরে যায়। কিন্তু হীরে? সে আকাশের এক সূর্যকে পলে পলে খাঁজে খাঁজে ধরে হাজারো করে তোলে আর রোশনির ফুলঝুরি ফুটিয়ে দেয়। আর ফোটায় হাজারো কেন লাখো বরষ ধরে। তাই বা কেন, দুনিয়ার জিন্দিগী যতদিন ততদিন। কি, আমি ঠিক বলি নি?

—এর চেয়ে আর সত্য হয় না সুলতান; আপনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আমি দুর্বল, সত্যই দুর্বল।

—হাঁ। তুমি ঔরৎ লেড়কার চেয়েও দুর্বল। দোয়াবে বিদ্রোহীদের দমন করে তাদের ঘেরাও করে জানোয়ার শিকারের মত শিকার করেছিলাম। তুমি বুঝতেই পারলে না আমি কেন করেছিলাম! কেন জান? মানুষ বড় না জানোয়ার বড় তাই দেখতে চেয়েছিলাম।

শিকার দেখেছ ? বাঘ পালায় ভাল্লু পালায়। গোড়াতে পালায় কিন্তু শেষে যখন মুখোমুখি হয় সে তখন লড়াই দেয়। জবর লড়াই। মানুষ শুধু কাঁদে। কাঁদে আর মরে। জানোয়ারের চেয়ে অনেক ছোট। তুমি তাদের কাঁদতে কাঁদতে মরা দেখে কাঁদলে, তাই মেহেরবানি করে চোখ দুটো অন্ধ করে দিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম, না হলে তুমি অনেকবার কাঁদতে আর আমাকে বিরক্ত করতে। আজও এই মুণ্ডটা দেখে কাঁদতে। কাঁদতে না ?

—হাঁ মেহেরবান সুলতান। মনে মনে আপনাকে হাজার সেলাম জানিয়েছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন সুলতান। বললেন, সত্যি বলছ সৈফুদ্দিন ? সচ্ বাত ? খোদা কসম ?

—খোদা কসম, সচ্ বাত শাহানশা !

—ঝুটা নহি ?

—কভি না, শাহানশা। ঝুটা নহি !

—আচ্ছা ! কিন্তু—

স্থিরদৃষ্টিতে এতক্ষণে তাকালেন বাদশা তার সঙ্গিনীর দিকে। সে মুখ নত করে অন্ধের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। বললেন, এ কে সৈফুদ্দিন ?

—ও এক ভিক্ষুকের মেয়ে, নিজেও ভিক্ষে করত। আমি অন্ধ হয়ে শহরের বাইরে গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম—তখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান—সেই সময় আমার শিয়রে এসে বসেছিল। আজও আমাকে ছাড়ে নি।

—সচ্ বাত ?

—খোদা কসম সুলতান !

—কিন্তু তোমাদের সম্পর্ক কি ?

—ওকে আমি সাদী করেছি হজরৎ।

—সচ্ বাত ?

—খোদা কসম !

—আচ্ছা ! কিন্তু তুমি—

মেয়েটি কাঁপছে।

—তোল্—মুখ তোল্। দেখি তোকে ! তুই কবিসিংহের প্রিয়তমা। সাকী।—আরে, দুনিয়ার মানুষ জানে মহম্মদ তোঘলকের কখনও ঔরতের ভুখা নেই। কখনও পরের মেয়ে ছোঁয় না। মুখ তোল্।

সে তুললো মুখ। পাকা অভিনেত্রী। আতঙ্কে যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সুলতান আর একবার অট্টহাস্য করে উঠলেন। সব স্তব্ধ। হাসি থামিয়ে সুলতান বললেন, সৈফুদ্দিন, বল তো, কানা করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমাকে কালাও করে দিয়েছিলাম ?

—না শাহানশা !

—হাঁ। কিন্তু করে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। ইচ্ছে হচ্ছে আজ সেটা করে দিই।

—মেহেরবান সুলতান—

—আরে, তুমি সৈফুদ্দিন, সত্যি কথা বলছ! তুমি শিরিনকে গলার আওয়াজ শুনে চিনতে পার নি? গান শুনেও চেন নি?

চমকে উঠল অন্ধ। বলে উঠল, শিরিন!

—আরে, যাকে তয়ফাওয়ালী কসবী বলে তুমি ঘেন্না করতে। কথাও বলতে চাইতে না! যার জন্যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম! তা—ওই তো শিরিন!

—তুনিয়ার মালিক শাহানশা, আমি ভিক্ষুক অন্ধ। আমি আপনার রহস্যের অযোগ্য। ও তো বোবা!

—বোবা?

—হাঁ শাহানশা। ঠিক বোবা নয়; ওর গলার নালী সর্দিতে বন্ধ হয়ে গেছে। আওয়াজ বের হয় না। ফিসফিস করে কথা বলে। গান গাইবে কি!

—তা হলে শোন!—এই! এই ঔরৎ!

মেয়েটি মাঝখানে মাথা হেঁট করেছিল, আবার সে তুললে মুখ।

—তুই বোবা? বল্, নইলে সাঁড়াশি দিয়ে চামড়া টেনে দেখব তোর গলায় আওয়াজ বের হয় কি না। বল্—। উত্তর দে। তুই বোবা?

—না, শাহানশা তুনিয়ার মালিক।

—গান গাইতে পারিস?

—পারি।

—সেই গানটা শোনা আমাকে—সেই—"হায় সাধু তুমি তাকে পাবার জন্যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অন্ধা হলে—কিন্তু চাঁদের দিকে তাকালে না কোনদিন। আজ অমাবস্যা, চাঁদ নেই, তা হোক—আমার চাঁদের মত মুখের দিকে তাকাও, তাকে দেখতে না পাও আমার চোখে তোমার ছবি দেখতে পাবে।" গা—।

গান ধরলে মেয়েটি কম্পিতগলায়।

সুলতান হুকুম দিলেন, চলো। সুলতানের তাঞ্জাম চলে গেল।

যে মুহূর্তে তাঞ্জাম চলে গেল সেই মুহূর্তে মেয়েটি থেমে গিয়ে তুই হাতে মুখ ঢাকলে। আর সৈফুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল, তমিনা!

সে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, না না—আমি শিরিন। আমি শিরিন!

বলেই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

—শিরিন!

—আমার কসুর মাফ করো। আমি শিরিন। মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর দূরে। অন্ধ চিৎকার করে এগুতে লাগল, শিরিন! শিরিন! শিরিন! শি—রি—ন!

নামল পর্দা।

দাদাসাহেব বললেন, বহুৎ আচ্ছা! বাতাইয়ে, আপ ক্যা কহেতে হ্যায়! আপনার মত বলুন।

বললাম, ভাল!

—শুধু ভাল? সিরিফ ভালা, ওর থেকে বেশি নয়?

—অভিনয়, প্রডাকশন খুব ভাল।

—আই অ্যাম গ্ল্যাড!

বাধা পড়ল। প্রথম সারির বিশিষ্ট জনেরা এসে দাদাসাহেবকে টেনে নিয়ে গেলেন। আমার মনে আমি তখনও মিলিয়ে দেখছিলাম, এই মেয়ে আর সেই মেয়ে এক কি না! তোঘলকাবাদের এই পটভূমি, আর তোঘলকাবাদের সেই বিচিত্র মেয়েটির সেই কথা। ভাবছিলাম, "সেকালে হয়তো আমি এইখানে এই দোকানে দোকানদারনী ছিলাম।" এই দুটো মিলিয়ে এমনই হয়েছে যে হাজার গরমিল হলেও মনে হচ্ছে এরা দুজনে এক। দুটো সমান ত্রিভুজের একটার দুটো কোণ ধরে টেনে ইতরবিশেষ করে দিলে, একটার সঙ্গে অন্যটাকে মেলালে আর মিলবে না। অঙ্কে মিলবে কিন্তু চেহারায় মিলবে না। বেশ মনে হচ্ছে, ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় যেন মেয়েটি খুঁড়িয়েছিল।

দাদা ফিরে এলেন; আবার পর্দা উঠবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, হিরোইনটি কে? ভাল অভিনয় করছে।

—ও, শী ইজ ওয়াণ্ডারফুল। পাক্কা অ্যাকট্রেস। পাঞ্জাবী গার্ল। ভেরী মডার্ন। আওয়ার অ্যাকাডেমি প্রডাক্ট। ইউনিভারসিটিকে গ্রাজুয়েট ভি হ্যায়।

—ও একটু খুঁড়িয়ে চলছে না?

—চলছে নাকি? হবে, পা জখম হয়ে থাকবে।

—আমি ওকে দেখেছি।

—দেখবে বই কি। আমার কাছে তো প্রায়ই আসে। সাউথ অ্যাভেন্যুতে দেখে থাকবে। যে কোন জায়গায় দেখে থাকতে পার। সারা দেহলী চষে বেড়ায়।

পর্দা উঠল।

অন্ধ খুঁজছে শিরিনকে।—শিরিন!

আমার কিন্তু সন্দেহ রইল না যে এই শিরিনই সেই মেয়ে!

শিরিন কিন্তু আর বের হল না। ওইখানেই শিরিনের ভূমিকা শেষ। শিরিন হারিয়ে গেল। সে আর ফিরল না সৈফুদ্দিনের কাছে। লজ্জায় সংকোচে বা যে কোন কারণে হোক ফিরল না। সৈফুদ্দিনই বললে, সে তখন কবরের পাশে বসে আছে। তার কুটীরের সামনে একটি কবর—ওই শিরিনের কবর। কবরের পাশে বসে গান গাইছে—"খোদা তোমাকে চেয়েছিলাম দাও আমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মধু। তোমার সাড়া পাই নি। পদ্ম ফুল আমাকে ডেকেছিল,

এস তুমি। আমার মধ্যে খোদা তোমাকে পাঠিয়েছেন তোমার প্রার্থিত বস্তু। আমি মুখ ফিরিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাঁকে তুমি ফুটেছ, তোমার মধুতে পঙ্কের অশুচ। চাই. নে। আমি অন্ধ হলাম। পদ্ম নিজে এল, আমার চোখে ঢেলে দিলে তার মধু। অন্ধত্ব সারল, চোখ মেলে পদ্মকে বুকে ধরতে গেলাম ; পদ্মটির পাপড়ি ঝর ঝর করে পড়ে গেল।"

নাটকে কথার মধ্যে বুঝলাম, শিরিনকে আর সৈফুদ্দিন পায় নি, সে আত্মহত্যা করেছিল, পেয়েছিল তার মৃতদেহ। সেই দেহ নিয়ে কবর দিয়ে সেইখানে বসে সে গান গায় ভিক্ষে করে।

এরই মধ্যে ঘোষণা হল, রাজধানী যাবে দেবগিরি।

হুকুমৎ জারি হল—"হুকুম শাহানশা, তামাম হিন্দোস্তানের পাদশাহ সোলতান মহম্মদ তুঘলকের ; দিল্লী তুঘলকাবাদের সুলতানশাহী যাবে দেবগিরি। এক মাটি আর পাথর এ ছাড়া যা কিছু সবকে যেতে হবে। সব আদমী যাবে, গৃহস্থী যাবে, আমীর ওমরাহ, এমন কি গরু ভেড়া ছাগল কুত্তা সমেত।"

কান্না উঠল, হায় হায় উঠল। এয় আল্লা, হে ভগবান, সুলতানের মতি ফেরাও। সুবুদ্ধি দাও! হে ভগবান! ইয়া আল্লা মেহেরবান! নয় তো দয়া করো—এই—উন্মা—

যে বলছিল তার মুখ চেপে ধরলে একজন, চুপ! চুপ! চুপ!

এরপর নাটকে এসেছে অনেক কিছু। জনতা এসেছে, বিদ্রোহের ধোঁয়াও উঠেছে, সে ধোঁয়ার উপর জল ঢালা হয়েছে। এতটুকু প্রতীক করে ভাল দেখিয়েছে। একদল লোক জমায়েত হয়ে পরামর্শ করেছে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে পালিয়ে যাবে। তারা কাঠ এনে ঘরে বোঝাই করছে। পাকা ঘর। পাথরের দেওয়াল। আগুন দিলে। ধোঁয়া উঠল! জানলা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে এল পাদশাহী সিপাহী। তারা কুয়ো থেকে জল তুলে ঢেলে দিলে। নিবে গেল।

একজন টেনে একখানা কাঠ বের করে বললে, ভিজে, একদম ভিজে! কাঁচা কাঠ। এই জলে! চল। ক'বালতি জলেই নিবে গেল।

অন্যজন বললে, শুকনো হলে কি হত বল তো!

সে বললে, শুকুক, শুকুবে একদিন। সেদিন দেখা যাবে কি হয়!

জল্লাদ এল, একটা শিকে বেঁধানো রয়েছে অনেকগুলো জিভ। ক'জন সিপাহীর হাতের দড়িতে বাঁধা একদল লোক। বধ্যভূমে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গোলমাল এসেছে বেশি। নাটকটা জোর হারিয়ে ফেলেছে। শেষ—অন্ধ সৈফুদ্দিন কবর আঁকড়ে পড়ে বলছে, আমি যাব না। আমি যাব না।

সিপাহীদের একজন বললে, হুকুম শাহানশাহ সুলতানের—ইঁট কাঠ পাথর বাদ দিয়ে জীবন্ত যে কেউ, জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত সব যাবে দেবগিরি।

—আমি ভিক্ষুক।

—খানাপিনা সব মিলবে। বিলকুল ভার শাহানশাহের।

—আমি অন্ধ—

—বয়েল গাড়িতে উঠিয়ে দেব। ওঠো।

—না না—আমি যাব না।

—তা হলে হুকুম, দড়ি দিয়ে বেঁধে জানোয়ারের মত টেনে নিয়ে যেতে। বাঁধ।

—না—না—না।

কিন্তু কে শোনে ? শাহানশাহের হুকুম ! হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁকে টানলে। সে শুয়ে পড়ল। চিৎকার করলে, শিরিন ! শিরিন !

একজন বললে, এইসা নেহি। হাতে নয়, এমনি করে বাঁধো পায়ে।

বাঁধতে লাগল পায়ে।

পর্দা পড়ল। ডাক শোনা গেল অন্তরাল থেকে, শিরিন !

আবার পর্দা উঠল। দেবগিরিতে মহম্মদ তোগলকের দরবার। বাইরে মসজিদ থেকে সুলতানের নামে খুৎবা পড়া হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে।

বন্দনা-গান হল।

সুলতান হুকুম দিলেন, ফকীর ভিক্ষুকদের দান কর। এক এক আঁজলায় যত নতুন সিক্কা ওঠে—দাও। এক সপ্তাহ ধরে সারা শহরে রোশনাই হবে। দিল্লী থেকে যারা এসেছে সব লোকের এক সপ্তাহের খাদ্য যাবে পাদশাহী খাজানাখানা আর গোলা থেকে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, দিল্লীর সব লোক এসেছে ?

—হাঁ সুলতান।

—অন্ধ সৈফুদ্দিন ? কসবীর কবর থেকে যে নড়ে না, সে ?—সিপাহী !

সিপাহী এসে ঢুকল, তার হাতে দড়ি। সে দড়ির প্রান্তে বাঁধা শুধু একটা পা।

—আর কই ?

—তাকে ছেঁচড়ে আনতে হয়েছিল সুলতান। পথে জঙ্গলের মধ্যে সেই ছেঁচড়ানিতে কমবক্ত মরে গেল। তারপর ধড়ের সব অঙ্গ একে একে খসে পড়ে গেল। পাখানা বাঁধা ছিল দড়িতে, সেইটে এসেছে।

সভাসদেরা নাকে কাপড় দিয়েছে। অর্থাৎ পচে গন্ধ উঠছে। সুলতান কিন্তু দিলেন না। প্রশ্ন করলেন, কি বলছিল কমবক্ত মরবার সময় ? শিরিন বলে চেঁচাচ্ছিল ?

—না, শাহানশা !

—তবে ?

—বলতে ভয় হচ্ছে মেহেরবান।

—কোন ভয় নেই। বল্…

—কমবক্ত চিল্লাচ্ছিল, খোদা—এয় খোদা, কবে, কবে দুনিয়া থেকে পাপ শাহানশাহী বরবাদ হবে ? কবে ? নয়া জমানা কবে আসবে ? জনতাকে রাজ ? আদমীর আজাদী ?

অট্টহাস্য করলেন পাদশাহ।

পর্দা নামল।

আবার উঠল। এবার তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তূপ। সেই বাজারের মুখ; পরিত্যক্ত কুলুঙ্গির মত দোকানগুলি পড়ে আছে। কেউ নেই। পিছনে দূরে লালকেল্লার মাথায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে। ঢুকল সেই মানুষ!

—কই, আমার পা? আমার পা?

—কবি!

—কে? কে? কে?

—আমি শিরিন।

—শিরিন!

—হাঁ, আমি কবর থেকে উঠেছি। তোমার জন্যে বসে আছি। চল আমরা যাই।

—কোথায়?

—ওই কেল্লার নয়া দরবারে। চল, তুমি চাইবে পা, আমি চাইব জাত, যা না থাকার লজ্জায় আমি দুনিয়ার অচ্ছুৎ। চল।

পর্দা নেমে এল। শেষ হল নাটক। করতালিতে ভেঙে পড়ছে আচ্ছাদন। চারিদিকে সাধুবাদ! অজস্র সাধুবাদ!

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা আবার উঠল।

নাটকের পাত্রপাত্রী সম্মুখে দাঁড়ালেন। দাদাসাহেব কখন উঠে গিয়েছিলেন লক্ষ্য করি নি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দু' এক বাত। তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নায়ক সৈফুদ্দিন সেজেছিলেন—

আমি সোজা হয়ে বসলাম। এবার নায়িকা আসবে। নায়িকা এল। তার সজ্জা এখন সহজ সজ্জা। অনেকক্ষণ ভূমিকা শেষ হয়েছে। অতি আধুনিকা একটি তরুণী।

কিন্তু সে নয়। না, সে নয়। তার থেকে এ মেয়েটি সৌন্দর্যে ম্লান। এবং যতই আধুনিকা হোক আধুনিকতার সে উগ্রতা এর নেই। এখন চোখে পড়ল, আকারে অবয়বে মুখ চোখের গড়নেও অনেক তফাত তার সঙ্গে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচয় শেষ হল; নাট্যকার, প্রডিউসার, ডিরেকটার এলেন। শেষ হল; সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। গাড়ি পাব না। দিল্লীতে ওই এক সমস্যা।

পথে মেজাজ যেন ভাল ছিল না। নাটকে খুব খুশী হতে পারি নি। শেষ দিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। একদম ঝুলে পড়েছে। হয়তো নায়িকাকে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মেয়েকে। তোগলকাবাদের পটভূমি আর আমার তোগলকাবাদের সেদিনকার স্মৃতি দুইয়ে এমন জট পাকিয়েছে এবং তার মধ্যে সেই মেয়েটি এমন সামনে রয়েছে যে তাঁকে বাদ দিয়ে নাটকটা দেখে আমার মন ভরে নি। হয়তো বা সে থাকলে ভালই লাগত। তাতে হয়তো নাটকের এই ভূতুড়ে কল্পনার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার সম্পর্কে উচ্ছ্বাস—সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ—ডাউন উইথ ইম্‌পিরিয়ালিজম স্লোগানের উৎকটত্ব ঢাকা পড়ত না—তবে বোধ হয় আমার মনে ভাল লাগত।

তিন

পরের দিন সকালেই দাদাসাহেবের বাসায় গিয়েছিলাম। বাসায় ফেরার পর মনে মনে একটু সংকোচ অনুভব করেছিলাম, দাদাসাহেবকে ফেলে চলে আসা আমার উচিত হয় নি। দাদাসাহেব নিশ্চয় আমাকে খুঁজে থাকবেন। তিনি যে লোক, নিশ্চয় খুঁজবেন।

সকালবেলা আটটার মধ্যেই গেলাম। রবিবার, ছুটির দিন; তার উপর কাল থিয়েটার গেছে, আজ অনেক জন আসবে। থিয়েটারেরই লোক। দাদার মতামত শুনতে আসবে। দাদাসাহেবের এ গুণের কথা বলেছি—হয়তো পুনরুক্তি হচ্ছে—দিল্লীর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত—মন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষকে সমান সমাদরে গ্রহণ করেন, এবং তাদের কাছে তিনি সমান প্রিয়। তা ছাড়া দাদাসাহেবের কাছে নিন্দে শুনেও সুখ না থাক, দুঃখ নেই। ওঁর নিন্দের মধ্যে বিষ থাকে না।

এরা সকলেই আসবে আটটার পর। ছুটি ব'লে তো বটেই তা ছাড়া প্রাতঃভোজনের পরে আসাই বিধি। অন্ততঃ শোভন। সকালবেলা দাদাসাহেব জমিয়ে চা খান, প্রাতঃরাশ করেন। চানাচুর পকৌড়ি থেকে ডিম মাখন রুটি জ্যাম জেলি অনেক রকম নিয়ে বসেন, পাশে বসে তরুণীর দল। তাঁর দৌহিত্রীরা এবং তাদের সঙ্গে একজন দুজন তাদের বান্ধবী তরুণী, তাদের আকর্ষণ কিন্তু দাদাসাহেব। আমি সকাল বেলা খাই নে এসব, দাদাসাহেবের ঘরে এ-কথা জানা কথা হয়ে গেছে; সুতরাং আমার খাবার টেবিলের সংকোচ ছিল না।

দাদার বাসায় বারান্দায় উঠলাম আর ঠিক মনে হল এইমাত্র দরজাটা বন্ধ হল। রাস্তার মোড়ে একখানা ফটফটিয়াও আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। তা হলে কেউ এর মধ্যেই এসে গেছে। তার আর উপায় কি! বোতামটা টিপলাম। ভিতরে বাজার বেজে উঠল।

নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হল, আ—!

দরজা সঙ্গে সঙ্গেই খুলল, দাদাসাহেবের সেক্রেটারী, তাঁর দৌহিত্রীর বান্ধবী শীলা এক তরুণী দরজা খুলে আমাকে দেখে বললে, আপ্! আইয়ে, নমস্তে।

ভিতরে ঠিক দরজা থেকে কেউ নারীকণ্ঠে বললে, ওঁকে বসতে বল, যিনিই হোন! দেখতে পেলাম, একখানা রঙীন শাড়ির অঞ্চলপ্রান্ত ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে অদৃশ্য হল দরজার ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে দাদাসাহেবের প্রসন্ন কণ্ঠ শুনলাম, আ! অ্যাট লাস্ট মাই রৌশন আ গেয়ী।—

শুষ্ককণ্ঠে উত্তর হল, হ্যাঁ এলাম। অন্যের কাছে যাই নি, যাবও না। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমি জানি। তা তুমি রাগ করে পালিয়ে এলে কেন? পহলে বস—বস।

—না, বসব না।

—আরে ভাই এতনা গোস্সা বুঢ্ঢেকে পর, হায় পরমাত্মা! এ কি সাজে! বস, বস!

মেজাজ ঠাণ্ডা কর। চা খাও, কিছু খাও, তারপর হবে। কাল রাত্রে যা মেজাজ দেখেছি তাতে জরুর তুমি কিছু খাও নি!

—এত বেওকুফ্ আমি নই।

—বহুৎ আচ্ছা ভাই, তা হলে এখন এই সকালেই বেওকুফি তুমি জরুর করবে না। বস।

চেয়ার টানার শব্দ হল।

আমি বসবার ঘরে বসে ছিলাম। সেক্রেটারীটি দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কি করবে। মেয়েটি তাকে বারণ করে গেছে। আমি বললাম, দেখ, আমি বরং পরে আসব, কি বল?

—এক মিনিট। আমি আসছি।

সে চলে গেল। পরমুহূর্তেই দাদাসাহেব ডাকলেন, আরে ভাই শঙ্করজী, আ যাও, ভিতর আ যাও।

—না। আমার কথা—

—হবে, পরে হবে, তুমি বস। বাংলাদেশের লেখক, বড় লেখক—তার উপর আর্টে ঝোঁক—আলাপ করিয়ে দিই। তুমি তো 'আরতি' নিয়ে গিয়েছিলে আমার কাছ থেকে। পড়েছ, হারিয়ে ফেলেছ পথে—

সেই মুহূর্তেই আমি গিয়ে ঢুকলাম, নমস্তে।

—নমস্তে ভাই, নমস্তে!

মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বিস্মিত হলাম, খুশীও হলাম। এ সেই মেয়ে। সেও হেসে সবিস্ময়ে বললে, হোয়াট এ সারপ্রাইজ—! ইট ইজ ইউ, মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড!—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, হোয়াই নট ওল্ড চাইল্ড, মাই ইয়ং মাদার? ইজ ইট নট সুইটার?

—নো—নেভার। তারপর হেসে বললে, তুমি তো আচ্ছা অবস্টিনেট লোক!

দাদাসাহেব হেসে উঠলেন, মাই গুডনেস! তোমরা জান দুজনে দুজনকে?

আমি আবার দুষ্টুমি করেই বললাম, ইয়েস ইয়েস দাদাজী, শী ইজ মাই—

—নো—নো—নো। বেতরিবৎ লোক কোথাকার!

দাদা বললেন, কি ব্যাপার? হোয়াট'স্ দি ফান্?

—দেখ না, সেই প্রথম দিন থেকে ধরেছে—আমি ওর মা!

কপালে হাত দিয়ে দাদাসাহেব বললেন, মাই গড! রৌশন মা! হায় পরমাত্মা!

—তাই বল তো ওকে!

—নো—নো—নো। বি ফ্রেণ্ডস্, শঙ্করজী!

—স্থাটস রাইট! ও মাই গ্র্যাণ্ড ওল্ড দাদাসাহেব, আই লাভ ইউ। এত পেয়ার করি এই জন্তে। ইউ ডোণ্ট নো, হাউ মাচ আই লাভ ইউ।

—হাউ মাচ? এতনা? দাদাসাহেব দু হাত দিয়ে একটা পরিমাণ দেখালেন।

—উঁহু। এ—ত—না। বলে সে দুখানা হাতকে যতদূর পারা যায় প্রসারিত করে

জানালে, যে তার থেকে বেশী আর হতে পারে না।

—একদম ঝুটা বাত।

—কেন?

—এই সেদিন কলকাতা থেকে ফিরে আমাকে বললে সেখানকার 'জু'তে যে শিম্পাঞ্জীটা আছে তুমি তার প্রেমে পড়েছ, আর সেদিনও ঠিক এতখানি প্রেমে পড়েছ বলে হাত দুখানা এমনি করেই বাড়িয়ে দেখিয়েছ।

মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওয়াণ্ডারফুল! দাদাসাহেব, তুমি ওয়াণ্ডারফুল! ইউ আর এ ডার্লিং!

—তা, শঙ্করজীকেও তো ভালবেসেছ?

—নিশ্চয়।

—প্রথম দিন থেকেই?

—প্রথম দিন থেকে। উনি আমাকে তোগলকাবাদ রুইন্‌সে জল খাইয়েছেন। পা জখম হয়েছিল, ওঁর কাঁধে ভর দিয়ে সেই উঁচু থেকে নেমেছি। ওঁর ট্যাক্সিতে উনি লিফ্‌ট দিয়েছেন বিনয়নগরের মোড় পর্যন্ত। তখন অবশ্যই জানতাম না যে উনিই শঙ্করজী, 'আরতি' ওঁরই লেখা! ওঃ দাদাসাহেব, কি বলব তোমাকে, ওই আরতির সেকেণ্ড হিরোইন আমাকে হণ্ট করেছে। ওঃ, কতবার ভাবতে চেয়েছি, ওই আশ্চর্য বউটি যদি আমি হতাম!

দাদা প্রগল্‌ভ ব্যক্তি। বললেন—এবং লেখককে নায়ক ভাব নি?

—হুঁ। ভেবেছি।

—তা হলে ভাগ্যে শঙ্করজী সে পরিচয় দেয় নি! বচ গিয়া আপ্‌নে, বহুত বচ গিয়া ভাইজী।

—কেন?

—কেন? আর তা হলে, তুমি শ্রীমতী রোশন, তোমাকে তো আমি জানি, তুমি হয় বেচারাকে চুলের মুঠো ধরে বলতে, চুল পেকেছে কেন তোমার? দাঁত ভেঙেছে কেন? নয়তো একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে বলতে, আই লাভ ইউ, মাই গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান। হু নোজ? জোয়ানি কি মর্জি, ইউ মাইট হ্যাভ বিগান কিসিং হিম! অ্যাণ্ড শঙ্করজী খুন হয়ে যেত। তুমি জান না, উনি পিউরিট্যান লোক, ধর্মবাতিক।

মেয়েটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ঝরে-পড়া ঝরণার মত খিলখিল করে হেসেই চলেছে। দাদা-সাহেবের কৌতুক রসিকতার লোষ্ট্রনিক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলের মত তার সে হাসি যেন ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছিল। আমি সবিস্ময় কৌতুকে এই পরিহাস-রসিকতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ আবার বাজার্ বেজে উঠল। বাইরে কেউ এসেছে। এক মুহূর্তে রোশনের হাসি থেমে গেল। বললে, আমার কথাটা আমি শেষ করতে চাই লোক আসবার আগেই।

আমি বললাম, আমি তাহলে উঠি—

হাতখানা চেপে ধরে রোশন বললে, না বস তুমি। তুমি আমার সাক্ষী। বল তুমি

শঙ্করজী, সেদিন তোগলকাবাদে আমার অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। তোমাকে আমি বলেছিলাম, ওই কুলুপি-দোকানে বসে ভাবছিলাম, হয়তো তোগলকাবাদের আমলে আমি এই দোকানের দোকানদারনী ছিলাম।

আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম না কথাটার অর্থ।

রৌশন বলেই গেল, উনি আমাকে একদিন দেখেছেন। আমি দিনের পর দিন ওই কবরস্থানে গিয়ে স্কেচের পর স্কেচ করেছি।

—কে তা অস্বীকার করবে, ডিয়ার রৌশন ? ই তো সব কোইকো মালুম হ্যায়।

—তবে ? কেন, কেন আমার বদলে অন্তের নাম দিলে প্রডিউসার হিসেবে ?

—আরে ভাই, তার আমি কি করব বল ? সে হল মাইনেকরা আকাদেমির প্রডিউসার—আর তুমি তো ভাই অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেই রাজী হয়েছিলে।

—কিন্তু আমি কুলি মজুর নই, শিফ্‌টার নই। আমি স্কেচ করেছি, আমি সেট ডিজাইন করেছি, রঙ তুলি নিয়েও কাজ করেছি, আর তার জন্তে পাওনা খাতির পাবে অন্ত লোকে ? এ নাটক ওই ভালা-ভোলি-নাড়ুগোপালের মত দেখতে ওই শরণ সিংয়ের লেখা ভেবেছ ? হ্যাঁ লিখেছিল একটা, কিন্তু সে কংগ্রেস রাজের ব্রিফ বেশরমী প্রপাগাণ্ডা। আমি ওকে বলে বলে কাটিয়ে লিখিয়ে চেহারা দিয়েছিলাম। তাও তুমি তাকে এমন করে কাটলে যে শিরিনকে এক সিন রেখে একদম মুছে দিলে।

দাদা বললেন, সো ইউ রিফিউজড টু অ্যাকসেপ্ট শিরিন'স রোল। হেসেই বললেন, কিন্তু সে হাসি নামেই হাসি, স্বাদে তার ঝাঁঝ ছিল।

—হ্যাঁ। তা আমি করেছি।

—কিন্তু করা উচিত ছিল না তোমার।

—ও পার্টে আছে কি তাই করব !

—যা আছে তাই করতে।

—না। তা আমি করি না।

—শুনো ভাই রৌশন। কথাটা শোন। দেখ তুমি ইউনিটের লোক নও, তবু তোমাকে ভালবাসি। তুমি নাটক নিয়ে এলে, আমি নাটক নিলাম। যা করে এনেছিলে তাতে তোমার মগজ আছে তা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে আমার ভাল লাগে নি। বলেই নিলাম যে বদল করব।

—আমি তা মেনে নিয়েছি।

—তাও অনেক ঝঞ্ঝাট করেছ। শেষ পর্যন্ত শিরিনকে রাখা উচিত ছিল সে আমি মানি। কিন্তু যে ভাবে তুমি রেখেছিলে তা হয় না। আমি ভাবতেই পারি না। তাই আমি ওই ভাবে কেটে করে দিলাম কি তুমি পার্টটা করবে। পার্টের জন্তেই তোমাকে নেওয়া হয়েছিল। প্রডাকশনের জন্তে নয়। তুমি যেচে ভার নিয়ে স্কেচ করলে, ডিজাইন করলে। তার জন্তে তুমি—। মাফ করনা ভাই। এ নিয়ে অনেক কথা কানে এসেছে। তুমি নাকি—।

—হ্যাঁ জানি। যত সব নর্দমার মক্ষির মত মনের লোক বলেছে, আমি প্রডিউসারকে খুশী করেছি,—কটাক্ষে ঘায়েল করেছি—

—ছাড় ছাড়, ওসব কথা ছাড়। তোমার মুখে আটকায় না কিন্তু আমাদের শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট শিরিনের পার্টের জন্যে। তুমি সাত দিন আগে বললে, আমি করব না। বেশ ভাল। ওরা চটে গেল। যাবারই কথা। সুরঞ্জনা পাকা অ্যাক্ট্রেস, সে চালিয়ে দিলে। তার উপর তুমি হঠাৎ প্রডিউসারকে বললে, ইডিয়ট।

—সে আমাকে কি বলেছে জান? হারলট! লোকের সামনে। হ্যাঁ, বলেছে আমি মদ খাই! আমি নাকি ফরেনারদের নিয়ে গাইডের কাজ করার নামে ফুর্তি করে বেড়াই! আর্ট ট্রেজার কিনে দেওয়ার ছলে বাজে জিনিস বিক্রি করে ঠকাই। আমি নাকি একটা চিট!

আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটির কোন সংকোচ ছিল না।

দাদা বাধা দিয়ে বললেন, দেখ রৌশন, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি বল? আমি বলব তুমি প্রডিউসারকে যখন সাহায্য করেছ, খেটেছ, তখন তোমার রেমুনারেশন পাওয়া উচিত। চেষ্টাও করব যাতে পাও।

—কিন্তু টাকাটাই সব নয়।

হাসলেন দাদা। এ হাসিটাও সহজ নয়, তিক্ততা তার মধ্যে স্পষ্ট। বললেন, নিমক মিলা হ্যায়, বাস্, চিনিকে বাত ছোড়ো। ওতেই মেনে যাও। নুন একটু বেশী হওয়া চাই, এই তো!

রৌশন স্থিরদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে তাকাল। তাতে তিরস্কার ছিল। তারপর বললে, যাক দাদাসাহেব, আর কথা বাড়াব না। কিন্তু—। না থাক। শঙ্করজী, তুমি হয়তো খুব শকড্ হলে। মাফ চাইব না। বলব, সহজভাবে নিয়ো। আচ্ছা, নমস্তে।

চলে গেল সে।

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ উঠবার পর দাদাসাহেব বেদনার সঙ্গে আক্ষেপ-মেশানো সুরে বললেন, একদম স্পয়েল্‌ড হো গয়া। অথচ ট্যালেন্ট ছিল লেড়কীর! ছবি আঁকতে পারে, এদেশের ক্র্যাফ্‌টসও জানে, অ্যাক্টিং করতে পারে; ফরোয়ার্ড—কিন্তু—

ওই অসমাপ্তির মধ্যেই ইঙ্গিতে কথাটা সুস্পষ্ট। বললে এত স্পষ্ট হতে পারত না।

আমি বললাম, কোথাকার মেয়ে? পাঞ্জাব?

—সে সব কেউ কিছু জানে না। ও বলে হরেক রকম, কাউকে বলে, কোন জায়গীর-দারের মেয়ে। কাউকে বলে, রাজার মেয়ে। কখনও বলে, বাপ ছিল পণ্ডিত লোক। কোন পদবী বলে না। শুধু রৌশন। লেখাপড়া ভাল জানে না। তবে ইংরিজি বলতে পারে। ফরেনারদের গাইড হয়, আর্ট ট্রেজার কিনে দেয়, বললে শুনলে না! লোকে নানারকম বলে। আমি স্নেহ করি। একটা অ্যামেচার ক্লাবে ওর অ্যাক্টিং দেখে ভাল লেগেছিল। আলাপ করেছিলাম। ঠিক এমনটা বুঝি নি। এই নাটক নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপটা বেশী হয়েছিল। তা—

হাসলেন দাদাজী।

—তা আমার গোড়াতেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

বাজার্ বেজে উঠল আবার। কেউ এসেছে।

মাঝখানে একবার বাজার্ বেজেছিল। সেবার এসেছিল ডিমওলা। দাদা থামলেন: কোই আ গেয়া হোগা। নাউ লেট আস্ স্টপ্। বাট, রৌশন হ্যাজ স্ট্যান্‌ড্ ইউ, ইজ নট ইট্? একদম চমক লাগা দিহিস! অ্যাঁ?

—নট মাচ্।

—নট মাচ্?

—হাঁ। ও সেদিন যখন মা বলতে রাগ করলে তখনই বিস্ময় কেটে গেছে।

হেসে ফেললেন দাদাজী। বললেন, সে দিল্লীর অনেক মেয়েই করবে। কিন্তু রৌশন একজাতের বোধ হয় একটি। অন্ততঃ আমি তো দেখি নি। আরে নাটকে ওর হাত ছিল বলছিল না? ছিল। ফ্যাক্ট। স্বীকার করেছে ড্রামাটিস্ট। ইয়ং ম্যান, রৌশনের পাল্লা। করেছিল কি জান? ওই হিরোইন শিরিন ছুটে পালাল। তারপর পাদশার লোক তাকে ধরলে, নিয়ে এল পাদশার কাছে। পাদশা জিজ্ঞাসা করলে, তোর মহব্বতি সত্যি? সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, সত্যি কিনা জানি না জাঁহাপনা, তবে—। পাদশা বললে, আচ্ছা তার পরীক্ষা দিতে হবে। তুই ওর কাছে যেতে চাইলে তোর মুখটা ঝলসে পুড়িয়ে দেব। তাতে তোর ক্ষতি হবে না। ও চোখে দেখতে পায় না। আর লোকেও তোর সুরত দেখে তোর পিছু নেবে না। আর যদি না-চাস, তবে তোকে দরবারের নাচনেওয়ালী হয়ে থাকতে হবে। পরদেশ থেকে রাজাদের দূত আসে, আমার অধীন এ-দেশের রাজারা আসে, তাদের গান শোনাবি, নাচবি, আর তারা চাইলে কসবীগিরিও করবি। খাজাঞ্চীখানা থেকে মাসে একশো মোহর তলব মিলবে। খানাপিনা মিলবে। বাড়ি মিলবে। হীরা জহরৎ ভি মিলবে। বল্, কি করবি বল্। মেয়েটা কাঁদতে লাগল। পাদশা হুকুম দিলেন, দে তবে ওর মুখখানা ঝলসে দে। দেখিস যেন মরে না-যায়। মেয়েটা কেঁদে উঠল, না মালিক, না—না। পাদশা বললেন, কী না? ও বললে, যাব না আমি, অন্ধা সৈফুদ্দিনের কাছে যাব না। পাদশা একরাশ মোহর ঢেলে দিলেন, বললেন, এই নে। যাও, একে আচ্ছা মোকাম দাও। আচ্ছা পোশাক দাও। এরপর মেয়েটার একটা সিন ছিল। বাড়িতে কাঁদছে। তারপর দরবারে মদ খাচ্ছে নাচছে, এক বিদেশী অতিথির কাছে কসবীপনা করছে। তারপর শঙ্করজী, মোস্ট হরিব্‌ল থিং—লাস্ট সিনে—দেবগিরির দরবারে যখন পা-খানা নিয়ে সিপাহী ঢুকল, সেই মুহূর্তে ওই মেয়েটা দরবারে ঢুকে কুর্নিশ করে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর বললে, জাঁহাপনা, মেহেরবানী হয় তো পচা পা-খানা বাইরে ফেলে দিতে হুকুম হোক। আমি গান গাই নাচি আর গুলাব-জল ছড়াই। বলে, দিস ইজ রিয়াল। শেষ—

এসে ঢুকলেন যিনি তিনি আমার পরিচিত নন তবে গতকাল রাত্রে তাঁর মুখ চিনেছি। তিনি কালকের নাটকের প্রডিউসার। দাদা হেসে বললেন, আইয়ে। উ আয়ি থি।

—হ্যাঁ দেখলাম, তিনমূর্তির সামনে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝলাম, এই আলোচনাই চলবে। বলতে কি, খুব ভাল লাগছিল না। গোড়াটা বেশ লেগেছিল, হাসি-ঠাট্টা। মেয়েটির এই নতুনকালের আলট্রা-মডার্নিজম খারাপ লাগে নি। এ জিনিস আমি বরদাস্ত করতে পারি নে তবু এ সময়টুকুর মধ্যে বেলোয়ারী কাচের আলোক প্রতিফলনের ঝকমকানি উপভোগ করছিলাম। এর মধ্যে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলেছিল। ভেবেছিলাম, কিছু লোককে মেয়েটির পিছনে লাগিয়ে দিলে কি হয়! তারা কেবলই বলবে, মাদার! মাঈজী! মা গো! কিন্তু হঠাৎ নাটকের কথা এবং অভিনয়ের ব্যাপারে ন্যায়-অন্যায় টাকার প্রসঙ্গ উঠতেই সবটাই কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। প্রডিউসারটি সম্পর্কেও ধারণাটি যেন প্রসন্ন নয়। দাদা যা বলেছেন তাতে লোকটিও খুব নির্দোষ নন। মেয়েটি যদি তার স্বার্থ-সাধনের জন্য খেলা খেলবার জন্য ফাঁদই পেতে থাকে, তবে উনি তাতে জেনে শুনে পা বাড়িয়েছিলেন।

আমি নমস্কার করে উঠে চলে এলাম। ন'টা বেজে গেছে। বেরিয়ে সাউথ অ্যাভেন্যুর মোড়ে এসে দেখলাম, সাইকেলের ভিড় চলেছে। দিল্লী শহর, বলতে গেলে সাইকেলের শহর। সাইকেল আর মোটরকার, যাদের ও দুটোর একটাও নেই এবং ট্যাক্সি চড়া যাদের ক্ষমতার বাইরে, এই মাঝখানের লোকের পথকষ্ট ভাগ্যলিপি। বাসের জন্য কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কতক্ষণে যে বাসে জায়গা মিলবে সে কথা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞও বলতে পারে না। ত্রিমূর্তির চারিদিকের গোলাইটার দিকে তাকালাম। লম্বা কিউ। আপিসের সময়। প্রডিউসার বলেছিলেন, সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম তাকিয়ে, কই সে? ওই না? গগল্স চোখে? গগল্স অনেক। আজকাল গগল্স দিল্লীতে ফ্যাশন। ফ্যাশন প্রয়োজন দুইই বটে। মেয়ে পুরুষ সবাই পরে। না, গগল্স ক'জনের চোখে থাকলেও সে নেই। সে রঙের শাড়িই নেই। মেয়েটি আজও সেই হাল্কা নীল বা সবুজ রঙের শাড়ি পরে এসেছিল। ওই রঙটা ওকে মানায় ভাল। এবং মেয়েটি তা জানে।

চার

দিন পঁচিশেক পর। এপ্রিল এসে শেষের দিকে পৌঁছেছে। শুকনো গরমে শরীর ফাটতে শুরু করেছে। দুপুরে রোদের মধ্যে বের হওয়া দূরের কথা, রোদের দিকে চাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর ভিন্ন বের হওয়া যায় না। সন্ধ্যে হতে সাতটা বেজে যায়। কলকাতা থেকে দিল্লীতে সূর্য ওঠেন দেরিতে, অস্ত যানও দেরিতে। কনটসার্কাসে গিয়ে দু পাক দিতে-না-দিতে দোকান বন্ধের পালা পড়ে যায়। তাই সেদিন সকাল-সকাল বেরিয়েছিলাম। দিনের আলোরও দরকার ছিল। জনপথের ফুটপাথে চট পেতে যে-সব প্রাচীন তিব্বতী দক্ষিণী পিতলের মূর্তি, টেরাকোটা মূর্তি, কাঠের মূর্তি বিক্রী হয়, যা আমি নিত্যই দেখি, সেগুলির মধ্যে আগের দিন একটি বিচিত্র মূর্তি দেখেছিলাম। এ মূর্তি আমি আগে আর চোখে দেখি নি।

মূর্তিটি শিব ও শিবানীর বিহার অবস্থার মূর্তি। রাত্রে দেখে ঠিক সুষমার পূর্ণ আস্বাদন পাই নি। দাম বেশী বলেছিল বলেই না-দেখে কিনি নি। আমার ট্যাক্সিওয়ালা বন্ধু উধম সিং আমাকে আর একদিন রাত্রে একটি মূল্যবান কথা বলেছিল। উধম সিং ট্যাক্সিওয়ালা বটে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রীতি-মমতার স্রোত ফল্গুধারার মত বিদ্যমান। আগে যখন কনস্টিট্যুশন হাউসে থাকতাম তখন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়। একটু বিচিত্রভাবে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন কারুর ইচ্ছেতে (যে জনকে দেখতে পাই নে) এ সূত্রপাত। অবশ্য সেটা আমারই মনগড়া। সে বিবরণ থাক। উধম সিং এমনি ভাবে একদিন রাত্রে মূর্তি কেনার সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে সেদিন টাকা বেশী ছিল না, তাই না-কিনে ফিরে তার ট্যাক্সিতে বসতেই বলেছিল, বাবুজী, তুমি না কিনেছ ভালই করেছ।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বল তো?

—বাবুজী দেখিয়ে, আপনি যে এ চিজ কিনছেন, কেন কিনছেন? ওই চিজটির সুরতের জন্তে কিনছেন তো? তা রাত্রিকালে বাবুজী বুড্‌ঢীতে রঙ মেখে এইসা সুরত বানায় —ঝুটা সুরত—যে ধরবার উপায় থাকে না। গাছকে মানুষ মনে হয়, চোর ছিপাকে দাঁড়িয়ে থাকলে আঁখসে মালুম হয় না। সুরযনারায়ণ থাকতে এ ফাঁকি চলে না। কাল দিনে দেখে কিনো। হার জিতের আপসোস থাকবে না।

সে কথাটি ভাল লেগেছিল, কথাটা মেনে চলি। তাই কাল রাত্রে মূর্তিটি দুর্লভ বা অসচরাচর হলেও কিনি নি।

বেলা পাঁচটা। এপ্রিলের বেলা পাঁচটায় দিল্লীতে রোদ উত্তাপ কলকাতার সাড়ে তিনটে চারটের মত। ওখানে নেমে মূর্তিটি দেখছি, কিনছি। হঠাৎ পিছন থেকে মৃদুস্বরে কেউ বললে, হ্যালো, ইজ ইট রিয়ালি ইউ ওল্ড ম্যান, মাই ফ্রেণ্ড?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আর কেউ নয়—রৌশন। মনে হল রৌদ্রে খুব ঘুরেছে। দেখেও খুশী হই নি। সেদিন দাদাসাহেবের ওখানে ওই সব শুনে খুশী হবার কথা নয়। তবুও একটু হেসে বললাম, ইয়েস। কিন্তু তুমি কোত্থেকে?

—আসমানসে নেহি। পথে পয়দলে হাঁটতে হাঁটতে। তোমার মত ট্যাক্সিতেও নয়।

—ভাল। চলেছ কোথায়? ভাল আছ?

—যাব আর কোথায়? এই কাজ শেষ হল। এবার একটু ঘুরে আস্তানায় ফিরব।

—কি কাজ করছ এখন? নতুন প্লে?

—না, না, না। ও আমার কাজ ঠিক নয়। ওটাতে একটা চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম। ভাগ্য মন্দ। আর—থাক সে সব। আমি আসলে এই সব নিয়েই কাজ করি। এই সব কিউরিয়ো, আর্ট ট্রেজার। নিজে একটু আধটু ছবি-টবি আঁকি। আর বিদেশী টুরিস্ট এলে তাদের গাইডের কাজও করি, সঙ্গে সঙ্গে এই সব জিনিসও বিক্রি করি। একদল ইংরেজ এসেছে, তাদের কুতুব তোগলকাবাদ ওই দিকটা দেখিয়ে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে

এই ফিরছি। কিন্তু তুমি এই সব জিনিস কেনো বুঝি? হাঁ—হাঁ—হাঁ, দাদাসাহেব সেদিন বলছিলেন বটে। তা কি কিনছ? এদের সঙ্গে দর করতে পার?

—তা জানি নে। এ সব জিনিসে ঠকা জেতার হিসেব করি নে। করলে কেনাও যায় না। তা ছাড়া দিল্লীতে তো জিনিসের দর কুতুবমিনারের মাথায় চড়ে বসে থাকে।

—সিঁড়ি আছে কুতুবমিনারে, টেনে নামিয়ে আনতে হয়। সর, আমি দেখি। ওরা আমাকে খুব চেনে। তোমাকে কত দাম বলেছে? চল্লিশ?

—পঁয়তাল্লিশ।

—হায় পরমাত্মা! তুমি নিশ্চয় এর আগে এদের কাছে বেশী দামে জিনিস কিনেছ, না হয় তো হু'তিন দিন এটার জন্যে এসে দর করে যাচ্ছ?

—সেটা সত্যি। কাল রাত্রে বলেছিল চল্লিশ। আজ বলে পঁয়তাল্লিশ!

—আচ্ছা।

বলে সে মূর্তিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বললে, নাও, দাম বল।

মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বললে, বলেছি তো?

—না, না। উনি আমার দোস্ত। ঠিক দাম বাতাও।

—চালিশ!

রৌশন মুখে কিছু বললে না শুধু তিনটে আঙুল দেখালে।

—নেহি, নেহি হোগা।

—হোগা। হো গেয়া। এক দো তিন। বাস্ করো।

তিরিশ টাকাতেই কিনে দিলে রৌশন। এবং জিজ্ঞেস করলে, এনিথিং এল্স্?

—নো, থ্যাঙ্কস।

—আচ্ছা। তা হলে, চল কফি হাউসে কফি খাইয়ে দাও।

—তারপর?

—তারপর—? না বাসায় আর যাব না। সাতটায় ফিরতে হবে হোটেলে। ডিনারের পর ওরা যদি কোথাও যেতে চায় তবে ব্যবস্থা করতে হবে। এখানেই খানিকক্ষণ ঘুরবে। বন্ধু মিলতে পারে। পার্কে বসব। কি ফের কফি হাউসে ঢুকব।

কফি খেতে বসে হঠাৎ সে বললে, তোমায় আমি একটা জিনিস দেখাব। দেখ তো।

তার বড় ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগ বা ছোট হাতব্যাগটি খুলে বের করলে ছোট একটুকরো কাঠ এবং একটি পেন্সিল চক।—দেখ তো!

অবাক বা বিস্মিত হয়ে গেলাম বলব না, সাধারণ জিনিস—এ দেখেছি। কিন্তু সাধারণ যা বাজারে মেলে, দেখা যায়, তার থেকে ভাল। কাঠের টুকরোটি পালিশকরা, তার উপরে খুদে লালকেল্লার ছবি আঁকা। খোদাই দাগের উপরে হাতীর দাঁতের মত কোন সাদা জিনিস দিয়েছি যাতে ঠিক হাতীর দাঁত বলেই মনে হয়। কোন সস্তা হাড়ও হতে পারে। আর পেন্সিল চকটি নীল রঙ মাখিয়ে তার উপর সুন্দর একটি মেয়ের ছবি। রঙীন।

সে বললে, ইয়ে দিল্লী আর ইয়ে ময়.ছুঁ। বল, আমার মত হয় নি ?

প্রশ্ন করলাম, তুমি করেছ ?

—তোমার ভাল লাগলে, আমি করেছি ; না-লাগলে, আমি করি নি। হাসতে লাগল।

—না ভাল লেগেছে। সত্যিই ভাল লেগেছে। রাখ।

—তুমি রাখ। খুশী হয়ে দিচ্ছি। এসব আমি ওই টুরিস্টদের জন্তে করে রাখি। ওদের সকলকে যাবার সময় দিই। বিজ্ঞাপন বলতে পার।

—কিন্তু আমার কাছে তোমার বিজ্ঞাপনের দরকার নেই।

—তা হলেও ধর, এ ছুটো দিয়ে মনে মনে বলছি, ফরগেট মি নট।

তার পরমুহূর্তেই বললে, নেইই বা কেন ? এতে তোমার মনে হবে আমি শুধু রঙীন ফানুস নই। তা ছাড়া তুমি ওই সব জিনিস কেনো, মনে কর ক্লায়েণ্ট তৈরি করছি।

আজ ভারী ভাল লাগল রৌশনকে। মনে হল, মানুষ কখনও রঙীন ফানুস হয় না। কিছু বস্তু থাকেই। বাসায় ফিরে এলাম। পকেট থেকে ওছুটোকে বের করে দেখলাম পেন্সিল চকটা দুখানা হয়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু ছবিটা গোটা আছে। চকটা ঠিক মাথার উপর থেকে ভেঙেছে।

চারদিন পর ; মনে হল ছবিটা দুখানা হয়ে ভাঙলেই ভাল হত। সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে গেল।

সেদিন জনপথের উপর বড় হোটেলগুলোর মধ্যে একটায় গিয়েছিলাম বম্বের এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গত রাত্রে ফোন করেছিলেন। শরীর ভাল নেই, থাকলে তিনিই আসতেন আমার বাসায়। ইস্ট জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া চষে ফিরেছেন, ধকল অনেক গেছে ; শরীর খারাপের দোষ কি ?

লিফ্‌টে তিনতলায় উঠে করিডর ধরে চলেছিলাম। বেলা তিনটে হবে, লোকজন নেই। হঠাৎ একটা দরজা খুলে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। সামনে খানিকটা দূরে, তবু চিনতে পারলাম সে রৌশন। বেরিয়েই সে হনহন করে চলে আসছিল। ওদিকে পিছনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি সাদাচামড়া ছোকরা। সে যেন তাকে ধরবার জন্তে অগ্রসর হল। লম্বা পা ফেলে ডাকলে, ইউ! ইউ! ডু ইউ হিয়ার ?—ইউ!

রৌশন দাঁড়ায় নি। আমাকে সামনে দেখেও না। সে পালাচ্ছিল। বিদেশী ছোকরা লম্বা পা ফেলে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে রুখে বললে, মাই মানি! রূপেয়া দেও হামারা!

আমি তখন প্রায় কাছেএসে পড়েছি। বেশী হলে হয়তো পনের বিশ ফুট তফাতে। রৌশনের মুখ আমার দিকে। চোখ ফিরিয়ে সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা তার মত প্রগল্‌ভার মুখেও যোগাল না। ছোকরাটি তার হাত ধরে বললে, তোমাকে আমি ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাব। সমস্ত কথা বলব। ইউ ড্যাম চীট! লোক ঠকানো তোমার পেশা। তুমি জান, ম্যানেজারকে বললে এ হোটেলে ঢোকা তোমার বন্ধ হয়ে যাবে।

রৌশন যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেছে। এমন সে হতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি। পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিলাম। টাকার কথা এবং যেভাবে সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, যে ভাবে ওই বিদেশী উদ্ধত যুবক উত্তেজনায় তার পথ রোধ করেছে তাতে আভ্যন্তরীণ কুৎসিতপনা নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে হাসছিল। কাছে পৌঁছুতেই গন্ধতেও প্রকাশ পেল। মগুগন্ধে কয়েক ফুটের মধ্যে বাতাস সংক্রামিত হয়ে উঠেছে।

রৌশন মাথা হেঁট করে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। রৌশনকেই ডাকলাম, হ্যালো! রৌশন?

বিদেশী ছোকরা চোখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। মুখে চোখে অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্য রেখায় রেখায় ফুটে উঠল। দিল্লীর গরমে চড়া রোদে মদ্যের ক্রিয়াও বোধ করি মাত্রা ছাড়িয়েছিল। সে বললে, ওয়েল জেণ্টেলম্যান—

আমি প্রস্তুত ছিলাম, প্রত্যাশা করছিলাম কিছুটা। বললাম, ইয়েস জেণ্টেলম্যান!

—অনুগ্রহ করে যদি তুমি নিজের কাজে যাও তো আমি খুশী হব। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে, কাজ আছে।

চট করে জবাবটা এসে গেল অর্থাৎ ভেবেচিন্তে নয়। ওই জবাবটাই এল তাই বললাম, আমার ওর সঙ্গে তোমার কাজের চেয়েও জরুরী কাজ আছে। আমি ওকে খুঁজতেই এসেছি।

—তোমার কাছে ও টাকা নিয়ে এনগেজমেণ্ট রাখে নি—না কি?

আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। একজন পানোন্মত্ত বিদেশী এই দেশের একটি মেয়ের, সে যেই হোক, যাই হোক তার পরিচয়, চরিত্র, অপমান করবে, তার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে অপমান করবে সে সহ্য হল না। বলে উঠলাম, তুমি জান, তুমি কি বলছ?

—নিশ্চয় জানি।

—না। জান না। জান, রৌশন আমার ধর্মকন্যা। সী ইজ মাই অ্যাডপটেড ডটার। আই কল হার মাই লিট্‌ল্ মাদার।

—ওঃ, গৌরবের ধর্মকন্যা তোমার—

—শাট আপ! আই সে! আমি এই হোটেলের সমস্ত ইণ্ডিয়ানকে ডাকব এবং বলব, তুমি এমন জঘন্যভাবে এদেশের মেয়ের অপমান করছ।

এবার ছোকরা চমকাল। এটা সে ভাবে নি। চমকে আমার দিকে তাকালে। আমি বললাম, কি করেছে রৌশন যে তুমি এমন কথা বলছ? আমি শুনেছি তুমি টাকার কথা বলছিলে। ফিরে চাচ্ছিলে টাকা।

—হ্যাঁ, ও আমার কাছে একশো টাকা নিয়েছে।

রৌশন এবার বললে, কিছু মূর্তি সংগ্রহ করে দেবার জন্য একশো টাকা দিয়েছিল কিন্তু সে মূর্তি এখনও এসে পৌঁছয় নি। ও—

আমার ব্যাগে টাকা ছিল। আমি বের করে একশো টাকার একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললাম, যাও, চলে যাও। একটা কথা শুধু স্মরণ রেখো, উপকার হবে। ভিন্ন দেশে

যখন যাবে তখন সে দেশের মেয়েদের সব থেকে বেশী শ্রদ্ধা সম্মান দিয়ো। যাও।

রৌশনকে বললাম, যাও, বাড়ি যাও। তোমাকে খুঁজে আমি হায়রান। যাও, দেরি করো না।

রৌশন নীরবে মাথা হেঁট করে চলে গেল। ওর শরীর থেকেও মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। হতভাগা মেয়ে ভাগ্যের নামে হতভাগ্যের পিছনে উন্মত্তের মত ছুটেছে।

যতক্ষণ সে লিফ্‌টে না চড়ল ততক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একশো টাকা যাওয়ার জন্য মনে আক্ষেপ ছিল না। সে চলে গেলে আমি ওপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় শেষ প্রান্তে বন্ধুর ঘর।

পাঁচ

ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

বাসার দরজায় নেমেছি। রাস্তার ধারে বড় গাছগুলির তলার অন্ধকার থেকে কে উঠে এল। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল; ট্যাক্সি থেকেই নজরে পড়েছিল কিন্তু সে নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। গরমের দিন—গরমের দিন কেন—শীত বা গ্রীষ্ম যে কালই লোক, সাউথ অ্যাভেন্যুর দু'পাশের ছোট পথে এবং ঘাসওয়ালা মাঝখানের জায়গায় সভ্য মানব মানবীরা ঘুরে বেড়ান। এঁদের ছোট ছেলেদের ব্যাডমিন্টন থেকে ক্রিকেট চলে; মাঝে মাঝে ফুলের বেড; তার চারিদিকে পশ্চিম অঞ্চলের তাজা-স্বাস্থ্য, টকটকে-রঙ, রঙীন পোশাক পরা বাচ্চারা টলতে টলতে ঘুরে বেড়ায়। দাঙ্গী—মডার্ন কথায় আয়ারা, প্যারাম্বুলেটর ঠেলে। মাঝে মাঝে সাহেবী পোশাক পরা (কোট অবশ্য গলাবন্ধ) বা পাজামা শেরওয়ানী পরা কেউ চামড়ার দড়ি হাতে হনহন করে হাঁটেন, পিছনে চলে অ্যালশেশিয়ান। মেয়েদের পোশাক আশিভাগ শাড়ি। কিছু সালোয়ার পাঞ্জাবি। মজুর মজুরনীরা ঘাগরা কাঁচুলি ওড়না পরে কিন্তু তারা সকালে কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে। কোন মেয়ে এখানে গাছে ঠেস দিয়ে বসে থাকলে কোন প্রশ্নই জাগে না।

মেয়েটি উঠে এসে দাঁড়াল। সে রৌশন।

চিত্ত কিন্তু আমার প্রসন্ন হল না। সে বললে, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।

উত্তর দিলাম না।

সে বললে, হোটেল থেকে বরাবর এখানে এসেছি।

এবার বললাম, ঠিকানা কোথায় পেলে?

—হোটেলের নীচেতলায় এসে ফোন গাইড থেকে দেখে নিয়েছিলাম।

—আর কোন দরকার আছে?

—আছে।

কি বলব ? কয়েক পা নীরবে হেঁটে বললাম, এস।

'না' কথাটা বলতে পারলাম না কিন্তু মনে খুব, খুব কেন—আদৌ সায় ছিল না। বাসায় ঢোকা না-পর্যন্ত সেও কোন কথা বলে নি। ঘরে ঢুকে বসবার আসন দেখিয়ে বললাম, বস।

বসে সে বললে, এক গ্লাস জল খাব।

দিল্লীর সংসার আমার চাকর নিয়ে। চাকরকে ডেকে বললাম, জল দে এক গ্লাস।

তার কথা কি জানি। কোনমতে একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অথবা একশো টাকা দিয়ে তাকে অপমান থেকে বাঁচিয়েছি যখন তখন সে প্রত্যাশা করেছে আরও দশ বিশ টাকা কি আর বের না হবে ?

জলের গ্লাসটা একনিশ্বাসে শেষ করে সে বললে, আঃ, বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

একটু অপেক্ষা করে বললাম, একেবারে সরাসরিই বলে ফেললাম, ধন্যবাদ দিতে এসেছ ?

—না।

—তবে ?

একটু চুপ করে থেকে বললে, সেই তোগলকাবাদ থেকে তুমি আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে চেয়েছ। আমি পাতাই নি। আজ—

মুখ তুলে তাকিয়ে সে হাসলে। সংসার বিচিত্র। অথবা মূর্খের মেলা। একটি ভালো কথা বললেই মন্দ মানুষকে ভালো মনে হয়। পিছনের সব মন্দ কথা ঢাকা পড়ে যায়। আশ্চর্য, আমি প্রসন্ন হয়ে উঠেই বললাম, যা হলে আজ থেকে ?

—না। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ও নড়ল।

আমার ভুরু দুটি কুঁচকে আবার কপালের শিরায় টান ধরাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সে ওই কয়েক সেকেণ্ড থেমে ঘাড় নাড়া বন্ধ করে বললে, তুমি আজ বলেছ আমি তোমার ধরমবেটি, অ্যাডপটেড ডটার। আজ থেকে তুমি আমার পিতাজী, আমি মেয়ে।

ব্যাস। ওইটুকু বলেই সে উঠল যেন তীরের মত। এবং চট করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে এলাম, ডাকলাম, রৌশন! রৌশন।

সে প্রায় ছুটে দুড়দুড় শব্দ করে নেমে চলে গেল। সিঁড়ি নেমে ধরবার সময়ও ছিল না, উচিতও হত না। লোকে মনে করত—অন্ততঃ কিছু মনে করতে পারত। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকতে গেলাম, কিন্তু তাও পারলাম না। দেখলাম সে হনহন করে চলছে; চলছে নয় ছুটছে—বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। অনেকটা দূর পর্যন্ত তাকে দেখা গেল। দাঁড়িয়েই রইলাম। যাক, এ আবেগ আর কতক্ষণ ? হয়তো যতক্ষণ পানীয়ের প্রভাব আছে ততক্ষণ। সে প্রভাব এখনও আছে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অথবা আজকের রাত্রিটা, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন সব, বিগত দিনের সব মুছে যাবে। আমি জানি এ দিক আর ও মাড়াবে না। আমাকে দেখলে অন্য পথে হাঁটবে।

মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমার পারঙ্গমতায় বা সার্থকতায় আমি খুশী হলাম। রৌশনের

মত মেয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। বাংলাদেশে এমন মেয়ে বিরল না হলেও অল্প। তবে তু'জন একজনকে দেখেছি, জানি; এই দিল্লী শহরেও একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তবে ঘনিষ্ঠতা কম। এমন ক্ষেত্রও কখনও হয় নি। সুতরাং এ অনুমান অভিজ্ঞতা থেকে নয়, এ অনুমানে আমার বুদ্ধির গৌরব করতে পারি। রৌশন সম্পর্কে আমার অনুমান পনের আনা মিলে গেল।

সাতদিনের মধ্যে রৌশন এল না। সাতদিন পরে একখানা চিঠি এল। এক আনা গরমিল হল ওই চিঠিখানা। পথে হঠাৎ দেখা হলে সে চলে না গিয়ে কথা বললে বলতাম, এক পয়সা গরমিল। ইংরিজীতে লিখেছে। হাতের লেখাটি ভাল। কিন্তু ভাষাটা গোলমেলে। কথাবার্তা রৌশন ইংরিজীতে চালায়, বেশ চালায়, অনর্গল বলে, থামে না—কিন্তু ভুল থাকে অনেক। আমার থেকেও ভুল থাকে। চিঠিখানায় যেন বেশী অসুবিধায় পড়েছে। কথা বলা আর লেখা, সে চিঠি হলেও, এক নয়। লিখেছে—

ডিয়ার ফাদার, (মাই ডিয়ার নয়)

সেদিন তোমাকে ফাদার বলেছি, ওটা মেনে নিয়েছি। পরে অবশ্য মনে কেমন কেমন ঠেকেছে, খুঁতখুঁত করেছে কিন্তু তুমি আমার জন্যে যা করেছ তারপর যদি বলি ওটা ভুল হয়েছে, নিতান্তভাবে সে কালে সেই মাতালের বাদশাকে হাতী বিক্রি করবে কিনা জিজ্ঞাসা করার গল্পের মত কাণ্ড—তাহলে ঠিক হবে না। সেদিন পানীয়ের প্রভাব আমার উপর ছিল সে তুমি জানতে পেরেছিলে। তা ছিল, কিন্তু আমার সচেতনতাও ছিল, এটা নিশ্চয় ওই হোটেলের বারান্দায় তুমি লক্ষ্য করেছ। তা না-হলে তো এমন দৃশ্য বা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটত না। খুব বেশী কথা বলব না। তবে তুমি সেদিন আমাকে তো জেনে বুঝেই তাকে বলেছিলে—রৌশন আমার ধরমবেটী—আমাকে খারাপ জেনে, মন্দ জেনেই কথাটা অসংকোচে বললে। তারপর তোমাকে ফাদার বলতে সত্যিই ইচ্ছে হয়েছিল, পানীয়ের প্রভাবও তার সঙ্গে মিশেছিল। আবেগটা বেশী হয়েছিল। না-হলে ঘণ্টা তিনেক গাছে ঠেস দিয়ে তোমার বাসার সামনে বসে বসে ঢুলতে পারতাম না। পরে মন খুঁতখুঁত করলেও ওটাকে মেনে নিয়েছি। আমি মন্দ মেয়ে, এ 'ব্যাড গার্ল' জেনেই তুমি কথাটা বলেছ। সুতরাং আমার দিক থেকে কি আপত্তি থাকবে? আমার বাবা তো ছিল। সে থাকলে বরং তার সঙ্গে ঝগড়া হত কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ঝগড়া হবে না। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বন্ধু হলে যেতাম। ফাদার বলেছি বলেই যাব না। তবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সত্যিই উপকার করেছ। আমি কৃতজ্ঞ। তার থেকে বেশী—তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। তোগলকাবাদে প্রথম দেখা হওয়ার সময় যে জেদটা ধরেছিলে, যাতে আমি বার বার না বলে ঘাড় নেড়েছি, তা আমাকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছ। কথাটা দাদাজীকে বলো না। বললে যায়-আসে না কিছু, তবে বলো না। টাকাটা ফেরত দেবার ইচ্ছে আমার খুব। হাতে নেই। টাকায় কুলোয় না আমার। তবে হলে, দেব। ইতি— রৌশন

আমি একটু হাসলাম। কি করব আর? মনটা খুশী ছিল। অনুমান সত্য হয়েছে বলে।

এর পর কয়েক দিনই ওই তিব্বতী বা নেপালীদের ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকলাম বিকেলে, কিন্তু রৌশনের দেখা পেলাম না।

কয়েক দিন পর, মে মাসের আট দশ তারিখ হবে, দাদাসাহেবের সঙ্গে দেখা হল।

দাদাসাহেব বললেন, রৌশনকে মনে পড়ে তো? স্থাট স্পয়েল্ড গার্ল!

—হ্যাঁ। কি হল তার?

—তাজ্জব কি বাত, আজ এরোড্রোমে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে, বললে কাশ্মীর যাচ্ছে। আরে বাপ! মনে হল আমেরিকান গার্ল! স্ল্যাক, ব্লাউজ পরে, গগল্‌স্ চোখে, বাপ রে! তোমাকে নমস্তে জানিয়েছে।

ক'জনের কাছে টাকা নিয়েছিল রৌশন? মনে মনে বললাম।

এর কদিন পরই চলে এলাম দিল্লী থেকে।

কলকাতায় এসে নিজের কাজে মগ্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ এর মধ্যে রৌশন এসে দাঁড়াল। রৌশন সশরীরে নয়, ডাক মারফৎ তার বিচিত্র পরিচয় এল। পিওন হাকলে, ইনসিওর! ইনসিওর? দেখলাম, রৌশন ইনসিওর করে একশো টাকা পাঠিয়েছে। ইনসিওরটা দিল্লীর ঠিকানা ঘুরে এখানে এসেছে।

সঙ্গে ছোট্ট চিঠি। দাদার, কিছু টাকা পেয়েছি। বিশ্বাস করো, বাই অনেষ্ট মীন্‌স্। তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম। কাশ্মীর এসেছি। তোমার জন্তে কি নিয়ে যাব বল তো?—রৌশন।

সশরীরে রৌশন এল তিন মাস পর। সেপ্টেম্বর। তিন মাস পর দিল্লী গিয়েছিলাম। রৌশনের কথা মনে অবশ্যই হয়েছিল। সে নিজের কন্যা হলে তার ব্যবহারে, তার দুর্নামে যে দুঃখ পাবার কথা তা তো আমার হবার কথা নয়; হয়ও নি। সেই কারণে কনট সার্কাসে যখন গিয়েছি তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি রৌশন আছে কিনা জনস্রোতের মধ্যে। জনপথে সব থেকে বেশী ভিড়। রেফ্যুজিদের দোকান, ফুটপাথে পেপার পাল্পের পুতুল, কাগজের ফুল, তামা পিতলের ওয়ালপ্লেটের নকল, পেপার পাল্পের ওয়ালপ্লেট, ফিরিওলা। ওরই মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ভারতীয় কুটিরশিল্পের কেন্দ্র, যেখানে কাপড়, কাগজের পুতুল থেকে কাশ্মীরী কার্পেট, পিতলের মিনা করা টেবিল, সোনা রূপোর কাজকরা শাল যার দাম আড়াই তিন হাজার পর্যন্ত, তার ওধারে তিব্বতী নেপালী দক্ষিণী মূর্তির ফুটপাথের বাজার, যেখানে রৌশনের ঘোরাফেরা প্রায় নিত্য বলে আমার ধারণা। সেখানেও কদিন সে আছে কিনা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু পাই নি। চার-পাঁচ দিনের পর রৌশন সম্পর্কে একেবারেই আর চিন্তা ছিল না।

আট দিন পর হঠাৎ টেলিফোনে সাড়া পেলাম।

—হ্যালো—ইজ ইট··· ?

—ইয়েস।

—শঙ্করজী ?

—হাঁ।

—ফাদার! বাপুজী!

—রৌশন!

—হাঁ। তুমারা খারাপ লেড়কী। বদমাশ লেড়কী। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির আমেজ।

—ভাল আছ ?

—খারাপ যারা হয় তারা ভবিয়তে খারাপ থাকে না বাপুজী।

—ভাল। কি খবর বল।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাল যাব ?

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার তোমার সঙ্গে দেখা করা।

—এস। কাল এস। এবেলা বারোটা পর্যন্ত ওবেলা চারটে থেকে ছটা।

—আচ্ছা। নমস্তে।

—নমস্তে।

—নেহি। তুমি আমাকে নমস্তে বলবে কি ? তুমি পিতাজী। ধরমবাপ। বল, জিতা রহো, আনন্দ রহো।

—তাই বলছি। জিতা রহো, আনন্দ রহো।

কিন্তু বিচিত্র, না, বিচিত্র কেন, বিচিত্র মেয়ে রৌশন, তার পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক, সে এল না। কোথায় কোন নবতর আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে কে বলতে পারে ? তার পরদিনও না।

দুদিন পর, বেলা তখন একটা, আমি স্নান সেরে আমার শোবার ঘরে পুজোয় বসেছি, বাইরের দরজায় কলিং বেলের সাড়া উঠল। শোবার ঘরে আমার পূজার পাট। পূজার সময় দরজা বন্ধ করে বসি এবং যে কেউ আসুক তাকে হয় বসতে হয়, নয় ফিরে যেতে হয়। আমার লোককে এ বলা আছে। এবং এই অসময়ে কেউ আসে না কারণ দিল্লীতে এটা লাঞ্চের সময়।

চাকর দরজা খুললে, বন্ধ করলে। হয়তো কাগজপত্র হবে।

মনকে ধমক দিলাম। যে হবে, যা হবে, তুমি ওদিকে ছুটছ কোথায় ? যাকে ডাকছ তাকে ডাক, ভাব।

মন চতুর। তার উত্তরের অভাব হয় না। সে বলে, যদি সে-ই এসে থাকে!

—না। তাঁকে ডাকছি মনে। বাইরে এলে তাঁকেও বসতে হবে।

মন ফিরে এল পুজোয়। পুজো সেরে, পুজোর কাপড় ছেড়ে, একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বসবার ঘরে এসে দেখলাম রৌশন দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার সিগারেট, সে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ওয়ালপ্লেট দেখছে নিবিষ্টচিত্তে।

ডাকলাম, রৌশন!

সে একটু চমকে উঠল। ফিরে আমাকে দেখে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে টিপে নিবিয়ে বললে, এসবে তোমার এত শখ? এটা কোথায় কিনলে?

রৌশনের মুখের এমন চেহারা আমি কখনও দেখি তো নাই-ই, কল্পনাও করতে পারি না। মুখে একটা কি যেন ছায়া ফেলেছে বা ফুটে উঠেছে যেটা বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা বা বিমুগ্ধতা যে-কোন একটা হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মমতা আছে, তাতে ভুল নেই। আমি ওর একটি নতুন পরিচয় যেন পেলাম। বললাম, সে কথা পরে বলছি, তার আগে আর একটা কথা বলব। মুখে আমার নিশ্চয় প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

সেও একটু হাসলে, বোধ হয় প্রতিবিম্বের মত। কারণ সে হাসিও তার প্রসন্ন এবং চাতুর্য-বর্জিত। বললে, ফরমাইয়ে।

—তুমি সত্যিকারের শিল্পী। সে আজ এই মুহূর্তে তোমার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, শিল্প আমি ভালবাসি।

—সে তোমার ওই ওয়ালপ্লেটখানা ভাল লাগাতেই বুঝেছি। ওর একটি ইতিহাস আছে। কিন্তু তার আগে তুমি দেখ, ওই জিনিস আরও আছে। চল ওই ঘরে।

এ জিনিস আরও ক'খানি ছিল। ঠিক একই জিনিস নয়। ওই একই রকমের। কাশ্মীরের পুরনো আমলের ডিজাইন—পুরনো শৈলী।

ওয়ালপ্লেট—পিতলজাতীয় ধাতুর তৈরী, ঢালের মত ঢঙ। আকার সচরাচর দু'রকমের, একটা গোল অন্যটা ওভাল। এর উপরে রিলিফে কাহিনীমূলক ছবি ফোটানো থাকে। হর-পার্বতী, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদি। এ ছাঁচের উপর ফেলে ছোট্ট হাতুড়ির নিপুণ মৃদু ঘায়ে ঘায়ে ফুটিয়ে তোলে। মূর্তির চারিধারে একটি পরিমণ্ডল রচনা করে সূক্ষ্ম বাটালি হাতুড়ির কাজ। এখন অর্থাৎ আধুনিক কালে এ শিল্পের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কাহিনীর দিক দিয়ে ওমর খৈয়ামের কবি ও সাকী, সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে, আবার সংযুক্তাহরণ পর্যন্ত এসেছে এবং ওই পরিমণ্ডলের কারুতে অনেক আধুনিক ঢঙ এসেছে। বলতেই হবে চোখে চটকদার হিসেবে এই আধুনিকগুলিই বেশী ঠেকে, চোখকে টানে। এগুলির বিক্রীও বেশী। পুরনো আমলের ঢঙের মধ্যে সেকেলে ভাব আছে, হয়তো বা গ্রাম্য, মোটাও বলে অনেকে। প্রতিটি প্লেটের কাছে সে ঠিক ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একটু বিস্মিত হলাম এবার। বললাম, এগুলি কি খুব ভাল? খুব দুর্লভ মনে কর?

—আমার খুব ভাল লাগছে। আমি এ শিল্পকে খুব ভাল করে জানি। আমি নিজেও তৈরি করতে পারি। তা ছাড়া—

—তুমি পার?

—হ্যাঁ। তুমি দেখেছ আমার হাতের কাজ। তোমাকে লালকেল্লার ছবি আঁকা কাঠটা দিয়েছিলাম। এও আমি পারি। আমার সঙ্গে শ্রীনগরের খুব ভাল জিনিস রয়েছে, ডাল লেকে শিকারাতে মাঝি আর মাঝিনী। তোমার জন্যে এনেছি আমি, দেখাচ্ছি এখুনি। কাজ

খুব ভাল। কিন্তু সে নয়, এগুলি এক ঘাড়ির তৈরী আর পুরনো বাড়ির হাত।

—তোমার দৃষ্টি তো খুব তীক্ষ্ণ!

—আমি চিনি যে! এ সবের সঙ্গে—। তারপরই সে সচেতন হয়ে উঠল আমার খাওয়া হয় নি বলে। সত্যই, আমার খাবার সময় চলে যাচ্ছিল। স্নান করে পুজো শেষ হলেই ক্ষিদে যেটুকু পাবার পেয়ে যায়। প্রাণায়াম শেষ হলেই যান্ত্রিক নিয়মে পিত্তরস ক্ষরিত হয় অভ্যাসফলে।

চাকর রামও দাঁড়িয়েছিল দরজায় কিন্তু বলতে সে কিছু পারছিল না। রৌশনের উপর সে বোধ হয় চটেছিল। দরজায় একটা কড়ায় লাগানো চাবিসুদ্ধ তালাটা নিয়ে মোচড়াচ্ছিল, এরই মধ্যে চাবিটা খুলে মেঝের উপর পড়তেই তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল রৌশন। এবং বুঝতেও পেরেছিল যে লোকটি বিরক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কারণও অনুমান করেছিল যে, খাবার সময় যাচ্ছে। সে তার কথা অসমাপ্ত রেখে বললে, ওঃ তোমার লাঞ্চের আমি দেরি করে দিচ্ছি বাপুজী। থাক ওসব কথা, চল তুমি খেয়ে নাও।

—তুমিও এস রৌশন। বাপুজী বলছ, আমার ধরম-বেটী তুমি, আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ডাল ভাত চচ্চড়ি খাবে। ডোণ্ট সে—নো।

হাসল সে। এবার তার হাসিতে তার স্বাভাবিক রঙ ধরেছে। বললে, ডাল ভাত নেহি বাপুজী, শুধু চচ্চড়ি।

—কেন? কম পড়বে ভাবছ?

—না, তা ভাবি নি। তবে সেটাও ভাববার কথা। আমি তোমার মন্দ বেটী, বদমাশ বেটী, খারাব লেড়কী হলেও আমি খেয়ে তোমাদের কাউকে উপোস করাব এমন ঠিক নই। তবে কথা তা নয়। আমি তো দুপুরে লাঞ্চে ভাত রোটী ভরপেট খাই নে। দিল্লীতে রেওয়াজই তাই। সেকালওয়ালারা খায়, একালওয়ালারা খায় না। ওই থোড়াথুড়ি, কিছু তরকারি, কিছু গোস, একখানা রোটী—এই খাই। কাজ করব কি করে?

সে বসে গেল একখানা চেয়ার নিয়ে।

তরকারি খুব মন্দ হল না। ভাজা, মাছের ঝোল, আলু ছেঁচকি, স্যালাড—তার উপর রাম পাঁপর ভেজে দিলে।

রৌশন বললে, একটু কফির জন্যে বলে দাও।

বেকুব হলাম, কফি তো নেই; রাখি নে ওটা। সে বললে, তবে চা।

খেতে খেতে বললে, জান বাপুজী, কাশ্মীর ক্র্যাফট্‌সের আড়ৎ। শাল, গালিচা, দোপাট্টা এ সব তো বিশ্ববিখ্যাত। ওখানকার লোকে পুরুষ পুরুষ ধরে করে আসছে। দাদার সুঁইয়ে নাতি সেলাই করে নকশা তোলে, দাদির সুঁই-কাঁইচি পায় নাতির বউ, নাতনী। এক এক ঘরে এক এক নকশা আছে। সোনার তারের কাজও হয়। ঠিক তেমনি আছে কাঠের কাজে হরেকরকম চিজ—বাক্স, তিনপাইয়া, ট্রে দেখেছ। তেমনি আছে পিতলের জিনিসের উপর নকশায় মিনায়। ঘরের দেমাক হচ্ছে ওই নকশা নিয়ে। যে ঘরে যে নকশার কাজের

নাম ছোটে তার কারিগরির যেটুকু সব থেকে বিস্ময়ের কাজ তার কৌশল সেই বাড়িতেই লুকোনো থাকে। সহজে বের হয় না। হলেও, ওই বাড়ির কাজের যে-কদর সে-কদর অন্যের কাজে ঠিক তেমন, এমন কি ভাল হলেও হয় না। ধর আমি তোমার বেটী, এই কাজ শিখে শ্বশুরালের ঘরে গিয়ে সেখানে এই জিনিস তৈরি করলাম। কিন্তু তবু ওর কদর হবে না। লোকে, মানে, যারা এই সব নিয়ে কারবার করে তারা তাদের ঘরের সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেয়। ট্রেডমার্ক বলতে পার। ওটা কেউ নকল করে না। তোমার দেওয়ালের সব প্লেটগুলি একবাড়ির। সব প্লেটে এক চিহ্ন। এ কথা সকলে জানে না। জানে যারা খুব ভাল করে এদের সঙ্গে মিশে কারবার করেছে বা এদের নিজেদের লোকেরা।

তারপর থেমে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, রাগ করো না বাপুজী, একটা সিগারেট খাব। তুমি খাচ্ছ, গন্ধে আমার মন খাবার জন্য ছটফট করছে। আমি বড্ড সিগারেট খাই। আই অ্যাম ইওর ব্যাড ডটার!

—সে কি! খাও। এই নাও। আমারই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, তুমি—

—হ্যাঁ, আমি মুখের সিগারেট তখন ফেলে দিয়েছিলাম। আপনা-আপনি ফেলে দিয়েছিলাম। ঠিক যখন প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন যেমন আমার নিজের বাপকে দেখে ফেলে দিয়েছি তেমনি ভাবে।

সে সিগারেট ধরালে। ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমি সত্যিই মন্দ মেয়ে। সত্যিই মন্দ। আই স্মোক, আই ড্রিংক, অ্যাণ্ড—।

চুপ করে ছাদের দিকে চেয়ে রইল।

আমি কথাটা ঘোরাবার জন্য বললাম, ও সব বাজে ছোঁড়ো রৌশন। এখন যে কথা হচ্ছিল তাই বল।

—ওই ক্র্যাফ্‌ট্‌সের কথা! ওগুলো তোমার পুরনো বাড়ির কাজ বটে, পুরনো ঢঙও আছে কিন্তু তৈরি হাল আমলের। আজকালকার।

আমি খুশী হয়ে উঠলাম। সত্যিই খুশী হলাম। এমন একটি আত্মসর্বস্ব বিলাসিনী, যাকে রঙ্গিণী বললে অত্যুক্তি হয় না—তার মধ্যে এমন একটি গুণ আবিষ্কার করে খুশী হলাম। বললাম, সাবাস! ওয়াণ্ডারফুল! তুমি ফুলমার্ক পেয়ে গেছ।

সে হাসলে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ছেলেবেলা এমন আমি যে দেখেছি। আমার বাপ ছিল শিল্প-পাগল লোক, ছোটখাটো সরদার আমীর। মা ছিল না। আমি গ্রামে ইচ্ছেমত ঘুরতাম। এই সব কারিগর-লোকের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতাম। কাজ দেখতাম। বলতাম, আমাকে শেখাও, আমি শিখব। লোকে আমীরের বেটী বলে ভালবাসত; শেখাত। তারা জানত, আমি তো আর এ-সব কাম করে খাব না।

থেমে-থেমে কথাগুলি বলছিল সে। মনে মনে যেন সেই সব ছবিগুলি ভেসে উঠছিল এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে ছবিগুলিকে মুছে দিতে বা সিনেমার ছবির মত পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

হঠাৎ বললে, জান, ছেলেবেলা থেকেই আমি মন্দ। দুরন্ত। আমাদের দেশে তো ঘোড়া অনেক। জাঠদের ঘরে ঘোড়া আছে। মাঠে চরে বেড়ায়। সেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতাম। তারপর একটু থেমে বললে, একবার মেলায় গিয়েছিলাম বাপকে না বলে। এমনি একটা ঘোড়ায় চড়ে। সেখানে হঠাৎ হুজ্জৎ বাধল। ওঃ, সে যে বিপদ! জান, এক ছোকরা শেষে আমাকে বাঁচায়। নিজে একটা ঘোড়ায় চড়ে আমার ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে ছোটাতে ছোটাতে নিয়ে আসে। আমার কি বিপদ! এই পড়ে যাব, এই পড়ে যাব মনে হচ্ছিল। কিন্তু কষে ঘোড়ার গলাটা ধরে আর রেকাবে পা টান করে রেখে এসে পৌঁছেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলাম দুজনেই। মেয়েটি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল সেদিন। যেদিন হোটেল থেকে মদ-খাওয়া অবস্থায় এসে আমাকে ধরমবাপ বলে ছুটে পালিয়েছিল সেদিনও এমন হয় নি।

কিছুক্ষণ পর আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম, তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

—নাঃ!

—কি নাম ছিল তাঁর?

—নো, নো ফাদার! বলতে নেই। আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল।

তারপরই বললে, তবে—, তবে তোমাকে বলতে পারি। বলা উচিত। একটু হাসলে এবং বললে, আমার পিতাজীর নাম—শঙ্করজী।

বুঝলাম আবহাওয়াটাকে লঘু করে তুলতে চাচ্ছে। আমি হাসলাম।

সে হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, অব বাপ! দু' ঘণ্টা হয়ে গেছে! নাও তোমার জন্যে কাশ্মীর থেকে ওয়ালপ্লেট এনেছি। যা বলছিলাম।

তার কাঁধের ঝোলা থেকে একখানা চমৎকার প্লেট বের করে টেবিলের উপর রাখলে। চমৎকার, অতি সুন্দর জিনিস। কাশ্মীর এম্পোরিয়মে অবশ্যই থাকবে কিন্তু আমার চোখে পড়ে নি। ডাল লেকে বা কোন জলস্রোতের উপর মাঝি ও মাঝিনী। তারা অবশ্য কাশ্মিরী। সুতরাং ডাল লেক বলা যায়। দাম দেখলাম পিছনে আঁটা একটি কাগজের টুকরোয় লেখা, চল্লিশ টাকা কত নয়া পয়সা। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এ যে অনেক দাম রোশন!

—ভাল জিনিসের দাম বেশি হবেই বাপুজী!

বলে আরও কয়েকটা টুকরো টুকরো ছোট খেলনা রাখলে সে। তারপর উঠল। আমার সিগারেটের বাক্স থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললে, তুমি আমার বাপুজী তো?

বললাম, জরুর। বুঝলাম সে উপহার দেবার দাবি খুঁজছে।

সে বললে, আমি তোমার গরীব বেটী।

—কেন? গরীব কেন? তুমি বড় বাপের মেয়ে, তুমি—

—বিলকুল বেচে বাপ ফকীর হয়ে মরে আমায় পথে বসিয়ে গেছে।

চুপ করে রইলাম। দুঃখ অনুভব করছিলাম রোশনের জন্য। রোশন নিজে থেকেই বললে, আমি সত্যিই গরীব। জীবনে অভাব মিটল না। অভাব যার মেটে না সে গরীব নয় তো কি!

একটু চুপ করে থেকে বললে, ওই ছোট জিনিসগুলি তোমার গরীব বেটীর উপহার। আর ওই প্লেটটার দাম তুমি আমাকে দিয়ো। কেমন?

বললাম, বস। আমি দেবার কথাই ভাবছিলাম।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাপুজী, আমার বাপুজী, সত্যিকারের বাপ তুমি।

সে বসল।

আমি উঠে শোবার ঘরে গেলাম টাকা আনবার জন্য। হাসতে হাসতেই গেলাম। মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ব্যঙ্গ করছিলাম। আমি কি না ওর ওই সব গরীব বেটী ইত্যাদি কথাগুলির ভণিতায় বোকার মত ভাবছিলাম মেয়েটি সবিনয়ে বলছে, বাপুজী, আমি গরীব, তা হলেও তুমি বাপুজী। তুমি যেন এ নিতে সঙ্কোচ করো না। হায় ভগবান! কিছু-দিন আগে রৌশনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। যাক্! রৌশন একশোটা টাকা ফেরত দিয়েছে যখন তখন চল্লিশটে টাকা নিয়ে যেতে পারে।

টাকা নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম সে আবার সেই ওয়ালপ্লেটটা দেখছে। সেই তেমনি মুগ্ধ বিস্ময় বা মমতা বা এমনি একটা কিছুর সঙ্গে দেখছে। আমি বললাম, ওটা কি এত ভাল, রৌশন? নেবে তুমি ওটা?

—নাঃ। সে ঘাড় নাড়লে।

—নাও। তোমার টাকাটা নাও।

টাকাটা হাতে দিয়ে বললাম, ওটার দাম কত জান?

—কত? পনের ষোল টাকা। বেশী দিয়ে থাক তো কুড়ি। যারা বেচে তারা ওই রকমই বলে। কুড়ি। দেয় পনেরতে।

—আমি কুড়িই দিয়েছি।

—কিছু বেশী দিয়েছ।

—ওটা আমার সব সময়ে সব ক্ষেত্রেই বিশেষত্ব।

চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, আমার প্লেটের দামের কাগজটা কিন্তু জাল নয় বাপুজী। হাসলে সে।

—ও আমি যাচাই করব না। ওটার দাম, যা দিলাম তারি থেকে অনেক বেশী। ওঁর সঙ্গে তোমার কহানিয়া রইল। ওই ওয়ালপ্লেটটারও তাই। ওর ভারী মজার ইতিহাস আছে।

সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে।

আমি বললাম, বস না। চায়ের সময় হল। চা খেয়ে যাও। রাম! চা তৈরি কর।

বললাম, যার কাছে কিনেছি—

ছয়

তার নাম উধম সিং। ট্যাক্সি ড্রাইভার। ট্যাক্সি নাম্বার—। উধম সিং ট্যাক্সি ড্রাইভার হলেও আমার দোস্ত। সংসারে এক একজনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়। তার কার্য-কারণ খুব খতালে অবশ্যই বুঝতে পারা যায় কিন্তু খতাতে ইচ্ছে করে না। সে খতানো পুতুল ভেঙে উপকরণ দেখার মত ব্যাপার।

আমি গাছের বাঁকাচোরা ডাল কেটে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে পুতুল তৈরি করি। এমনি একটা বাঁকা ডাল যেটা দুটো বাঁকে বাঁকা এবং যার হাত পায়ের মত চারটে ফ্যাংড়া আছে তা থেকে একটা ফকীর তৈরি করেছি। মাথায় মুখে তুলোর চুল দাড়ি পরিয়ে, কাগজ সেঁটে তাতে চোখ মুখ এঁকে, লুঙ্গি পরিয়ে, মালা পরিয়ে হাতের মত ফ্যাংড়া ডালের ডগায় একটা বাটীর মত এঁটে দিয়েছি, চমৎকার লাগে। যে আসে সেই দেখে খুশী হয়। সেদিন এক বন্ধু এসে ওটা নেবার মতলব করতেই টেনে সাজপোশাক খুলে দিলাম, ডালটা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বন্ধু চলে গেলে ওটাকে আবার সাজালাম। এবার খরচ করলাম, খাটলাম বেশী। বেশী মনোহারি করে তুললাম। না-করে পারলাম না। উধম সিংয়ের সঙ্গে দোস্তি এমনি ব্যাপার। তুলনা যদি খুঁটিয়ে মানে ধরে করা যায় তবে হয়তো মিলবে না কিন্তু ধরণটা এমনি। আলাপ বা দোস্তিকে মনে হয়েছিল অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রিত বা বিধি-অভিপ্রেত।

রৌশন বললে, বড় ভাল কথা বল তুমি বাপুজী।

বললাম, ধন্যবাদ! খুশী হলাম শুনে। এখন শোন।

দিল্লীতে নতুন আসছি। কালকা মেলে এসে সন্ধ্যার সময় দিল্লীতে নেমেছিলাম। উনিশ শো পঞ্চাশ সাল; স্টেশন থেকে—নম্বর ট্যাক্সিতে এসেছিলাম; নোট-বইয়ে নম্বরটা টোকা আছে। কারণ ঘটেছিল। ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় আমার নীলরঙের পাওয়ারওয়ালা চশমাটা ফেলে নেমেছিলাম। হোটেলে নেমেও খেয়াল ছিল না। কালকা মেল আসে সন্ধ্যের পর। নীলরঙের চশমার প্রয়োজন হয় নি। আধ ঘণ্টা বাদে ট্যাক্সিওলা এসে সেটা দিয়ে গেল।

—বাবুজী এটা তোমার?

—হ্যাঁ।

—লিজিয়ে; নমস্তে।

কিছু বকশিশ দিতে গিয়েছিলাম, নেয় নি। ওর সঙ্গে ট্যাক্সি পর্যন্ত এসেও নিতে রাজী করাতে পারি নি। ট্যাক্সির নম্বরটা নোট করে নিয়েছিলাম আর জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপকা নাম সাব?

—উধম সিং, বাবুজী।

বলে সে ফের নমস্কার করে চলে গিয়েছিল।

তারপর কয়েকবার দিল্লী এসেছি, তা দশ বারো বার হবে। ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। মনেও ছিল না ওর কথা। গত বছর দিল্লী এলাম, এবার এখানে কয়েক মাস অন্ততঃ পাকা-

পোক্তভাবে থাকতে হবে। কনস্টট্যুশন হাউসে ঘর পেয়েছিলাম। এসেছিলাম রাত্রের প্লেনে। ওখানে যে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম সেটা বড় ট্যাক্সি। তারপর কাজে গেলাম। কনস্টিট্যুশন হাউসের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম।

পরের দিন ছিল শনিবার, কাজ ছিল না, ছুটির দিন। সকালবেলা যাব সোনেরিবাগ, চা খাব সেখানে। গত রাত্রে টেলিফোনে নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, শুধু চায়ের নয়, বন্ধুর বাড়িতে দুর্লভ ক্যাকটাসের ফুল ফুটতে শুরু করেছিল রাত্রে। বন্ধু বলেছিলেন, রাত্রেই ফুটে যাবে, সকালেই আসবেন যেন। নিশ্চয় আসবেন।

ট্যাক্সি নিলাম; চেপে মনে হল, কালকের সেই লোক, সেই গাড়ি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বন্ধুর ওখানে গিয়ে দেখলাম, ক্যাকটাস রাত্রে ফুটে ভোরবেলা ম্লান হয়ে গেছে। বন্ধুও ম্লান মুখে বললেন, বেয়াকুফ বইনা গেলাম মশয়। কাল রাত্তিরে আট-দশজনকে টেলিফোন করছি। তারা আইয়া পড়ব।

ঘণ্টাখানেক গল্প করে বন্ধুর ক্লার্ককে বললাম, একটা ট্যাক্সির জন্যে ফোন করে দিন।

ক্লার্ক টেলিফোন করে এসে বললে, স্ট্যাণ্ডে এখন ট্যাক্সি নেই, এলেই পাঠিয়ে দেবে।

বসে রইলাম। মিনিট দশেক পর বন্ধুর নিমন্ত্রিত কয়েকজন এসে হাজির হলেন; ট্যাক্সির মিটার ওঠানোর সঙ্গে একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ হয়, সেই শব্দ উঠতেই আমি বেরিয়ে গিয়ে বললাম, রোখো।

দেখলাম, সেই ড্রাইভার!

এবার সে হেসে বললে, নমস্তে বাবুজী।

হেসে আমিও বললাম, নমস্তে।

সে বললে, কনস্টিট্যুশন হাউস?

—হাঁ।

বিকেলে বেরিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে। গিয়েছিলাম বাজারে। জিনিস কিনে দোকান থেকে বেরিয়েই দেখলাম খালি ট্যাক্সি এবং সেই ট্যাক্সি। হাত তুললাম, দাঁড়াও।

গাড়িতে উঠতেই সে বললে, এ তো তাজ্জব বাবুজী! একদিনে এই তিনবার। এ তো বড় হয় না।

সে 'কভি' শব্দ ব্যবহার করেছিল। আমি হেসে বলেছিলাম, ধরে নাও নসীবের খেলা!

সে খুশী হয়ে বলেছিল, ইয়ে তো ঠিক হায়। সচ্ বাত।

এটা নেহাত কাকতালীয় বললে সে খুশী হত না। সে চলতে লাগল। খানিকটা দূর এসে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

—কেন? কনস্টিট্যুশন হাউস।

—না। আমি যাব কালীমন্দিরে, বিড়লা মন্দিরের পাশে।

সে বললে, কেন বললে না আগে। কতটা ঘুর হল বল তো!

বললাম, তা হোক। একটু ঘোরা তো হবে, চল।

গাড়ি আটকে রেখে কালীমন্দির থেকে ফেরার সময়, তখন সাড়ে সাতটা বাজছে, আমার ইচ্ছে হল জনপথে ওই তিব্বতীদের ফুটপাথের দোকান ঘুরে যাব। টেবিলের উপর নটরাজের একটি মূর্তি রাখতে অনেকদিন থেকে ইচ্ছে। বললাম, আমাকে একবার জনপথ যেতে হবে, ওখানে চল।

নামলাম। ভাড়া দিতে গেলাম, সাড়ে চার টাকা উঠেছিল, সে বললে, না এক টাকা কম দাও তুমি।

—কেন?

—আমি ভুল করে কনস্টিটুশন হাউস গিয়ে ঘুরিয়েছি তোমাকে।

বললাম, সে আমার ভুল। তোমার নয়।

—নেহি। জরুর আমার ভুল। আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল কোথায় যাবে।

—সেও ঠিক, আবার আমিও বলি নি কোথায় যাব। এটা আমারও কসুর এটাও ঠিক। নাও তুমি।

নিলে সে। কিন্তু বললে, না বাবুজী, এ ঠিক নেহি।

আমি পূর্বদিকের ফুটপাথে নেমেছিলাম, ভাড়া মিটিয়ে পশ্চিমদিকে এসে উঠলাম। দাঁড়ালাম তিব্বতীদের দোকানে। হেজাক বাতি জেলে দোকান পেতেছে। কয়েকজন বিদেশিনী রয়েছে। এটা নাড়ছে ওটা নাড়ছে। আমি দাঁড়িয়ে দর দেখতে শুরু করলাম। বাগবাজারে খড়োঘাটে ইলিস কিনতে গিয়ে ওটা শিখেছি। পাঁচ জন মাছের দর হাঁকলে একটা দর পাওয়া যায় যেটা দিলে ঠকেছি এমন আপসোস হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, দরও করলাম কিন্তু কিনলাম না, হাতে তুলে আলোর কাছে ধরেও মনে হল যেন ঠিক রূপটা বুঝতে পারছি না। রেখে উঠে বললাম, নাঃ। কাল দিনে আসব।

পিছন থেকে শুনলাম কেউ বললে, ঠিক বাবুজী। ওহি ঠিক হ্যায়। রাতের আলোর জলুসে মেকী জিনিস খাঁটি বলে চলে যায়। রাত্রে মানুষকে ঘুমুতে হয়। ওটা হল জানোয়ারের চোখের কাল। ওদের চোখ রাত্রে জ্বলে। কাল দিনে কিনো।

ফিরে দেখলাম, সেই ড্রাইভারটিই পিছনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলছে। বিস্মিত হলাম, তুমি?

সে বললে, হ্যাঁ। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি এখানে দাঁড়ালে। তাই দাঁড়ালাম। তুমি তো ফিরবে, তোমাকে নিয়েই যাব। তুমি লোক ভাল বাবুজী। নাও ওঠো গাড়িতে।

বললাম, আরও কিছু কিনব যে। ছোটো অ্যাশট্রে। ফুটপাথে নেপালীরা কাঠের উপর পিতলের কাজ করা অ্যাশট্রে বিক্রি করে তাই কিনব।

—বেশ তো চল।

ঠিক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে-ই দর করে কিনে দিলে। একটি ছোট নটরাজের

মূর্তিও তার কাছে ছিল। সেটাও কিনলাম। সে বললে, ওর দর তুমি কর, ওর কদর আমি জানি না।

লোকটিকে ভাল লাগল। গাড়িতে উঠে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা না বলে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে এক আপিসে বড় ছোট চাকরি করবার জন্য অন্যায় বা অশোভন ভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। সকলের এমন হয় কি না জানি না তবে আমার হয়। আমার ভাবপ্রবণ বলে অপবাদ আছে। অনেকে ইংরিজীতে নিজেদের দিকে দায় কমিয়ে নিয়ে বলেন 'টাচি'। যাই হোক, কথা খুঁজছিলাম। প্রথম যে কথাটা খুঁজে সবাই পায় সেইটে আমিও পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি সাহেব ?

—আমার নাম উধম সিং।

একমুহূর্তে নামটার ধ্বনি মনের তারে একটা পরিচিত ধ্বনির সুর তুললে। মেঝেতে কাঠ পড়লে কিছু হয় না কিন্তু ধাতুর কিছু পড়ে শব্দ উঠলে জানলার লোহার শিকে একটা সুর বয়ে যায়। কানেও ধরা পড়ে, হাত দিলে তো বেশ বোঝা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে।

—উধম সিং ?

—জী হাঁ।

চুপ করে রইলাম, ওই সুরটা মনে বাজছিল। হঠাৎ মনে পড়ল। প্রথম মনে পড়ল নীল চশমাটা। তারপর সব।

এবার বলে উঠলাম, তাজ্জব কি বাত সাহেব !

—কিঁউ ?

—আজ বিকেলে ওষুধের দোকানের সামনে তোমার গাড়িতে যখন তিসরিবার চড়লাম তখন তুমি বললে, তাজ্জব কি বাত। তা তার চেয়েও তাজ্জবের কথা উধম সিংজী—আমি যেবার প্রথম দিল্লী আসি, দিল্লী টিশন থেকে হোটেল পর্যন্ত তোমার গাড়িতে এসেছিলাম। তোমার গাড়িতে আমি একটা চশমা ফেলেছিলাম। তুমি আধঘণ্টা বাদ ঘুরে এসে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, তুমি নাও নি। তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিলে উধম সিং। ট্যাক্সির নম্বরটাও লিখে নিয়েছিলাম নোট বইয়ে। হ্যাঁ, এই নম্বরই তো! মনে পড়ছে তোমার ? তোমার ট্যাক্সিতে চড়ে দিল্লী ঢুকেছি। আজ এইভাবে তিনবার দেখা হয়ে তোমার গাড়ি চড়লাম, আলাপ হল। যেন কেউ বন্দোবস্ত করে করিয়ে দিলে। তাজ্জব কি বাত নয় ?

—জরুর বাবুজী, জরুর ; জরুর তাজ্জবের কথা।

বললাম, আমরা দোস্ত হয়ে গেলাম সিংজী।

—দোস্ত ?

—হাঁ দোস্ত।

—আপকা মেহেরবানি।

—নেহি, উপ্পরওয়ালে কি মর্জি।

—বাস্ বাস্। ভগবান কা মর্জি।

ভগবানের মর্জিতে উধম সিংএর সঙ্গে আলাপ। উধম সিং আমার দোস্ত। এই লোকটিই এইসব জিনিস আমাকে এনে দিয়েছে। সে আমাকে দিল্লী দেখিয়েছে। কনস্টিট্যুশন হাউসে যতদিন ছিলাম, ততদিন তার গাড়িতে রোজ বিকেলে ঘুরেছি। দিল্লীর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নিয়ম আছে যাত্রী এলে বা টেলিফোনে ডাক এলে যার পালা সে-ই যাবে, অন্য কেউ যেতে পায় না। উধম সিংকে বলা ছিল, সে বিকেলবেলা রাস্তা থেকে মিটার ডাউন করে এসে একেবারে কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকত এবং আমার ঘরে এসে বলত, নমস্তে বাবুজী। আমি তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম।

রাম এসে চা এবং কিছু খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। গল্পে ছেদ পড়ল। রৌশন চুপচাপ শুনে চলেছিল। কখনও চোখ বন্ধ করে, কখনও জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের বড় গাছটার বা তার উত্তর পাশের খোলা ঠাঁইটুকু দিয়ে ওপারের বাড়িগুলির মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ওদিকে বাঁদিকে অল্পদূরে সফদরজঙ, ডাইনে কয়েক মাইল দূরে পালাম এরোড্রোম। এই সময়টুকুর মধ্যেই একখানা জেট. একখানা ভাইকাউন্ট ঘুরপাক খেয়েছে। উঠেছে কি নেমেছে বলতে পারব না। সিগারেট সে তিনটে ধরিয়েছে কিন্তু একটাও পুরো খায় নি। ওর হাতে ধরা অবস্থাতেই প্রদীপের শিখার কালির মত আঁকাবাঁকা রেখাতে নীলচে ধোঁয়ার শিখা তুলে পুড়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে চোখে লেগে জল টেনে বের করলে ফেলে দিয়ে জুতোয় চেপে দিয়েছে, নয়তো একটা টান দিয়েছে। অ্যাশট্রেটা সামনে থাকতেও তাতে ফেলতে তার খেয়াল হয় নি। বোধ হয় মেঝেতে ফেলে পায়ে চেপে সিগারেট নেবানো ওর অভ্যাস। স্থান কাল সম্পর্কে যে সচেতনতা থাকলে সতর্ক হয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলতো সেটা গল্পের মধ্যে মগ্ন হয়ে হারিয়ে ফেলেছিল সে।

রৌশনকে বললাম, চা খাও। নাও, খাবার নাও।

—রৌশন চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে হাত নেড়ে জানালে খাবার সে খাবে না।

—কেন?

—নাঃ। এমনি। ভুখা নেহি হুঁ।

—একটা কিছু নাও। মেয়ে খাবে না, বাপ খাবে কি করে?

হেসে দু'তিনটে বেগুনি তুলে নিয়ে খেয়ে বললে, ভাল হয়েছে। কিন্তু তারপর বল। কি হল তোমার উধম সিংয়ের?

—হবে আর কি? আছে, এখনও ট্যাক্সি চালায়। কিন্তু আমি চলে এলাম ওখান থেকে এখানে। সাউথ অ্যাভেন্যু। এখন ট্যাক্সি এখানকার স্ট্যাণ্ড থেকে আসে। ওর সঙ্গে বড় দেখা হয় না। তবে এদিকে যখন খালি ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরে তখন জানলা খোলা,

বারান্দার পর্দা তোলা দেখলে এসে দেখা করে যায়। চা খায়। গল্প করে।

—আসল কথাই তো বললে না। এইগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা।

—বলি নি বুঝি? ও। ও-ই এগুলি এনে দিয়েছে আমাকে।

—সে কোথা থেকে যোগাড় করলে?

—তুমি ঠিকানা চাও? তোমার ঠিকানা দাও, তাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এসব তার বাড়ির তৈরি। তার স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে আছে বুড়ো মা আছে। তারা বাড়িতে তৈরি করে।

একটু হেসে বললাম, বললাম না, তুমি ফুলমার্ক পেয়েছ। এই কারণেই বললাম। কাশ্মীরে বাড়ি ছিল। জম্মু আর পাকিস্তানের বর্ডার ঘেঁষে। সেখানে পুরুষানুক্রমে এইসব করত। ও নিজে ড্রাইভারি করত একজন মুসলমান মার্চেণ্টের। দেশভাগ, কাশ্মীরের গোলমালের সময় খেতে না পেয়ে চলে এসেছিল দিল্লী, নাইন্টিন ফিফ্টি কি ফিফ্টি ফাইভের সময়, সাল তারিখ তো মনে নেই ওর। এখানে এসে ট্যাক্সি-ড্রাইভারি করছে।

চায়ের কাপটা সে ধরেই ছিল, খায় নি বিশেষ। ওই দু'এক চুমুক দিয়েছিল। এবার সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে, এদের দারুণ অভাব। তবে জান বাপুজী, সে বোধটা এদের নেই।

—সেইটেই একটা আশীর্বাদ!

—তুমি তাই বল?

—তা বলি। অভাবকে ভাল বলি নে কিন্তু অভাবের কষ্টকে সহ্য করে জিন্দিগীর লড়াইকে ভাল বলি।

—উই ডিয়ার। তা এর—

—কি?

—বড় ছেলে টেলে নেই? মানে যে সাহায্য করতে পারে? কি বড় মেয়ে? তা হলে এইগুলো করতে পারে বেশী। থেমে গিয়ে আবার বললে, এদের দুঃখ আমি জানি বাপুজী।

—নাঃ। বড ছেলে মারা গেছে।

চুপ করে চেয়ে রইল জানলা দিয়ে।

আমি বলেই গেলাম, বড় মেয়েও একটি ছিল। সেও মরে গেছে।

ঘাড় নাড়ল সে। সে ঘাড়নাড়ার অর্থ হয় না তবু নাড়লে। আর কিই বা করতে পারত? আমি বললাম, ঠিকানা দেবে? ওকে বলে দেব, এমনি ওয়ালপ্লেট তোমার কাছে দিয়ে আসবে!

—প্লিজ সেভ মি ফাদার। নো। প্লিজ। ওসব দুঃখীর দুঃখমোচন-টোচন আমার কাজ নয়। আমি নিজেও দুঃখী। হয়তো ওদের থেকেও দুঃখী। আমার অভাবের দুঃখবোধ আছে। আজ আসবে, কয়েকটা টাকা দাও। কাল আসবে, কিছু ব্রাশ প্লেট কিনে দাও। পরশু বলবে, লোকে বলছে যা দাম দিচ্ছ তা কম দিচ্ছ। ওসব আমার সইবে না। পাঠিয়ো না তুমি।

বলে অনেকটা যেন হঠাৎ উঠে পড়ল।—চললাম বাপুজী। অনেক সময় চলে গেছে। তবে দিল খুশ হয়ে গেছে। একটা এনগেজমেন্ট গেছে, আপসোস নেই। সন্ধ্যের এনগেজমেন্ট ফেল করলে চলবে না।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হেসে বললে, দুপুরটায় আজ ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখলাম। ভারী মিষ্টি, ভেরী সুইট!

আবার একটু হেসে বললে, নমস্তে।

গগল্‌সটা চোখে লাগিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রৌশন স্টাইল ভুলবে না। বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আমেজ লেগেছে দিনের আলোয়, এখনকার এই গোধূলিবেলার আলোয় চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু রৌশন গগল্‌স না-পরে পথে বের হবে না।

ঘণ্টা দুয়েক পর; রাত্রি তখন আটটা। টেলিফোন বেজে উঠল।

প্রশ্ন করলে কেউ,—নম্বর এটা?

—হ্যাঁ।

—আমি কি শঙ্করজীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—কথা বলছি।

—গুড ইভনিং স্যার। আমি একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর কথা বলছি।

মনটা অবশ্যই ছাঁৎ করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল এই মন্দ মেয়েটিকে। এর পরই বোধ হয় টেলিফোনে তার গলা শুনতে পাব, ফাদার, আই অ্যাম রৌশন, ইওর ব্যাড ডটার। প্লিজ হেল্প মি ফাদার!

নীরস কণ্ঠেই বললাম, বলুন কি প্রয়োজন আমাকে?

—আপনি কি কোন মেয়ে আর্ট-ডীলারের কাছে কিছু জিনিস কিনেছেন?

সন্দেহ হল, চোরাই মাল! যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করেই বললাম, কিনেছি। একখানা কাশ্মিরী মেটাল ওয়ালপ্লেট।

—বোটম্যান অ্যাণ্ড হিজ ওয়াইফ?

—ইয়েস।

—জিজ্ঞাসা করতে পারি কত দাম দিয়েছেন?

—চল্লিশ টাকা অ্যাণ্ড সাম নয়া পয়সা।

—থ্যাঙ্ক ইউ সার! বলেই আবার বললে, আর একটা কথা।

—বলুন।

—ক'খানা কত টাকার নোট মনে আছে?

—হ্যাঁ। অল ইন ফাইভ-রূপী নোট্‌স!

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। এই রাত্রে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা করবেন।

—আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

—নিশ্চয়।

—ঘটনাটা কি ? অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে ?

—নাথিং সিরিয়াস স্যার। আপনি বোধ হয় জানেন না এই মেয়েটির খুব সুনাম নেই। কয়েকবার আমাদের কাছ পর্যন্ত এসেছে। তবে আজ তার দোষ নেই। সে-ই একজনকে চড় মেরেছিল, তারপর সে তাকে মেরেছে; একটু বেশীই মেরেছে। তারপর চার্জ করেছে তার কাছে টাকা নিয়েছে বলে।

কথা ওইখানেই শেষ হল।

আমি রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একটু হাসলাম এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললাম। রৌশন কথা বলে নি ফোনে কিন্তু কানের পাশে যেন শুনলাম সে বলছে, বাপুজী, আমি তোমার খারাপ বেটী, বদমাশ বেটী!

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। ওই কথাই মনে ঘুরল শুধু। বার বার মনে হতে লাগল এই বুঝি টেলিফোন বাজল। রৌশন ডাকবে।

—বাপুজী, আমাকে তুমি মাপ কর। আমি তোমার খারাপ বেটী।

আবার ভাবনা হল, ওকে থানায় নিয়ে যায়নি তো? ইন্‌স্পেক্টর বললে, কয়েকবারই ওকে আমাদের কাছ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

আজ? আজও হয়তো হাজতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

সাত

পরের দিন সকালে সে এল। প্রত্যাশা করি নি। আদৌও করি নি। বুদ্ধির বিচারে এরপর রৌশনের গতিবিধির যে ছক তাতে তার আড়ালে চলার ছক। পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। বুদ্ধি আমার সাধারণ বুদ্ধি। আমাকে যারা চেনে তারা যে বলে বুদ্ধি মোটা, সে তারা ভুল বলে না। রৌশনকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল, বুদ্ধির অঙ্কে গোলমাল হয়েছে সেখানে।

রৌশন আমার অনুমানের চেয়ে অনেক খারাপ মেয়ে এবং সে পাকা অভিনেত্রী। আমার ভুলটা সে বুঝতে পেরে সেই মত অভিনয় করে গেছে। কাল অভিনয়ের মেকআপ যখন খসেই গেছে তখন সে সে-সব ভাল করে মুছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মাথায় সযত্নবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। মুখে কালো ছায়া পড়েছে, শুধু তাই নয়, কপালে কালসিটে। গালে চড়ের দাগের চিহ্ন যেন এখনও মিলিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পায় নি। শিউরে উঠলাম। বিতৃষ্ণা বিরক্তির মধ্যেও বেদনা অনুভব করলাম।

সকল কথা যখন আজকে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করছি তখন এটুকু বুঝতে পারছি যে তার প্রতি গভীর অন্তরে একটি মমতা ছিল। যে মমতা সম্ভবতঃ মূর্খতার

নামান্তর। অথবা তার সঙ্গে যেটুকু থাকা উচিত তার অভাব ছিল। মমতাকে বা হৃদয়াবেগকে যে শিক্ষা ও বুদ্ধির শৈত্যে জমিয়ে কঠিন করা যায় তা ছিল না। নইলে ওই সকালের আগে সন্ধ্যায় টেলিফোনে পুলিসের কাছে তার কথা শোনার পর তার জন্ম ভাবব কেন?

সেদিন সকালে তাকে দেখে তার জন্তে বেদনা অনুভব করেও বোধ করি প্রথমেই কঠিন হবার চেষ্টা করলাম।

বললাম, কোথা থেকে? ফ্রম পুলিস লক-আপ?

সে তাকালে আমার দিকে। চাউনিতে সে কি ক্লান্তি! লাল হয়ে আছে চোখ দুটি। পাঞ্জাবের মেয়েদের চোখ বড় নয়। রৌশনের চোখ টানা চোখ। দু'পাশের সাদা ক্ষেতে লালচে আভা জেগে রয়েছে। একবার সন্দেহ হল, সে কি এই সকালেই—? ইচ্ছে করেই এগিয়ে গিয়ে সামনে কাছে দাঁড়ালাম যেন অসন্তুষ্ট হয়ে কৈফিয়ৎ নিতে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু না। কোন গন্ধ পেলাম না।

সে মাথা নাড়লে, যার অর্থ—না।

—এখানে কেন এসেছ? ধন্যবাদ দিতে?

এবার তার কণ্ঠস্বর নির্গত হল, বললে, না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে সে কোন উত্তর দেবার আগেই বলে দিলাম, যদি তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে রৌশন তা হলে বলে রাখি, আমি দুঃখিত।

সে একটু হেসে বললে, না, তার জন্যেও আসি নি। কিন্তু তুমি কি আমাকে বসতেও বলবে না? না, চলে যেতে বলছ?

এমন শান্ত করুণ কণ্ঠ কখনও রৌশনের শুনি নি। তার কণ্ঠস্বর এবং তার ওই শেষের প্রশ্ন আমাকে একটু অপ্রতিভ করলে। বললাম, বস।

বসল সে। তারপর বললে, তুমি আমার উপর খুব গোস্সা হয়েছ। হবার কথাই বটে। কিন্তু আমি কি তোমাকে বার বার বলি নি, আমি ব্যাড গার্ল। আমাকে মেয়ে বলেছ, আমার ধরমবাপ তুমি। আমি তোমার মন্দ মেয়ে।

— এর যা জবাব তা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু মন্দেরও একটা সীমা আছে রৌশন। তুমি এত উচ্ছৃঙ্খল এত মন্দ তা আমি জানতাম না।

সে মুখ তুলে আমার দিকে অসংকোচ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, তুমি বিশ্বাস কর বাপুজী, কাল আমি কোন মন্দ কাজ করি নি। কোন দোষ আমার ছিল না।

আমার অজ্ঞাতসারে আমার কপাল কুঁচকে উঠল। যখন উঠে গেছে তখন বুঝতে পারলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, এই বিশ্বাস করতে বল আমাকে? কিন্তু বুঝতে পেরে সংযত করলাম নিজেকে।

সে বলেই চলেছিল, আমার সত্যকারের বাপ মায়ের দোহাই নিয়ে বলছি, তুমি আমার ধরমবাপ, তোমার দোহাই দিয়ে বলছি, ঝুটবাত আমি বলছি না। যেদিন হোটেলে আমাকে

তুমি দেখেছিলে সেদিন আমি ড্রিংক করেছিলাম সেই বিদেশীর সঙ্গে। তাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছিলাম, সেদিন আমার দোষ ছিল। কিন্তু সেদিন তুমি নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলে, আমার ধরমবেটী এ মেয়ে। সেই কারণেই কাল যখন পুলিস এসে নির্দোষ আমাকে ধরলে, আমার ব্যাগের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তখন সত্যি কথা বলেছিলাম। তোমার নাম করেছিলাম। না-হলে তাও করতাম না। তাতে আমার যা হত হত।

—কি হয়েছিল কাল?

—হয়েছিল? তার আগে বল তোমার মন শান্ত হয়েছে! না-হলে আমার চলে যাওয়াই উচিত হবে। কালকের নির্যাতনের চিহ্ন আমার মুখে চুলে ফুটে রয়েছে। আসবার সময় দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় হঠাৎ নিজের চেহারা আমার চোখে পড়েছিল। কাল আমার কোন দোষ ছিল না, আমি ড্রিংক করি নি। পুলিস সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ বলেই ছেড়ে দিয়েছে আমাকে, না হলে কখনও ছাড়ত না। তাদের খাতায় আমার বদনামের কালো দাগ মারা আছে। তারপর নিজের আস্তানায় গিয়ে সারাটা রাত জেগে শুধু কেঁদেছি। ঘুম আসে নি। চোখে মুখে তাও ফুটে আছে। সকালেও মন শান্ত করতে পারি নি। তাই এসেছি। মনে হয়েছিল—

বাধা দিলাম। বললাম, দাঁড়াও। সে থামলে বললাম, চা খেয়েছ?

—না।

—কাল রাত্রেও কিছু খাও নি বোধ হয়?

—খেতে বসেই তো বিপদটা ঘটেছিল। হোটেলে খাই তো। বাড়িতে তো ওসব ঝামেলা রাখলে চলে না। সবে একখানা রোটি ছিঁড়ে মুখে তুলেছি—। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে। এ বিষণ্ণ হাসি সেই হাসি যা কেবল নির্দোষে দণ্ডিত বা নিরপরাধ নির্যাতিতের মুখেই ফোটে। অতি নিষ্ঠুর ছাড়া সব মানুষকে সে-হাসির সম্মুখে বিষণ্ণ হতে হয়।

শুধু ওই বিষণ্ণতাই নয়, তার সঙ্গে মমতা—যা আমার দুর্বলতা এবং এমন ক্ষেত্রে জ্বরের অনুসঙ্গী উপসর্গের মত লজ্জাও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রামকে বললাম, রাম কিছু খাবার দে। কি আছে? আর দুধ থেকে যদি ছানা না-করে থাকিস তবে দুধটা দে কাচের গ্লাসে করে। আগে ওটাই দে।

রাম দুধটা গরমই করছিল ছানা কাটাবার জন্য। সে দুধের প্যানটা নামাতেই বললাম, দে, আমাকে দে।

নিজেই হাতে করে নিয়ে এলাম। টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললাম, আগে এটা খাও। তারপর কথা শুনব।

দুধের গ্লাস দেখে সে আবার হাসলে। বললে—দুধ! সত্যিই তোমার কাছে আমাকে ছোট্ট মেয়ে বানিয়ে দিলে।

সস্নেহে বললাম, পি লেও বেটী!

দুধের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, বেশী গরম আছে।

—জুড়ুক।

জানলার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, জা'ন বাপুজী, বাপ-মা সবারই থাকে, আমারও ছিল। তা—। থেমে গেল রৌশন।

—তুমি তো বলেছ তোমার বাপের কথা। মায়ের কথা অবশ্য বল নি।

মাথা নাড়লে সে। অর্থাৎ—না।

বললাম, তোমার মনে নেই, বলেছ তুমি। আমীর আদমী ভালো বাপের আদরের মেয়ে, ছেলেবেলায় মাতৃহারা—

—নেহি বাপুজী। ঘাড় নাড়লে সে শান্ত দৃঢ় ভাবে। আমি সে ঝুটা বাত বলেছি তোমাকে। বাপ আমার আমীর ছিল না। ছিল এই উধম সিংএর মত গরীব জাট। ওই একই গাঁওয়ে আমাদের বাড়ি ছিল। পাশাপাশি, হাঁ একদম পাশাপাশি বাড়ি ছিল। ওর মেয়ে ছিল। সেও আমার সাথী ছিল। তুমি বললে সে মরে গেছে। কাল সব শুনে ছেলেবেলার সব কথা মনে পড়ে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বাপুজী। খুব খারাপ। উধম সিং এখানে থাকে, ট্যাক্সি চালায় আমি জান। ওরাও যেমন দেশ ছেড়ে এসেছিল আমরাও এসেছিলাম তেমনি। ওর মেয়ের নাম ছিল হরিপীতম, ভালো মেয়ে ছিল। ভালো মেয়ে সে, বাঁচলো না। আমি জানতাম, বাঁচবে না। সংসারে শাস্ত্রে একটা ধর্মযুদ্ধ বলে কথা আছে। বাপুজী বল তো, ধর্মযুদ্ধ করে কেউ জেতে? জেতে না! সে মরে গেল। হরিপীতম! হরিপীতম!

দুধের গ্লাসটিতে এবার চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে খেয়ে শেষ করলে। তারপর জল খেলে। আবার বললে, হরিপীতম। আবার শুরু হল। আমার ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। থাক।

একটু পর আবার বললে, আমারও একটা নাম ছিল। থাক, সে বলব না। বাপ মা'র নামও বলব না। তারা বোধ হয় বেঁচে নেই। নাম বললে, তুমি কোনদিন উধম সিংকে বললে সে আমাকে চিনতে পারবে। হয়তো খুঁজবে। উধম সিংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মানে দেখেছে সে আমাকে পথেঘাটে। নিশ্চয় দেখেছে। চোখাচোখিও হয়েছে। অবশ্য আমার গগল্‌সের ভিতর দিয়ে। চিনতে সে আমাকে পারে না।

হাসলে। হেসে বলতে লাগল, কি করে চিনতে পারবে? এক গরীব জাঠের বেটী, দেহাতী, সেই দশ বছর বয়সে লম্বা বেণী ঝুলিয়ে, ছেঁড়া সালোয়ার পাঞ্জাবি, ময়লা দোপাট্টার নামে ন্যাকড়ার ফালি পরে যাকে দেখেছে তার এই মেমসাহেবী ঢঙে ছাঁটা চুল—দোকানে ড্রেস করা—এই শাড়ী এই ব্লাউজ, চোখে গগল্‌স, ইংরিজী কথা, জোয়ানী চেহারায় বদলি, চিনবে কি করে বল? দেখ, দামী সালোয়ার পাঞ্জাবি, হীরা জহরৎ, বেণী হলেও সন্দেহ হত, ভাবত কেউ আমীর-টামীরের নজরে পড়ে এই বদলটা হয়েছে। দেশ ছাড়ার সময় আমার উমর ছিল দশ-এগারো। তার সাত-আট বছর পর সরকারী আর্টস ক্র্যাফ্‌টস থেকে কাজ শিখে এই পথে পা দি যখন তখন এই ভাবের বদল আর জোয়ানীর বদল দেখে চিনতেই পারে

নি। আমিও চেনা দিই নি। খারাপ আমি অনেকদিন আগেই হয়েছি। অনেক আগে। ওই দশ-এগারো বছর বয়সে। অথচ বাপ-মা এমন ধার্মিক ছিলেন বাপুজী! সেই কথা মনে হয়ে গেল কাল; তোমার দেওয়ালে ওয়ালপ্লেট দেখে থেকে—।

চুপ করে গেল সে। গলা ধরে এসেছিল। একটু সামলে নিয়ে বললে, ওখানাতে আছে গৌরী মাঈ আর মহাদেওজী। আজকাল তো এসব বিলকুল মিথ্যে হয়ে গেছে। ওসবের দাম আর নেই। সত্যিসত্যি মানেও নেই। কি মানে আছে? গাঁজা মদ খায় ঘরদোর নেই এমন যে লোক, তার নিন্দে শুনে কোন মেয়ের মরে যাওয়ার কি মানে আছে? ও ঘরের ওয়ালপ্লেটে রয়েছে রামসীতা। বল তো, সীতার আগুনে পুড়তে যাওয়া কে মানবে, কেন মানবে আজ? রাম বনে গেল বাবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে? তার কি মানে? কেন যাবে? একালের ছেলে বিদ্রোহ করবে। সীতার আগুনে পুড়ে রক্ষা পেয়েই শেষ নয়, শেষে বনে নির্বাসন! এ সতীত্বের কোন অর্থই নেই আজ। আমার কাছে তো নেইই। সেটা আমি ব্যাড গার্ল বলেই নয়—আমি সত্যিই ওগুলিকে মূর্খতা বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তবু আমি কেমন হয়ে গেলাম। ফিরে গেলাম সেকালে। তারপর তুমি উধম সিংয়ের নাম করলে, আমি চিনলাম। আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঘুরিয়ে ওর মেয়ে হরিপ্রীতমের কথা। বললে সে মরে গেছে। মনটা কেমন হয়ে গেল। মনে আছে বলেছিলাম, পাথরের মত শক্ত দিল, ফাটলে তার ভিতর থেকে জল বের হওয়া সহজে থামে না। বড় বড় দরিয়া ধরে গেলে শুনেছি পাওয়া যায় ওই একটি বা দুটি পাথরের ফাটল। গোমুখী থেকে গঙ্গাজী বেরিয়েছে। সেখানে শুনেছি দুটি গর্ত আছে। আমার দিলে কাল ফাটল ধরেছিল। জল ঝরছিল। চোখ দিয়ে বের হতে চাচ্ছিল। তোমার এখানে কাঁদতে পারি নি। চলে গিয়ে কনট সার্কাসের একটা পার্কে গাছতলায় বসে কেঁদেছিলাম। তারপরই গেলাম খেতে একটা হোটেলে। অন্যদিন বন্ধু পাকড়াবার চেষ্টা করি, খানিকটা হাসিতে কথায় তাকে খুশী করি, চাউনি দিয়ে ভোলাই; তার পয়সায় খাই। তারপর হয়তো খানিকটা গাড়িতে বেড়িয়ে কি একটু হেঁটে হঠাৎ স্লিপ করি। বা যেখানে অনেক লোকজন সেখানে গুডনাইট বলে হাত বাড়িয়ে পুট দি ফুলস্টপ। কাল একলা ছোট কেবিনে একটা টেবিলে একটা কোণে খেতে বসেছিলাম। মধ্যে মধ্যে অবাধ্য জল চোখ থেকে বেরিয়ে আসছিল; আমি সেটা লুকোবার জন্যে টেবিলে কনুই রেখে দুই হাতে মাথা রেখে মুখ নীচের দিকে করে বসেছিলাম। টপ টপ করে জল পড়ছিল টেবিল ক্লথের উপর কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। মনে মনে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল। কেন? কেন চোখের জল পড়বে? পিছন মুছে দিয়ে এসেছি। নিজের হাতে। এসব বিশ্বাস করি নে। তবে? কেন?

হঠাৎ থেমে গেল রৌশন। চুপ করে চেয়ে রইল মেঝের দিকে। কপালে ভ্রূর উপর একটি কুঞ্চনরেখা ফুটেছে। ভাবছে কিছু।

রাম এসে ডাকলে, চা খাবার দিইছি।

রৌশনকে বললাম, চল খাবে চল। ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। এস রৌশন।

রৌশন খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। একটু চমকে উঠে বললে, এঁ্যা ?

—ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। এস।

—ব্রেকফাস্ট ? দুধ তো খেলাম। আচ্ছা চল।

রাম পর্যাপ্ত খাবার দিয়েছিল। রুটি মাখন ডিম বিস্কুট ফল মিষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে সাজিয়ে দিয়েছিল। রাম এসব বিষয়ে সত্যই হুঁশিয়ার এবং পারঙ্গম দুইই। তার উপর অভিজাত সমাজের সাহেবী সমারোহের উপর প্রবল আসক্তি আছে। ছিল খুব বড় বাড়িতে। সুতরাং রৌশনের মত মেমসাহেবী কেতার মেয়েকে দেখে সে তার সকল পারঙ্গমতা দেখিয়ে দিয়েছে।

রামই বললে, কফি করব ?

বিস্মিত হলাম, কফি ? ছিল না তো!

—আনিয়েছি। কাল টেলিফোনে স্টোরে বলেছিলাম, রাতে দিয়ে গেছে।

—তবে নিশ্চয় করবি। কাল রৌশন কফি চেয়ে পায় নি।

রৌশন হাসলে। খাবার উদ্যোগে হাত বাড়িয়ে ছুরি কাঁটা তুলে নিতে নিতে বললে, বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম আমি। আমি তোমাকে বলেছি, ছেলেবেলা থেকেই খারাপ আমি। কিন্তু একটা কথা বলি নি। আমি খারাপ। দিল্লীতে এসে আমি বাপুজী এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারছিলাম না। এই ছেঁড়া লুগা পরা, ফুটপাথে শোওয়া, ভিক্ষে করে খাওয়া এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। থাকতাম কাশ্মিরী গেট যেখানে ওই এলাকায়। কিছুদিন যেতেই রাস্তাঘাট চেনা হল। জি বি রোডও চিনলাম। নীচের তলায় বড় বড় গোলদারী দোকান গদি গুদাম। উপরতলায় থাকে বাঈজী লোক। তাদের সাজ-পোশাক, বাইরের আলো, জলুস দেখে ভারী লোভ হল। দিনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উপরতলার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। অছিলা—ভিখমাঙা। রাত্রেও চলে যেতাম সুবিধে পেলেই। তখন গভর্নমেণ্ট আইন করে এসব তুলে দেয় নি। তখন সন্ধ্যেবেলা জি বি রোড—আলোয়, সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতে, বাঈজীর গানে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের রূপে রঙে পোশাকের বাহারে মনে হত—হমেনস্ত হমেনস্ত। আমার তো মনে হত। একদিন একজন লোককে বললাম, দিনের পর দিন দেখে ওকে চিনেছিলাম। ও ওই ওপরতলায় যায় আসে। ওদের সঙ্গে লোকটির আলাপ আছে তাও বুঝেছিলাম।

আবার থামল রৌশন, থেমে সংকোচ কাটিয়ে হেসে বললে, আই অ্যাম এ ব্যাড গার্ল। আর বাপুজী, এসব ব্যাপার আমি বুঝতাম, তখনই বুঝতাম। পাড়াগাঁয়েও এসব গল্প আছে। ছেলেবেলা থেকেই শোনা যায়। বাঈজী হলে—। বাপুজী, ওর মানে আমি জানতাম। পুরো বুঝতাম। কিন্তু আমার ভয় হয় নি। ওই লোকটিকে বললাম, আমাকে তুমি বাঈজী করে দিতে পার ? সে লোকটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বললাম, আমি গাইতে পারি। গাঁয়ের নাচও জানি। সে আমার থুতনি ধরে মুখটা তুলে আলোয় ভাল করে দেখে বললে, আয় আমার সঙ্গে। গেলাম চলে। মা বাপ ভাই সব পড়ে রইল ফুটপাথে, খোলায়। থাকল—থাকল। আমি সে ভাবি নি।

আবার থামল সে।

ভেবে নিয়ে বললে, সব কথা বলে লাভ নেই বাপুজী। আমি আমার স্বভাবটাকে বোঝাবার জন্তে বললাম। ওই আমার স্বভাব। সেই-আমার যে কাল কি হয়ে গেল বলতে পারব না। ছেলেবেলা হরিপীতমের মা গল্প বলত, ভারী সৎ ভারী ভাল হরিপীতমের মা, গল্প বলত রামসীতার, হরপার্বতীর, আর আমাদের বলত, এমনি যারা হয় তারা দেওতা হয়ে যায়, স্বরগলোকে উ লোকের মসনদ মেলে—ভারী ভারী মহল মেলে, দাসী বাঁদী মেলে—ওরা যেখানে পা দেয় সেখানে পদ্ম ফুটে যায়। বিশ্বাস করি না, তবু সেই সব মনে পড়ে দিল উদাস হয়ে গিয়েছিল। অকারণ। অর্থহীন। বাপুজী, তোমার কাছে ঝুটা বাত বলব না। সত্যিই আমার কাছে অর্থহীন ওই সব গল্প এবং অর্থহীন এই সব কাহিনীর কথা মনে পড়ে দিল উদাস হয়। আমি হরদম ঝুটা বাত বলি, সে তুমি শুনেছ, জানও বোধ হয়। কাল যে ওয়ালপ্লেট তোমাকে কাশ্মীরের বলে দিয়ে গেছি, ওটা কাশ্মীরের খুব সস্তা জিনিস। আমি নিজে ওর ওপর কিছু কাজ করে ঢঙটা অবশ্য পালটে দিয়েছি। দামের কাগজটাও আমার লাগানো।

এবার আমি বাধা দিলাম, তুমি জান এ কাজ?

—জানি না? আমি তো ওই উধম সিংদের ঘরের বেটী। পাঁচ বরিষ থেকে ছোট হাতোড়ি নিয়ে ছাঁচের উপর তামা পিতলের পাত রেখে ঠুকঠুক করে ঠোকা শিখেছি। তা ছাড়া আমার হাত ছেলেবেলা থেকেই ভাল। জন্ম থেকে আমার বুদ্ধি যেমন মন্দ, তেমনি আর্টিস্টও আমি বোধ হয় জন্মাবধি। তারপর জি বি রোডে গিয়ে দু'বছর ছিলাম। এক ব্যবসাদারনী আমাদের পালছিল। আমার সঙ্গে আরও তিনজন লেড়কী ছিল; হঠাৎ পুলিস হানা দিয়ে আমাদের উদ্ধার করলে। তাদের দুজন ফিরে গেল তাদের বাড়ি। আমি বললাম, আমার বাপ-মা মরে গেছে। সেই ফুটপাথে যেতে আমার দিল চায় নি। তখন এই আমীর বাপের গল্প বানিয়ে বলেছিলাম। তখন তো বাচ্চা লেড়কী। বারো-তেরো বছর বয়স। সুরত তখন খুলছে সবে। পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করেছিল এবং পাঠিয়ে দিয়েছিল অনাথ আশ্রমে। সেখানে এই আমার হাতের কাজ, ছবি আঁকার এলেম, এই কামের এলেম দেখে আর্ট ক্র্যাফ্‌ট্‌স শিখতে পাঠিয়েছিল। চার বছর সেখানে থেকে ক্র্যাফ্‌ট্‌সের সঙ্গে কিছু ইংরিজী আর জীবনের স্টাইল শিখে বেরিয়ে এসেছিলাম। থাক, বাপুজী, পিছনের সে সব কথা—খারাব লেড়কীর সবই খারাব কথা। কালকের কথা তোমাকে বলতে এসেছি। সেইটে বিশ্বাস করাবার জন্ত এত কথা বললাম, বলে ফেললাম; কালকের সেই উদাস হয়ে যাওয়া দিলের আমেজ বল আমেজ, আমেজের জের বল জের এখনও রয়েছে। এতটা বলবার দরকার ছিল না। এতটা কেন, কিছুটাই বলারও জরুরৎ ছিল না। সোজা বললেই হত, তুমি বিশ্বাস করতে করতে, না-করতে নাই করতে। হয়তো পেট ভরে খেলে কাল আর সমস্ত রাত্রি কাঁদতামই না, ঘুমিয়ে পড়তাম ভরাপেটের খুশিতে।

খাওয়া শেষ ক'রে সে ন্যাপকিনে মুখ পুঁছছিল, রামু কফি ঢালছিল। সে তাকে বাধা দিয়ে বললে, তুম ছোড়ো জী, আমি বানিয়ে নিচ্ছি। বাপুজী, রৌশন খারাপ মেয়ে, তার লজ্জা

হায়াও নেই। তবে সে কফি খুব ভাল বানাতে পারে। তুমি ভুলতে পারবে না। ক্ষুধা তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রোশন পালটেছে। তার উদাস দৃষ্টি নেই, সে ক্লান্তি বিষণ্ণতাটুকু নেই, সে সেই ছলনাময়ী হয়ে উঠেছে।

রোশন কফি তৈরি করতে করতে বললে, আমি কোণের টেবিলে বসে কাঁদছিলাম। মন খারাপ। ভাবছিলাম, বাপ মায়ের খবর করি—। এঃ, আই অ্যাম সরি—

কফি খানিকটা পড়ে গেল টেবিলে।

বললাম, থাক ব্যস্ত হয়ো না।

—মনটা এখনও ঠিক হয় নি বাপুজী। হ্যাঁ, উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি—তারা কোথায়?

—তা হলে তুমি মিথ্যে বলেছ, মা বাপ মরে গেছে?

—না জেনে বলেছি। তবে অনুমান—তারা মরে গেছে। জি বি রোড—তার লাগোয়া বাঈ পাড়ায় বাপ কিছুদিন রোজ খোঁজ করে ফিরত। শুনেও ছিলাম, দু'চার রোজ বাড়ির ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখতামও। তারপর আর না। একদম না। বেঁচে থাকলে বাপ আমায় খুঁজতে ছাড়ত না। ওইখানেই খুঁজত। আমার মতিগতি তারা ভাল করে জানত। অবশ্য নাও হতে পারে। ঘেন্নায় ও অঞ্চল থেকে চলে গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো উধম সিংয়ের মত ট্যাক্সিও চালাতে পারে, তবে কোনদিন নজরে পড়ে নি। আমি গগল্‌স পরে, মডার্ন মেয়ে, দিল্লী চষে বেড়াই, টুরিস্টদের নিয়ে ফিরি, চোখে পড়ত।

একটু থেমে বললে, কাল ওই মেজাজের মধ্যে মনে হল তার। অন্য কোন কাজও তো করতে পারে। অন্য কোথাও গিয়েও তো থাকতে পারে। পাঞ্জাব রেফ্যুজী তো তামাম হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাবছিলাম আর কাঁদছিলাম। চোখের আঁসু প্ল্যাস্টিকের টেবিল ক্লথের উপর জমছিল, শুষে যাচ্ছিল না। হঠাৎ এক ছোকরা, বদমাশ ছোকরা, চিনি আমি, এবং ওকে এড়িয়ে চলি, হোটেলে ঢুকে আমার খোঁজ পেয়ে কেবিনের পর্দা ঠেলে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল; মদের গন্ধ পেয়েও আমি মুখ তুলি নি। সে মাথায় টোকা দিয়ে ডাকলে, আজ তো পিয়ারীকে মিলে গিয়েছে। আজ তো পাকড় লিয়া।

এবার আমি চমকে উঠলাম। গলা শুনে চিনে চমকালাম। তেমনি ভাবেই মুখ নীচু করেই রইলাম। বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে দিক করো না। আমার তবিয়ৎ ঠিক নেই, মেজাজ ঠিক নেই। যাও তুমি।

এই সময় বয় আমার অর্ডারের খাবার দিয়ে গেল। সে ছোকরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসে বললে, আমার খানাও এই টেবিলে লাগাও।

আমি বললাম, না।

সে গুণ্ডা প্রকৃতির ছোকরা, সকলে ভয় করে, পয়সাও কামায়। সে জবরদস্তি বললে, আলবৎ, এই টেবিলে বসব আমি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।—না।

সে খপ করে হাত টেনে ধরে বললে, বস পিয়ারী। আজ তোমাকে ছাড়ছি না। লোকে বলে তুমি চতুরালিতে ব্রিজবালার চেয়েও সরেস। হেসে, গায়ে ঢলে পড়ে, রঙিলা কথা বলে খেয়ে দেয়ে, কভি কভি দু'চারটে চিজ্‌ ভি প্রেজেণ্ট নিয়ে বিলকুল পিছলে চলে যাও। আমাকে তো দেখে বিশ মিল্‌ দূর ভাগো। আজ্‌ পাকড় লিয়া। বইঠ যাও। খাও। উসকে বাদ চলো ট্যাক্সিমে। আমার কাছে বোতল আছে। চলো কুতবকে তরফ, নেহি তো চলো যাঁহা দিল চায়—

আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। ভিজে মেজাজ যেন আগুনলাগা বারুদখানা হয়ে গেল। আমি কি করছি বোধ হয় তাও আমার খেয়াল ছিল না। আমি জবরদস্তি হাতখানা ছিনিয়ে নিলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, ছোড়ো!

সে হেসে বলল, আরে, জোর দেখায় যে! বলে আমাকে টানলে তার দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলাম। জোর চড় দিয়েছিলাম। ব্যাস, চড় খেয়ে আধ মিনিট আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চালাতে লাগল চড় ঘুষি। পড়ে গেলাম তো লাথি মারল পিঠে। ছোট্ট কেবিনের মধ্যে হচ্ছিল এসব। আমি চিৎকার করছিলাম। হোটেলের লোক এসে টেনে ছাড়ালে। দুজনকেই নিয়ে গেল ম্যানেজারের কাছে। সে বললে, ও-ই আমাকে ডেকেছিল। এবং আমাকে পাশে বসিয়ে হাসিখুশিতে ভুলিয়ে পিকপকেট করেছে। দশ রূপেয়ার নোটে একশো রূপেয়া ছিল। সারজেণ্ট এল। তার বদনাম, আমারও বদনাম আছে। আমার ব্যাগে তোমার দেওয়া টাকাটা ছিল। পাঁচ টাকার নোটে চল্লিশ টাকা। আমার নিজের ছিল পনের টাকা আর কিছু খুচরা। তাও এক রূপেয়া দো রূপেয়ার নোট। আমি খারাপ মেয়ে, কিন্তু কাল আমার কোন দোষ ছিল না। মন্দ হয়েছি বলেই কাঁদছিলাম। আর তুমি ওয়ালপেপ্রেট কিনেছ। ও ব্যবসা আমি করি। তা ছাড়া বাপুজী, তুমি আমাকে সত্যি বাপের মতই স্নেহ কর। যদি বিপদ হয় তবে তুমি আমাকে রক্ষা করবে বলে তোমার নাম সাক্ষি করেছিলাম। পুলিস ছেড়ে দিলে আমাকে। আমি বললাম, আমি এ নিয়ে কেসও করতে চাই না। খুব মিনতি করলাম। হাত জোড় করলাম। ওকে ছেড়ে দাও। নইলে ও আমার হয়তো জানই নিয়ে নেবে। জানি না কি করেছে। বাড়ি গেলাম। পুলিসই মেহেরবানী করে পৌঁছে দিলে। ঘরে ঢুকে বুকের ভেতরটা আরও কেমন হয়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে সারারাত কাঁদলাম। কাল এও মনে হল, কেন এ পথ ধরলাম। দুঃখের মধ্যে মা-বাবার তো সুখ দেখেছি। হরিপীতম বিয়ের গল্প শুনত, মুখ উজ্জ্বল হত। হরিপীতমের বিয়েও দিয়েছিল উধম সিং, গাঁয়েরই এক জাঠের ছেলের সঙ্গে, তার নামও পীতম সিং। চৌদ্দ বছরের বর, ন' বছরের বউ। তাদের সে মিষ্টি হাসি, চোখে চোখে ইশারা দেখেছি, ঠাট্টা করেছি। আমার ওই জীবন হলে কি হত?

থামল সে—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেসে বললে, এ একটা একরাত্রের বোখারের মত হয়ে গেল। একদম পাঁচ ছও ডিগ্রি বোখার আর তার ঘোরে আবোল তাবোল; স্বপ্ন দেখলাম, চেঁচালাম। সকালবেলা সেই ঘোরে তোমার কাছে এলাম।

হেসে উঠল, বললে, বোখার ছেড়ে গেছে বাপুজী। তুমি আমাকে মাফ করো। সত্যি মাফ করো। আমি আর কখনও তোমার কাছে আসব না। তোমার মত লোকের ধরম বেটী আমার মত মন্দ মেয়ে? না—না—না। এ হয় না।

আমিও কিছু বলতে পারলাম না। আমি তো বলেছি, আমার বদনাম আছে, আমি বুদ্ধিতে স্থূল, হৃদয়াবেগে চালিত হই। আবেগ আমার মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। হতভাগ্য মেয়ে পাঁকে ডুবছে, অভ্যাসবশে পাঁককে চন্দন ভাবছে আনন্দ পাচ্ছে; মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ হলে হাত বাড়াচ্ছে; কেউ নেই সংসারে মমতা করবার মত। তাকে হাত বাড়িয়ে একটু সাহায্য না-করে কি পারা যায়? তবু ভয় হচ্ছে। পালটা গল্প মনে পড়ছে;—কর্কট নাগ কার অভিশাপে দীর্ঘকাল আগুনের বেড়ার মধ্যে বন্দী ছিল। ত্রাণ কর বলে চীৎকার করছিল। কেউ উচিত মনে করে নি। তারা বুদ্ধিমান। দীর্ঘকাল পর বনে নির্বাসিত বুদ্ধিভ্রষ্ট নল রাজা হৃদয়াবেগে পরিচালিত হয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে মৃতপ্রায় নাগকে বের করে এনে বাঁচিয়েছিলেন, কর্কট নাগ পরিত্রাণ পেয়ে প্রথম কাজ করেছিল পরিত্রাতা নলকে দংশন করে। সোনার বর্ণ নল কালো হয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষে। রৌশনের সঙ্গে কর্কট নাগের তো প্রভেদ নেই। আমি চুপ করে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম, যাক—তাই যাক রৌশন। আর যেন না আসে কখনও।

রৌশন টেবিল ছেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানলার ধারে।

সামনে সাউথ অ্যাভেন্যু ধরে আমাদের ফৌজের জোয়ানরা মার্চ করে চলছিল। সে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। চলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে তাকাল। বিস্মিত হয়ে গেলাম। তার চোখের কোল থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসেছে। আবার কেঁদেছে রৌশন। এতক্ষণ ফৌজী মার্চ দেখছিল, না কাঁদছিল।

রুমাল বের করে চোখের জল মুছে সে বললে, কাল থেকে—। সেন্টিমেণ্ট—ইমোশন—বড় বেরাগা ব্যাপার বাপুজী। আমি এইবার যাব।

একটু থেমে বললে, আর আমি আসব না। আসা আমার উচিত নয়।

আমি নিজেকে কঠিন শাসনে স্তব্ধ রাখলাম।

সে আবার বললে, একটা শেষ অনুরোধ করব, রাখবে?

—কি? বল?

একশো টাকার দুখানা নোট বের করে সে বললে, তোমার দোস্তকে কোন ছুতো করে দেবে? উধম সিংকে?

চমকে উঠলাম। ওঃ! মূর্খ আমি। তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আবার দু' ফোঁটা জল তার চোখের কোলে কোলে ছলছল করছে। সে হাত বাড়িয়ে ধরেই রইল আমি নেব বলে।

বললাম, হরিপীতম! ওই একটি শব্দ ছাড়া উচ্চারণ করবার কথা খুঁজে পেলাম না।

হেসে সে বললে, হরিপীতম মর গেয়ি বাপুজী! ও নাম তুমি মুখে এনো না। আমি

রৌশন। ব্যাড গার্ল।

—রৌশন, যেয়ো না—ফেরো।

—না বাপুজী আ—র ফেরা যায় না। বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লে সে। ওই জীবন, হোক বাপ মা, তাদের জন্তেও ও-জীবনে ফেরা যায় না। সে বিষণ্ণ হেসে ঘাড় নাড়তে লাগল অর্থাৎ সে তো নিরুপায়।

আবার বললাম, শোন, আমার বাত শোন—

—কি শুনব? দেখ আমাদের দেশে বলে, সংসার ছেড়ে বনে বা তীর্থে তপস্যা করলে ভগবান মেলে। সে তো জিন্দিগীর সেরা লাভ। তাতে সব পায়, স্বর্গ মর্ত্য সব। কিন্তু ক'জন যায়? সেই সংসারের অশান্তি-দুঃখের সুখ ছাড়তে পারে না। টাকাটা দিয়ো

—দাও। নিলাম টাকাটা।

খুট্ শব্দ করে দরজার ছিটকিনি খুলে সে বেরিয়ে গেল। তার আগে গগল্‌সটা পরে নিলে।

আট

আমার দোষ, আমি জীবনে কোন ঘটনায় কোন জায়গায় ছেদ টেনে দিয়েও তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই না। কারও সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েও আবার সে এলে তাকে দরজা খুলে সম্ভাষণ করি। অনেক ক্ষেত্রে নিজে গিয়েও সম্পর্কটা জুড়ে নিই, তাতে গিঁঠ থাকলেও তাকে বড় বলে ধরি না। রৌশন সম্পর্কেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

দেড় বছর পর। মার্চ মাস।

খবরের কাগজে দেখলাম, কুতুবমিনার হতে লাফ দিয়ে তরুণীর আত্মহত্যা। কলকাতায় লেক, দিল্লীতে কুতুব আত্মহত্যার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। রোমান্টিক আত্মহত্যাকারীদের, অর্ধ উন্মাদদের, কি বলব, প্রিয় স্থান। কেমন করে লাফ দেয়, লাফ দেওয়ার পরমুহূর্ত থেকে মাটিতে পৌঁছুনো পর্যন্ত ওইটুকু সময় কি মানসিক অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারি নে। মৃত্যুর পথ অনেক। পটাসিয়াম সায়ানাইড সহজ পথ। তবু কেন যে—। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তার আগে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তাই ঠিক। কিন্তু তার মধ্যে লেকের জলতলে বাসর পাতার কল্পনা, কুতুবমিনারের উপর থেকে লাফ দেওয়ার প্ল্যান আসে কি করে? এক বন্ধুর কাছে তার এক বন্ধুর রোমান্টিক আত্মহত্যার গল্প শুনেছিলাম। সে আমলে কুড়ি-পঁচিশ টাকার ফুল কিনে খাটে ফুলশয্যা বিছিয়ে ব্লেড দিয়ে নিজের একটি ধমনী কেটে শুয়ে পড়েছিল। সে নিজে ছাত্র ভাল ছিল এবং বিজ্ঞানের ছাত্র। পটাসিয়াম সায়ানাইড তার পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার ছিল না।

হেডলাইন দেখে নিয়ে আর পড়ি নি। থাক, কোন হতভাগিনী ব্যর্থতায় উন্মাদ হয়ে করেছে, সে আর পড়ে কি হবে?

প্রেম? যাকে চেয়েছে তাকে পায় নি? এই যুগে তার জন্তে আত্মহত্যা! কলকাতা পুলিসের একজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বলেছিলেন, নব্বুই দিন। তরুণ আর তরুণী; এ বলছে ওকে না পেলে বিষ খাব, ও বলছে গলায় দড়ি দেব নয় ছুরি দেব। পালিয়ে গেছে, পাকড়ে এনে মেয়ের বাপকে বলেছি নাইন্টি ডেজ সাবধানে রাখুন, দেখা করতে দেবেন না, চিঠিপত্র লিখতে বা পেতে দেবেন না, বাস্ তাতেই হবে; নব্বুই দিন তিন মাস পর সে নিজেই বলবে, বাপ রে কি ভুলই করেছিলাম। বিয়ের সম্বন্ধ করবেন পছন্দমত, দেখবেন নিজেই সেজেগুজে সলজ্জ হাস্তোজ্জ্বল নত মুখে এগিয়ে যাবে কনে দেখার আসরে। গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি। ছেলেদের এক মাসও লাগে না। হাজার হলেও বেটাছেলে মানিক ছেলে।

থাক, ও নিয়ে ভাববার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অন্য খবরে এগিয়ে গেলাম। মোটামুটি দেখে ঠেলে দিলাম কাগজ। কাজ নিয়ে বসলাম। কাজ, লেখার কাজ। এই লেখাটাই লিখছিলাম। কিছুদিন আগে একজন বন্ধু বলেছিলেন, একেবারে মডার্ন মেয়ে নিয়ে কিছু লেখো। তুমি লেখো নি। অবশ্য দেখে থাক তো লেখো নইলে লিখো না। মাঝখানে বন্ধুর বাড়িতে এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন, শাড়ি পরেছেন, তার সঙ্গে হর্স-টেল খাটো চুল, পায়ে চটি। তাঁকে বন্ধু হেসে রসিকতা করে বলেছিলেন, মিস, তুমি কিন্তু ব্যাকডেটেড হয়ে গেছ; মডার্ন যাকে বলে তা আদৌ নও। হলে এখানে ছ'মাস এসেছ, ছ'টা প্রেম তো হওয়া উচিত ছিল। তোমার মায়ের কথা ভাব তো।

আমাকে বলেছিলেন, জানেন, সম্প্রতি ওর মা দ্বিতীয়বার উইডো হয়েছেন। শোকে অভিভূত হয়েছিলেন খুবই। হঠাৎ খবর পেলেন, তিনি লটারীতে একটা এরোপ্লেন পেয়েছেন। উঠে বসলেন। এবং প্লেনটার দখল পাওয়ামাত্র সে প্লেনে চড়ে পৃথিবী ঘুরছেন। পৃথিবী দেখা উদ্দেশ্য অবশ্যই বটে কিন্তু মূল লক্ষ্য—টু ফাইণ্ড আউট সেই লোকটি যাকে তিনি চির-জীবন খুঁজছেন।

কথাটা সেই থেকেই উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গেই উনি বলেছিলেন। অন্যদিকে লেখার তাগিদ ছিল, ভেবেছিলাম মডার্ন মেয়ে নিয়েই লিখব এবং বন্ধুকে উৎসর্গ করব। আমার সে মডার্ন মেয়ে রোশন। তা ছাড়া আর কাকে নিয়ে লিখব? তার শেষ কথাটা কানে আজও বাজছে, মা বাপ কারুর জন্তেই আমি ফিরতে পারি না।

রোশনকে নিয়েই লিখছি। মডার্ন মেয়ে বলব না। মডার্ন মেয়েদের সত্যিই জানি না, মডার্ন খোলসে একটি মন্দ মেয়ের কাহিনী। আজকেই এই বেলাতেই শেষ করব। শেষ করে উঠলাম, ওই কথাতেই শেষ, ফিরতে আমি পারি না।

ছেদ টেনে দিয়ে চায়ের কাপ এবং সিগারেট নিয়ে বসলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। তুললাম রিসিভার—হ্যালো।

—শঙ্করজী!

—দাদাজী!

—আরে ভাই পেপারমে দেখা হ্যায় ?

—কি ?

—রৌশন ?

—রৌশন—কি ? কি করলে আবার ?

—আরে কুতুবমিনারকে উপরসে—

—এঁ্যা—? সে রৌশন ?

—হ্যাঁ। পড় নি ?

—হেডলাইন দেখেছি কিন্তু পড়ি নি।

সে রৌশন ? টেলিফোনটা রেখে কাগজটা টেনে ঝুঁকে পড়লাম। হ্যাঁ, সে রৌশন। বেলা চারটের সময়।

—আঃ—। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা মাংস-স্তূপ, রক্তমাখা নীলাভ মিহি শাড়ি, কিছু চুল। দুটো একটা প্রত্যঙ্গ শুধু গোটা। হয়তো আধখানা হাত, নয় তো—। আঃ ছি ছি, থাক, থাক। কিন্তু—কিন্তু—। রৌশন এ কাজ করলে—?

মা হতে যাচ্ছিল ?

না। রৌশন ডাক্তার ক্লিনিক সব চেনে। তা ছাড়া সে সন্তানাঢকে কোন প্রসূতিভবনে প্রসব করে তাদের মারফতই কোন অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে পারত।

আর কি ? কোন জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছিল ?

আজকের দিনে, রৌশন যে মেয়ে তাতে তার সামান্য পানোন্মত্ততার অপরাধ থেকে কালোবাজারের পথ ধরে কি অপরাধ তার পক্ষে অসম্ভব ? জাল পয়সা নোটের ব্যবসা, বিদেশের গুপ্তচরবৃত্তি ; মনোহারিণী শক্তিতে সংবাদ সংগ্রহ করে চাণক্যপুরীতে বিক্রী, সবই রৌশন করতে পারে। হয়তো বা শেষের ওই ধরনের কোন জটিলতায় পড়ে থাকবে রৌশন, নইলে এইভাবে আত্মহত্যা সে করত না।

আর একটা হতে পারে।

যাকে চাই তাকে পাই না বলে জীবনের অশান্তি ব্যর্থতা মিথ্যে না-হয় মেনে নিলাম কিন্তু যা চাই তাকে না-পেলে জীবনের অশান্তি তো আছে।

রৌশন বলেছিল, উপার্জন করি, কিন্তু অভাব আমার মেটে না। অনেক চাই আমি। অনেক।

জীবনে ফুলের মালা বদল করে বিয়ে হয়। কিন্তু ওই ফুলের মালার পাশে সোনার হার ছাড়া সে বিয়ে সুখের হয় না। বিয়ের পাওনা না পেলে সুন্দরী বধূরও শ্বশুরঘরে ঠাঁই হয় না, ঠাঁই হলেও শান্তি হয় না। তার নিজের মনেরও হয় না।

রৌশন যে চেয়েছিল অনেক। ফর্দ দেয় নি। এবং সে করা সহজ নয়। তবে এক কথায় বলেছিল, অনেক টাকার তার প্রয়োজন। সেই অশান্তির জ্বালায় ?

মনে হল এটা সম্ভব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। লেখাটা সেই দিনই পাঠাব ভেবেছিলাম, পাঠালাম না। দাদাজী হয়তো জানতে পারেন কিছু। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আসা বন্ধ করেছিল কিন্তু দাদাজীর কাছে আসা বন্ধ করে নি। তঁরে সঙ্গে অতীত জীবনের কথার সম্পর্ক ছিল না, বা আমার মত ধরমবাপ-বেটীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। দাদাজী—দাদাজী, রসিক নাট্যোৎসাহী ব্যক্তি দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিনের, নাট্য ও শিল্পলোকের অনেক শক্তি ও সূত্র তাঁর হাতে। সুতরাং রৌশন তাঁর কাছে আসত, এটা বা সেটার জন্যে। হয়তো প্রভাকশনে সাহায্য নয়তো ছোটখাটো পার্ট চাই বলে আসত। উদার দাদাজী শ্রদ্ধার বা স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ না-করলেও করুণার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

এসব দাদাজীই মধ্যে মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন আমাকে। আমার কাছে সে আসত সেটা তিনি জেনেছিলেন। সম্পর্ক চুকলে পর একদিন হেসে বলেছিলেন, রৌশন মাকো ভাগিযেছ, ভাল করেছ শঙ্করজী। কত টাকা তোমার মা বলার খেসারত দিযেছ?

—কে বললে তোমাকে?

—খুদ রৌশন, আওর কৌন। তোমার বাড়ি কখনও আসবে না সব কুছ ফারখৎ কর দিয়া, বললে আমাকে। তা, ওর বাত তো লাখোতে একটা সত্যি।

আমি বলেছিলাম, না, সত্যিই। আমিই ওকে আসতে বারণ করে দিযেছি।

—ভাল করেছ।

—আর কিছু বলেছে?

—না। তোমার সম্পর্কে ওর বহুৎ রেস্পেক্ট। বললে, একটা ওয়ালপ্লেট সে তোমাকে ঠকিয়ে বিক্রি করেছিল, তুমি ধরে ফেলেছিলে। তারপর বলেছিলে, তুমি আর না-এলেই আমি খুশী হব। বললে, ও মানুষ নিযে বনে না দাদাজী। বড়া কড়া ধাতকে আদমী।

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

তারপরও মধ্যে মধ্যে বলতেন, রৌশন আমি থি তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেমন আছে?

—আরে ভাই, ওরা কখনও ভবিষ্যতে বা বাইরে খারাপ থাকে না। রোগে তো ওরা হাসপাতাল যায় না, মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে হাসপাতাল যায়। তবে দিলের কথা বলতে পারব না। নাঃ, ভুল বললাম শঙ্করজী, ওদের ও বস্তুটাই নেই। এখন থিয়েটারে মেতেছে। ইচ্ছে, বম্বেতে গিযে ছবিতে নসীব পরীক্ষা করবে। এখানে নাম হলে সুবিধে হবে আর আমার একটা রেকমেণ্ডেশন চায়। বাড়ি খাল করে ফেললে।

দাদাজীর বম্বেতে ছবির রাজ্যে সত্যই প্রতিষ্ঠা আছে।

আমি বলেছিলাম, দিয়ো না একটু লিখে। একটা চান্স পাক না। যদি পারে।

একবার বলেছিলেন, শঙ্করজী, শী ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ চান্স।

—কে?

—ও, তুমি ভুলে গেছ? রৌশন। তুমি বলেছিলে, আর মেয়েটা খারাপ হলেও, আই

পিটি হার।

—দাদাসাহেব ইউ আর রিয়েলি গ্রেট।

—আরে ভাই, হাজার হলেও বাচ্চা লেড়কী, বাপ নেই মা নেই, অরফ্যান। দুনিয়ার ধুলোমাটি মেখেছে, মরে যায় নি, উঠেছে কোন রকমে, হাউ ক্যান ইউ হেট হার!

—নিশ্চয়। এটাই গ্রেটনেস।

দাদাজী প্রশংসার কথা চাপা দিয়ে বলেছিলেন, লিখে দিয়েছিলাম, রয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট রোল দিয়েছে। তাতেই খুশী। শী ওয়াজ ড্যান্সিং লাইক এ চাইল্ড।

দাদাজীই পরে খবর দিয়েছিলেন, ছবিতে রৌশন একদম ব্যর্থ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, পুয়োর গার্ল!

উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেমন মধ্যে মধ্যে আসে তেমনি এসেছিল।

—নমস্তে দোস্ত বাবু সাহেব। আচ্ছা হায়?

—নমস্তে সিংজা দোস্ত। তোমাদের ভালবাসার দৌলতে ভালই আছি। তোমার বালবাচ্চা সব ভাল?

—হাঁ। সব আচ্ছা। বড় লড়কাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা বাবুজী, এ পেলেট কোথা কিনলে?

সে এগিয়ে গেল। রৌশনের প্লেটখানার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। কোথায় পেলে বাবুজী?

—কাশ্মীর থেকে এনে একজন দোস্ত দিয়েছে সিংজী।

—জান বাবুজী, এতে আমাদের বাড়ির ফুটকি চিহ্ন রয়েছে।

মুখ তুলে ভাবতে লেগে গেল, বললে, কে আছে ওখানে? আমার চাচেরা ভাইদের কেউ হবে। আমি ভেবেছিলাম তারা সব মরে গেছে। ওঃ বহুৎ নয়া ডিজাইন বানায়া। আচ্ছা চিজ।

মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করব মনে করেও জিজ্ঞাসা করলাম না। টাকাটা দেওয়ার কথা মনে হল। কি করে কি বলে দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে এল এবং তাই বললাম। বললাম, তোমরা নিজেরা এখানে যা তৈরি কর সে সব নতুন করে কর না কেন?

—আর বাবুজী, ওসব আচ্ছা লাগে না। সীতারাম, হরপার্বতী এসব ছেড়ে এই মাঝি আর মাঝিনী কি হবে? এ তো নদীর ঘাটে গেলেই মেলে। পথে মেলে ঘাটে মেলে। এ আবার বাড়িতে কেন?

—বেশ তো, তা-ই নয়া ডিজাইনে কর।

—রূপেয়া চাই বাবুজী। প্রথমে খরচ করতে হবে—তবে তো! কাম করবার লোক চাই। ভালো হাত চাই। আমার—

হঠাৎ থেমে গিয়েছিল সে। মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে এল। তারপর বলেছিল, আমার কে

বড়া লেড়কী ছিল ত্তার হাত ছিল আচ্ছা। খুব মধেস হাত। বাচ্চা বয়েসে সে মরেছে কিন্তু সেই বয়েসেই তার মগজেও এসব খেলত।

আমি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করেছিলাম, হরিপীতম।

চমকে উঠেছিল উধম সিং। বলেছিল, বাবুজী?

—বল!

—এ নাম কি করে জানলে তুমি?

—তুমিই বলেছিলে সিংজী। এইখানে বসে।

—বলেছিলাম?

—হ্যাঁ। মনে নেই?

—কিন্তু—

—কি কিন্তু? একদিন তোমাদের সব কথা আমাকে বলেছিলে। আমি ওযেটিং চার্জ দিতে চেয়েছিলাম নাও নি!

—সে মনে আছে। কিন্তু আমি তো ও নাম মুখে আনি না।

বিব্রত হয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের কাছে বুদ্ধিহীন হলেও উধম সিংয়ের কাছে আমি বুদ্ধিমান। বলেছিলাম, সেদিন তুমি কেঁদেছিলে সিংজী, সেই তারই মধ্যে বলে ফেলেছিলে নইলে আর আমি জানব কি করে?

—তা হবে। হয় তো দারুও খেযে থাকব।

—বোধ হয। চোখের জল যখন বের হয় তখন মনের ঘরের দরওযাজাগুলো খুলে যায় সিংজী, নইলে আঁসু বেবোয় কি করে?

হেসেছিল উধম সিং। বলেছিল, তা বলেছ ঠিক। দরওযাজা বিলকুল যদি না-ই খুলবে তবে আঁখো কি আঁসু নিকালে কি করে।

একটু থেমে আবার বলেছিল, ও লেড়কীর নাম আমি মুখে আনি না। বহুত দুখ পাই। কলিজা একদম উখাড়ে যায়। মর গেযি।

এরপর চুপ হয়ে গিয়েছিল সব। সেও চুপ আমিও চুপ। আবার ভাবছিলাম জিজ্ঞাসা করব কি না, কি করে মরল সে?. ঠিক হবে? মন বলছিল, না।

সে-ই বললে, বাবুজী, দিল্লীতে এসে এই দিল্লী শহরে ওরা তাকে লুঠ করে নিয়ে গেল।

—কারা?

—আবার কারা? যারা ওখান থেকে তাড়ালে আমাদের। এখান থেকে যারা চলে গেল পাকিস্তান। তারাই। মেয়েটা বড় ভাল ছিল, গুণ ছিল অনেক। ভিক্ষে করতে গেল একদিন আর ফিরল না। হারিয়ে গেল। জি বি রোডে বাবুজী যে সব মুসলমানী বাঈজী থাকে তারা তাকে গায়েব করে পাকিস্তান নিয়ে যাচ্ছিল। পথে কাটাকাটির সময় আমার বেটীও কাটা পড়েছে। মর গেয়ি উ!

চুপ হয়ে গেল সে, আমিও চুপ করে রইলাম। নিজেকে সতর্ক করলাম, না, আর কোন

কথা নয়। অন্তত: হরিপীতমকে নিয়ে নয়।

সে হঠাৎ বলে উঠল, লোকে দেখেছে। চোখে-দেখা লোকে আমাকে বলেছে। তার বুকে উল্কি ছিল। লেখা ছিল পীতম। পীতম আমার জামাইয়ের নাম। সে এক মেলায় ওকে নিয়ে গিয়ে শখ করে নাম লিখিয়েছিল। যে দেখেছে সে বললে, একটা মরা মেয়ের বুকে সে দেখেছে সে উল্কির লেখা।

মনে হয়েছিল উধম সিংয়ের সন্দেহ আছে।

এবার আমি বলেছিলাম, একটা কথা বলব তোমাকে।

সে তখনও ও কথাটা ভুলতে পারে নি। বলেছিল, আমার জামাই, সে বাবুজী ওই দশ এগার বছরের বউয়ের জন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। নসীব, সব নসীব।

বলেছিলাম, ভুলে যাও সিংজী সে সব কথা। দুনিয়াতে এমনি একটা সময় আসে যখন দিন-দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিই বাউরা হয়ে যান।

—ই বাত ঠিক হ্যায় বাবুজী। ঠিক বলেছ। ভগোয়ান মালিক বাউরা হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াতে মানুষও সব ক্ষেপে যায়। ওঃ! দুখ আমার জামাইয়ের জন্তে। ছেলেবেলা থেকে এক গাঁয়ের লেড়কা লেড়কী। বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ছোট থেকে, বিয়ে হল—। ছোট মেয়ে, আমার বাড়িতেই থাকত কিন্তু দেখা তো হত দুজনের। মহব্বতি ছিল, সে মহব্বতি বেহেস্তের মহব্বতি।

—শোন উধম সিং, একটা কথা বলব তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—হাঁ—হাঁ। বলেছ আর একবার। বল কি হুকুম?

—আমাকে দোস্ত বলে মান তো?

—আলবৎ? জরুর! একবার বলেছি, আবার দোসরা বাত কিসের? হাঁ, তবে তুমি বড় আদমী, আমি ছোট—

—না। দুনিয়াতে মানুষ ছোট বড় নয়। কাম আছে ছোট বড়। সেও ভুল, কাম হল কাম। আমার দোস্ত তুমি। তোমাকে বলবার কথা তোমার ভাল চাই; তুমি এই প্লেটের কাজ ভাল করে কর। তুমি টাকার কথা বলছ। টাকা আমি দোস্ত হিসেবে দিচ্ছি। তুমি মাল কেনো, যাতে খরচ করতে হবে কর। দুশো টাকায় হবে?

—দু শো টাকা তুমি দেবে? কেন?

—বললাম তো দোস্ত হিসেবে দেব।

—ধার?

—না। ধার নয়।

—তবে কি? মেহেরবানির দান?

—না দোস্ত দোস্তকে দিচ্ছে। তোমার হলে আমাকে দেবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বললে, খুব প্রেমসে দিচ্ছ তো?

—নিশ্চয়।

—তাহলে দাও। নেব। দেখ, খুব গরীব আমরা কিন্তু ভিখ মাঙ্গি না। দাও। দেখি নসীবকে ভাল করা যায় কিনা।

টাকাটা নিয়ে সে নিশ্চিন্ত করেছিল আমাকে।

রৌশনও সঙ্গে সঙ্গে মনের দরজায় বলেছিল, বাপুজী, আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

হঠাৎ এতদিন পর খবরটা শুনে মনে হচ্ছে অশরীরী রৌশন আমার এই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলতে চাচ্ছে, বাপুজী, আজ এসেছি, কেউ দেখতে পাবে না বলে এসেছি। যাবার আগে দেখা করতে এসেছি। নমস্তে জানাতে এসেছি। বল, আনন্দ রহো। জিতা রহো তো নয়, জিন্দিগী শেষ হয়ে গেছে। বল, আনন্দ রহো।

কলিং বেল বেজে উঠল। চমকে উঠলাম। সে চমকানো অল্প নয়। এই মুহূর্তে বেল বাজতেই মনে হল সত্যিই রৌশন এসেছে, বেল টিপছে। উঠে গিয়ে দরজা খোলবার আগে ঘুলঘুলিটা দেখলাম, কে? মানুষের মন বিচিত্র।

দেখলাম, পিওন।

খুললাম। পিওন বললে, রেজেস্ট্রি চিঠি বাবুজী।

রেজেস্ট্রি চিঠি! কোথাকার? কলকাতা থেকে? হাতে নিয়ে দেখলাম—চমকে উঠলাম আবার। লিখছে, রৌশন কেয়ার অফ পোস্টমাস্টার দিল্লী···।

রৌশন!

চিঠিখানা সই করে নিলাম। হাতে করে নিয়ে বসেই রইলাম। রৌশন লিখেছে। কাল সকালের দিকে রেজেস্ট্রি করেছে। বিকেলে কুতুবমিনারে চড়ে ঝাঁপ খেয়েছে।

আজ এসেছে চিঠিখানা। মনে হচ্ছে রৌশনও এসেছে। কথা বলেছে চিঠির মধ্যে দিয়ে।

কম্পিত হাতে খুললাম।

নয়

রৌশনের লেখাটি বড় সুন্দর। জন্মশিল্পী ছিল সে, এ কথা সেই মুহূর্তে অকপটে স্বীকার করেছিলাম। এবং এই চিঠি লেখার সময় মনের মধ্যে তার চঞ্চলতা অস্থিরতা ছিল বলেও মনে হচ্ছে না। বেশ ধীর চিত্তে লিখেছে। ভাষাটা গোলমেলে; বেচারী ভাল লেখাপড়া তো শেখে নি। অবশ্য তার জন্যে তার কোন দৈন্যবোধ ছিল না। উর্দু ভাল বলত কিন্তু আরবী হরফ আমি পড়তে পারি নে সে তা জানত তাই বোধ হয় হিন্দীতে লিখেছে। বিস্ময় বোধ করলাম এর জন্য। কারণ একালের ফ্যাশন ও ধারণা অনুযায়ী ইংরিজী যেখানে বৈদগ্ধ্যের চরম পরিচয়, সেখানে মডার্ন মেয়ে রৌশন ইংরিজী ছেড়ে হিন্দীতে লিখলে কেন। অস্বাভাবিক এটা।

কালের একটি স্বভাব আছে, সে স্বভাব মানুষের প্রকৃতি এবং দেশমাটির প্রকৃত পরিচয়কে ঢেকে দেয়। থাক ও-সব কথা। রৌশন হিন্দীতে লিখেছে, তার চিঠি পড়ছি আর আমার কল্পনা-প্রবণ মন যেন কানে অর্থাৎ মনের কানে তার স্বরহীন কথা শুনতে পাচ্ছে।

পরম আদরণীয় বাপুজী,

সব আগে তোমায় নমস্তে জানাচ্ছি। আমার বহুৎ বহুৎ প্রণাম তোমাকে। আমি আজ মরতে যাচ্ছি। মরব আজ! মন আমার শান্ত; কোন অশান্তি নেই। ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে মরবার সিদ্ধান্ত করেছি। মরা ছাড়া আমার পথ নেই। আজ এক বছর নিদারুণ অশান্তির মধ্যে কেটেছে। তোমাকে বলেছি, অনেক জঙ্গল পাহাড় অন্ধকার আমি জীবনে একা পার হয়েছি। তখন ভয় হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু আমি তোমার শুধু মন্দ মেয়েই নই, আমি দুর্দান্ত মেয়ে। আমার সাহস তোমাদের থেকে অনেক বেশী। আমি ভয় পেয়েও হটে পিছন ফিরি নি, ভয়ের সঙ্গে লড়াই দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। তাতে অশান্তি ছিল না এমন বলি নে কিন্তু মজা ছিল যেন। ওই মজাই আজ হারিয়ে গেছে। জিন্দিগীর নুন ফুরিয়ে গেছে। এক বৎসর দিন রাত কেঁদেছি, অশান্তিতে ভুগেছি। ভয়ের হাঁ বড় থেকে বড় হয়েছে। মরবার সংকল্পে যেই শক্ত হয়েছি অমনি সব পালিয়ে গেছে। সব এখন সাফা হয়ে গেছে, সামনে সিধা রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কুতুবের সেই চূড়া যেখানে অনেকবার উঠেছি, মনে হয়েছে বিলকুল দুনিয়া ছোট হয়ে খেলাঘর বনে গিয়েছে। আমি উপরে দাঁড়িয়ে আছি, কত সুখ এখানে। ওখান থেকে ঝাঁপ খাব। সেদিন বলেছিলাম, বাপ হোক মা হোক, কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে আসতে পারব না। অসম্ভব। ফেরা যায় না। পত্থরে গড়া কুতুবমিনারে সিঁড়ি আছে বাপুজী। জিন্দিগীতে দেমাকে আর আরামে গড়া মিনার যখন মানুষ গড়ে তখন সিঁড়ি গড়ে না। উঠে যায় আর পায়ের ধাক্কায় সিঁড়িগুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে যায়, পাছে কখন কারুর ডাকে নেমে আসে ভুল করে। নামতে হলে পড়তে হয়। যারা ঠেলা খেয়ে পড়ে যায় তারা মরে হাড়গোড় ভেঙেও বেঁচে থাকে কাঁদতে। আমি নিজে লাফ দেব। আমি মরে বেঁচে যাব। অনেক ভেবে স্থির মগজে খুশ-দিলে রয়েছি।

দুনিয়ায় বাপ মা ছেড়েছি। এই জীবনে কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক, সত্যকারের সম্পর্ক ছিল না। শুধু তুমি এই অল্পকালের মধ্যে আমার মত মেয়েকে বাপুজী বলিয়েছ, কোন শরম কর নি, বিদেশীর কাছে আমাকে ধরমবেটী বলেছ। তুমি আপনার লোক। আর দাদাজী সাহেব। দাদাজী আমার ভোলানাথ। তাঁর এই গোস্সা, এই মেজাজ খোশ, তাঁর কাছে মন্দ পাপ বিচার নয়, তাঁর বিচার মায়ামমতার। কত মায়া যে তিনি করেছেন তার কিছু জান, সব জান না। ভেবে চিন্তে খুব শান্তিতে খুশীতে মরতে যাচ্ছি তাই প্রথমেই আজ দাদাজীকে চিঠি লিখবার কথা মনে হল আর তোমাকে। তুমি পিতাজী, ধরমবাপ। আমার পাপ উপেক্ষা করে এগিয়ে এসে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ এবং বলেছ, এই মন্দ মেয়েই আমার বেটী। তোমাদের না লিখে মন মানল না।

দাদাজী আমার অনেক উপকার করেছেন অনেক ভাল বেসেছেন কিন্তু তিনি আমার

জীবনের কথা জানেন না। তাঁর কাছে শুধু মাফি চেয়ে গেলাম। স্রিফ ক্ষমা, মাফি। আর লিখলাম, দুঃখ করো না। প্রণাম।

তুমি আমার জীবনের কথা জেনেছ। প্রায় সবটাই বলেছি। কিছুটা বলি নি তার কারণ সবটা পিতাজীর কাছে বলা যায় না। হাজার বেশরমী হলেও বলতে পারে না।' তা আজও বলব না। আর কিছুটা বলব। যা বলেছি এমন ভাবে যে বলার মত বলা হয় নি। তোমার সঙ্গে নসীবের খেলে উধম সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।' আমার আসল বাপ, গরীব বাপ। আমি তার মন্দ বেটী। খারাপ বেটী। তুমি আমার কথা জেনে গেছ। তাই তোমাকে শুধু মাফি চেয়ে চিঠি শেষ করতে পারছি না। সব লিখছি।

আত্মহত্যা যারা করে তাদের বেশীর ভাগ চিঠি লিখে যায়। না-লিখে বোধ হয় মরতে মন চায় না। কেউ দুনিয়াকে দুষে যায়। কেউ লেখে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়; তারা কিন্তু এই কথা লিখেই দায়টা বেশী করে চাপিয়ে দিয়ে যায় সেই লোকটির উপর, সে-ই তা বুঝতে পারে, অন্য কেউ তার পাত্তা পায় না। তার বিলকুল কথা সেই লোক মনের মধ্যে ভাবে আর আপসোস করে। যে মরে ওতেই তার মন খুশী হয়। আমার তো তা নয়! দায় আমার কারুর উপর দেবার নেই। তাই তোমাকে লিখে জানিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। মরে গিয়ে তো ভগবানের দরবারে (ভগবান যদি থাকেন) দাঁড়াতে হবে। তিনি তো পুছবেন, যে জিন্দিগী আমি তোমাকে দিলাম সে জিন্দিগী তুমি নিজের হাতে মাঝখানে বরবাদ করলে কেন? একজন অন্যজনের জান নিলে আমার কানুনে তার সাজাই হয়, তোমার জান তুমি নিয়েছ। তুমি বল, কেন নিয়েছ? তখন একটা জবানবন্দি তো দিতে হবে। এই জবানবন্দিটাই মরবার আগে সবাই তৈরি করে নেয়। আমিও তোমার কাছে পত্র লিখে তাই তৈরি করছি। এটাই সেখানে পেশ করব।

বলেছি তোমাকে—সবই প্রায় মিথ্যা বলতে আমি ওস্তাদ মেয়ে। কিন্তু তোমাকে ঝুটা বাত বলি নি অন্ততঃ আমার কথা যা বলেছি তার ভিতর। কিছু বাদ আছে।

শোন বলি।

এক গাঁওয়ে জম্মু এলাকায় থাকত উধম সিং, তার সংসার তার স্ত্রী, মেয়ে ছেলে। মেয়ে হরিপীতম। জন্ম থেকে মন্দ মেয়ে। মন্দ মেয়ে জন্মায় বাপুজী। গরীব জাঠের ঘর। সে সব বলেছি। তাদের পেশার কথাও বলেছি। হরিপীতম বচপন্ থেকেই মন্দ। বড় চালাক বড় চতুর। বুদ্ধি খুব। তার হাত ওই কারুকামে খুব মিহি, অল্পতেই ধরতে পারে, বুঝতে পারে, আবার বুদ্ধি খাটিয়ে শেখা কারিগরির উপরেও কারিগরি করতে পারে। ছবি আঁকতেও পারত; খড়ি দিয়ে কালি দিয়ে কাগজের উপর ছবি নকশা সে আঁকত পাঁচ বছর বয়স থেকেই। আর চুরি করতে পারত খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে। এমন কি পাঁচজনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে অন্য লোকেদের মুখের দিকে চেয়ে তাদের কথা শুনত হাসত আর তার হাত চুরি করত। আর মিথ্যে এমন ভাবে বলত যে কেউ তা ধরতে পারত না, একবিন্দু সন্দেহও করত না। করতে পারত না। একটা ঘটনা বলি, তখন ছ'সাত বছর বয়স। গাঁওয়ের

মধ্যে বড় সর্দারের বাড়ি নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়েছি। সেখানে সর্দারের বাড়ির বেটী-বহুরা বসে আছে। বাচ্চাকে সাজিয়ে গুছিয়ে এ কোলে করছে ও কোলে করছে। বাচ্চার হাতের সোনার গহনার একটা ছোট্ট সোনার ঘুন্টি কস্তার ডগায় দুলছিল। আমার লোভ হল। মনে হল ওটা চাই আমার। বুদ্ধি ঠিক পথ বাতলালে। বেরিয়ে গিয়ে খুঁজে জাঙ্গাল থেকে এক টুকরো ভাঙা কাঁচ নিয়ে এলাম। আমি ভিড়ের মধ্যে ঠিক ওর পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। সময় ঠিক পাচ্ছিলাম না। একবার বাচ্চার বুড়ো দাদো এলেন আর এক বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে আশিস করতে। মেয়েরা ঘোমটা দিলে। বুড়ো দুজন সামনে এসে দাঁড়ালেন। বহুর কোলে বাচ্চা। ঝুমকিটা ঝুলছে। আমি ফাঁক পেয়ে কাঁচ দিয়ে সেটাকে কেটে টপ করে মুখে পুরে গিলে দিলাম। এসব আমার বাবা মা জানত না। বিশ্বাস করো। গাছে চড়তাম, ফল পাড়তাম। গান গাইতে পারতাম, নাচতে পারতাম। গাঁওয়ের লোকেদের খুশী করবার ক্ষমতা আমার ছিল। তারা আমাকে মন্দ বলে তখনও বুঝতে পারত না। বয়সও হয় নি। গাঁওয়েই শ্বশুরবাড়ি। বিয়ে তখন আমার হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে বিয়ে হয়েছিল। বর ছিল দশ বছরের। উত্তম সিং, ডাকনাম পীতম। তার দাদো, মায়ের বাপ তাকে বলত পীতম। দাদোর ছেলে ছিল না, এই পীতম ছিল তার সব। সে ছিল ফৌজে হাওলদার। এই দাদোই আমাদের গাঁওয়ে এসে আমাকে দেখে পছন্দ করে দশ বছরের পীতমের সঙ্গে পাঁচ বছরের হরিপীতমের বিয়ে দিয়েছিল। তুমি জান, আমাদের বিয়ে হলেই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না, 'গওনা' আছে। মেয়ে যুবতী হলে তবে শ্বশুরবাড়ি যায়। কাজেই বিয়ে হয়েও বাপের বাড়িতে ছিলাম। পীতম ছেলেবয়স, পাঁচ বছর বয়স থেকে থাকত দাদোর বাড়ি; আমাদের গাঁ থেকে দশ মাইল দূর, কিন্তু বিয়ের পর পীতম সেখান থেকে পালিয়ে আসত বাপের কাছে একটা ঘোড়ায় চড়ে। আসত আমার জন্তে। দুর্দান্ত শক্তগড়ন ছেলে। মনমেজাজ অদ্ভুত। আমার ভালও লাগত ভয়ও করত। বাপুজী, বিয়ের বাসরেই সে আমার চুলের মুঠো ধরে মেরেছিল। আমি কেঁদেছিলাম মায়ের জন্তে। সে এলে যে ক'দিন থাকত তার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হত। পথেঘাটে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা, দু'চারটে কথা নয়, তার সঙ্গে দু'চার ঘণ্টা কাটাতে হত। জায়গা তার ছিল। সে গাঁওয়ের নগিচে একটা গোপন স্থান ঠিক করেছিল, কোন আগেকার আমলের কোন সরদারের ভাঙা মাটির গড় নাদির শাহের আমলে গড়টাকে গোলা মেরে একদম মাটির ডাঁই করে দিয়েছিল। তারা নির্বংশ হয়ে গিয়েছিল। সেই গড়ের মধ্যে একটা জায়গা সে বের করেছিল। সেইখানে দিনে একবার যেতেই হত। না গেলে পরের দিন সে আমাকে মারত। নিষ্ঠুরভাবে মারত। কিন্তু তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, ভাল লাগত। হয়তো বর বহু হয়েও ওই যে গোপনে দেখা তার মধ্যে একটা মজা ছিল। বোধ হয় গোপন অভিসারের স্বাদ আর রঙ ছিল। সেও ছিল দুর্দান্ত আর ছিল গোঁয়ার। গল্প করত, বড় হয়ে সে ডাকাত হবে। এই গড়টাকে তলায় তলায় খুঁড়ে ঘর গড়ে নেবে। ঘোড়া রাখবে। হাতিয়ার রাখবে। রাত্রে বের হবে ডাকাতি করতে বলত, তুই খানা তৈরি করে রাখবি—আমি এসে খাব। তোকে গহনা দেব, বলব, নে [illegible]

একবার মেলাতে গিয়ে সে উল্কিওলার কাছে আমার বুকে লিখিয়েছিল পীতম। আর নিজের বুকে লিখিয়েছিল হরিপীতম।

সে বড় গোঁয়ার ছিল। মুখে বলত ডাকাত হব কিন্তু বাপুজী চুরিকে সে ঘেন্না করত। ওই যে সোনার ঘুন্টি আমি চুরি করে গিলেছিলাম সেটা পেট থেকে বের হয়েছিল। ময়লা থেকেই সেটাকে কুড়িয়ে আমি অনেকদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর একদিন সেটা আমি তাকে দিয়েছিলাম, এটা তুমি নাও। বিক্রি করে—

সে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় পেলি ?

আমি হেসে বলেছিলাম, ডাকাতের বহু আমি। আমি চুরি করেছি।

—চুরি ? কার ঘরে ?

ঘটনাটা বলতে সে আমাকে খুব মেরেছিল। বলেছিল, চুরি আর ডাকাতি এক নয়। চুরিতে পাপ হয় ডাকাতিতে হয় না। বলে সেটাকে গাঁওয়ের ধারের দরিয়াতে ফেলে দিয়েছিল। আমার বহুৎ দুখ হয়েছিল। সোনার কোন গহনা আমার ছিল না। বাপ দেয় নি শ্বশুরও না। আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। মানুষের মনে যাদের সাধ আশ কিছুতেই মেটে না এই আশই তাদের মন্দ করে তোলে।

এরপর বাপুজী, তার সঙ্গে তার বাপেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল আমাদের। এমন হল যে এ ঝগড়া মিটবে না। তার আবার বিয়ে হবে। আমার সঙ্গে ফারখৎ হবে।

সেও এই মন্দ মেয়ের দোষ। তারও দোষ! হাঁ তারও দোষ। ওই যে গাঁওয়ের বড় চাষী সরদার, ওদের বাড়ি এসেছিল এক মেহমান। ওই সরদারের শালার বেটা। তারা বড়লোক, এই সরদারের চেয়েও বড়লোক। তার বয়স উত্তমের মতই। বহুৎ খুবসুরত। কিন্তু উত্তমের মত শক্ত নয়, তার মত ডাকাত নয়। গোঁয়ার নয়। আমার তখন সাত বছর বয়স। বাপুজী, গাঁওকে যত নির্দোষ সরল ভাব তা নয়। সেখানে ছেলেমেয়েরা শহরের থেকেও বোধ হয় পাকা, অল্প বয়সে সব শেখে। ওই ছেলেটা তাদের বহেনদের পুঁতির মালা দিচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে বলেছিল, তুই নিবি ?

তখনই চোখের ভাষা জেনেছিলাম। সেই ভাষার সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখের ভাষা মিশিয়ে বলেছিলাম, দাও না।

সে বলেছিল, আমাকে চুমু দিস তো দেব।

ইশারায় ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, দেব।

তখন থেকেই আমি ঠক। ঠকাতে কোন দোষ নেই এ শিখেছিলাম। হাতে পেলে সেটা নিয়ে ছুটব, আর এ মুখো হব না এই ছিল মতলব। তাই দিয়েছিলাম ছুট। ওদিকমুখো হই নি। কিন্তু তার কপালে বিপদ আর আমার কপালেও। সে কি করে জেনেছিল যে আমি পীতমের সঙ্গে দেখা করতে যাই ওই ভাঙা গড়ে ঠিক দুপুরের সময়। সে সেদিন লুকিয়ে ছিল। আমাকে ঠিক ধরেছিল পথ আটকে।—বেইমানী!

আমি ভয় পেয়ে বলেছিলাম, ছোড়ো ছোড়ো। কাল জরুর ময় যাউঙ্গী। ছোড়ো—

—নেহি।

—তব লেও তুমহারা মালা।

—নেহি। মালা নেব কেন ? দাম নেব। তুই বলিস নি ?

আমি মন্দ মেয়ে বাপুজী। বলেছিলাম, নাও। তবে জলদি চুমো খেয়ে নাও। জলদি করো।

সে আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলেছিল, এই তো পিয়ারী !

বাপুজী, হঠাৎ একটা ঢেলা এসে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠলাম। তাকে বললাম, পালাও, ভাগো। জলদি। পীতম তোমাকে মেরে ফেলবে।

—কে ?

—পীতম। আমার বর।

—আসুক না, ছোটলোক চাষীর বেটা।

বলতে বলতে পীতম এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার উপর। আমরা জাঠ রাজপুত আর সে বড়লোকের বেটা শিখ। তার কাছে ছোট কৃপাণ ছিল। সে কৃপাণখানা খুলে মারতে চেষ্টা করেছিল পীতমকে। কিন্তু পীতমের ছিল অনেক বেশী বল, কুস্তির অনেক প্যাঁচ শিখেছিল। সে তার ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখে নাকে খুব মার দিয়েছিল। আমার ভয় হয়েছিল খুব। তখন এখনকার মত বুদ্ধির বিচার করতে শিখি নি। আমার সেদিন বিচারে মনে হয়েছিল দোষ আমার। ও ছোকরা মরে যায় তো কি হবে ? আমি ওই কৃপাণখানা নিয়ে পীতমকে বলেছিলাম, ছোড়ো উসকো। ছোড়ো নেহি তো— !

বলতেই পীতম তাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার উপর পড়েছিল এবং কৃপাণখানা নিয়ে মেরেছিল আমার কাঁধের নিচে হাতে। সে ছোকরা এই ফাঁকে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল। বাচ্চা ছেলের ছোট কৃপাণ, খুব ধারালো ছিল না, নইলে হয়তো সেই দিনই খতম হতাম। কিন্তু রক্ত পড়েছিল দরদর করে। পীতম দাঁড়িয়ে দেখে বলেছিল, আর কখনও করবি এমন ?

বলেছিলাম, না।

—ওঠ। চল নদীর কিনারায়, রক্ত ধুয়ে দি।

নদীর ধারে যখন এসেছি তখন পিছনে গোলমাল শুনেছিলাম। একটা ঢিবির উপর উঠে সে দেখে বলেছিল, অনেক আদমী আসছে। সেই হারামী লোক নিয়ে আসছে। তুই বাড়ি যা, আমি পালালাম। চলে যাচ্ছি দাদোর বাড়ি, বুঝলি। বলে সে ঝোপঝাড় খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। দাদোর দেওয়া যে ঘোড়াটা চড়ে সে আসত সেটাকে নিয়েই আসত ওখানে। সেটাই ছিল ওর ওই ভাঙা গড়ে আসবার অজুহাত। ওখানে ঘাস ছিল অনেক। ওর বাপের ঘোড়া ছিল ছোট ঘোড়া। তার সহিস ছিল না। পীতম ঘোড়ার যত্ন করত নিজে।

বাপুজী, এই নিয়ে ঝগড়া লাগল আমার শ্বশুরদের সঙ্গে আমার বাপের। শ্বশুর বললে, ও বহু কখনও নেব না। বাপ বললে, আয় বাপ, হে ভগবান, কি খুনের

সঙ্গে বেটীর সাদী দিয়েছি। সরদারেরা চটল শ্বশুরদের উপর। তাদের দুঃখ দিতে লাগল, যেমন বড়লোক গরীবদের দেয়। আমার বাপকে বললে, তোর বেটীকে দে, আমাদের বাড়ি থাকবে কাম কাজ করবে। সরদারনী বেটীর মত দেখবে।

তার মানে খুব ভাল নয় বাপুজী। বাপ আমার তা দেয় নি। বলেছিল, তার চেয়ে মরে যাক ও।

দু' বছর ঝগড়া চলল। পীতম কখনও কখনও গাঁওয়ে আসত লুকিয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করত না। মামার বাড়িতেই থাকতে লাগল। সেখানকার বাড়ির সে-ই তো সব পাবে। তার দাদো বিয়েরও সম্বন্ধ করতে লাগল। পীতম সেখানে পড়তেও লাগল। ইস্কুল ছিল সেখানে। দাদো তার খুব কড়া হয়ে গেল।

দু' বছর পর বাপুজীর সঙ্গে এক মেলাতে গিয়েছিলাম আমরা এই সব চিজ নিয়ে বেচতে আর মেলা দেখতে। তখন আমার বয়স দশের কাছাকাছি। মাথায় লম্বা ছিলাম, আমাকে বড় দেখাতো। আর সাজতাম খুব। সাজতে জানতাম। আমাদের গাঁওয়ে মুড়িওয়ালী ছিল ক'ঘর, তারাও গিয়েছিল। তারা মুসলমান। সেখানে হঠাৎ অন্য এক গাঁওয়ের এক ছোকরা এসে ওই চুড়িওয়ালীদের সঙ্গে মস্করা শুরু করলে আর খারাপ কথা বললে। এতে তাদের সঙ্গে আমাদের গাঁওয়ের দলের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। পাঞ্জাব জম্মুর এসব ঝগড়া বড় খারাপ। বারুদে আগুন লাগার মত; দপ করে জ্বলে উঠলে বিলকুল একেবারে জ্বলে যায়। হাতে শুরু হলেই কোথা থেকে আসে লাঠি ছোরা তার সঙ্গে কৃপাণ তলোয়ার বল্লম। খুন গিরে যায়, লাস পড়ে যায়। তবে এ ঝগড়া খুব বড় ঝগড়া হয় নি। আমাদের গাঁয়ের লোক বেশী যায় নি। আট দশজন পুরুষ, দশ বারোজন মেয়ে। চুড়িওয়ালী বেশী। ওরা ছিল আমাদের থেকে বেশী। হার আমাদেরই হত।" মেলা যে গাঁয়ের সে গাঁয়ের লোকেরা এসে মেলার ঝগড়া বন্ধ করলে। কিন্তু ওরা বললে, চল্, পথে দেখা যাবে। আমরা ভয় পেলাম। বাপুজী, এই সময় এল পীতম আর তার মামার বাড়ির গাঁয়ের ছোকরার দল। সব একবয়সী, চৌদ্দ পনের ষোল; নওজোয়ান হব-হব করছে। মুখে ফিনফিনে দাড়ি গোঁফ। হাতে লাঠি। লাঠির ভিতর গুপ্তি। শিখদের কোমরে কৃপাণ।

পীতম বললে, চলো মেহমান' দেখা যাবে। এখনি চল না মেলার বাইরে দেখা যাক।

ওরাও এসেছিল মেলা দেখতে। ছোকরার দল। হিন্দু মুসলমান শিখ। এক এক গাঁও এককাট্টা একদল। ফরক নেই।

ফেরবার সময় পীতমদের দল গাঁও পর্যন্ত পৌছে দিয়ে ফিরে গেল। গাঁওয়ের লোকেরা বললে, গাঁওয়ের ছেলে, চল গাঁওয়ে চল।

পীতম বললে, নেহি। এই বউটা কই ডাকলে?

আমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম। বললাম, ফিরে এস।

সে বললে, না। তুই বড় হ। গওনা হোক তবে নিতে আসব। গাঁওয়ে সরদার আমার উপর রেগে আছে, যাব না।

বলতে ভুলেছি বাপুজী, পীতম ফেরবার সময় তার ঘোড়ার পিঠে আমাকে চড়িয়ে নিজে একটা অন্য ঘোড়ায় চড়ে, পিছনে আমার ঘোড়াটাকে মেরে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমি ঘোড়ায় চড়তে জানতাম। কিন্তু বড় ঘোড়ায় এত জোর ছোটা ছুটি নি। আমি দুই হাতে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরে এসেছিলাম। দলের লোক খুব হেসেছিল। আমাদের ঘরের মেয়ের মধ্যে মা ছিল, বাবার চাচেরা বহিন আমার ফুফু ছিল। তারা হেসেছিল বেশী। পুরুষ ছিল ফুফুর এক মামা। বয়েস অনেক, বুড়া। সে আমাদের দাদো, সে তো হো হো করে হেসেছিল।

এগিয়ে আসতে আসতে বলেছিলাম, মর মর যাউঙ্গী।

সে বলেছিল, যা তু মর যা। এমনি যদি মরে না যাস তো তোকে খুন করে খাদে ফেলে দেব বলেই তো এনেছি।

বলে আমার ঘোড়াটাকে আর না মেরে থামিয়ে আমাকে নামিয়ে আদরের লাঞ্ছনায় আমায় নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল।

গাঁওয়ে আমরা ফিরলাম। তারা দলবল নিয়ে সেই রাত্রেই ফিরে গেল।

আমাদের গাঁওয়ে হাওয়া ফিরল। মুসলমান জাঠ সবাই গেল সরদারের কাছে। উত্তমকে আসতে দেওয়া হোক। সে গাঁওয়ের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে।

সরদারকে বলতে হল, আচ্ছা বেশ।

আমার বাপ জামাইয়ের নামে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পীতম এল না। আসা হল না। সে তখন ইস্কুলে পড়ছে। পীতমের দাদো বললে, লেখাপড়া শিখুক। গাঁওয়ে যাওয়া হবে না। গোঁয়ার চাষা বনে যাবে। বউকে বরং সময় হলে নিয়ে আসব। তাকে যেন তরিবৎ শেখানো হয়, কিছু কিছু লেখাপড়া শেখানো হয়। পীতমকে ফৌজে ঢোকাব, আপসর করে ঢোকাব। এখানকার পড়া হলে কলেজে দেব ওকে, ফৌজী কলেজে।

বাপুজী, এইটুকু তোমাকে আমি বলি নি।

কেন জানি না, শরম লেগেছিল। না, ওই ঘটনাগুলোকে বলবার মত মনেই করি নি। এসব কথা সেদিনও মনে হয়েছিল তাতে খানিকটা শরম হয়েছিল, আর নিজেই নিজেকে বলেছিলাম, এ আবার বলবার মত কথা নাকি? ওসব তো শ্লেটের উপর খড়ির লেখার মত। কত দুর্যোগের পানি বর্ষালো, কত আঁখের আঁসু ঝরল, তাতে ধুয়ে গেছে বেমালুম— বিলকুল। তবে এই শেষ চিঠি আমার, গোটা জিন্দিগীর জবানবন্দি। সত্যমিথ্যা সব কিছুর হিসাব ফিরিস্তি একটা কথা, বেশরমীর মত শোনাতে পারে তোমার কাছে, তবে দুনিয়ার মালিকের কাছে তো শরম নেই। শরম করলে চলবে না তাই বলছি, আমার জিন্দিগীতে পীতম শুধু দশ বছরের কনের চৌদ্দ পনের বছরের নামের বর নয়।

সে আমার জীবনের সত্যকারের দুর্দান্ত পুরুষ। তার নির্যাতন প্রহার সমাদর উপহারের কথা ধোয়া শ্লেটের কালো বুকে কেটে বসে যাওয়া দাগের মত। অস্পষ্ট কিন্তু দাগ পড়েছে।

এ কথাগুলো বলি নি তোমাকে। মনে পড়ছে তোমার, সেদিন যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি মধ্যে মধ্যে থেমে থেমে বলেছিলাম। থেমেছিলাম এই কথাগুলোতে এসে। নিজে মনে করছিলাম, একটি ভারী মিঠা কৌতুক বলে মনে হয়েছিল; থেমে হিসেব করে কতটা বাদ দেব ভেবে নিয়ে ফের বলেছিলাম। প্রথম দিন যেদিন ঝুটা বাপের পরিচয় দিয়েছিলাম, এক শিল্পপাগল বিপত্নীক আমীর আমার বাপ ছিল বলে (যেটা ইদানীং সর্বত্র দিতাম) সেদিন তোমাকে এই মেলার হুজ্জোতের কথাটা বলেছিলাম।

পরে যেদিন সত্য পরিচয় দিই সেদিন বিয়ের কথা বলেছিলাম এই কথাগুলি বাদ দিয়ে। আমার এই জীবনের এই পালায়, যে পালায় বাপ মা সব কিছুকে পিছনে ফেলেছি বাপুজী, তাদের চোখে দেখতে পেতাম, তাদের দুঃখ কষ্ট সব চোখে দেখেও পিছনে ফেলেছি যেখানে সেখানে সেই গ্রাম্যজীবনের দশ-এগার বছরের অপরিণত নারীত্বের স্বাদ স্মৃতির কতটুকু দাম? তাই বলি নি।

তারপর লাগল হাঙ্গামা; দেশ ভাগ হল। আগুন জ্বলল। কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানা এল। হিন্দুস্তানের জোয়ানেরা ছুটল রুখতে। আমাদের এলাকা জম্মু হলেও পাকিস্তানের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত মাইল। কাশ্মীরের মধ্যেও হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া তখন। ও এলাকাও পাঞ্জাবের বেহদ্দ হয়ে গেল। গরীবদের দেশ ছাড়তে হল। প্রথমে খবর এল, পীতমের দাদোর গাঁয়ে বড় হাঙ্গামা হয়েছে। দাদোর বাড়ি লুঠ হয়েছে। দাদো বন্দুক নিয়ে লড়াই করবার সময় গুলি খেয়েছে। পীতম জখম হয়েছে। পীতমের বাপু ছুটল। আমার যাওয়ার মত মন ছিল না, তখন ভয়ে কাঁপছি। পীতমের মাও যায় নি। দু' দিন পর খবর হল ওরা এই দিকে এগুচ্ছে। হানা আসবে। আসছে। সকলে দেশ ছাড়ল। শুধু ভয় নয় বাপুজী। দেশে তখন সব হয়ে গেছে। গঁহু নেই, জোয়ার নেই, কাপড়া মেলে না। ভুখা—ভুখা—ভুখা। আর ভয়—ভয়—ভয়। ঠিক হল—চল দেশ ছেড়ে। কোথায়?

—হিন্দুস্তানের যেখানে হোক।

এলাম চলতে চলতে দেহলী। লালকিল্লা, জামা মসজেদ; কুতুব মিনার; দিল্লী কটক, আজমীর ফটক, কাশ্মিরী ফটক, বাপ রে বাপ।

বাসা হল ফুটপাথে; দিল্লীর রোদ দিল্লীর শীত ওই ফুটপাথে শুয়ে পোয়াতে লাগলাম। মনে আর কিছুই রইল না। শুধু ভিক্ষে। আর ভুখা। আর জীবনের দুঃখ। ধরম ইজ্জত সব তো চোখের উপর দেখলাম যেতে লাগল দামড়ির দামে। সরকার থেকে কিছু কিছু টাকা মিলত কখনও কখনও; কিন্তু নিয়মিত টাকা মেরে দিত দালালে আর চোর লোকেরা। সরকারী লোকও তাদের সঙ্গে ছিল।

আজ এখান, কাল ওখান। ওই দালালেরাই চালান করত চুরির সুবিধের জন্য। আর লোক তো পঙ্গপালের মত। দিল্লীতেও তখন হাঙ্গামা চলছে। আজ নেভে কাল জ্বলে। যখন জ্বলে তখন কিছু কিছু মুসলমান পালায় পাকিস্তান। আমরা এসে পড়লাম জি বি রোডের কাছে। গান গেয়ে ভিক্ষে করতাম। ক্রমে ক্রমে মনে আগুন ধরল। প্রথম ধরল বাপুজী,

দিনের বেলা দিল্লীর সাজপোশাক-করা বেটীদের দেখে। একদিন কাছে একটা ইস্কুলে ওদের অভিনয় হচ্ছিল। আমি ঢুকে পড়েছিলাম কোন রকমে গলে। দেখে মনে হল, অয় খুদা, এই নাচগানের জন্যে এদের এত সাজ এত রঙ, এত সরঞ্জাম, এত রোশনি! হায়, হায়, হায়! তারপর দেখলাম বাঈজীদের। হায়, হায়, হায়! কি সুখ ওদের! কত আরাম! কত মজা! আর আমি ঘুরছি পথে পথে।

একদিন গিয়ে ধরলাম সেই একটা লোককে যাকে দেখতাম বাঈজীদের বাড়িতে ঢোকে বের হয়। সে আমাকে নিয়ে গেল এক প্রৌঢ়া ব্যবসাদারনীর কাছে। রাখবে একে? ও নিজে বলছে, বাঈজী হবে। গান জানে, বলছে নাচও জানে। নাম বলছে হরিপীতম। এই ফুটপাথে থাকে। কাশ্মীরী।

বাঈজী হেসে বললে,—এখানে আসার মানে জানিস? বুঝিস?

বলেছিলাম, জানি। বুঝি।

—বল তো।

আমি তোমার মন্দ মেয়ে বাপুজী। আমি মাথা হেঁট করে অবশ্য বলে দিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আচ্ছা। বহুত আচ্ছা।

তারপর প্রশ্ন করেছিল, ভয় করবে না?

—না।

—কিন্তু এতে পাবি কি?

—অনেক টাকা। ভাল কাপড় পোশাক।

—ঠিক আছে। আচ্ছা, গানা শোনা তো।

গান শুনে সে বলেছিল, একে এখন থেকে বরবাদ করিস নে। ওকে গানা শিখতে দে। এর হবে। ওর নাম দে রৌশন। বাপুজী, বরবাদ, একদম বরবাদ হয়ে যেতাম কিন্তু এই গান বাঁচিয়ে দিলে। বাপুজী, লাল কুঁয়রের গল্প তখন জানতাম না। তা হলে সেদিন মনে মনে ভাবতাম, লাল কুঁয়র হব। তখন তো জানতাম না, আজাদ হিন্দুস্তান ডেমোক্রেটিক দেশ, এখানে বাদশা নেই সে আমলের মত কিংবা কাশ্মীরের মত রাজাও নেই।

এরপর পুলিস হানা দিলে। উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

তখন ওই পরিচয় তৈরি করলাম। আমি এক শিল্পপাগল আমীরের বেটী। নইলে আবার যেতে হত সেই ফুটপাথে। উধম সিং জন্মদাতা বাপ, তার সঙ্গে তার দারিদ্র্যের জন্যে এর আগেই তো সম্পর্ক ছিঁড়েছি। আবার কেন? আর ফিরে যাওয়া যায়? বাঈজীর বাড়িতে তখন কিছু সাজগোজ রঙচঙএর স্বাদ পেয়েছি, সামনে দেখেছি সে যেন রঙমহলের দরওয়াজা খোলা। ভিতরটা ঝলমল করছে। সাড়ে দশ বছরে এসেছি দিল্লী। এখানে এসেছি এগার বছরে, তখন বয়স বারো। আর কয়েক বছর গেলেই ওই দরওয়াজায় ঢুকবার সময় হবে, এক্তিয়ার মিলবে। আমি ঢুকে গিয়ে রানী হয়ে বসব। এ স্বপ্ন ভাঙল। পুলিস পাঠালে

অনাথ আশ্রমে। সেখানে মেজাজ খারাপ হল। পালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন মিলল একখানা পিতলের থালা, সেটা লুকিয়ে রেখে দিলাম ; একটা পেরেক আর পাথর যোগাড় করে তাতে ছবি আঁকলাম। সেটা পড়ল অনাথ আশ্রমের মেট্রনের হাতে। সে বললে, আর কি পার ? আমি খড়ি নিয়ে ছবি এঁকে দেখালাম।

এর থেকে বদলালো জিন্দিগী। পাঠালে ওরা রেফ্যুজীদের শিল্প-শিক্ষার সেণ্টারে। সেখান থেকে আর্টস ক্র্যাফ্‌ট্‌সের মাস্টের তলায়। স্টাইপেণ্ড মিলল।

শিখলাম এখানে, অনেক শিখলাম। বুদ্ধি ছিল, ওই কাজে দখল ছিল। তাড়াতাড়ি শিখলাম। আর শিখলাম সাজপোশাক, নতুন জিন্দিগীর মানে। বাপুজী, এসব শিখতে আমার দেরি লাগে নি। জলদি জলদি শিখেছি। আর আমার মনের সাধ বেড়েছে। অনেক, অনেক চাই আমার। অনেক। তার সঙ্গে শিখলাম মেয়েদের কাছে হাসতে চলতে, পুরুষদের নিয়ে খেলতে। ওঃ কি যে মজা, কি যে আনন্দ! ঠকাতে কি করে হয় জানতাম। ছেলেবেলাতে নিজে শিখেছিলাম। আবিষ্কার করেছিলাম সেই শিখ ছোকরাকে ঠকিয়ে। ও হয়তো সব মেয়েই জানে। কিন্তু সব মেয়ে তো আমার মত মন্দ নয়। ওটাকেই পেশা করে না। সব মেয়েই একজন বা দুজনকে ঠকায়। আমি আর্টস ক্র্যাফ্‌ট্‌সের সঙ্গে সাজগোজ, একালের সব রুচি সব রঙএর সঙ্গে, সব লোককে ঠকিয়ে এ দুনিয়ার কৌতুক রসে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যাব বলে নেমে পড়লাম।

বাপ মা ভুলে গেছি। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না।

তুমি যেদিন মা বল সেদিন ভারী খারাপ লেগেছিল আমার।

হঠাৎ বাপুজী, আমাকে যেন কে টেনে ধরলে। ডুবে গিয়ে যেন জল খেলাম খানিকটা। চমকে গেলাম একদিন। আর্টস্ ক্র্যাফ্‌ট্‌স থেকে বেরিয়েই দিনকতক কাজ পেয়েছিলাম সরকারী ডেকরেশনের ইউনিটে। একদিন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একটা প্যাণ্ডেল সাজাবার কাজে ছিলাম। ফাংশন ছিল। ডিফেন্স মিনিস্টার কয়েকজন জোয়ান আর অফিসারকে মেডেল দেবেন।

প্যাণ্ডেলে আমি আর কজন ছিলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাজসজ্জা নিখুঁত করে রাখবার জন্য। এটা পড়ে যায়, ওটা সরে যায়, সেটা বেঁকে যায় হেলে যায়, সেগুলোকে ঠিক করে দেবার ভার আমাদের। সব কটিই মেয়ে। তারা শোভাও বাড়ায়। খুঁটিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একের পর এক জোয়ানেরা এসে মেডেল ডেকরেশন নিচ্ছিল।

হঠাৎ শুনলাম, লেফ্‌ট্‌নাণ্ট পীতম সিং!

চমকে উঠলাম। পীতম সিং!—

দেখলাম ছ ফুট লম্বা জোয়ান। দাড়ি কামানো, সুচলো গোঁফ, সবল পদক্ষেপে এসে পায়ের জুতোয় জুতোয় খট শব্দ করে দাঁড়িয়ে মিলিটারী স্যালুট করলে। আমি দেখেছিলাম। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কিসের একটা স্রোত বয়ে গেল। সে আগুনের স্রোত না

হিমের স্রোত মনে নেই। কিন্তু নিদারুণ ভয় হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হল সামনে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর। কাঁধের নিচে সেই ছুরির দাগের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব করলাম। আমি বেরিয়ে পালিয়ে এলাম। এবং ওই জন্যেই আমার চাকরি গেল। তা যাক। পীতম আমাকে দেখতে পেলে খুন করবে। জীবনে যা করেছি তার জন্যে কোন অপরাধ-বোধ আমার ছিল না। বাপ উধম সিংকে দেখেও তা মনে হত না। কিন্তু পীতমকে দেখে আমার যে ভয় হল তার অর্থ ও ছাড়া আর কি হতে পারে। আমার যুক্তি তো সে মানবে না। যে ছুরি মেরে নিজের যুক্তিকে কায়েম করে, তার সামনে অপরাধ মেনে দণ্ড নিতে হয়, নয় পালাতে হয়।

মনে আছে তোমার, তোগলকাবাদে সেই কুলুঙ্গিতে বসে থাকা? তার কারণ শুধু হুঁচোট লাগা নয়। একদল জোয়ান এসেছিল সেদিন সেখানে। তোমার এও মনে আছে বোধ হয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে একদল জোয়ান এসেছিল তারা চলে গেছে? ওদের আমার ভাল লাগে না।

তুমি প্রতিবাদ করেছিলে।

যেদিন তোমাকে সব কথা বলে শেষ বিদায় নিয়ে আসি সেদিনও আমি রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজের মার্চ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, পীতম আছে কিনা? অথচ পীতমের থাকার কথা নয়।

পীতমের তখন আর্মি থেকে চাকরি গেছে।

কেন জান?

কাশ্মীর শ্রীনগরে সে একজন আধুনিকা তরুণীর হাত চেপে ধরেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, কে তুমি? কি নাম তোমার?

সে তাকে ধমক দিয়েছিল, ছাড় অসভ্য কোথাকার!

—নাম না বললে ছাড়ব না।

মেয়েটির চেঁচামেচিতে লোকজন আসে। মিলিটারী পুলিস আসে। তাকে অ্যারেস্ট করে। সে বলেছিল, ওর নাম হরিপীতম, আমার স্ত্রী, হারানো স্ত্রী। ওর বুকে আমার নাম লেখা আছে উল্কিতে—পীতম।

কোর্টমার্শালে পীতমের শাস্তি হয়। চাকরি যায়।

আমার ভয় বেড়ে গিয়েছিল বাপুজী। পীতম হরিপীতমকে আজও খুঁজছে। তাকে কে বোঝাবে হরিপীতম জন্মান্তরে রোশন হয়ে জন্মেছে। আগের জন্মের স্বামীত্ব পরজন্মে দাবি করা চলে না। কোন মুলুকে কোন আইনে নেই। বিধাতাও এ দাবী স্বীকার করেন নি। এ হয় না।

আমি এর পর দিল্লী থেকে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। কোথায় যাব? বম্বে সিনেমায় যদি নামতে পাই! তা হলে সব পাব। সব। অর্থ পাব সুখ পাব, তামাম লোকের মনোহারিণী প্রিয়া হব।

দাদাসাহেব আমার পরম উপকারী। তুমি স্নেহ করেছ। দাদাজী করুণা করেছে, উপকার করেছে। চিঠি নিয়ে বোম্বে গেলাম। পার্ট পেলাম। ছোট পার্ট। গাঁয়ের গল্প, এক চাষী বউয়ের পার্ট। নায়িকার ভাইয়ের বউ। ঘরে ননদ এবং অন্য মেয়েদের সঙ্গে একটু নাচও ছিল।

পার্ট আমার ভাল হল না। কিন্তু তবু দমলাম না। ঘুরতে লাগলাম। অনেক মূল্য দিলাম। অনেকজনের সঙ্গে ড্রিংক করতে হল, মোটরে বেড়াতে হল। হোক, পার্ট আমার চাই।

হঠাৎ একদিন বাপুজী সমুদ্রের ধারে জুহুতে ছবির রাজ্যের একজনের সঙ্গে পরিহাস লাস্যের স্তাবকতা করছি, সে এসে সামনে দাঁড়াল।

আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম।

—হরিপীতম!

চোখে গগল্‌সটা পরে বললাম, কি বলছ? কাকে বলছ?

—তোমাকে? তুমি হরিপীতম।

—না।

—তোমার নাম তো কৌশন।...ছবিতে বহু সেজেছ? তাই বা বলতে হবে কেন। তুমি হরিপীতম। তোমার বুকে আমার নাম লেখা আছে।

সে হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার জামা। বাধা দিলে আমার সঙ্গী। একটা ঘুষি মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আমার জামা ধরে টানলে, আমি প্রমাণ বের করব। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। একা তার কত শক্তি! সে চেঁচাতে লাগল, দুনিয়া ঢুঁড়ছি ওর জন্যে। হরিপীতম! ওর জন্যে আমি নরকে যেতে হয় যাব। ছাড় আমাকে। চিৎকার করে ডাকলে, হরিপীতম! হরিপীতম!

গোলমালের মধ্যে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম। শুধু জুহু থেকে নয়, বম্বে থেকে। খবর অবশ্য পেলাম, পুলিস আমার খোঁজ করেছে। সাক্ষী দিতে হবে। আমি পালিয়ে গেলাম কলকাতা। তাতে মামলা আটকাল না। মারপিট এবং আমার হাত টানার সাক্ষীর তো অভাব হয় নি। ওর জেল হয়ে গেল আট মাসের।

সে বলেছে শুনলাম, আদালতে, হরিপীতম আমার স্ত্রী, তাকে আমি খুঁজছি। সে আমার কাছ থেকে পালাচ্ছে। আমি তাকে সেদিন ধরেছিলাম। তার বুকে আমার নাম লেখা আছে পীতম। আমার বুকে তার নাম হরিপীতম। তাকে পেলে যে দণ্ড নিতে হয় নেব। স্বর্গ নরক যেখানে সে যাবে তার পিছন পিছন যাব। তাকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি। পেতেই হবে তাকে আমাকে।

আট মাস জেল শুনে সে বলেছিল, বহুৎ আচ্ছা, আট মাস পর তাকে ধরব আমি। যদি শুনি সে মরেছে তবে আমিও মরে তার পিছনে ছুটব।

বাপুজী, আমার সারা জীবনটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে গেল সেই দিন। আট মাস

আগে। নিরাশ্রয় হয়ে পথে দাঁড়ালাম। যেন সেই দিল্লীতে এসে সেই ফুটপাথের ধারে বাসা বাঁধলাম মনে মনে।

তোমাকে বলেছিলাম, আমি কারুর জন্যেই, মা বাপ সে যে-ই হোক, কারুর জন্যেই ওদের জীবনে ফিরে যেতে পারি না। পারব না। কেন যাব? অর্থহীন। আমি মডার্ন মন্দ মেয়ে রৌশন বাপুজী; সেই আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, বাপুজী, দুনিয়ায় মেয়েরা বাপ ভুলতে পারে, মা ভুলতে পারে, সন্তানও ভুলতে পারে কিন্তু তার সেই দিলের আদমী প্রাণের পুরুষকে ভুলতে পারে না। দয়া মায়া স্নেহ মমতা সব ভোলা যায় ভুখের রোটীর জন্যে, দুনিয়ার সুখের জন্যে, আরামের জন্য, খাতিরের জন্যে; ভোলা যায় না মহব্বতি, যে প্রেম পুরুষের পৌরুষ সাহস শক্তি প্রতিষ্ঠা আর ওই মেয়ের জন্য সব দিতে পারার ত্যাগস্বীকার দিয়ে জড়ানো।

বাপুজী, আমার মনপ্রাণ চীৎকার করতে লাগল, পীতম—পীতম—পীতম। পীতমকে চাই। পীতমকে চাই। পীতম!

মনে করলাম জেলে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু সাহস হল না। বম্বে গিয়ে ফিরে এলাম এসে করলাম কি জান?

সাহাদারার ওই দিকে গিয়ে গাঁয়ের মেয়ের জীবন অভ্যাস করতে লাগলাম। লম্বা চুল রেখে শুরু করলাম গাঁয়ের জীবন। হরিপীতম পীতম সিংয়ের স্ত্রী।

কিন্তু পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না। সহ্য হয় না, হল না। আমার তপস্যা সিদ্ধ হল না। এই জীবন ছাড়তে পারছি না। নানান মানুষ এমনভাবে আমাকে এই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, তারা টানছে। যেমন সেইদিন রাত্রে হোটেলে এক বদমাশ আমাকে জড়িয়েছিল। নানান অভ্যাস আমাকে বেঁধেছে। দেবে না। তারা আমাকে পীতমের কাছে যেতে দেবে না। আমি কি করব?

কাল সে খালাস পাবে: আমার হিসেব সঠিক। রেমিশন বাদ দিয়ে হিসেব করেছি আজ সাত দিন ভাবছি, কাঁদছি।

পীতমকে পেতেই হবে। মহব্বতি ভোলা যায় না।

কিন্তু এ জীবন আমাকে ছাড়বে না।

তাই জীবন থেকে ছুটি নেব। সংকল্প স্থির হতেই মন শান্ত হয়ে গেল। উঁচু থেকে নিচে নামতে হবে তো! তাই কুতব থেকে—।

নমস্তে পিতাজী।

তোমার মন্দ মেয়ে
রৌশন

কেটে দিয়ে লিখেছে, হরিপীতম!

গল্প

বন্দিনী কমলা

রাজহাটের রায়বাড়ি প্রাচীন বনিয়াদী ঘর। কোম্পানির আমল হইতে বহু বিস্তীর্ণ জমিদারি। সংসারটিও বিপুল।

ভাদ্রমাসের দিন, রায়বংশের সেজ তরফের বড় মেয়ে বনলতা সিমেন্ট-বাঁধানো মেঝের উপর সুবিপুল দেহখানি এলাইয়া দিয়া নিথর হইয়া পড়িয়াছিল, স্পন্দনের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতেছে আর মধ্যে মধ্যে গালে-টেপা পান দুই-একবার মুখের মধ্যে নাড়িতেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারিটা বাজিয়া গেল। বনলতা একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিয়া শ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিল, নলে! নলে!

নলে—নলিনী, সেজ তরফের ঝি। নলিনীর সাড়া পাওয়া গেল না। নীচে রান্নাশালে ঠাকুর-চাকরেরা গোলমাল করিতেছে। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। রায়বাড়ির অনেক বিশেষত্বের মধ্যে এই একটি বিশেষত্ব। খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয় দেড়টায়—ছেলেরা খায় দেড়টায়, বাবুরা খান আড়াইটায়, মেয়েরা সাড়ে তিনটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উঠেন, তারপর চাকর-বাকরদের পালা পৌনে চারিটা, চারিটায়।

বনলতা আবার ডাকিল, নলে—ও নলে!

বড় তরফের ঝি কামিনী দরজার সম্মুখের বারান্দা দিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল, সে সাড়া দিল না। বনলতা উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ডাকিতেছিল, দেখিতে পাইল না, পায়ের শব্দ শুনিয়াও ফিরিয়া চাহিল না।

সে আবার ডাকিল, নলে! নলে! অ নলে!

এবার একটি তরুণী বধূ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, কী বলছেন দিদি? বড় তরফের কনিষ্ঠা বধূ, সদ্য বিবাহিতা।

বনলতা ফিরিয়া না চাহিয়াই বলিল তোমাকে নয়, নলেকে ডাকছি।

বধূটি চলিয়া গেল। বনলতা আবার ডাকিল, অ—নলে!

বধূটি তেতলায় উঠিয়া গেল, একদিকের খোলা ছাদের উপর ভাদ্রের রৌদ্র মাথায় করিয়া বড় তরফের বড় মেয়ে পান ও দোক্তা হাতে চরকির মত অবিরাম ঘুরিতেছে। সে পাগল, অমনি করিয়া ঘোরাই তাহার ব্যাধি। মধ্যে মধ্যে পান-দোক্তা খায়, বিড়বিড় করিয়া বকে, ফিকফিক করিয়া হাসে—আর অবিরাম ছাদের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। তরুণী বউটি এ বাড়িতে সদ্য আগত, পাগলকে দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন হাঁপাইয়া ওঠে, কান্না পায়। ছাদটা অতিক্রম করিয়া তেতলার মহলে যাইতে হইবে, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পাগল এদিক হইতে ওদিকে পৌঁছিবামাত্র দ্রুতপদে ছাদটা অতিক্রম করিয়া গেল। নলিনী ঝি সেজগিন্নীর পা টিপিতেছিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছে। মৃদুস্বরে বধূটি ডাকিল, নলিনী!

নলিনী কথা বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কী?

—বনলতাদি ডাকছেন তোমাকে।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে নীচেকার ঠোঁটটি উল্টাইয়া দিল, পরক্ষণেই বিরক্তিভরা মুখে অতি সন্তর্পণে সেজগিন্নীর পা-খানি কোল হইতে পাশের পা-বালিশের উপর নামাইয়া রাখিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছিল, কিন্তু পা-খানি নামাইয়া দিবামাত্র আরক্ত চোখ মেলিয়া তিনি তাকাইয়া দেখিলেন। নলিনী বলিল, বনোদি ডাকছেন, শুনে আসি।—সেজগিন্নীর চোখ বন্ধ রইল। নলিনী নীচে চলিল—সঙ্গে সঙ্গে বধূটি। বধূটির বড় মুশকিল হইয়াছে, সে যেন মাটির জীব, সমুদ্রতলের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ রাজ্যের নিয়মকানুন সব আলাদা! দিনে বেচারার ঘুমানো অভ্যাস নাই, কিন্তু বেলা তিনটার পর হইতে বাড়িখানা পর্যন্ত যেন ঘুমে ঝিমাইতে থাকে। জাগিয়া থাকে এক পাগল—তাহাকে তাহার বড় ভয়। দোতলার সিঁড়িতে আসিয়াই শোনা গেল, অ—নলে! নলে! বনলতা সেই সকরুণ শ্রান্ত সুরে ডাকিতেছে।

নলিনী বলিল, মর তুমি! মর! ভোঁসকুমড়ি কোথাকার!

বধূটি অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই বনলতার ঘরের সম্মুখে তাহারা পৌঁছিয়া গেল; বনলতা তখনও চোখ বন্ধ করিয়া ডাকিতেছে, নলে!

—কী দিদিমণি? আমি সেজমা'র পা টিপছিলাম।

বনলতা কোনো কৈফিয়ৎ দাবি করিল না, চোখ মেলিয়া অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া একটা হাত প্রসারিত করিয়া হাতদশেক দূরে মেঝের উপর নামানো একটা রূপার কৌটা দেখাইয়া বলিল, দোক্তার কৌটোটা দে—

নলিনী তাড়াতাড়ি কৌটাটা বনলতার কাছে আনিয়া নামাইয়া দিল।

বনলতা বলিল, আর একখানা পাতলা চাদর আমার গায়ে ঢেকে দে তো!

বধূটির বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না, সে বলিল, গরম লাগবে না দিদি?

—বড় মাছি লাগছে।

নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা চাদর আনিয়া বনলতার সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। বধূটি বলিল, একটু বাতাস করব দিদি?

—তুমি আর জ্বালিও না ছোট বউ! কেবল কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান! তুমি বাতাস করবে কেন? ঝি-চাকর থাকতে বউয়ে বাতাস করে নাকি?

ঘড়িতে ঢং করিয়া আধ ঘণ্টা বাজিল, বেলা সাড়ে চারিটা। বাড়িটাতে যেন জনমানব নাই; কেবল কতকগুলা অস্বাভাবিক শব্দ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনে নাকডাকার শব্দ। নিচে কয়টা কাক উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া কলকল করিতেছে। ঝি-চাকরেরা ঘুমাইতেছে।

বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া বউটি দাঁড়াইয়া ছিল—সহসা তাহার হাসি পাইল; কাহার নাক ডাকিতেছে ঘোঁ-ঘোঁ-পট-পট ফু—ৎ! পিছনে ঘরের মধ্যে বনলতাদিদিরও নাক ডাকিতে শুরু হইয়াছে। সহসা রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াই বধূটি চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নাকের ভিতর এবং তালুতে আলা

করিয়া উঠিতেই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া শূন্যমনেই জনশূন্য উঠানটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির মধ্যে মানুষের সাড়া জাগিয়া উঠিল—কেহ যেন সুর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছে। বাড়ির গিন্নী অর্থাৎ বাবুদের মা এতক্ষণে দেবদর্শন করিয়া ফিরিলেন, টোলের পণ্ডিত তাঁহাকে গীতা শুনাইতেছে। গীতা শুনিয়া ঠাকুমা জল খাইবেন, তারপর তাঁহার রান্না চড়িবে, ঠাকুমা ততক্ষণ তাঁহার নিজের এস্টেটের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ শুনিবেন। খাইবেন বেলা ছয়টায়, তারপর আরম্ভ হইবে দিবানিদ্রা ; দিবানিদ্রা সারিয়া উঠিবেন রাত্রি দশটায়। তারপর আরম্ভ হইবে মহাভারত পাঠ। রাত্রি বারোটায় সান্ধ্যকৃত্য শেষ করিলে পর তাঁহার রাত্রের খাবার তৈয়ারী হইবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ির নাতি-নাতনী, ছেলে-বউ প্রত্যেকের সংবাদ লইবেন—আর বুড়ী ঝি দামিনী তাঁহার পায়ে তেল দিবে। শুইবেন রাত্রি দুইটার পর। বধূটি অকস্মাৎ খুকখুক করিয়া হাসিয়া উঠিল, ঠাকুমার সে কি নাকডাকা বাবা রে! সেদিন শেষরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। বিকট শব্দে ভয় পাইয়া স্বামীকে জাগাইয়া বলিয়াছিল, ওগো—ও কিসের শব্দ ?

এক মুহূর্ত শুনিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইয়া তাহার স্বামী বলিয়াছিল, ঠাকুমার নাক ডাকছে!

ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। সে আবার বলিতে গিয়াছিল, না, তুমি ভালো করে শোন।—কিন্তু তখন তাহার স্বামীরও আবার নাকডাকা শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার ভাগ্য ভালো যে স্বামীর নাক ডাকে মৃদু শব্দে ফুরুর—ফুরুর!

সে সাহসী মেয়ে ; ভয় বড় একটা সে পায় না। সে সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্বনাশ। বাড়িতে যেন নাকডাকার কোরাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঘোঁ ঘোঁ! ঘড়র-ঘড়র-ঘোঁ! ঘড়র-পট-পট-ফুৎ! আরও কত রকম—মুখে শব্দ করিয়া তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। সমস্ত ধ্বনিকে ছাপাইয়া ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে—ব্যাণ্ড-বাজনার জয়ঢাকের মত।

স্মরণ করিয়া বধূটি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণী-কণ্ঠের হাস্যধ্বনি কিছুক্ষণ বাড়িটার খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিল। সহসা গম্ভীর স্বরে কে প্রশ্ন করিল, কে ?

বধূটি লজ্জায় মরিয়া গেল। মেজ খুড়শ্বশুরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বনলতার ঘরে ঢুকিয়া কপট নিদ্রায় কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মেজ শ্বশুরের পায়ের সাড়া বারান্দাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পদশব্দ তেতলায় উঠিয়া গেল।

পাগলী আর্ত চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।

মেজ শ্বশুরের রুষ্ট কণ্ঠস্বর, তুই হাসছিলি! কাকে দেখে হাসছিলি ? বল্—বল্!

প্রচণ্ড জোরে চড় মারার শব্দ। পাগলী বোবা জানোয়ারের মত চীৎকার করিতেছে। বধূটির একবার ইচ্ছা হইল, উঠিয়া গিয়া মেজ শ্বশুরকে বলে, আমি হাসিয়াছি, ও নয়। কিন্তু তাও সে পারিল না।

বনলতা যতক্ষণ না উঠিল, ততক্ষণ সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়িটা আবার জাগিয়া উঠিল। সে জাগিয়া ওঠা যেমন-তেমন নয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে লঙ্কায় যেমন সোরগোল উঠিত, তেমনি সোরগোল তুলিয়া জাগা। ছোট্ট ছেলেদের চীৎকার-হাসি-কান্না, বধূ ও কন্যাদের হাসি, ঝি-সম্প্রদায়ের বাসনমাজা ও ঝাঁটার শব্দ, কথা-কাটাকাটি, গিন্নীদের ঝি-চাকরকে আহ্বান—বাড়িটাতে যেন তুফান উঠিয়াছে।

—বড়বাবুর দুধ নিয়ে আয়, মানদা। ঠাকুরকে বল ছেলেদের জলখাবার নিয়ে যাবে। —বড়গিন্নী হাঁকিতেছিল। বধূটি এইবার উঠিল। বনলতা তখন উঠিয়া বসিয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, কী হে ছোট গিন্নী, তুমি যে দিনে ঘুমোও না। আমাকেও যে হার মানালে হে!

মৃদুস্বরে বধূটি বলিল, আমি ঘুমুই নি।

—ওই হল হে হল! ছিল না কথা হল গান, আজ না হয় হবে কাল। দিনে শুলে তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে বল, আজ শুয়েছ, কাল ঘুমোবে। বনলতা গোটা দুয়েক পান ও খানিকটা দোক্তা মুখে পুরিয়া কথা বন্ধ করিল।

বউটি উঠিয়া শাশুড়ীর কাছে তেতলায় চলিল। একটা চাকর হনহন করিয়া বারান্দা দিয়া ওদিকের মহলে চলিতেছিল, বনলতা তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া উঠিল, হরে! ও হরে, শোন্!

—আমার এখন সময় নাই বাপু।—তবু হরিচরণ দাঁড়াইল।

—মেজ জ্যাঠার সিদ্ধি নিয়ে যাচ্ছিস বুঝি?

—হ্যাঁ। বাবু এখনি চেঁচামেচি করবে—কী বলছেন বলুন!

—আমাকে একটু সিদ্ধি দিয়ে যা, পেটটা বড় খারাপ হয়েছে। এই এতটুকু।

মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া হরিচরণ বলিল, কই গেলাস বার করুন!

বধূটি যাইতে যাইতেও কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। বনলতা বলিল, খাবে ভাই ছোট বউ? ভারি মজা হয়—যা হাসি পায়, সব ঘোরে, সব ঘোরে!

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় বউটির সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল—যেন পলাইয়া গেল।

বনলতা বলিল, মেয়ে আনতে হয় সমান ঘর থেকে। এ বউটা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে কিনা—

বাধা দিয়া হরিচরণ হাসিয়া বলিল, যেতে দেন দিনকতক দিদিমণি, তারপর—

সিদ্ধি ঢালিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। বনলতা সিদ্ধিটুকু নিঃশেষে পান করিয়া আবার পান-দোক্তা মুখে দিয়া উঠিল। নিচে হাঁসের প্যাক-প্যাক শব্দে বাড়িটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশটা রাজহাঁস বাড়ির উঠানে আসিয়া কলরব করিতেছে। উহাদের খাবার দিতে হইবে। হাঁসগুলি বনলতার বাপের সম্পত্তি। বড় জ্যাঠার ছিল ঘোড়া, সে ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে। এখন আছে কেবল একটা ময়না, একটা চন্দনা, একটা কাকাতুয়া, গোটাকয়েক কাঠবেড়ালী, দুইটা খরগোশ। মেজ জ্যাঠার আছে

শ-দেড়েক পায়রা। বনলতার বাপের এই খ্রাস। ছোট কাকার গোটা আষ্টেক কুকুর।

পায়রা ও কুকুরের প্রতি ভীষণ ঘৃণা বনলতার। পায়রাগুলা যা ঘর নোংরা করে, আর কুকুর তো অস্পৃশ্য—ছুঁইলে স্নান করিতে হয়! রাজহাঁসগুলি যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি ডিম খাইতে সুবিধা। বড় জ্যাঠার শখের জিনিসগুলিও ভালো? ময়নাটা যা চমৎকার ধমক দেয়, হারামজাদা, শালা, শূয়ার কি বাচ্চা! চমৎকার!

বউটির নাম মণি—মণিমালা। এ বাড়িতে নাম হইয়াছে কাঞ্চনবউ। এ বাড়িতে বধূদের নামকরণ হয় প্রাচীন প্রথায়—মানিকবউ, রাণীবউ, মতিবউ, রত্নবউ, স্বর্ণবউ, আতরবউ, বেলাবউ, অর্থাৎ হীরা মণি মাণিক্য মুক্তা পান্না প্রভৃতি মহার্ঘ্য এবং আতর বেলা চাঁপা প্রভৃতি পরম আদরণীয় বস্তুর নামকরণ করা হয়।

কাঞ্চনবউ তেতলায় উঠিতে উঠিতেই শুনিল, তাহার শাশুড়ী ঝিকে বলিতেছেন, দেখ্ তো রে, কাঞ্চনবউমা কোথায় গেল!

কাঞ্চনবউ গতি দ্রুততর করিল। শাশুড়ী আপন মনেই বোধ করি বলিতেছিলেন, সমস্ত দুপুর মেয়ে কেবল ঘুরে বেড়াবে, সকলে ঘুমোবে আর কাগচিলের মত বউমা এখান-ওখান করে ফিরবে। বলে, অভ্যেস নেই! অভ্যেস থাকবে কোথা থেকে? গেরস্ত-বাড়ির মেয়েদের কি ঘুমোবার সময় থাকে!

কাঞ্চনবউ নতমুখে শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী বলিলেন, এই যে—কোথায় ছিলে সমস্ত দুপুর!

কাঞ্চনবউ চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, যাও, চুল বেঁধে কাপড়চোপড় কেচে নাও। ঠাকরুন ডেকেছে তোমাকে, আজ থেকে তোমাকেই লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেখাতে হবে। বাড়ির ছোট বউয়েই ও-কাজ চিরকাল করে।

তাড়াতাড়ি চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া লালপাড় গরদের একখানি শাড়ি পরিয়া কাঞ্চনবউ প্রস্তুত হইয়া শাশুড়ীর অপেক্ষা করিয়া রহিল, তিনিই তাহাকে বাড়ির গিন্নীর কাছে লইয়া যাইবেন।

নীচে খুব শোরগোল উঠিতেছে। রান্নাশালে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যস্ততা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বনলতা হাঁকিতেছে—সেই সুরে, সেই ভঙ্গিতে, নলে—অ নলে!

নলে এবার অল্পেই সাড়া দিল, যাই।

বনলতা বলিল, আসতে হবে না। আজ এত রান্নার তাড়া কেন রে?

—ছোট কর্তা শিকারে যাবেন তাই।

—কী শিকার রে? কোথায়?

—বনশূয়োর এসেছে নদীর ধারে। রেতে আউশ-ধান খেতে আসে—

বনলতা বাকীটা আর শুনিল না। বলিল, মরণ! পাখী-টাখী হলেও মানুষে খায়—শূয়োর মেরে কি হয়? অনর্থক জীবহত্যা!

রান্নাশালের পাশে বিস্তৃত সরঞ্জাম পড়িয়াছে। মেজবাবুর কাছে সরকারী সাহেব আসিয়াছে ; মেজবাবু এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার এবং আরও অনেক কিছু। তাহা ছাড়া বড়বাবুর বড় ছেলে, কাঞ্চনবউয়ের বড় ভাশুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারশ্যাল বসিয়াছে।

কাঞ্চনবউ অবাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড বড় বাড়ির প্রতিটি কোণে যেন তাহার জন্ম বিস্ময় লুকাইয়া আছে, রূপকথার মায়াপুরীর মত। এ বাড়ির লক্ষ্মীর ঘর সকলের চেয়ে বড় বিস্ময়। লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে নাকি বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছে, সে ঘরের দরজা কখনও খোলা হয় না ; বন্ধ দুয়ারের সম্মুখে ধূপ-প্রদীপ রাখিয়া অর্চনা করা হয়। কাঞ্চনবউয়ের কৌতূহলের সীমা ছিল না। মণি বাঙালী গৃহস্থঘরের মেয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই অভাবনীয় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে স্বচ্ছন্দ সাহসের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ; বড়দাদা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী, ছোটদাদা গান্ধীসেবক, কাঞ্চনবউ সকলের ছোট, শৈশবে মাতৃহীন হইয়া মেয়েটি এই উদাসীন সংসারে আরণ্যলতার মত জীবনের সকল প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন শক্তিতে বড় হইয়াছে। তাহার রূপ দেখিয়া তাহাকে এ বাড়িতে আনা হইয়াছে। কিন্তু এ বাড়ির মৃত্তিকার সকল রস, এ বাড়ির আকাশের সকল আলো-বাতাস তাহার জীবনের ধাতু-প্রকৃতির পক্ষে বিষ না হইলেও বিষম হইয়া উঠিয়াছে। তবু তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই, তাহার জীবনী-শক্তি কিছুতেই পরাজয় মানিতে চায় না। বড়গিন্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উলঙ্গ একটি বারো বৎসরের বালক। তাঁহার বড় ছেলের বড় ছেলে।

বড়গিন্নী এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন বড় ছেলের বড় ছেলেটিকে লইয়া। বারো বছরের ছেলেটিকে লইয়া বড় গিন্নীর ঝঞ্চাটের আর সীমা নাই। তাহার সমস্ত কিছু বড়গিন্নীকে করিতে হয়। অপটু মায়ের আট মাসের সন্তান ছেলেটি। আঁতুড়ে তাহাকে আঙুরের মত তুলায় মুড়িয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর বহু সযত্ন পরিচর্যায় বড় গিন্নী তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। এখন সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু তবু তো সে আট মাসে ভূমিষ্ঠ অপরিপুষ্ট ছেলে, সেই জন্মই সকালে বড়গিন্নী বুরুশ দিয়া তাহার দাঁত মাজিয়া দেন, জিভ ছুলিয়া দেন, মুখে কুলকুচার জল তুলিয়া দেন। খাওয়াইয়া তো দেনই—বেচারা এখনও নিজে হাতে তেল পর্যন্ত মাখিতে পারে না, সে-ও তাঁহাকে মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়। তাহারই পরিচর্যায় তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যায় একটা কবিরাজী তেল মাখাইবার ব্যবস্থা আছে, সেই তেল মাখাইয়া গা মুছিয়া উলঙ্গ ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিলেন, এস বউমা, শ্বশুরকে প্রণাম করে নাও, তারপর চল।

বড়কর্তা সান্ধ্যকৃত্য করিতেছিলেন। কুলধর্মে রায়েরা তান্ত্রিক, কিন্তু বড়বাবু শিবভক্ত। ঘরের বাহির হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—শিব-শম্ভু, শিব-শম্ভু! শঙ্কর, শঙ্কর!

বেচারা বধূটির সর্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর কি যেন খান। মদটা সে বুঝিতে পারে, কিন্তু ছোট কল্কেতে সাজিয়া চাকরটা কি যে তাঁহাকে দেয়। দুর্গন্ধে বাড়িটা সুদ্ধ ভরিয়া উঠে। কিন্তু উপায় ছিল না।

বড়কর্ত্রা হাসিয়া বলিলেন, কী গো আমার মা-লক্ষ্মী!

কাঞ্চনবউ প্রণাম করিল।

একেবারে নীচের তলায় বাড়ির ঠিক মাঝখানে প্রশস্ত একখান ঘর, কিন্তু অন্ধকূপের মত অন্ধকার—একটি দরজা ভিন্ন আর দরজা নাই অথবা জানালা নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই মণি একটা গুমোট গরম অনুভব করিল, নাকে ঢুকিল ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ। হাতের প্রদীপের আলোয় ঘরের গাঢ় অন্ধকার আবছায়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। মণির সর্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তাহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না; সে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে যেন অশরীরীর মত ছাদে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে—চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কতকগুলি লোহার সিন্দুক।

—এই ঘরের এই দোরের কাছ থেকে!

মণি চমকিয়া উঠিল। লাঠির উপর ভর দিয়া বার্ধক্যে অবনমিত-দেহ বৃদ্ধা কর্ত্রী দন্তহীন মুখে জড়িত স্বরে বলিলেন, এই ঘরের এই দোরের কাছে পিদীম রাখ্‌ লো ভাই নাতবউ! এই হল আমাদের লক্ষ্মীর ঘর।

মণি দেখিল বিবর্ণ কালো একটি চতুষ্কোণ স্থান; ক্রমে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হইল—ওটা একটা দরজা, দরজাটার শিকলের মুখে মরিচা-ধরা একটা তালা ঝুলিতেছে।

কর্ত্রী বলিলেন, আমার দিদিশাশুড়ী, বুঝলি ভাই—এই ঘরে মা-লক্ষ্মীকে বন্ধ করে রেখে গিয়েছেন। এই দরজা যদ্দিন না খুলবে, ততদিন মা-লক্ষ্মী এ বাড়িতে বাঁধা থাকবে। আমার বড় শ্বশুর ছিলেন কোম্পানির দেওয়ান—তখন নবাবের আমল—

তিনিই এ দেশে প্রথম জমিদার কোম্পানির দেওয়ানী করিয়াই তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। মণিমালা তাঁহার নাম শুনিয়াছে, তাঁহার নাম ছিল—গোপীবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম সরকার হইতে রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি নাকি একেবারে অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন।

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, বুঝলি ভাই, ভাঙা ঘর, রাত্রে শেয়ালে এসে আগড় ঠেলে রান্না খেয়ে যেত। বাড়ির চারিদিকে ছিল কুকুরসোঙার বন, ঝরঝর করে জল পড়ত, রাত্রে ঘুমুতে না পেয়ে আমার বড় শ্বশুর কাঁদতেন, বড় শ্বশুরের মা বলতেন, এই কুকুরসোঙার বন—এই ভাঙা কুঁড়ে ভেঙে অমুক রচবে বৃন্দাবন। তাই তিনি করেছিলেন। কোম্পানির কুঠিতে প্রথমে তিনি সর্দার হয়ে ঢুকেছিলেন।

গোপীবল্লভ প্রথমে পাইকদের সর্দার হইয়া কোম্পানির চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে মুন্সী, তারপর গোমস্তা, তারপর নায়েব, তারপর হইয়াছিলেন দেওয়ান।

তখন কোম্পানির কাছে তাঁতীরা সব দাদন নিত। কিন্তু দাদন শোধ করবার সময় সব লুকিয়ে বসে থাকত। সে দাদন আর আদায় হত না। তখন সায়েব বললে, যে এই দাদন আদায় করতে পারবে তাকেই আমি দেওয়ান করব। এই আমার বড় শ্বশুরের কপাল খুলে গেল। খুঁজে খুঁজে তাঁতীদের সব ধরে এনে খুঁটিতে বেঁধে দাদন একেবারে পাইপয়সা আদায় করে দিলেন। বুঝলি ভাই নাতবউ, সাধারণ পুরুষ ছিলেন কি তিনি—তাঁর ডাকে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত।

সত্য কথা। সে আমলে গোপীবল্লভকে লোকে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বলিয়া মানিত। কোম্পানির কর্তা সায়েবদের তিনি ছিলেন ডান হাত।

মণিমালা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দিদিশাশুড়ীর কুঞ্চিতচর্ম দন্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। সে-আমলের কথা সে-ও অনেক জানে। তাহার বিবেকানন্দ-ভক্ত বাপ, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী বড়দাদা, গান্ধীপন্থী ছোটদাদার কাছে অনেক শুনিয়াছে।

দিদিশাশুড়ী অকস্মাৎ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, ইদিকে জাঁদরেল হলে হবে কি ভাই, বুড়ো খুব রসিক ছিল, বুঝলি, ষাট বছর বয়সে বুড়ো তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিল। প্রথম দু'পক্ষের ছেলেপুলে ছিল না, তারপর ষাট বছর বয়সে নৌকো করে যেতে যেতে গাঙের ঘাটে আমার দিদিশাশুড়ীকে দেখে বুড়োর মুণ্ডু ঘুরে গেল। বুঝলি ভাই, সে-আমলে পুজোর সময় লোকে দুগ্‌গা ঠাকরুণের পিতিমে না দেখে নাকি দেখত আমার দিদিশাশুড়ীকে। এই টানা টানা চোখ, দুধে-আলতার রঙ, চাঁপার কলির মত আঙুল, সব চেয়ে বাহারের ছিল তাঁর চুল। ভোমরার মত কালো আর কোঁকড়ানো। তাঁরই পেটে জন্মালেন আমার শ্বশুর। আর কি ভাগ্যি ছিল আমার দিদিশাশুড়ীর! বিয়ের পরই দুই সতীন টুকটুক করে মরে গেল। তখন এই বাড়ি হল। বুড়ো নাকি বলত, এ মানিক আমি রাখব কোথা! নাম দিয়েছিলেন মানিকবউ। মানিকবউয়ের আতরের ভরি ছিল আশী টাকা। ঢাকা থেকে ঢাকাই কাপড় আসত। কাশী থেকে আসত গরদ।—বলিয়া ঠোঁটের ডগায় একটা পিচ কাটিয়া বলিলেন, বুঝলি ভাই নাতবউ, বর তোমার গিয়ে বুড়োই ভালো। নইলে ভাই আদর হয় না। জানিস তো প্রথম পক্ষ হল হেলাফেলা, দ্বিতীয় পক্ষ ফুলের মালা, আর তৃতীয় পক্ষ হল হরিনামের ঝোলা—ও তোর গলাতেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

কাঞ্চনবউ মুখ নত করিয়া মৃদু হাসিল।

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, হাসছিস বুঝি! তোর ওই ছোঁড়া বর তোর আদর করবে মনে করছিস? এ বাড়ির সবারই বার-ফটকা রোগ আছে। ছোঁড়াকে খুব কষে লাগাম টেনে রাখবি, বুঝেছিস!

মণি বলিল, আপনি মা-লক্ষ্মীর কথা বলুন।

—তাই বলছি লো। সে আমার দিদিশাশুড়ীর আমলে। তখন বুড়ো মারা গিয়েছে সদ্য। আমার শ্বশুরের বয়েস তখন বছর বিশেক, সবে বিয়ে হয়েছে। তখন আমাদের নায়েব ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার বড় শ্বশুরের হাতে তৈরী নায়েব। শ্বশুর বলতেন, কিত্তিকাকা।

দাপট কি তার! সমস্ত ছিল তার হাতে। ভারি কুটিল লোক ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার শ্বশুর তাকে খুন করে তবে সম্পত্তি হাতে পান। সপ্তমী পুজোর দিন তাকে খুন করেছিলেন।

মণি শিহরিয়া উঠিল, খুন!

—হ্যাঁ। তা নইলে সে কি আর সম্পত্তি দিত শ্বশুরকে! আমার দিদিশাশুড়ী কিন্তু শ্বশুরকে বললেন, এ কি মহাপাপ করলি তুই? আমার বংশ কি করে থাকবে? সেই থেকে তিনি একেবারে যোগিনী সাজলেন, গেরুয়া কাপড় পরলেন, গায়ে নামাবলী নিলেন, তেল ছাড়লেন, কোঁকড়ানো চুল রুখু হয়ে ফুলে চামরের মত হয়ে উঠল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, চুল তাঁকে কাটতে দেয় নি ঘরের লোকে। আটদিন উপোস করে থাকলেন—মা, এ মহাপাপ থেকে আমার বংশকে রক্ষা কর। তারপর আঙুল গুনতে আরম্ভ করলেন, অষ্টুমী, নবুমী, দশুমী, একাদশী, দ্বাদশী, তেরোদশী, চতুরদশী, পুন্নিমে—আটদিন, সেই দিন কোজাগরী পুন্নিমে।

সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে অষ্টাহ উপবাসিনী গোপীবল্লভের পরমাসুন্দরী সহধর্মিণী ওই লক্ষ্মীর ঘরে ঘৃতদীপ জ্বালিয়া বসিয়া ছিলেন, এই প্রাসাদতুল্য বাড়িটির ফটক হইতে অন্দর পর্যন্ত সারি সারি আলো জ্বলিতেছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় যেন ভুবন ভাসিয়া যাইতেছিল। কেবল দিগন্তের এক কোণে কোন সুদূর দূরান্তের সচকিত বিদ্যুৎ-চমকের ক্ষীণ আভাস মধ্যে মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, দাসদাসী পুত্র-পুত্রবধূ সব ঘুমঘোরে অচেতন। কোজাগরী পূর্ণিমায় এমনি চৈতন্যহারা ঘুমই মানুষের চোখে নামিয়া আসে। আজও আসে। লক্ষ্মীদেবী এই জ্যোৎস্নাময়ী কোজাগরী নিশীথে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হন। প্রশ্ন করেন সুধাক্ষরা কণ্ঠে, কোজাগরী রাত্রে—কে জাগে রে? কে জাগে?

উত্তর দেয় ভক্তিমান গৃহস্থের গৃহদ্বারের আলোকশিখা ও আলিপনা, সেই আলোকিত আলিপনারেখা ধরিয়া তিনি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন কেহ জাগিয়া আছে কিনা। জাগিয়া থাকিলে পূজাগ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ দিয়া আবার বাহির হন। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মা-লক্ষ্মী রায়বাড়িতে দেখা দিলেন না; গোপীবল্লভের রূপসী বিধবার চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। তারপর রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহরের প্রথম ভাগ, অকস্মাৎ জ্যোৎস্না কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। সে বাতাসে সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। গোপীবল্লভের বিধবার ভক্তি ও নিষ্ঠার সীমা ছিল না, তিনি আবার প্রদীপ জ্বালাইয়া শেজ দিয়া সেগুলি ঢাকিয়া দিলেন। কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, চারিদিক অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ।

সেই দুর্যোগের মধ্যে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কে জেগে রয়েছে গো? আমাকে একটুখানি বসতে দেবে? অন্ধকারে আমি পথ পাচ্ছি না।

অপূর্ব পদ্মগন্ধে রায়গিন্নীর মনপ্রাণ তখন উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে হাসিলেন, মুখে বলিলেন, দিতে পারি মা, এক শর্তে।

—কী, বল?

—তুমি এইখানে বস। আমি একটু বাইরে যাব, যতক্ষণ না ফিরব আমি, ততক্ষণ কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে?

—বেশ।

মেয়েটিকে ঘরে বসাইয়া গোপীবল্লভের বিধবা উঠিলেন, ঘরের দরজাটা টানিয়া শিকল দিতে দিতে বলিলেন, আমি শেকল দিয়ে যাচ্ছি, এসে খুলে দেব। তারপর দিলেন ওই তালা। ছেলেকে ডাকিয়া তুলিয়া সমস্ত বলিয়া ছেলের হাতে চাবি দিলেন, তারপর বলিলেন, ও তালা তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা-লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে আমি চললাম।

—কোথায় মা?

মা হাসিয়া বলিলেন, কর্তাকে খবর দিতে বাবা। বলিয়া তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলে গেল পিছন পিছন। মা গঙ্গার কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। শরতের মেঘ কাটিয়া তখন আবার চাঁদ উঠিয়াছে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার বুকে লাখে লাখে চাঁদমালা ভাসিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। গোপীবল্লভের বিধবা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

গল্প শেষ করিয়া বর্তমান রায়গিন্নী বলিলেন, সে চাবিও আমার শ্বশুর গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছেন।

মণিমালা বিচিত্র দৃষ্টিতে ওই তালাটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল অন্ধকূপের মধ্যে মা লক্ষ্মীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে! চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল।

বিগত শতাব্দীর স্বপ্ন-কল্পনার কাহিনী, তরুণী কিশোরীটির সমস্ত চেতনাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিল। সাধারণ তরুণীর কল্পনায় হয়তো ভাসিয়া উঠিত মণিরত্নময় এক ধনভাণ্ডার, যে মরকত তাহারা চোখে কখনও দেখে নাই—কল্পনায় সেই মরকত দিয়া পদ্ম গড়িয়া তাহার উপর কল্পনা করিত পটের অথবা মাটির লক্ষ্মীদেবীকে; কোণে ঝাঁপি, পায়ের কাছে পেঁচা। কিন্তু মণিমালা, এ বাড়ির কাঞ্চনবউ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া মেয়ে। তাহার কল্পনায় কেবলই ভাসিয়া উঠিল, বদ্ধদ্বার অন্ধকার ঘরের মধ্যে রক্তমাংসের সুকুমারী একটি মেয়ে ভীতত্রস্ত দৃষ্টিতে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে। চোখ হইতে টপটপ করিয়া মুক্তার মত নিটোল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, গভীর রাত্রে হয়তো গুনগুন করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। মেয়েটির গোলাপ ফুলের দেহবর্ণ বাসি চাঁপার মত হইয়া গিয়াছে।

কাঞ্চনবউ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। পায়ের তলায় সিমেন্টের কঠিন শীতল স্পর্শ তাহার অনুভূতির অগোচর থাকিয়া গেল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাশালে রান্নার গন্ধ উঠিতেছে, সে গন্ধও তাহার গোচরে আসিল না। তাহার ছোট খুড়শাশুড়ীর ঘরে গ্রামোফোনে একটি নাচের গান বাজিতেছে। ঝিদের কোলে দুটি শিশু তারস্বরে চাৎকার করিতেছে মায়ের কোলের জন্য। বনলতার ঘরে

তাসের আসর বসিয়াছে। বনলতা কেবলই হাসিতেছে সিদ্ধির ঘোরে। সেজকর্তা ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। বধূটিকে দেখিয়া দ্রুতপদে তিনি ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। ওই তাঁহার এক বিশেষত্ব, কাহারও সহিত কথা বলেন না, লোক দেখিলেই ঘরে ঢুকিয়া যান। ভোরবেলা হইতেই বাহির হইয়া গোয়ালায়, গরু ছাগল ভেড়া ও হাঁসের পাল লইয়া থাকেন; দ্বিপ্রহরে একবার খাইয়া যান, আবার সন্ধ্যায় ফেরেন, তারপর অন্ধকারে ছাদে পায়চারি করেন। লোক দেখিলেই ঘরে ঢোকেন, লোক চলিয়া গেলেই বাহির হইয়া আসেন। বড়-কর্তার ঘরে মেজকর্তা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠিতেছে চট্-পট চট্-পট, চাকরে বড়কর্তার গা-হাত-পা টিপিতেছে।

মেজকর্তা বলিতেছেন, বেটা শূয়ার কি বাচ্চার আস্পর্ধা দেখ দেখি! হাজার পাঁচেক টাকার দরকার, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শালা বলে কিনা আগের দেনাটা প্রায় লাখ পাঁচেকে গিয়ে দাঁড়াল। জানে না বেটা উল্লুক, রায়বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মৃদুস্বরে বড়বাবু বলিলেন, চাপরাসী দিয়ে বেটার কান মলিয়ে দিলে না কেন!

দেওয়া উচিত ছিল ভাই। কিন্তু কালই আমার টাকার দরকার, সার্কেল অফিসার এসে বসে আছেন চাঁদার জন্যে। বলেছি কালই দোব টাকা।

রুদ্ধদ্বার ঘরের বাহিরে যেমন বায়ুপ্রবাহ বহিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সমস্ত বহিয়া গেল মণিমালার মনের বহির্লোকে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আপনার ঘরে বসিল।

বনলতার ছোট বোন বছর দশেকের মেয়েটি—নাম স্নেহলতা, সে আসিয়া কাঞ্চনবউয়ের পাশে বসিল। কাঞ্চনবউ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

মেয়েটি বলিল, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে।

কাঞ্চনবউ সস্নেহে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

সে বলিল, আমাকে একটা পয়সা দেবেন?

—পয়সা! পয়সা নিয়ে কি করবি?

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

কাঞ্চনবউ বাক্স খুলিয়া একটি আনি তাহার হাতে দিল, মেয়েটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চুপি চুপি এবার বলিল, জানেন আমার বাবার পয়সাকড়ি কিছু নেই। ওই যে মেজ জ্যাঠা গাঁদামিনসে, সব ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে, কাউকে কিছু দেয় না।

মণিমালা অবাক হইয়া গেল। 'এমন কথা—এসব কথা বলিতে নাই' বলিতেও সে ভুলিয়া গেল।

মেয়েটি আবার বলিল, বাবা আমার মুখ্যু, গাঁজা খায়, গুলি খায়, তাই জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। লোক দেখলে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে। মেজ জ্যাঠা মদ খায় কিনা, তাই ওকে খুব ভয় করে বাবা। বাবা যে গুলিখোর! বলিয়াই সে হাসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, জানেন মাছি ধরে বাবা কানের মধ্যে পোরে, বন্‌বন্ শব্দ করে, তাই—

বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিতেই মেয়েটি শশব্যস্ত হইয়া কথা শেষ না করিয়াই

নিমেষের মধ্যে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই বড়গিন্নীর ঝি কামিনী উঁকি মারিয়া বলিল, স্নেহ এসেছিল বুঝি বউদিদি ?

কাঞ্চনবউয়ের কথা সরিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

ঝি বলিল, দেখ্ দেখি সব ভালো করে, কিছু চুরি করে নিয়ে গেল কিনা। মেয়েটা চোর, খবরদার ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়ো না।

কাঞ্চনবউয়ের এবার মনে হইল সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। ঝিটা চলিয়া যাইতেই সে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

বাহির দিকের জানালা দিয়া রিহারস্থালের বক্তৃতার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

ক্রমশ বাড়ির শব্দ-কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। উপরে ঘরে ঘরে মৃদু নাসিকা গর্জন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে কেবল ঠাকুর চাকর ও ঝিদের কথাকলহ। কাঞ্চনবউয়ের স্বামী বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। কাঞ্চনবউ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল, রাত্রে সে ঘুমাইবে না, জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, মৃদু কান্নার শব্দ অথবা কঙ্কন-ঝঙ্কার শোনা যায় কিনা সে শুনিবে।

তাহার স্বামী বলিল, কলকাতায় যাচ্ছি—কিছু বরাত থাকে তো বল।

চকিত হইয়া মণি বলিল, কলকাতা ?

—হ্যাঁ। 'ষোড়শী' প্লে দেখতে যাচ্ছি। আমাদের 'ষোড়শী' হচ্ছে কিনা এবার।

মণি চুপ করিয়া রহিল।

হাসিতে হাসিতে স্বামী কহিল, আর একটা মতলব আছে। আগে কাউকে বলছি না সেটা। একেবারে সব তাক লাগিয়ে দেব।

মণি এবারও কিছু বলিল না, শুধু হাসিল, মৃদু ম্লান হাসি।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া স্বামী বলিল, হুঁ, হুঁ, অবাক হয়ে যাবে সব। কাউকে বলো না যেন, মোটর কিনব একখানা, দাদা সব মতলব ঠিক করে ফেলেছে। ডি-লাক্স সেলুন বডি—ফোর্ড!

সহসা মণি চমকিয়া উঠিল। চাপা কান্নার শব্দ। কে কাঁদে! সে তাড়াতাড়ি স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে কাঁদছে ?

কান পাতিয়া শুনিয়া স্বামী বলিল, বার বার বললাম দাদাকে, এত করে টেনো না। নেশার ঘোরে বউদিকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। নাও শোবে এস।

স্বামী বিছানায় ধপাস করিয়া বসিয়া শরীর এলাইয়া দিল। আবার সে ডাকিল, শোও এসে।

কাঞ্চনবউ উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই স্বামীর নাক ডাকিতে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ পরে নীচের রান্নাশালের সাড়াশব্দ শুরু হইয়া গেল। ওদিকে দিদিশাশুড়ীর মহলে কেবল মৃদু সাড়া উঠিতেছে। লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে। ঠাকুরমায়ের জলখাবার তৈয়ারী হইতেছে।

পাশের আমবাগানে পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়া গেল বোধ হয়। টক্‌টক্‌ শব্দে ওটা বোধ হয় তক্ষক ডাকিতেছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় একটা ব্যাঙ কাতরাইতেছে, অজগরে উহাকে গ্রাস করিতেছে। আরও একটু নিবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনবউ শুনিল, আমবাগানে অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে। কিন্তু কই, পদ্মগন্ধ তো পাওয়া যাইতেছে না! মৃদু কঙ্কন-ঝঙ্কারও তো উঠিতেছে না, সন্তর্পিত কোমল চরণপাতে ক্ষীণ নূপুর-ধ্বনি কিংবা কান্না কি দীর্ঘনিশ্বাস—কিছুই তো শোনা যায় না। সন্তর্পণে সে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়িখানা সুষুপ্ত, দিদিশাশুড়ীর মহলেও আর সাড়াশব্দ উঠিতেছে না। কেবল সমবেত নাসিকাগর্জনের ধ্বনিতে বাড়িখানা মুখরিত। ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে—সেই অদ্ভুত বিকট শব্দে।

আজ কিন্তু কাঞ্চনের হাসি আসিল না।

ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। আবার পেঁচারা ডাকিয়া উঠিল, দূরে মাঠে ডাকিয়া উঠিল শেয়াল। কোথাও কেহ কাঁদে না, কাহারও দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না।

পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠিয়াছে, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনবউয়ের যেন মোহ কাটিল। সে অনুভব করিল, দেহ তাহার ভার হইয়া পড়িয়াছে, চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত বাড়িখানা এখনও সুষুপ্ত। সে ঘরের ভিতর গিয়া বিছানায় শুইল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঢ়ঘুমে অসাড় হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে মোহ জাগিয়া উঠে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে। প্রদীপ ও ধূপদানী নামাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া সে একাগ্র উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করে। ঘরের মধ্যে মাথার উপর চামচিকা উড়িয়া বেড়ায়, বন্ধ ঘরের গুমটে দরদর করিয়া ঘাম পড়ে। কিছুক্ষণ পর নিজেই সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তারপর প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসে।

এক-একদিন সে তালাটার দিকে চাহিয়া দেখে। মরিচা-ধরা তামাটে রঙের তালাটা জাম ধরিয়া একটা অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সাহস করিয়া সে একদিন তালাটা নাড়িয়া দেখিল। সচেতন বুদ্ধি সত্ত্বেও তালাটার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘামে তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিয়াছে। দ্রুতপদে সে উপরে উঠিয়া গেল।

রান্নাশালে আজ ছোট শ্বশুরের হাঁকডাক শোনা যাইতেছে। তিনি আজ রাশীকৃত পাখী শিকার করিয়াছেন, সেই পাখী রান্নার জন্য তিনি মশলা বাটাইতেছেন। রান্না হইবে বাহিরে কাছারিবাড়িতে, বাড়ির মধ্যে বৃথা মাংস প্রবেশ করিতে পায় না।

বনলতার ঘরে তাসের আড্ডা বসিয়াছে। আজ কিন্তু আড্ডাটি নিঃশব্দ, নিঃশব্দে সকলে খেলিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দোতলাটাই আজ কেমন শব্দহীন গতিতে চলিয়াছে নিঃশব্দ

মেজকর্তা দ্রুতপদে ছাদ হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বড়কর্তার ঘরে মেজকর্তার কি আলোচনা হইতেছে। বৃদ্ধা রায়কর্ত্রী পর্যন্ত আসিয়াছেন।

মহাজন নালিশ করিয়াছে, দাবি হইয়াছে প্রায় ছয় লক্ষ। সেই লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

মেজকর্তা সাহেব-সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তিনি বলিতেছেন, লক্ষ্মীর ঘর খুলিয়া দেখা যাক। —এ যুগে 'লক্ষ্মী বন্দিনী' এ প্রবাদ রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার বিশ্বাস পূর্বপুরুষ গোপীবল্লভের পত্নী ওই ঘরে মহামূল্য গুপ্তধন লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বড়কর্তা বলিলেন, না। ইস্পাতের মত কঠিন অনমনীয় তাঁহার কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধা কর্ত্রী বলিলে, আমি আত্মহত্যে করব তাহলে—এই তোকে বলে রাখলাম কিন্তু।

পরদিন সন্ধ্যা দিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল। নতজানু হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া করজোড়ে সে প্রার্থনা করিল, মা, মা-লক্ষ্মী! দয়া কর মা, তুমি রায়বংশকে রক্ষা কর। যে বাড়িতে তুমি অচলা হয়ে রয়েছ, সেখানে ঋণের কষ্ট কেন?

আবার তাহার চোখে জল আসিল। উঠিয়া প্রদীপটি তুলিয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কালো দরজাটা পাথরের মত অনড় অচল। সহসা দরজার তালাটার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল, ব্যগ্র ঔৎসুক্যে সে তালাটার অতি নিকটে আলোটা তুলিয়া ধরিল। শতাব্দীর রসনা অবহেলিত তালাটা প্রথম দৃষ্টিতে অখণ্ড পাথরের মত মনে হইলেও, ক্ষয়িত হইয়া কখন খুলিয়া গিয়াছে—কেবল ঝুলিয়া আছে।

অত্যুগ্র উত্তেজনায় তালাটা ধরিয়া সে টানিল।

তারপর সেই পাথরের মত অনড় অচল দরজার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার দিয়া ঠেলা দিল।

বার বার! বার বার! সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গের ঝিটা সভয়ে ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিয়াছিল।

সমস্ত রায়বাড়ি ভাঙিয়া আসিল।

সর্বাগ্রে মেজকর্তা।

দুয়ার খুলিয়া গেল।

শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকালের বদ্ধ বায়ু—তাহার স্পর্শ গন্ধ তীব্র উগ্র অসহনীয়। মেজকর্তা দুয়ারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখিলেন।

ছোট একখানি ঘর চোরকুঠরীর মত।

শূন্য! কোথাও কিছু নাই। কিন্তু মেঝের উপর ওটা কি পড়িয়া?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাঞ্চনবউ দেখিল, একটা নরকঙ্কাল। আর ওটা? ধূসর বিবর্ণ—

ধীরে ধীরে ঘরখানার তীব্র অসহনীয় গন্ধ স্পর্শ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

মেজকর্তা একবার অগ্রসর হইয়া ধূসর বস্তুটিকে হাতে করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন,—কাঞ্চনবউ দেখিল, সকলেই দেখিল একরাশ চুল—বিবর্ণ হইয়া গেছে, কিন্তু তবু অনুমান করা যায়, সে চুল এককালে ভ্রমরের ন্যায় কালো এবং কুঞ্চিত ছিল। মেঝের উপর আরও পড়িয়াছিল—একখানা বিবর্ণ জীর্ণ কাপড় কি চাদর, পাড়ের চিহ্ন দেখা যায় না, আর একখানা নামাবলী।

অকস্মাৎ কাঞ্চনবউয়ের চোখ দিয়া দরদরধারে জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

গ্রন্থ-পরিচয়

অভিযান

'অভিযান' উপন্যাস তারাশঙ্করের একটি বিখ্যাত ও বিশিষ্ট রচনা। তারাশঙ্কর সাহিত্যজীবনের প্রায় আরম্ভ থেকেই অবজ্ঞাত ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন। বোধ হয় অবহেলিত সমাজজীবনের সর্বস্তর ছুঁয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' এই দুই মহাগ্রন্থের পরে এক সাধারণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে নিয়ে তিনি 'অভিযান' উপন্যাসটি রচনা করেন।

'অভিযান' তিনি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' লেখবার আগে রচনা করেছিলেন। একথা 'অভিযান' পাঠের কালে মনে রাখতে হবে।

উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে ধারাবাহিক রচনা হিসেবে 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'পরিচয়' পত্রিকায় তারাশঙ্করের 'অভিযান' উপন্যাস প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক গোপাল হালদার লিখেছেন :

"......আমি তখন "পরিচয়ে"র সম্পাদক। আমরা ওঁর মর্যাদা-মত দক্ষিণা দিতে পারব না, কাজেই সহজে আমি ওঁকে "পরিচয়ে" লিখতে বলতাম না। কাগজের কর্তৃপক্ষ হলেও আমি মর্মে মর্মে বুঝি—লেখা যাঁর বৃত্তি তাঁকে দক্ষিণা না দেওয়ার অর্থ তাঁর জীবিকা-হরণ ও তাঁর পরিজনদের প্রতিও অনভীপ্সিত অন্যায়। আমি মানতাম, "লেখা ছাপতে ছাপাখানায় টাকা দেবে, বাঁধাই'র-দপ্তরীকে টাকা দেবে, ডাকবিভাগকে মাশুল দেবে—কেবল লেখককেই টাকা দিতে হবে না। কেন, লেখাটা কি এত নিকৃষ্ট জীবিকা? না, লিখতে পারাটাই অপরাধ? তারাশঙ্করবাবুর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এ মূল নীতির ব্যতিক্রম হয়—সে হয় "আত্মীয়তা"র ক্ষেত্রে। এই আত্মীয়তা মনের ও আদর্শের আত্মীয়তা। তাঁর দক্ষিণা যোগাতে লেখকই আনন্দ পান—তা তাঁর নৈবেদ্য, তাঁর চিৎ-স্বরূপের কাছে। এ সম্পর্কেও তারাশঙ্করের বিশেষ উৎসাহ দেখেছি। "পরিচয়ের জন্য একটা উপন্যাস লিখব"—নিজ থেকেই তিনি জানান। আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না—যখন মাসের পর মাস "অভিযান" তার পৃষ্ঠায় ছাপা হতে থাকে। "অভিযান" (সত্যজিৎ রায়ের কল্যাণে বহু সহস্র লোকের এখন পড়া নয়, দেখা বই'। লেখা শেষ হলে কৃতজ্ঞতায় ঠিক করলাম—সাধ্যাতীত হলেও যা পারি কিছু মর্যাদা-সূচক (টোকেন) প্রণামী দেব, মাত্র তিন বা চার শ টাকা। কথাটা সংকোচে পাড়লাম। তারাশঙ্কর বললেন, 'টাকাটা রাখুন। ওটা আমার হয়ে "পরিচয়"-এ জমা দেবেন—পত্রিকাটা ভালো করে চালান্।' ('কালি ও কলম', 'তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর', অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ পৃ. ৬৩৬)।

পুস্তকাকারে 'অভিযান'-এর প্রথম প্রকাশকাল :

'অভিযান'. প্রথম সংস্করণ. পৌষ. ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) ষোলোপেজী ডবল-ক্রাউন সাইজ,

পৃ. ৩২০ বোর্ড বাঁধাই—কাগজের মলাট। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ. ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

'বেঙ্গল লাইব্রেরী' সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকামতে 'অভিযান'-এর প্রকাশকাল ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭।

'অভিযান' উপন্যাসটি 'তারাশঙ্কর-বীথিকা'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে বঙ্গাব্দ ১৩৮০ সালের ১ বৈশাখ (ইং ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩) প্রকাশিত হয় (প্রকাশক : 'সাহিত্যম্', ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২)।

'তারাশঙ্কর-রচনাবলী'র নবম খণ্ডে 'অভিযান'-এর ষষ্ঠ মুদ্রণ থেকে পাঠগ্রহণ করা হয়েছে।

তারাশঙ্করের অসংখ্য ছোট গল্প ও উপন্যাসের মতই মনে হয় 'অভিযান'-এর ঘটনাও তাঁর অভিজ্ঞতার উৎস থেকে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। মফস্বলের ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের এমন বাস্তবোচিত ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যেই বিরল। এমন সব খুঁটিনাটি বর্ণনা বইটিতে আছে—যা লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির ফল। একটি সাধারণ মানুষ—দৈহিক শ্রমই যার মুখ্য জীবিকা তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত বর্ণনা তারাশঙ্কর করেছেন তাঁর 'অভিযান' উপন্যাসে।

বাল্যকাল থেকে অনাদৃত ও ভাগ্যহত একটি মানুষের জীবনকাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে।

'অভিযান' তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট রচনা। 'অভিযান' উপন্যাসের মেজবাবু চরিত্রটিকে মনে হয় নিজের চোখে দেখেছেন তারাশঙ্কর। আরো একটি চরিত্র আছে রাজবন্দী ও সন্ত্রাসবাদী অনন্তবাবুর। তারাশঙ্কর যৌবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এবং কারাবাসও করেছিলেন। তাঁর নিজ গ্রাম লাভপুরেও একদা অনেক খ্যাতনামা রাজবন্দীরা অন্তরীণে আবদ্ধ হয়ে আশ্রয়লাভ করেছিলেন। তারাশঙ্কর একদা সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তারই কোনো চিত্র তিনি এঁকেছেন অনন্তবাবুর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

'অভিযান'-এর কাহিনীর কোনো বীজগল্প আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'রাঠোর ও চন্দাবত'-এর কথা স্বভাবতই স্মরণে আসে। সেখানেও আত্মকলহ ও মারামারি এবং রক্তপাতের মধ্যেও একটি প্রেম ও ভালোবাসার মধুর ও করুণ কাহিনী পাঠকের মনকে অধীর করে তোলে।

তারাশঙ্করের আরও একটি উপন্যাসেও মোটর ড্রাইভারদের কথা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁর 'স্বর্গ-মর্ত্য' উপন্যাসের মোটর ড্রাইভার ও তাদের আস্তানার কথা স্বভাবত মনে আসে। কিন্তু 'স্বর্গ-মর্ত্য' উপন্যাসটি তারাশঙ্করের অনেক পরের রচনা। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে 'অভিযান' উপন্যাসের নরসিং ও রামা এবং নিতাইয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টির ধারা থেকে এই উপন্যাসটি একটু স্বতন্ত্র রীতিতে রচিত বলে—তাঁর সমধিক বিখ্যাত উপন্যাসগুলির আড়ালে এই উপন্যাসটি রয়ে গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ও সৃষ্টি হিসেবে এখনো সম্যক আলোচিত হয় নি।

পদচিহ্ন

'পদচিহ্ন' তারাশঙ্করের আত্মজীবনী-মূলক ও তাঁর স্বগ্রামসমাজ-সম্পৃক্ত উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম উপন্যাস বলা চলে। 'পদচিহ্ন'-এর প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৫৭ (ইং এপ্রিল ১৯৫০)। এই ধারায় তিনি পরবর্তীকালে 'জনপদ' ও 'কালান্তর' উপন্যাস রচনা করেছেন।

'পদচিহ্ন' উপন্যাসের পটভূমি মনে হয় তাঁর স্বগ্রাম লাভপুর গ্রামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নবগ্রামের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চিত্র আঁকতে গিয়ে স্বগ্রামের ছবিই তিনি এঁকেছেন। তারাশঙ্করের রচনারীতির যেগুলি বৈশিষ্ট্য—সেই অতীতের স্মৃতিচারণ—প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব এবং সমাজের উচ্চকোটীর মানুষদের মধ্যে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজে যশ ও প্রতিষ্ঠা পাবার লোলুপতা ও আকাঙ্ক্ষা এবং রক্ষণশীল সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হবার কাহিনী—তিনি 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। সমাজের গ্রামীণ মানুষেরা তখনো রক্ষণশীল আবহাওয়ায় পুষ্ট—যন্ত্রযুগের আবির্ভাব তখনো ঘটে নি—সমাজ-জীবন তখনো নিস্তরঙ্গ ও উত্তেজনাহীন। সমাজের বহিরঙ্গে কোনো পরিবর্তন আসে নি। ইংরেজপ্রীতি ও শোষণ তখনো সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ভাবাদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের আহ্বানে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে সমাজের আদর্শবাদী ও নীতিপরায়ণ মানুষের অন্তর।

'পদচিহ্ন' উপন্যাসের নায়ক গোপীচন্দ্র অল্প বয়সে—প্রথম যৌবনে ভাগ্যের অন্বেষণে সামান্য জীবিকা অবলম্বন করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং মধ্যজীবনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ করায়ত্ত করে গ্রামে ফিরে আসেন। তাঁর মনের মধ্যে ছিল নানা জনহিতকর কার্যের বাসনা। তিনি গ্রামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, হাই স্কুল স্থাপন, জলাশয় খনন, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির পরিকল্পনা করেছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য এবং অমায়িক ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি গ্রামবাসীর প্রিয় পাত্র ও আত্মীয়বৎ আপনজন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিনীত ও নম্র ব্যবহারের জন্যে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের মনোমত হতে পারেন নি। মদ্যপ এবং খলচরিত্র স্বর্ণভূষণের বিরোধিতাও তিনি করতে পারেন নি। কনিষ্ঠপুত্র পবিত্রের পাঠে অবহেলা এবং থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ দেখেও তাকে নিরস্ত করেন নি—সায় দিয়েছেন। গোপীচন্দ্র ক্ষমতাশালী বিনয়ী ও ভদ্র কিন্তু আদর্শবাদী ও দৃঢ়চিত্ত নন—ফলে যখনই সংঘাত এসেছে—তখন দৃঢ়তার ও কাঠিন্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দোলায় স্থির নির্ভরভাবে কিছু করতে পারেন নি। তারাশঙ্কর গোপীচন্দ্রের চরিত্রে

দ্বিধা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মনে হয় গোপীচন্দ্র এবং গোপীচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্তিচন্দ্র এবং কিশোরবাবু এবং মহাপ্রাণ রাধাকান্ত তাঁর চোখে দেখা মানুষ। তাঁর শৈশবে এবং কৈশোরে তিনি স্বগ্রামে এই ধরনের মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। বাস্তবের পটভূমি থেকে উপন্যাসের পাতায় এই চরিত্রগুলিকে তিনি তুলে এনেছেন। সন্দেহ হয় গৌরীকান্ত তিনি নিজেই। কাশীর বৌ-ই বাঁকীপুরের বৌ। সেজন্যে এই চরিত্রগুলি এত বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবানুগ ও জীবন্ত বলে প্রতিভাত হয়। এখানেই মহান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক হিসেবে সার্থকতা।

যতিভঙ্গ

'যতিভঙ্গ' তারাশঙ্করের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে 'যতিভঙ্গ', 'সপ্তপদী', 'বিপাশা' উপন্যাসগুলিকে একটি বিশিষ্ট ধারার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনায় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসে প্রধানত রাঢ়ের লালমাটি—তারা উচ্চাবচ প্রান্তর—রাঢ়ের লৌকিক সংস্কৃতি ও কিংবদন্তী থেকে উপন্যাস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু পরিণত বয়সে স্রষ্টা তারাশঙ্কর নগরজীবন ও শহরের নরনারীকে নিয়ে তাঁর কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। 'যতিভঙ্গ' উপন্যাসটি তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তারাশঙ্কর বাস্তব জগৎ এবং তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনমত তাঁর কাহিনীতে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। আজকের নাগরিক জীবনের উন্মার্গতা ও অস্থিরতার চিত্র তাঁর অনেক উপন্যাসে পাওয়া যায়। আজকের মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণার চিহ্ন তাঁর অনেক উপন্যাসে নরনারীর চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'যতিভঙ্গ' এই ধারার অন্যতম উপন্যাস।

এই কাহিনীতে মানবচিত্তসমস্যা ছাড়াও, তারাশঙ্কর যে কিছুকাল লোকসভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন, সে সময়ের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন দিল্লী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সেদিক দিয়ে এটি একটি মূল্যবান দলিলও।

বন্দিনী কমলা

'বন্দিনী কমলা' তারাশঙ্করের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প। রাঢ়-বঙ্গের একটি লৌকিক কাহিনীকে আশ্রয় করে গল্পটি রচিত হয়েছে। রাঢ় ও বঙ্গের বহু জায়গায় বহু প্রাচীন ও ধনী সম্পন্ন ও জমিদার-পরিবারে লক্ষ্মীকে বন্দী করবার গল্প শোনা যায়। স্রষ্টা তারাশঙ্করের সঙ্গে দেশের মাটির ও লৌকিক সংস্কৃতি, কিম্বদন্তী এবং জনমানসের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ

ছিল। তাঁর সাহিত্যের একটি ধারা এই লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে উপন্যাস-গল্পের কাহিনী ও উপকরণ আহরণ করেছে। 'বন্দিনী কমলা' গল্পটি সম্ভবত এই রকম একটি জনশ্রুতি ও পারিবারিক ইতিহাস-আশ্রিত গল্প।

'বন্দিনী কমলা' গল্পটি সর্বপ্রথম ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন ১৩৪৭)।

তারপর তারাশঙ্করের 'তিন শূন্য' গল্প-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল (প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৪৮, ইং ১৯৪১)।

'বন্দিনী কমলা' অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত তারাশঙ্করের 'গল্প-পঞ্চাশৎ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় (প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৬৩, মুকুন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৪)।

'বন্দিনী কমলা' গল্পটি রচনার মধ্যে লেখকের মুন্সীয়ানা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ঘটনার সঙ্গে অতীত দিনের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত কিম্বদন্তীর মিশ্রণ ঘটিয়ে তারাশঙ্কর গল্পটি রচনা করেন। তিনি ছিলেন এই ধারার নিপুণ ভাষ্যকার। বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অন্যান্য ধনী পরিবারের মত জগৎশেঠের পরিবারেও কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীকে বন্দিনী করবার কথা শোনা যায়। তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত রচনা 'ঢেকা' ভ্রমণের কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় (দ্রঃ 'ঢেকা', পৃ, ৪৫, 'সোনার মলাট তারাশঙ্কর', 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন', কলকাতা-৯, ১৯ জুলাই ১৩৭৩)।

অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় 'বন্দিনী কমলা' গল্পটির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'বন্দিনী কমলা' গল্পটিও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর রচিত হয়েছে। রাজহাটের রায়বাড়ির বন্দিনী কমলার কাহিনী শতাব্দী ব্যাপী বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই বংশের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গোপীবল্লভের 'পরমাসুন্দরী সহধর্মিণী' কোজাগরী পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীকে বন্দিনী করেছিলেন। সে রাত্রির পরিবেশকে গল্পকার অর্থগূঢ়তায় ভরে তুলেছেন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে নেমে এল প্রবল বর্ষণ, প্রবল বাতাসে ঘৃতপ্রদীপগুলি গেল নিবে, পদ্মগন্ধে বাতাস হয়ে উঠল ভারি। সেই দুর্যোগের রাত্রিতে লক্ষ্মী রায়বাড়ির চোরকুঠরীতে চিরকালের জন্য হলেন বন্দিনী। বলা বাহুল্য এই অলৌকিক কাহিনীর একটি প্রবল অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে গল্পটির উপসংহারে। বাস্তবের রূঢ় আলোকে দীর্ঘকালের সংস্কারের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে—বন্দিনী কমলা পরিণত হয়েছেন নরকঙ্কালে ও একরাশ বিবর্ণ চুলে।...এখানেও কিংবদন্তী ও সংস্কারই এর ভিত্তিমূল রচনা করেছে। ('গল্পকার তারাশঙ্কর'—'তারাশঙ্করের গল্প-পঞ্চাশৎ' পৃ. ৪৯)।

শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

—নবম খণ্ড সমাপ্ত—